আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সপ্তম খণ্ড, ১২৮৮।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্, এ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

১৪৮নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট্, ৩০৯ নং

ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত।

সূচিপত্র।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৭ম ভাগ। | বৈশাখ ১২৮৮—এপ্রেল ১৮৮১। | ১ম সংখ্যা

বালিকা-প্রতিভা।

(গীতি)

১

একে অমানিশা-রাতি, নিবেছে চাঁদের বাতি,
গম্ভীর প্রকৃতি তায় অনন্ত আঁধার ঢালে।
যদিও আকাশে তারা কিন্তু ক্ষীণ জ্যোতি-ধারা,
হারি মেনে মিশাইছে শরমে শূন্যের কোলে।
আলোক-জীবন-গ্রাসী স্তরীভূত তমোরাশি
হাসিয়া বিকট হাসি গা ঘসে প্রফুল্ল ফুলে।
রাঙা ফুল কাল হয়, আঁধারে লুকায়ে রয়,
পবন পাইয়া ভয়, পালায় সৌরভ ভুলে।

* গত ১৬ই ফাল্গুন (১২৮৭) শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতা-নিবাসী মহর্ষি-প্রতিম শ্রীযু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের ভবনে "বিদ্বজ্জন-সমাগম"-উপলক্ষে "বাল্মিকী-প্রতিভা" নামে এ খানি অভিনব নাট্য-গীতির অভিনয় হইয়াছিল। সেই অভিনয়ে উক্ত মহোদয়ের অন্যতম পু শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রতিভা' নাম্নী কন্যা প্রথমে বালিকা, পরে সরস্বতী মূর্ত্তিঃ অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছিলেন। এই কবিতাটী তদুপলক্ষে লিখিত হইয়াছে।

আবার তমস হাসে, গাঢ় ঘসে আরণ্য বাসে,
নিকলে অনল-কণা খদ্যোত জ্যোতির ছলে।
যারে পায় তারে ধ'রে ছেড়ে দেয় কাল ক'রে
স্বাতন্ত্র্য-বিনাশ-মন্ত্র সকলের কানে ব'লে।

২

একি! এ যে মহাটবী! প্রকৃতির মহাচ্ছবি!
নীরব হুঙ্কার কভু শুনিনি;—শুনি যে আজ!
কই সে বৈচিত্র্য-মাখা প্রকৃতির হাসা-রেখা?
একি ভাব-বিপর্য্যয়!—প্রকৃত প্রলয়-সাজ!
ঝড়ে তরু গায় গায় কতই আছাড় খায়,
নীরব হুঙ্কারে ভেঙে হুহুঙ্কারে পড়ে বাজ।
তড়িদগ্নি তেড়ে উঠে বেড়ায় জলদে ছুটে,
জলদের আঁখি ফুটে বিশ্ব বুঝি ভাসে আজ।
আহা কি ভীষণ কাণ্ড! ফাটে বুঝি ব্রহ্ম অণ্ড।
মরে বুঝি একাঘাতের মহাভিক্ষু-মহারাজ।
একই নিশ্বাসে আজ্ প্রকৃতি সারিবে কাজ,—
ছিঁড়িবে যোগীর জটা—উড়াবে রাজার তাজ!

৩

ও কি ও!—বনের মাঝে দস্যুরা ভৈরব সাজে
রয়েছে না?—রয়েছে ত!—কি উদ্দেশে? কে তা জানে?
এ বনে আসিতে ডরে সাহস ঘুমায়ে পড়ে
মূর্চ্ছায় মোহিত হ'য়ে;—ওরা এল কোন্ প্রাণে?
সুরা-পানে ভোর হ'য়ে তীক্ষ্ণ তরবারি ল'য়ে
ভ্রূক্ষেপ না করে কা'রে—জোরে চায় চারি পানে।
কখন বিকট হাসে, কখন অসভ্য ভাষে
ওই শুন কি বলি'ছে পরস্পরে কানে কানে।
বিদ্যুৎ থামিয়া গেল, আঁধার দ্বিগুণ হ'ল,
ও কি ফের!—ও কি ফের!—বিদ্যুৎ চমকে বনে!
জলদে বিজলী ছিল, কে তা'রে নামায়ে দিল?
আঁধার পুড়িয়া গেল এ বিজলী পরশনে।

৪

এ কি এ কি,—এ কি দেখি! মেঘের বিজলী ও কি?
হাঁ হাঁ ভাই —না না ভাই! বিজলী অমন নয়।
অনন্ত অনল মাখি বিজলী ঝলসে আঁখি,
বজ্র ল'য়ে খেলা করে, সুগম্ভীরে কথা কয়।
উঠি সে মেঘের গায়, ক্ষণে শত ক্রোশ ধায়,
কভু তার বুক চিরে কোথায় লুকায়ে রয়।
আবার ফাড়িয়া মেঘ, দেখায়ে উন্মত্ত বেগ,
পলকে ঝলকি উঠে কাঁপায়ে ভুবন-ত্রয়।
এ বিজলী সে ত নয়, তারি চেয়ে শোভাময়,
অথচ উত্তাপ নাই, জুড়ায় নয়ন-দ্বয়।
এ বিজলী কি বিজলী? আমারে বুঝাও ব'লি,
কেন এ বিজলী পানে আঁখি মোর চেয়ে রয়?

৫

এই আমি কত ক্ষণ এ ভীষণ মহাবন,
প্রকৃতির উন্মত্ততা, সুরা-মত্ত দস্যুগণে
মহোন্মত্তা বিজলীরে এক বার বই ফিরে
দেখেনি ডুবার তরে, ছিনু সশঙ্কিত মনে।
ভাঙ্গিল ভয়ের ঘোর, নয়ন হরিকে ভোর,
স্বর্গীয় সজীব ছবি কে আনিল ঘোর বনে?
পরণে গেরুয়া বাস, আলু থালু কেশ-পাশ,
কি এক অপূর্ব্ব প্রভা উথলে ও বরাননে!
অলঙ্কার বলে কারে, ও বালিকা জানে না রে,
প্রকৃতির অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা অযতনে।
বালাই লইয়া মরি, বিধাতার কারিগরী
আজি একাধারে হেরি বিস্ময় মানিনু মনে।

৬

পূর্ণিমার শশি-কর মাখান ও কলেবর,
পদ্ম শশী দোঁহে ওর মুখে বুলায়েছে কর।
গোলাপ হরিষ চিতে গালে ওর টিপ দিতে,
না জানি, কতই যত্ন করিয়াছে নিরন্তর।

কালী দিয়ে অলি-কুল ছোঁবায়ে দিয়েছে চুল,
সরসী রেখেছে তুলে দু-নয়নে ইন্দীবর।
বাঁধুলি তুলিয়া করে বসায়েছে ওষ্ঠাধরে
যেন গো সে বন-দেবী মোহিবারে চরাচর।
সমীর আদর করি, চূর্ণ-কুন্তলেরে ধরি,
আঁকা বাঁকা করি, ভালে সাজায়েছে থরে থর।
বীণা আর পিকবর তুলি' নিজ নিজ স্বর
রাখিয়াছে গলে ওর, শ্রবণের সুখকর।

৭

সরলতা, মধুরতা, তরলতা, কোমলতা
এক সঙ্গে মিশাইয়া কে ছড়ালে ওর গায়,
বিস্মিত করিতে বিশ্ব কে নির্ম্মিল হেন দৃশ্য,
এ মূর্ত্তি প্রতিভাময়ী—ভরপূর প্রতিভায়।
কোমল কমল দিয়ে এমন কোমল মেয়ে
কে গড়েছে প্রভাতের প্রভা মাখাইয়া তায়?
কারু-শিরোমণি সেই, তার গো তুলনা নেই,
ধন্য কারু-কার্য্য তা'র, শত ধন্য সে জনায়।
এত ভাব-ভরা ছবি, দেখেছে কি কোন কবি,
আজিকার মত এই নিবিড় বনের গায়?
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভুলি' এক দৃষ্টে আঁখি মেলি'
চেয়ে আছি ওর পানে স্বপ্ন-ময়ী পিপাসায়।

৮

ও কি ও!—আবার ও কি!— বিদ্যুতের চকমকি!—
ঝটিকার হুহুঙ্কার!—ঘন ঘোর—গরজন!—
পলকে প্রলয় সম একি কাণ্ড সু-বিষম!
আবার অকূল হ'য়ে উঠিল গভীর রস!
খসিল গাছের ফুল, উড়িল বালার চুল।
পাকে পাকে জড়াইল গৈরুয়া অঞ্চল গায়;
ঝটিকা ঝাপট মেরে কাঁপাইছে বালিকারে।
ভাসা ভাসা চোক দুটি বন-দিকে চায়।

সরলা ব্যাকুল হ'য়ে, প্রাণ ভ'রে ফুকারিয়ে
কাঁদিয়া উঠিল ওই—
"এ কি এ ঘোর বন!—এনু কোথায়!
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দেনা!
কি করি এ আঁধার রাতে!
কি হবে মোর, হায়!
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে—গগনে,
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায়!"

৯

হায়, হায়! এ কি হ'ল কেন গো এখানে এল
এমন ফুধের মেয়ে!—এ কি বিধি-বিড়ম্বন!
এর পিতা মাতা, হায়! বুঝিগো পাষাণ-প্রায়,
তা নহিলে কোন্ প্রাণে নাহি করে অন্বেষণ?
মাভৈর্মাভৈঃ! ওগো বনদেবী জাগ জাগ,
ধর গো ধর গো এই ননী-মাখা পুতলীরে।
তুমি না বাঁচালে এরে, আর কি কুটীরে ফিরে
যাবে এ কচি মেয়ে? থাম্ থাম্ প্রকৃতি রে!
ঝটিকা রে থাম ত্বরা!— ধ'রে যা রে বৃষ্টি-ধারা—
সরে যা রে অন্ধকার!—চপলা লুকা রে ঘনে!
কোন্ প্রাণে এক যুটে আজ্ তোরা রুখে উঠে;
বালিকা-হত্যার তরে হুঙ্কার ছাড়িস্ বসে?

১০

হায় গো, কি হ'ল, হায়! সবাই বধির-প্রায়,
ক্ষুদ্র কণ্ঠ-চীৎকারে কি কারো মন নাহি গলে?
আয়, বাছা! আয় আয়, আয়, গো মা! আয় আয়,
বুক দিয়ে ঢেকে রাখি তোরে লুকাইয়া কোলে
তোর মত সরলারে ভাসিতে নয়ন-ধারে
দেখিতে পারি না আর, দেখিতে পারি না আর;

* বালিকা কর্ত্তৃক এই বিষাদময়ী গীতিটি দেশ-বেহাগ রাগিণী-যোগে গীত হইয়াছি

আয় বাছা! আয় আয়, আয় গো মা! কোলে আয়,
দেখি ক্রূরা প্রকৃতির কত দূর অত্যাচার।

১১

হা হা! পুন ওকি হ'ল! নিরমম দস্যু-দল
অসহায়া বালিকার বাঁধিয়া কোমল কর;
হইয়া যমের প্রায়, কোথায় লইয়া যায়!
তরবারি ঘুরাইয়া কতই দেখায় ডর!
বাল্মীকি দস্যুর রাজা করি'ছে কালীর পূজা,
এই সব পাপী দস্যু সে মহাদস্যুর চর;
শ্যামার তৃপ্তির তরে বলি দিবে এ বালারে,
দোহাই দোহাই, কালি! মেয়েটিরে রক্ষা কর।
এটি গো বনের ফুল, বিপদে দিও মা কূল,
এ ফুল দ্বি-খণ্ড যদি তোমার সম্মুখে হয়,
তা হ'লে নাস্তিক হ'ব, তোরে নিশাচরী কব,
যেখানে প্রতিমা পা'ব, গুঁড়াইব সুনিশ্চয়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

নাটক-চন্দ্রিকা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

অথ ভাষাবিবেক।

নাটক নাটিকা প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যে ভদ্র, অভদ্র; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য; রাজা, মহিষী, মন্ত্রী; চেটী, সখী; পার্ব্বত্য লোক, বন্য লোক ও কঞ্চুকী * প্রভৃতি নানা প্রকার পাত্রের প্রবেশ সম্ভবিতে পারে, এজন্য গ্রন্থকারের কেবল সাধুভাষায় অথবা সরল ভাষায় রচনা করিতে প্রয়াস পাওয়া, তুষাবঘাতের ন্যায় নিষ্ফল। যে পাত্রের যে রূপ ভাষা, সেই পাত্রের মুখ হইতে সেই রূপ ভাষা নির্গত করান, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতি নাটকে এই নিয়ম অতি সুন্দররূপে নিবদ্ধ

---

* নানাগুণালঙ্কৃত, সচ্চরিত্র, কার্য্যকুশল অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে 'কঞ্চুকী' কহে। যথাঃ—

"অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ।

তাহার মুখ হইতে ঠিক সেইরূপ ভাষা বিনির্গত করাইয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্ত নাটক-দীপিকা ও নাটক-দর্পণ প্রভৃতি নাট্য শাসনে প্রাকৃত, মাগধী, পৈশাচী, শৌরসেনী ও রাক্ষসী প্রভৃতি নানা ভাষা কথনের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ নিয়মানুসারে প্রাচীন কবিগণও তাহার সমীচীন ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা নাটকে শৌরসেনী প্রভৃতি ভাষার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু, সময়ে সময়ে সংস্কৃত, উড়িয়া, উর্দ্দূ ও সাধারণ হিন্দী ভাষার আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং গ্রন্থকারের ঐ কয়টী ভাষার কিছু কিছু জানা আবশ্যক।

অথ শ্লিষ্ট রচনা।

সময়ে সময়ে নাটক মধ্যে-পাত্র-বিশেষ দ্বারা শ্লিষ্ট কথোপকথন, দর্শকদিগের চিত্তকে এক বারে আর্দ্র করিয়া ফেলে। যাঁহারা যথার্থ রসজ্ঞ, তাঁহারাই শ্লিষ্ট রচনার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। নাটকে এরূপ রচনা-স্থানকে পতাকা-স্থান কহে। ইহার উদাহরণ-স্বরূপ একটী আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত এই খানে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

তার পর, কৃষ্ণ সাম-দানাদি উপায় দ্বারা রাধিকার মান-ভঞ্জনে অসমর্থ হইয়া, বিদেশিনীর বেশ-ধারণ পূর্ব্বক করে একটী বীণা লইয়া, ধীর সমীর নামক স্থানে কেলি-কুঞ্জের দ্বারে গিয়া এই গানটী গাইতে লাগিলেন। গীত, যথা—

"শুনলো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি
সে নাগর ধনে পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি?
বেস্থা অবসান-কালে,
কি জানি কিসের ছলে,
বিরস বয়ান, নেহারি তাহার
নব ভিজিলি আঁখি-জলে।
পড়িয়া মানের দায়,
চরণে ঠেলিলি তায়,
কিসের লাগিয়া, এমন হইলি
কেন বা ঠেলিলি পায়?"

অনন্তর মানিনী রাধিকা তান-মিলি এই গীতিকা শুনিয়া অত্যন্ত উন্মন হইলেন, ক্রমে তাঁর প্রাণ অস্থির হইল; তখন রঙ্গদেবী নামে সখীরে ডাকিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন "রঙ্গদেবি দ্যাখ্ দেখি পথে কে গান কোচ্চে।"

রঙ্গদেবী এই কথা শুনিয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়া বাহিরে গেলেন এবং একটু পরে কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "প্রিয়সখি একটী স্ত্রীলোক বীণা-সহকারে গান করিয়া ভিক্ষা করিতেছে; কিন্তু, তাহার মুখ ঘোমটায় ঢাকা; এজন্য চিনিতে পারিলাম না। বোধ হয়, কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্ত্রীলোক, গরিব হোয়েচে বোলে লজ্জায় মুখ ঢেকে ভিক্ষা কোরে বেড়ায়। তা আমাদের পরিচয় নেবার প্রয়োজন কি? চাট্টি ভিক্ষা দিয়ে বিদায় কোরে দাও"—

এই কথা শুনিয়া বৃষভানু-কুমারী

বলিলেন "সখি! যদি তিনি কুঞ্জ-মধ্যে আসেন, তবে এই খানে তাঁহাকে ডাকিয়া আন।"

রঙ্গদেবী শ্রবণ-মাত্র তথায় গিয়া, বিদেশিনীকে ডাকিয়া আনিলেন।

বিদেশিনী গান করিতে করিতে কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন।

রাধা। বিদেশিনি! তুমি বেশ গাইতে পার, তোমার গলা বড় মিষ্টি।

বিদে। আজ্ঞে আপনারা ভাল বলিলেই ভাল, নচেৎ কিছুই নয়।

রাধা। বিদেশিনি! তুমি কোথায় থাক?

বিদে। আজ্ঞে পথে পথে।

রাধা। আহা বিদেশিনি! অমন কথা বোলো না—বিদেশিনি! তোমার কি কেহ নেই, বিদেশিনি?

বিদে। আমার স্বামী আছেন; তিনি আমাকে একাকিনী রাখিয়া প্রবাসে গিয়াছেন। আজিও ফিরে আসেন নাই, তাই স্বামি-বিরহিত হইয়া, পোড়া পেটের জন্যে পথে পথে ভিক্ষা কোরে বেড়াচ্চি।

রাধা। কেন বিদেশিনি! তোমার কি বাড়ী নেই?

বিদে। আজ্ঞে না; দুঃখিনীর আবার বাড়ী ঘর কি? পথে পথে ভিক্ষা করি, গাছ-তলায় শয়ন করি।

রাধা। ভাল বিদেশিনি! তোমার কি আসাও নেই; আমার মাথা খাও, সত্যি কোরে বল।

বিদে। আগে ভাল বাসাই ছিল, এখন দুঃখিনীর অদৃষ্ট-ক্রমে পুড়ে গিয়েছে।

রাধা। (স্বগত) ভাল বাসা ছিল, এখন পুড়েছে। (প্রকাশে) বিদেশিনি! তোমায় আর অধিক কি বলিব, আমার দশাও তোমার মত; অতএব, তুমি আমার কুঞ্জে থাক। বিদেশিনি! তোমার নাম কি?

বিদে। (একটু নিঃশব্দ থেকে)— আমার নাম ভাবিনী; ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়! এই কথোপকথন এই খানে যে অপরূপ মাধুর্য্য ব্যক্ত করিতেছে ও এই 'ভালবাসা' শব্দটী যে কি সুন্দর নাট্য-কলা-কৌশল ব্যক্ত করিতেছে, তাহা এক বার ভাবিয়া দেখুন। এই স্থানের যথার্থ চাতুরী ও ভাব-মাধুর্য্য ভাবিতে গেলে, শরীরে সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার হয়।

অথ সম্বোধন-প্রকার।

সমাজ-মধ্যে এবং সহৃদয় সামাজিকদিগের সমীপে অভিনয়-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া, নাট্যোল্লিখিত পাত্রগণের পরস্পর সম্বোধন করিবার একটী প্রথা প্রচলিত আছে এবং এই প্রথা নাট্য-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা নাটকেও সেই নিয়মের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে, শিষ্টাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এবং যিনি যেরূপ পদের লোক, তাঁহার সেরূপ সম্ভ্রম-রক্ষা করা হয়

না; সুতরাং সম্বোধন করিতে হইলে, প্রাচীন নিয়ম ও প্রথার অনুসরণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

যথা—

ভৃত্যগণ রাজাকে 'স্বামিন্' বা 'দেব' বলিয়া; অধম লোকেরা 'মহারাজ' বলিয়া; রাজর্ষিগণ ও বিদূষক 'বয়স্য' বলিয়া; ঋষিগণ 'রাজন্' অথবা অপত্যার্থ-প্রত্যয়-সিদ্ধ পদ দ্বারা; (যেমন রামকে 'দাশরথে' দুষ্যন্তকে 'পৌরব' যুধিষ্ঠিরকে 'পাণ্ডব' বা 'কৌন্তেয়') এবং বিপ্রগণও অপত্যার্থ-প্রত্যয়-সিদ্ধ পদ দ্বারা অথবা নামোল্লেখ পূর্ব্বক সম্বোধন করিবেন।

রাজা বিদূষককে নাম দ্বারা অথবা 'বয়স্য' বলিয়া; নটী ও সূত্রধার পরস্পর আর্য্য ও আর্য্যে বলিয়া; সূত্রধার পারিপার্শ্বিককে 'ভাব' বলিয়া; আত্ম-সদৃশ ব্যক্তিকে সমকক্ষ ভদ্র লোকে 'বয়স্য' বা 'ভ্রাতঃ' বলিয়া সম্বোধন করিবে।

দূত ও আর আর অধীন লোক রাজাকে 'দেব' বলিয়া; কৃতাভিষেকা মহিষীকে সকলেই 'দেবি!' বলিয়া সম্বোধন করিবে।

অধম লোকেরা অমাত্যকে 'আর্য্য' বলিয়া; বিপ্রগণ "অমাত্য" বা 'সচিব' বলিয়া; সাধারণে দেবর্ষিকে অথবা অন্যান্যমুনি-ঋষিকে 'ভগবন্' বলিয়া; ঋষিপত্নী, ঋষিকুমারী বা কোন ব্রত-পরায়ণা ভৈরবী বা বৈষ্ণবীকে 'ভগবতি' বলিয়া; যে রাজা রথী ও মৃগয়াশীল সারথি তাঁহাকে 'আয়ুষ্মন্' এবং তিনি সারথিকে 'সূত' বলিয়া সম্বোধন করিবেন।

যুবরাজকে 'ভর্ত্তৃদার' বলিয়া; অধম শ্রেণীর লোকে রাজকুমারকে 'সৌম্য' বা 'ভদ্র' বলিয়া; এবং প্রজাবর্গ ও পরিচারিকাগণ রাজকুমারীকে 'ভর্ত্তৃদারিকে!' বলিয়া সমাহ্বান করিবে।

শিষ্যগণ আচার্য্যকে 'উপাধ্যায়' বা 'আচার্য্য' বলিয়া; পূজনীয় ব্যক্তিকে অন্যান্য ব্যক্তিরা 'আর্য্য, মহাশয়, মহাত্মন্ ও মহোদয়' প্রভৃতি সম্মান-সূচক সম্বোধন-বাক্যে সমাহ্বান করিবে।

রমণীগণ শ্বশুরকে 'আর্য্য' শ্বশ্রূকে 'আর্য্যে' স্বামীকে 'আর্য্যপুত্র' আপনার সখী বা আত্ম-সদৃশ স্ত্রীগণকে 'হলা' (হ্যাঁলা) বলিয়া সম্বোধন করিবে।

যাহারা পাষণ্ড, তাহাদিগকে তৎকাল প্রচলিত বাগ্বিশেষ দ্বারা সম্বোধন করিবে; যেমন 'কাপালিক' 'ভণ্ড' দুরাত্মন্ 'অরে দুরাশয়!' 'মূর্খ!' 'বর্ব্বর' ইত্যাদি। যে গুলি অবশিষ্ট থাকিল কর্ম্ম, বিদ্যা ও জাত্যনুসারে তাহাদের সম্বোধন স্থির করিয়া লইবেন।

এই সম্বোধন-প্রকার যে নাটকের মধ্যে চালাইতে হইবেই, এরূপ কোন কথা নহে। তবে এই নিয়মানুসারে চলিলে, অনেকাংশে শিষ্টাচার সংরক্ষিত হইতে পারে। আর যদি এই সক

দ ব্যতীত ব্যক্তি-বিশেষের সম্মান, গৌরব বা আদর-সূচক অন্য কোন দ দ্বারা কেহ সম্বোধন-প্রণালী প্রচলিত রিতে বলেন, তাহাও সামাজিকদিগের চি অনুসারে অবশ্যই আদরণীয় হইবে।

অথ গীতিকা।

বাঙ্গালা নাটকাদিতে মধ্যে মধ্যে তান-য়-বিশুদ্ধ সুমধুর গীতিকা প্রয়োগের ত্যন্ত প্রয়োজন; কারণ, সময়োচিত গ-বিশেষ দ্বারা কি হৃদয়ালুশ্রোতৃ-। কি সাধারণ জন-সমাজ সকলেই মোহিত-চিত্ত হইয়া থাকেন। অতএব বল বক্তৃতা, পরস্পরের কথোপ-ন কিংবা পাত্র-বিশেষের শুষ্করুদিত ত্যাদির পরিবর্ত্তে মধ্যে মধ্যে কোন ন পাত্র দ্বারা গীতিকা প্রয়োগ করা তান্ত আবশ্যক।

এই গীতিকা সাক্ষাৎ ও উপাংশু-ভেদে ই প্রকার। রঙ্গ-স্থলে কোন পাত্র কর্ত্তৃক যে গীতিকা প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম সাক্ষাৎ গীতিকা; আর নেপথ্য হইতে যে গীতিকার অবতারণা হয়, তাহাকে উপাংশু-গীতিকা কহে॥

অথ নৃত্যকলা।

অঙ্গ-বিক্ষেপাদি দ্বারা বিবিধ নটন-কৌশলকে নৃত্য-কলা কহে। অভিনয়-কালে সঙ্গীত-চতুর পাত্র-বিশেষের তান-মিলিত গীতিকা-প্রয়োগ যেরূপ মনোহর, স্ত্রী-জনোচিত নৃত্য-কলাও তদ্রূপ নয়নানন্দকরী; অতএব রঙ্গ-মধ্যে দুই এক বার নৃত্য-কলা-প্রয়োগ মন্দ নহে। দুর্গেশ-নন্দিনী নাটকের মধ্যে কতলু খাঁ যখন বিমলাকে সম্মুখে বসাইয়া নর্ত্তকীর নৃত্য-কৌশল দেখিতে লাগিলেন, তখন যে সে দৃশ্যটী কিরূপ চিত্ত-বিমোহন হইয়াছিল, তাহা যে দর্শকেরা নয়ন-গোচর করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন।

জটিল সন্ন্যাসী।

স্বাস্থ্য।

(৪৫৩ পৃষ্ঠার পর)

গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরস্থ বীজ বায়ু কর্ত্তৃক ত ভাগে বিভক্ত হয়, সন্তানও সেই খ্যক জন্মে। যমজ বা তিন চারি সন্তান ন্মিবার ইহাই কারণ; যে ভাগে শোণিত ধিক থাকে, তাহাতে কন্যা ও যে গে শুক্র অধিক থাকে, তাহাতে পুত্র জন্মে (১)। গর্ভাশয়ের বায়ু বিকৃত থাকিলে অথবা শুক্র শোণিতের কোন

(১) "বীজেঽন্তর্বায়ুনা ভিন্নে
দ্বৌ জীবৌ কুক্ষিমাগতৌ, যমাবিত্যভিধীয়েতে—"
(সুশ্রুত, শারীর স্থান।)
"শুক্রাধিকং দ্বৈধমুপৈতি বীজং
যস্যা সুতৌ যাসহিতৌ প্রসূতে,

রূপ অবস্থা বা তেজোহ্রাস থাকিলে, বা পিতা মাতা অমিতাচারী হইলে, সন্তান নানা রূপ জন্মে (২)। কাণ, খঞ্জ, বধির, বিকৃত পুত্র জন্মিবার ইহাই কারণ। তোমার সন্তান বিকলাঙ্গ হয়, তোমার কখনই ইচ্ছা নহে; অথচ তুমিই তাহার হেতু নষ্ট করিবার ক্ষমতা থাকিলেও, করিতেছ না; কিংবা রিপুর বশীভূত হইয়া তুমিই তাহার প্রয়োজক হইতেছ, ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়। এ কথা এ স্থলে বিশেষ বলার আবশ্যকতা নিষ্প্রয়োজনীয়।

সুশ্রুত এক স্থলে বলিয়াছেন,—'ঋতু-স্নাতা নারী, স্বপ্নে মৈথুন করিলে, বায়ু আর্ত্তব-শোণিতকে কুক্ষিতে আনিয়া গর্ভ উৎপাদন করে; তাহার মাসে মাসে গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, এবং পৈত্রিক গুণ-বর্জ্জিত জরায়ু বৃদ্ধি হয়।" (৩)

জরায়ুর এরূপ বিকৃতি অনেক দেখা গিয়াছে, আর্ত্তব-শোণিতের রোধ তাহার প্রধান কারণ; আর্ত্তবশোণি[ত] বিশুদ্ধ না থাকিলে, গর্ভাশয় গ[র্ভ] উৎপাদনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া গ[ণ্য] করা উচিত নহে।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—"কথা[টি] অমূল্য। শুক্রই পুরুষের বলের কারণ, বলই জীবনের আত্মার চিরস্থায়িত্ব[ের] হেতু। সেই শুক্র হইতে যে সন্তান উৎপ[ন্ন] হয়, সে বাস্তবিকই নিজের আত্মা[র] রূপান্তর-মাত্র। কালিদাস রঘুবং[শে] বলিয়াছেন,—" দিলীপ-নন্দন তাঁহা[র] মূর্ত্তির রূপান্তর-মাত্র."(৪) বস্তুতঃ বুদ্ধিম[ান] জনক যদি "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই স্বর্ণ অক্ষর কয়েকটির উপর দৃ[ষ্টি] রাখেন, তাহা হইলে স্বভাব-যুক্ত সন্ত[ান] প্রাপ্ত হয়েন।

গর্ভ উৎপন্ন হইলেই স্ত্রী-সম্ভো[গ] সবিশেষ নিষিদ্ধ। জাতগর্ভা-সম্ভো[গে] বীজের যে বিকৃতি হইবে, ইহা সহজে[ই] উপলব্ধি হয়। আয়ুর্বেদ উপদে[শ] দিয়াছেন,—"পূর্ব্বোক্ত বিধানে [স্ত্রী] সম্ভোগ করিয়া এক মাস অর্থাৎ পুনরার্ত্ত[ব] কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।" ([৫])

রক্তাধিকং বা যদি ভেদমেতি
দ্বিধা সুতে বা সহিতে প্রসূতে,
ভিনত্তি যাবদ্বহুধা প্রপন্নঃ,
শুক্রার্ত্তবং বায়ুরতি প্রবৃদ্ধঃ,
যাবন্ত্যপত্যানি যথা বিভাগং।" চঃ শাঃ।

(২) চরক ও সুশ্রুতের শারীর স্থান, দ্বিতীয় অধ্যায় দেখ।

(৩) ঋতু-স্নাতা তু যা নারী
স্বপ্নে মৈথুনমাচরেৎ
আর্ত্তবং বায়ুরাদায়
কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি।
মাসি মাসি বিবর্দ্ধেত
গর্ভিণ্যা গর্ভ-লক্ষণং,
কললং জায়তে তস্যা
বর্জ্জিতং পৈত্রিকৈর্গুণৈঃ।"

(৪) "অথাংশু চাদেন পরার্দ্ধ-জন্মনা,
ক্ষিতৈরভেত্তা ক্ষিতিমণ্ডমধ্যং।
স্ব-মূর্ত্তি-ভেদেন গুণাগ্র্যবর্ত্তিনা,
পতিঃ প্রজানামিব সর্গমাত্মনঃ।"
(রঘুবংশ; ৩য় সর্গ, ২৭ শ্লোক

(৫) এবং তামভিসংগম্য
পুনর্মাসাত্ত্বেদসৌ। (ভাঃ প্র।)

সদ্যোগৃহীত-গর্ব্ভার লক্ষণ-স্থলে চরকা-
র্য্য বলিয়াছেন, (৬) "লালাপ্রসেক
মুখদিয়া জল উঠা) গাত্রের গুরুতা,
ঙ্গ-সাদ, তন্দ্রা (নিদ্রার্ত্তার ন্যায়
চেষ্টা) হর্ষ, হৃদয়-ব্যথা, তৃপ্তি ও
নির বীজ-গ্রহণ সদ্যোগৃহীত-গর্ব্ভার
ক্ষণ। সুশ্রুতাচার্য্য বলিয়াছেন,—
শ্রমবোধ, গ্লানি, পিপাসা, সক্থির
বসাদ, শুক্র-শোণিতের অববন্ধ ও
নির স্ফুরণ সদ্যোগৃহীত-গর্ভার লক্ষণ
৭); আর স্তনদ্বয়ের মুখ-কৃষ্ণতা, রোম-
রাজির উদ্গাম, চক্ষু-পক্ষ্মের সর্ব্বদা সং-
লন, অকারণ বাস্তবেগ, উত্তম গন্ধেও
দ্বেগ, মুখ হইতে জলস্রাব এবং অবসাদ
গুলি গর্ভিণীর লক্ষণ(৮)। নূতন গর্ভিণী
সকল অনুধাবন করিতে কিছু অশক্ত,
কিন্তু স্তনদ্বয়ের রূপান্তর তাহাদের
ক্ষে জানিবার এক অতি সহজ উপায়।
৯) বাভট অন্যান্য লক্ষণের সহিত
বলিয়াছেন, গর্ভিণীর অম্ল ইচ্ছা, স্তনদ্বয়
পীন, শ্বেতান্ত ও কৃষ্ণ চুচুক হয়। চরকা-
চার্য্যও বলেন,—(১০) আর্ত্তবা দর্শন-
সাম্য, আস্য-স্রাব, অন্নে অনভিলাষ,
বান্তবেগ, অরুচি, অম্লে বিশেষ ইচ্ছা,
নানারূপ ভাবে শ্রদ্ধা ও প্রণয়, গাত্রের
গুরুতা, চক্ষুর গ্লানি, স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার,
ওষ্ঠ ও স্তন-মণ্ডলের অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণতা,
পাদ-শোথ, লোম-রাজির ও যোনির সামান্য
জালিত্ব এই গর্ভিণীর লক্ষণ কিন্তু এ
সকল ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। সদ্যোগৃহীত-
গর্ভার পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণের অন্যতম
বুঝিয়া বুদ্ধিমতী রমণী সম্ভোগের পরই
গর্ভোৎপাদন অনুভব করিয়াছেন, অনেক
শুনা যায়। আর বুদ্ধিমতী হইলে,
গর্ভে কি সন্তান হইবে, বলিতে পারেন,
চরকাচার্য্য বলেন,—(১১) যাহার কন্যা
হইবে, তাহার বাম অঙ্গের চেষ্টা, পুরুষে
অভিলাষ; স্ত্রী-বিষয়ে স্বপ্ন, স্ত্রী-নামধেয়

---

(৬) "নিষ্ঠীবিকা গৌরবমঙ্গ-সাদ-
স্তন্দ্রা-প্রহর্ষৌ হৃদয়-ব্যথা চ।
তৃপ্তিশ্চ বীজ-গ্রহণঞ্চ যোন্যা-
গর্ভস্য সদ্যোঽনুগতস্য লিঙ্গং। চঃ শাঃ।

(৭) "তত্র সদ্যো-গৃহীত-গর্ভায়া লিঙ্গানি,—
মা গ্লানিঃ পিপাসা সক্থি-সদনং শুক্র-শোণিতয়োরব
ন্ধ-স্ফুরণঞ্চ যোনেঃ" সুঃ শাঃ।

(৮) "স্তনয়োঃ কৃষ্ণমুখতা রোম-রাজ্যুদ্গমস্তথা,
ক্ষি-পক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ।
মেত্যকস্মাচ্ছর্দয়তি গন্ধাদুদ্বিজতে শুভাৎ, প্রসেকঃ
সদনঞ্চাপি গর্ভিণ্যা লিঙ্গ-মুচ্যতে।"
(সুঃ শাঃ)

(৯) "অম্লেষ্টতা স্তনৌ পীনৌ শ্বেতান্তৌ কৃষ্ণ-
চূচুকৌ।" বাভট।

(১০) আর্ত্তবাদর্শন-মাস্যসংস্রবণমনন্না-
ভিলাষঃ ছর্দ্দিররোচকোঽম্লকামতা চ বিশেষেণ
শ্রদ্ধা-প্রণয়নমুচ্চাবচেষু ভাবেষু গুরুগাত্রত্বং
চক্ষুষো গ্লানিঃ স্তনয়োঃ স্তন্যমোষ্ঠয়োঃ স্তন-মণ্ডল-
য়োশ্চ কার্ষ্ণ্যমত্যর্থং শ্বয়থুঃ পাদয়োরীষল্লোম-
রাজ্যা যোন্যাশ্চ জালত্বমিতি গর্ভে পর্য্যাগতে
রূপাণি ভবন্তি। চরক।

(১১) সব্যাঙ্গ-চেষ্টা পুরুষার্থিনী স্ত্রী,
স্ত্রী-স্বপ্ন-পানাশন-শীল-চেষ্টা,
সব্যাঙ্গ-গর্ভা ন চ বৃত্তগর্ভা
সব্যপ্রদুগ্ধা স্ত্রিয়মেব সূতে
পুত্রং ত্বতো লিঙ্গ-বিপর্য্যয়েণ।

দ্রব্যে স্পান ও অশন-শীলতা ও চেষ্টা হয়, এবং বাম ভাগে গর্ভ-পেশীর ন্যায় অবর্ত্তুল আকার বৃদ্ধি ও বাম স্তনে দুগ্ধ হয়।—পুত্র হইবার হইলে, ইহার ঠিক বিপরীত লক্ষণ ঘটে, এবং গর্ভ, বর্ত্তুলের আকার ধারণ করে। ভাব-প্রকাশে লিখিত আছে (১২) দুই মাসের পরই কি সন্তান হইবে, স্পষ্ট জানা যায়; নপুংসক হইলে, অন্যান্য সকল লক্ষণ মিশ্রিত ভাবে প্রকাশ পায়, এবং গর্ভ-বর্ত্তুল অর্দ্ধ ফলের ন্যায় বোধ হয়। গর্ভিণীর এই সকল লক্ষণ, বিশেষ-রূপে জানা থাকিলে, অনায়াসে কি সন্তান হইবে, বুঝিতে পারা যায়।

গর্ভোৎপাদনের মুখ্য কারণ।—শুক্র ও শোণিত, বিশুদ্ধ শুক্র-শোণিত হইয়াও যদি অন্যায় সহবাস করে, তাহা হইলেও যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। সুশ্রুত বলিয়াছেন,—(১৩) যে মোহবশতঃ স্ত্রীর সহিত ঋতুকালে অঙ্গনার ন্যায় সহবাস করে, তাহার স্ত্রীলোকের ন্যায় শ্মশ্রু-শুক্র-রহিত, পুরুষাঙ্গ-হীন ষণ্ড সন্তান জন্মে। এরূপ স্ত্রী ও পুরুষের দোষে সন্তান বিকৃত হওয়ার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়।

কুলজ বিকার, বীজের দোষে ঘটে (১৪)। কুলজ বিকার অসাধ্য। এক জনের অনভিজ্ঞতায় একটি বংশ সমূলে ধ্বংস হয়।' কুষ্ঠরোগ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—(১৫) দম্পতীর কুষ্ঠ থাকিলে, তজ্জনিত শুক্র-শোণিতের দুষ্যতা হেতু, তাহা হইতে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান কুষ্ঠরোগ প্রাপ্ত হয়।*

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার রায় কবিরাজ।

(১২, পুত্রগর্ভযুতায়াস্তু নার্য্যা মাসি দ্বিতীয়কে।
গর্ভো গর্ভাশয়ে লক্ষ্যঃ পিণ্ডাকারোঽপরং শৃণু।
দক্ষিণাক্ষি মহত্বং স্যাৎ প্রাক্ ক্ষীরং দক্ষিণে স্তনে
দক্ষিণোরুঃ সুপুষ্টঃ স্যাৎ প্রসন্ন মুখ-বর্ণতা,
পুন্নামধেয় দ্রব্যেষু স্বপ্নেষ্বপি মনোরথঃ,
আম্রাদি-ফলমাপ্নোতি স্বপ্নেষু কমলাদি চ।
কন্যা গর্ভবতী গর্ভে পেশী মাসি দ্বিতীয়কে,
পুত্র-গর্ভস্য লিঙ্গানি বিপরীতানি চেষ্টিতে,
নপুংসকো যদা গর্ভে ভবেদ্গর্ভোঽর্ব্বুদাকৃতি।
উন্নতে ভবতঃ পার্শ্বে পুরস্তাদুদরং মহৎ॥
অর্ব্বুদং বর্ত্তুলং ফলার্দ্ধতুল্যং (ভাব প্রকাশ।)

(১৩) যো ভার্য্যামৃতৌ মোহাদঙ্গনেব প্রবর্ত্ততে,
তত স্ত্রী-চেষ্টিতাকারো জায়তে ষণ্ড-সংজ্ঞিতঃ।

(১৪) যে চাপি কেচিৎ কুলজা বিকারা।
ভবন্তি তাংশ্চ প্রবদন্ত্যসাধ্যং। নিঃ।

(১৫) "দম্পত্যোঃ কুষ্ঠ বাহুল্যা
দুষ্ট-শোণিত শুক্রয়োঃ,
যদপত্যং তয়োর্জাতং
জ্ঞেয়ন্তদপি কুষ্ঠিনং।"

* কেহ কেহ এই প্রয়োজনীয় সুন্দর প্রস্তাবকে অশ্লীল মনে করেন। আর্য্য-চিকিৎসাবিজ্ঞানের যথার্থ বিবরণের ফলোপধায়কতা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকটে "স্বাস্থ্য" প্রস্তাব পরম উপাদের পদার্থ হইবে। ইহা অশ্লীল হইলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক অংশ অপাঠ্য হয়। সং।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি।

কৈশোর।

এই সংসার-ক্ষেত্রে সকলেই আপনাপন খ্যাতি-লাভার্থ যত্নবান্; কেহ ধর্ম্ম-বিষয়ে, কেহ রাজ্য-শাসনে, কেহ স্বদেশ-উদ্ধারে, কেহ রণক্ষেত্রে, কেহ বা নির্জ্জনে, কেহ বা সহস্র লোক-পরিপূরিত অসামান্য সভা-গৃহে, কেহ বা পুস্তকে, যে কোন বিষয়েই হউক না, প্রতিপত্তি-লাভের জন্য লালায়িত। এই জন্য কেহ বা নিভৃত বন-প্রদেশে একাকী বনশোভা দর্শন করিয়া উদ্ভিদ্‌গণের তত্ত্ব-নির্ণয়ে সমুৎসুক; কেহ বা ভ্রাম্যমাণ পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি অবধারণে যত্নবান্; কেহ বা অবনী, পাতাল, অনিল, অনল ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সুদূরস্থিত সৌরজগতের প্রকৃতি নিরূপণে যত্নশীল; কেহ বা অসংখ্য শত্রুবেষ্টিত স্থানের মধ্যস্থলে থাকিয়া বীর-দর্পে তাহাদিগকে প্রতিহত করিবার উপায়-উদ্ভাবনে সচেষ্ট। এইরূপে যে দিকে যাই—যে স্থানই দেখি, সেই স্থানেই দেখিতে পাই, সকলেই কোন না কোন বিষয়ে সুখ্যাতি প্রাপণাশায় ছুটাছুটি করিতেছে—সেই খ্যাতি যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারাই জগতের আরাধ্য। তাঁহারাই তাঁহাদের পরবর্ত্তী অনুলিপ্সু সকলের আদর্শ-স্থানীয়। কিন্তু, এই অসংখ্য জীব-মণ্ডলীর মধ্যে সেই জীবনের এক-মাত্র লক্ষ্য-স্থানীয় সুখ্যাতি কয় জন পাইয়াছেন? যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। এই অসংখ্য মনুষ্য-পুরে ও পৃথিবীর অসংখ্য মনুষ্য মধ্যে তাঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। এমন কি, করাঙ্গুলি দ্বারা তাহা সহজেই গণনা করা যায়; আমরা ইঁহাদেরই মধ্যে এক জন অসাধারণ ব্যক্তির বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। যিনি সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ও স্বীয় ভুজ-বীর্য্য ও বুদ্ধি-কৌশল-প্রভাবে ইউরোপ খণ্ডে অত্যদ্ভুত কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—যিনি একাকী অসংখ্য শত্রু-মণ্ডলীর মধ্যেও থাকিতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইতেন না—যাঁহার নাম শুনিলে এক সময় অশীতিতম বৃদ্ধ হইতে অপোগণ্ড শিশু পর্য্যন্ত সকলেরই গাত্রচর্ম্ম শিহরিয়া উঠিত—যাঁহার কার্য্য-নিচয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় ইতিহাস বলিয়া অভিহিত—যাঁহার ভুজ-বলের, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের নিকট সকলেই নত—সেই মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বাল্য-জীবনী জানিতে

বোধ হয়, অনেকেই সমুৎসুক হইবেন।

আমরা পৃথিবীতে যত বীর দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ইহাঁকে সর্ব্ব-প্রধান না বলিলেও, প্রধান বলিতে বাধ্য হইব। আলেক্জাণ্ডার, জুলিয়স্ সিজর, হানিবল্ প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত বীরাগ্রগণ্য ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু, আমাদের বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র কর্শিকাদ্বীপ-বাসী সেই সকলেরই শীর্ষস্থানীয়। কেন না আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি বীরগণ সমরাঙ্গনে অসামান্য অভিনয় প্রদর্শন করিলেও, তাঁহারা সকলেই উচ্চ বংশ-সম্ভূত; বাল্যকাল হইতেই, তাঁহারা রাজভোগ ও রাজার মান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; শৈশবকাল হইতেই তাঁহাদের আজ্ঞা শত শত দাস দাসীতে সম্পাদন করিয়াছে; আজ্ঞামাত্র শত শত যোধ তাঁহার কার্য্য-সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন; বাল্যকাল হইতেই নানা যুদ্ধের সংবাদ রাখিয়াছেন, হয়ত কোন যোদ্ধার অপ্রতিহত বীরত্ব তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং আজন্মই সেই সকল তাঁহাদের স্মৃতিপটে আঘাত করিয়াছে ও বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল বৃত্তি ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রমে আরও উচ্চে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু, নেপোলিয়নের সেরূপ কোন সুবিধাই ঘুটে নাই। তিনি সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন যোদ্ধা দর্শন করা দূরে থাকুক, বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের পূর্ব্বে হয়ত যুদ্ধের নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করেন নাই; সেই কর্শিকা-দ্বীপের সামান্য লোকের সন্তানেরাই তাঁহার ক্রীড়ার সঙ্গী ছিল; সুতরাং শৈশব-কাল হইতে তাঁহার ঐ রূপ কোন সুযোগই ঘটে নাই। আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধি সহকারে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন, পৈতৃক সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি সকলই পাইয়াছিলেন; সুতরাং সামান্য চেষ্টায় অনেক অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করা দুষ্কর নহে। কিন্তু, নেপোলিয়ন, বয়োবৃদ্ধি সহকারে কেবল অর্থহীনতাই লক্ষ্য করিয়া খেদ করিয়াছেন; একবারে কখন সৈন্য বা অর্থ কিছুই পান নাই। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা নিজের বুদ্ধি ও ভুজ প্রভাবে। নিজেই, অতি সামান্য অবস্থা হইতে মনুষ্য-মন যত দূর উচ্চাভিলাষী হইতে পারে, তৎপ্রাপণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ক্ষমতা অধিক বই আর কি বলিব? এক্ষণে এই মহাবীরের কৈশোর অবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভূমধ্য-সাগরস্থ কর্শিকাদ্বীপ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিখ্যাত। এই স্থলেই বিখ্যাত সেনেকা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে প্রকাণ্ড বীর্য্যের সহিত কর্শিকাবাসিগণ ফরাসী ও জেনোয়া-বাসী হইতে স্বদেশ রক্ষা করিয়াছিল, তজ্জন্য ইহা অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই সুশ্রী, বলিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও স্বাধীনচেতাঃ।

কেহই কাহারও অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে না; এই কারণ বশতঃই স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সময়ে সময়ে যে ভয়ানক সমর-তরঙ্গ উত্থিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? দ্বীপের জলবায়ুও এরূপ উপাদানে সংরচিত, যেন উহারা কখনই পরাধীনতা সহ্য করিতে পারিবে না। যাহা হউক, যদিও কর্শিকা পুরাকাল হইতেই খ্যাতি-লাভ করিয়াছিল, তত্রাপি নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি উহাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিয়াই, পৃথিবীর সকলেই উহার নাম সাম্যকৃরূপে অবগত হইয়াছেন। কর্শিকা নেপোলিয়ন-রূপ অত্যদ্ভূত বালককে বক্ষে ধারণ করিয়াই জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; না হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উহার নাম বিদিত হইত কি না সন্দেহ-স্থল।

নেপোলিয়ন যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা সামান্য; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নিতান্ত হীন-বংশ-সম্ভূত ছিলেন না; যদিও তাঁহার বংশ পূর্ব্ব হইতেই রাজসম্মানে সম্মানিত হয় নাই, যদিও তাঁহাদের কেহ কখন রাজা বলিয়া অভিহিত হন নাই, তত্রাপি তাহা যে একটি গণনীয় ও ভদ্র বংশ বলিয়া কথিত হইত, তাহা নিশ্চয়। কেহ কেহ বোনাপার্টি-বংশের পূর্ব্ব খ্যাতি প্রতিপাদনার্থ অনেক অনুসন্ধানে বোনাপার্টি-নাম সাদৃশ্যে তাঁহাকে রাজবংশোদ্ভব, কেহ বা কোন গ্রন্থকারের, কেহ বা এক জন পোপের জন্মদাত্রীর, কেহ বা কোন সন্ধি-সংস্থাপয়িতার বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। কিন্তু নেপোলিয়ন তৎসমুদায়ই অশ্রদ্ধেয় বলিয়া গিয়াছেন। যৎকালে তাঁহার শ্বশুর অষ্ট্রিয়ার মহারাজা আপন জামাতার বংশের বিষয় অনুসন্ধান করেন ও তাঁহাকে টেভিজোর (Treviso) রাজবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সম্মানিত করেন, তৎকালে নেপোলিয়ন এই মাত্র উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন "তিনি তাঁহার বংশের রুডল্ফ মাত্র।" অর্থাৎ হাপস্‌বর্গের রুডল্ফ যেরূপ স্বীয় ক্ষমতা-প্রভাবে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ; বংশার্জ্জিত কোন গৌরবই তাঁহার ছিল না। কেহ কেহ তাঁহাকে গথ রাজবংশ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলেন "মণ্টনটীর যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার এই প্রকার কোন সম্মানই থাকে নাই। ঐ যুদ্ধের পর তিনি যাহা কিছু রাজ-সম্মান পাইয়াছিলেন মাত্র। এইরূপে নানা লোকে তাঁহাকে নানাপ্রকার গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু বীর নেপোলিয়ন তৎসমুদয়ই নিজমুখে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বংশ-গৌরবের অভিলাষী ছিলেন না; কিম্বা জাত্যভিমানেও তাঁহার স্পৃহা ছিল না; সুতরাং অলীক মর্য্যাদায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। তিনি বংশ-গৌরব অপেক্ষা আত্ম-গৌরব

ভাল বাসিতেন; তাহাই তাঁহার উন্নতির প্রধান সহায় এবং তাহাই তাঁহার জীবনের প্রতি কার্য্যেই প্রতিক্ষণেই দর্শন করিতে পারা যায়।

যাহা হউক, নেপোলিয়নের প্রকৃত বংশ-সম্বন্ধে যাহা অবগত হইতে পারা যায়, তাহা এই—নবম শতাব্দীতে বোনাপার্টিগণ কিয়ৎপরিমাণে প্রতিপত্তি লাভ করেন; তখন ইটালী তাঁহাদের আবাস-স্থল ছিল; তথায় ফ্লরেন্‌স নগরীর কোন কোন গৃহে অদ্যাপিও তাঁহাদের ধ্বজ-পতাকা-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যৎকালে ইটালিতে জিবেলাইন ও গুয়েল্‌ফ (Ghibellines and Guelphs) উভয় বংশ গৃহ-বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন বোনাপার্টিগণ জিবেলাইন-গণের সহায়তা করেন। কিন্তু, যুদ্ধে পরাজিত হইলে, ইহাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। ইহাঁদের মধ্যে একটী পরিবার এই কর্শিকাদ্বীপে আসিয়া বসবাস করেন এবং দ্বীপবাসিগণের সংমিলনে কিছু দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ গণনীয় ও মাননীয় হইয়া উঠেন। অষ্ট্রিয়ার মহারাজা, নেপোলিয়নকে যে টেভিজোর রাজবংশ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়াছিলেন, তাহারও কারণ ইহাই বোধ হয় যে, যখন বোনাপার্টিগণ ইটালিদেশে বসবাস করিতেছিলেন, তখন টস্কেনীই তাঁহাদের বাস স্থান ছিল এবং তদন্তর্গত টেভিজো নগরের সুবর্ণ-পুস্তকে ইহাদের নাম অঙ্কিত আছে; এই দৃষ্টেই তিনি জামাতাকে রাজ-বংশ-সম্ভূত বলিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

এই বংশে চার্লস্ বোনাপার্টি নামে এক জন সুদক্ষ লোক জন্ম পরিগ্রহ করেন; ইনি অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রভাবে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। চার্লস্ এক জন বিখ্যাত স্বদেশ-হিতৈষী এবং সুদক্ষ সেনানী ছিলেন; যৎকালে ফরাসীর কবল হইতে কর্শিকা উদ্ধার করিবার জন্য পেওলি (Paoli) বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, চার্লস্ তখন তাঁহার সহচর ছিলেন; এবং তাঁহার হইয়া অনেক যুদ্ধ করেন। কিন্তু, এই যুদ্ধের পরিণাম পেওলির নির্ব্বাসনে পর্য্যবসিত হয়; তৎসঙ্গে চার্লসও তাঁহার দশা প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু, সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার গুণবান্ খুল্লতাত লুসিয়ান বোনাপার্টি তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। লুসিয়ান ঐ বংশের মধ্যে প্রধান ধনী এবং আজাক্সিয়ো নগরের ধর্ম্মাধিকরণ ছিলেন, সুতরাং ক্ষমতাও বিলক্ষণ ছিল। যৎকালে ঐ গৃহ-বিবাদ চলিতেছিল, সেই সময়ে চার্লস্, লিটিসিয়া রামোলিনী নাম্নী একটী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও স্থির-প্রতিজ্ঞা যুবতীর পাণি-গ্রহণ করেন। স্ত্রীলোক হইলেও, ইহাঁর প্রকৃতি বীরপুরুষের অনুরূপ ছিল; এমন-কি, গৃহ-যুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার স্বামীর বিপদের সম্পূর্ণ

অংশ-ভাগিনী ছিলেন। চার্লস্ যে স্থলে গমন করিতেন, তিনি কখনই তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন না; স্বামীর সহিত অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন; এমন কি, অন্তর্ব্বত্নী অবস্থাতেও অশ্বপৃষ্ঠে রণরঙ্গ দেখিতে বিরত হইতেন না। কথিত আছে, নেপোলিয়ন্ জন্ম-গ্রহণ করিবার দুই চারি দিবস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি অশ্বচালনা করিয়াছেন। পেওলির নির্ব্বাসনের পর, বোনাপার্টিগণ ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন ও তৎপরে চার্লস্, কর্শিকার শাসন-কর্ত্তা কাউণ্ট ডি মারবিউফ (Count De Marbuf) কর্ত্তৃক আজামিয়োর অ্যাসেসর পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার আয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল ও লোকের নিকট যেন বেশ মাননীয়ও হইয়াছিলেন ইহার। কিছু দিন পরেই চত্বারিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার ত্রয়োদশ সন্তান, তন্মধ্যে বিখ্যাত নেপোলিয়ন বোনাপার্টি দ্বিতীয়। নেপোলিয়নের যশঃ-সৌরভ দিগন্ত-ব্যাপ্ত হইলে, এক সময় মণ্টপিলারস্থ প্রজা-সমিতি তাঁহাকে তাঁহার পিতার স্মরণার্থ একটি স্তম্ভ উত্তোলিত করিতে অনুরোধ করেন; নেপোলিয়ন্ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন :—"যদি দুই দিন পূর্ব্বে আমার পিতার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই করিতে পারিতাম; কিন্তু, যখন প্রায় বিশ বৎসর হইল, তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার স্মরণার্থক কিছু নির্ম্মাণ করিলে, লোকে তাহা গণনার মধ্যেই আনিবেক না—অতএব মৃত ব্যক্তিকে নিরাপদে থাকিতে দিন।"

পূর্ব্বে চার্লস্ বোনাপার্টির যে তেরটি সন্তানের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে চার্লসের মৃত্যুর সময় আট জন-মাত্র বর্ত্তমান ছিলেন—পাঁচ পুত্র ও তিনটি কন্যা। প্রথম, জোসেফ;—ইনি পরে স্পেনের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; দ্বিতীয় নেপোলিয়ন; তৃতীয় লুসিয়েন; চতুর্থ লুইস; ও পঞ্চম জেরোমি। কন্যার মধ্যে প্রথম মেরিয়া আনে, ইনি পরে ইলাইযা নামে অভিহিত হইয়া, টসকনী প্রদেশের ডিউকের পত্নী হন; দ্বিতীয় মেরিয়া আনন সিয়াদা; ইনি মেরিয়া পৌলিন নামে বর্নীজের রাণী হয়েন। তৃতীয় কারোলাইন্—ইনি কিছু কাল পরে নেপল্‌সের মহারাণী হইয়াছিলেন।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট আজামিয়ো নগরে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি জন্মগ্রহণ করেন। ঐ দিন তাঁহার মাতা রামোলিনী কোন উৎসব-দর্শনার্থ বাহিরে গমন করিয়াছিলেন—তথায় নানা লোকের সহিত নানা রূপ কথা-বার্ত্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল—তিনি দ্রুত পদে তথা হইতে প্রত্যাগমন

করিলেন—এবং বাটীতে উপনীত হইয়া সম্মুখে এক খানি কৌচের উপর শয়ন করিলেন—এবং তাহার উপরেই নেপোলিয়নকে প্রসব করেন। তথায় শিশুকে আবৃত করিবার জন্য কোন বস্ত্র-খণ্ড না পাইয়া, ইলিয়াডোক্ত কতিপয় বীর পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত এক খণ্ড পুরাতন চিত্রপট (Tapestry) দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিলেন। অজাসিয়ো নগরেই তাঁহার শৈশবাবস্থা অতিবাহিত হয়। শৈশব-কাল গত হইলে, সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তিনি সেইরূপ শিক্ষা পাইতে লাগিলেন; এইরূপ পঠদ্দশায় প্রায় সমুদায় শীত কাল তিনি আজাসিয়ো নগরে পিতৃ-ভবনে অতিবাহিত করিতেন; এই সময় তাঁহার একটি পিত্তল-নির্ম্মিত কামান ক্রীড়নক ছিল; তিনি উহা লইয়া সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিতেন; কামানটি প্রায় চতুর্দ্দশ সের ওজনে হইবে।* আমরা জানি না, এই বাল্যকালে হইতেই নেপোলিয়নের মানসক্ষেত্রে যুদ্ধস্পৃহা বদ্ধমূল হইয়াছিল কি না। তিনি আপন স্পৃহানুযায়ী ক্রীড়নক সংগ্রহ করিয়াছিলেন কি না কে বলিতে পারে? কিংবা এইরূপ ক্রীড়নকের সহিত সর্ব্বদা আলাপেই পরিণামে মহাযোদ্ধা ও বীরাগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাহার কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, তিনি যে পরে এক জন অতি বিখ্যাত লোক হইবেন, তাহা তাঁহার শৈশব জীবনের প্রায় সমুদায় কার্য্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন্ দুরন্ত শীত ঋতুতে পিতৃ-ভবনে অবস্থান করিতেন বটে, কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশে অবস্থানের জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতেন। এই স্থানটি অতি মনোহর ও দর্শক-বৃন্দের সন্তোষ-বিধায়ক। আজাসিয়ো নগর হইতে সানগুনিয়ার দ্বীপাভিমুখে যাইতে হইলে, প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে দুইটি সুদীর্ঘ প্রস্তর-স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই স্থলেই একটি ধ্বংসাবশেষ গৃহে যাইবার ধ্বংসাবশেষ সুন্দর তোরণ বিদ্যমান আছে। এই পল্লীতে ম্যাডাম বোনাপার্টির স্বসম্পর্কীয় ভ্রাতা বাস করিতেন। এই গৃহে প্রবেশ করিবার দ্বার নানাবিধ সুন্দর মহীরুহচয় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এইজন্য গৃহটির শোভা অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহটির সম্মুখে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান ও তাহার পরেই একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর তরুরাজি দ্বারা বেষ্টিত; ঐ সকল বৃক্ষ ক্রমশঃ সুদূরস্থিত একটি অরণ্যে যাইয়া মিশিয়াছে। তাহার পরেই একটি সুদৃশ্য পর্ব্বত। ঐ অরণ্য হইতে গৃহটিকে পৃথক করিবার নিমিত্ত গৃহ, উদ্যান ও প্রান্তর বেষ্টন করিয়া একটি নাতি-উচ্চ সুন্দর গ্রানিট-নির্ম্মিত প্রাচীর ছিল। নেপোলিয়ন সমুদায় গ্রীষ্মকাল এই সুন্দর স্থানেই অতিবাহিত করিতেন;

* Benson's Sketches of Corsica, page 4.

এই রমণীয় স্থানে থাকিয়া যে তাঁহার মনে বিবিধ সুন্দর ভাবের আবির্ভাব হইত, তাহা বলা বাহুল্য।

বাল্যকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, কর্শিকার শাসন-কর্ত্তা কাউণ্ট ডি মারবিউফ তাঁহাকে রাজ-ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্রেনের সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন; এই বিদ্যালয়ে যুবকগণকে সৈনিক-বৃত্তি ও ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষা দেওয়া হইত। কাউণ্টের এইরূপ উপকারে সকলেই চমৎকৃত ও বিস্মিত হইল; এবং কি কারণে নেপোলিয়ন কাউণ্টের এরূপ অনুগ্রহ-ভাজন হইলেন, তাহার কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না। কোন কোন ইতিহাস-বেত্তা বলেন, ম্যাডাম্ বোনাপার্টির সহিত কাউণ্টের গুপ্ত প্রণয়ই ইহার মূলীভূত কারণ। কিন্তু, তাহা বিশ্বাস্য নহে। কেন না, যে সময়ে নেপোলিয়ন্ সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তখন কাউণ্ট অতিমাত্র স্থবির হইয়াছিলেন। এমন কি, কোন কার্য্যেই তখন তাঁহার স্পৃহা ছিল না—এমন অবস্থায় তিনি যে এতাদৃশ গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষতঃ, ম্যাডামের বাস-স্থান আজাসিয়ো নগরের কেহই কখন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করেন নাই। ইহাই যদি উক্ত অনুগ্রহের কারণ হইত, তাহা হইলে, আজাসিয়ো-বাসিগণ নিশ্চয়ই তৎবৃত্তান্ত ঘুণাক্ষরেও শ্রবণ করিতেন। কিন্তু, কেহ তাহা করেন নাই; ইহাতে স্পষ্টতঃই জানা যাইতেছে, ঐতিহাসিকগণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ম্যাডামের উপর এই বৃথা কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছেন।"

সৌভাগ্য-বশতঃ নেপোলিয়ন যে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, তাঁহার প্রকৃতিও তদনুযায়ী ছিল; সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তথায় প্রতিষ্ঠা-ভাজন হন। এমন কি, তিনি সামান্য দিনের মধ্যে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ বার্ষিক বিবরণী পাঠাইবার সময় তাহাতে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। নেপোলিয়ন গণিত-শাস্ত্রে এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, গণিতাধ্যাপক তাঁহাকে বিদ্যালয়ের রত্ন বলিয়া অভিহিত করিতেন। অন্যান্য শিক্ষকের নিকটেও তিনি সামান্য প্রশংসা-ভাজন ছিলেন না; সকলেই তাঁহার গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। বিদ্যালয়ে তিনি কিসে উন্নতি লাভ করেন এবং কিসে প্রতিক্ষণেই নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার নিয়ত এই চেষ্টা ছিল; সময়ের অপব্যবহার তাঁহার সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। উক্ত বিদ্যালয়ে নেপোলিয়নের অনেক বন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারেন, এমন অন্তরের বন্ধু কেহই থাকেন নাই। অথচ তাঁহার সহাধ্যায়ী সকলেই

তাঁহাকে ভাল বাসিত ও তাঁহাদের নিকট তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; এমন কি, সকলে একত্র হইয়া কোন কার্য্য করিতে হইলে, তিনিই তাঁহাদের নেতৃত্ব-পদে বৃত হইতেন। এবং তখনই তাঁহার ক্ষমতা এতাধিক হইয়াছিল যে, তিনি কোন একটি কার্য্যের প্রস্তাব করিলে, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিত না। ঐ সৈনিক বিদ্যালয়ের এই রূপ নিয়ম ছিল যে, বালকগণ বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইতে পারিত না—রাত্রেও তথায় থাকিতে হইত; কেবল কোন উৎসবের দিন বাহিরে যাইবার কোন নিবারণ ছিল না। ব্রিয়েনের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে প্রতিবৎসর একটি মেলা হইত, তথায় তাঁহারা যাইতে পারিতেন। একদা ঐ মেলার সময় আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কোন উৎসব-উপলক্ষে সৈনিক ও সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরস্পর বিরোধ হয়; এই জন্য সৈনিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, বালকগণকে সে বৎসর উৎসব-দর্শনে যাইতে নিষেধ করিলেন। নিষেধ-আজ্ঞা প্রচারিত হইলে, নেপোলিয়ন্ বালকদিগকে তথায় লইয়া যাইবার পরামর্শ স্থির করিলেন। তদনুযায়ী ছাত্রগণ তাঁহার পরামর্শানুসারে বিদ্যালয়-গৃহের চতুর্বেষ্টিত প্রাচীরের একটি স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিল। এই কার্য্যটি এরূপ গুপ্তভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, উৎসবের দিন পর্য্যন্ত তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। উৎসবের দিন উপস্থিত; প্রাচীরের সেই স্থানটি হঠাৎ পতিত হইয়া গেল; বালকগণ তাহা দিয়া অবলীলাক্রমে বাহির হইয়া উৎসবে যোগ প্রদান করিল। ব্রিয়েনের বিদ্যালয়ে পাঠের সময় তাঁহার একটি বাল্য-ক্রীড়ার উল্লেখ করিব। একদা শীত-কালে ভয়ানক তুষার পতিত হইয়াছে; নেপোলিয়ন্ সহাধ্যায়িগণকে সেই বরফের উপর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। সকলেই এক মনে তাহা করিতে আরম্ভ করিল। দুর্গ নির্ম্মিত হইলে, তাহার চতুর্দ্দিকে খাল ও প্রাচীর যথা-রীতি নির্ম্মিত হইল। বালকগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গেল; যুদ্ধ আরম্ভ হইল; ক্রমে এই যুদ্ধ এতাদৃশ বিষম হইয়া উঠিয়াছিল যে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা নিবারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে বাল্যকাল হইতে বালক নেপোলিয়নের মানস-ক্ষেত্রে যুদ্ধ-ভাব প্রধূমিত হইতেছিল। ঐ অবস্থায় ঐরূপ নানা কার্য্যের আন্দোলন তাঁহার স্মৃতি-পটে রক্ষিত হইয়া পরিশেষে তাঁহাকে অতিশয় সুফল প্রদান করিয়াছিল; এই সকলের অনুশীলনে তিনি পরিণত অবস্থায় যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্য অবাধে সম্পাদন করিতে পারিতেন; এবং যে বিষয় লইয়া এক জনকে কিয়ৎকাল মস্তিষ্ক ঘুরাইতে হইত, তিনি তাহা উপস্থিত হইবামাত্র বুঝিতে সক্ষম হইতেন।

নেপোলিয়ন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন না, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সকলই আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন ও তাহারই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেন। এবং ঐ চিন্তাতেই এত সময় ব্যয়িত হইত যে, সাহিত্যালোচনার আর অবসর পাইতেন না। এই জন্য তিনি কোন সাহিত্যই ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই; এমন কি, ফরাশী ভাষায় এক খানি পত্র লিখিতে হইলেও,তাহা রীতি-মত ও শুদ্ধ ভাষায় লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার একে সাহিত্য-জ্ঞান অল্প, তাহাতে অত্যন্ত আড়ম্বর-প্রিয় ছিলেন; কিছু লিখিতে হইলে, বড় বড় শব্দ বিন্যাস করিতেন, অথচ সেই সকল শব্দ তত্তৎ-স্থলের উপযোগী কি না,তাহা এক বারও ভাবিয়া দেখিতেন না; সাহিত্যে তিনি ব্রিয়েনের বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

তিনি অত্যন্ত অপমান-অসহিষ্ণু ছিলেন। তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একদা ব্রিয়েনের বিদ্যালয়ে পাঠ-কালীন তথাকার কোন অধ্যাপক তাঁহাকে একটী সামান্য দোষের নিমিত্ত অপমানিত করেন। অধ্যাপক তাঁহাকে একটী অপমান-সূচক পোষাক(penitential dress) পরিতে দেন ও তাঁহাকে তাঁহার ভোজন-স্থান হইতেও স্বতন্ত্র করিয়া দেন; বালক নেপোলিয়ন্ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, হঠাৎ তাঁহার মূর্চ্ছা হইল; এই অবধি অত্যন্ত ক্রোধের সময়,এই মূর্চ্ছা তাঁহাকে সময়ে সময়ে আক্রমণ করিত। বিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপক ফাদার পিটল তাঁহার প্রিয় ছাত্রের এই অপমান-দর্শনে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে সুস্থ করিলেন; এবং শিক্ষককে তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে আর কখন এ প্রকার শাস্তি দিতে নিষেধ করিলেন, এবং বলিলেন, ইহাকে সামান্য বিবেচনা করিবেন না। ভবিষ্যতে এই বালক এক জন অসাধারণ লোক হইবে। বাল্যকাল হইতেই নেপোলিয়নের উন্নতি লাভ করিবার ও সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার আশা বিলক্ষণ ছিল; ইহাই তাঁহার উন্নতি লাভ করিবার প্রধান কারণ। তিনি অস্থির-চিত্ত ছিলেন না; এক বার যাহা সঙ্কল্প করিতেন, তাহা কদাচই পরিত্যাগ করিতেন না। একদা ইটালীর সৈন্যের অধ্যক্ষকে রাজ-কার্য্যে নিয়োজিত করিবার উপায় উদ্ভাবনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, পিচেগ্রু (Pichegru) বলিয়াছিলেন, "আমি নেপোলিয়নের বাল্য-স্বভাব বিশেষরূপে জানি; তাঁহার অভিলাষ অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি যখন এক বার তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, তখন কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিবেন না।"

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় রাজশ সৈনিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক ডি কেরালিয়ো নেপোলিয়নের

গুণ-গ্রামের পরিচয় পাইয়া, অপরিণত-বয়স্ক হইলেও, তাঁহাকে পারিস নগরীর সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠ-সমাপ্তির জন্য নির্ব্বাসিত করেন। তদনুযায়ী নেপোলিয়ন উক্ত নগরের সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন। অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যে, সেখানেও তিনি ব্রিয়েনের বিদ্যালয়ের ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তথায় তিনি নানা সভায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন; তন্মধ্যে আবিরায়নানের সভা তাঁহার অধিকতর প্রিয়। তিনি সদাই তথায় গমনাগমন করিতেন; এবং এই স্থল হইতেই অধ্যয়নের পিপাসা তাঁহার অধিকতর বলবতী হয়; সুতরাং নানাবিধ গ্রন্থ-পাঠে তিনি সময়াতিবাহিত করিতেন। তাঁহার বিশেষ গুণ এই ছিল, যাহা অধ্যয়ন করিতেন, তাহা তাঁহার স্মৃতি-পটে একবারে অঙ্কিত হইয়া থাকিত ও যুক্তি দ্বারা তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে পারিতেন। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে প্লটার্ক-প্রণীত গ্রন্থই তাঁহার সমধিক আদরণীয় ছিল এবং তৎপাঠে তিনি আপনার চরিত্র এরূপে গঠিত করিয়াছিলেন, যে ইহার বহু দিন পরে পেওলি তাঁহাকে পৌরাণিক বীর বলিয়া অভিহিত করিতে কিছু-মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। যে সময়ে তিনি পারিসের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, সেই সময়ের একটী বৃত্তান্ত এই স্থলে উদ্ধার করিলাম; একদা তিনি তাঁহার কোন আত্মীয়কে এক খানি পত্র লিখেন; তাহাতে রাজ-মান্য-সূচক কতক গুলি কথা লেখা ছিল; বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে তিনি পত্র-খানি তথাকার অধ্যাপক মসিয়ুর ডোমাইরনকে দেখান; তিনি পত্রের রাজ-মান্য-সূচক কথা গুলি উল্লেখ করিয়া নেপোলিয়নকে অতিশয় তিরস্কার করেন, এবং পত্র-খানি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। নেপোলিয়ন এতদ্দৃষ্টে কিছু-মাত্র বলিলেন না; কিন্তু সেই ঘটনার প্রায় বিংশতি বৎসর পরে যখন ডোমাইরন তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত, তখন এক দিন সহাস্য বদনে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "পত্র-দাহের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত কালের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তদশ বৎসর বয়সের সময় নেপোলিয়ন সৈন্য-দলের দ্বিতীয় লেফ্‌টেনান্টের পদে নিযুক্ত হন; এই তাঁহার ভাবী উন্নতির সূত্রপাত। যে জন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই অমানুষী ক্ষমতায় এই প্রথম পাদবিক্ষেপ। এই দিন হইতেই নেপোলিয়ানের ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইতে লাগিলেন; এই দিনই তাঁহার সাম্রাজ্য-প্রাপ্তির সূচনা হইল।

নেপোলিয়ন দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন; ফ্রান্সবাসী সকলেই পরিচ্ছন্নতায় সমধিক স্পৃহাবান্। নেপোলিয়নও তাদৃশ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকায়, তাঁহার প্রকৃতি এরূপ শুভদায়িনী ছিল যে, যিনি

একবার-মাত্র তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তিনিই তাঁহার অনুগত ও বশীভূত হইয়া যাইতেন। তাঁহার প্রকৃতি-সিদ্ধ এইরূপ মহৎ গুণ ছিল বলিয়াই তিনি মানব-জন্মের উচ্চতম সীমায় উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিছু কাল মধ্যে তিনি সৈনিক সম্প্রদায়ের প্রথম লেফ্টনাণ্টের পদে অধিরূঢ় হয়েন। এই সময়ে "কিসে মানব সাধারণ সুখী হইতে পারে?" রায়নালের এই প্রশ্নের যুক্তি-গর্ভ মীমাংসা করিয়া নিয়ম সভা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। যাঁহার হস্তে পরি-শেষে সহস্র সহস্র লোকের সুখ-দুঃখের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল—যিনি ইয়ুরোপ-খণ্ডস্থ সমুদায় লোকের মানসিক ভাবের আমূল পরিবর্ত্তনের কারণ—যিনি তরুণ বয়সের যুক্তি-পূর্ণ মীমাংসায় পরিণত বয়সে পরীক্ষার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, সেই মহাপুরুষের তরুণ বয়সের মনের ভাব জানিতে বোধ হয়, অনেকেই সমুৎসুক হইবেন। কিন্তু, তাহা পাওয়া যায় না। কেন না, মহা-গৌরবান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, একদা টালীরাণ্ড নিয়ম সভার পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিয়া নেপোলিয়নের লিখিত ঐ পুস্তক খানি তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি তাহার কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়াই তাহা নষ্ট করিয়া ফেলেন; ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহার অপরিণত অবস্থার মনের ভাব অপরিণত বয়সের মনোভাবের সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হয় নাই। কেন না, তাহা হইলে তিনি কখন পুস্তক খানি নষ্ট করিতেন না। যদি সেই যুক্তিই অধিকতর উপা-দেয় বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তখন তাহা কার্য্যেও পরিণত করিতে পারিতেন। প্রথম লেফ্টানাণ্ট থাকা কালীন তিনি "সেনিস পর্ব্বতে ভ্রমণ বৃত্তান্ত" নামক এক খানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু, তাহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।

দেখিতে দেখিতে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ আসিয়া উপস্থিত—তাহার সহিত মহা বিপ্লবের সূত্রপাত। ফরাসী জাতি-সাধারণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গেল। এক দল রাজকীয়—অপর দল হিতৈষী। নেপোলিয়নের অধীনস্থ সৈন্যগণও এই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। নেপোলিয়ন দেশ-হিতৈষি-পক্ষ অবলম্বন করিলেন। উহা গ্রহণের সময় তিনি বলিয়াছিলেন;—"যদি আমি এক জন প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী হইতাম, তাহা হইলে, রাজকীয় দল আমার নিতান্ত প্রিয় হইত; কিন্তু যেমন আমি এক জন সামান্য কর্ম্মচারী, আমি হিতৈষি-দলে যোগ প্রদান করিলাম।" নেপোলিয়ন এই সময়ে জাতীয় সভার (National Assembly) এক জন প্রধান অবলম্বন ছিলেন; এবং যত দিন পর্য্যন্ত উক্ত সভা জীবিত ছিল, তত দিন পর্য্যন্ত তিনি

তাহারই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বিধি-নিয়ামক সভার (Legislative Assembly) সৃষ্টি হইলে, তাহাতে তিনি যোগ দেন নাই। তিনি যে জাতি-সাধারণের কার্য্যে বিশেষ আস্থা-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিকার্য্যেই পরিলক্ষিত হইত। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার উদ্ভাবিত উপায় সকলই পরে মহা বিপ্লবের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে রাজনৈতিক কোন তর্কে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকগণ তাঁহাকে রোণ নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন্ তথায় মৃত-কল্প হইয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার এক বিশ্বস্ত বন্ধু তাঁহাকে সেই ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ইহা নহে। রোণ নদীতে সন্তরণ করিতে করিতে, তাঁহার হস্ত-পদাদি অবশ হইয়া পড়ে—তাহাতেই তিনি প্রায় জলমগ্ন হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার এক জন বন্ধু তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি সৈনিক দলের কাপ্তেনের পদে উন্নীত হন। এই সময় পারিস নগরীতে অবস্থিতি-কালীন তিনি ২০এ জুন ও ১০ই আগষ্ট উপর্য্যুপরি দুইটি প্রজাদ্রোহ দর্শন করেন। তিনি উহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—ইহা বিদ্রোহ নহে; ঘৃণিত মনুষ্যবৃত্তি-মাত্র; এবং ইহাও বলিয়াছিলেন, এক জন সেনাপতি কেবল অক্লেশে এই আপাত-ভয়াবহ, কিন্তু তুচ্ছ লোক-সমিতিকে, বিদূরিত করিয়া দিতে পারেন। বোধ হয়, সেই সময়ে ভবিষ্যৎ যদি তাঁহার কাণে কাণে বলিতেন "সম্মুখে যাহা দেখিতেছ—তাহা তোমারই জন্য; তুমি পরে যে উপায়ে সম্রাট্ হইবে, ইহাতে তাহারই পথ প্রস্তুত হইতেছে" তাহা হইলে নেপোলিয়ন্ ঐ লোক-সমিতিকে কি ভাবে দেখিতেন ও কিরূপে আপন মনের ভাব প্রকাশ করিতেন? তাঁহার ভাগ্য যে ক্রমে সুপ্রসন্ন হইতেছে, তাহা তিনি কখন স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। যখন পারিসে এই রূপ গোলযোগ চলিতেছিল, তখন তিনি আপনার পরিবারের জন্য ব্যাকুল হইলেন—তাঁহাদিগকে নিরাপদে রাখা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হইল। কেন না, কর্শিকা দ্বীপও তখন নিতান্ত নিরাপদ ছিল না—ফ্রান্সের বাতাস তাহার গাত্রেও লাগিয়াছিল; সুতরাং কর্শিকাবাসিগণও সে সময় গোলযোগ উত্থাপন করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। কাজেই নেপোলিয়ন্ আপন পরিবারবর্গকে ফ্রান্সে আনিবার জন্য কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কর্শিকা গমন করিলেন।

এই সময় নির্ব্বাসন হইতে পেওলি প্রত্যাগমন করিলেন। পারিস নগরীতে গমন করিলে, সকলেই তাঁহাকে মান্যের সহিত গ্রহণ করিল; এবং তিনি

জাতীয় সভার সম্পাদক ও কর্শিকার জাতীয় সৈন্যের অধিনায়কতাপদে নিযুক্ত হইলেন। পেওলি, অতি উদারচেতা লোক ছিলেন; সুতরাং তাঁহার কার্য্য-প্রণালীও যে সেই প্রকার হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? জাতীয় সভা এ পর্য্যন্ত পেওলির সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই— সুতরাং শীঘ্রই পেওলি তাহাদের বিরক্তির ভাজন হইলেন। তাঁহাকে 'সভার সংস্রব হইতে বিচ্যুত ও জাতীয় সভায় আপন দোষ-ক্ষালনের নিমিত্ত আহ্বান করা হইল। পেওলি তখন ফরাসী রাজ্য হইতে কর্শিকা দ্বীপকে স্বতন্ত্র করিবার চেষ্টা করিতেছেন; সুতরাং তথায় যাইতে অস্বীকার করিলেন। যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; প্রায় দ্বীপবাসী সকলেই পেওলির পক্ষ অবলম্বন করিল। ফ্রান্স হইতে লাকোম্বি, সেণ্টমিচেল ও সালিসেটী প্রভৃতি সেনাপতিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন; কিন্তু, তাহাতে কোন ফলই হইল না। অবশেষে নেপোলিয়নই উক্ত পদে নিয়োজিত হইলেন। তখন তিনি কর্শিকাতেই অবস্থান করিতে ছিলেন। সুতরাং শীঘ্রই পেওলির বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিলেন। ইহাই নেপোলিয়নের সর্ব্ব প্রথম যুদ্ধ। তিনি সর্ব্বপ্রথমেই আপন জন্মভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার উপর যখন প্রথমে সেনাপতি-পদের নিয়োগ-পত্র আইসে, তখন তিনি মহা গোলযোগে পতিত হইয়াছিলেন। কেন না পেওলি তাঁহার পিতৃ-মিত্র ও আত্মীয়; এবং নিজের জন্ম-ভূমির উদ্ধার-সাধনার্থই বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। এমন অবস্থায় তাঁহার বিপরীতাচরণ করা কর্ত্তব্য কি না? যাহাই হউক, অনেক বিবেচনার পর তিনি সভার (Convention) পক্ষই অবলম্বন করিলেন; এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধার্থ-সজ্জিত হইলেন।

নেপোলিয়ন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কর্শিকাস্থ বাষ্টিয়া নগর হইতে ফরাসী-সৈন্যের সাহায্যে পেওলি-অধিকৃত তাঁহার সূতিকা-ভবন আজাসিয়ো নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। আজাসিয়ো নগরীর সম্মুখবর্ত্তী টরি ডি কাপিটিলো (Torre de Capitillo) নামক সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার-মানসে পঞ্চাশৎজন মাত্র অনুচর লইয়া আজাসিয়ো উপসাগরে অবতরণ করিলেন। অল্প শ্রমেই তাহা অধিকার করিয়া বসিলেন; কিন্তু বায়ুর প্রতিকূলতা-বশত তথা হইতে আর যাইতে পারিলেন না এবং রণ-তরি স্থল-সংলগ্ন হওয়াতে, মহা বিপদে পতিত হইলেন। শত্রুপক্ষীয় সৈন্য সকল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। এই স্থানে এই অবস্থায় এই সামান্য সৈন্য-সম্বলিত অবরুদ্ধ দল এতাদৃশ বিপন্ন হইয়াছিল যে, অবশেষে আহারের নিমিত্ত যুদ্ধার্থ-সজ্জিত অশ্বের মাংসে কথঞ্চিৎ উদর পূর্ণ করিয়া মহাকষ্টে দিনপাত করিতে হইয়াছিল। পাঁচ দিন

পরে নেপোলিয়ন্ এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন; তথা হইতে মুক্ত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে সেই দুর্গটি ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু, তাহা সিদ্ধ হইল না; তত্রাপি যত দূর পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তাহাতেই ঐ দুর্গ তদবধি কোন প্রয়োজনেই আইসে নাই। এক্ষণে উহা কেবল নেপোলিয়নের প্রথম কার্য্য ঘোষণা করিবার নিমিত্তই যেন ধ্বংসাবশেষ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা দৃষ্টেও পেওলির রণ-কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি হইল না—দিন দিন তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইংরাজ-সেনা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তখন নেপোলিয়ন্ আপন পরিবারবর্গকে তথায় রাখা নিতান্ত অনিষ্টকর, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে প্রথমতঃ নাইস নগরে, পরে মারসিলিসে প্রেরণ করিলেন। নিজেও তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা লুমিয়েন্ উভয়ে কর্শিকা দ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি নেপোলিয়ন্ আর কখনই জন্ম-ভূমিতে প্রত্যাগমন করেন নাই। মারসিলিসে তাঁহার পরিবারবর্গকে মহাকষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল; এবং যত দিন পর্য্যন্ত নেপোলিয়ন্ উচ্চ-পদস্থ না হইয়াছিলেন, অবধি তাহাদের দুরবস্থা অতি প্রবল ছিল।

তাঁহার জন্মস্থান হইলেও, আজাসিয়ো নগর কখনই তৎ-প্রদত্ত অলঙ্কার প্রভায় প্রভাম্বিত হয় নাই। কেবল মাত্র একটি সামান্য কৃত্রিম উৎস, ইহা নেপোলিয়নের জন্মস্থান তাহাই জগতে খ্যাপন করিতেছে, তিনি উক্ত নগর ভালবাসিতেন না; আর যদিও অন্তরে কখন ভালবাসিয়াই থাকেন, তবে পরিণামদর্শিতা-বশতঃ তাহা কখনও প্রকাশ করেন নাই—কিম্বা তাঁহার কোন কার্য্যে আস্থাবান্ হন নাই। ইহা তাঁহার মঙ্গলেরই কারণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

এই রূপে নেপোলিয়নের বাল্য ও তরুণ বয়সের কিয়দংশ কাটিয়া গেল। এক্ষণে তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চবিংশতি হইয়াছে, তিনি পূর্ণ-যৌবনে উপস্থিত হইয়াছেন—সুতরাং তাঁহার কৈশোর অবস্থা এই খানেই শেষ করা গেল। কৈশোরে তিনি যে কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, জগতের লোক তাহা চিরদিন উৎসাহের সহিত দর্শন করিবে; দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সাধারণ লোকের মনে যে অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, নেপোলিয়ন্ তাহা প্রজ্বলিত করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

হাস্য।

মানুষের হাসে না কে? সুখে দুঃখে, রাগে অভিমানে, হৃদয়ের জ্বালায় নিরন্তরই মানুষ হাসে। দুঃখী, ধনী, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই হাসে; কিন্তু হাসিতে

প্রাণে কয় জন? হাসি চেনে কয় জন?

হাসি কপোলে, চক্ষে, দন্তে ও ওষ্ঠে প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহার কার্য্য নিজের ও যাহার প্রতি থাকে, তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়, লক্ষ্যের হৃদয়ে হয় বিষ, নয় অমৃত ঢালিয়া দেয়! এক হাসিই হৃদয়ে সন্তোষ, আশা, সাহস, বল প্রভৃতি প্রদান করে, আবার সেই হাসিই সন্তোষ, আশা, সাহস ও বল প্রভৃতি ধ্বংস করে। উভয়ই হাসি, কিন্তু রূপ ভিন্ন ভিন্ন। কপোলে, চক্ষে দন্তে ও ওষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চিহ্ন অধিক হয়। চতুরতায় চক্ষু হাসে, আনন্দে কপোল হাসে, অপ্রস্তুতে দন্ত হাসে, ছলনায় ওষ্ঠ হাসে। হাসে এক জন, তাহার ফল পায় দশ জন। বার-বিলাসিনী যুবককে দেখিয়া হাসে, তাহার হৃদয় মুগ্ধ করিতে, আর স্বার্থ পুরাইতে। যুবতী সমবয়স্কার অলঙ্কার-গুলি পুরাতন ধরণের দেখিয়া হাসে,—তাহার স্বামীর সর্ব্বনাশ করিতে, স্বর্ণকারের উদর পুরাইতে, আর নিজের অহঙ্কার বাড়াইতে হাসে। নিন্দুক পরের নিন্দা করিয়া হাসে,—দর্শকগণের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে, আর নিজের চরিত্রে কলঙ্ক মাখাইতে। খল পরের অনিষ্ট করিয়া প্রতিবাসীর ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বাধাইয়া হাসে, তাহাদের অনিষ্ট করিতে আর নিজের অভীষ্ট সাধিতে। ধনী—দীর্ঘকায়, দ্রুতগামী তুরঙ্গযোজিত শকটে অর্দ্ধ-শয়ানাবস্থায়, প্রাসাদোপরিস্থিতা বার-বিলাসিনী দেখিয়া হাসে, রসিকতার পরিচয় দিতে, আর নিজের মাথা খাইতে। যুবতী—সমবয়স্কার স্বামী, বৃদ্ধ মূর্খ বা বিশ্রী দেখিয়া হাসে, তাহাদের প্রণয়ে ব্যবধান দিতে, হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিতে, আর নিজের মন্দ রুচি বাড়াইতে। চতুরা স্বামীর নিকট অন্যের অলঙ্কারের সহিত নিজের গহনার তুলনা করিয়া অভিমানের হাসি হাসে—স্বামীর মাথা ঘুরাইতে, আর নিজের সোণা বাড়াইতে। অভিমানিনী ছাত্রীর 'কম্প-টার' বুনিতে ছুই থাই উল ভুল হইয়াছে দেখিয়া হাসে,—তাহার শিক্ষার পথে কণ্টক দিতে, আর নিজের গুমর বাড়াইতে। যুবতী নবোপাখ্যান পড়িয়া হাসে,—স্বামীকে দাস করিতে, আর প্রণয়ে ছলনা শিখিতে। বিচারক দায়রা করিবার সময়, উকীলের বক্তৃতা শুনিয়া হাসে,—আসামীর ও তাহার আত্মীয়-গণের সর্ব্বনাশ করিতে, জুরিগণকে নিজের মতে আনিতে। বঞ্চক স্বীয় লক্ষ্যের নিকট তাহার আত্মীয়ের সদুপ-দেশকে মন্দ পরামর্শ প্রতিপন্ন করিয়া হাসে, তাহার বুদ্ধি ভ্রংস করিতে ও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে। ডাক্তার বাবু অন্য ডাক্তারের চিকিৎসার উল্লেখ করিয়া হাসে,—তাহার উন্নতির পথে কণ্টক দিতে, আর নিজের পসার বাড়াইতে। উকীল বাবু স্বীয় মক্কেলের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া হাসে, তাহার

বুদ্ধি-টুকুকে ঢাকা দিতে ও নিজের ফিচ্ সংগ্রহ করিতে; আর প্রতিপক্ষের উকীলের তর্কে হাসে,—তাহাদিগের প্রকৃতি বিপর্য্যয় করিতে ও নিজের পসার বাড়াইতে। প্রায়ই হাসির উদ্দেশ্য আছে,—কতক আমরা বুঝি,—কতক বুঝি না। আকাশে চাঁদ হাসে, দম্পতীর প্রণয়বেগ উত্তেজনা করিতে, নিঃসহায় পথিককে সাহস দিতে, আর অভিসারে চৌর্য্য-কার্য্যে ভয় জন্মাইতে। মেঘাচ্ছন্ন নীল আকাশে সৌদামিনী হাসে, জগতের চমক ভাঙ্গাইতে, পথ-হারা পথিককে পথ দেখাইতে, আর প্রকৃতির শান্ত ভাব ভুলাইতে। শিশু, জননীর অঙ্কে শয়ন করিয়া হাসে, জনক-জননীর হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দিতে!—সেই হাস্য যিনি চেনেন, তিনি কার্য্য-ক্ষেত্রে সফল-কর্ম্মা ও মানুষের হৃদয় বুঝিতে অধিকারী। কোন কালেজে এক জন অধ্যাপক ছাত্রদিগকে হাসির ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া বক্তৃতা দেন। অনেকে তাঁহাকে ভাঁড় বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু আমরা বলি, সংসার-ক্ষেত্রে চলিতে শিখিতে হইলে, অগ্রে হাসি-তত্ত্ব শিক্ষা করা চাহি! চির-দাস বঙ্গ-সন্তানের যদি সুখের প্রত্যাশা থাকে, তবে তাহা হাস্য-তত্ত্ব-শিক্ষায়। জগতে যে হাস্য-বিদ্যায় দক্ষ, সেই বিষয়ী—সেই অনেক উন্নতি করিতে পারে। উকীল বাবু, যদি হাস্য-বিদ্যায় দক্ষ হয়েন,—বিচারকের একটু হাসিতেই সকল বুঝিতে পারেন, মিথ্যা বকিয়া মাথা ধরাইয়া আর তাঁকে হাসিতে হয় না। কর্ম্ম-প্রার্থী যাহার নিকট উমেদারি করেন, তাহার হাস্য-তত্ত্ব বুঝিলে এক দিনেই মনের ভাব বুঝিতে পারেন। বিচারক সাক্ষীর একটু হাসিতেই সত্য মিথ্যা বুঝিয়া লইতে পারেন, আর বঙ্গীয় যুবক সাহেবের হাসির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি একটু ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে পারেন, তবে শীঘ্রই উন্নতির পথে যাইতে পারেন। তাই বলি, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে হাস্য-তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া উচিত। যে ছাত্র তাহা সংগ্রহ করিতে পারে, সে মানুষের হৃদয়-তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারে; আর মনুষ্য-সমাজেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

যিনি হাস্যের ছবি আঁকিতে পারেন, তিনি প্রকৃত কবি। যিনি হাসাইতে পারেন, তিনি রসিক। যিনি হাসিতে পারেন,—তিনি চতুর চূড়ামণি।

কবি কালিদাসে রহস্যত্ত কিসে বুঝিলেন, শকুন্তলা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী? একটু হাসের! দুষ্মন্তকে বিদূষক জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"অধ ওর উবরি কীদিসো সেচিওবাও?"

"তোমার উপর তাহার মনের ভাব কি বুঝিলে?—" চতুর নায়ক দুষ্মন্ত বলিলেন,—

"অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং
হসিতমন্য-নিমিত্ত-কথোদয়ং।"

শকুন্তলার অনুরাগ-প্রকাশক চক্ষু হাসিয়াছে, অন্য-নিমিত্ত কথায় এক এক হাস্যেই হৃদয়ের ভাব, হৃদয়ের ভাল বাসা—প্রণয়-লিপ্সা জানাইয়াছে। শত সহস্র কথায় যে ভাবের স্পষ্ট উপলব্ধি হইত না, সেই সরলতাময় প্রণয়লিপ্সা একটু হাসিতেই প্রকাশ হইয়াছে। চতুর কালিদাস এই টুকুতেই মানুষের হৃদয়জ্ঞতার পরিচয়—স্বীয় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আর রত্নাবলী-কার নিপুণ কবি শ্রীহর্ষ নায়কের বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রকাশ হওয়ায় বাসবদত্তার একটু হাসিতে মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছেন। নায়ক বিদূষককে বলিতেছেন,—

ধিঙ্‌মূর্খ! অলং পরিতোষেণ
ঈষণ্মাং প্রতিভেদকারি
হসিতং নোক্তং বচো নিষ্ঠুরং।
কোপশ্চ প্রকটীকৃতো দয়িতয়া * *"

ধিক্ মূর্খ,—আবার আহ্লাদ! প্রণয়িনী তিরস্কার করে নাই, একটী কটু কথা বলে নাই। কিন্তু যে একটু হাসিয়াছে, তাহাতেই রাগ সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। নায়ক বাসবদত্তা তিরস্কার করিলে—দু ঘা মারিলে, এত ভয় পাইতেন না, হৃদয়ে এত বিভীষিকার ছবি পড়িয়া নিদারুণ আঘাত করিত না, হৃদয় কাঁপাইত না। একটু হাস্যেই সকল হইয়াছে। তিরস্কার অল্প ক্রোধের। সে ক্রোধের আবরণ উন্মোচিত হয়, শীঘ্রই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। আর হাস্য আবরিত গাঢ় ক্রোধের শীঘ্র যাইবার নহে। যে ক্রোধে হাসি হয়, সে ক্রোধ হৃদয়ে আঘাত করে। কবি দীনবন্ধু যথার্থই বলিয়াছেন,—"হাসির মার বড় মার!"

হাসিতে হাসাইতে চায় সকলে। কিন্তু পারে কয় জন? তাস খেলিতে বসিয়া তুমি যদি হাসির একটু কৌশল মত ব্যবহার করিতে পার, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হাস্য-বিদ্যায় অপটু হইলে বাঞ্চিত হইবেন। তুমি জিতিবে। তেমনি সংসারে একটু হাসির উপর তোমার ক্ষমতা থাকিলে, তুমি প্রত্যেক পদে জিতিবে। যে তোমার অপেক্ষা হাস্য-বিদ্যায় পারদর্শী, সেই তে মায় ঠকাইবে। যে সেই হাসির বৃথা ব্যবহার করে,—সে হয় পাগল, নয় হাল্কা লোক। মুদ্রারাক্ষসে লিখিত আছে,—রাজার দাসী মর্ম্ম না বুঝিয়া বৃথা হাসিয়াছিল বলিয়া, রাজা প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাকে তিরস্কার করেন, কিন্তু আমরা বলি, দাসী নিতান্ত নিরপরাধিনী নহে; লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই পাপের একটু উপদেশ, একটু শাসন ভাল। রাজা দাসীকে পাগল বা হাল্কা লোক ভাবিয়া অল্প শাসন করিলেও চলিত। যে সর্ব্বদা হাসে, তাহার পরকালের পথে কাঁটা পড়ে, তুমি বিদ্যালয়ের ছাত্র। সময় নাই, অসময় নাই, হাসিয়াই মাৎ করিতেছ, তোমার পরকাল যাইতেছে।

পাঠের ফল কিছুই হইতেছে না। তুমি যুবক বিষবৃক্ষের প্রত্যেক পত্র পাঠ করিয়া বৃথা হাসিতেছ, তোমার সর্ব্বনাশ হইতেছে, কেবল অসৎ প্রবৃত্তির উদ্দীপনা জন্মিতেছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে না। তুমি যুবতী। সময় নাই অসময় নাই,—হাসিতেছ! তোমারও পরকাল যাইতেছে। তুমি বিচারক; সময় নাই, অসময় নাই হাসিতেছ, তোমারও পরকাল যাইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীরভাবে থাকিবে, হাসিবে না, এ কথা বলিতেছি না। যে না হাসে, তাহার হৃদয় নাই,—তাহার মুখ দেখিলেও পাপ। সকল সহিতে পারি; "গোম্‌দা মুখ" তিরস্কার সহে না।

"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"—

সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ির কাজ অল্প। হাসির শব্দ গুরু; তায় অর্থের গুরুতা নাই। চাটুকার প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য চৌতালে হাসিয়া গৃহ প্রতিধ্বনিত করে,—সে হাসির মূল্য যৎসামান্য। তোমার বাজারে ধার করিবার পসার থাকিলেই অর্থাৎ বড় মানুষের সংখ্যায় নাম উঠিলেই বড় খরচ কর, আর না কর—সে হাসি দেখিতে পাইবে। তাহা সৌন্দর্য্যহীন, নীরস ও বিরক্তিজনক। কেবল কর্ত্তার উর্দ্ধসংখ্যা লক্ষ্যের মূর্খতার পরিচায়ক! 'মুচ্‌কে হাসি' যে সকল ভাব প্রকাশ করে, তাহা অমূল্য! প্রণয়ী যাহার হাসির ছায়া দেখিয়া রূপে গুণে প্রণয়-লালসায় ব্যগ্র, চিরদিন আশার বীজ হৃদয়ে বপন করিয়াছেন,—তাঁহার একটু হাসিতেই সব ধ্বংস হয়। মস্তক ঘুরিতে থাকে, হৃদয় দারুণ আহত হয়। আবার সেই একটু হাসিতেই হৃদয় নাচিয়া উঠে,—শিরায় শোণিত দ্রুত বেগে প্রবাহিত হয়;—আশা-লতা ফলবতী হয়। দম্পতী একটু হাস্যে উভয়ের এক প্রাণ এক হৃদয় ভাবিয়া প্রেমের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আবার সেই দম্পতীর একটু হাস্যে উভয়ে দারুণ ব্যবধান বোধ, বঞ্চনা বোধ, জগতে সুখ-বিহীনতা বোধ হইয়াই প্রেমের দৃঢ় বন্ধনের শিথিলতা জন্মে। হাসির আড়ম্বর যত অল্প, ততই অর্থের গুরুতা, মুচ্‌কে হাসিতেই চতুর, প্রণয়ী, দুঃখী, সুখী বোধ হয়। একটু মুচ্‌কে হাসি এক জন হাসিলে, শত শত ভাব প্রকাশ পায়, সে হাসি অমূল্য নয় তো কি? তুমি তোমার প্রণয়িনীর একটু হাসিতে মুগ্ধ হইয়া কর্জ্জ করিয়া অলঙ্কার গড়াইয়াছ; তুমি একটু হাসিতে সুন্দরের জ্বালায় দশ হাত ভূমির জন্য শত শত মুদ্রা খরচ করিয়া, শত শত লোকের তোষামোদ করিয়া আদালতে আদালতে বেড়াইতেছ, তুমি একটু হাসিতে সকল ভুলিয়া সেই মূর্ত্তি পূজা করিতেছ, সে সেই একটু মুচ্‌কে হাসি! তাহার কার্য্য তোমার অন্তস্তল ভেদ করিয়াছে। সে হাসি কি কখন জীবনে ভুলিতে পারিবে?—চতুরা নায়িকা নায়কের মন ভুলাইতে একটু হাসিয়া

তাহার সর্ব্বনাশ করে, সে হাসিতে মধু বিষ দুই আছে। সে হাসি যে ভোগ করিয়াছে, সে বলিতে পারে, মুচ্‌কে হাসির ক্ষমতা কত! স্মিত মুখের একটী কথায় যাহা হয়, তাহা কিছুতেই হইবার নহে। একটু হাসিতে সৈনিক উত্তেজিত হইয়া প্রাণ পণ করে। একটু হাসিতে নির্ব্বোধ আত্মহত্যা করে।

একটু হাসিতে রাগ বাড়ে। একটু হাসিতে মান বাড়ে একটু হাসিতে মান যায়। তুমি যুবতী এত করিয়া মানের ছবি দেখাইলে—কিন্তু ঐ একটু হাসিয়া সকল মাটি হইয়া গেল!—

গোপাল ভাঁড় এত খ্যাতিনামা কেন? হাসাইতে জানিতেন, বলিয়া। যে হাসাইতে পারে, তাঁর যশ সর্ব্বত্র। কিন্তু সে হাসির কার্য্য অতি অল্প! তুমি হাসাইতে যাইয়া যদি হাসাইতে না পার, তবে তোমার দাঁতে হাসিতে হইবে। এই আমি কালি কলম নষ্ট করিয়া সুখের উপাধানে মস্তক সম্পূর্ণ না রাখিয়া, কত উৎসাহে হাসিতে হাসিতে লিখিতেছি,—হয়ত কেহ পাঠ করিয়া, একটু হাসিয়া আমায় পুনরায় কলম ধরাইবেন,— উৎসাহ বাড়াইবেন—আমায় হাসাইবেন; অথবা একটু হাসিয়া আমার দেঁতো হাসি হাসাইবেন। কিন্তু সকলে যা চায়, তারই আন্দোলন ভাল—তবু তো লোকে বলিবে, হাসির কথা লিখিয়াছে!!

ম, চ, মিত্র।

বিরাগী।

আর কেন বৃথা এই, সংসার মায়ার জালে
থাকে বদ্ধ মন,
জীবনের সুখ যাহা, প্রেম-আশা অভিলাষ
ঘুচেছে সকল।
গভীর জলধি যথা, সদা বায়ু-সন্তাড়িত
তরঙ্গে আকুল,
একে একে এ হৃদয়ে, কত স্নেহ, কত তৃষা
করেছে ব্যাকুল।
এবে সে কুসুম-রাশি, জলন্ত অনলে যেন
পুড়ে ছারখার,
শৈশবের সরলতা, অস্ফুট কৈশোর-ভাব
প্রণয়-বিকার।

ভবিষ্যের সুখ-রাজ্য, আশার সুবর্ণ জ্যোতি
দূর মনোরম,
প্রভাত আকাশ-মাঝে, ম্লান চন্দ্রমার লেখা
তেমতি এখন। ১

কোথা বালকের মন, আশায় উন্মত্ত সেই
চকিত-চঞ্চল,
ভাবী বাসনায় দৃপ্ত, উদ্বেলিত প্রেম-সিন্ধু
সলজ্জ সরল।

বাল্যের সঙ্গিনী যাঁরা, কোথা চলি' গেল সব
হৃদয়-বাসিনী,
কুসুম-স্তবকে দামে, সুসজ্জিতা ফুলময়ী
চিত্ত-বিনোদিনী।

জীর্ণারণ্য এ সংসার, ছিন্ন মরমের গ্রন্থি
ছার গৃহ-বাস,
জ্ঞানেতে নাহিক তৃপ্তি, বিষময় সমুদায়
শূন্য হৃদাকাশ।

স্মৃতির নয়ন কাছে, কিবা দেখিবারে পাই
ভাবী আশাময়,
বিস্তৃত জীবন-মরু, ধূ ধূ করে চারি দিক
বিধি নিরদয়। ২

তবে কেন এ নরকে, বৃথায় কাটাই কাল
মোহ-পরবশে?
যাই চলি যথা সুখ, সৃষ্টির নিভৃত দেশ
প্রাণের হরষে।

গভীর কানন-মাঝে, অনন্ত সাগরে যথা
হইব বিলীন,
নির্ঝর-ঝর্ঝর ধ্বনি; প্রকৃতি-উদাত্ত তাঁব
হেরিব সুদীন।

শরীরে, হৃদয়ে, প্রাণে, একতান, একাগ্রতা
উন্মত্ত আশ্বাস,
রাজিব বিপিন-মাঝে, স্বভাবের প্রিয় অঙ্কে
অমিত উল্লাস।

তুলিব মানব-জাতি, মানবের অভ্যুদয়,
উন্নতি, পতন
কালের কলঙ্ক-রেখা, যশের মোহিনী ছবি
মাণিক কাঞ্চন। ৩

বার, তিথি, দিনমান, শিশির, নিদাঘ-আদি
ঋতুর প্রয়াণ,
পাসরিব সমুদয়, জগতের লীলা খেলা
কাল-পরিমাণ।

মিলিয়া অনন্ত সনে, অনন্ত জীবনে পশি'
দেখিব কেমন,
সৃষ্টির প্রক্রিয়া সব, গ্রহ, উপগ্রহ, তারা,
গতি-আবর্ত্তন।

দেখিব জগত-চিত্র, নিরমল, সুধাময়
অকল্মষ শোভা,
বন, গিরি, প্রস্রবণ, পল্লী, নর-নিকেতন
পূত, মনোলোভা।

দেখিয়া দেখিয়া প্রাণ, ভাসিবে অনন্ত সুখে
প্রমত্ত স্বাধীন,
তবে এই হুতাশন, দারুণ প্রাণের জ্বালা
হইবে বিলীন। ৪

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত।

সমর-শেখর।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"How far less blest am I——?
Daily to pine and waste with care!
Like that poor plant, that, from its stem
Divided, feels the chilling air."—MICKLE.

বর্ষাকাল। বৃষ্টির আরম্ভে রঘুনাথপুরের পথ, ঘাট সমুদায়ই পরিষ্কার ও নবাম্বু-বিধৌত হইয়াছে। গ্রামের পুষ্করিণী, জঙ্গল, খাল, বিল, ও পয়ঃ-প্রণালী সকল নূতন

জলে পরিপূর্ণ। শশিশেখরের পদচ্যুতির সময় হইতে রঘুনাথপুরের রথ্যাগুলির কোন প্রকার সংস্কার সাধিত হয় নাই। সেই জন্য তাহাদের অবস্থা অতিশয় মন্দ। বর্ষার পর বর্ষার তরঙ্গাভিঘাতে সকল পথগুলিই বিকৃত ও বিভগ্ন। কোনটীর এক পার্শ্বের পয়ঃ-প্রণালী রুদ্ধ হওয়াতে, গ্রামিকগণ জল-নির্গমের জন্য তাহার মধ্যদেশ কাটিয়া অন্য পার্শ্বস্থ পয়ঃ-প্রণালীর সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছে। কোনটীর বা এক স্থানের একটী সেতু ভগ্ন হইয়াছে, গমনাগমনের সুবিধার জন্য গ্রামবাসিগণ বাঁশের আঁশে নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর ঘাসের চাপড়া ও মাটির রাশি ঢালিয়া দিয়াছে। কোনটীর বা অঙ্গ ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িত হইয়া অবশেষে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সেই সেই স্থলে বর্ষার জল একত্রিত হইয়া এক একটী ছোট ছোট পুকুরের সৃষ্টি করিয়াছে। পথের দুই ধারে, পয়ঃনালীর উপরি ভাগে, গৃহাদির পার্শ্বদেশে অসংস্কৃত উদ্যান সকলে কচু, চাকুন্দে, বনবিচুটি ও শ্যামাতৃণ প্রভৃতি নানা প্রকার আরণ্য লতা-গুল্মাদি সঞ্জাত হইয়া তত্তৎ-স্থলকে গাঢ়রূপে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। উদ্যান ও বন-বৃক্ষ-রাজির অনন্ত শ্যামিমা, গ্রামের প্রান্তস্থিত শস্য-ক্ষেত্র সকলের নয়ন-স্নিগ্ধকরী হরিত তরঙ্গ-লীলা এবং আতটপূর্ণ জলাশয়-নিচয়ের প্রশান্ত সলিল-শোভা একত্রিত হইয়া প্রাবৃটের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছে।

নিশীথ সময়। উজ্জ্বল তারকারঞ্জিত নীল নৈশ গগনের পূর্ব্ব প্রান্তে সপ্তমীর শশি-কলা ধীরে ধীরে রঘুনাথপুরের প্রান্ত-প্রবাহিনী রুদ্রাণীর তীরস্থিত বিশাল বন-পাদপ-সমূহের দেখা দিল। রুদ্রাণীর প্রশান্ত স্বচ্ছ বক্ষে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িল। পূর্ণকলেবরা রুদ্রাণী সেই প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। উভয় তীরস্থ বৃক্ষ সমূহের নিবিড় কিসলয়াবলী সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-প্রতিভাত হইয়া মন্দ মন্দ বায়ু-সঞ্চারে শর শর শব্দে মন্দ মন্দ নৃত্য করিতেছিল। রঘুনাথপুরের দিকে রুদ্রাণীর একটী বাঁধা ঘাট ছিল। এই ঘাটের প্রশস্ত চত্বর ও সোপানাবলী শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত—স্থানে স্থানে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত। শ্বেত চত্বরের দুই পার্শ্বে দুটী বিশাল বটবৃক্ষ কর প্রসারণ করিয়া পরস্পরকে স্নেহালিঙ্গন করিতেছে। উভয়েরই তলদেশ ইষ্টক-নির্ম্মিত আলবাল-পরিবেষ্টিত। আলবাল জলে পূর্ণ। তৎ-পার্শ্বে জীর্ণ কুসুমোদ্যান। কুসুমোদ্যানে কেবল কয়েকটী কামিনী, করবীর ও চম্পক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশিষ্ট সমুদায়ই বন্য বৃক্ষ। ইহার পর কানন—কাননের পর গভীর অরণ্য ক্রমশঃ গভীরতর হইয়া সুদূর-প্রসারিত রহিয়াছে। রুদ্রাণীর

জলের উপর—তীরের উপর—বৃক্ষরাজির শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, অসংখ্য খদ্যোত, দীপমালার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া বসিতেছিল—নিবিতেছিল—উড়িতেছিল—আবার বসিতেছিল—আর জ্বলিতেছিল। কচিৎ দুই চারিটী বাদুড় ও পেচক ঝট্‌পট্‌ শব্দে বটবৃক্ষের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় উড়িয়া বসিয়া স্বচ্ছন্দে সুপক্ক বটফল ভক্ষণ করিতেছিল, কখন বা কর্কশ চীৎকার করিয়া দূরস্থ বনের দিকে উড়িয়া যাইতেছিল। কোথায় বা আট দশটী শৃগাল একত্র দলবদ্ধ হইয়া আহারান্বেষণে চারি দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া বিকট চীৎকার করিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। হঠাৎ দুইটী শৃগাল খেলা করিতে করিতে দৌড়াইয়া আসিয়া সোপান-চত্বরে বসিল। তন্মধ্যে একটী অপরটীর গাত্র অবলেহন করিতে লাগিল—সহসা নিম্নতম সোপানে কি দেখিয়া দুইটীতেই পলাইয়া গেল। তাহারা কি দেখিল, তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে ভয় পাইল বলিয়াই, পলাইয়া গেল। শৃগাল ত যৎসামান্য। সেই গভীর নিশীথ সময়ে—সেই জনহীন রুদ্রাণী-তটে একটী রমণীমূর্ত্তি দেখিলে অনেক মানবেরও চিত্ত সহসা ভয়াকুল হইয়া উঠিত! এ রমণী কে? কেনই বা এই গভীর রজনীযোগে এ প্রকার বন-প্রদেশে আসিয়াছে? কে জানে—উহার হৃদয় কি প্রকার! রমণী আলুলায়িত-কুন্তলা—নিম্নতম সোপানে উপবেশন করিয়া এক দৃষ্টে রুদ্রাণীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ হস্ত নাভির উপরি-ভাগ বেষ্টন করিয়া সংস্থিত; বাম করতলে কপোলদেশ বিন্যস্ত, ভ্রমর-কৃষ্ণ বিশাল নয়নদ্বয় তটিনী-বক্ষে সংযত। এবং চরণযুগল নিম্ন ভাগে লম্বিত। রমণী এক দৃষ্টে নদীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। স্তিমিত নক্ষত্রালোক-পরিবেষ্টিত চন্দ্ররশ্মি রমণীর দক্ষিণ গণ্ডে পতিত হইয়া ধীরে ধীরে হাস্য করিতেছিল। সেই চিত্র নদী-বক্ষে অত্যন্ত প্রতিফলিত হইতেছিল। শীতল সলিল-কণাপহারী সুমন্দ নৈশ সমীরণ জ্যোৎস্না-স্নাত বিটপি-চয় বিকম্পিত করিয়া রমণীর অলক-গুচ্ছ লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করিতেছিল। সেই গভীর রজনী-যোগে সেই জন-হীন কানন-বিহারিণী—রুদ্রাণী-তটস্থ সোপানোপরি রমণী একাকিনী বসিয়া এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। কি চিন্তা? রমণী কি ভাবিতেছিল? রমণী ভাবিতেছিল—"হায়! এ পৃথিবীতে মানবের জন্ম কেন হইল? হইল ত এরূপ হইল কেন? কেন এক জন মুষ্টি-ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে রোদন করিয়া বেড়াইতেছে? আর কেন এক জন শত সহস্র দাস, দাসী-সেবিত হইয়া মনের আনন্দে কাল যাপন করিতেছে? এ কার্য্য কাহার?—

বিধাতার?—না মানবের আত্ম-কৃত? যদি বিধাতার হয়, তবে ইহাতে তাঁহার কি সুখ? তিনি কি মানবের রোদন দেখিতে ভাল বাসেন? ভীষণ সংসার-সাগরে মানব ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদ-তুল্য। ক্ষণেকে জন্মাইয়া আবার ক্ষণেকের মধ্যেই এ বুদ্বুদ জলেই মিশায়; তবে এ ক্ষণকালের জন্য বিধাতা এ ক্ষুদ্র মানব-জীবনকে এরূপ কঠোর শাস্তি কেন দেন? আর যদি মানবেরই আত্ম-কৃত হয়, তবে কোন্ কার্য্যে আমি হতভাগিনী এ কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি? আমি কি এমন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, তাহার বিষময় ফল আমাকে এ জীবনে ভোগ করিতে হইতেছে? কি দুষ্কর্ম্ম?—এ পৃথিবীতে দুষ্কর্ম্ম কি? এক জনকে ভালবাসিলে—এক জনকে এ সংসারে এক-মাত্র আপনার ভাবিয়া হৃদয়ে স্থান দিলে, কি পাপ হয়?—দুষ্কর্ম্ম হয়?—তবে এ সংসারে সৎকর্ম্ম কি আছে? হায়! আমি দীনা—জ্ঞানহীনা—অনাথিনী। অন্যরূপ সৎকর্ম্ম কি তাহা জানি না;—জানিলেও করিবার ক্ষমতা নাই। আমার অতি সামান্য হৃদয়। এই হৃদয়ই আমার সর্ব্বস্ব। এই হৃদয়ের দ্বারাই যাহা কিছু সৎকর্ম্ম হইবে, আমি তাহাই করিব। আমার এই হৃদয় লইয়া আমি বিজনে বসিয়া হৃদয়েশ্বরের মঙ্গল অনুদিন ধ্যান করিব; কিছুই প্রতিদান চাহি না। চাহিলেও পাইবার আশা নাই; কেন না, আমি অনাথিনী—পথের ভিখারিণী! হায়! আমি কেন জন্মিলাম?—কেন দুঃখিনী হইলাম? যদি দুঃখিনী হইলাম, তবে কেন ভাল বাসিলাম?—যাঁহার যোগ্যা নই, তাঁহাকে কেন ভালবাসিলাম? ভালবাসিলাম যদি, তবে পাইলাম কই?—তবে আমার এ নারী-জন্ম কেন? হায়! আমি অভাগিনী নারীজাতি। লজ্জাই আমাদের কাল। মনের আগুনে দিবানিশি জ্বলিতেছি—তথাপি কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। বলিলেই বা কে ভাল বলিবে? যাহার কাছে বলিব, হয়ত সেই ঘৃণা করিবে—উপহাস করিবে। সেই ভয়ে ঘরে এক বার নাম পর্য্যন্তও করিতে পারি না, পাছে অন্য কেহ শুনিতে পাইয়া প্রমাদ ঘটায়। সেই ভয়ে আজ এই খানে আসিলাম। এক বারও মনের সুখে হৃদয় খুঁজিয়া সেই সুধাময় নাম আজি উচ্চারণ করিব—নতুবা এ গভীর রজনীতে এ ভয়ানক স্থানে একাকিনী আসিব কেন?—এক বার, এক বার সেই নাম—সেই সুধাময়—সেই সতীশ। আকার—কই এখানে ত কেউ শুনিতে পাইবে না?—আবার সতীশ—সতীশ, সতী—সতী—আমার—আমার—আমা সতীশ—এক বার সাধ মিটাইয়া বলিয়া লই—আমার—আমার সতীশ।—না—না আমি কে? আমি ত তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবার যোগ্য নই; নতুবা পারি না কেন? নিদ্রার আশ্রয়ে

যে নাম অনুক্ষণ মনে হয়—সে নাম সাহস করিয়া উচ্চারণ করিতে পারি না কেন?—হায়! হায়, মানব-জীবন—মানবের খেলিবার পুতুল। ইচ্ছা করিলে এ পুতুল এখনি ভাঙ্গিয়া এই রুদ্রাণীর জলে বিসর্জ্জন দিতে পারি; তাহাতে আমায় কে নিবারণ করিবে? হাঁ, তাহাই ভাল। আমার এ জীবন ঢালিয়া দিই না কেন? রুদ্রাণীর রবে স্বর মিলাইয়া অহরহ কল কল নাদে বলিব—আমার সতীশ। আমার—আমার—আমার সতীশ। কেহ বুঝিবে না—কেহ বারণ করিবে না—আমি নিজে বুঝিব—নিজে বলিব—নিজে মজিব।" সহসা রমণী চমকিয়া উঠিল; কে যেন তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল! রমণীর হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল!—রমণী ফিরিয়া দেখিল—শ্বেত-শ্মশ্রুল তাপসমূর্ত্তি!

তাপস বলিলেন, "সুরাঙ্গিণি!"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

'Nae langer she wept;—her tears were a'spent—
Despair it was come, and she thought it content;
She thought it content, but her cheek it grew pale,
And she drooped like a lily broke down by the hale."—AULD ROBIN GRAY.

তাপস বলিলেন, "সুরাঙ্গিণি!"

সুরাঙ্গিণীর মস্তক সহসা ঘূর্ণিত হইল—ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল! তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না! ভূতলাসক্ত নয়নে সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাপস আবার কোমল স্বরে বলিলেন "সুরাঙ্গিণি! —বৎসে! ভয় পাইও না। আমার হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। আমাকে তোমার পুত্র বলিয়া জানিও।" এই সুললিত আশ্বাস-বাক্য মধুর নিক্কণে সুরাঙ্গিণীর কর্ণ-কুহরে ধ্বনিত হইল। তাহার শ্রবণ-যুগল অমৃতসিক্ত হইল। তথাপি সম্পূর্ণ সাহস হইল না। কেবল এক বার তাপসের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—সেই সৌম্যমূর্ত্তি—সারল্যতা-ধার—শ্বেত-শ্মশ্রুল মুখ-মণ্ডলে স্বর্গীয় বাৎসল্যভাব পূর্ণ প্রতিভাত। সহসা সুরাঙ্গিণীর বিশাল নয়ন-দ্বয় অশ্রু প্লাবিত হইল। সে তাপসের চরণতলে প্রণত হইয়া বাষ্প-গদ্‌গদ স্বরে বলিল "দেব! আপনি কে?" তাপস স্নেহ-ভরে সুরাঙ্গিণীর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে উত্তোলন করিলেন এবং কহিলেন, "বৎসে! আমি সামান্য তাপস। কার্য্যানুরোধে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকি। পরোপকার-সাধনই আমার এক-মাত্র উদ্দেশ্য। এক্ষণে তোমার কিছু উপকার করিব—মনস্থ করিয়াছি।"

"প্রভো! আমার কি উপকার করিবেন? আমি জন্ম-দুঃখিনী—এ জীবনে কখন সুখ পাই নাই—পাইবারও আশা নাই। এখন এ জীবন ত্যাগ করিতে পারিলেই এক প্রকার সুখী হই।

পারেন যদি, এই উপকারটি করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন ;—আমার জীবন-বায়ু-রোধ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। না পারেন—অনুমতি করুন, এই রুদ্রাণীর জলে ডুবিয়া মরি।”

তাপস ঈষৎ হাস্য করিলেন; এবং বলিলেন, “তোমরা বালিকা। হৃদয়ে অল্প যাতনা অনুভূত হইলেই একবারে দুঃসহ মনে করিয়া অধীরা হও, এবং ইতস্ততঃ না ভাবিয়া দিবানিশি মৃত্যু কামনা কর।”

সুরা। “না প্রভো, এ অল্প যাতনা নহে। এ যাতনায় আজন্ম পীড়িত হইতেছি, হৃদয়ের প্রতি স্তর তাহার অনলে দগ্ধ হইতেছে। জীবনান্ত ভিন্ন তাহা নিভিবে না। তাই এ জীবন ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি যথাস্থানে গমন করুন—আমার এ সুখে ব্যাঘাত দিবেন না।” সুরাঙ্গিণী সোপানের এক ধাপ নামিয়া দাঁড়াইল।

তাপস ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, “বৎসে! আমার কথা শুন! ইহাতে তোমার উপকার ভিন্ন অনুপকার হইবে না। আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা মহাপাপ।”

সুরা। “আমি অবলা—হীনবুদ্ধি; আপাততঃ পাপ পুণ্য কিছুই জানি না। যাহাতে সুখ হইবে, আমি তাহাই করিব; ভবিষ্যতের জন্য ক্ষণকালও ভাবিব না।”

তাপ। “তুমি নিতান্ত বালিকা—জ্ঞানহীনা। তাই বারংবার মৃত্যু-কামনা করিতেছ। তুমি মনে করিতেছ যে, মরিলে সুখ পাইবে, কিন্তু বল দেখি, মরিলে আর সুখ পাইবার স্থান কোথায়? জীবন এক বার অপগত হইলে, আর কি তাহাকে ফিরাইয়া পাইবে? এক বার ফুরাইলে আর যদি তাহার অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে লোকের ভাবী সুখ পাইবার আশা বা দুঃখ ভোগের আশঙ্কা সফল হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা নহে, ইহ সংসারই মানবের কার্য্য-ক্ষেত্র। যত দিন জীবিত থাকিবে, যাহা করিয়া লইতে পারিবে, তাহাই হইবে; নতুবা মানুষের অন্য প্রত্যাশা কোথায়? জীবন ফুরাইলে সকলই ফুরাইয়া যাইবে।” তাপস দেখিলেন, সুরাঙ্গিণী স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার সুন্দর কপোল-দেশ ক্ষণে ক্ষণে আরক্ত হইতেছে। বুঝিলেন, তাঁহার বাক্য বৃথা ব্যয়িত হইতেছে না। তিনি বলিতে লাগিলেন, “তুমি মনে করিতেছ যে, মরিলে সুখ পাইবে; ইহা তোমার মনের ভ্রান্তি-মাত্র। ভাবিয়া দেখ, জীবিত থাকিতে যাহা পাইলে না, মরিলে তাহা কি প্রকারে পাইবে?—কোথায় পাইবে? কে তোমাকে দিতে আসিবে?—তুমিই বা কোথায় থাকিবে? আজ তুমি যাহার জন্য জীবন ত্যাগ করিতে যাইতেছ,—জীবিত থাকিলে হয়ত

তাহা কাল পাইতে পার—কিম্বা দশ দিন পরে পাইতে পার। তবে অনর্থক কেন মোহে পতিত হইয়া সে সুখের দ্বার আপনিই রুদ্ধ করিতে বসিয়াছ ?”

সুরা। “প্রভো! সুখ কি জানি না; জানিতেও চাহি না।”

তাপ। “যদি জান না, তবে তোমার এ অনুতাপ কেন ? যাহা না জান তাহার জন্য কেন রোদন করিতেছ ? কেনই বা তবে বর্ত্তমান অবস্থায় অতৃপ্ত হইয়া আপনা আপনিই ব্যথিত হইতেছ ? যদি জানিতে চাহ না, তবে কেন মরিতে চাহিতেছ ? বুঝিয়া দেখ, তুমি তাহা জানিতে না বলিয়াই ত মরিতে চাহিতেছ ? বৎসে! তুমি বালিকা চপলস্বভাবা, বুদ্ধিহীনা। সেই জন্য আরও কয়েকটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না।” পিতৃজ্ঞানে এ বৃদ্ধের প্রতি রুষ্ট হইও না।” সুরাঙ্গিণীর হৃদয় আবার সহসা কাঁপিয়া উঠিল, মুখ গভীর আরক্ত হইল, তাপসের মুখের দিকে চাহিতে আর তাহার সাহস হইল না। সে মনে করিয়াছিল, তাপস বুঝি, তাহার অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন নাই; সে যে সতীশের জন্য এই রুদ্রাণীর জলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছিল, তাপস বুঝি তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই জন্যই সে এত ক্ষণ কৌশল করিয়া সে কথা পাড়িতে চাহিতেছিল না। কিন্তু এখন তাহার সে ভ্রম অপনীত হইল। এখন সে বুঝিল, তাপসের কাছে মনোভাব গোপন করা বিড়ম্বনা-মাত্র; কারণ তাপস সর্ব্বজ্ঞ! ইহা বুঝিয়া মনে অত্যন্ত লজ্জা হইল। মনে মনে আপনার মৃত্যু কামনা শত বার করিল। সে হৃদয়ের ভাব জগতের দ্বিতীয় জীবের কর্ণগোচর করিবে না ভাবিয়াছিল, তাহার কি হইল ? তাপস ত তাহা সম্পূর্ণ জানিতে পারিয়াছেন। তবে আর তাহার সে ভাব গুপ্ত রহিল কৈ ? সুরাঙ্গিণীর বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। সে প্রতিমুহূর্ত্তে মনে মনে আপন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল। জগতের সকল বস্তুর প্রতি তাহার অবিশ্বাস হইতে লাগিল। সে ভয়ত্রস্ত নয়নে যে দিকে চাহিল, সেই দিকেই যেন বিশ্বাসঘাতকতা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার প্রতি কুটিল ভ্রূকুটী বিক্ষেপ করিতেছে! যেন সেই নৈশ অম্বর অন্ধকারের মধ্য হইতে এক একটা ভীষণ হস্ত বহির্গত হইয়া তাহার কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধ করিতে আসিতেছে! রুদ্রাণীর দিকে চাহিল, তাহার বোধ হইল যেন রুদ্রাণী তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইতেছে ?—যেন সেই রুদ্রাণীর প্রত্যেক ঊর্ম্মি হইতে সেই রূপ এক একটা হাত বাহির হইয়া তাহাকে ধরিতে আসিতেছে! কোথায় যাইবে ?—কোথায় পলাইবে ?—কে তাহাকে রক্ষা করিবে ? ভয়ে সুরাঙ্গিণীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তাপস তাহা

বুঝিলেন, পাছে সুরাঙ্গিণী মূর্চ্ছিত হইয়া নদী-জলে পড়িয়া যায়, সেই ভয়ে তাহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। তাঁহার হস্তদ্বয় প্রসারিত হইতে না হইতে, হঠাৎ সুরাঙ্গিণী স্খলিত-পদে রুদ্রাণীর জলে পড়িয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ভারত-রত্নোদ্ধার; (অনুষ্ঠান-পত্র)। ইহার উদ্দেশ্য—প্রাচীন ভারতের বিলুপ্ত-প্রায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উদ্ধার সাধন করা। বিষয়টী গুরুত্ব অনুসারে ভারতীয় জাতি-সাধারণের মহোপকারক কার্য্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। বাবু তারিণী প্রসাদ নিয়োগী, বহু শ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া প্রাণপণে আমাদের জাতীয় ভাব রক্ষায় বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে বাঙ্গালার ও ইংলণ্ডের অনেকগুলি পুরুষ-কেশরী এই কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

সার্ উইলিয়াম্ জোন্স-প্রতিষ্ঠিত এসিয়াটিক সোসাইটী অনেক অবশ্য-ব্যবহার্য্য অপ্রচলিত পুস্তকের বহুল প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং তদ্রূপ করিতে থাকিবেন বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে—তাহাতে আমাদের হৃদয়ের সাধ পূরে নাই। এসিয়াটিক সোসাইটী যত টুকু কার্য্যকুশলতা দেখাইয়া পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতের উপকার করিতে হয়—তাহা করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার অপলাপ করিতেছি, এমন কেহ যেন মনে না করেন। সোসাইটীর গতি যত দ্রুততর হওয়া আবশ্যক, ততদূর হয় নাই এবং হইবেও কি না জানি না। আর এক কথা—সোসাইটী গবর্ণমেণ্টের প্রোৎসাহে চলিতেছেন, এ জন্য অর্থের স্বচ্ছলতা বিলক্ষণ আছে—স্বীকার করি; কিন্তু তাহা সভাগণের অনুমোদন-সাপেক্ষ, সুতরাং সীমাবদ্ধ। অনেক স্থলেই শুনা যায়—আসিয়িক সমাজ অতি অপ্রচলিত ধ্বংসোন্মুখ পুঁথির উদ্ধারে অসমর্থ। তাহার কারণ, তাঁহারা রাজকীয় কর্ম্মচারী বলিয়া পুস্তকের অস্তিত্বেরই যথার্থ্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হন। যে সকল গৃহস্থ ব্যক্তিগণের হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তাহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইতে সহসা বিক্রেয় গ্রন্থের মূল্য পাইবে না ভাবিয়া পুস্তক-বিক্রয়ে সম্মত হয় না। অনেক স্থলে আবার পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি-বোধে তদ্বংশীয় অনক্ষর ব্যক্তিরা পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং পুস্তক-প্রাপ্তি এক প্রকার দুর্ঘট হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে উৎসাহশীল পরিশ্রমশালী যদি কেহ অভ্যুত্থিত হইয়া প্রাচীন ভারতে কীর্ত্তি—প্রাচীন ভারতের গৌরবের—

প্রাচীন ভারতের মহত্ত্বের আদর্শ ও সাক্ষী-স্বরূপ বিলয়োন্মুখীন আধুনিক ভারতের আশ্বাস-জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাকে আমরা প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দি; শুধু মুখে ধন্যবাদ দিয়া নিস্তব্ধ বা নির্ব্বাক হইতে চাহি নাই—সাধ্যমত সাহায্যে অগ্রসর হই। সেই জন্য আশীর্ব্বাদ করি, তারিণী বাবুর অভিলাষ পূর্ণ হউক। তিনি ভারতের 'সুপুত্র' নাম লইবার যোগ্যতা লাভ করুন। ভারতীয় ধনিক-বৃন্দ! বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়! আসুন, অগ্রসর হউন। আপনারা মনে করিলে, কি না করিতে পারেন? অতএব উদ্যোগ-কর্ত্তাকে সাহস দিন, সাহায্য করুন। ভারতের কথা বলিব না, একা বাঙ্গালার অসাধ্য কি? বাঙ্গালা উঠিতেছে—প্রাকৃতিক নিয়মে বাঙ্গালা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।

কাব্যহার (পদ্যময় সন্দর্ভ)। শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামি-প্রণীত। চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৷৵০ আনা। এই পুস্তক ভূতপূর্ব্ব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-সম্পাদক বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে উপহৃত হইয়াছে। কাব্যহার পাঠে আমাদের অন্তর-বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে—ভাব-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়াছে। ইহার প্রতি সন্দর্ভ কবিত্বের উজ্জ্বল বর্ণোচ্ছ্বাসে শোভা পাইতেছে। অধিক বাক্যাড়ম্বর করিব না, পাঠকগণকে পুস্তক হইতে কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিয়া শুনাই:—

"ভুল না আমায়" কেন ফুটিলি এ কাননে
গভীর নিলীম রেখা
"কি ছিল বদনে লেখা,
পাশ্চাত্য কুসুম কে রে বঙ্গ-মাঝে আনিল?"
বঙ্গের উদ্যানে কেন হেন ফুল ফুটিল?"

"ভাসমান ছবি" সন্দর্ভে কবি বলিতেছেন:—

লাবণ্যের সরোবরে করিয়া সিনান রে
রূপের গৌরব-ভরে
ডগমগ ভাব ক'রে
ষোড়শী রূপসী ওই ঊষা বিনোদিনী
যবে আসি দেখা দেয় মানস-মোহিনী
সে রূপ দেখিয়া মন
কেন জ্বলে অনুক্ষণ?
প্রেম-মাখা ছবি হেরি কেন রে জীবন
হিংসায় সাগর মাঝে হয় নিমগন?"
"মধুর মধুর প্রেমের প্রবাহ
মধুর মধুর রাগের আবাহ
মরি কি মধুর সুধা জড়িত
গুর্জ্জরী রাগেতে হৃদিতন্ত্রী মম
উঠে রে বাজিয়া বল্লকীর সম
নবীন ভাবেতে হ'য়ে মণ্ডিত।" **

বাহুল্যের জন্য আর তুলিতে পারিলাম না। প্রথম উদ্যমেই বেণোয়ারী বাবুর প্রতিভার প্রতিফলন যখন এমন প্রাণ-মোহন হইয়াছে, তখন তিনি আরব্ধ ব্রত অচিরে উদ্‌যাপন না করিলে, সুকবির আসনে অটল রহিবেন।

A REPORT OF THE BENGAL

NATIVE CHURCH COUNCIL. অক্সফোর্ড মিশন্ প্রেসে মুদ্রিত। ১৮৮১ সালের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ ইহাতে বিবৃত করা হইয়াছে। এতৎ-সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য নাই।

ওলাউঠার চিকিৎসা। জি, পি, রায় কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ॥০ আনা। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিসূচিকা প্রস্তাব সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সম্পাদিত জর্নালে প্রচারিত হইয়া তাহা হইতে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। পরে তদ্বিষয়ে কয়েক খানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। এখানি সেই শ্রেণীরই অন্যতম গ্রন্থ। গৃহস্থ ব্যক্তিগণের জন্য যেরূপ ভাষার প্রয়োজন হয়, গ্রন্থকার সেইরূপ পরিষ্কৃত ও প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন; সুতরাং বলিতে পারি,যাঁহাদের জন্য পুস্তক খানি বিরচিত হইয়াছে, তাঁহাদের উপকারে আসিবে। ইহার মুদ্রাঙ্কণও উত্তম হইয়াছে। প্রণেতা, ইহাতে সংক্ষেপে ভারতে হোমিওপ্যাথি-প্রচারের বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে গিয়া একটি অন্যায় করিয়াছেন। তিনি, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়, হোমিওপ্যাথি-প্রচারের জন্য কত ক্লেশ ও অর্থ-নাশ করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ ডাক্তার সরকারের নামোল্লেখ পর্য্যন্তও কেন করেন নাই, বুঝিতে পারিলাম না। রাজেন্দ্র বাবুর অকপট প্রযত্নে হোমিওপ্যাথির কত দূর প্রচার হইয়াছিল, আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে। তিনি এক জন প্রবীণ সুচিকিৎসক,তাহাও জানি। কিন্তু বিজ্ঞান-চক্ষে দেখিলেও, হোমিওপ্যাথির গুরুত্ব আছে, এটী কেবল ডাক্তার সরকারেরই দ্বারা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নাম উল্লেখ না করিয়া গ্রন্থকার ভাল করেন নাই।

উষাহরণ বা অপূর্ব্ব মিলন*। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। গীতি-নাট্য-পুস্তকের তালিকা-মধ্যে ইহা এক সুন্দর নাট্য-গীতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কৃষ্ণের পৌত্র এবং মদনের পুত্র অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক সুপ্রথিত বাণ রাজার কন্যা-হরণ উপলক্ষ করিয়া উষাহরণ বিরচিত হইয়াছে। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় প্রাচীন হইয়াও, গীতিকা ও পদ্যময় কথোপকথনে নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে।

অশ্রুকুঞ্জ। উক্ত গ্রন্থকার সম্পাদিত। সাহিত্য প্রেস; মূল্য /০ আনা। ইহা এক খান স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত-গ্রন্থ। "জাতীয় সঙ্গীতের" ধরণে "অশ্রুকুঞ্জ" প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে সুন্দর সুললিত গীতিকা সন্নিবিষ্ট আছে। "জাতীয় সঙ্গীতের" তুলনায় ইহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গীত পুস্তক বলিয়া পরিগণিত করা উচিত।

কবিতাহার†; জনৈক হিন্দুমহিলা-প্রণীত। গভীর অন্ধকার মধ্যে আলোক

* সারদাস্বিনী যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ॥১০।

† মিনর্ভা প্রেস; মূল্য।০ আনা।

প্রবেশিলে কত আহ্লাদ হয়, সকলেই জানেন। বঙ্গে এখন অন্ধকারের অবস্থা। এই দুর্দ্দিনে যদি অবরুদ্ধ-মতি প্রতিহত-গতি স্ত্রী-জাতির মনীষা কিয়ৎ পরিমাণেও স্ফূর্ত্তি পায়, তবে কোন্ মনস্বীর না আনন্দ হয়? তাহার উপর, তাঁহাদের হৃদ্বৃত্তির বিকাশ আবার যদি সম্পূর্ণ প্রোজ্জ্বল কিরণ দান করে, তাহা হইলে সে প্রশংসা পাইবার অধিকারীর কত পুণ্য! কবিতাহারের রচয়িত্রী সেই সুখ্যাতিবাদ পূর্ণ-মাত্রায় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রয়াসের ফল—অত্যন্ত আশাপ্রদ। সুকুমার অবস্থা হইতেই তাঁহার রচনা যখন অমৃত-নিঃস্যন্দনী শক্তি পাইয়াছে, তখন পরিপক্ক লেখনী না জানি, বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে আরো কত মহামূল্য জ্যোতিষ্ক সংস্থাপন করিবেন! কবিতাহারে 'ঊষা-বর্ণন,' 'বঙ্গ-মহিলাগণের হীনাবস্থা,' 'শরৎবর্ণন' 'সঙ্গিনীর বৈধব্য' 'লর্ডমেয়োর অপমৃত্যু' পাঁচটী মাত্র সন্দর্ভ নিবেশিত আছে। 'সঙ্গিনীর বৈধব্যে' হৃদয়-ভাব অপ্রতিহত গতি দেখাইয়াছে। দ্বিতীয় সন্দর্ভে গ্রন্থকর্ত্রী সুনিপুণ চিত্রকরের মত তুলিকা-যোগে স্বশ্রেণীর একটী অতি বিশ্বস্ত ছবি আঁকিয়াছেন। স্ত্রী-জাতির আন্তরিক বেদনা যাঁহারা বুঝিতে চাহেন না, সেই কঠোর-প্রাণ পুরুষকে বলি—দেখ, প্রবল পুরুষ! যাঁহাদিগকে অবলা বল, তাঁহারা কি লিখিয়াছেন—এক বার দেখ। আর যে ইয়োরোপীয় জাতি আমাদিগকে রাজদ্রোহী ভাবেন, তাঁহাদিগকে বলি, দেখুন মহাত্মন্! আমাদের অন্তঃপুরচারিণী—আমাদের জননী জাতি আপনাদের রাজত্বে কত সুখিনী—আপনাদের সমবেদনায় কেমন দুঃখিনী!

রচয়িত্রী খণ্ডকাব্য ছাড়িয়া মহাকাব্যে হস্ত প্রসারণ করিলে, প্রথম শ্রেণীর পুরুষ কবিদের সমকক্ষতায় সমর্থ হইবেন।

কবিত্বের উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে কিছু উদ্ধৃত হইল :—

"আহা, কি সুন্দর! ঊষা শশিমুখী,
লইয়া বালাই মরিয়া যাই।
চরাচর বিশ্ব করিবারে সুখী,
বুঝি গো তোমার জনম তাই।

"তব সহচর, মলয় পবন,
ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ কেমন বয়।
পেয়ে তবাদেশ, চপল চরণ,
জাগাই'ছে জীব তরু-নিচয়।

"তব আগমনে প্রকৃতি সুন্দরী,
কি শোভা ধরেছে হায়!
আধ-বিকসিত সরসিজ, মরি
নীলাম্বু-কুণ্ডলে কি শোভা পায়!"

'বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থায়' গ্রন্থকর্ত্রী বলিয়াছেন :—

"যদি কেহ বই পড়ে গৃহের ভিতরে,
ননদি অমনি তায় হেরিয়া অদূরে।
লোহিত লোচনে আসে কাঁপিতে কাঁপিতে
বলে "বই পড়ে বুঝি, যাইবি বিলাতে!"
বিষণ্ণ বদনে হায়! অমনি সুধীরে,
পুস্তক রাখিতে তায় নেত্রে নীর ঝরে।
ভাবে হৃদি দর দর নেত্রের ধারায়,

কিছুই বলিতে নারে মূকসম চায়।
কোন নারী যদি ষষ্ঠি পূজা নাহি করে,
খৃষ্টান বলিয়া তারে করে একঘরে।"

'সঙ্গিনীর-বৈধব্য' সন্দর্ভ হইতে কিঞ্চিৎ শুনাই :—

"অমৃত তরুতে হায়! ছিল রে আশ্রিতা,
দুইটী মুকুল সহ বিধু স্বর্ণলতা।
প্রণয়-উদ্যানে কিবা ছিল রে শোভিতে,
যেন রে সে কল্পতরু নন্দন বনেতে।
সুরপুর-বিহারিণী মন্দাকিনী-তীরে,
শোভিয়া যেমন আহা! জন-মন হরে।
কিম্বা শোভে ঘন-কোলে যেন সৌদামিনী,
তেমতি শোভিতেছিল প্রাণের সঙ্গিনী।
হায়! কে সাধিল বাদ করিয়া বৈরিতা,
উৎপাটি অমৃত তরু ছিন্ন কৈল লতা।
ঘোর টাইফইডাগ্নি প্রবেশি' শরীরে,
আট দিনে কৈল ভস্ম চারু কলেবরে।
সন্ধ্যার সময়ে হ'ল গাভারি গাভারি,
কে জানে যে সে গাভারি যাবারি গাভারি।
তার পর দিনে রোগ হইল প্রকাশ,
মিথ্যা কথা উঠে বসা ঊর্দ্ধনেত্র শ্বাস।"

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ১৭ শ সংস্করণ। স্বাস্থ্য-রক্ষার সমালোচন †।

ইহার প্রণেতা একজন অপ্রকাশিত-নামা। পুস্তিকার মুখবন্ধে নানা ভাবে নানা কথা উল্লিখিত হইয়াছে,—প্রথম দৃশ্যে বোধ হয়, যেন কত ভাল বিষয়ের অবতারণা করিবেন বলিয়া, গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। কার্য্য কিন্তু ইহার ঠিক্ বিপরীত। তিনি যে নিতান্ত লঘুচেতা, পুস্তকের লেখা তাহাই প্রকাশ করিতেছে। তিনি রাধিকা বাবুর ন্যায় ব্যক্তিকে অতি তুচ্ছ লোক বলিয়া মনে করায়, বিলক্ষণ ধৃষ্টতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এক জন গ্রন্থকর্ত্তা কেমন করিয়া এত অসার, অপরিপক, অর্দ্ধ-শিক্ষিত মত সমাজে অভিব্যক্ত করিলেন, বলিতে পারিনা। ইহার আবার মূল্য ১০ পয়সা। এ পুস্তিকা কেহ দুইটী পয়সা ব্যয় করিয়া ক্রয় করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। তবে আমাদের এই কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য যদি কেহ কৌতূহল-পরবশ হইয়া ক্রয় করেন। ইহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালাত্র অভিমতি প্রকটন করা হইয়াছে। হিন্দুপেট্রিয়ট ১৭শ সংস্করণ স্বাস্থ্য-রক্ষার সমালোচনে প্রশংসা করিয়াছেন। এই সমালোচক তাহা লইয়া বিজ্ঞবর পেট্রিয়ট সম্পাদককে কত বিদ্রূপ কত ভ্রূ-ভঙ্গীই করিয়াছেন! এরূপ বালকোচিত মত যতই ব্যক্ত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল।

ঘোড়ার ডিম ও কুপোকাৎ *।

২ নং খোস গল্প ৮০ বীণাযন্ত্রে মুদ্রিত। ঘোড়ার ডিমের ২য় সংস্করণ হইয়াছে। পুস্তকের নামে অনেক অশ্রদ্ধা হইতে পারে, ভিতরে কিন্তু তাহার নাম গন্ধও নাই। পুস্তকে নানাছাঁদে সদুপদেশ

† চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ১০ পয়সা।

* মূল্য /০ এক আনা।

রহিয়াছে। ইহাদের ছন্দ ৺ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের ন্যায় অবিরাম-গতি ও সরল। স্থানাভাবে দৃষ্টান্ত জন্য কিছুই উদ্ধৃত হইল না। পুস্তকের আদ্যন্তে সুরুচি বজায় রাখায় লেখককে ধন্যবাদ দিতেছি। পাঠকগণ এক এক খান ক্রয় করিয়া দেখিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন—নিশ্চয় এক জন স্বভাব-জাত কবির মন হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এরূপ প্রহসনে সমাজের সুশিক্ষা সম্ভব।

সীতাহরণ; শ্রীজয়গোপাল গোস্বামি-প্রণীত; ষ্টানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা। জয়গোপাল বাবু এক জন কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি। তিনি নিজের চেষ্টায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইংরাজীতে যাহাকে Self-made man বলে, আমাদের গোস্বামী মহাশয় সেই শ্রেণীর। স্বনামখ্যাত পুরুষ বলিয়াই তিনি শান্তিপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক-পদ পর্য্যন্তও অধিকারে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার রচিত গণিত-বিজ্ঞান এক খানি গণনীয় গ্রন্থ। গণিত-বিজ্ঞানের বহুল সংস্করণ হইয়াছে। সমালোচ্য পুস্তকের ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বিশদতা ধরিয়া বিচার করিলে, সীতা-হরণকে সাহিত্য-ভাণ্ডারের সুন্দর গদ্য গ্রন্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে সীতাহরণের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস ও শকুন্তলার ন্যায় সীতাহরণের ভাষা অতি প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি-বিকাশিনী।

আরণ্য প্রসূন। (খণ্ডকাব্য) ১৪ নম্বর ডফ্ ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কবিতা-কুসুম একত্রে সম্বদ্ধ। কুসুমগুলি সুদৃশ্য, সুগন্ধি। গ্রন্থকার নূতন মালী। এক এক স্থলে ফুলগুলি সতেজ হইয়া উঠিতে উঠিতে ছিন্ন-দল ও অপ্রফুল্ল হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, পাট ঠিক হয় নাই;—একটু অপরিপক্ক অবস্থাতেই ফুটিয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে দুই স্থলে দুই রকম অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কিছু অস্থির-চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং দুই একটি স্থল পরিত্যক্ত হইলে ভাল হইত। অনেক স্থলের ভাব অপরিষ্কৃত। যাহা হউক কালে অপরিচিত গ্রন্থকার পরিচিত হইবেন, আশা করা যায়। মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য সুচারুই হইয়াছে। কবি উপহার-স্থলে লিখিয়াছেন;—

'সখের বাগানে, সখে, পশিয়া পুলকে,
তুলিয়া ফেলেছি এ যে বন-ফুল, হায়!
কারে দিব তোমা বিনা, কে লইবে আর
কে দেখিবে পরিমল আছে কি না তার!'

করিব আশঙ্কা আর কেহ তাঁহার কুসুমের পরিমল 'দেখিবে' না। আমরা বলি, ফুলের পরিমল লইতে চেষ্টা না করাই ভাল। অমরকোষের মতে,—

"বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জন-

মনোহরে” রগড়াইয়া যে মনোহর গন্ধ পাওয়া যায়, তাহাই পরিমল। কিন্তু ফুল রগড়াইলে প্রায়ই দুর্গন্ধ হয়, শোভা যায়। কবির কথা রক্ষা করিতে গেলে সুদৃশ্য সুগন্ধ কুসুমগুলি নষ্ট হয়!—তাই তাঁহার কথা সম্পূর্ণ শোনা গেল না। আর এক কথা,—আরণ্য-প্রসূন নামের স্বার্থকতা হয় নাই, কবির উপহারের কথা ঠিক সখের বাগানের ফুল,—দেশী বিদেশী সখের কুসুমোদ্যানের কলমের ফুল। অনেক স্থলে সৌখীন হেম বাবুর কবিতা-কুসুমোদ্যানের কলম বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক, কবির ভাবুকতা আছে,—পাঠকের জন্য একটু উপহার দেওয়া গেল ;—

“ মরি ওই বিরহিণী বিচ্ছেদ জ্বালায়
চেয়ে চাঁদে প্রাণে কাঁদে বাসনা অন্তরে
চিকণ চাঁদের গায়ে পারদ মাখায়
সে সুন্দরে দেশান্তরে প্রিয়তমে হেরে !

সুদৃশ্য সুগন্ধি!—বিমর্দ্দন করিয়া দেখ,—দুর্গন্ধ হইবে। একটা স্থল রগড়াইয়া দেখা যাক। আমাদের মিত্রাক্ষর কবিতায় মিলই প্রধান, কিন্তু অন্তরে আর হেরে মিল ভাল হয় না, একাক্ষর মিল মিত্রছন্দের অতিদোষ। তার পর ভাব, চাঁদকে বিরহিণী দেখিতেই ভাল বাসে না, সই বিরহিণী চিকণ চাঁদে পারা মাখাইয়া মুকুর করিয়া প্রিয়তমের ছবি দেখিবে কি রূপে? আর চাঁদ ‘চিকণ’ স্নিগ্ধ। তাহাতে পারদ মাখাইলে, মুকুর হয় না। তাই বলিতেছিলাম, রগড়াইয়া কায নাই!—নয়ন শীর্ষক কবিতাটি সরস কতক মিষ্ট। একটু উদ্ধৃত করিতেছি

“বাঁধিয়া কবরী নারী বাঙ্কিয়া অধরে
বিলাসে আপন ছবি নিরখে মুকুরে
আপন মাধুরী হেন,
আপনি সম্ভোগে যেন,
আপন নয়ন পানে আপনি চাহিয়া
কত কি নিরখে যেন অতৃপ্ত থাকিয়া।’

অন্যত্র—

“কোলের কোমল শিশু মুমূর্ষু শয্যায়
নাভি-শ্বাসে সঙ্কোচিয়া বিকৃত কায়ায়
*   *   *   *
*   *   *   *
চাক চাক দৃষ্টিহীন চেয়ে মুখ পানে,
পলকে পলকে আঁখি স্থির করি আনে
পাতি আঁখি তার পানে ব্যাকুল মাতার
অনিমেষ অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি মমতার,
যতই অন্তর কাঁদে,
ততই নয়ন কাঁদে,
নিরাশ, বেদনা, শোক, সংসার-বিস্মৃতি,
দেখিয়াছি সে নয়নে এককালে স্থিতি!”

স্থূল কথা—এখন যেরূপ অজস্র কবিতা পুস্তক বাহির হইতেছে, এপুস্তক তদপেক্ষা অনেক ভাল! কবিতাপ্রিয় পাঠকগণ পাঠ করিলে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলি। পত্র সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিবার প্রথা বঙ্গে বড় একটা ছিল না। পত্রগুলিতে লেখিকার পতিভক্তির চিহ্ন প্রতিপদেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত বঙ্গীয় শিক্ষিত

মহিলাপুরীতে অবস্থাপিত হয়—আমাদের হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা। পত্রের ভাষা যত সরল হইলে মনোরম হইয়া থাকে যদিও তত সরল না হইয়াছে, তথাপি গদ্য লিখিতে প্রয়াস পাওয়ায় আমরা ধন্যবাদ দি।

আমার জীবনের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কোথায় আসিলাম ?

সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া অশ্বদ্বয় প্রান্তর ও লোকালয়ের মধ্য দিয়া বেগে ছুটিতে লাগিল। কোন্ দিক দিয়া গাড়ি যাইতে লাগিল, কত ক্ষণ আমরা গাড়িতে ছিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। বোধ হয়, পর দিবস প্রাতে যদি কেহ আমাকে এতৎ-সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলেও, আমি কোন সদুত্তর দিতে পারিতাম না। বস্তুতঃ তৎকালে আমি যে অবস্থায় ছিলাম, তাহাকে চৈতন্য কি অচৈতন্য বলিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। অন্তরাত্মা যেন ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল; সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য, কোন অনুভবই রহিল না; বহির্জ্জগত বিলুপ্তপ্রায় হইল। কেবল চক্রের সেই শ্রুতি-কঠোর শব্দ অবিরত শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথা হইতে সে শব্দ আসিতে লাগিল,—স্বর্গ মর্ত্ত্য কি পাতাল হইতে,—তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। এই অবস্থায় কত ক্ষণ অতিবাহিত হইল, বলিতে পারি না। যখন আমরা গাড়ি হইতে নামিলাম। আমার বোধ হইল যুগান্তর হইয়াছে—যেন পূর্ব্ব জন্ম ঘুচিয়া গিয়া আর এক জন্ম হইয়াছে; পৃথিবী ছাড়িয়া আর এক জগতে আসিয়াছি। অবশ্য যুগান্তরও হয় নাই, পৃথিবী ছাড়িয়া অন্যত্রও যাই নাই। সেই জন্ম, সেই কাল দিনের কাল রাত্রি, সেই পৃথিবী। সকলই সেই, কিন্তু যেখানে আসিয়া নামিলাম, সে স্থান বড়ই বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল—কত বিস্ময়কর তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না।

গাড়িতে যত ক্ষণ ছিলাম, তাহার মধ্যে কি হইল না হইল, বলিতে পারি না। আমার কেবল এক কথা স্মরণ আছে। গাড়ির সেই শব্দ—কর্কশ, অবিশ্রাম, আদ্যন্ত একই রকমের। এখনও সেই শব্দ যেন কাণের ভিতরে বাজিতেছে। কিয়ৎ কাল পরে—কত ক্ষণ তাহা বলিতে অক্ষম; এক মুহূর্ত্ত হইতে পারে, এক যুগ হইতে পারে, আমি কিন্তু তাহা জানি না—কিয়ৎ কাল পরে গাড়ির সেই শব্দ ভেদ করিয়া মাতঙ্গিনীর পরিষ্কার কণ্ঠধ্বনি আমার কর্ণে আসিয়া লাগিল। মাতঙ্গিনী কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি তাহাতে চমকিয়া

উঠিলাম। পরক্ষণেই অশ্বদ্বয়ের গতি মন্দ হইল, এবং আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ সেই মোহ দূর হইল। মুহূর্ত্তেক আমি হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম; কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইল, আমি এইমাত্র যেন মহানিদ্রায় সুপ্ত ছিলাম; তবে আবার পুনর্জ্জীবিত হইলাম কেমন করিয়া? মরিয়া কি পুনর্ব্বার বাঁচিলাম? এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে আমি এক বার চারি দিক নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্তু কি দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এই ঘটনার পরে আমি যত বার ইহা স্মরণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, তত বারই আমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। কেবল কতকগুলা স্তূপাকার গৃহচ্ছায়া অবিস্পষ্ট আলোকের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া আমার স্মৃতি-পথে পতিত হয়। তদ্ভিন্ন আমি আর কিছুই দেখিতে পাই না।

আমাদের গাড়ি একটী দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মাতু অগ্রে গাড়ি হইতে নামিল। তাহার হাতে কাপড়ে বাঁধা সেই কি কতকগুলা রহিয়াছে। মাতু তাহা কিঞ্চিৎ লুক্কায়িত ভাবে রাখিল। সে গাড়ি হইতে নামিল, কিন্তু আমার কেমন ভয় করিতে লাগিল। মাতু তাহা বুঝিয়া আমার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে আমাকে নামাইল। আমি গাড়ি হইতে নামিয়া বস্ত্রের—দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। মাতু তাহা দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল 'কাহাকে দেখিয়া ঘোম্‌টা দিতেছ?' কিন্তু আমি মাতুর কথা শুনিলাম না। অবিলম্বে আমরা দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মাতু সজোরে দুই তিন বার কবাটে আঘাত করিল। অমনি বাটীর ভিতর হইতে বিকট হাস্য-ধ্বনি উঠিল। আমি অবাক্ হইয়া মাতুর মুখের দিকে চাহিলাম। মাতুর মুখের উপরে তৎকালে পথের দীপালোক আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোকে দেখিলাম, তাহার ভ্রূদ্বয় আকুঞ্চিত হইয়াছে, তাহার অধর ঈষৎ স্ফীত হইতেছে। অবিলম্বে দ্বারের ভিতর দিয়া জ্যোতি-রেখা দেখা দিতে লাগিল, এবং তাহার পর ক্ষণেই পদধ্বনি শ্রুত হইল। বাটীর ভিতর হইতে তখন একটী স্ত্রীলোক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মাতু আসিলি?—ভাল ত?' মাতু বলিল 'দোর খোল।' অবিলম্বে দ্বারোদ্‌ঘাটন হইল, এবং আমাদের সম্মুখে দুইটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইল। ইহাদের মধ্যে একটী বয়স্থা, অন্যটীর বয়স্ অতি অল্প—ষোল বৎসরের অধিক হইবে না। মাতু বয়স্থাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'দিদি এত হাসি কিসের?' বয়স্থা বলিল—'এ রাত্রিতে আর কোন কথায় কায নাই।' এই স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। তাহাকে দেখিতে ঠিক্ মাতঙ্গিনীর মত, কেবল বয়স

কিছু অধিক হইয়াছে। মাতঙ্গিনীর অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের বোধ হইল বড় হইবে। বালিকার বয়স ষোল বৎসরের অধিক হইবে না বলিয়াছি। তাহারও মুখের সহিত বয়স্থার সাদৃশ্য বিস্তর—তবে এক জনের মুখে পূর্ণ যৌবন খেলিতেছে, আর অপরের মুখে সৌন্দর্য্যের অবশেষ-মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা যাইতে যাইতে পরস্পরের দিকে দুই এক বার চাহিতে লাগিলাম। বয়স্থা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'যাতে তোমার কোন কষ্ট না হয়, গরিবেরা প্রাণপণে তার চেষ্টা প্যবে; তবে গরিবদের ক্ষমতা অতি অল্প।' আমি লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। বালিকা বয়স্থার কথায় সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া বলিল—'কেন ভাই! আমরা দু'জনে একত্রে থাক্‌ব, কথা ক'ব, কিসের কষ্ট?' এই বলিয়া সে আমার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসি হাসিল। সেই হাসির কি মাধুর্য্য!—বহুকাল অতীত হইল, তথাপি সেই হাসি অদ্যাবধি যেন চক্ষুর উপরে খেলিতেছে। বিনোদিনি! হতভাগিনি! তোর জীবনের এরূপ পরিণাম হইবে, তাহা আমি এক দিনের জন্যও কখন ভাবি নাই। বহু কলঙ্কে তোর জীবন কলঙ্কিত হইলেও তোর মুখে কি যে এক মাধুর্য্য দেখিতাম, তাহা আমি জন্মে ভুলিতে পারিব না! তবে তোর এমন পরিণাম হইল কেন! কিন্তু সে কথার এখন প্রয়োজন নাই—সে কথা বলিবার এখনও সময় হয় নাই।

আমরা একটী ক্ষুদ্র সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। সিঁড়ির ধাপ গুলি অতি উচ্চ ও অপ্রশস্ত,—উঠিতে পা কাঁপিতে থাকে। অর্দ্ধেক সিঁড়ি আমরা উঠিয়াছি, এমন সময়ে পুনরায় সেই বিকট হাস্যে বাটী ফাটিয়া গেল। আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাতঙ্গিনী ও সেই বয়স্থা স্ত্রীলোকটী পরস্পরের দিকে খটমটিয়া চাহিল, কিন্তু কেহ কোন্ কথা কহিল না, কি কোন প্রকার মুখ-ভঙ্গী করিল না। কেবল সেই বালিকার মুখে একটু হাসি দেখা দিল—আমার বোধ হইল, সে যেন ঈষৎ লজ্জিত হইয়াছে। দুই এক পা করিয়া আমরা উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার আর তিলার্দ্ধ এমন্ ইচ্ছা হইল না যে, উপরে যাই। ভয় ও বিস্ময়ে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না; কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম 'মাতঃ কি সর্ব্বনাশ করিলে—আনিলে কোথায়?' অবশেষে আমরা উপরে উঠিলাম। উপরে যাইয়া আমি কম্পিত হৃদয়ে চারি দিক দেখিতে লাগিলাম—বোধ হইল, যেন চারি দিকে বিভীষিকা লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে সময়ে মাতঙ্গিনী যদি একটা কথা কহিত, তথাপি মনে একটু ভরসা হইত; কিন্তু

হতভাগিনী কোন কথা কহিল না, কেবল নিঃশব্দে আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। উপরে উঠিয়া আমার আরও ভয় বাড়িল। প্রায় প্রত্যেক ঘরে মিটি মিটি আলোক জ্বলিতেছে, ও দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। দুই একটার ভিতর হইতে এক এক বার অবিস্পষ্ট মনুষ্য-স্বর উঠিতেছে—তেমন বিকৃত স্বর আমি আর কখন শুনি নাই। বলিদানের পূর্ব্বে হতভাগ্য ছাগশিশু যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। মাতু তাহা বুঝিতে পারিল, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া আমার হাত ধরিয়া, কিঞ্চিৎ বেগের সহিত চলিতে লাগিল।

আমরা অবশেষে এক কোণে একটি ক্ষুদ্র ঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মাতু বয়স্থা সেই স্ত্রীলোকটীর কাণে কাণে কি বলিল,—তাহাতে সে বালিকাটিকে লইয়া চলিয়া গেল। কিয়দ্দূর যাইয়া বালিকা বয়স্থাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'বড় সুন্দর,—না মা?' আমি—তাহার এই কথাটি শুনিতে পাইলাম, কিন্তু বয়স্থার কোন প্রত্যুত্তর শুনিলাম না। মাতু এবং আমি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমাদের সমভিব্যাহারিণীদের হস্তে যে প্রদীপটী ছিল, মাতু তাহা ঘরের এক কোণে বসাইয়া রাখিল। এখনও মাতুর মুখে কোন কথা সরিল না। তৎকালে সে শয়নের আয়োজনে কিঞ্চিৎ ব্যস্ত ছিল, বোধ হয়, সেই জন্যই কোন কথা কয় নাই। এই সময়ে আর একটী স্ত্রীলোক দেখা দিল। তাহার বয়স ত্রিশের কম নয়। স্ত্রীলোকটীর কাপড় আলু থালু, গতি স্খলিত। মাতু তাহাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—'তুই এখানে কেন? মরিবার কি আর স্থান নাই?' স্ত্রীলোকটা স্খলিতস্বরে উত্তর করিল—'রাগ করিস্ নি মাতু দিদি, গরিব তোমারই। তুমি যে সোণার পাখীটী পিঁজ্‌রায় ক'রে এনেছ, সেইটী একবার দেখ্‌তে এসেছি। ভয় নেই,—কেড়ে নেব না।' এই বলিয়া সে আমার দিকে আসিল। আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মাতুর কাছে গিয়া আশ্রয় লইলাম। স্ত্রীলোকটা মুহূর্ত্তেক আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'তাই বল্ মাতু দিদি। এতক্ষণে বুঝিছি,—বাজার জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দিতে এসেছ।' মাতু তাহার কথায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কিন্তু আমি তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। 'মারিস্ নি মাতু দিদি, গরিব তোমারই' এই কথা বলিতে বলিতে স্ত্রীলোকটা একটু সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা পাইল, আর অমনি চারি চাপটে মাটির উপরে পড়িয়া গেল—উঠিবার চেষ্টা করিল, পুনরায় পড়িয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার চক্ষু স্থির হইল, ও ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। মাতঙ্গিনী পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া রহিল; হঠাৎ তাহার যেন বাক্‌রোধ হইয়া

গিয়াছে। সেই হতভাগিনীর উপরে তাহার সেই স্থির দৃষ্টি, তাহার চক্ষুতে সেই ঘন ঘন অগ্নি-শিখা, সেই ভ্রূকুটী, সেই আবঙ্কিম গ্রীবা এখনও যেন চক্ষুর উপরে দেখিতেছি,বোধ হইতেছে। মুহূর্ত্তেক পরে সেই স্ত্রীলোকটী পুনরায় দেখা দিল। কোন কথা বলিল না, কোন দিকে চাহিল না, কেবল সেই হতভাগিনীর প্রকোষ্ঠ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল, এবং মাতঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিল।

স্বল্পকাল মধ্যেই চারিদিক নিস্তব্ধ হইল—নিশীথিনী আপনার শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রহরাবশেষে রজনীর প্রতিদিন যে গাম্ভীর্য্য, যে নিস্তব্ধতা, তখনও ঠিক্ তাহাই; কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। মনুষ্যের সুখ দুঃখে, মনুষ্যের ক্রিয়া-কলাপে প্রকৃতির মুখ-শ্রীতে কে কবে বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছে? সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্রকৃতি অনুক্ষণ আত্ম-চিন্তায় (সে চিন্তা বুঝিবে কে!) নিমগ্ন রহিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভব-সাগরে কত রঙ্গ হইতেছে। এক দিকে কোন হতভাগ্য জীবের ভগ্ন তরি জন্মের মত ডুবিতেছে। অন্য দিকে কেহ বা সৌভাগ্য-পবন-ভরে কত দর্পে, কত বিক্রমে বাহিয়া চলিয়াছে। এক দিকে জয়ধ্বনি উঠিতেছে; অন্য দিকে হাহাকার শব্দে গগন ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতির তাহাতে কি আসে যায়? বিশ্ব-বিমোহিনি সুন্দরি! একি তোমার বিচিত্র আচরণ? তোমার মলিন মুখ দেখিলে মনুষ্যের হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হয়। তোমার প্রফুল্লতা দেখিলে মনুষ্য সর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়া যায়। মনুষ্যের জন্য কি তোমার হৃদয় এক বারও কাঁদে না?

কলিকাতা।

'ব্রহ্মাণ্ড দেব! কোথায় আসিয়া পড়িলাম? নাথ! হতভাগিনী দুহিতাকে এ ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা কর।' যৎ-কালে সেই ক্ষুদ্র ঘরের ভিতরে হত-ভাগিনীর অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু হইতে মস্তকের উপাধানে বারি-বিন্দু পতিত হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই কথা গুলি স্বতই মুখে উচ্চারিত হইল, তাহা কি ভয়ানক সময়! ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, সেরূপ বিপদে যেন কোন হত-ভাগিনী কখন পতিত না হয়!

মাতু দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের এক পার্শ্বে একটি শয্যায় শায়িত হইল। অপর পার্শ্বে আর একটী শয্যা ছিল; আমি তাহাতে শয়ন করিলাম। মাতু নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, ঘুমাইল কি না বলিতে পারি না। ক্ষণেক পরে প্রদীপ নিবিয়া গেল, এবং অন্ধকারে চারি দিক আচ্ছন্ন হইল। কি ভয়ানক নিস্তব্ধতা! কি ভয়ানক অন্ধকার! সেই অন্ধকারে আমার নিমীলিত চক্ষুর সম্মুখে সেই

রাত্রির ঘটনাবলি নাচিতে লাগিল। বিস্ময় ও আশঙ্কায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার বোধ হইল, সেই হস্তভাগিনী টলিতে টলিতে আমাকে যেন ধরিতে আসিতেছে। ভয়ে তৎক্ষণাৎ আমি চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, কিন্তু সেই গাঢ় অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। হৃদয় দুপ্ দুপ্ করিয়া বক্ষস্থলে আঘাত করিতে লাগিল—সে শব্দ আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতে লাগিল, কিন্তু নিশ্বাস ফেলিতে ভয় হইল—পাছে তাহাতে শব্দ হয়। কিয়ৎকাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হইল। ক্রমে চৈতন্য ঈষৎ অবিস্পষ্ট হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তেক মধ্যে সে ভাব দূর হইল। তখন দেখিলাম সেই রাত্রির বাস্তব ঘটনাবলীর সহিত কতকগুলি অবাস্তব ঘটনা মিশ্রিত হইয়া একটী নূতন চিত্র অঙ্কিত হইতে ছিল। আবার সেই অচৈতন্য একটু একটু করিয়া দেখা দিতে লাগিল ক্রমশঃ বাড়িল—শরীর শিথিল হইয়া পড়িল—তাহার পর কি হইল জানি না।

পুনরায় যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, দেখিলাম—বেলা অনেক হইয়াছে। মাতঙ্গিনীর বিছানার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। বাটীর অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, যেন বাটীর সমস্তলোক আমাকে একাকী রাখিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। তখন আমি গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার উপর বসিয়া রহিলাম। গত রাত্রির ঘটনাবলীতে ক্রমশঃ মন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইল। এমন একবারও মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি কি পদবিক্ষেপ শব্দ হইল না যে তদ্দ্বারা অন্তশ্চক্ষু পুনরায় বহির্জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিয়ৎকাল পরে মাতঙ্গিনী আসিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম তাহা চিরকাল যেমন প্রফুল্ল ও সহাস্য, পুনরায় তদ্রূপ হইয়াছে। গতরাত্রির ভাব তাহাতে কিছুমাত্র নাই। মাতু হাসিয়া বলিল 'এখানে বসে কি হচ্চে? ঘরের ভিতরে বসে কি কল্কাতা দেখ্‌বে? চল ছাতের উপরে চল।'

এই বলিয়া মাতঙ্গিনী আমাকে ছাদের উপরে লইয়া চলিল। ইতিপূর্ব্বে আমি কখন কলিকাতা দেখি নাই। সুতরাং সেই মনোহর বিশাল দৃশ্য সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় কোন্ দিকে চাহিব, কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। যে দিকে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকই অট্টালিকায় পরিপূর্ণ। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, চারিদিকে কেবল কাতারে কাতারে সংখ্যাতীত প্রাসাদমণ্ডলী রহিয়াছে—এক তিলও কোথাও অবকাশ নাই। মধ্যস্থল হইতে চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া কেবল প্রাসাদের পর প্রাসাদ, তাহার পর প্রাসাদ, ইত্যাদিক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অট্টালিকা স্তূপে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া

রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটা নারিকেল ও বট বৃক্ষের অগ্রভাগ সন্নিকটস্থ প্রাসাদ-শেখরকে অতিক্রম করিয়া উঠায় সেই শ্বেত পাটল দৃশ্য শ্যামল শোভায় বিচ্ছুরিত হইয়াছে। চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া এক একবার বোধ হইতে লাগিল যেন এক বিচিত্র প্রাসাদ-দ্বীপ ঐন্দ্রজালিক বলে ব্যোম সাগরে ভাসমান রহিয়াছে। স্থলে স্থলে বিশেষতঃ উত্তরাংশে, পর্ব্বত প্রায় এক একটা স্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে, ও অনবরত কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতেছে। দক্ষিণভাগে অত্যুচ্চ মন্দির চূড়া সকল সুশ্বেত অঙ্গে বালার্ক রশ্মি মাখিয়া ব্যোমদেশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে, এবং সুনীল আকাশ-পটে অপূর্ব্ব শোভায় চিত্রিত রহিয়াছে। পশ্চিমদিকে প্রাসাদ-প্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে শত শত মাস্তুল শাখা-পল্লব-শূন্য অরণ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পূর্ব্বভাগে প্রাসাদ-সংখ্যা ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিয়াছে; ক্রমশঃ সংখ্যাতীত হইতে দুই চারিটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে;—এবং অবশেষে গগনস্পর্শী নারিকেল-বহুল নিবিড় শ্যামল কান্তার রেখায় বিলীন হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া আমার হৃদয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। কল্য নিশারম্ভে কোথায় ছিলাম, আর সেই নিশার অবসান না হইতে হইতেই বা কোথায় আসিলাম; সেখানে না আসিতে আসিতে কি ভয়ানক ব্যাপার সকল দেখিলাম; ইত্যাদি কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইলাম। মাতঙ্গিনী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে আমাকে সম্বোধন করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা দেখাইতে লাগিল—"ঐ দেখ দক্ষিণে মণিমণ্ট। উহা এখান হইতে একটী বড় থামের মত শুধু দেখাইতেছে, কিন্তু উহা এত উচ্চ যে উহার উপরে উঠিলে পৃথিবীর এক দিক্ হইতে অপর দিক্ অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়। উহার উত্তরে লাটসাহেবের বাটী। লাট সাহেবের বাটীর দেয়াল ও মেজে হীরা দিয়া বাঁধান, তাহাতে এত আলো হয় যে, রাত্রিতে অন্য আলোর আর প্রয়োজন থাকে না। পশ্চিমে ঐ দেখ, কত জাহাজের মাস্তুল দেখা যাইতেছে। ঐ সব জাহাজ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিলাতে যায় এবং সকাল না হইতে হইতে পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসে। মাতু আবার বলিতে লাগিল—'চাহিয়া দেখ চারিদিকে কাতারে কাতারে কত বাড়ী রহিয়াছে। এখানে কত লোকরই যে বাস, তাহা কেহ বলিয়া উঠিতে পারে না।—সকলেই সুখী। যাহার যে ইচ্ছা, সে তাহা করিতেছে; কোন কথা বলিবার কেহ নাই। আমার প্রাণে যাহা ভাল লাগিবে, আমি তাহা করিব'—বলিতে বলিতে মাতু আমার দিকে গভীর-অর্থযুক্ত মর্ম্মভেদী এক কটাক্ষবিক্ষেপ করিল, আমি তাহার

অর্থ বুঝিলাম না “তোমার তাহা সহ্য না হয়, চক্ষু বুজিয়া চলিয়া যাও। এই পর্য্যন্ত, তোমার সহিত সম্বন্ধ। কোন কথা বলিবার তুমি কে? এমন স্থান বোধ হয় স্বর্গেও নাই!’—যখন যাহা চাহিবে, তখনই তাহা হাতের ভিতরে। চারিদিকে আমোদ আহ্লাদ ভিন্ন অন্য কথা নাই। আবার সেই কটাক্ষ!—‘বার মাস ত্রিশ দিনের উৎসব ছাড়া এক দিন নাই। যদি সব খোয়াইয়া এখানে থাকিতে হয় সেও ভাল, তথাপি এমন স্থান ছাড়িতে নাই। ধন্য সহর কলিকাতা!—কলিতে তুমিই ইন্দ্রালয়। তোমাকে যে না দেখিয়াছে, তাহার জন্মই বৃথা!’

এই রূপে মাতঙ্গিনী কলিকাতার প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং আমি অবাক্ হইয়া এক মনে তাহা শুনিতে লাগিলাম ও মাঝে মাঝে এক একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। তখন বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল। শীতকালের সকাল; সুতরাং তীক্ষ্ণ উত্তুরিয়া বাতাস হু হু করিয়া ছাদের উপর দিয়া বহিতেছিল। সেই শীতল বাতাসে সূর্য্যের উত্তাপ যে কি মিষ্ট লাগিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমরা সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ছাদের উপরে বসিয়া রহিলাম। মাতু খানিক এ ও পাঁচ কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু আমি মাতুকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব করিব করিয়, বলিতে পারিতেছিলাম না। অনেকক্ষণের পর আমি তাহাকে বলিলাম—‘মাতু তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। সত্য বলিবি ত?’

মাতু—‘কেন কখন কি তোমার কাছে কোন কথা লুকাইয়াছি?

আমি—‘না, তা আমি বল্‌ছি নি। কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করিব, তার ঠিক্ উত্তর দিবি ত?’

মা। ‘কি বলিবে বল না।”

আ। আচ্ছা যথার্থ করিয়া বল দেখি আমরা কোথায় আসিয়াছি।’

মাতু হাসিয়া উঠিল—‘এমন হাবা মেয়ে যদি আর ত্রিভুবনে দেখেছি। কেন, রাত্রিতে পাগ্‌লীকে দেখে বুঝি ভয় হয়েছে? কি বিপদ!—এযে আমার বোনের বাড়ী। কাল রাত্রিতে আমরা যখন এলেম, আমার বোন্‌কে দেখ্‌লে না? আর সেই যে একটী ছোট মেয়ে, সে আমার বোন্‌ঝি। তার নাম বিনোদিনী।’

আ—‘যে পাগলের কথা বলিলি, সে কি রকম পাগল?’

‘আহা তার কথা আর জিজ্ঞাসা করো না!’—মাতু করুণস্বরে বলিল। পরদুঃখে মাতুর হৃদয় গলিয়া গেল। ‘আহা তার বাই রোগ আছে! মাঝে মাঝে যখন সেই রোগ চাগায়, তখন ঐ রকম করে ব’কে মরে। পরমেশ্বর মানুষকে যে কত ব্যাধি দিয়েছেন, তার ঠিকানা কি!”

গত রাত্রিতে যাহাকে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছিল, মাতুর মুখে তাহার এই বিবরণ শুনিলাম। কিন্তু তথাপি আমার সন্দেহ দূর হইল না। মাতু অবশ্য মিথ্যা কথা কহিতেছে না, কিন্তু তাহা হইলেও আমার মনের ভিতরে কেমন এক প্রকার অপ্রত্যয় জন্মিল। তখন আমি সে সম্বন্ধে আর কোন কথা না কহিয়া, বিনোদিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম—

'বিনোদের শ্বশুর-বাড়ী কোথায়?'

মাতু—'আহা ওকথা আর বোল না! অভাগিনীর কপাল অনেক দিন ভেঙ্গেছে। বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে, সে সব দায়ি মিটে গেছে!—দেখো, একথা যেন তার কাছে পেড়ো না।' মাতু! যথার্থই বলিয়াছিলি 'অভাগিনীর কপাল অনেক দিন ভাঙ্গিয়াছে।'—যে সময়ের কথা বলিতেছি, ইহার অনেক পূর্ব্বে হত-ভাগিনী বিনোদিনীর অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছিল। যে দিন তাহার জন্ম হয়, সেই দিনেই তাহার অদৃষ্ট ভাঙ্গে। কিন্তু ইহার মূলীভূত কারণ কে?—যাহার দ্বারা সে পৃথিবী দেখিল,—যে নাম 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' বলিয়া পরিচিত!—কি ভয়ানক!

এই সময়ে নীচে সিঁড়ির ভিতর হইতে মৃদুমন্দ বীণা-ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর, অস্ফুট অবিস্পষ্ট, হৃদয়-বিমোহিনী গীত-ধ্বনি শ্রুত হইল। তাহাতে স্বতঃই মন ও দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। অবিলম্বে বিনোদিনীর হাসি হাসি মুখখানি দেখিতে পাইলাম, সেই সংগীত মৃদু হাসিতে মিলাইয়া গেল। বিনোদিনী বলিতে বলিতে আসিল—'মাসি তুই কি কেবল একলা নিয়ে থাকৃবি? আমাদের কি দেখ্তে দিবি নি?' মাতু বলিল—'কেন মা, এই যে এখানে এসে যত পার দু'জনে কথা কও না। আমরা বুড়ো হাবড়া মানুষ; নীচে গিয়ে কায কর্ম্ম দেখিগে।' এই কথা বলিতে বলিতে মাতু, বিনোদিনী আমার কাছে আসিবার পূর্ব্বে, কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল; এবং তাহার কাণে কাণে কি কথা বলিয়া চলিয়া গেল। আমার বোধ হইল, মাতু যেন বিনোদকে কোন বিষয়ে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু সে কি যে বলিল, তাহা আমি সবিশেষ বুঝিতে পারিলাম না।

বিনোদিনী আমার কাছে আসিয়া বসিল। 'সিঁড়িতে গান গাইতেছিল কে ভাই?—তুমি এমন গাইতে পার?—আহা কি সুন্দর!' বিনোদিনী কোন উত্তর না করিয়া, একটু হাসিতে হাসিতে তাহার সেই সুন্দর সুগোল হাত-খানি দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল; তাহার সেই প্রফুল্ল মুখখানি আমার মুখের কাছে আনিল ও মুহূর্ত্তেক সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—'তোমার নাম কি ভাই?' আমি (একটু লজ্জিত হইয়া) আমার নাম বলিলাম। বিনোদিনীর সেই সুন্দর

সুগোল হাত-খানি পুনরায় আমার গলা বেড়িয়া ধরিল—'বেস্ নামটি ভাই।—তুমি যেন আমার দিদি; আজ থেকে তোমাকে আমি 'দিদি বলে ডাক্‌ব, কেমন?' আমার প্রাণের ভিতরে কেমন করিয়া উঠিল, ও আমার বাহুদ্বয় আপনা হইতে বিনোদিনীর কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিল।—'বিনোদ! বিনোদ!—' হায় হতভাগিনীর কপাল যে অনেক দিন ভাঙ্গিয়াছে!

এই প্রথম পরিচয়-জনিত আবেগ প্রশমিত হইলে, দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া ছাদের উপরে বেড়াইতে বেড়াইতে বিনোদিনী কত গল্প করিতে লাগিল। পরে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল।—

'দিদি এর আগে কি কখন তুমি কলিকাতায় এসেছিলে?'

'না ভাই, আমি আর কখন আসি নি; তাই আমাকে মাতু ছাতের উপর থেকে কলিকাতা দেখাতেছিল।'

'বটে!' বিনোদ হাসিয়া উঠিল। 'তা ঘরের ভিতরে ব'সে কলিকাতার কি দেখ্‌বে? চল এক দিন এক খানা গাড়ী ক'রে কতকটা ঘুরে আসিগে।'

'সে কি ভাল দেখাবে?'

'মন্দই বা কিসে?' বিনোদ আমার মুখের উপরে চাহিয়া রহিল, কিন্তু আমি তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

'আমরা চুরি না ডাকাতি কর্‌তে যাব যে, তা ভাল দেখাবে না?'

'দেখ বিনোদ কাল রাত্রিতে সেই যে মেয়ে মানুষটা'—

'কে নিস্তার মাসি?' বিনোদের মুখে একটু হাসির রেখা দিল।

'তা হবে। মাতু বলিল, তার বাই রোগ আছে, মাঝে মাঝে সেই রোগ চাগায়।'

এবার বিনোদ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। 'মাঝে মাঝে কেন, প্রায়ই চাগায়। কলিকাতায় ও রোগ অনেকের আছে।' এই বলিয়া সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, ও হাসিতে লাগিল। আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—'না ভাই! সত্য করিয়া বল না!'

'সত্য না ত কি মিথ্যা বল্‌ছি।' বিনোদ আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, ও আমার হাত ধরিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া গেল।

'চল নীচে চল। বড় গা জ্বালা করিতেছে, আর রৌদ্রে থাকিতে পারি না।' তখন আমি বিনোদিনীর সহিত ছাদের উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম।

শ্যাম—

নাটক-চন্দ্রিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নাট্য-পরিশিষ্ট।

যাঁহারা আলঙ্কারিক, তাঁহারাই নাট্য-শাস্ত্র-প্রণেতা। কিন্তু, পূর্ব্বতন আলঙ্কারিকগণ প্রথমে যখন অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহই অলঙ্কার-শাস্ত্রে আপনাদিগের কোনরূপ একটী স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই।

কবিদিগের কাব্য-রচনাপ্রণালী ও নাটককারদিগের দৃশ্যকাব্যে রসের স্রোত এবং ভাবের প্রবাহ দেখিয়া, সেই সকল কাব্য ও নাটকাদি-গত রস এবং ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কবিদিগের কাব্যগত রসস্রোত ও ভাবপ্রবাহ তাঁহাদিগকে যে দিকে লইয়া গিয়াছে, তাঁহারা গা ভাসাইয়া সেই দিকেই চলিয়া গিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা রস ও ভাব এই দুইএর উপেক্ষা করিয়াও ব্যঙ্গ্যোক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। এক জন আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—"সব্যঙ্গ মুত্তমং কাব্যমব্যঙ্গ্যমধমং স্মৃতং। কিঞ্চিৎব্যঙ্গ্য-সমাযুক্তং, মধ্যমং পরিকীর্ত্তিতং॥"

ভাবের গৌরব থাকুক, আর না থাকুক, কোনরূপ শ্লিষ্ট রচনা দেখিলেই, তাঁহারা একেবারে বিমোহিত হইতেন। এই নিমিত্তই তাঁহারা দ্ব্যর্থ কিম্বা অর্থত্রয়-বাচী কাব্যের অত্যন্ত আদর করিয়া গিয়াছেন।

যদি বিলোমকাব্য কি দ্ব্যর্থ-ঘটিত কাব্য অথবা যমক-কাব্য উৎকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে, রামকৃষ্ণ বিলোমকাব্য, রাঘব-পাণ্ডবীয় ও নলোদয় কাব্য, লোকের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী হইত। কালিদাস-প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও রঘুবংশ যেরূপ আদরের সামগ্রী, নলোদয় সেরূপ নহে। কারণ, যমকের অনুরোধে তাহার অর্থ অত্যন্ত জটিল এবং তাহাতে রসভাবেরও তাদৃশ গৌরব নাই; সুতরাং উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া নলোদয়কে কেহই তত আদর করে না।'

নাট্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রথম সূত্র-কার মহাত্মা ভরত মুনি। তিনি প্রথম সূত্রকার বলিয়া তাঁহার প্রণীত নাট্য-শাস্ত্রে ও অলঙ্কার-সূত্রে অনেক অসঙ্গত কথা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তার পর এদেশে যে সকল আলঙ্কারিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও মুনিবরের অনুগামী হইয়া চলিয়াছেন; নিজের একটীও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারেন

নাই। তাঁহারা কেবল পরস্পরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া কাল কাটাইয়াছেন; সামাজিকগণের আনন্দবর্দ্ধক কাব্য নাটকাদির উন্নতি কিসে হয়, তাহার কোন চেষ্টাই করেন নাই। হনূমানের গন্ধমাদন উৎপাটন, অগস্ত্যের সমুদ্র-শোষণ প্রভৃতি নিতান্ত অস্বাভাবিক বাক্য লইয়া যাঁহারা কাব্য-নাটকাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

কাব্যের যথার্থ লক্ষণ যে কি, তাহা স্থির করিতে গিয়া, অনেকে অনেকরূপ বিচার করিয়াছেন। অনেকে অনেকের কাব্য-লক্ষণে দোষারোপও করিয়াছেন। যথার্থ কাব্য যে কি, তাহা সহজ করিয়া কেহই বলেন নাই।

এক জন আলঙ্কারিক, কাব্যলক্ষণ-সম্বন্ধে এই সূত্র করিয়াছেন "কবিবাক্ নির্ম্মিতং কাব্যং" আর এক জন এই বলিয়া তাহাতে দোষারোপ করিয়াছেন "কবির বাক্য যদি কাব্য হইত, তাহা হইলে, কবির সকল কথাই কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিত।"

মহাত্মা মম্মটভট্ট কাব্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবলঙ্কৃতৌ পুনঃ কাপি" অর্থাৎ যে শব্দার্থ নির্দ্দোষ, সগুণ ও অল্প-অলঙ্কার-বিশিষ্ট তাহার নাম কাব্য।

দোষদাতা এ লক্ষণকেও এই বলিয়া দোষ দিয়াছেন যদি, অদোষ শব্দার্থ সগুণ ও অল্প-অলঙ্কার-বিশিষ্ট হইলে, কাব্য হয়, তাহা হইলে 'কুরঙ্গ-নয়না' এই বাক্যটী কাব্য মধ্যে গণ্য হইত। কারণ, কুরঙ্গ-নয়না বাক্যটী অদোষও বটে এবং অল্প-অলঙ্কার-বিশিষ্টও বটে। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং" উক্ত দোষদাতা ইহাতেও এই দোষ দিয়াছেন, রসাত্মক বাক্য যদি কাব্য হয়, তাহা হইলে "গোপীভিঃ সহ বিহরতি কৃষ্ণঃ" এ বাক্যটী কাব্য বলিয়া গণ্য না হয় কেন? কাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই রূপে কেবল বিবাদ করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ যে কি, তাহা কেহই বিশদরূপে লেখেন নাই।

ইনিও ব্যঙ্গোক্তিকে উত্তম কাব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

'উত্তমং ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে
মধ্যমে তত্র মধ্যমং।
অবরং তত্র নিষ্পন্ন
ইতি ত্রিবিধমাদিতঃ॥"

ধ্বনি শব্দের অর্থ ব্যঙ্গ। ইনি ব্যঙ্গোক্তিকে উত্তম কাব্য বলিয়া, শেষে আবার উত্তমোত্তম কাব্য বলিয়া আর একটী শাখা বাহির করিয়াছেন। ইনি বলেন—ধ্বনি হইতে আর একটী ধ্বনি বাহির হইলে, তাহাকে উত্তমোত্তম কাব্য বলা যায়। এই ধ্বনি লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বিশদরূপে কেহই কোন লক্ষণ করেন নাই। ফলতঃ যে মহাত্মা বলিয়াছেন—"রসভাব-বিশিষ্ট লোকোত্তর চমৎকার-

কারক রচনার নাম কাব্য” তিনিই আমাদের নিকট পূজনীয় ও গরীয়ান্ আলঙ্কারিক।

অধিক আর কি বলিব, প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ধ্বনি লইয়া এত আলোচনা করিয়াছেন যে, মহাত্মা অভিনবগুপ্ত পাদাচার্য্য কেবল ধ্বনি সম্বন্ধে বিচার করিবার নিমিত্ত ধ্বন্যালোক নামে এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেবল ধ্বনিসম্বন্ধে অত কথা লিখিবার তত প্রয়োজন ছিল কি না তাহা ধ্বন্যালোক গ্রন্থ পাঠ না করিলে এক জনকে বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার।

ফলতঃ যে সকল কাব্যে বা নাটকে রস ও ভাবের প্রাচুর্য্য আছে কিন্তু ব্যঙ্গ্য নাই, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে উত্তম কাব্য বলিতে সাহস করেন নাই; সুতরাং এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে—অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্র করিবার সময়ে পূর্ব্বতন গ্রন্থকারেরা হয় ভয়ে, না হয় গুরু-গৌরবের সম্ভ্রম-রক্ষার নিমিত্ত অলঙ্কার গ্রন্থে আপনাদিগের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই।

কবির কাব্য সরসই হউক আর বিরসই বা হউক, যাহাতে ঐ কাব্য অক্ষুণ্ণ থাকে, পূর্ব্বতন আলঙ্কারিকেরা তাহারই বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং নাটকাদি দৃশ্য কাব্যে আধুনিক রুচি অনুসারে অনেক দোষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

‘লক্ষ্মী স্বয়ম্বর’ নামক এক খানি অপূর্ব্ব নাটক পুরাতন কবি ভরত সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করেন। ঐ নাটক চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব, দেবর্ষি নারদ, মহাত্মা তুম্বুরু ও উর্ব্বশী প্রভৃতি দিয়া রমণীগণ দ্বারা ইন্দ্রের সভায় অভিনীত হইত।

লক্ষ্মী স্বয়ম্বর নাটক এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয়, ঐ নাটকের রচনা প্রণালী ও কলা-কৌশল দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলে তৎপরে মহাত্মা ভরত মুনি প্রথম নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

সেই নাট্যশাস্ত্রের সূত্র ও প্রণালী দেখিয়া, কবিবর শূদ্রক নৃপতি মৃচ্ছকটিক নামে প্রকরণের প্রথম সৃষ্টি করেন।

লক্ষ্মী স্বয়ম্বর নাটকের পর একেবারে প্রকরণ নামক দৃশ্যকাব্যের প্রথম সৃষ্টি দেখিয়া ইহা অনুমিত হইতে পারে যে, মুনিপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রোক্ত প্রকরণের লক্ষণ না দেখিলে একবারে প্রকরণের সৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। যদিও হয়, তাহা হইলে, প্রকরণের সূত্রের সহিত এত মিল কখনই থাকে না।

শূদ্রক নরপতি কালিদাসের পূর্ব্বতন কবি। প্রায় ৩০০০ সহস্র বৎসর অতীত হইল, এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া অবন্তী দেশকে সমুজ্জ্বল করেন। ইহাঁর প্রণীত প্রকরণে বিস্তর প্রাচীন রীতিনীতির বিষয় উল্লিখিত আছে। শূদ্রক নৃপতি এই প্রকরণ-খানি প্রস্তুত করিয়া তৎপরে আপন পুত্রকে রাজা করিয়া একটী অশ্ব-

মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং ১০০ বৎসর বয়সে সেই যজ্ঞাগ্নিতে প্রবেশ করিয়া তনুত্যাগ করেন। প্রমাণ যথা—

"ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথকলাং বৈশিকীং হস্তি-শিক্ষাং, জ্ঞাত্বা শর্ব্ব প্রসাদাদ্‌ব্যপগত তিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য। রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরম সমুদয়ে নাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা, লব্ধা চায়ুঃ শতাব্দং দশ দিন সহিতং শূদ্রকোহগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

ইহার পর উজ্জয়িনী প্রদেশে মহাকবি কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন। কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের মধ্যে প্রধান রত্ন বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। এই মহাত্মার অমৃতোদ্‌গারি-লেখনী হইতে তিন খানি দৃশ্যকাব্য বিনির্গত হয়; উক্ত তিন খানির নাম—মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল। এই কয়খানি গ্রন্থের রচনা প্রণালী ও গুম্ফন কৌশল দেখিয়া বোধ হয় যে, প্রথমে গ্রন্থকার মালবিকাগ্নিমিত্র, দ্বিতীয় বারে বিক্রমোর্ব্বশী ও তৃতীয় বারে অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক নাটক রচনা করেন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর গত হইল, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভায় বিরাজমান ছিলেন।

মহাত্মা ভরতপ্রণীত নাট্য শাস্ত্রের অনেক লক্ষণই প্রায় এই কয় খানি দৃশ্যকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুনিবর ত্রোটক নামে রূপকের যে রূপ লক্ষণ করিয়াছেন, কবিবর কালিদাস সেই সমস্ত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া বিক্রমোর্ব্বশী নামক ত্রোটকের অবতারণা করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞান শকুন্তলও ঠিক ঐরূপ অর্থাৎ ও দুখানিও নাটকলক্ষণের ঠিক অনুগামী। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আলঙ্কারিকদিগের ন্যায় কবিগণও স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে আপনাদিগের স্বাধীনমত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই।

মুনিবর যে যে স্থানে যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, কবিগণ তাহার কোনরূপ বিচার না করিয়া, সেই সকল নিয়মকে আশ্রয় করত নাটকাদি দৃশ্যকাব্যের রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রায় নিরঙ্কুশ হইতে পারেন নাই। মুনি নাটকের লক্ষণে লিখিয়াছেন, "পঞ্চাদিকা দশপরা স্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" অর্থাৎ নাটকে পাঁচ অঙ্কের কম ও দশ অঙ্কের অধিক অঙ্ক না থাকে, যদি কোন নাটককর্ত্তা ইহার অন্যথা করেন, তাহা হইলে তাঁহার নাটক নাটকের মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

এই নিমিত্ত কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল নাটককারই ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন অর্থাৎ কোন নাটকই চারি অঙ্কে বা একাদশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

নাটকে দশ অঙ্কের অধিক অঙ্ক করিবে না, একথা লিখিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে অধিক অঙ্কে নাটক গুম্ফিত

হইলে এক রজনীতে উহার অভিনয় কার্য্য সমাহিত হইবে না ভাবিয়া, মুনিবর ঐরূপ নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু একাদশ অঙ্কে বা দ্বাদশ অঙ্কে নাটক পরিসমাপ্ত হইলে যদি তাহার অভিনয় কার্য্য উপযুক্ত সময়ের মধ্যে অভিনীত হইয়া উঠে, তাহা হইলে একাদশ অঙ্কে নাটক লিখিবার বাধা কি?

যখন চারি অঙ্কে পরিসমাপ্ত ত্রোটকের ও দুই অঙ্কে উপসংহৃত প্রস্থান নামক রূপকের অভিনয় কার্য্য উপযুক্ত সময়ের মধ্যে অনায়াসে সমাপ্ত হইতেছে, তখন তিন অঙ্কে বা চারি অঙ্কে পরিসমাপ্ত হইলে নাটকের অভিনয়ে কেন বিঘ্ন হইবে? নাটকের লক্ষণে এইরূপ ভূরি ভূরি অনুচিত নিয়ম লিখিত হইয়াছে। সেগুলির উল্লেখ করিতে গেলে অনর্থক প্রস্তাব-বাহুল্য হইয়া পড়ে এজন্য উপেক্ষিত হইল।

কালিদাস জন্মিবার প্রায় ১১০০ শত বৎসর পরে মহাকবি ধাবক কাশ্মীর দেশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ধাবক কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ হর্ষদেবের সভায় ছিলেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই মহাকবি-প্রণীত দুই খানি দৃশ্যকাব্য প্রথমে কাশ্মীরাধিপতির সভায় অভিনীত হয়। সেই দুইখানির মধ্যে প্রথম খানির নাম নাগানন্দ ও দ্বিতীয় খানির নাম রত্নাবলী।

হর্ষদেব সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশের প্রথমেই লিখিয়াছেন যে, অনেক অর্থ দিয়া ধাবকের নিকট হইতে উক্ত দৃশ্যকাব্য দুখানি লইয়া আপনার নামে প্রচারিত করেন এবং সেই সময়ে উক্ত নাটক ও নাটকার প্রথমে—

"শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা
গুণগ্রাহিণী।"

এই শ্লোকটী লিখিত হইয়াছে। "শ্রীহর্ষাদে র্ধাবকাদীনামিব ধনং।" মম্মটভট্টের এই কথা যথার্থ কি পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। কারণ হর্ষদেব মূর্খ ছিলেন না। তিনি সৎকবি ও বহু ভাষায় নিপুণ ছিলেন, একথা রাজতরঙ্গিণীর অষ্টম তরঙ্গে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যথা—

"সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ
সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ
খ্যাতিং দেশান্তরেষপি॥"
রাজতরঙ্গিণী।

ফল, নাগানন্দ ও রত্নাবলী নাটক দৃশ্যকাব্য-দ্বয়ের প্রণেতা যিনি হউন, গ্রন্থ দুখানি যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ধাবক বা হর্ষদেবের পর মহাকবি ভবভূতি জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাকবির লেখনী হইতে তিন খানি দৃশ্যকাব্য বিনির্গত হয়। তন্মধ্যে প্রথম খানির নাম মালতী মাধব। এখানি প্রকরণ ও কবির কল্পিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ দুই

খানিই নাটক। দ্বিতীয় খানির নাম বীর-চরিত ও তৃতীয় খানির নাম উত্তর রাম চরিত।

ভবভূতি প্রণীত নাটক ও প্রকরণ অতি সুন্দর। এরূপ ওজস্বী লেখা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মহাত্মা কাশ্মিরাধিপতি যশোবর্ম্মার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীতে স্পষ্ট লেখা আছে——

"কবির্বাক্পতি রাজশ্রী
ভবভূত্যাদি সেবিতঃ।
জিতোযযৌ যশোবর্ম্মা
তদ্গুণস্তুতি-বন্দিতাং।।"

কহ্লণরাজতরঙ্গিণী ১৪৫ শ্লোঃ।

ভবভূতির সহিত অন্যান্য নাটক কর্ত্তার তুলনা করিবার এখন তত প্রয়োজন নাই; ইহার বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে। ভবভূতির পর অনর্ঘ রাঘব এবং তৎপরে প্রসন্নরাঘব লিখিত হয়। অনর্ঘ রাঘব মুরারি মিশ্রের লিখিত ও প্রসন্ন রাঘব কবিবর জয়দেবের লেখনী-বিনির্গত।

যেরূপ ব্যাকরণ শাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে, কাব্যাদি কিছুই লিখিতে পারা যায় না, সেইরূপ নাটকাদি দৃশ্য-কাব্য লিখিতে হইলে, ব্যাকরণ, ভাষা ও নাট্যশাস্ত্র এই তিনটী মুখ্যবিষয়ে সর্ব্বাগ্রে অধিকার করিতে হয়। তৎপরে লোকাচার ও ভিন্নলোকের স্বভাব চরিত্রের বিষয় আলোচনা করিতে হয়; একথা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে, এজন্য এস্থলে আর তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষ স্বর্ণভূমি। এখানে কিছুরই অভাব নাই। শব্দশাস্ত্র অধিকার করিবার জন্য এইস্থানে নানা প্রকার ব্যাকরণ যেরূপ সুলভ; নাটকাদি দৃশ্যকাব্য লিখিবার নিমিত্তও গ্রন্থকার সকল নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সকল নাট্যশাসন এক্ষণে একবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

চৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন, তখনও ঐসকল নাট্যশাসনের অনেক গ্রন্থ পাওয়া যাইত; কারণ রূপগোস্বামী সেই সময়ে অনেক গুলি নাটক ও নাটক চন্দ্রিকা নামে এক খানি নাট্য শাসন লিখিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত নাটক ও নাট্যশাসন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

নীলকণ্ঠদীক্ষিত প্রণীত অর্থদ্যোত-নিকা, মাতৃগুপ্ত প্রণীত নাটকদীপিকা, সুন্দরমিশ্রকৃত নাট্যপ্রদীপ, ভানুদত্ত প্রণীত রসতরঙ্গিণী এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটকের টীকাকার পণ্ডিত রঙ্গনাথ আচার্য্য। তৎপ্রণীত টীকার মধ্যে নাট্য দর্পণ, নাট্যলোচন ও রূপাচন্দ্রামাণ নামে আরও তিন খানি নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলি আমরা একেবারে হারাইয়াছি।

মোহনলালমিশ্র হনুমান্ নাটকের

টীকায় নাটকাবতার নামে অন্য এক খানি নাট্য-শাস্ত্রের উল্লেখ করেন এবং রায়মুকুট, ভানুজীদীক্ষিত ও মহাদেব বেদান্তী 'নাটক-রত্নকোষ' নামে এক খানি অত্যাশ্চর্য্য নাট্য-শাসনের নামোল্লেখ করেন; কিন্তু সে গুলিও এখন আর এদেশে পাওয়া যায় না।

১৪২৭ শাকে পণ্ডিতবর রূপ গোস্বামী এদেশে আসিয়া যে তিন খানি দৃশ্যকাব্য লিখিয়াছেন, নাটক-সম্বন্ধে সেই কয়-খানিই শেষ গ্রন্থ বলিতে হইবে। রূপ গোস্বামীর পর আর প্রসিদ্ধ ও অভিনয়-যোগ্য কোন নাটক লিখিত হয় নাই।

নাট্য-শাসনের ন্যায় নৃত্য-শাসনও হিন্দুসমাজে খুব প্রচলিত ছিল, এবং নৃত্যকলা-বিস্তারের নিমিত্ত দুই খানি গ্রন্থও প্রচলিত ছিল; কিন্তু কালবশতঃ সে দুই খানিও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয়, উক্ত গ্রন্থ সকল মুসলমান-দিগের অধিকার সময়ে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মহাকবি ভারবি-প্রণীত কিরাতার্জুনীয় কাব্যের টীকায় পণ্ডিতবর মল্লিনাথ নৃত্যকলা-শিক্ষার এই দুই খানি গ্রন্থের উল্লেখ করেন, যথা—নৃত্য-সর্ব্বস্ব ও নৃত্য-বিলাস।

পুরা কালে যিনি যত নাট্য-সূত্র লিখুন না কেন, স্বাধীন মত কেহই ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। সকলেই প্রায় ভরতমুনির অনুগামী হইয়া আপন আপন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন সুতরাং কোন গ্রন্থই সহজ ও সরল হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার অনুগামিনী হইলেও, আধুনিক রীতিনীতি—প্রাচীন রীতিনীতি অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন; সুতরাং সংস্কৃত 'নাট্যশাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালা নাটক লেখা কখনই উচিত নহে।

একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বোধ হইবে যে, নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ নাটকাদি দৃশ্যকাব্য লিখিবার নিমিত্ত যে সকল অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি না লিখিলেও তাহাদের কার্য্য, যে কোন নাটককারের নাটকে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইত! উদাহরণ-স্বরূপ এই স্থানে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

মুনিবর সাত্বতী বৃত্তির চারিটী অঙ্গ লিখিয়াছেন। যথা—উত্থাপক, সংঘাত্য, সংলাপ ও পরিবর্ত্তক।

শত্রুর বাক্য যদি উত্তেজন-কর হয়, তাহা হইলে তাহাকে উত্থাপক বলা যায়।

মন্ত্রণাবলে, অর্থবলে অথবা দৈববলে যে সংহতি-ভেদ, তাহার নাম সংঘাত্য। উদাহরণ—

মন্ত্রবলে যথা;—মুদ্রারাক্ষসে চাণক্যের মন্ত্রণাবলে রাক্ষস-সহায়ের ভেদ। অর্থ-বলেও ঐ মুদ্রারাক্ষসে ভেদ হইয়াছিল।

দৈববলে যথা—বাল-রামায়ণে রাবণ হইতে বিভীষণের ভেদ।

যাহাহউক,এই সকল অতি সামান্য কথা লইয়া নিয়ম বা সূত্র করিলে, নাটকের বহুতর নিয়ম করা যাইতে পারে।

মনে কর,নায়ক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে তাহাকে নর্ম্মঘাত বলা যায়।

নায়ক ও বিদূষকের যে গুপ্ত পরামর্শ তাহার নাম কটস্ফোট।

সখীদিগের প্রতি নায়িকার যে ভদ্রতা ও সদাচার, তাহার নাম বষট্‌স্ফূর্জ্জিত, ইত্যাদিরূপে নিয়ম করিলে বাঙ্গালা নাটকেরও নিয়ম হইতে পারে। কিন্তু ঐ রূপ অনর্থক কথা লইয়া মূল গ্রন্থের রসভঙ্গ করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

আরও দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের মধ্যে রাজার প্রতি শকুন্তলার ও শকুন্তলার প্রতি রাজার যে পরস্পর অনুরাগ, মহাত্মা ভরত তাহার নাম বীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও সেই স্থলে নানা প্রকার জটিল বাক্য বলিয়া একটা বিষম গোলমাল করিয়াছেন, কিন্তু ওরূপ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না—অর্থাৎ তিনি যদি বীজার্থ লইয়া অত গোলযোগ না করিতেন, তাহা হইলে কি কালিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে রাজা ও শকুন্তলা এই দুই জনের পরস্পর অনুরাগের উল্লেখ না করিয়া বিবাদের উল্লেখ করিতেন?

মুনি-প্রণীত নিয়ম না থাকিলেও গ্রন্থকার কখনই ঐ মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতেন না; অতএব নাট্য-শাস্ত্রে বশীভূত হইয়া ঐরূপে বীজ-বপনের প্রয়োজন কি?

মনে কর, মুনি যদি এক স্থানে দেখিতেন, যে পাঁচ চূড়া করিয়া না কামাইলে কঞ্চুকী হইবে না, তাহা হইলে এদেশীয় গ্রন্থকারগণ, কঞ্চুকীর মাথা কামাইতে কখনই ছাড়িতেন না এবং প্রত্যেক অঙ্কেই তাহাকে প্রবেশ করাইয়া দর্শকগণকে ঐ কামান মাথা দেখাইতেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বোধ হয় যে, সূত্রকার ও নাটককার এই দুইএর মধ্যে কাহারও চিত্তে স্বাধীন ভাব ছিল না। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উপরি নির্ভর করিয়া গিয়াছেন।

এ দেশীয় সভ্যগণের রুচি স্বাভাবিক ঘটনার দিকে ধাবিত হইবে, প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ইহা অনুভব করেন নাই; এই নিমিত্ত কোন রূপ অলৌকিক ঘটনার অবতারণাকে তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে অত বড় বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্মদর্শী শ্রীহর্ষ, নৈষধ কাব্যে অত অস্বাভাবিক রচনা কখনই করিতেন না। তিনি যে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী লোক ছিলেন, খণ্ডন গ্রন্থই তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

পূর্ব্বতন কবিগণ খ্যাতবৃত্ত অবলম্বন করিয়া অনেক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। মুরারি-মিশ্র, মহাত্মা জয়দেব ও কবিবর ভবভূতি রামচরিত আশ্রয় করিয়া যে কয়খানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সকলগুলি উৎকৃষ্ট হইলেও,

ভবভূতি-প্রণীত উত্তর-রামচরিত ও বীর-চরিতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভবভূতির গভীর অর্থযুক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য অতি মনোহর ও সামাজিকদিগের আদরণীয়।

মহাকবি ভবভূতির নাটক-গুম্ফনের কৌশল অতি আশ্চর্য্য ও মনোহর। এই মহোদয়ের লেখনী হইতে যে সকল পদ বিনির্গত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক পদই সুমধুর ও ওজোগুণশালী।

কবিবর ভবভূতি অল্প কথায় যে সকল মানসিক ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, সে গুলি যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তেমনি রসপুষ্ট। আধুনিক পণ্ডিতগণ সেই সকল ভাব আলোচনা করিয়া বলেন যে, এরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া কেহই কাব্য নাটক লিখিতে পারেন নাই।

কালিদাস ও ভবভূতি এই দুই মহা কবির রচনা তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়—কালিদাসের লেখা অমৃতময়ী এবং ভবভূতির রচনা অম্লামৃতময়ী।

"ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" কালিদাস রঘুবংশের মধ্যে এই যে একটী বাক্য লিখিয়াছেন, ইহার ভাব অতি গূঢ় ও যথার্থ। লোক-মাত্রেরই রুচি পৃথক। নাটকাদি দৃশ্যকাব্যে নানা প্রকার পাত্রের প্রবেশ সূচিত হইয়া থাকে। নাটক-কর্ত্তাকে একাকীই সেই সকল ভিন্ন-রুচি লোকের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নাটক লিখিতে হয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক নাটক লিখিবার সময়ে একমাত্র কালিদাসকে দুষ্মন্ত, মাধব্য, শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, কুলপতি কণ্ব ও ধীবর প্রভৃতি নানা প্রকার লোকের রুচির ন্যায় রুচি-বিশিষ্ট হইয়া, লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল। সেই রূপ মহাত্মা ভবভূতিও, রাম, লক্ষ্মণ ও জনক প্রভৃতি নানা প্রকার পাত্রের রূপ ধারণ করিয়া উত্তর-চরিত ও বীর-চরিত লিখিয়া লোক-সমাজে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

যাঁহারা বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব প্রভৃতির সাধারণীকৃতি শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের রুচির ন্যায় রুচি-বিশিষ্ট হইতে পারেন নাই, অথচ নাটক লিখিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা নাটক লিখিয়া কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই। তবে আপনার কার্য্যকে কেহই মন্দ মনে করেন না বলিয়া তাঁহারা যা তা লিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এ সম্বন্ধে কবি কর্ণপূর একটী অতি আশ্চর্য্য কথা বলিয়া গিয়াছেন;—

"আত্মনঃ প্রিয়তয়া তনুভাজাং
নাত্মনঃ কৃতিষু দূষণদৃষ্টিঃ।
সর্ব্বতস্তিমির মস্যতি দীপো
নাত্মমূল-তিমিরং বিনিহন্তি॥"

আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রিয়তা বশতঃ কেহই আপনার কাব্যে দোষ দেখিতে পান না। যেমন প্রদীপ সর্ব্ব স্থানের অন্ধকার দূর করে বটে, কিন্তু আপনার নিম্নে যে অন্ধকার থাকে, তাহা নষ্ট করিতে পারে না।

এই কারণেই অনর্ঘ-রাঘব প্রভৃতি

কএক খানি নাটক তত আদরের সামগ্রী বলিয়া বিখ্যাত নহে।

মুরারি মিশ্র রূপ-গোস্বামী অপেক্ষা প্রাচীন; কিন্তু রূপ-গোস্বামি-প্রণীত বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব ও দানকেলি-কৌমুদী অপেক্ষা তাঁহার অনর্ঘ-রাঘব কোন রূপেই উৎকৃষ্ট নহে।

কবিশিরোমণি জয়দেবের প্রসন্নরাঘব অনর্ঘ রাঘব হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। প্রসন্নরাঘবে যেমন মধুর শব্দ সকল বিন্যস্ত হইয়াছে, সেইরূপ তাহাতে রস ও ভাবেরও অভাব নাই।

নাটকে সমাস-বাহুল্য থাকিলে তাহা তত আদরের হয় না। কোন একটী কারু কার্য্যে যদি পদ্মরাগাদি বহুমূল্য পাথর সকল পৃথক্ পৃথক্ বসান থাকে, তাহা হইলে দেখিতে বড়ই মনোহর হয়; আর যদি তাহা না হইয়া সেই সকল পাথর অত্যন্ত নিবিড় ভাবে এমন কি একবারে গায় গায় বসান হয়, তাহা হইলে উক্ত বহুমূল্য বস্তু দেখিতে কখন সুন্দর হয় না। নাটক-রূপ কারু কার্য্যে যদি পদ-রূপ বহুমূল্য প্রস্তর সকল পৃথক্-রূপে বিন্যস্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত কারু কার্য্য বড়ই সুন্দর হয়।

নাটকের মধ্যে যদি পদ্যের ভাগ অধিক থাকে, তাহা হইলে সে নাটক অভিনয়-কালে তত শ্রবণ-সুখদায়ক হয় না; প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের মধ্যে এই দোষটী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকের মধ্যে পদ্য-প্রাচুর্য্য অভিনয়ের একটী প্রধান অন্তরায়। এই কারণে নাটক-মধ্যে সমাস-বাহুল্য ও পদ্য-প্রাচুর্য্য এই দুটী দোষই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

উদাহরণ।

রাজা বিদূষককে বলিলেন "সখে! বাসবদত্তা এখন কোথায়?

বিদূ। সখে তিনি বর্ষা-মেঘমালা-গভীর-গর্জ্জন-মুদ্রিত-নয়না হইয়া চিন্তা করিতেছেন।

পাঠক! এই স্থানে বিদূষকের কথা আপনার ভাল লাগে কি না আপনার কর্ণই তাহার প্রমাণ। ইত্যাদি।

এজন্য নাটকে সমাসবহুল রচনা হৃদয়-গ্রাহিণী নহে।

যখন কোন নূতন নাটক বা নাটিকা কবির মুখ হইতে প্রথম বিগলিত হয়, তখন কতকগুলি লোক একত্র মিলিত হইয়া তাহার গুণ গান করিয়া থাকেন ও তাহার পূর্ব্বতন কোন নাটককারের নাটকের সহিত উক্ত নূতন নাটকের তুলনা করিয়া, হয়ত পূর্ব্ব গ্রন্থের দোষ সকল কীর্ত্তন করেন। এ ভাবটী মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ।

মনে কর, যখন আডিসনের লেখনী হইতে কেটো নামক নাটক বিনির্গত হইয়াছিল, তখন মহাকবি সেক্স্‌পিয়ারের ওথেলো প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নাটকগুলিতে দোষারোপ করিয়া কতকগুলি লোকে কেটোর প্রশংসা করিয়াছিল; কিন্তু আধুনিক নবীন পণ্ডিত

ডিকুইন্‌সি বলেন যে, সেক্‌স্‌পিয়ারের হাম্‌লেট্‌ ও ওথেলো প্রভৃতি কএকখানি নাটকের সহিত কেটোর তুলনা করিলে স্বর্ণ ও তাম্রে যত প্রভেদ, এত ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে।

সেক্‌সপিয়ার অতি উৎকৃষ্ট নাটককার বটেন, কিন্তু কালিদাস অপেক্ষা তিনি যে উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন না, এ কথা লইয়া অনেকে অনেক আন্দোলন করিয়া থাকেন। পণ্ডিতবর উইল্‌সন সাহেব কালিদাসকে সেক্‌স্‌পিয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটককার বলিয়া কালিদাসের গৌরব করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্য কেহ এক স্থানে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল অধ্যয়ন করুন।

সখে ! তা কি ভোলা যায় ?

"——তৎ কেন বিস্মর্য্যতে"

অমরু।

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
আমারে হেরি' আগত,
সঙ্কুচিতা প্রিয়তমা
রহিল শয্যায়,
কতেক করিনু ছল,
তথাপি নীরবে র'ল,
স্পর্শিলে শিহরে,—দৃষ্টি
লজ্জা-মাখা তায়,
ভয়-লজ্জা-চারু মুখ—
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
বিধুর কিরণ যত,
উজলি' সে চারু দেহ,
প্রিয়ার নিদ্রায়,
হেরিয়াছি আঁখি ভরি'
হৃদয়ে চিত্রিত করি'
রাখিয়াছি সে মুরতি—
তাহা কি লুকায়—
হৃদয়ে অঙ্কিত যাহা—
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
নূতন প্রণয়ে রত,
'এই আসি'—বলি' গেল,
দারুণ লজ্জায়—
আসিতে বিলম্ব হ'ল,
আমি কত করি' ছল,
স্নেহ নাহি বলি সখে !—
কাঁদা'নু তাহায়—
ভয়ে অভিমানে চারু ;—
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
প্রেমের কথায় রত,

কাটা'নু সুখ-যামিনী ;
অরুণ-প্রভায়—
উজলিল এ ভুবন,
কূজনিল পাখি-গণ,
ব্যস্ত ভাবে ম্লান মুখে
চাহিল বিদায় ;
সকল ভুলিতে পারি,
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
অভিমানে হ'য়ে রত,
বিনা দোষে কত দোষী,
করে'ছি তাহায়,
গুমরে গুমরে কাঁদি,
কত যে আমারে সাদি'
না ফিরাতে পারিয়াছে
আমার কথায়,
সজল সরক্ত আঁখি
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
স্বেদ ঝরে অবিরত,
অলকা জড়ায়ে আছে,
কপোলে তাহায়,
শ্বাস বহে ঘন ঘন
উরস্থল কাঁপে ঘন
লজ্জায় চকিত দৃষ্টি,
হাসি মুখ তায়,
আলু থালু বেশ কেশ ;—
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
সাজাইতে মনোমত,

কপোল সরাগ করি'
চুম্বিনু তাহায়,
"ছি ছি নাথ! একি রীত,
না হইলে কিছু ভীত,
সকলে নিন্দিবে ওহে
হেরিলে তোমায়"—
কহিল যে ছলে রাগে ;—
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
সুহাসিনী মনোমত,
হেলিয়া দুলিয়া সাজি'—
কুসুম-সজ্জায়,
আমার মন উদাসি
মৃদু স্বনে হাসি' হাসি'
অপাঙ্গ বিক্ষেপ করি,'
প্রেমের কথায়
ভুলায়েছে সব দুখ,—
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
আলু থালু বেশ যত,
সলাজ সভয়ে প্রিয়া
কহিল আমায়,—
ছিঁড়েছে কুসুম-হার,
স্রস্ত বেণী অলঙ্কার,
গুছাইয়া দেও নাথ !—
যেমত যথায়,
গুছা'তে শিহরি আমি ;
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
"স্বামী ভালবাসে কত ?"

সমান-বয়স্কা সখী
জিজ্ঞাসে তাহায়,
কহি'ছে সুন্দরী হাসি,—
"আমি তারে ভাল বাসি,
ভাল বাসে কি না বাসে
জানি না আমায়"
যে ভাবে বলিল প্রিয়া,—
তা' কি ভোলা যায়?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
কপট নিদ্রায় রত,
হেরিয়া আমারে,—আসি
কোমল শয্যায়,
চাহি' চারি দিকে ফিরি,'
মৃদু হাসি' ধীরি ধীরি,
চুম্বিল কপোল মম,
আমিও তাহায়—
দ্বিগুণ প্রতিশোধিনু ;—
তা' কি ভোলা যায়?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
সেধেছি তাহারে কত,
সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে তবু
হেরেনি আমায়,
আড় চোখে তিরস্কারে,
কাঁদালে কত আমারে,
প্রতিজ্ঞা করিনু মনে
চাব না তাহায়
যে চাহনি বিষ মধু
তা' কি ভোলা যায়?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
বসি' বালা শির নত,
কপোলে অশ্রু-শীকর
ভাবি'ছে আমায়
বিলম্ব হইল কাজে
প্রবেশিনু ভয়ে লাজে
কত তোষামোদি' কথা
কহিনু তাহায়
বাষ্প রোধি-কণ্ঠ-স্বর ;
তা' কি ভোলা যায়?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
জ্বরের যন্ত্রণা যত,
অস্থিরা করিয়াছিল
সেই প্রেমদায়
মো'রে হেরি সব দুখ—
ভুলিয়া, লভিল সুখ
হাসিল চারু-হাসিনী
হাসা'তে আমায়
সকল ভুলিতে পারি,—
তা' কি ভোলা যায়?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
মম মন অবিরত
ছিল মগ্ন, প্রিয় সখে!
দারুণ চিন্তায়!
কত ছলে মৃদু হাসি'
আমি যাহা ভালবাসি
নানাবিধ আলাপনে
ভুলা'লে আমায়
সকলি ভুলিনু আহা!
তা' কি ভোলা যায়?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
না হেরি তা'রে আগত,

রহিনু চাহিয়া পথ
আ'সার আশায়,
শিঞ্জিত মধুর ধ্বনি,
আশ্বাসি' আমারে ধনী
কত ছলে কত বার
সে রূপ দেখায়,
কত যে আনন্দে ভাসি,
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
যামিনীর অর্দ্ধ গত,
মম আঁখি ঢুলু ঢুলু
হেরিয়া নিদ্রায়
কহিল প্রেয়সী হাসি'
নিদ্রারে কখন দাসী
না দিবে আসিতে নাথ !
আছি এ বিভায়,
পশিল নয়ন মম,
তা' কি ভোলা যায় ?

এক দিন,——নহে বহু দিন গত,
অশ্রু ঝরে অবিরত,
সতৃষ্ণ সরক্ত দৃষ্টি
চাহিয়া আমায়
বলে—'নাথ ! এস ত্বরা
তব দাসী প্রাণে মরা
রহিল, স্মরিহ—'বলি'
দিলেক বিদায়,
সকল ভুলিতে পারি
তা' কি ভোলা যায় ?

ম, চ, মিত্র।

মানব-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পারিবারিক শাসন। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবার-বর্গের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাহাদের একের সুখে অন্যে সুখী ও একের দুঃখে অন্যে দুঃখী হয়; এজন্য উহাদিগের পরস্পরের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা ও অধিকার আছে। তদ্ভিন্ন ঐ সকলের সহিত বৈজিক আকর্ষণীক সম্বন্ধ থাকা হেতু নৈসর্গিক বলে পরস্পরের প্রতি নৈসর্গিক অনুরাগ জন্মে; সেই অনুরাগ-বলে পরস্পরের প্রিয়চিকীর্ষু হয়, তজ্জন্য কেহ কাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিলেও তাহাতে অসন্তুষ্ট হয় না। ঐ কর্কশ ব্যবহারের কারণ স্বরূপে তাহারা এই মনে করিয়া লয় যে হয় কর্কশ ব্যবহারকারী ভবিষ্যতে মঙ্গলের জন্য অথবা কোন প্রকার বুদ্ধিভ্রংশহেতু ঐ কর্কশ ব্যবহার করিয়াছেন, সুতরাং তাহার প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মে না। এই জন্য পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি অপরের হিতাভিলাষে শাসন করিলে

অপর শাসন অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হয়। কেন না, এখানে শাসনকারীর অন্তরে সুখাভিলাষ মূর্ত্তিমান্ রহিয়াছে এবং শাসিত ব্যক্তিও মনে মনে জানিতেছে যে, শাসনকারী তাঁহার হিতাভিলাষী সুতরাং শাসনও তীব্র হয় না এবং শাসিত ব্যক্তির মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত হয় না। দেখ, পিতা মাতা, পুত্রের সুখাভিলাষে কি শাসনই না করিতেছেন? তাঁহারা প্রহার, কারাবদ্ধ, অনশন প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কঠিন শাসনেই তাহাদের শাসন করিতেছেন। ইহাতে উপকার ভিন্ন অপকার হইতেছে না। ঐরূপ শাসন অপর কেহ করিলে, তাহাকে বিশেষ রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। পিতা মাতা যদি ঐরূপ শাসন করিয়া শিক্ষাদি না দিতেন, তাহা হইলে কয় জন বালক শিক্ষা লাভ করিতে পারিত? কয় জন বালক বাল্য-কালে আপনা হইতে শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা করে? পিতামাতা প্রভৃতির ঐকান্তিক যত্ন, শাসন ও উপদেশ না পাইলে বোধ হয়, কোন বালকই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারিত না। শিক্ষা লাভ দূরে থাকুক, শিশুগণের জীবন রক্ষা হওয়া দুষ্কর হইত। সুতরাং শিশুগণের পক্ষে পারিবারিক শাসন যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পিতা পুত্রের ন্যায় দাম্পত্য-শাসনও বিশেষ হিতকর। অনেক দম্পতি, স্ত্রী বা স্বামীর মীঠর বা সরল শাসনের অধীন হইয়া লাম্পট্য প্রভৃতি দোষ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। এমনও অনেক দেখা গিয়াছে যে, যে সকল দোষ শিক্ষায় যায় নাই, ধর্ম্ম ভয়ে শোধিত হয় নাই, সমাজ-ভয়ে শাসিত হয় নাই এবং রাজ-দণ্ডেও দমিত হয় নাই, সে সকল দোষও কেবল এক মাত্র স্ত্রীর সরল ও সরস শাসনে শোধিত হইয়া গিয়াছে। দাম্পত্য-শাসনের আশ্চর্য্য শক্তি এই যে, উহাতে কায়িক দণ্ড নাই, অবরোধ নাই, অর্থ-দণ্ড নাই, অথচ এমনি তীব্র শাসন যেন তাহাতে শাসিত হইতেই হইবে। তুমি একটু অধিক রাত্রিতে বাটী আসিলে মনে এমনি ভয় হইবে যে, পাছে গৃহলক্ষ্মী কোন দোষের আশঙ্কা করেন। আবার প্রণয়িনী তাহাতে এই মাত্র দণ্ড দিবেন যে, হয় বাক্যালাপ করিবেন না, না হয় এই মাত্র বলিবেন, আজি না আসিলে হইত। এই কৈফিয়তের উত্তর দিতে হয়ত তোমার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইবে, নিদ্রা নিকটেও আসিতেও পারিবে না। পর দিন ঐরূপ কার্য্য আর না করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে হইবে। কুকর্ম্মশালী কোন স্ত্রী বা স্বামী দাম্পত্য-শাসন-ভয়ে অর্জ্জিত বিষয়-বিভবও ভোগ করিতে পান না। দেখা গিয়াছে, অনেক পুরুষ বিবাহের পূর্ব্বে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিল, বিবাহিত হইয়া ঐ শাসনের গুণে আশ্চর্য্য কর্ম্মঠ হইয়াছে। এই প্রকারে স্থির হইয়াছে, পারিবারিক শাসন আমাদিগের নিতান্ত

হিতকর—এমন কি, এই শাসন না থাকিলে, সমাজের দুর্গতির সীমা থাকিত না। জ্ঞান, বিদ্যা, উন্নতি, প্রণয় প্রভৃতির আস্বাদ-মাত্রও পাওয়া যাইত না; মানব অপর জীব হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত না। কিন্তু অপরাপর শাসনের ন্যায় পারিবারিক শাসনের এক্ষণে সেরূপ উপকারিতা নাই।

আন্তর শাসন—আমাদিগের এমন কর্ত্তব্য কার্য্য অনেক আছে যে, তাহার করণে বা অকরণে সমাজ বা রাজা সাক্ষাৎ-ভাবে কোন প্রকার দণ্ডবিধান করিতে পারেন না, অথচ সেই সকলের নিবারণ বা অনুষ্ঠান না হইলে, আমাদিগের মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। সমাজ ঐ সকল করণ বা অকরণ জন্য এ প্রকার গূঢ় ভাবে শাসন করিয়া থাকেন যে, তাহা দ্বারা ঐ সকল অনিষ্ট বহুল পরিমাণে নিবারিত হয় এবং বহু প্রকার ইষ্ট সাধিত হইয়া সমাজের হিতকর হয়। কাহার ক্ষতি না করিয়া, অনেকে মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। ঐ মিথ্যা দ্বারা যখন কাহারও ক্ষতি হইতেছে না, তখন সমাজ বা রাজার শাসন করিবার অধিকার নাই; কিন্তু ঐ প্রকারে মিথ্যা কহিতে কহিতে, তাহা অভ্যাস পাইয়া গিয়া প্রকৃত মিথ্যাবাদী হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহার ও সমাজের ক্ষতি হইয়া থাকে। কেহ ভিক্ষুককে ভিক্ষা, অতিথিকে অন্ন ও সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ না দিলে এবং কোন জলমগ্ন পুরুষকে নিজে কষ্ট করিয়া উদ্ধার না করিলে সমাজ বা রাজা কিছুই বলিতে পারেন না, অথচ এ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান না হইলে, দেশের অনেক হিতকর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে মানব স্বাধীনতা বা যথেচ্ছচারিতা-প্রিয়। তাহাদের উপর ধর্ম্মশাসন, রাজ-শাসন ও সমাজিক শাসনের প্রভুতা না থাকিলে, মানব সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচারী হয় ও তাহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। আধুনিক সমাজ বা রাজবিধানে মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত প্রভৃতির দণ্ডের ব্যবস্থা নাই; কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে দেশের যে সকল অনিষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মহান্ অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি? সমাজ কি উহার কোন ব্যবস্থা করেন নাই?

অবশ্যই করিয়াছেন। সমাজ গূঢ় ভাবে ঐ সকলের উপায় করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার নাম যশ ও নিন্দা। কেহ মিথ্যা বলিলে, বেশ্যাসক্ত বা মদ্যপায়ী হইলে, অমনি লোকে বলিয়া উঠে, অমুক মিথ্যাবাদী; তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই। অমুক বেশ্যাভক্ত; অমুক মদ্যপায়ী। উহার সহিত ভদ্রলোকের আলাপ করা উচিত নহে। কেহ ভিক্ষুককে ভিক্ষা, অতিথিকে অন্ন ও সাধারণ হিতকর বিষয়ে অর্থ না দিলে অথবা অভ্যাগত লোকের সহিত বিনয়ের সহিত আলাপাদি না করিলে, অমনি লোকে বলিয়া উঠে, অমুক বড়লোক

বটে, কিন্তু ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয় না, অতিথিকে অন্ন দেয় না, দেশ-হিতকর কার্য্যে অর্থ দেয় না অভ্যাগতের সহিত ভালরূপ আলাপ করে না, অহঙ্কারে ধরাকে শরার ন্যায় দেখে; কেবল স্বার্থ-পরতায় পরিপূর্ণ। সে কেবল আপন স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াইতেই ব্যস্ত, ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয়দিগকেও অন্ন দিতে কুণ্ঠিত, সুতরাং তাহার নিকট কাহার হিতাশা নাই—তাহার নিকট যাওয়া অন্যায়; তাহার নাম পর্য্যন্ত করিতে নাই। আবার কেহ কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন অর্থাৎ ভিক্ষুকাদিকে ভিক্ষাদি দিলে, লোক-সমাজ প্রশংসার সহিত বলিয়া উঠে, অমুক উপবাস করিয়াও অতিথিকে অন্ন প্রদান করে, পুত্র-নির্ব্বিশেষে ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে পালন করে, নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্র-পতিত মনুষ্যের প্রাণ-রক্ষা করিতে অগাধ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছে। আপন পুত্রের প্রাণরক্ষা করিতেও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হয় নাই। তাহার তুল্য সাধু লোক পৃথিবীতে বিরল, তাহার নাম করিলেও পাপ বিনষ্ট হয়। উক্তরূপ নিন্দা ও সাধুবাদে মানবের মন বিচলিত হয়, তদনুসারে মানবগণ নিন্দনীয় কর্ম্ম না করিতে ও যশস্কর কর্ম্ম করিতে, যথাসাধ্য যত্নবান্ হয়েন। সুতরাং নিন্দা ও যশ দ্বারা মানসিক পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া, উহাদিগকে আন্তর শাসন বলা গেল। মানব, নিন্দা-ভয়ে অনেক বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়া থাকে এবং যশোলিপ্সু হইয়া নিজের প্রাণান্তকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অনেকে মৃত্যুর পর কীর্ত্তি চিরস্থায়ী থাকিবে বলিয়া, অনেক আয়াসকর, ব্যয়সাধ্য মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; যশোলিপ্সা না থাকিলে, ঐ সকল কার্য্যের আদৌ অনুষ্ঠানই হইত না। মৃত্যুর পর যশ হইলে মানবের কোন লাভ আছে কি না এবং যদি থাকে, তাহা বিশেষরূপ জ্ঞাত না থাকিয়াও, কি জন্য মানব, পরকালের যশের জন্য এত লালায়িত হয়? কি জন্য "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" বাক্যের এত আদর? যদিও তাহার গূঢ় মর্ম্ম অবধারণ করা দুরূহ, তথাপি স্পষ্টত ইহা জানা যাইতেছে যে, মৃত্যুর অন্তে স্থায়ী কীর্ত্তির ফলভোগ, জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হয়—তাহাতে মানব সুখী হইবে, সন্দেহ কি? এবং যখন আমরা কালিদাস, আর্য্যভট্ট প্রভৃতির নাম স্মরণ করিয়া, ভক্তি-গদ্গদ চিত্তে বিমল যশের ব্যাখ্যা করি, তখন আমরাও ঐরূপ যশোভাজন হইব, এরূপ আশা মনোমধ্যে উপস্থিত হইলে, কেন না বিমল আনন্দ লাভ করিতে না পারিব। সুতরাং যদিও আমরা মৃত্যু-অন্তে নিন্দা বা যশের কথা শুনিতে না পাই—তথাপি অপবাদকর কার্য্যে নিবৃত্ত ও যশস্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয়, হওয়াও সম্ভব। বিশেষত যখন যশ ও নিন্দা সমাজ-ঘটিত অর্থাৎ

সমাজের হিতকর ক্রিয়া করিলে যশ ও অহিতকর কার্য্য করিলে নিন্দা হয়, তখন মানবকে উহার অধীন হইতেই হইবে। সমাজের সাক্ষাৎ দণ্ড অপেক্ষা মানব এই নিন্দারূপ দণ্ডে অধিক শাসিত হয় এবং প্রত্যক্ষ পুরস্কার অপেক্ষা যশরূপ পুরস্কারে অধিকতর উৎসাহিত হয় সুতরাং নিন্দা ভয় ও যশোলিপ্সা, আমাদের বিশেষ উপকারী; ইহার আর একটী গুণ এই যে, ইহা একটী সমাজ-মধ্যে আবদ্ধ নহে। সকল সমাজেরই লোকেরা নিন্দাভাজন না হইতে ও যশোভাজন হইতে ইচ্ছা করে এবং ইহাতে মানবের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে; সুতরাং রাজশাসন প্রভৃতি অপেক্ষা ইহার উৎকর্ষ আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়—ইহার দ্বারাও এক্ষণে মানবের তদনুরূপ উপকার সাধিত হইতেছে না। কেন না, নিন্দা ও যশ যে সমাজ লইয়া, সেই সমাজই যখন বিশৃঙ্খল হইয়াছে, তখন তাহা দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা কি প্রকারে হইবে? এক্ষণে সমাজের বিশৃঙ্খলতা হেতু নিন্দাকর ও যশস্কর কার্য্যের নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। একবিধ কার্য্য করিয়া নিন্দনীয় ও যশস্বী উভয় প্রকারই হইতেছে। কেহ কন্যার বিবাহ অল্প বয়সে দেন বলিয়া পূজনীয়. কেহ অধিক বয়সে দেন বলিয়া নিন্দনীয় হইতেছেন। কেহ স্ত্রীকে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখেন বলিয়া, নিন্দনীয় ও কেহ বাহিরে বাহির করেন বলিয়া প্রশংসনীয় হইতেছেন, কেহ ইউরোপীয় বেশ ধারণ, ইউরোপীয় ভোজ্য ভোজন ও ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার হেতু প্রশংসনীয় হইতেছেন, কেহ সামান্য দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার ও দেশীয় রীতি নীতির অনুসরণ করেন বলিয়া প্রশংসিত হইতেছেন কেহ বিধবা বিবাহের ভান করিয়া বেশ্যা-বিবাহ করিয়া যশস্বী হইতেছেন ও কেহ কলঙ্কিতা সামান্যা স্ত্রী ঘরে রাখিয়া যশস্বী হইতেছেন; কেহ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীকে মূর্খ, কুসংস্কার-সম্পন্ন বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন কেহ চস্মা শ্মশ্রুধারী নব-ব্রাহ্মকে নাস্তিক ও দেশের কণ্টক বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। এক্ষণে বিবেচ্য কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য ও নিন্দনীয় ও কোন্ কার্য্য যশস্কর। ইহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, সুতরাং মানবের মনে নিন্দা ভয় ও যশের আশা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কোন কার্য্য করিয়া, কোন স্থানে যশস্বী ও কোন স্থানে নিন্দনীয় হইয়া মানব প্রকৃত যশস্কর ও নিন্দনীয় কার্য্যের অবধারণে অসমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং উক্তরূপ নিন্দা ও যশকে কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। আপনার মনে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছে। তাই লোকে মানবের মতামত কুক্কুর শৃগালের ধ্বনিবৎ জ্ঞান করিতেছে।

শ্রীগৌরেশ্বর পাঁড়ে।

পারিবারিক একতা।

আমাদের সামাজিক একতা নাই। সেই একতার অভাবে আমাদের দেশে নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কিন্তু যেখানে স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে অপ্রণয়; যেখানে পিতা ও পুত্রের মধ্যে অসদ্ভাব; যেখানে ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে কলহ; সেখানে কি প্রকারে সামাজিক একতা সংস্থাপিত হইতে পারে? আমাদের গৃহে একতা নাই, আমরা তাহা শিক্ষা করি নাই, আমরা কি প্রকারে সমাজ-রূপ বৃহদ্গৃহে একতা রক্ষা করিব?

প্রথমে গৃহের একতা প্রয়োজনীয়। নতুবা আমরা সমাজের একতার জন্য চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা কখনই সফল হইবে না। প্রথমে স্বীয় স্বীয় গৃহে ও আত্মীয়বর্গ-মধ্যে একতার বীজ রোপণ না করিলে, কখনই আমরা সে বীজ হইতে সুফল আশা করিতে পারি না। প্রথমে গৃহে সদ্ভাব শিক্ষা না করিলে, পিতা মাতা ও ভাই ভগিনী একতা শিক্ষা না দিলে, আমাদের হৃদয়ে একতা বীজ অঙ্কুরিত হয় না। যাহার হৃদয় পাষাণময়, তাহার হৃদয়ে একতা স্থান লাভে অসমর্থ।

আমরা বাল্যকাল হইতে বিবাদ ও বিসংবাদের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি; বাল্যকাল হইতে কেবল বিবাদ শিক্ষা করিয়াছি ও তাহা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত করিতেছি। সুতরাং আমাদের হৃদয়ে একতা স্থান পায় না। ভূমি উর্ব্বরা না হইলে, সুশস্যের আশা করা বৃথা। যাহাতে স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে, ভ্রাতা ও ভগিনীগণের মধ্যে সদ্ভাব ও একতা রক্ষা হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, এক্ষণে ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদের সামাজিক একতার আশা দুরাশা-মাত্র।

ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধের প্রধান কারণ, একত্র বাস। আমরা শুদ্ধ একত্র বাসকে একতা-নাশের কারণ বলি না— ইহা হইতে যে কতকগুলি শাখা বহির্গত হয়, তাহারা এই সর্ব্বনাশের মূল।

মনুষ্য-মাত্রেই স্বাধীন,—কেহ কাহারও অধীন নহে। ভ্রাতৃগণও এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত নহেন, সুতরাং সকলেই স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিতে চাহেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃত্ব করিতেন; আর আর সকলে তাঁহার অধীনে থাকিতেন। কিন্তু, এখন আর আমাদের সে পূর্ব্বতন সমাজ নাই; সমাজ নব বেশ ধারণ করিয়াছে; নূতন প্রকারের আচার ব্যবহার আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছে;—আমরা এখন এক প্রকার নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এক নূতন

সমাজের সভ্য হইয়াছি। এখন আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের প্রতি সদয় ভাবে কর্তৃত্ব প্রকাশ করেন না, কনিষ্ঠও পূর্ব্বের মত জ্যেষ্ঠের অধীনে থাকিতে চাহেন না।

কেবল কেহ কাহারও অধীনে বাস করিতে চাহেন না—এমন নয়। প্রথমেই কেহ পৃথক্ হইয়া বাস করেন না। যখন সমরানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হয়, যখন ভ্রাতৃস্নেহ মারাত্মক শত্রুতার বেশ ধারণ করে তখনই তাঁহারা পৃথক্ বাস করেন।

ক্রমে এই বিরোধ অতি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করে। যেখানে প্রণয়, যেখানে অত্যন্ত স্নেহ ও মমতা, সেখানে বিচ্ছেদ হইলে, সেই বিচ্ছেদ অতি ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এইরূপ বিবাদ ঘটিবার পূর্ব্বে আমাদিগের সাবধান হওয়া উচিত। একত্রে বাস করিয়া বিবাদ প্রজ্বলিত করিবার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব হইতে পৃথক্ বাস করা বিধেয়। কিছু দিনের জন্য একত্র বাস করা অপেক্ষা, যাহাতে বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য প্রথমেই পরস্পরে পৃথক্ বাস করা ভাল।

যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বিষয়াপন্ন, তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃগণ পরস্পর সকলেই বিষয়ের কর্তৃত্ব করিতে অভিলাষী। তাঁহারা সেই কর্তৃত্বের জন্য পূর্ব্ব সহবাস ভুলিয়া, স্নেহ ও মমতাপাশ ছিন্ন করিয়া, চিরকালের জন্য শত্রু হইয়া পড়েন। তথাপি পূর্ব্ব হইতে আপনাদিগের অধিকারগত বিষয়ের ভাগ স্বীয় স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে চাহেন না। এই শত্রুতা কেবল পরস্পরের বিচ্ছেদের কারণ হইয়া সন্তুষ্ট থাকে না। চিরকাল বিচারালয়ে উপস্থিত থাকিয়া, পরস্পরকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হয়।

ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদের কারণ অনেক স্থলে ভ্রাতৃগণ নহেন, তাঁহাদের প্রণয়িনীগণ এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করেন। তাঁহারা অশিক্ষিত, কিন্তু কর্তৃত্ব-ভার হস্তে করিতে তাঁহাদের অত্যন্ত লালসা। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অগ্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। ক্রমে তাঁহাদের স্বামীতে সে বিবাদ সংক্রামিত হয়, এবং ভ্রাতৃগণ তাহা মস্তকে লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করেন।

ভ্রাতৃগণের যেমন সমান অধিকার, ভ্রাতৃজায়াগণেরও সেইরূপ। তাঁহারা সকলে আপন আপন পুত্রকন্যার প্রতি স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করিতে চাহেন। তাহার বিশেষ কারণ এই, প্রায়ই কামিনীগণ আপনাদিগের পুত্রকন্যার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। যাতৃগণ প্রথমে বিবাদের সূত্রপাত করেন, পরে ভ্রাতৃগণ সেই সূত্র লইয়া পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠেন।

ভ্রাতৃগণের সম্প্রীতির মূল, ভ্রাতৃজায়াগণের সম্প্রীতি। কিন্তু যে স্থানে একত্র বাস, সেখানে সেই সম্প্রীতি চিরস্থায়ী

হয় না—কালক্রমে ভ্রাতৃগণ বিরোধ করিয়া পৃথক হইয়া পড়েন।

ইহার উপর আর এক উপদ্রব আছে। পরিবারের মধ্যে এক জন কিঞ্চিৎ উপার্জ্জনক্ষম হইলে, আর সকলে তাঁহার মস্তকে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কেবল নিশ্চিন্ত থাকেন—তাহা নহে, তাঁহার উপর অভিমানও বর্ত্তমান থাকে। যিনি উপার্জ্জনক্ষম, বর্ত্তমান সমাজে তাঁহার অদৃশ্যযুক্ত ব্যয় আছে। সেই ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে সমুদয় সংসার-খরচ তাঁহার পক্ষে অতীব কষ্টকর। কিন্তু এ বিষয় অলস ব্যক্তিগণ না বুঝিয়া "আমাদিগকে দেখিতে পারে না" বলিয়া লোকের নিকট নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া বেড়ান। এ ভাব কত কাল চলিতে পারে? বিচ্ছেদ শীঘ্রই সকলের মনকে আকর্ষণ করে, সুতরাং সকলে পৃথক বাস করেন।

এক্ষণে আমাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, কিসে এই স্ত্রীলোকদিগের বিবাদ শীঘ্র বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করে। প্রথম উপায়, স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষা দান করা। শিক্ষা পাইলে, তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয়ত—বিবাহ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাবধান হওয়া। এই দ্বিতীয় উপায়টীই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবে আমরা সকল প্রকার অমঙ্গলে পতিত হই।

পুত্রের জ্ঞানোদয় হইতে না হইতেই জনক জননী তাহার বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। বালক বিবাহিত হইয়া অল্প বয়সে সংসারে প্রবেশ করিতে অক্ষম হয়। পিতা মাতা যত দিন জীবিত থাকেন, সে বালকের কোন প্রকার বিবাদ ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু পিতা মাতা চিরস্থায়ী নহেন। সেই বালক সপরিবারে সন্তানাদি-বেষ্টিত হইয়া কোথায় যাইবে? প্রায়ই জ্যেষ্ঠের স্কন্ধে পতিত হয়। তাহার উপর অভিমান—স্ত্রীর অভিমান আসিয়া পৃথক হইতে বাধ্য করে।

যদি স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত হইত, তাহা হইলে অভিমান আসিত না। আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত। যদি সেই বালক অল্প বয়সে বিবাহিত না হইত, পিতা মাতা যদি পুত্রের প্রতি বৈরী ভাব না করিতেন, তাহা হইলে সেই বালককে অন্যের গলগ্রহ হইতে হইত না, প্রণয়নীর অভিমান সহ্য করিতে হইত না, জ্যেষ্ঠের সহিত সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতে হইত না, চিরকাল অন্ন-কষ্টে লালায়িত হইতে হইত না।

ভ্রাতৃগণের বিরোধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থলে, পিতা পুত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়। পিতা মাতা অসময় হইবার ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র পুত্রের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইবার পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে বৃদ্ধ বয়সে জ্বালাতন হইতে হয়।

পুত্র বালক—উপার্জ্জনে অক্ষম। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃতির গতি কে নিবারণ করিবে? কিছু দিনের মধ্যে সেই বালক 'পিতা' নাম ধারণ করিল! যখন সেই বালকের প্রথমে একটী সন্তান জন্মিল, পিতা মাতার আনন্দ অপার হইল! পৌত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া নরক হইতে নিস্তার পাইলেন! কিন্তু সে আনন্দ কত দিন থাকিবে? সেই শিশুর লালন-পালন কে করিবে? ক্রমে পিতা পুত্রে বিবাদের সূত্র বয়ন করিতে লাগিলেন! জননী পুত্রকে কিছু বলিতে না পারিয়া বধূকে বাক্য-যন্ত্রণায় পরিবেদনা প্রদান করিতে লাগিলেন! সংসারে হুলস্থুল উপস্থিত হইতে লাগিল! পিতা মাতা স্নেহ ও মমতা ভুলিলেন! পুত্র প্রণয়িনীর উত্তেজনায় পুত্রোচিত ভক্তিকে বিসর্জ্জন দিলেন! এখন দুটী সংসার হইল! পুত্র একণে ত্যজ্য পুত্র হইল!

পিতা মাতা তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না। দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ দিলেন। ক্রমে সেটীও পৃথক্ হইল! পুত্রগণ বৃদ্ধ বয়সে পিতা মাতার শুশ্রূষা করিবার পরিবর্ত্তে বৈরী-ভাব প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের জীবনের পথে বিপরীত বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল!

এখন আমাদের উচিত কি? এ বিষম বিপদে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? এখন নিশ্চিন্ত না থাকিয়া কিঞ্চিৎ সাহস অবলম্বন করিলেই, এ বিপদ হইতে সহজে উদ্ধার পাইতে পারি। যাঁহারা নিজে ভুক্তভোগী, তাঁহারা সাবধান হইলে আর তাঁহাদিগকে এরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। যখন তাঁহারা দেখিলেন, এক পুত্রের বিবাহে হইতে এরূপ অমঙ্গল সংঘটন হইয়াছে, তখন তাঁহারা সাবধান না হইয়া, বরং অন্য পুত্রের বিবাহ-দানে বিশেষ আগ্রহের সহিত উৎসাহিত হন, এবং অধিক মনোদুঃখে কালযাপন করেন। এই সকল ব্যক্তি দ্বারা আমরা কোন প্রকার সুফলের আশা করিতে পারি না। তাঁহারা আপনাদিগের দোষে চিরকাল কষ্ট পাইয়া জীবন কাটাইলেন। একণে এই সকল দেখিয়া, সমাজের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য সাহস অবলম্বন না করিলে আমরাও তাঁহাদের মত কষ্ট পাইব!

পিতা মাতা যে পথে বিচরণ করিয়া আপনাদিগের চরণ কণ্টকে কণ্টকিত করিলেন; সংসারে যে উপায় অবলম্বন করিয়া চিরকাল কষ্টভোগ করিলেন, আমরাও যদি সেই পথে গমন করি, সংসারে সেই উপায় অবলম্বন করি আমাদিগকেও সেই রূপ চরণ বেদনায় অস্থির হইতে হইবে, আমাদিগকেও সেই রূপ কষ্ট পাইতে হইবে। সময় উপস্থিত, একণে যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে, এখন আর আমাদিগের নিশ্চিন্ত থাকিবার অবকাশ নাই।

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের একতা নাই। ইহার একটী মাত্র কারণ নির্দ্দেশ

করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই বিবাদের উৎপত্তি ভ্রাতা ও ভগিনীর দোষে ঘটে না। ভ্রাতৃজায়া পরকন্যা, সুতরাং তাহার প্রতি অনেক সময়ে নানা প্রকার অত্যাচার সংঘটন হইয়া থাকে। সেই কামিনী পিতৃগৃহ হইতে যাহা লইয়া আসিতে পারে নাই, শ্বশুর-গৃহে সেই কামিনীর সেই সকল দ্রব্যে প্রায় অধিকার থাকে না। শ্বশ্রূমাতা স্বয়ং কিছু না বলিয়া, প্রায়ই কন্যার উপর সে বিষয়ের ভার অর্পণ করেন। শ্বশ্রূমাতা অনেক সময়ে এই কারণের জন্য সেই বধূর মর্ম্মান্তিক শত্রু হইয়া উঠেন। এই বিবাদ ক্রমে চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া অতি ভয়ানক বেশ ধারণ করে। ভ্রাতা ভগিনীগণের মধ্যে, পিতামাতা ও পুত্র-গণের মধ্যে বিরোধবীজ রোপিত হয়।

অনেক স্থলে আমরা দেখিতে পাই, ভ্রাতৃজায়া ও ননন্দার মধ্যে প্রণয় নাই, সুতরাং ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে প্রণয় থাকে না! ননন্দা মনে করেন, ভ্রাতৃ-জায়ার প্রতি অত্যাচার তাঁহার কুলধর্ম্ম! যখন তিনি এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি যে আর এক ব্যক্তির ভ্রাতৃজায়া তাহা ভুলিয়া যান। আবার যে ব্যক্তি শ্বশুর-গৃহে ননন্দার নিকট অধিক অত্যাচার ভোগ করেন, তিনি পিতৃগৃহে নিজ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি তাহার সুদ সমেত পরিশোধে যত্নবতী হইয়া অবশেষে ভ্রাতৃস্নেহচ্ছিন্ন করিতে যত্নবতী হইয়া পড়েন।

যদি ভ্রাতৃজায়া স্বীয় পতির নিকটে কিঞ্চিৎ মমতা-ভোগে অধিকারিণী হন, ননন্দা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার ভ্রাতৃজায়া গৃহে ক্রীত-দাসী অপেক্ষা হীন বেশে কাল-যাপন করিবে। এই সকল বিষয়ে পিতামাতা সদুপায় অবলম্বন করিবার পরিবর্ত্তে, অনেক স্থলে নিজ কন্যার পক্ষ সমর্থন করেন! যত দিন সেই বধূ বালিকা থাকেন, যত দিন তিনি স্বামীকে হস্তগত করিতে সমর্থ না হন, অতি কষ্টে দিন-যাপন করেন! কিন্তু যখন তাঁহার সুদিন উপস্থিত হয়, যখন তিনি স্বামীকে মধুর ভাষায় মুগ্ধ করিতে সক্ষম হন, তখন তিনি তাহার পরিশোধ-গ্রহণে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়া থাকেন। স্বামী এক্ষণে স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি করেন না, ভগিনীর প্রতি সোদর-প্রণয়-প্রকাশে ইচ্ছা করেন না। পিতামাতা কিছু দিন-মাত্র ইহার ফলভোগ করিয়া মৃত্যুকে শান্তি-স্থান বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু ভ্রাতা ও ভগিনী এই বিরোধ লইয়া চিরকাল দগ্ধ হইতে থাকেন। ভ্রাতা অনেক সময়ে ভগিনীকে 'ভগিনী' বলিতে অব-মাননা বোধ করেন, ভগিনী ভ্রাতার নামে শিহরিয়া উঠেন!

বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিলে, এ বিরোধের কারণ অন্বেষণ করিবার জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। পিতা মাতা পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাকুল

হইয়া উঠেন। পুত্র নিজ স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ পোষণে সমর্থ হউক আর নাই হউক, পুত্রের বিবাহ দিতেই হইবে। পুত্রবধূর মুখ না দেখিলে তাঁহাদের জীবনে আনন্দের কিঞ্চিৎ ম্লানতা জন্মে। তাঁহারা পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিয়া আনন্দে ভাসিতে থাকেন। সে আনন্দ কত কাল থাকিবে? ক্রমে যত দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, আনন্দের হ্রাস হইতে লাগিল; ক্রমে সেই বধূর ভারগ্রহণ অতি কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। পুত্রকে কিছু না বলিয়া পুত্রবধূর উপর তিরস্কার আরম্ভ হইল। আপনারা স্বয়ং দূরে থাকিয়া কন্যাকে আজ্ঞাবহ নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে সমস্তগুলি একত্রিত হইল—বিবাদাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল!

পিতামাতা যখন পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তখন যদি তাঁহারা এসকল বিষয় এক বার ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। আমাদের দেশের এই এক আশ্চর্য্য নিয়ম, কেহই অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করেন না! পিতা মাতা পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলেই, আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন; ওদিকে পুত্রও আনন্দে ভাসিতে থাকেন! ক্রমে যখন দুরুহতা ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করে, পিতা মাতা, পুত্র ও পুত্রবধূর মস্তকে দোষারোপ করেন। পুত্রও পিতা মাতা ও ভগিনীগণের প্রতি দোষ যোজনা করিতে ত্রুটি করেন না! কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত দোষী কে? পুত্র না পিতামাতা? পুত্রবধূর প্রতি অধিক দোষারোপ করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই। পুত্রবধূ বাল্যাবস্থায় যেরূপ কষ্টে দিনপাত করেন, তাহাতে তাঁহাকে আমরা অধিক দোষদিতে পারি না। ননন্দা পিতামাতার উত্তেজনায় নিজ পদে কুঠারাঘাত করেন। এক্ষণে পিতামাতা ও পুত্র, এই দুয়ের মধ্য হইতে দোষি-পক্ষ অবধারণ করিতে হইবে। পুত্রের স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা উচিত কি না? অনেকে বলিবেন, পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়া কখনই পুত্রোচিত কার্য্য নহে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, যেখানে পিতা মাতা আপনাদিগের ধর্ম্ম ভুলিয়া যান, সেখানে পুত্র যে আপনার ধর্ম্ম ভুলিবেন, তাহার আর বৈচিত্র কি?

পুত্রের নিকট ভক্তি ও অনুরাগের আশা করিলে পুত্রের সহিত পিতা-মাতার সম্পর্ক দৃঢ়ীভূত করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা আপনাদিগের দোষে আপনা-দিগের অবিবেচনার ফলভোগ করেন। তাঁহারা যদি বিবেচনা পূর্ব্বক পুত্রের বিবাহ দিতেন, পুত্র-বধূর প্রতি যত্ন করিতেন, পুত্রের সন্তানের প্রতি বীত-রাগ না হইতেন—তাঁহারা যদি পিতা মাতার ন্যায় কার্য্য করিতেন, তাহা

হইলে, তাঁহাদিগকে এ সংসারে এত মনোদুঃখে জীবন কাটাইতে হইত না। তাঁহারা যাহাকে আপনাদিগের একমাত্র আনন্দের বিষয় বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের আনন্দের বিষয় নহে! তাহাই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের মূল! পুত্রের বিবাহই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের মূল!

স্ত্রী ও স্বামীতে একতা নাই। ইহার প্রকৃতি নানাপ্রকার। পিতা মাতা অর্থ-লোলুপ হইয়া, পুত্রের রুচির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, পুত্রের সহিত যে কোন বালিকার বিবাহ প্রদান করেন। যত দিন স্ত্রী ও স্বামীর বিচার শক্তি না জন্মায়, তত দিন কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় না। কিন্তু যখন পরস্পরের প্রণয়োদ্দীপনের প্রয়োজন হয়, তখনই বিষম সমস্যা! কোন স্থানে স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসেন না, কোন স্থলে স্বামী স্ত্রীকে ভাল বাসেন না; কোন খানে বা উভয়ে উভয়কে দেখিতে পারেন না।

স্বামী যখন বালক, যখন হিতাহিত বিবেচনার পরিপক্কতা লাভ করে নাই, যখন বাহ্যিক আমোদ এক-মাত্র লক্ষ্য-স্থল, তখন তাহার বিবাহ হইল! বাদ্য-ভাণ্ডের আমোদে বিবাহ! পিতা মাতার কি আনন্দ! পরিণেতারই বা কি আনন্দ! কিন্তু, হায়! সে ভাব কত কাল থাকিতে পারে? বয়োবৃদ্ধির সহিত মানসিক প্রবৃত্তি ও রুচি সকল পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই সময় কি ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সময়! হয় স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে স্বর্গীয় প্রণয় আসিয়া উপস্থিত হইবে, নতুবা উভয়ের বিরোধের বীজ রোপিত হইবে! কিন্তু প্রায় দ্বিতীয়টীই ঘটিয়া যায়।

কত যুবক এইরূপে প্রতারিত হইয়া চিরকালের জন্য মনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেছে! কত যুবতী মনঃক্লেশে দিবা-রাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে! কত যুবতী মনঃকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া নরক-মুখে পতিত হইতেছে। কোথাও বা বিষপান, উদ্বন্ধন যুবতীগণকে সকল দুঃখ ও পরিতাপ হইতে মুক্ত করিতেছে!

যেখানে স্ত্রী ও স্বামীতে সদ্ভাব থাকিবার সম্ভাবনা, সেখানে আবার অন্যপ্রকার উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে যুবকেরা পিতা মাতার উত্তেজনায় পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়া, একতার পরিবর্ত্তে, উভয় নৌকায় পাদবিক্ষেপের ন্যায় অচিরে সংসার-সাগরে হাবু ডুবু খাইতে থাকে।

যেখানে এ প্রকার গোলযোগ নাই সেখানেই বা একতা কোথায়? অপরিচিতের প্রণয়ে কখনই একতা উৎপন্ন হইতেই পারে না। আমি যাহাকে জানি না, চিনি না, তাহার সহিত আমার বিবাহ! কি ভয়ানক! আবার পিতামাতা আমার বিবাহের কর্ত্তা। তাঁহারা আমার জন্য প্রণয়িনী অন্বেষণ

করিবেন! যদি আমি আমার প্রণয়িনী অন্বেষণ করি,চারি দিক হইতে আমাকে আক্রমণ করিবে! আমি সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইব!' এরূপ যে দেশের রুচি, সেখানে একতা কোথায় পাইব?

গৃহে একতা শিক্ষা না করিলে, একতার বীজ গৃহে রোপিত না হইলে, আমরা কখনই সামাজিক একতা রক্ষা করিতে পারিব না। আমরা বাল্যকাল হইতে বিচ্ছেদের মধ্যে প্রতিপালিত হই! আমাদের পিতা মাতার একতা নাই, আত্মীয় স্বজনের একতা নাই! আমরা কোথায় একতা শিক্ষা করিব? আবার যখন সংসারে প্রবেশ করি, আমাদের দম্পতির মধ্যে একতা নাই; আমরা কি প্রকারে একতা গ্রহণ করিব? আবার যখন সন্তানাদি হইবে, তাহাদের সহিত আমাদের একতা থাকিবে না, সুতরাং আমরা কি প্রকারে একতা রক্ষা করিব? যাবজ্জীবন বিরোধের মধ্যে বাস করিয়া, একতার আশা করা আকাশ কুসুমের ন্যায় অসম্ভব।

আমরা দেখিতেছি, বিবাহ-পদ্ধতি এই বিরোধের মূল। যত দিন না বিবাহ-প্রথা পরিশুদ্ধ হইবে, তত দিন একতার আশা নাই। যত দিন পিতা মাতার হস্তে বিবাহের ভার অর্পিত থাকিবে, তত দিন একতার সম্ভাবনা কোথায়? যত দিন বিবাহিত হইয়া যুবকগণ অন্যের উপর আপন পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার অর্পণ করিবেন, তত দিন একতার উপায় নাই। যত দিন এক জন উপার্জ্জন-ক্ষম হইলে, পরিবারের অন্য অন্য ব্যক্তি পরিশ্রম-বিমুখ হইবে, তত দিন একতা আস্বাদন করিবার প্রত্যাশা হইতে পারে না।

যাঁহারা দেশে দেশে, নগরে নগরে দেশ-সংস্কারের জন্য বক্তৃতা করিতেছেন-তাঁহারা যদি বাতাসে বাক্যব্যয় না করিয়া, আপন আপন পরিবার-মধ্যে একতা-রক্ষার উপায় গ্রহণ করেন, তাঁহারা মুখে না বলিয়া, কার্য্যে যদি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল। নতুবা যখন আমার প্রয়োজন নাই, তখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু যখন আমার সময় উপস্থিত হইল, অমনি নানা-প্রকার ছলনা করিয়া আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধি করিলাম, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল কি হইবে।

আমরা এক্ষণে বুঝিতেছি,—আমাদের হীনাবস্থার কারণ জানিতেছি, এ সময়ে বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া কার্য্য করিলে, আমাদের সন্ততি-গণের শুভ সংঘটনের সম্ভাবনা। অন্যথা আমরা যেরূপ কষ্ট পাইতেছি,আমাদের পুত্রগণও আমাদিগের ন্যায় তদ্রূপ কষ্ট পাইবে! আমরা এক্ষণে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণকে নিন্দা করি, কেন না তাঁহারা এ সমুদয় বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত থাকিলে, বৃথা বাক্যব্যয় করিলে আমাদিগের উত্তরবংশীয়েরা আমাদিগকে কি মনে করিবেন?

যাঁহারা অদ্যাপি অবিবাহিত,তাঁহাদের একতা রক্ষা করিবার অনেক উপায় আছে। কিন্তু জানি না,তাঁহারা পিতা-মাতার কুহকে পড়িবেন কি না। এই সকল নব্য যুবক যদি বাল্যকালে বিবাহ না করেন, পরের উপরে স-পরিবারে গলগ্রহ হইয়া না থাকেন, তাঁহারা যদি পর-প্রদত্ত কামিনীকে সংসারের অবলম্বনস্বরূপ না করেন—তাহা হইলে, বোধ হয়, অল্প দিবসের মধ্যে আমরা পারিবারিক সামাজিক একতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীচঃ—

প্রেম-পরিণাম।

(গদ্য কাব্য।)

তৃতীয়াংশ। শেষ—লেখক ও পাঠক !

এই শোচনীয় ব্যাপারের শেষ অংশ আমাদিগকেই বিবৃত করিতে হইল ; এই শোণিতাক্ত ঘটনার শেষ কথা আমাদিগকেই প্রকাশ করিতে হইল। অপারিণামদর্শী যুবক যুবতীর হৃদয়ক্ষেত্রে যে প্রণয়-বীজ অসময়ে অবিবেচনায় উপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফল বিষময় ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? সেই বিষময় ফলের শেষ ভয়ানক কথা আমাদিগকেই লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে।

যুবতী যখন বক্ষ-মধ্যে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া শোণিতাক্ত ও হতচেতন হইয়া পতিত হইলেন, দৈবের প্রতি-কূলতা হেতু যুবকও সেই সময়ে, সেই রুধিরপ্লাবিত ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত। রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত মৃত্যু-যাতনা জনিত ভয়ানক কাতর ধ্বনি শ্রবণে তিনি ত্বরায় সুন্দরীর সমীপস্থ হইলেন। দেখিলেন—ভয়ানক ! যাহা ভ্রমেও ভাবেন নাই, স্বপ্নেও যাহা মনোমধ্যে উদিত হয় নাই—তদধিক শোচনীয় ঘটনা ! যাহার জন্য তিনি সংসারত্যাগী, যাহার চিন্তায় তিনি উন্মাদগ্রস্ত, যাহার নিমিত্ত তিনি উদাসীন, তাঁহার আজি এই দশা ! ধীরে ধীরে যুবতীর পার্শ্বে যুবক উপবেশন করিলেন ;—চক্ষে নিমেষ নাই, মুখে কথা নাই, অঙ্গে অনুভূতি নাই। শোণিত স্থির, হৃদয় বহ্নি-চর্ব্বিত, সংসার শূন্য,—যেন অনন্ত সমুদ্র-বক্ষে তিনি-একাকী সমাসীন। যুবতীর চক্ষের সহিত তাঁহার চক্ষু সম্মিলিত হইল ; সেই মৃত্যু-পীড়িত নেত্রও যেন তখন প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল। যুবতী তখন ধীরে ধীরে

যুবকের পদ স্পর্শ করিলেন। যুবক উন্মত্তের ন্যায় বিকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—

"হৃদয়েশ্বরি! এই কি আমার প্রেম পরিণাম?"

যুবতী অতি ক্লিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"নাথ! দয়াময়! অপরাধ ক্ষমা কর।"

যুবক পুনরায় আর্ত্ত স্বরে বলিলেন,—

"এ ভয়ানক কার্য্যে কেন তোমার মতি হইল?"

আবার ভগ্নস্বরে যুবতী উত্তর দিলেন,—

"যে মতি ছিলনা বলিয়া এত যাতনা, সেই মতিই ইহার কারণ; তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

অতি সতর্কতা-সহকারে যুবক,যুবতীর সেই ক্ষীণ তনু ক্রোড়ে উঠাইলেন। কি আশ্চর্য্য! মৃত্যু-যাতনাকে পরাভূত করিয়া আনন্দ-জ্যোতি সুন্দরীর বদন-মণ্ডলে ক্রীড়া করিতে লাগিল। যুবতী কহিলেন,—

"নাথ! মৃত্যু তো উপস্থিত। কিন্তু যে যাতনা তোমায় দিয়াছি, ইহাতেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল না তো!"

যুবক কহিলেন,—

"যাও সাধ্বী। স্বর্গ তোমায় লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইবে। তোমার গুণ কেহই ভুলিবে না।"

সেই কৃতান্ত-কবলিত বদনে হাস্যের আবির্ভাব হইল। সেই হাসিই এ পাপ-তাপ-পূর্ণ সংসারে তাঁহার শেষ কার্য্য হইয়া রহিল। প্রাণ-বায়ু তাঁহার দেহ হইতে প্রস্থান করিল। বৃন্ত-চ্যুত প্রফুল্ল প্রসূনের ন্যায় সুন্দরী প্রাণহীনা হইলেন। অসময়ে, নবীন যৌবনের প্রবল উদ্বেল কালে, সুন্দরী তরুণী অনুতাপানলে বিদগ্ধা হইয়া দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত বিধানার্থ, স্বয়ং স্বেচ্ছায় স্বীয় নবনীত বিনিন্দিত কোমল দেহ হইতে জীবন বিচ্ছিন্ন করিলেন।

যুবক নির্নিমেষ। এক ফোঁটা অশ্রুও এই ভয়ানক সময়ে তাঁহার দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে মৃতার বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"ভাবিয়াছ কি এই যাতনা আমি সহিব?"

সুন্দরীর বক্ষ-মধ্য হইতে ছুরিকা উন্মুক্ত করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"দেখ প্রিয়ে! তোমার শোণিতে নিজ শোণিত মিশাইতে পারি কি না।"

তৎক্ষণাৎ সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা যুবকের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি চেতনা-হীন হইয়া ক্রোড়শায়িনী সুন্দরীর উপর পড়িয়া গেলেন। হায়! জীবনে যাহাদের মিলন ছিল না, অন্তিমে তাহাদের মিলন হইল। অন্তিম সময়ে উভয়ের ওষ্ঠে ওষ্ঠ, অধরে অধর, হৃদয়ে হৃদয় মিলিল। যাতনার একতা, মৃত্যুর একতা, শোণিত-পাতের একতা—মৃত্যু সময়ে তাঁহাদের সর্ব্বথা একতা

হইল। হায়! জীবনে তাঁহাদের একতা হয় নাই কেন? মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাদের মিলন হয় নাই কেন? জীবনে যদি তাঁহাদের মিলন বা একতা ঘটিত, তবে এরূপ যন্ত্রণায় জীব-লীলা সাঙ্গ করিয়া অকালে ভব-রঙ্গ-ভূমি হইতে প্রস্থান করিতে হইত না। হায়! তাহা হইলে, তাঁহাদের জীবন-নাটকের যবনিকা পতন এতাদৃশ ভয়াবহ ঘটনায় পর্য্যবসিত হইত না। জীবনে মিলন ও একতা হয় নাই বলিয়াই, এ প্রণয়-তরুতে এই বিষময় ফল ফলিল। যত্নে বা আদরে, রোদনে বা অনুতাপে, উপদেশে বা শিক্ষায় ইহার ফল অন্যবিধ হইত না। অপাত্রে বা অসময়ে প্রেম জন্মিলে, পরিণামে তাহা পরিতাপের কারণ হইবেই হইবে; তাই বলিয়া যদি তুমি প্রেমের স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে চাও, তবে তোমাকে বাতুল বলিব। প্রেম কি রোধ করিবার সামগ্রী? উপদেশ দ্বারা প্রেমের পাত্র নির্ব্বাচন করিতে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। প্রণয় স্বয়ং উদ্ভূত হয়, স্বয়ং প্রবাহিত হয়, অন্য প্রবাহে স্বীয় উত্তাল বারি-রাশি ঢালিতে না পাইলে, কূল প্লাবিত করিয়া আপনিও ভাসে, অপরকেও ভাসায়। তুমি প্রণয়কে উপদেশ দিও না, তাহাতে তাহার গতি রোধ হইবে না। শিক্ষা লইয়া তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইও না, প্রণয় সে সম্বন্ধে অন্ধ; যত্ন বা আদর দেখাইয়া প্রণয়কে ভুলাইতে যাইও না, প্রণয় ভুলিবার পাত্র নহে। যত্নে বা আদরে, অযত্নে বা অনাদরে তাহার সমান বৃদ্ধি। যদি তুমি কোন স্থলে এ সত্যের বিরোধ দেখিয়া থাক, জানিও তথায়—প্রণয়ে পবিত্রতা নাই। সে প্রণয় হাটের সামগ্রী। কথা দিলে, যত্ন দিলে, আদর দিলে, অর্থ দিলে সে প্রণয় কিনিতে পাওয়া যায়। তাহা কৃত্রিমতা, বিকার, মোহ, লিপ্সা প্রভৃতির নামান্তর। তাহা হিংস্র সিংহ, নিরীহ মেষ সকলেরই আছে। সে প্রণয়ের সহিত এ প্রণয় মিশাইও না; ছিঃ! সে প্রণয় প্রতিদান চায়, ঋণ দিয়া সুদ সমেত শোধ চায়, সে প্রণয়ের—লাভের বাঞ্ছা, তাহা ব্যবসাদারী। আর যাহা প্রণয়, প্রণয় বলিলে যাহা বুঝিতে হয়, যাহা সংসারে অতি দুর্ল্লভ সম্পত্তি। যাহা কল্পনায় আইসে, কার্য্যে প্রায় পাওয়া যায় না, যাহা—(কি বলিয়া বলিব কি?) জীবনে স্বর্গ দিতে পারে, তাহার প্রধান দোষ, সে অন্ধ। তাহাকে তুমি দেও ভাল, না দেও ভাল, সে আপনি অপরকে দিয়া সুখী। সে তোমার নিকট হইতে পাইবার প্রত্যাশা রাখে না। তাহার পাত্রাপাত্র বিচার নাই।

অসময়ে ও অপাত্রে প্রণয়-রত্ন উপহার দিতে গিয়া, সংসারে সময়ে সময়ে যৎপরোনাস্তি বিপদ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। আমাদিগের প্রস্তাব-বর্ণিত ব্যাপার তাহারই একটী দৃষ্টান্ত মাত্র।

ইতি তৃতীয়াংশ সমাপ্ত।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

মানবজাতির পরলোক।

পরলোক সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের এখন বিশ্বাস এই, মৃত্যুর পর জীবাত্মা জীবিত থাকিয়া পরলোকে ইহজীবনের কার্য্যের ফলাফল স্বরূপ সুখ দুঃখের ভাগী হয়। যে উদ্দেশে এইমত সৃষ্ট ও প্রচারিত হয়, মানবসমাজে সে উদ্দেশ্য কেমন ব্যর্থ হইতেছে, বরং এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ মানবসমাজে কত অনিষ্টপাত হইতেছে তাহা আমি পূর্ব্বে আর্য্যদর্শনে * একপ্রকার প্রদর্শন করিয়াছি। তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যখন এই মত ও বিশ্বাসের উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না, বরং এতদ্বারা পৃথিবীর ইষ্ট অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট ঘটিতেছে তখন ইহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। মানবসমাজ হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই মত সম্বন্ধে এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; আবার যে সুধীগণ এই মতের যৌক্তিকতা দেখিয়াছেন, তাঁহারাও ইহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া ইহা পরিত্যজ্য বলিয়া প্রথিত করিয়াছেন। বাস্তবিক এই মত কেবল অনুমান মূলীয়। কোন অকাট্য প্রমাণ ও সত্যের উপর ইহা স্থাপিত নহে। এই মত যদি বৃথায় অপসিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তি বলিয়া স্থির হইল তবে কি মানবের পরলোক নাই? আমরা বলি মানবের পরলোক আছে। সে পরলোকও মৃত্যুর পর; সে পরলোকেও ইহ জীবনের কার্য্যের ফলাফল স্বরূপ সুখ দুঃখের ভাগী হইতে হয়। তবে প্রভেদ এই প্রাচীন মত কেবল অনুমান মূলক অপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ এই নব্য মত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এই জন্য ইহার প্রমাণ অনাবশ্যক।

আমরা এ জগতে প্রকৃতির তিন প্রকার মূর্ত্তি দেখিতে পাই। প্রকৃতি এ জগতে জড়, উদ্ভিদ, ও জীবরূপে কার্য্য করিতেছেন। এ তিনই প্রকৃতির রূপ ও কার্য্য। যে প্রকারেই কেন প্রকৃতি এই তিনরূপে পরিণত হউক না, এই তিনরূপে পরিণত হইয়া ইহা চিরকাল একভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ভৌতিক জগতে আমরা সকলই জড়ময় দেখিতে পাই, তাহাতে প্রাণের কোন কার্য্য ও চিহ্ন দেখি না। উদ্ভিদ জগতে প্রাণের সঞ্চার। কিন্তু এজগতে প্রাণমাত্র; প্রকৃতির যে শক্তির সমষ্টি হইলে প্রাণ চৈতন্য প্রাপ্ত হয় উদ্ভিজ্জে সে চৈতন্যের কিছুই চিহ্ন নাই। যাহাকে আমরা জীব জগৎ বলি সেই প্রাণী জগতে চৈতন্যের সঞ্চার দেখিতে পাই। প্রকৃতিকে আমরা প্রথমে এই

* অগ্রহায়ণ ও পৌষ—১২৮৩ সাল।

তিন মহা শ্রেণীতে দেখিতে পাই। জড় হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে চৈতন্য। জড় প্রকৃতি, প্রাণ ও চৈতন্য-বিরহিত এবং কেবল জড়-ধর্ম্ম-সমন্বিত; উদ্ভিদ প্রকৃতি চৈতন্য-বিরহিত এবং জড় ও প্রাণ-ধর্ম্ম সমন্বিত; জীব-জগতে সকলই বর্ত্তমান—জড়ধর্ম্ম, প্রাণধর্ম্ম ও চৈতন্য। প্রকৃতি এই শ্রেণীতে উত্থিত হইয়া জীব-জগতে পরিণত ও পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার পর প্রকৃতির উন্নতির আর কি আছে, তাহা আমরা জানি না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি কিরূপে উন্নত ও পরিণত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? এ জগতেই যখন আমার প্রকৃতির এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ উন্নতি দেখিতে পাই, তখন জগদন্তরে তাহার আরও উত্তরোত্তর উন্নতি ও পরিণতি থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

জড় জগৎ ছাড়িয়া দিয়া প্রাণি-জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই, আবার প্রাণি-জগতের পদার্থ-সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র উদ্ভিদ হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত অসংখ্য তৃণ, লতা, তরু ও বনস্পতি সজ্জিত আছে। ইহাদিগের প্রাণের তারতম্য আছে। কেহ অল্পায়ুঃ-বিশিষ্ট; কেহ বা অল্প আঘাতে বিনষ্ট হয়, কেহ বা কুঠারাঘাতেও বিনষ্ট হয় না। কেহ নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন, কেহ বা বৃহদায়তন। আবার এমত সকলও উদ্ভিজ্জ আছে, যাহা উদ্ভিজ্জ ও জীব-জগতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জও বলা যাইতে পারে, জীবও বলা যাইতে পারে। তাহারা যেন এই দুই জগতের শৃঙ্খল। তাহারা উদ্ভিজ্জ-প্রায় জীব এবং জীব-প্রায় উদ্ভিজ্জ। এই শ্রেণীতে প্রকৃতি যেন উদ্ভিজ্জ হইতে, জীব-জগতে, উত্থিত হইয়াছে। এই শ্রেণী অতিক্রম করিয়া যখন জীব-জগতে আসিয়া পড়ি, তখন একেবারে অসংখ্য জীবশ্রেণী মধ্যে হারাইয়া যাই। দেখিতে পাই—অতি ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত জীবসজ্ঘ পর্য্যায়ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। জলচর, স্থলচরের প্রকৃতিতে উত্থিত হইয়াছে। মৎস্য, বিমানচারী বিহঙ্গগণের ন্যায় পক্ষ ধারণ করিয়াছে। দ্বিপদ—চতুষ্পদের সমতুল্য হইয়াছে, চতুষ্পদ, দ্বিপদের ন্যায় প্রকৃতি ধারণ করিয়াছে। জীবভেদে চৈতন্যের তারতম্য হইয়াছে। ক্ষুদ্রতম কীটাণুর অচৈতন্যবৎ চৈতন্য হইতে মনুষ্যের প্রখরা বুদ্ধিশীল চৈতন্য পর্য্যন্ত চৈতন্যের ক্রমশই উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রাণি-জগতের এই শ্রেণী চলিয়া আসিতেছে। ইহা চিরকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই শৃঙ্খলশ্রেণীর কোন শৃঙ্খল কেহ কখন ভগ্ন দেখে নাই। প্রকৃতি সমস্ত উদ্ভিজ্জ ও সমস্ত জীব চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; এক দেশে যদি এক জাতি উন্মূলিত ও

একেবারে বিনষ্ট হয়, অন্য দেশে তাহাকে জীবিত করিয়া দেন। মহাসমুদ্র-মাঝে নূতন নূতন দ্বীপ-পুঞ্জ দৃষ্ট হইতেছে, অমনি কোথা হইতে, তাহাতে অগণ্য বাসোপযোগী প্রাণি-পুঞ্জ সঞ্জাত হইতেছে। প্রকৃতির সৃষ্টিকরিণী শক্তি দ্বারা প্রকৃতি এই সমুদায় সৃষ্টি করিতেছেন। যেরূপে আদিতে সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, আজিও সেই রূপে সৃষ্ট হইতেছে। যে সৃষ্টি-বীজ প্রকৃতিতে নিহিত আছে, সেই বীজ হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাণি-শ্রেণীর কোন জাতি একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে না। পৃথিবী হইতে এক জাতিকে একেবারে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, এমত শক্তি পৃথিবীতে কিছুই নাই। উদ্ভিজ্জের কোন জাতি আজি পর্য্যন্ত একেবারে উচ্ছেদ হয় নাই, জীবের কোন জাতীয় জীব পৃথিবী হইতে একেবারে অদৃশ্য হয় নাই। প্রকৃতির যদি কখন বিনাশ হয়, তবেই তাঁহাদিগের বিনাশ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নহিলে নহে।

কিন্তু প্রকৃতি কি নিয়মে এই প্রাণি-জগৎকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল বৃক্ষ ছিল, আজি হয় ত সে সকল বৃক্ষের চিহ্ন-মাত্র নাই। এক শত বর্ষ পূর্ব্বে যে সমস্ত জীব জীবিত ছিল, আজি হয় ত তাহারা কেহই বাঁচিয়া নাই। এক্ষণে নূতন পাদপ-শ্রেণী উত্থিত হইয়াছে; নূতন জীব-বংশ জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর উপর বিচরণ করিতেছে। তবে জাতি সমুদায় বজায় রহিয়াছে। কেবল প্রভেদ এই, দেশভেদে, পরিপুষ্টির সামগ্রী ভেদে হয় ত জাতীয়স্থ প্রতি বৃক্ষ ও প্রতি জীব ঠিক পূর্ব্বকার মত হয় নাই। কাহারও হয় ত উন্নতি হইয়াছে, কাহারও অবনতি ঘটিয়াছে। কোন আম্র বৃক্ষে অধিকতর সুস্বাদু ফল ফলিয়াছে, কোন বৃক্ষের ফল অধিকতর অম্ল-রসাক্ত হইয়াছে। কোন বটবৃক্ষ উচ্চতর হইয়াছে, কোনটী বা ক্ষুদ্রতর হইয়া গিয়াছে। জীব-সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। যে সমস্ত গাভী শত বর্ষ পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে তাহার হয় ত একটীও জীবিত নাই। নূতন এক বংশ গাভী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গাভী-কুল ঠিক সেই একই আছে। শত বর্ষ পূর্ব্বে যেমন কতকগুলি গাভী কৃষ্ণকায়, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি বৃহদাকার, কতকগুলি খর্ব্বকায়, কতকগুলি বৃদ্ধ, কতকগুলি সবল তরুণ-বয়স্ক, কতকগুলি পয়স্বিনী, কতকগুলি পয়োহীনা। যাহা গাভী-সম্বন্ধে সত্য, তাহা সকল জীব-জাতিতেই সত্য। তবে প্রভেদ এই, প্রকৃতি এক পুরাতন বংশের পরিবর্ত্তে এক নূতন বংশ আনিয়াছেন। পুরাতন বংশের কিছু চিহ্ন-মাত্র নাই। আর এক প্রভেদ এই, পুরাতন বংশ যেমন দেশে জন্মিয়াছিল, তাহাদিগের পুষ্টি সাধন যেমন হইয়াছিল, তাহারা তদ্রূপ দেহ ও গুণ-বিশিষ্ট হইয়াছিল।

এক্ষণকার জীব-সমূহের মধ্যে যে যেমন দেশে জন্মিয়াছে, যাহার যেমন পুষ্টি-সাধন হইয়াছে, তাহার দেহ ও গুণ তদনুরূপ জন্মিয়াছে। প্রকৃতির এ নিয়মের কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পুরাতন জীব-সমূহ সকলেই গতাসু হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি কিছুই হারায় নাই। তাহার ক্ষতি পূর্ণ হইয়াছে। আজি মহামারীতে হয় ত বহুসংখ্যক জীব পতিত ও পঞ্চত্ব পাইল, আবার এক শত বর্ষ পরে সেই মহামারীর পূর্ব্বে যেমন সংখ্যা ছিল, হয় ত তাহার সমান, না হয় ত তাহার দ্বিগুণ জীবের সংখ্যা হইল। মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম মাত্র। যখন পৃথিবীতে যাহার অবস্থান নিষ্প্রয়োজন, অথবা এত দুর্ব্বল ক্ষীণকায়, যে জীবন ধারণ করা একেবারে অসম্ভব, সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। তাহার দেহোপকরণ-সমুদায় পৃথিবীতে মিশাইয়া গেল। তাহাতে পৃথিবী পরিপুষ্ট হইল; পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান দেহীদিগকে পরিপুষ্ট করিল। তাহারা আবার নূতন জীবজাতির জন্মদাতা হইল। এক দিকে যে ক্ষতি হইল, অন্য দিকে তাহার পূরণ হইল। কেবল প্রভেদ এই, পূর্ব্বে যে জাতি যে লোকে জন্মিয়াছিল, পরে সেই জাতি তাহার পরলোকে নব-দেহ-বিশিষ্ট হইয়া, নব বলে বলীয়ান্ হইয়া, এবং নব জীবনে জীবিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। মৃত্যু কেবল দেহের পরিবর্ত্তন-মাত্র। তাহা ইহ ও পরলোকের মধ্যস্থিত ব্যবচ্ছেদ বই আর কিছুই নহে।

মানবও প্রাণি-জগতের অন্তর্গত। মনুষ্য জীব-জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিভুক্ত। প্রকৃতি অপরাপর জীব-জাতিকে যে নিয়মে সৃষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন, মনুষ্যকেও ঠিক সেই নিয়মে সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যান্য জীব-জাতির জ্ঞান ও সংস্কার যেমন তাহাদিগের জীবিকা-বিধানের ও প্রাণধারণের উপযোগী, মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধি ঠিক তাহার জীবনোপযোগী। তদ্ব্যতীত এ জ্ঞান ও বুদ্ধি আর কিছুই নয়। তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতার ক্ষতি তাহার বুদ্ধি পূরণ করিয়া দেয়। যেখানে বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়াছে, সেই বৃক্ষ-তলে ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। যে বনে ব্যাঘ্র ও সিংহ থাকে, সে বনে শৃগাল থাকিতে পারে না। যেখানে মনুষ্য-সমাজ, সেখানে সিংহ ও শার্দ্দূলের অবস্থিতি নাই। দুর্ব্বল, সবলের নিকট তিষ্ঠিতে পারে না। প্রকৃতি যে নিয়মে নিকৃষ্ট জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গকে রক্ষা করিতেছেন, মনুষ্যকেও সেই নিয়মে রক্ষা করিতেছেন। অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের জন্ম-মৃত্যু যেরূপ, মনুষ্যেরও ঠিক তদ্রূপ। অন্যান্য জীব-জাতি যেমন বহুকাল হইতে রক্ষিত হইতেছে, মনুষ্য-জাতিও তদ্রূপ। মনুষ্যজাতিও বংশ-পরম্পরায় জীবিত ও রক্ষিত রহিয়াছে। তাহার সময়ে সময়ে লোক-সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয় মাত্র।

নহিলে মনুষ্যজাতির কিছু প্রভেদ ঘটে নাই। দেশ, কাল ও অবস্থা-ভেদে সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতেছে। দেশ, কাল ও অবস্থা-ভেদে মনুষ্য-সমাজেরও অবস্থা বিভিন্ন হইতেছে। মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধি যেরূপে অন্যান্য জীবজাতির জ্ঞান ও সংস্কার হইতে প্রভিন্ন হইয়াছে, সেই বুদ্ধির কার্য্য ও সেই কার্য্যের ফলাফল অন্যান্য জীবের অবস্থা হইতে তাহার অবস্থাকে বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে। যাহা বুদ্ধির কার্য্য, তাহা প্রকৃতির সংরক্ষিণী শক্তির কার্য্য-মাত্র। মনুষ্যজাতি ও সমাজের সংরক্ষিণী শক্তির বৃদ্ধি যাহা, বুদ্ধিরও উন্নতি তাহা। সকল জীবজাতিরই জ্ঞান ও সংস্কার যেমন এক অথবা ততোধিক বিষয়ে প্রভিন্ন হইয়াছে, মানব-চেতনা তদ্রূপ বুদ্ধিশীল হইয়া অপর জাতীয় চেতনার সহিত প্রভিন্ন হইয়াছে। অন্যান্য জীব-জাতিতে যেমন কেবল প্রকৃতিরই কার্য্য দেখিতে পাই, মানব-জাতির অবস্থা ও কার্য্যেও সেই প্রকৃতির কার্য্য। মনুষ্য-সমাজের উন্নতি ও অবনতি প্রকৃতির অবস্থা ও ক্রীড়ামাত্র।

সুখ ও দুঃখ, উন্নতি ও অবনতি আপেক্ষিক ভাব-মাত্র। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানব-সমাজ যে অবস্থায় ছিল, এবং ঠিক তাহার পঞ্চাশ বৎসর পরে সমাজ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজিকার সমাজ ঠিক ইহার পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বকার সমাজের সহিত তুলনায়, সুখ-দুঃখ-সম্বন্ধে ঠিক তদবস্থায় অবস্থিত। এক্ষণকার সমগ্র মনুষ্য-সমাজের আভ্যন্তরিক ভিন্নতা আছে বটে; ইহার মধ্যে অতি বর্ব্বর সমাজও আছে, অতি সুসভ্য সমাজও আছে, কিন্তু প্রত্যেক সমাজকে স্বতন্ত্ররূপে বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রতীত হইবে যে, প্রত্যেক সমাজের উন্নতি ও অবনতি, সুখ ও দুঃখ তাহার প্রতি ব্যক্তির কার্য্যকলাপ অথবা আলস্যের ফল। প্রতি ব্যক্তির সমষ্টিতে সমাজ গঠিত। সুতরাং প্রতি ব্যক্তির কার্য্যের ও চরিত্রের ফলাফল সমাজে প্রতীত হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি সমাজের লোকেরা যেরূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহার প্রভাব দশ বৎসর পরে পরিদৃষ্ট হইবে। ইয়োরোপীয় সমাজের বর্ত্তমান উন্নতি এক দিনে হয় নাই। সেই উন্নতি উনবিংশ শতাব্দীর ফল। সে উন্নতি এক জনের চেষ্টায়ও সাধিত হয় নাই; তাহা সমগ্র জাতীয় জীবন ও কার্য্যের ফল-স্বরূপ। আবার বর্ত্তমান বংশধর-গণ যে প্রকার সুকার্য্য ও অকার্য্য করিয়া যাইতেছেন, পর-বংশে তাহার ফলাফল স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইবে। ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাহা সম্ভোগ করিবে। এইরূপ সমাজ-মধ্যে এক এক লোক-প্রবাহ আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য-কলাপের ফলাফল সমাজ-মধ্যে চিরকালের জন্য রাখিয়া যাইতেছে। সমাজ-মধ্যে কেহ বৃথায় জন্মে নাই,

বৃথায় চলিয়া যায় নাই। সকলেই সমাজকে—হয় উন্নত, না হয় সমভাবে অবস্থিত, না হয় অবনত করিতেছে। বর্ত্তমানে কিছুই বুঝা যায় না, ভবিষ্যতে সকলই স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতে থাকে। এক্ষণকার ভারতীয় সমাজ যে কত কালের জড়তা, দুষ্কৃতির ফল—তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি। মৃত্যু হইলে দেহ ও তৎ-সহিত আত্মার ধ্বংস হইল সত্য, কিন্তু দেহীর জীবনের কার্য্য-পরম্পরার ফলাফলের ধ্বংস নাই। তাহা ভবিষ্য পুরুষে সম্ভোগ করিতে লাগিল।

অতএব এক লোক-প্রবাহ সমাজকে যে অবস্থায় রাখিয়া যাইবে, তাহার পরবর্ত্তী লোক-প্রবাহ সমাজকে তদ-বস্থায় দেখিতে পাইবে। এই পরম্পর লোক-প্রবাহ-শ্রেণী ইহলোক ও পর-লোক-বাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। ইহলোকে এক লোক-প্রবাহ যেরূপ কার্য্য করিয়া গেল, তাহার অব্যবহিত পরলোকে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা সেই কার্য্যের ফলভোগী হইবে। আমি সত্যই মরিয়া আবার জন্মগ্রহণ করিতেছি না বটে, কিন্তু আমার পর যিনি জন্মিবেন, তিনি আমার পরলোক-বাসী। সার কথা এই, মানব-কুল ইহলোকে অদৃশ্য হইতেছে, এবং মানব-কুল আবার পরলোকে জীবিত হইতেছে; মানব-কুল সমাজকে যেরূপে রাখিয়া যাইতেছে, মানব-কুল তাহার তদ্রূপ ফলভাগী হইতেছে।

আমরা মানব-সমাজকে যখন এইরূপ সময় দ্বারা বিভক্ত করি, তখন আমরা মানব-জাতির ইহলোক ও পরলোক কি, বুঝিতে পারি। এই ইহলোক প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, পরলোকও প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। মানব, ইহলোকে ধ্বংস হইতেছে বটে, কিন্তু পরলোকে জীবিত হইতেছে। প্রকৃতি দেখে না, তুমি বর্ত্তমান রহিলে কি না, প্রকৃতি দেখিবে, মানব বর্ত্তমান রহিল কি না। ইহলোক ও পরলোকে মানব-জাতির ক্ষতি পূরণ হইতেছে কি না। অদ্য কতিপয় ব্যক্তির ধ্বংস হইল বটে, কিন্তু অদ্যই অপর কতিপয় ব্যক্তির জন্ম ও উৎপত্তি হইল। প্রকৃতি, মানব-জাতিকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়া পরলোক জীবিত করিল। প্রকৃতির নিয়ম একই। তিনি গো, মহিষকে যে পরলোক দিয়াছেন, মনু-ষ্যকেও সেই পরলোক দিয়াছেন।

সমাজস্থ প্রতি ব্যক্তির কার্য্যের উপর যখন মানব-জাতির পরলোক নির্ভর করিতেছে, তখন প্রতি ব্যক্তির উচিত—সেই পরলোকের উন্নতি সাধন করেন। যিনি যে সমাজভুক্ত হউন না কেন, তাঁহার সেই সমাজের যথাবিধি উন্নতি সাধন করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেহ ও আত্মা সকলই ধ্বংস হইবে সত্য, কিন্তু আমরাই আবার সন্তানরূপে সমুদ্ভূত হইলে, পরলোকে আপনাদেরই কার্য্যে ফলভাগী হইব। এই কথা বলিবা-মাত্র একটী জটিল পূর্ব্ব পক্ষে উত্থিত হয়।

যাঁহারা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিয়া অন্যবিধ পরলোক স্বীকার করেন, তাঁহারা বলিবেন, মৃত্যুতে যদ্যপি আমার সমুদায় ধ্বংস হইল, তবে আর আমিই সন্তান-রূপে কি প্রকারে সম্ভূত হইব? আমার ত কিছুই রহিল না; তবে আর আমি কই? আমি আর পরের জন্য ইহজীবনে কষ্ট পাইব কেন? আমার সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে কেন?

এই পূর্ব্বপক্ষে আবার সেই গোড়ার কথা উত্থিত হইল। আমরা পূর্ব্বে এক স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি, মানবজাতি কতদূর স্বর্গ ও নরকের বিশ্বাস দ্বারা ইহজীবনে চালিত হয়। শুদ্ধ নরক-যন্ত্রণা-ভয়ে অল্প লোকেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় এবং অল্প লোকেই শুদ্ধ স্বর্গ-সুখ-ভোগ জন্য দান ভিন্ন অন্যান্য সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এক্ষণকার সমাজের উন্নতি যে শুদ্ধ পরলোক বিশ্বাস দ্বারা সাধিত হইয়াছে তাহা আজি পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। মানবের যশোলিপ্সা ও সুখেচ্ছা এত প্রবল; তাহার আত্মম্ভরিতা, আত্মাদর, এবং আত্মপ্রসাদের সুখলিপ্সা ও এত প্রবল যে আহার সৎকার্য্যের প্রবৃত্তির অভাব হয় না। ইহ জীবনেই সুখসম্ভোগ করিব, এই ইচ্ছাও মানবজাতির অধিকাংশকে কার্য্যে ও সদনুষ্ঠানে নিয়োজিত করে। যাহারা নিতান্ত পরলোকের প্রতি তাকাইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বরং ইহলোকের সুখের প্রতি উদাসীন হইয়া অনেক প্রকৃত ও সামাজিক সদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হয়। মানব আপন প্রকৃতি-ধর্ম্মে আলস্য পরিত্যাগ করিবে, এবং কার্য্যে ও সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। যত দিন ইউরোপে পরলোক ও ধর্ম্মের ভাব প্রবল ছিল, তত দিন তাহার অধিক সামাজিক উন্নতি সাধিত হয় নাই। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ভাব ও পরলোকের ভাব রিপু-রূপে প্রবল থাকাতে, ইহা অধঃপাতে গিয়াছে। এই ভাব যে পরিমাণে কমিবে, যে পরিমাণে ভারতবাসিগণ প্রকৃতিস্থ ও মানবীয় প্রকৃতি-ধর্ম্মে উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করিবে, সেই পরিমাণে তাহার উন্নতি-সাধন হইবে। ইউরোপে ক্রমশঃ যেমন ধর্ম্মের উষ্ণতা শীতল হইয়া আসিল, অমনি তাহার প্রকৃত উন্নতি আরব্ধ হইল। আমরা এ কথা বলি না, মানব প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হউক, কিন্তু আমরা বলি, প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা অগ্রে নির্ণীত হউক। যাহা এত কাল ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং তন্মধ্যে কত অপধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে প্রথিত আছে, তাহা আধুনিক সমাজের বিচার্য্য বিষয়। মানব-সমাজ এত প্রাচীন হইয়াছে, মানব-ইতিহাস এত পুরাতন হইয়াছে যে, এক্ষণে প্রাচীন মতামত সকলের অনেক দূর পরীক্ষা হইয়াছে। তন্মধ্যে কত দূর সত্য ও অসত্য আছে, পৃথিবীর এত কালের

সামাজিক পরীক্ষায় এক বার তৎসমুদায়ের বিচার করা আবশ্যক। পূর্ব্বকালে কোন বিষয়েই সর্ব্ব সমাজের পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করিবার পন্থা ছিল না। এক্ষণে পৃথিবীস্থ সমস্ত সমাজ এত দূর পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিয়াছে, এবং সকল সমাজ-সম্পর্কীয় জ্ঞানের এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, এক্ষণে সেই পূর্ব্বকালীন অন্ধ মত, অজ্ঞানতা-মূলক কুসংস্কার ও অপধর্ম্মের বিশ্বাসাদির পরীক্ষা করিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে সকল বিষয় আলোড়িত করিয়া; এত দিনকার ঐতিহাসিক জ্ঞান দ্বারা ও সমাজতত্ত্বের পরীক্ষা দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব-নির্ণয় করা উচিত।

শ্রীপু—

বঙ্গ-বিধবা। (১)

কে আছে এমন (বল) আমাদের মত
জনম-দুখিনী, অনাথিনী আর এ তিন ভুবন।
গেছে সুখ যত ছিল সমুদয়, হারায়েছি যবে পতি-দেবতায়,
গতি-হীন হ'য়ে আছি বসুধায়, ঘটেছে ললাটে জীবনে মরণ।
সবে বলে শুনি শাস্ত্রের বিধান, অবিভেদে জীব মঙ্গল নিদান,
বিধবার ভাগ্যে অসি খরশান, কেন তবে হেরি হায়,
দয়া-মায়া-পূর্ণ এ ভারত-ধাম, এ হতভাগিনী জনে কেন বাম,
কেন তবে মোরা কাঁদি অবিশ্রাম, শুনেও শ্রবণে করে না শ্রবণ।
কারে বলি দুখ কেবা শুনে আর, কে আছে জগতে বলিতে আমার,
আশ্রয়-বিহীন তরঙ্গেরি তৃণ মত ভাসি অনিবার,
অনন্ত দুঃখের এ প্রবলানলে, কেন দহি মোরা কি পাপের ফলে,
দোষ দিব কায়, কারো দোষ নয় সকলি ললাট-লিপির লিখন। শ্রীদু, না, চ।

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বসন্তোপহার (গীতিকাব্য-সংগ্রহ)। রায় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৷৷০ আনা। বহুদিন হইল, এই কাব্য আমোদের হস্তগত হইয়াছে। অনবকাশের নিমিত্ত পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, বোধ করি, তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্তা ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিবেন।

সিটী কালেজের সম্পাদক, বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের নামে বসন্তোপহার উৎসর্গী-

(১) রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কৃত হইয়াছে। উমেশ বাবুকে সুচরিত্রের আদর্শ পুরুষ বলিয়া উপহার দেওয়ার কাব্যকারের লেখনী সার্থকতা লাভ করিয়াছে। গদ্যে উপহার দিতে গিয়া কবি "যতনের (ধন)" উপহার দিয়াছেন, "যতনের রতন" দিলেও ত সুন্দর হইত!

আমরা বসন্তোপহার নামের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কেন না সন্দর্ভ-গুলির প্রকৃতি বুঝিয়া দেখিয়াছি। সমাজ-দুর্গতি নাটকে ও ধর্ম্ম পুস্তকে, নবাখ্যানে ও প্রহসনে বক্তৃতায় ও উপদেশক কথায় চিত্রিত হইয়া থাকে—কাব্যেও হওয়া আবশ্যক। আহ্লাদের সহিত বলিতেছি,এই কাব্যে সমাজের বর্ত্তমান অপকৃষ্ট চিত্রের প্রতি কটাক্ষ আছে; সুতরাং ইহাকে দেশের একটী শুভ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। ইহার কোন কোন কবিতা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি ভূমিকার এক স্থানে লিখিয়াছেন—"বঙ্গভাষার অদ্বিতীয় লেখক ভূতপূর্ব্ব বঙ্গদর্শন-সম্পাদক যে শ্রেণীর লেখক," সেই শ্রেণীস্থ এক ব্যক্তি গ্রন্থকর্ত্তার কবিতার প্রশংসা করায়, তিনি এই পুস্তক-প্রকাশনে সাহসী হইয়াছেন। এই অজ্ঞাত-নাম্নী সমালোচক যিনিই হউন, তিনি সৎ পরামর্শ দিয়াছিলেন, অবশ্য বলিতে হইবে। আক্ষেপের বিষয়,ইহার মধ্যে যে সকল অপক,অস্ফুট মত ও ভাব রহিয়াছে; সেই গুলি না থাকিলেই উত্তম হইত। দৃষ্টান্ত-স্থলে বলা আবশ্যক, 'বঙ্গের প্রতি' সন্দর্ভে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল পুরুষ-কুলের নামোল্লেখ করিতে গিয়া "দ্বারকানাথ," "মাইকেল" ও "দীনবন্ধুর" নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইল না। এবং "বঙ্কিম" "রমেশ" "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" ও "সাধু কেশবের"নামে বর্ত্তমান কালিক বাঙ্গালার গৌরবের একশেষ হইতে পারে না। অতীত কালে অনেক মহাপুরুষ ছিলেন—যাঁহারা বাঙ্গালায় এক একটী নবীন যুগের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন—যাঁহাদের বিষয় সর্ব্ব প্রথমে ও প্রধানত বলা আবশ্যক ছিল, তাঁহাদের পবিত্র নামাবলি প্রতি বাঙ্গালির যপ-মালার ন্যায় ব্যবহার্য্য হওয়া উচিত। তাঁহাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত কিশোরী চাঁদ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান-কালিক বহুল স্বদেশহিতৈষী, সমাজ-সংস্কারক,গ্রন্থকার ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদেরও নাম কীর্ত্তিত হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। যাহা হউক, এই পুস্তকের এই দোষ বাদ দিলে, অনায়াসে বলা যাইতে পারে—আমাদের দেশে এখন বঙ্গীয় মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও গীতি-কাব্যের উন্নতি হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সেই শ্রেণীর পুস্তকাবলির ভুরি প্রচার চলিতেছে। এই পুস্তক তাহার অন্যতম প্রমাণ। ফল,কাব্যামোদী ব্যক্তি বসন্তোপহারের সরস কবিতা পাঠ করিলে, আমোদিত হইবেন।

সমর-শেখর।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"*K. Rich.*—Marshal, command our officer-at-arms
Be ready to direct these alarms."

—*King Richard. II.*

সুবিস্তীর্ণ সভামণ্ডপস্থ বিবিধ রত্ন-রাজি-বিরাজিত দান্ত সিংহাসনোপরি কালিকুটাধিপতি সামরিণ উপবিষ্ট হইয়া পারিষদবর্গ-সমভিব্যাহারে কি বিষয়ের কথোপকথন করিতেছেন। সম্মুখে—ঈষৎ দক্ষিণে কালকূটহৃদয় ভবানীশঙ্কর আসীন হইয়া মনোমধ্যে কু-পরামর্শ-জালের সৃজন করিতেছে। সম্মুখে ও ইতস্তত নগরের কতিপয় প্রধানতম প্রজাগণ এবং প্রধান সেনাপতি বীরেন্দ্র সিংহ বিনীত ভাবে উপবিষ্ট হইয়া নৃপতির পরামর্শ শ্রবণ করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতেছেন। অন্যান্য দিবসাপেক্ষা অদ্য সভাসদ্ গণের সংখ্যা সর্ব্বাংশে ন্যূন। উপস্থিত সকলেরই অন্তঃকরণ বিষণ্ণ ও গম্ভীর ভাবাপন্ন। সামরিণ চতুর্দ্দিকে কুটিল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "এ নগরমধ্যে কি কেহই নাই যে, দুরাত্মা দস্যুদিগের আবাস-স্থান জ্ঞাত করাইয়া রাজ্যের পরমোপকার করে। অদ্যই যেন নগর-মধ্যে ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত করা হয় যে, যে ব্যক্তি দস্যুগণের অনুসন্ধান করিতে পারিবে, সে রাজকোষ হইতে সমধিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।—আর গোয়া হইতে কালিকুট পর্য্যন্ত সকলেই যেন সতর্ক ভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করে; অল্প-মাত্র অঙ্কুশ পাইলেই শান্তি-রক্ষকেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কেন না, আর উপেক্ষিত হইবার নহে, দিন দিন দুষ্টদিগের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমশ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিশুদ্ধ শাসন-প্রণালীর অতিশয় অপকলঙ্ক ঘটিতেছে।"

"প্রভুর অনুমান সম্পূর্ণই সত্য; কেন না পূর্ব্বে এ রাজ্যে কেহই চৌর্য্য-শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না, কিন্তু আজ কাল তাহা শ্রবণ-মাত্র সকলেই ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া যায়।" ভবানীশঙ্কর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "বলিব কি, নৃশংসদের দৌরাত্ম্য এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, নিরাশ্রয়া অবলা-জাতিও নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে পায় না। চৌর্য্যবৃত্তি দূরে থাকুক, প্রত্যহ অসংখ্য নরনারী হত্যা করিয়া মানব-শোণিত-পাত-কলঙ্কস্রোতে বিমল সামরিণ-বংশের শুভ্র যশ-স্তম্ভ সমুদায় একবারে ভাসাইয়া

দিতে আরম্ভ করিয়াছে।—আমার এই বার্দ্ধক্য—এই বয়সে না জানি, কি দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইতে হইবে।”

নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভাল রমেশ কয় দিবস নিরুদ্দেশ?”

ভবানী। “আজ লইয়া প্রায় এক পক্ষ হইবে।”

সা। “তাহার পর আর কোন প্রকার সমাচার পাও নাই?”

ভ। “এক দিন জনশ্রুতি উঠিল—সতীশসিংহ নামে কোন ব্যক্তির সহিত রমেশ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতেছিল—নাগরিকগণ অনেকেই দেখিয়াছে।”

সা। “ইহা কোন্ স্থানে হইয়াছিল, জান?”

ভ। “আজ্ঞা—কোন অনির্দ্দিষ্ট পর্ব্বত-প্রদেশে।”

সা। “তাহার পর তোমরা কোন প্রকার অনুসন্ধান করিয়াছিলে?”

ভ। “করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কিছুই সত্য বলিয়া অনুমান হয় না। কেহ বলে রমেশ সতীশসিংহকে বধ করিয়াছে, আবার কেহ কেহ বলে, সতীশ রমেশকে নিহত করিয়াছে। কিন্তু এতদুভয়ের কোনটী সত্য, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর,—কারণ সেই দিন হইতেই উহাদের উভয়েরই আর কোন প্রকার অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পাপিষ্ঠ দস্যুগণই তাহার কোন দুরবস্থা করিয়াছে। প্রভো! এই বেলা অনতিবিলম্বে তাহার যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া রাজ্যের শত্রুদিগকে বিনষ্ট করা উচিত হইতেছে।—নতুবা ইহার পর সমধিক অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে।”

সামরিণ তৎক্ষণাৎ সভাসীন সেনাপতিকে অল্পসংখ্যক সৈনিক পুরুষ ও এক জন নিপুণ নায়ক নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিতে অনুমতি করিলেন। সেনাপতি উত্থিত হইয়া প্রণাম করত বিদায় গ্রহণ করিলেন। পদদ্বয় গমন করিয়া তিনি পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং সামরিণকে সম্বোধন করিয়া বিনম্র স্বরে বলিলেন “প্রভুর যদ্যপি অনুমতি হয়, তবে যাইবার সময় শ্রীচরণে এক নিবেদন করি।” “ভাল, কি তাহা বল—শুনিতে ইচ্ছা করি।” সামরিণ অন্য মনে অনুমতি করিলেন। সেনাধ্যক্ষ আশ্বাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন “প্রভো! আমি আপনার দাস, অন্যান্য সামান্য বেতনভোগী হইতে উচ্চ-পদস্থ হইলেও, রাজাজ্ঞা খণ্ডন করিতে কখন সাহসী নহি। কিন্তু জ্ঞানিগণেরও কালক্রমে বুদ্ধি-ভ্রম ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য তাঁহাদের হিতার্থী ভৃত্যদিগের তদ্বিষয়ক যুক্তি প্রণিধান করিয়া প্রভু-সন্নিধানে জ্ঞাত করান উচিত; এবং তাঁহারাও তজ্জন্য ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেন। প্রভুর বর্ত্তমান বিষয়ে (এ দাসের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন) অবিবেচকতা দর্শন করিয়া—

ধীরেন্দ্রসিংহ ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

ভবানীশঙ্কর তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—"তুমি নির্ব্বোধ, আর আমাদের অপেক্ষাও শতগুণে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি; কেবল উচ্চপদপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বৃহস্পতি অপেক্ষা জ্ঞানবান্ মনে কর;—ভাল, অদ্য বর্ত্তমান বিষয়ে আমাদের কি অবিবেচকতা দেখিলে?"

"আজ্ঞা, যে হীনবুদ্ধিতা হেতু নিরপরাধী ধর্ম্মাত্মা শশিশেখর পদচ্যুত হয়েন, এবং পর্টুগিজগণ ভারতবর্ষে প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়।"

বিচার-মূঢ় সামরিণ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভবানীশঙ্করের মর্ম্মস্থল এই তীক্ষ্ণ বাগ্বাণে বিদ্ধ হইল। তাঁহারা উভয়েই একরূপ কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "মূর্খ! সে বিষয়ে কাহার নির্ব্বুদ্ধিতা, তাঁহা তুই কি প্রকারে জানিবি?"

"আজ্ঞা! যাহারই হউক, প্রভুর নীতিজ্ঞ মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হইয়াছিল।"

ভবানীশঙ্কর অধিকতর ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন—"ধীরে! তুই আপনার মৃত্যুসোপান আপনিই সৃজন করিতেছিস্। এত বড় স্পর্দ্ধা—রাজ-সন্নিধানেই রাজনিন্দা।—এখনও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য কর্।"

"সে বিষয়ে আপনাকে সতর্ক করিতে হইবে না, আমার এ হীন বুদ্ধিতে অবশ্যই তাহা বোধগম্য হইবে।"

"তবে অনর্থক রাজাবমাননা কি নিমিত্ত করিতেছিস্?"

"সত্য কথা বলিব, তাহাতে মান আর অপমান কি?"

"তবে কি এখনও বলিবি যে, সে বিষয়ে আমাদের দোষ ছিল?"

"সহস্র বার। যত ক্ষণ না বাগিন্দ্রিয় আপন কার্য্যকরণে বিরত হইবে,—তত ক্ষণ বলিব—কালিকূটাধিপতি সামরিণ ও তাহার মন্ত্রী ভবানীশঙ্করের বিচারবিহীনতা বশত নিরপরাধী ধার্ম্মিকবর মন্ত্রি-প্রধান শশিশেখর পদচ্যুত হইয়াছেন এবং ইয়োরোপীয়গণ ভারত-মাতার হৃদয়ে পদাঘাত করিতে সাহসী হইয়াছে। যে ভূপতি খলের চাতুরী না বুঝিয়া, হিতাহিত সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া, আপনার জন্মভূমিকে, আপনার রক্ষিত রাজ্যকে অক্লেশে শত্রুহস্তে প্রদান করে, সে ভূপতি-নামে কখনই বাচ্য হইতে পারে না।"

সামরিণের সর্ব্বাঙ্গ এই দারুণ বাক্যানলে দগ্ধীভূত হইল, প্রতি লোমরন্ধ্র দিয়া যেন জলন্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; দুর্দ্দম ক্রোধবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, সিংহাসন হইতে লম্ফ দিয়া ভূমে পতিত হইলেন এবং নিজ কোষ হইতে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া "পামর! এই তোর মূর্খতার প্রতিফল গ্রহণ কর্" বলিয়া ধীরেন্দ্রের

প্রতি আঘাত করিতে উদ্যত হইবেন। অস্ত্রনিপুণ সেনাপতি "এ আপনার বৃথা উদ্যম। নিরস্ত হউন। কেন সভাস্থলে অপমানিত হইবেন।—ও আশা পরিত্যাগ করুন।" বলিয়া আপনার অসি বাহির করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। মূর্খ সামরিণ কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। বারংবার কটূক্তি প্রকাশ করিয়া,ধীরেন্দ্রকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সকল উদ্যম বিফল হইল। এত ক্ষণ ধীরেন্দ্র কেবল আত্ম-রক্ষাতে বিরত ছিলেন; কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে আর কত ক্ষণ ধৈর্য্য থাকে?—রাজাধমের তৎসমুদায় পরুষ বচন আর সহ্য করিতে না পারিয়া, আপনার তরবারি-চালন-নৈপুণ্যে তাহার হস্ত হইতে অস্ত্র ভূমে পাতিত করিলেন। এই অবসরে ভবানীশঙ্কর "প্রহরি—প্রহরি!" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল। শ্রবণ-মাত্র কতিপয় প্রহরী দ্রুত বেগে সভাভিমুখে ধাবিত হইল।

"সাবধান—সাবধান, মূর্খতাবশত আপনার প্রাণ কেহই হারাইও না" বলিয়া ধীরেন্দ্র অসি-হস্তে তাহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন। যে দুই এক জন তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ ঘোর আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। অবশিষ্ট সকলে আস্ফালন করিতে করিতে বেগে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

ধীরেন্দ্র পুনর্ব্বার সভাতলে আসিলেন, "সামরিণ! অদ্য মূর্খের ন্যায় যে কুকর্ম্ম করিলে, ইহার প্রতিফল এক পক্ষ-মধ্যে প্রাপ্ত হইবে। ঐ শুন পর্ত্তুগিজগণের তোপ-ধ্বনিতে সমুদ্র-কূল আবার প্রতিধ্বনিত হইল!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"——To arms, to arms!
To arms they flew,—axe, club, or spear,—
And mimic ensigns high they rear."

The Lord of the Isles.

উল্লিখিত ঘটনাবলির চারি দিবস পরে একদা সন্ধ্যাকালে পাণ্ডোরের ক্ষুদ্র শৃঙ্গ-সম্মুখস্থ এক প্রকাণ্ড শালতরু-তলে কয়েক জন সশস্ত্র পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া, বৃক্ষমূলাসীন অপর পুরুষদ্বয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছে। ইহারা উভয়েই একটী বৃহৎ অনতিদীর্ঘ মূলোপরি সম্মুখীন ভাবে উপবিষ্ট। বৃক্ষের ঐ মূলদেশটী ভূমি হইতে এক হস্ত পরিমাণে উচ্চ, অথচ তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট; দূর হইতে সহসা বোধ হয়, যেন কোন এক-পদ ভয়ঙ্কর রাক্ষস সগর্ব্বে পদবিক্ষেপ করিতে গিয়া, নিরুদ্ধচেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

বক্তা-দ্বয়ের সজ্জা সম্যক্‌ ভিন্ন। এক জনের পায়জামা ও অঙ্গরাখা কৃষ্ণবর্ণ বনাত দ্বারা নির্ম্মিত। মস্তকে উজ্জ্বল জরি-মণ্ডিত টুপি,—উন্নত ললাটের অর্দ্ধ

ভাগ্ ও অপর পার্শ্বের সমস্ত গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত দৃঢ়সংলগ্ন। অঙ্গরাখা কটিদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পায়জামার সহিত সম্মিলিত। এতদুভয়ের মিলনোপরি শুভ্র চর্ম্মকটিবন্ধ স্থাপিত, বাম পার্শ্বে খড়্গ; চর্ম্মকোষ লম্বমান, দক্ষিণ হস্তে সুদীর্ঘ ফলক—ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত। অপরের পায়জামা ও অঙ্গরাখা শ্যামল বর্ণ মকমল-নির্ম্মিত; মস্তকে উজ্জ্বলোজ্জ্বল রত্ন-মণ্ডিত, সৌবর্ণ-পূর্ণচন্দ্র শোভিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ। জরির কটিবন্ধে সশস্ত্র চাকচিক্যশালী ধাতুজ অসি-কোষ বিলম্বিত।—এতদ্ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র নাই। পার্শ্বস্থ শ্রোতৃগণের বেশবিন্যাস প্রায় পূর্ব্ববর্ণিত পুরুষের সমতুল্য;—কেবল তাহাদের মস্তকাবরণি শুভ্র, নিরলঙ্কার, বনাত-বিনির্ম্মিত;—ইহাতে বোধ হয়, ইহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত বীর-পুরুষের অনুচর হইবে। অপর বীর পুরুষের বেশবিন্যাসে তাঁহাকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বলিয়া অনুমান হয়। বস্তুত তাহাই বটে। ইনি দুরাত্মা সামরিণের আজ্ঞাবিদ্বেষী সেনাপতি—ধীরেন্দ্রসিংহ। যে দিবস দুরাচার সামরিণ ও ভবানী-শঙ্কর তাঁহাকে সভাস্থলে অপমানিত করে, তিনি সেই দিবস হইতে, পাপরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সমরশেখরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সমরের সহিত ইহাঁর পূর্ব্ব হইতেই বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল, এক্ষণে একত্রে এক দলভুক্ত হইয়া উভয়েই সমধিক সন্তুষ্ট হইলেন।

ধীরেন্দ্র, সমরের ফলক-দণ্ড ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "যে দিবস মূর্খ রমেশ সতীশ-সিংহকে চিমার উপত্যকায় সদলে আক্রমণ করে, সনাতন তাহার পর দিবসেই নগর-মধ্যে ঘোষণা করে যে, সতীশ-সিংহ কর্ত্তৃক রমেশ নিহত হইয়াছে। ক্রমে জনশ্রুতি উঠিয়া কখন তাহার বিপরীত, কখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ঘোষণাপত্র প্রচার করিল;—ফলতঃ কেহই তদ্বিষয়ের যাথার্থ্য বোধগম্য করিতে পারিল না, কেন না সতীশ-সিংহ সেই দিন হইতে আপনার বাটীতেই ছিলেন আর রমেশ কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার দুই দিবস পরে সামরিণ তদ্বিষয় অবগত হইয়া শুদ্ধ নগরের কয়েক জন প্রধানতম প্রজাকে আহ্বান করিয়া সভাসীন হয়েন। সমর! মূর্খের এক বার সুবিচার-ক্ষমতা শ্রবণ করুন।" ধীরেন্দ্র অবজ্ঞা-সূচক হাস্য করিয়া অবশিষ্ট ঘটনা সমুদায় পূর্ব্বাপর যথাযথ নিম্ন স্বরে বর্ণন করিতে লাগিলেন। সমরশেখর সমস্ত বিবরণ ধীর-গম্ভীর ভাবে শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "ধীরেন্! তবে পর্ত্তুগিজদিগের এ বার কি প্রকার উদ্দেশ্য?"

"বোধ হয় দেশ-জয়! আরও শুনিলাম, তাহারা এই বার এক দক্ষ সেনাপতিকে তন্নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছে।"

"দক্ষ! কোন বিষয়ে? চৌর্য্য-বিদ্যায়, না রণ-বিদ্যায়?"

পার্শ্বস্থ এক-জন অনুচর বলিয়া উঠিল:—

"বোধ হয়, দুই বিষয়েই হইবে। যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তাহাতেই দক্ষতা প্রকাশ করিবে; বেশির ভাগ প্রথম বিদ্যায়।" সমর সহাস্যে উত্তর করিলেন, তৎসঙ্গে উপস্থিত সকলের উচ্চ হাস্য উত্থিত হইয়া, বনস্থলীকে কম্পিত করিল। এই সময়ে কোন ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া সমরের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন—সনাতন! "সাবধান, সাবধান! এক দল সশস্ত্র অশ্বারোহী পুরুষ রুদ্রাণী পার হইয়া এই দিকে আসিতেছে। শীঘ্রই তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে"—বলিয়া সনাতন গাঢ় তিমিরপূর্ণ দুর্গম বন-পথ দিয়া নিরুদ্বেগে দৌড়াইয়া চলিল।

সমরশেখর শত্রুগণের অনুসন্ধানার্থ পার্শ্বস্থ-অনুচর চতুষ্টয়কে সতর্ক ভাবে গমন করিতে আদেশ করিলেন। পর-ক্ষণেই ধীরেন্দ্রও অবশিষ্ট অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনর্ব্বার ধীরেন্দ্রের সহিত প্রত্যাগত হইলেন। "ধীরেন্দ্র সিংহ! আপনি এই বর্শা হস্তে এই স্থানে অবস্থান করুন। দুরাত্মারা যেন কোন ক্রমে এ স্থান অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্র শৃঙ্গ-পার্শ্বে না যাইতে পারে" এই বলিয়া আপন হস্ত-স্থিত কলক তাঁহাকে প্রদান করিয়া দ্রুত বেগে প্রস্থান করিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে অস্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের ঝন্‌ঝনি শব্দ পশ্চাৎ হইতে শুনিতে পাইলেন, অমনি অঙ্গরাখা হইতে নিজ ছুরি বহির্গত করিয়া গভীর নিনাদে তদ্দিকে ধাবমান হইলেন; উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রধান অনুচর রুদ্রসিংহ এক পদচারী বিপক্ষ-দলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। "রুদ্রসিংহ! ধন্য তোমার সাহস, ধন্য তোমার বল।" বৈরি-দল ক্রমে পরিক্লান্ত হইয়া পৃষ্ঠদর্শন করিল। দুর্গম আরণ্য পথ, কোন্ দিকে যাইয়া নিস্তার পাইবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না; সম্মুখে যে দিক পাইল, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু তাহারা অদ্য কালপ্রেরিত হইয়া পাপ্তোরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এক দিকে মেষ পালের ন্যায় সকলে পলায়ন করিয়া অবশেষে ধীরেন্দ্রের শাণিত তরবারি-সমক্ষে পতিত হইল। ক্ষুধাতুর আহারান্বেষী মৃগেন্দ্রের ন্যায় তিনি এত ক্ষণ চঞ্চল ভাবে ইতস্তত পদচারণ করিতেছিলেন। সম্মুখে আহার্য্য দেখিয়া সবেগে ধাবিত হইলেন এবং করাল তরবারি-গ্রাসে একে একে সকলকে নিপাতিত করিলেন। এ দিকে সমর রুদ্রসিংহের সহিত তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ধীরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার বিক্রম দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সহস্র

ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। "প্রভো! অন্যান্য সকলে বলভদ্রের সঙ্গে কোন্ দিকে রহিয়াছে, আপনি এক বার ইঙ্গিত করুন।" রুদ্রসিংহের এই বাক্যানুসারে সমর ক্রমাগত তিন চারি বার গভীর তূর্য্য নিনাদ করিলেন। শেষ শব্দ প্রতিধ্বনিতে বিলীন হইতে না হইতে বলভদ্র তাহার সঙ্গিগণ-সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। "বলভদ্র! তোমরা কি কি করিলে?" তিনি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রভো! আমরা সনাতনের পরামর্শানুসারে—"

সমর এখানে বলভদ্রের কথায় ভঙ্গ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার সনাতনের সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইল?"

বল। "আমরা এখান হইতে কিয়দ্দূর যাইয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। আমাদিগকে দেখিয়াই সনাতন কহিল 'তোমরা শীঘ্র রুদ্রাণীর বৃহৎ বেত-বনের নিকট গমন কর, বিপক্ষ-দল পার হইতেছে। যাও—শীঘ্র যাও।"

"ধন্য, সনাতন! ধন্য তোমার দৃঢ়ব্রত।"

সমর বলভদ্রকে বলিতে আদেশ করিলেন।

বল। "আমরা তাহার পরামর্শানুসারে যাইয়া দেখিলাম, প্রায় সাত আট জন রুদ্রাণী পার হইয়া বেত-বনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—আর কয়েক জন আপনাপন ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে নিকটস্থ কোন বৃক্ষমূলে রজ্জুবদ্ধ করিয়া সতর্কে নদী পার হইতে লাগিল। আমরা এই অবসরে বেত-বন-পার্শ্বস্থ শত্রুদিগকে সজোরে আক্রমণ করিলাম। আমাদের এই হঠাৎ আক্রমণ দেখিয়া সকলে বিহ্বল হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। এ দিকে ইহারা উত্তীর্ণ হইয়া দ্রুত-বেগে আমাদের প্রতি ধাবিত হইল,—ফলত আমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের সম্মুখীন হইলাম। দুরাত্মারা অস্থির ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু কত ক্ষণ আমাদের অস্ত্রবেগ সংবরণ করিবে? একে একে চারি জন পতিত হইল; অবশিষ্ট দুই জনে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া নদী-মধ্যে পতিত হইবামাত্র তীব্র স্রোতবেগে ভাসিয়া গিয়াছে। পতিত চারি ব্যক্তিকে বদ্ধ রাখিয়া প্রভুর ইঙ্গিতানুসারে আমরা আসিয়াছি। অনুমতি হইলে, দুরাত্মাদিগকে প্রভু বিদ্যমানে আনয়ন করি।"

সমশেখর তাহাদের ভূয়সী প্রসংসা করিয়া স্বয়ং সানুচরে ধীরেন্দ্র সমভিব্যাহারে বলভদ্র-নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"*La Cap.*—Fye fye! what, are you mad
Jul.—Good father,—
Hear me with patience but to speak a word."

Romeo and Juliet

অদ্য বেলাপরাহ্নে গিরিবালা আপন কক্ষাবাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া নৈদাঘ গগনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন

দিবাকর কতকগুলি নানাবর্ণ রঞ্জিত মেঘখণ্ডে আবৃত হইয়া আস্তে আস্তে নামিতেছেন। তাঁহার তেজোময় উজ্জ্বল জ্যোতি সমুদায় গাঢ় মেঘ খণ্ড ভেদ করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। দিননাথ যতই নিম্নগামী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ মেঘখণ্ড সমুদায় ঐন্দ্রজালিক স্ফটিকের ন্যায় ক্ষীণপ্রভ হইতে লাগিল। এত ক্ষণ সমুদায় হীরকমণ্ডিতাবশেষ কৃষ্ণবর্ণ দৃশ্যপটের ন্যায় অভ্যন্তরস্থ অমরাবতী-তুল্য নৃত্য-শালাকে আবরণ করিয়াছিল; এই বার তাহার পরিবর্ত্তন হইল —ঐ দেখ, সমস্ত সিন্দুর মণ্ডিত—আবার ঐ তাম্রবর্ণ—ক্রমে ধূসর বর্ণ—ক্রমে নীল—এই বার সমস্ত নিবিড় কৃষ্ণবর্ণে লেপিত হইল। গিরিবালার হৃদয়াগারও অন্ধকার-পরিপূর্ণ হইল।—জগতের চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন—সমস্তই অন্ধকারময়। চমকিত হইয়া বাতায়ন-সন্নিধান হইতে সরিয়া বসিলেন। অদ্য সন্ধ্যাকালে জগতের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিল, প্রথমে সেই স্বর্ণ-মণ্ডিত সৌন্দর্য্য গৌরব, পরে ক্রমশ তাহার বিলোপ, অবশেষে নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণ। জগতের এই সমস্ত ক্রমিক বিকৃতি অবলোকন করিয়া গিরিবালা অতিশয় ক্ষুব্ধা হইলেন। যে দুর্দ্দিনে তাঁহার স্নেহময়ী জননী ভবলীলায় বিরত হইয়া স্বর্গীয় সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের সংসার-সুখের পথে এক একটী করিয়া কণ্টক-বৃক্ষ উত্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে,—সেই দিন হইতেই তাঁহাদের প্রোজ্জ্বল সৌভাগ্য-সূর্য্য গগনস্থ সর্ব্বোচ্চ আসন পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অন্ধকারময় বিপজ্জালে আবৃত হইয়াছে। অগ্রে তাঁহার পিতার মিথ্যাপকলঙ্ক ও পদচ্যুতি, তৎপরেই স্নেহশীলা মাতৃ-বিয়োগ। গিরিবালা যদিও এ সময়ে দুগ্ধপোষ্যা বালিকা ছিলেন, তথাপি যে মূর্ত্তিমতী স্নেহপ্রতিমা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকিত, অকস্মাৎ সেই সরলতাময়ী প্রতিমূর্ত্তির অদর্শন দেখিয়া মুগ্ধা বালিকা অনুক্ষণ চকিত ভাবে রোদন করিত। শোকার্ত্ত শশিশেখর তাঁহার আগমনাশা কীর্ত্তন করিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। সরল স্বভাবা বালিকা তাহাতেই শান্ত হইত, মনে করিত, যথার্থ তাহার জননী স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, এখন প্রত্যাগমন করিবেন। ক্রমে বাল্যাপগমের সহিত তৎসহচরী বুদ্ধিবৃত্তি অপগত হইলে, তারুণ্য আসিয়া অশেষপ্রকার সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিল; যাহাতে সেই কঠিন মাতৃবিয়োগ বিস্মৃত হয়, সেই চেষ্টায় নানা-প্রকার কলকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। সরলা গিরিবালা তাহাতেই শান্ত হইলেন, কিন্তু একবারে বিস্মৃত হইলেন না।

গিরিবালা বালিকা, তাহাতে আবার একাকিনী। যে ভীষণ কাল-তরঙ্গে পতিত হইয়াছেন, এ সময়ে এমন এক জন বিশ্বাসপাত্রী নায়িকা বিশেষ প্রয়োজন যে তাহাকে ধীরে ধীরে তদুপরি বহন করে। কিন্তু হায়! অভাগিনী তাহাতেও বঞ্চিতা। যে এক-মাত্র প্রিয় সখী সুরঙ্গিণী—বিপদের সময়, দুঃখের সময় সান্ত্বনাদাত্রী,—সুখ-দুঃখের সমভাগিনী—সেও পরায়ত্তা, সন্নিকটে অবস্থান করিলেও, সর্ব্বদা গিরিবালার নিকটে থাকিতে পায় না; সাংসারিক কার্য্য-হইতে অবসর পাইলেই, অমনি প্রিয়-সখীর নিকট ছুটিয়া আইসে। বাটীতে এক-মাত্র জরাজীর্ণা জননী; তাঁহারই সেবা-শুশ্রূষায় সমস্ত দিবস বিব্রত থাকিতে হয়, যে অল্প ক্ষণ অবসর পায়, সখী-সম্মিলনে অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার বাটী প্রত্যাগমন করে। তাহার মাতা এ বিষয়ে ক্ষুব্ধা নহেন। তিনি আপন তনয়া সুরঙ্গিণী হইতে গিরি-বালাকে কখন বিভিন্ন জ্ঞান করেন নাই। গিরিবালার মাতার পরলোক-যাত্রার পর দিন হইতেই তিনি মাতৃহীনা বালিকাকে আত্মজা সুরঙ্গিণীর সহিত স্তন্য দান করিয়া একত্রে এক শয্যায় উভয়কে লালন পালন করিয়াছেন। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য কাহাকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না। ক্রন্দন করিলে উভয়কেই ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া সমান মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। এক্ষণে দুর্জ্জয় বাত-রোগে জড়ীকৃত হইয়া চলৎশক্তি-হীনা হইয়াছেন, আর স্বয়ং গিরিবালাকে দেখিতে আসিতে পারেন না; তথাপি দিবারাত্রি সুরঙ্গিণীর নিকট হইতে তাহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন। অকপটহৃদয়া সুরঙ্গিণী সাশ্রু-নয়নে মাতৃ সন্নিধানে স্বীয় সহচরীর আধুনিক দুরবস্থা-বিষয় বর্ণন করে এবং মাতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়ে। গিরিবালা পূর্ব্বে প্রত্যহই তাঁহার রুগ্ন পালক-মাতাকে দেখিতে যাইতেন; কিন্তু আজ কয় দিবস না যাওয়াতে, তিনি আরও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অদ্য রোগের কিয়ৎ পরিমাণে শমতা দেখিয়া সুরঙ্গিণীর স্কন্ধে ভর দিয়া যষ্টি সাহায্যে ধীরে ধীরে গিরিবালার কক্ষ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন—গিরিবালা বাতায়ন-পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। "দিবাকর! তুমি কি চিরকালের জন্য অস্তমিত হইলে? আর কি তুমি পুনর্ব্বার সগৌরবে পূর্ব্ব দিক্ উজ্জ্বল করিয়া বিরহ-বিধুরা কমলিনীর হাস্যের সহিত এ পাপ পৃথিবীতে উদিত হইবে না?—না প্রবঞ্চনা করিয়া মন্দভাগিনী গিরি-বালার হৃদয় পরীক্ষা করিতেছ? ভগবন্! আপনি ত সর্ব্বজ্ঞানী, তবে এ জন্ম-দুঃখিনীর হৃদয়ের গূঢ় বিষয় সমুদয় অবগত হইয়াও, তাহাকে এত যন্ত্রণায় লিপ্ত করিতেছেন কেন? দেব!

এ হৃদয়ক্ষেত্রে পাপ-বীজ" কখনই ত স্থান পায় নাই, তবে কেন এখন তাহার বিষময় ফলভোগ করিতে হইতেছে?—"

সুরাঙ্গিণীর মতো আর থাকিতে পারিলেন না; সবলে তাহার স্কন্ধ হইতে হস্ত লইয়া চিরবলিষ্ঠের ন্যায় দৌড়াইয়া আসিয়া মূর্চ্ছিত-প্রায়া গিরিবালার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অঙ্কে লইতে চেষ্টা করিলেন, "ওমা, গিরিবালা! কেন মা তুই এখন উন্মাদিনী হ'লি?" সুকুমারী বালিকা আপন স্নেহশীলা ধাত্রীকে নিকটে দেখিয়া আরও দ্বিগুণ-তর বিহ্বল হইয়া পড়িল। "জননি! কেন তত যত্ন করিয়া এ হতভাগিনীকে মানুষ করিয়াছিলে—তা না হইলে এত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না!—ওঃ আর যে পারি না মা।" আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। দুর্দ্দম শোকাবেগ-উচ্ছ্বসিত হইয়া গিরিবালার কণ্ঠ রুদ্ধ করিল। তিনি শোকার্ত্তা মোহিনীর ক্রোড়-দেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া অনর্গল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুরাঙ্গিণী প্রিয় সখীর এই"রূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া সত্বর এক খানি তালবৃন্ত ঘন ঘন ব্যজন করিতে লাগিল। এবং স্বীয় জননীকে নিশ্চেষ্ট ভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া করুণ-স্বরে কহিলেন "ওকি! মা তুমিও যে একবারে পাগল হ'লে, কোথায় আশ্বাস বাক্যে উহাকে সান্ত্বনা করিবে, না বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলে!—নিরস্ত হও। মা! এ সময়ে তুমি ওরূপ কাতর হ'লে কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে তা জান?—ঐ দেখ, সখীর মুখে বাক্য নাই, নয়ন পলকহীন, সর্ব্বাঙ্গ জড়—যেন এক খানি নির্জ্জীব প্রতিমা।" মোহিনীর মোহ অপনীত হইল। তিনি চমকিত হইয়া আপন ক্রোড় হইতে গিরিবালার অশ্রু-প্লাবিত বদন ধীরে ধীরে উত্তোলন করিলেন এবং সুরাঙ্গিণী-দত্ত শীতল বারি লইয়া তাহার মুখমণ্ডল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কি প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে মুগ্ধা বালিকার বিষম শোকানল নির্ব্বাপিত হইবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এ অরুন্তুদ বিষ-জ্বলন নিবারণের যে একমাত্র অমোঘ মন্ত্র, তাহাও তিনি জানেন না। সতীশ কোথায়? কি কতিতেছেন? কি অবস্থাতেই বা আছেন? তদ্বিষয় তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে আর অধিক প্রয়াস স্বীকার করিতে হইল না। ক্ষণকাল পরেই গিরিবালার দুরন্ত মোহ অপনীত হইল। তিনি ভয়ার্ত্তা কুরঙ্গিণীর ন্যায় ত্বরিত দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মোহিনী ও সুরাঙ্গিণী কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হইলেন। "সখি! ওরূপ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কোথায় যাইতে-ছিলে?" সুরাঙ্গিণী নম্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

"না। কোথাও যাই নাই। একটী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম,

তাই এখান হইতে পলাইতেছিলাম।

"তোমার আন্তরিক দুর্ব্বলতার জন্যই ওরূপ হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, মা,তোর দুঃখিনী মায়ের একটী অনুরোধ রাখ; এখন এ সমস্ত বিষয় ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য আমার কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যা।" মোহিনী. গিরি-বালার মস্তক ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে আপন ক্রোড়ে ন্যস্ত করিলেন, এবং তাঁহার বিশীর্ণ মুখ-মণ্ডলে আস্তে আস্তে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সুরা-ঙ্গিণীও স্নিগ্ধ ব্যজনার্থে সত্বর তালবৃন্ত আশ্রয় লইলেন। ইহাদের উভয়েরই সুচারু সাহায্যে মর্ম্মপীড়িতা গিরিবালা ক্ষণকাল সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন। এই সময়ে গৃহের দ্বারদেশে কাহার পদ শব্দ শ্রুত হইল; সুরাঙ্গিণী তাহা জানিবার জন্য যেমন উত্থিত হইবে, অমনি সাহ্লাদে দেখিল, শশিশেখর কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোহিনী শশব্যস্তে মস্তকাবৃত করিয়া "সংবাদ শুভ ত? কন্যার স্বাস্থ্যরক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হইতেছে" বিনম্র বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং গিরিবালার মলিন মুখ-কালিমা দেখাইয়া দিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। "কেন, আর মনোবিকার কি বেশী বেশী হইয়াছে?" শশিশেখর করুণ ও বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া নিদ্রিতা গিরি-বালার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। বিপদের উপর বিপদ! একে প্রীতি-দায়িনী গৃহলক্ষ্মী-বিরহে তিনি এক প্রকার উন্মত্তপ্রায় হইয়া-ছিলেন, তাহার উপর আবার জীবন-স্বরূপা গিরিবালার ঐতাদৃশ অবস্থান্তর। বৃদ্ধ, দুরন্ত শোকে ও চিন্তায় একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; এবং দারুণ মর্ম্মবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন; "ওমা, গিরিবালা! আমি যে তোর মুখ দেখে সকল শোক, সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়েছিলাম, এখন কি প্রকারে তোর এরূপ দুরবস্থা দেখে জীবন ধারণে সক্ষম হ'ব? হায়! সর্ব্বস্বাপহৃত হইয়াও যে একমাত্র জীবনা-বলম্বন মহামূল্য দুর্ল্লভ রত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া গৃহশূন্যের ন্যায় দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তাহাও বুঝি নির্দ্দয় চৌর বিধি অপহরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ওঃ তবে আর এ পাপ দেহভার-বহনে ফল কি? চিরকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও কেবল এক-মাত্র আশার কুহকে এত দিন জীবিত রহিলাম; কিন্তু, হায়! তাহাও অবশেষে শূন্যে পরিণত হইল।" সুরাঙ্গিণী রোরুদ্যমান শশিশেখরকে শান্ত করিয়া বলিলেন "আপনিও যদি এ সময়ে বালকের ন্যায় রোদন করেন, তাহা হইলে এ বিষম বিপদ্‌-শান্তির উপায় কে অন্বেষণ করিবে? এ দেশে আর আমাদিগের কে সহায় আছে বলুন?—আপনাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সখী

আরও ব্যাকুল হইতেছেন, নতুবা ইঁহার এখনও এত দুরবস্থা হয় নাই যে, আমরা হতাশ হইব; ঐ শুনুন গিরিবালা কি বলিতেছেন।—চুপ করুন।" শশিশেখর স্বল্প-পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়া কন্যাকে নিজ বক্ষে তুলিয়া লইলেন এবং "মা! কি বলিতেছিলে—বল, আমি এখনই তাই করিব" বলিয়া আশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন। "আমি একটু ঘুমব" গিরিবালা পিতার স্কন্ধদেশে মস্তক রাখিয়া নম্র স্বরে উত্তর করিলেন। শশিশেখর তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ পর্য্যঙ্কে তাঁহাকে শায়িত করিলেন এবং সুরাঙ্গিণীকে তৎ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া মোহিনীর সহিত কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া শশিশেখর বিস্তৃত আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। মোহিনী তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। "ভগ্নি! আমি কি তাঁহার অনুসন্ধানের ত্রুটি করিয়াছি? গোয়া, কালিকুট, বেলগ্রাম এই তিন নগর ও ইহাদের মধ্যস্থ সকল স্থানই—যেখানে যেখানে তাঁহার গমনাগমনের সম্ভাবনা—আমি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান লইয়াছি: কিন্তু, কি করিব, আমাদের দুরদৃষ্ট, নতুবা তিনি এ প্রকার অদৃশ্য হইবেন কেন? যে দিন হইতে রমেশের নিধনবার্ত্তা এবং মূর্খ সামরিণের ভয়ঙ্কর ঘোষণার কথা দেশমধ্যে প্রচারিত হয়, সেই দিন হইতে তাঁহাকে আর কেহই দেখিতে পায় নাই। সামরিণ কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন কি না, তাহাও জানিবার জন্য বিশেষ অন্বেষণ করিলাম,—কিন্তু শুনিলাম, তাহার প্রেরিত সৈনাগণও অদ্যাবধি প্রত্যাগত হয় নাই"—বলিতে বলিতে শশিশেখর চিন্তায় অধোমুখ হইলেন।

মোহিনী। "সতীশকেই ধরিবার জন্যই কি সামরিণ সেই সকল সৈন্য পাঠাইয়াছিল।"

শশি। "না শুদ্ধ তাঁহার অনুসন্ধানে নয়, পার্ব্বতীয় দস্যুদিগেরও উন্মূলনের জন্য; কেন না ইতিমধ্যে কে সামরিণকে বলিয়াছিল যে, সতীশ এক জন পার্ব্বতীয় দস্যুপতি।"

মোহিনী। "ভাল, এ কথা যদ্যপি সত্য হয়, তবে আপনি কেন সেখানে অনুসন্ধান লইলেন না? অসম্ভব ত নয়; সতীশ যে প্রকার ভাবে ভ্রমণ করেন, তাতে তাঁকে এক জন দস্যু বলিলেও বলা যায়। কেন না, দস্যুগণ নগরে আসিয়া কাহার বাটীতে এক দণ্ডও স্থির থাকে না,—পাছে রাজপুরুষ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। আর সতীশকে রঘুনাথপুরে আসিয়া কখন স্থির থাকিতে দেখিয়াছেন? সদাই অস্থির—সদাই চঞ্চল।"

শশি। "না মোহিনি! সতীশ যে দস্যু নন, তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে যে কেন তিনি কোথাও সুস্থির থাকিতে পারেন না, তার কারণ—তিনি আপনার পিতৃসন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। যত দিন না পিতার

অনুসন্ধান পাইবেন, তত দিন তিনি কোন বিষয়-কার্য্যে রত হইবেন না।”

মোহিনী। “তবে গিরিবালাকে কি প্রকারে শান্ত করিব?”

শশি। “সতীশকে পাওয়া গেলেই সকল বিষয় স্থির হবে। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার সহিত যদ্যপি এই মুহূর্ত্তেই আমি সাক্ষাৎ করিতে পারি, তবে আমার দুঃস্থা বালিকাকে এখনি প্রকৃতিস্থ করিতে সক্ষম হই।” শশিশেখর কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন এবং তৎপরেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন “আহা! বালিকার কোমল হৃদয়ে প্রণয়াঙ্কুর কি বর্দ্ধনশীল! যে দিন সতীশ গিরিবালাকে দুরন্ত দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, সেই দিনেই সুকুমারীর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রথম প্রণয়-বীজের অঙ্কুর হয়। তাহার পর যখন নৃশংস বিশ্বাস-ঘাতক রমেশ কর্ত্তৃক আহত হইয়া আরোগ্য লাভের জন্য আমার বাটীতে আনীত হয়েন, সরলা গিরিবালা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত—সেই সময়ে প্রণয়াঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইল। তাহার সপ্তাহ পরেই সতীশ অদৃশ্য হইয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রণয়ের কি অপূর্ব্ব মহিমা! এই দুরন্ত বিরহের প্রখর তাপ প্রণয়বৃক্ষকে স্পর্শ না করিয়া তদাধার হৃদয়-ক্ষেত্রকে দারুণ বিদগ্ধ করিতেছে। হায়! বালিকা আমার সেই তাপেই দিন দিন মলিন হইতেছে।” শশিশেখর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, মোহিনীর নয়নদ্বয় হইতে দর দর বেগে অশ্রুধারা নিঃসৃত হইতেছে;—তিনি অমনি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন “ভগ্নি, মোহিনি! একি! তুমি ক্রন্দন করিতেছ—কেন? ক্রন্দনের প্রয়োজন কি? আমি যে এক প্রকার উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তাহাতে গিরিবালার মনোবিকার শীঘ্রই অপনীত করিতে সক্ষম হইব। ভগ্নি! ক্ষান্ত হও। যাহা বলি, শুন।”

“ভাই! গিরিবালার উপস্থিত দুরবস্থা দেখিয়া আমার স্মৃতিপথে আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা এক একটী করিয়া উদিত হইতেছে। হায়! আমার নরেন্দ্র যদি জীবিত থাকিত, তা হ’লে আর বালিকাকে আমার এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না; আর আমাদিগকেও এ বৃদ্ধ বয়সে দারুণ শোকানলে দগ্ধ হইতে হইত না। ওঃ! নরেনের মুখ মনে পড়িলে, আমার হৃৎপিণ্ড আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যায়। তার সেই সুন্দর মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া কঠোর প্রসববেদনা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারি নাই, নরেন্দ্রের শোক অনেকাংশে বিস্মৃত হইয়েছিলাম। কিন্তু, হায়! নৃশংস ভবানীশঙ্করের বিষ হৃদয়ে তাহাও সহ্য হইল না! রাক্ষস আমার জ্যেষ্ঠ

পুত্র রণেন্দ্রকে পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কোথায় লুকাইত করিল—আজও তার কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। কেবল নরেনের মুখ দেখে সেই দরুণ শোক অনেক অবহেলা করেছিলাম। উঃ! নর-পিশাচ ভবানীশঙ্কর তাহাতেও আমাকে বঞ্চিত করিল। প্রসব-রাত্রেই ডাকিনী ধাত্রী দ্বারা প্রসূতিকে উৎকট মাদক দ্রব্য পান করাইয়া অনায়াসে আমার সাররত্ন' নরেন্দ্রকে হরণ করিল। ভাই! আমাদের হৃদয়ে আর কত যন্ত্রণা সহ্য হইবে বল? উঃ! আমি যাই পাষাণহৃদয়া, তাই এ বিষম শেলা-ঘাতে আজিও জীবিত আছি।” মোহিনীর আর বাক্যস্ফূরণ হইল না। উত্তাল শোকতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধ করিল। তিনি রোদনশীল শশিশেখরের হস্ত ধারণ করিয়া নির্ব্বাকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়-কাননের দুর্নিবার্য্য শোকাগ্নি দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল; তিনি রোরুদ্যমান শশিশেখরের হস্ত ধরিয়া করুণ স্বরে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন “ভাই! গিরিবালার অদৃষ্ট বড় মন্দ, নহিলে শৈশবাবস্থাতেই মাতৃ-হীনা হইবে কেন? আহা! সুনীতি বড় পুণ্যবতী ছিল, তাই এ সকল কঠোর যাতনার আরম্ভেই পাপ পৃথিবী হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করেছেন। এ হত-ভাগিনীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রেম মনে পড়িলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আহা! আমার নরেন্দ্রের জন্মরাত্রেই তিনি স্বয়ং তাহাকে দেখিতে আইসেন এবং তাহার অতুল রূপে মোহিত হ'য়ে ‘নরেন্দ্র’ নাম রাখিয়া পরমাহ্লাদে বলেছিলেন ‘সখি! আমাদের উভয়ের যেরূপ এক প্রাণ ও এক আত্মা, ঈশ্বর-কৃপায় যদ্যপি এই সময়ে আমার একটী কন্যা হয়,তা হ'লে নরেনের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়া দুই জনে বড় আরামে থাকি।’ কিন্তু, হায়! ভবানীশঙ্করের অত্যাচারে সে আশা বৃথা হ'ল! সুনীতি! তুমি কি নরেন্দ্রের জন্য ইহ-লোক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া গেলে? তোমার গিরিবালা—প্রাণনন্দিনী গিরি-বালার মলিন মুখ দেখে তোমার হৃদয় এক বারও কাঁদে না?—না, না, আমারই ভ্রম। স্বর্গধাম অশোক—চিরানন্দময়। সখি! তুমি কি প্রাণ-ধনের—তোমার নরেন্দ্রের সঙ্গে চির-সুখসম্ভোগে পূর্ব্বজন্মের সকল বন্ধনই ছেদন করিলে?—আর এ হতভাগিনী চিরকাল তোমার দারুণ বিরহে দগ্ধ হবে?”

শশিশেখর এক অত্যুষ্ণ নিশ্বাস সহকারে হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণারাশি প্রকাশ করিয়া মোহিনীকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন “ভগ্নি! ক্ষান্ত হও। বিগত বিষময় বিষয় সকল আলোচনা করিয়া হৃদয়কে আর কেন যন্ত্রণা দাও,—আর নরেন্দ্রের বৃথা অমঙ্গল-ভয়ে বিহ্বল হও। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি,

নরাধম ভবানীশঙ্করের পাপ অভিলাষ কখনই সিদ্ধ হবে না। ধর্ম্মের প্রভাব কখনই যাবার নয়; যদি তা হ'ত জগৎ এত দিন রসাতলে যাইত। আমার নিশ্চয় বোধ হ'তেছে—ধর্ম্ম স্বয়ং তাঁহার একান্ত ভক্ত সুরশেখর ও তৎপুত্রদ্বয়কে সকল উৎপাতী বিপদ্ হইতে রক্ষা কর্‌তেছেন। এক্ষণে আমি এক সুদুপায় ঠিক করেছি।" মোহিনী সাগ্রহে তাঁহার মুখ প্রতি সতৃষ্ণ নয়নদ্বয় সংযত করিয়া রহিলেন, শশিশেখর বলিতে লাগিলেন "বেলগ্রামে এক অদ্ভুত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত বাস করেন। শুনিতে পাই, তাঁর গণনাশক্তি ভারি চমৎকার। ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁর নিকট যদ্যপি আমাদের সকল বিষয়ের যথার্থ সংবাদ পাই, তবে সকল অসহ্য কষ্ট হ'তে মুক্ত হই।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"প্রায়ো গচ্ছতি যত্র ভাগ্যরহিতস্তত্রাপি যান্ত্যাপদঃ॥"

পর দিন প্রত্যূষে ধর্ম্মাত্মা শশিশেখর সপরিবারে বেলগ্রাম যাত্রা করিলেন। বেলগ্রাম, রঘুনাথপুরের বিংশতি ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। যদিও দাক্ষিণাত্যে তৎকালে ভ্রমণোপযোগী শকটাদি প্রচলিত ছিল, কিন্তু তৎসমুদায় দুর্ম্মূল্য ও বহুব্যয়-সাধ্য; পরন্তু দস্যুভয়-বিরহিতও নহে। শশিশেখর তজ্জন্য নৌকাযানে যাত্রা করিলেন। নৌকায় দুইটী-মাত্র নাবিক। ক্ষীণা তরঙ্গিণীর অনুকূল তরঙ্গাঘাতে ক্ষুদ্র তরণী তর্‌তর্ বেগে গমন করিতে লাগিল। দূর হইতে পশ্চিমাচলের সমুন্নত শিরোদেশ গগনপট-শোভিত অচল জীমূতাবলির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। শশিশেখর তাঁহার ক্ষুদ্র বালিকাকে তৎসমুদায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করাইতে লাগিলেন। কোথাও বা নবোদিত সহস্রাংশুকরপ্রভিন্ন আরণ্য কুসুমরাজি সুমন্দ সমীরণ-সঞ্চারে আন্দোলিত হইয়া পর্ণাঘাতে মধুলোভী ষট্‌পদদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, যেন লব্ধভর্তৃকা বিরহিণীর নয়নাঞ্জন আনন্দাশ্রু সিঞ্চিত হইয়া চঞ্চল পলক দ্বারা বিন্দু বিন্দু ভাবে পাতিত হইতেছে। কোথাও বা একটী বটবৃক্ষ হস্ত প্রসারণ করিয়া নদীর অন্য তীরস্থ অপর একটী বটবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছে। নীরভীরু সুচতুর শাখামৃগগণ তদ্দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া বালারুণ-কিরণ-শোভিত শ্যামল শাদ্বলোপরি ক্রীড়া করিতেছে। এক স্থলে কতক গুলিন হরিণশিশু তাহাদের ধাত্রীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নবোদ্গত দন্ত দ্বারা কোমল কুশাঙ্কুর সকল ছিন্ন করিতেছে। গিরিবালা জন্মে কখন মৃগশাবক দর্শন করেন নাই, শশিশেখর তদ্দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "মা! গিরিবালা! ও দিকে দেখ, হরিণশিশুগণ কেমন নব তৃণ ভক্ষণ করিতেছে।" তরণী তখন নিক্ষিপ্ত তীরবেগে ছুটিতে ছিল; শশি-

শেখর কর্ণধারকে ক্ষণকালের জন্য নৌকার গতিরোধ করিতে বলিলেন। তখন গিরিবালা মোহিনীর অঙ্ক হইতে মস্তকোত্তোলন করিলেন এবং সুরাঙ্গিণীর স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া তৎসমুদায় স্বপ্নরূপে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে পথরোধকারী জলজ লতা-পাশ ছিন্ন করিয়া নৌকা পুনর্ব্বার সবেগে বাহিত হইল। কোথাও বা কতকগুলিন সারস একত্রিত হইয়া নদীবক্ষে শ্বেতস্রগ্‌বিরচন করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। যেন প্রমোদিনীর উরঃস্থলে চিক্কণ তার-হার শোভা পাইতেছে।' গিরিবালা এই সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া অনেকাংশে সুস্থ হইলেন। স্নেহময় শশিশেখর আপন দুঃস্থ বালিকার মুখচন্দ্রে কালিমা-কলঙ্কের অন্তর্ধান দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আমি যাহা অনুমান করিয়া এই সহজ জলপথ আশ্রয় করিয়াছি, ঈশ্বর-কৃপায় তাহা সফল হইল। আমার বালিকার স্বাস্থ্যোন্নতির অনেক সুলক্ষণ দেখিতেছি।"

সেই জন-হীন কানন-বিহারিণী বিমলসলিলা কলস্বনার অনুকূল স্রোতে সন্তরণ করিতে করিতে ক্ষুদ্র তরণী ক্রমশ বহুদূর অগ্রসর হইল। ক্রমশ সেই মধ্যাহ্ন সূর্য্যাকর-প্রতিভাত লোচনানন্দকর প্রকৃতির বিকট হাস্যময় স্থল অতিক্রম করিয়া জলযান নদীর এক বিভীষিকাময় অসূর্য্যম্পশ্য বিভাগে প্রবিষ্ট হইল। ঘন-সন্নিবিষ্ট বিশাল আরণ্য পাদপ সকল একত্র-সম্বদ্ধ শাখাপল্লব দ্বারা নদীর চতুর্দ্দিক এরূপ গাঢ় সংবদ্ধ করিয়াছে যে, দিবা ভাগেও সে স্থল ঘোর নিস্তব্ধতাপূর্ণ অন্ধকার-ধূমে আবৃত থাকে; বোধ হয়, যেন সমগ্র পৃথিবীর অন্ধকারসকল দিবাকর কর্তৃক তাড়িত হইয়া এই নিবিড় বিজনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গিরিবালা এই অন্ধকার দর্শন করিয়া চমকিত হইলেন, এবং ভয়ভীতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় চতুর্দ্দিক চঞ্চল নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। "এরূপ অন্ধকারের মধ্য দিয়া কত দূর যাইতে হইবে?" শশিশেখর নাবিকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রায় আধ ক্রোশ হইবে।"

"আধ ক্রোশ"! শশিশেখর বিস্মিত ও ঈষদ্‌ভীত হইলেন; এবং মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া সাশ্বাস বচনে কহিলেন "ভাই, তোমরা তীব্র বেগে নৌকা চালনা কর।"

দক্ষ নাবিকদ্বয় কর্তৃক নৌকা সবেগে তাড়িত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। অকস্মাৎ এক কঠিন বস্তু-সংঘর্ষণে জলযান বদ্ধ প্রভাব হইয়া প্রত্যাঘাত-ক্রিয়া দ্বারা দশ হস্ত পরিমাণে পশ্চাদ্ধাবিত হইল। চতুর কর্ণধর স্বীয় নৌবিদ্যা-নৈপুণ্যে নৌকাকে তাহার গন্তব্য পথে পরিবর্ত্তিত করিয়া মন্দ মন্দ ভাবে চালিত করিতে লাগিল। নৌকা পুনর্ব্বার সেই স্থানে যাইয়া আস্তে আস্তে দণ্ডায়-

মান হইল। তখন ক্ষেপণী-ধর হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখিল যে, একটী বৃহৎ বৃক্ষ দ্বারা তাহাদের যানের গতি রুদ্ধ হইয়াছে। বৃক্ষ-স্কন্ধ দুই কূল স্পর্শ করিয়া লম্বমান-রূপে অবস্থাপিত। একে এই ঘোর অন্ধকার, তাহাতে আবার এ প্রকার ভীষণ প্রতিবন্ধক! যাত্রি-সকলেরই হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। নৌকাধ্যক্ষ এই অবসরে প্রস্তর ও লৌহ-সাহায্যে অগ্ন্যুৎপাদন করিয়া আলোক জ্বালিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এক বিকট আর্ত্ত-নাদে সে চমকিত হওয়াতে, প্রস্তর তাহার হস্ত-স্খলিত হইয়া নদী-জলে পতিত হইল। কি সর্ব্বনাশ! এ ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মধ্যে এ আবার কি বিভীষিকাময় কাণ্ড সংঘটিত হইল! ভয়ে জলযানস্থ সকলেই হীনপ্রাণ ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। কেহই কারণ-জিজ্ঞাসু হইতে সাহসী হইল না। ভয়-বিহ্বল নয়নে সকলেই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই নিবিড় তিমির-জাল ভেদ করিয়া কাহার কাহারও দৃষ্টি কতিপয় অস্পষ্ট মানব-মূর্ত্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইল। এবং তাহাদের অস্ফুট কণ্ঠরব ও শুষ্কপর্ণ-নিপীড়ন-জনিত মর্ম্মর-ধ্বনি ঘন ঘন শ্রুত হওয়াতে, বোধ হইতে লাগিল, তাহারা সকলেই নদী-ভাগে আগমন করিতেছে। কর্ণধার এত ক্ষণ নৌকা-কর্ণ ধারণ করিয়া নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান ছিল, এক্ষণে এই অস্পষ্ট কথোপকথন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উপস্থিত বিপদ-শঙ্কায় তৎ-সহচরকে নৌকা বিপরীত দিকে চালিত করিতে বারংবার আদেশ করিল; কিন্তু কিছুতেই কোন উত্তর পাইল না। কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! এ সময়ে সে দুর্ভাগ্য ক্ষেপণী-ধরই বা কোথায় অন্তর্হিত হইল! হতভাগা হয় ত তিমির-বিহারী পিশাচগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে! কর্ণধার ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। তথাপি যথাসাধ্য নৌকাকে বিরুদ্ধ দিকে তাড়িত করিবার জন্য তাহার সম্মুখ-ভাগে যেমন গমন করিবে, অমনি জল-স্পর্শ-শীতল কঠিন হস্ত দ্বারা কে তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া সজোরে তাহাকে দূর জলে নিক্ষেপ করিল। তৎক্ষণাৎ মার্জ্জারের কণ্ঠ-স্বরের ন্যায় এক প্রকার রব শ্রুত হইবামাত্র নৌকা অকস্মাৎ তীব্র বেগে বিপরীত দিকে বাহিত হইতে লাগিল। শশিশেখর ও তাঁহার স্বজনবর্গ করুণ স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

—

আয়েষা।

কুসুম-শোভিত উদ্যান ভ্রমিতে ভ্রমিতে যখন তাহার মধ্য দেশে সরসী-তীরে উপনীত হই, মনে করি—সে কুসুম-শোভা আর দেখিতে পাইব না, মনে করি—সে পরিমলে আর আমোদিত হইব না, তখন আস্তে আস্তে বিশ্রান্ত

ভাবে সেই সরসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দৃষ্টিপাত করিয়া যদি তন্মধ্যে কমলিনী সুন্দরীর ঢল ঢল হাস্য-বিকাশ দেখিতে পাই, তাহার কোমল অঙ্গে ভ্রমরী কেমন গুণ গুণ রবে ধীরে ধীরে বসিতে যাইতেছে দেখিতে পাই, পদ্মবন কেমন সৌরভে আমোদিত রহিয়াছে দেখিতে পাই, সরসী কেমন অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত রহিয়াছে দেখিতে পাই, তবে অন্তর-মধ্যে যে আনন্দের উদয় হয়, তাহা বাক্যে কখনই প্রকাশিত হয় না। সেই রূপ আনন্দ আমরা একদা দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন আমরা গ্রন্থের মধ্য দেশে উপনীত হইলাম, ঘটনা-জাল গ্রন্থ-কল্পনাকে যেমন ক্রমে গভীরতর ও তমসাচ্ছন্ন করিয়া আনিল, যখন আমরা সে মৃদু-মধুরা তিলোত্তমা সুন্দরী, সে সুরসিকা চতুরা বিমলা, সে আমোদিনী, কৌতুকিনী আশ্মানিকে হারাইলাম, তখন সেই কতলুখাঁর রাজগৃহে আসিয়া দেখি, আর এক সুন্দরী রাজলক্ষ্মীর ন্যায় গৃহ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সুন্দরীর নাম আয়েষা। প্রথম সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহাকে অতি রমণীয় ভাবে দেখিতে পাইলাম। তিনি রাজবৈরী মুমূর্ষু-প্রায় জগৎসিংহের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, এ সুন্দরী পর-চিন্তাবিনী রমণী-রত্ন। তৎপরেই তাঁহার পূর্ণবিকশিত রূপ-লাবণ্যের জ্যোতিঃ দেখিলাম। অগ্রেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, তখন তাহার রূপ-জ্যোতিঃ দেখিয়া দ্বিগুণতর মোহিত হইলাম। ভাবিলাম এ স্থানে, এ নিষ্ঠুর পাঠান-গৃহে এ কে সুরবালা শোভিত রহিয়াছেন?—অথবা যেমন আফ্রিক অরণ্যে গোপাদপ জন্মিয়া থাকে, যেমন আরবীয় মরুদেশে কুত্রাপি ক্ষুদ্র-তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়, ইনি ঈশ্বরের সেই রূপ সৃষ্টি। ইনি মরুদেশের নিকুঞ্জ-কানন, আশামরীচিকার পূর্ণ সরিৎ, তৃষ্ণার পয়োনিধি, যন্ত্রণার ঔষধি, এবং দুঃখের শান্তি-নিকেতন।

যে দৃশ্যে আয়েষার চিত্র প্রথম অঙ্কিত হইয়াছে, সে দৃশ্য দেখিবামাত্র স্যার ওয়াল্টার স্কটের একটী চিরস্মরণীয় অনুরূপ দৃশ্য অনিবার্য্য ভাবে মনে সহসা উদিত হয়। অমনি সুন্দরী রিবেকাকে মনে আইসে। তখন আয়েষাকে রিবেকাস্থানীয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। বরাবর যত আয়েষাকে দেখি, ততই রিবেকার সাদৃশ্য আয়েষাতে উজ্জ্বলবর্ণে উপলব্ধি হইতে থাকে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই?

স্কটের রিবেকার চিত্র অতি সুন্দর। যে তুলীতে তিনি রিবেকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সে তুলিকাস্পর্শ অতি কোমল। স্কট প্রথমে রিবেকাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী সাজাইলেন। সেই সুন্দরীর হৃদয়কে কোমলতায় পূর্ণ করিলেন। সে হৃদয় ইহুদীর আবাসে থাকিয়াও

মানব-দুঃখে একান্ত কাতর হইত। প্রণয়ের সোহাগে অন্তরে অন্তরে গলিয়া থাকিত। ধীরতার সহিত অন্তরে অন্তরে সেই প্রণয় গোপন রাখিয়াছিল। স্কট এই কোমলতা অল্প মাত্রায় তাঁহার ছবির গাত্রে যেন অতি সুকুমার তুলিকায় একটী মাত্র মৃদু রেখায় চিত্রিত করিয়াছেন। তৎপরে বাল্মীকি যেমন সীতা দেবীকে নানা দুরবস্থায় ও দুঃখে নিপাতিত করিয়া তাহাকে অতি মলিনা করিয়াছেন, সকলেরই অনুকম্পাভাজন করিয়াছেন, স্কটও তদ্রূপ রিবেকাকে নানা দুরবস্থায় ও দুঃখে ফেলিয়া তাহার চিত্রে মলিনতার ছায়াপাত করিয়াছেন। দুই জনেই চির-দুঃখিনী, মানবের সহানুভূতির কোমল-পাত্রী। সীতা দেবীর পানে চাহিয়া আমরা যেমন তাহাকে চিরদুঃখিনী, মৃদু-মধুর মলিন-বেশা উপলব্ধি করি, রিবেকার প্রতি চাহিয়াও একদা তাহাকে তদনুরূপ ভাবে দেখিতে থাকি। যেন বোধ হয়, উভয়েরই চিত্রে যে ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা অতি কোমল, মধুর, ও মনোমুগ্ধকর।

আয়েষাতে এ ভাব নাই। পাঠকের ও দর্শকের সহানুভূতি সুন্দরীগণকে যে কোমল, মলিন বর্ণে চিত্রিত করে, সে শরীরী ভাবে ও বাহ্যিক দুরবস্থার সহায়তায় আয়েষা সুন্দরী নহে। আয়েষা শুদ্ধ আন্তরিক গুণে বিভূষিতা হইয়া রিবেকা অপেক্ষাও কোমলা হইয়াছেন। চিরদুঃখিনী মলিনা রিবেকার চিত্র-মধ্যে তাহার হৃদয়-মাধুরীর কোমলতা যেন ঈষৎ আভাসে মৃদু বর্ণে প্রতীত হইতে থাকে। কিন্তু উজ্জ্বল গৌরবিণী আয়েষার চিত্র সেরূপ নহে। আয়েষা পদ্মপুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত ও সুন্দর; অথচ সমুদায় কোমল। তত দূর কোমলতাই তাহার সৌন্দর্য্য, রূপ ও মাধুরী। রিবেকাকে দেখিলে বোধ হয়, স্কট যেন কোন বিমলিনা সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য অতি কোমল তুলিকা-স্পর্শে হৃদয়-মাধুরীর ঈষৎ লাবণ্য দিয়া দিয়াছেন। অথবা কোন কোমলাঙ্গিনী যেন দীন ভাবে ম্লান ও আচ্ছন্ন রহিয়াছেন। কিন্তু আয়েষার চিত্র সেরূপ নহে। আয়েষা, রিবেকা হইতেও সমধিক কোমলতায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রভাসিত রহিয়াছেন। তাহাতে যে মৃদুরঞ্জন আছে, সে মৃদুরঞ্জন তাহার সমুদায় কোমলতার অপূর্ব্ব ভাব। রিবেকাকে একদা শরীরী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আয়েষাকে শরীরী বলিয়া বোধ হয় না; তিনি যেন সমুদায় হৃদয়-কোমলতা। তাহার রূপ ও শরীর, হৃদয়মাধুরীর বর্ণ-গৌরবে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রস্ফুটিত পদ্মের নীচে জল-মধ্যে মৃণালের দেহ লুক্কায়িত আছে। কেবল কমল-গাত্র কমলোপরি উজ্জ্বল কোমলতায় জাগিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, রিবেকার হৃদয়-কোমলতা সমধিক বর্দ্ধিত

হইয়া আয়েষাকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। আমি বলি, ইহারা হৃদয়েও বিভিন্ন। রিবেকা প্রণয়িনী এবং তজ্জন্য কৃপাময়ী, আয়েষা কৃপাময়ী এবং তজ্জন্য প্রণয়িনী। রিবেকার প্রণয় প্রথমে সঞ্চাত হয়। প্রণয় অন্তরে অন্তরে বর্দ্ধিত হইয়া কৃপার সহায়তা গ্রহণ করে, অথবা কৃপা-রূপে অবস্থান করে। অবশেষে সেই প্রণয় কৃপাতে লয় প্রাপ্ত হয়। সে প্রণয়ের আর বাহ্য বিকাশ হইল না। তাহা কৃপাভাবে গোপনে গোপনে অন্তর্লীন রহিল। কৃপাই বাড়িতে লাগিল। প্রণয়ও তৎসঙ্গে বাড়িয়া তাহাতে বিলীন হইতে লাগিল। আয়েষার হৃদয় এরূপে কোমল নহে। তাহা আদিতে কৃপা ও অনুকম্পায় কোমল, সেই কোমলতাই তাহার প্রধান ভাব। তাহার অনুকম্পা প্রণয় আনিয়া দেয়। তাহার কৃপাময়তা সকল ভাবের অগ্রে উদয় হয়, সকল ভাবের উপরে ছাপাইয়া উঠে। প্রণয়, কি দ্বেষ, কি স্নেহ, কি ভগ্নী-ভাব, কি বাৎসল্য, কি পিতৃ-ভক্তি সকলই তাহার কৃপার নিকট পরাজিত। তাহার প্রবল কৃপা-ভাব প্রণয়কে ছাপিয়া রাখে, স্নেহকে চালিত করে, এবং পিতৃ-ভক্তির উপরে উঠে। যখন আমরা এই ভাবে রিবেকার সহিত আয়েষার তুলনা করিয়া দেখি, তখন আমরা এক দিন বলিতে পারি, আয়েষা কৃপাময়ী, রিবেকা প্রণয়িনী।

এই জন্য বলি, আয়েষা কেবল কোমলতাময়, কেবল কৃপাময়তা। কৃপা-পাত্র দেখিবা-মাত্র তাহার কৃপা সহজে ও স্বতই হৃদয়ে অনিবার্য্য বলে উদিত হয়। সে কৃপার পাত্রাপাত্র নাই। তাহা সকল ভাবের অগ্রে উদয় হইয়া থাকে। তাহা তাহার ইচ্ছারও তত অধীন নহে। তাহা এত দূর প্রবল যে, এমত বোধ হয়, তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহা দমন করিতে পারিতেন না। অন্য ভাব ক্ষণিক প্রবল হইলেও এই ভাব শেষে হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া দিত। কোন উগ্র ভাব হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্যও স্থান পাইত না। পরের ব্যথা তিনি যেন কোন দিব্য-জ্ঞান-প্রভাবে বুঝিতে পারিতেন। বুঝিতে পারিয়া সে ব্যথা যাহাতে না জন্মে, অথবা জন্মিলে তাহা তৎক্ষণাৎ যাহাতে নিবারণ হয়, এমত চেষ্টা করিতেন। কোন্ কথায় ও কোন্ ব্যবহারে কি প্রকার পরের ব্যথা জন্মিতে পারে, তিনি তাহা অতি সূক্ষ্ম-ভাবে বুঝিতে পারিতেন। তাহার হৃদয়-কোমলতার এই অনুভব শক্তি অতি চমৎকার ছিল।

আয়েষার এই পর-সুখদায়িনী প্রবৃত্তি এত প্রবলা ছিল যে, ইহা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি কোন বাধা বিপত্তি মানিতেন না। সে বাধা-বিপত্তিতে তাহার রোষানল প্রজ্বলিত হইত। তিনি সেই রাজনন্দিনীর রোষের সহিত অতি প্রবল দর্পে সে বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতেন। যদি সৎক্রোধ কিছু থাকে,

ইহাকেই সৎক্রোধ বলে। তাহার সেই সৎক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে রাজনন্দিনীর তেজ উদয় হইত। তাহার সেই তেজ-প্রভাবে সকল বাধা আপনাপনি অপসারিত হইত। বাধা দাঁড়াইতে স্থল পাইত না। রাজনন্দিনীর তেজ-প্রভাবে আয়েষা আপন পথ মুক্ত দেখিতেন; তখন তিনি দেব-কন্যার মত স্বকীয় সৎ প্রবৃত্তি-পথে অতি প্রফুল্ল চিত্তে তেজের সহিত অগ্রসর হইতেন। অগ্রসর হইয়া কৃপাপাত্র দেখিবামাত্র অমনি গলিয়া যাইতেন। অমনি তাঁহার হৃদয়-কন্দরে অনুকম্পা সঞ্চারিত হইত। তখনি তিনি পরতাপ-মোচনের জন্য ব্রতী হইতেন। তিনি কোন স্থলে উপস্থিত হইয়া, কে তাহার অনুকম্পা-পাত্র, তাহা একবারেই বুঝিতে পারিতেন, কাহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে হইত না। পরে দেখাইয়া দিবার অগ্রেই তিনি যেন কোন দিব্য চক্ষু-প্রভাবে তাহা দেখিয়া লইতেন। ইহাই হৃদয়ের কোমলতা, ইহাই কোমলতার দিব্য অনুভব-শক্তি। কেবল কারুণ্য-রসেই এতদূর কোমলতা সম্ভাবিত হয়। কারুণ্য-রসে কত দূর কোমলতা সম্ভাবিত হয়, আয়েষা তাহা প্রদর্শন করেন। আয়েষা কারুণ্যের উৎস, পরতাপের দিব্য চক্ষু, এবং সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা।

পরতাপ-হরণে ব্রতী হইয়া আয়েষা কোন কষ্টই কষ্ট-জ্ঞান করিতেন না। তিনি দিবারাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও, সেই কার্য্যে একান্ত মনে ব্রতী থাকিতেন। রাজনন্দিনীর তখন কোন সুখ-জ্ঞান থাকিত না। পৃথিবীতে তখন তাহাই তাহার এক-মাত্র সুখ। তখন তিনি অন্য সকল সুখে ও সকল বিষয়ে উদাসিনী হইতেন। সে কার্য্যে কাহারও অপেক্ষা করিতেন না। সে কার্য্যে তিনি একাকিনীই ধাবিত হইতেন এবং একাকিনীই প্রবৃত্ত থাকিতেন। কাহার অপেক্ষা করিবার তাহার বিলম্ব সহিত না। সে কার্য্য তাহার একারই জানিতেন। সে কার্য্য করিবার সময় তাহার অন্য ভাব কিছু মনে আসিত না; আসিলে মনে স্থান পাইত না। তিনি অতি গম্ভীর ভাবে পরতাপ নিবারণের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। অতি ধৈর্য্য ও স্থিরতার সহিত তাহা সম্পন্ন করিতেন। যে গৃহে আয়েষা পর-দুঃখে কাতর হইয়া গম্ভীর মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন, সে গৃহ অতি নিস্তব্ধ, স্থির, ও নীরব। কোন দিব্যাঙ্গনা সে গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহার পদ-সঞ্চারেই দুঃখ ও তাপ আপনাপনি অপসারিত হইতেছে। উষার আগমনে নিশার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে আপনাপনিই তিরোহিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব দিক হাসিয়া উঠিল।

রিবেকার হৃদয় যে কারুণ্য-রসে এত দূর কোমল, কোমলতায় যে এত দূর সুকুমার ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহা কুত্রাপি

পরিদৃষ্ট হয় নাই। রিবেকা যাহা করিয়াছেন, সকলই আইভ্যানহো-সম্বন্ধে। গার্থকে অর্থদান, তাহাও আইভ্যানহো-সম্বন্ধে। আইভ্যানহোর শুশ্রূষা বিষয়ে তো কথাই নাই। সেই শুশ্রূষা-কালেই এক বার তাহার ঈর্ষা-ভাবের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিল। মুমূর্ষু প্রায় আইভ্যানহোকে ব্যায়াম-ক্ষেত্রেই পরিত্যাগ করিয়া আসিতে চাহিলে, রিবেকা পিতাকে অনেক বুঝাইয়া তাহাকে আপনাদিগের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। আইভ্যানহোর বিবাহ হইয়া গেলে, তিনি দেশ-ত্যাগিনী হইয়া গেলেন। যে বাপদেশে তিনি দেশত্যাগিনী হইবেন বলিয়া গেলেন, তাহা বৃথা ভাণ মাত্র। তিনি রাওয়েনাকে বিবাহ-কালীন নিজ হস্তে এক মহার্ঘ যৌতুক দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন বলিয়াই স্কট্ তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রিবেকার সহৃদয়তা অন্য কাহাকে ও অন্য কিছুতে প্রকাশিত হয় নাই।

ঘটনা-সম্বন্ধে রিবেকার সহিত আয়েষার সৌসাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ যে, তাহারা দুই জনেই এক বলিয়া আপাতত প্রতীত হয়। রিবেকা যে রূপ আইভ্যানহোর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আয়েষা তদ্রূপ জগৎসিংহের সেবায় নিরত ছিলেন। রিবেকা যেমন এক জন দস্যুর দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আয়েষাও তদ্রূপ ওস্মানের প্রণয় তুচ্ছ করিয়া জগৎসিংহের প্রতি একান্ত মনে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। রিবেকা যেমন রাওয়েনার পরিণয় কালে তাঁহাকে এক বহুমূল্য রত্ন-বলয় প্রদান করিয়াছিলেন, আয়েষাও তদ্রূপ দুর্গেশ-নন্দিনীকে বিবাহ-কালীন নানা অলঙ্কার-দামে ভূষিত করিয়াছিলেন। আইভ্যান-হোর বিবাহ হইলে, রিবেকা দেশ-ত্যাগিনী হইয়াছিলেন, আয়েষাও জগৎ-সিংহের পরিণয় সময়ে একদা প্রাণত্যাগ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। এ সমস্ত ঘটনা সদৃশ; সদৃশ বলিয়া রিবেকা ও আয়েষার চরিত্র এক নহে। আই-ভ্যানহোর অনুচর গার্থকে অর্থদান করিবার পূর্ব্বে, এবং আইভ্যানহোর সেবার নিরত হইবার বহুদিন পূর্ব্বে রিবেকার মন আইভ্যানহোর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, আয়েষার তদ্রূপ হয় নাই, হইবার কোন সুবিধাও ঘটে নাই। মুমূর্ষু প্রায় জগৎসিংহকে ওসমান্ স্বগৃহে ও পাঠান রাজবাটীতে লইয়া আসিলেন, আনিয়া আপনি বসিয়া থাকিয়া আয়েষাকে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিলেন। আমরা এই স্থলে জগৎসিংহের সহিত আয়েষার প্রথম সাক্ষাৎ দেখিতে পাই। তৎপূর্ব্বে তাহাদিগের কুত্রাপি সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সেবা-শুশ্রূষায় নিরত হইয়া, সহৃদয় ও যৌবন-কালীন প্রণয়-প্রবণ আয়েষার চিত্ত জগৎসিংহের প্রতি পক্ষপাতী হইল।

এই আসক্তি সেবার সহিত দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দস্যুর অত্যাচারের বিপক্ষে রিবেকার বিরুদ্ধাচরণের সহিত শৈশব-সহচর প্রকৃত প্রণয়ী ওসমানের প্রতি আয়েষার ব্যবহারের তুলনাই হয় না। রিবেকার কৃতজ্ঞতা-সূচক উপহারের সহিত আয়েষার সংসার-বৈরাগ্যসূচক, নিঃস্বার্থ ও আত্মীয়তা ভাবের সর্ব্বস্ব দানেরও তুলনা হয় না। এ দান আয়েষার প্রণয়ের উৎসর্গ-স্বরূপ। তিনি যাহাকে একান্ত মনে আপনার ভাবিতেন, তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া সুখিনী হইলেন। এই সর্ব্বত্যাগই প্রণয়ের উৎসর্গ। প্রণয়ের জন্য সর্ব্বস্বের জলাঞ্জলি ইহাকে বলে। ইহুদিনী রিবেকার প্রণয়ের কি এত দূর উচ্চতা ছিল? আবার আয়েষা যখন এক দিন যৌবন-উন্মত্ততায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়া সহসা আপনার জীবনের মহৎ লক্ষ্য ভাবিয়া তৎ-কার্য্য হইতে বিরত হইলেন, তখন আয়েষার সুমহতী জীবন-প্রবৃত্তি ও সুন্দর স্বভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আয়েষার হৃদয়-কোমলতা, ধৈর্য্য ও কৃপাময়তার এই চরম কল্পনা। পাছে কখন প্রলোভিত হন বলিয়া, তিনি আত্ম-জীবনের মহৎ লক্ষ্য ভাবিয়া অতি ধীরতার সহিত বিষাঙ্গুরীয় নদীজলে চির দিনের জন্য নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিষাঙ্গুরীয়ের সহিত আয়েষা যেন নিজ হৃদয়-হলাহল প্রণয়কেও বিসর্জ্জন দিলেন। বিসর্জ্জন দিয়া আবার আয়েষা প্রকৃতিস্থ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। আয়েষার এই কার্য্যকে আমরা সম্যক্ প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারি না। জগৎসিংহের বিবাহ হইয়া গেলে, আয়েষাকে যখন তাহার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল, তখন এই প্রকার একটী প্রধান ঘটনায় আয়েষার জীবনস্রোতে কিরূপ প্রতিঘাত লাগিতে পারে, প্রতিঘাত লাগিয়া আয়েষার সমুদায় স্বভাবে কিরূপ ফল ফলিতে পারে, বঙ্কিম বাবু তাহা অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই রূপ এক একটী চরম কল্পনা দিয়া বঙ্কিম বাবু এক একটী সুন্দরীর সমুদায় স্বভাবের সুন্দর বিকাশ করিয়া তাহার সমাপ্তি করেন। ইহাই চিত্রকরের শেষ অঙ্গরাগ লেখা, চরম বর্ণরেখা-পাত— যে রেখায় একেবারে সমুদায় চরিত্রের সুন্দর বিকাশ হইয়া পড়ে ও সুন্দরীকে পরম রমণীয় ভাবে রঞ্জিত করিয়া দেয়।

রিবেকার সহিত আয়েষার যদি কোন সাদৃশ্য থাকে, তাহা তাঁহাদিগের প্রণয়ের সাদৃশ্য। উভয়েরই নিরাশ প্রণয়। ইহুদিনী খ্রীষ্টান্ আইভ্যানহোকে ভাল বাসিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, পাঠান-কন্যা হিন্দু-কুল-সম্ভূত জগৎসিংহকে ভালবাসিয়াও তদ্রূপ বিপক্ষে পড়িয়াছিলেন। উভয়েরই প্রণয় অজ্ঞানত ও স্বভাবত সম্ভূত হইয়াছিল।

উভয়েই শেষে জানিতে পারিল,এ প্রণয়ের মিলন হওয়া অসম্ভব। রিবেকা জানিতে পারিলেন, আইভ্যানহো পরের জন্য, আয়েষা শেষে বুঝিতে পারিলেন, জগৎ সিংহ তিলোত্তমানুরাগী। তাঁহারা এই বিপদে পড়িলেন, কেন তাঁহারা এরূপ পাত্রকে ভাল বাসিয়াছিলেন। রমণী-হৃদয় যে কাহারও কথা শুনে না, তাহা যে আপন পথে ধাবিত হয়, তাঁহারা এই সত্যেরই সাক্ষীভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের হৃদয় স্বতই একবার যেখানে গিয়াছে, সেখানে না গিয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন নাই। বাস্তবিক হৃদয় ও প্রণয়ের বেগ কিরূপ অনিবার্য্য, তাহা এই রমণী-দ্বয় বিলক্ষণ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা দেখান, যৌবনে হৃদয় যখন প্রণয়-প্রবণ হয়, তখন সেই হৃদয়াবেগ পাত্রাপাত্রে অন্ধ হইয়া সহসা এক-জনের প্রতি এরূপ অজানত ভাবে আকৃষ্ট হইয়া যায় যে, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। আয়েষা কোন কালে যে সে অনুরাগ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। রিবকা সেই অনুরাগের অন্তর্দাহে দেশান্তরিত হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার শান্তি আইভ্যানহোর দেশে নাই। দেশান্তরে গিয়া যদি কখন মন ফিরাইতে পারেন, এই চেষ্টায় রিবেকা দেশান্তরে গেলেন। কিন্তু আয়েষা রিবেকা নহে। আয়েষার প্রকৃতি বুঝি রিবেকা হইতেও কোমল-তর। আয়েষার প্রকৃতি বুঝি রিবেকা হইতেও দৃঢ়তর। আয়েষার হৃদয় কখন ফিরিবার নহে, তাহা আয়েষা বিলক্ষণ অনুভব করিতেন। তাহার কোমলতর প্রকৃতিতে তাহার যৌবনানুরাগ দৃঢ়তর বসিয়াছিল। সে অনুরাগকে প্রত্যাখ্যান করা আয়েষার সাধ্য নহে। আয়েষা বরং সেই প্রেমে বাড়িতে লাগিলেন। ওসমান্ প্রতিবিরোধী ও বিদ্বেষী হইয়া সেই অনুরাগকে বরং ক্রমশই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। ওসমানের বিপক্ষতায় সেই প্রেম-প্রবাহের বল বৃদ্ধি হইল। আয়েষা যাহাকে হৃদয় দিতে পারিবেন না, তিনি জানিতেন, বিবাহ করিতে হইলে তাহাকেই হৃদয়, মন, সমর্পণ করিতে হইবে। আয়েষা তজ্জন্যই জগৎ-সিংহের প্রেমে একান্ত আবদ্ধ ও পক্ষপাতিনী হইলেন। তখন সেই প্রেমকে আয়েষা উচ্চ হইতে উচ্চে তুলিলেন। হৃদয়-মন্দিরে তাহাকে দৃঢ় স্থাপিত করিলেন। স্থাপিত করিয়া সেই নিরাশ প্রেমের পূজা করিতে লাগিলেন। সেই প্রেমকে পবিত্র করিয়া তুলিলেন। মহাশ্বেতা যেমন একদা অচ্ছোদ সরোবর তীরে নিবিড় অরণ্যমধ্যে একাকিনী ভগবান ভবানী-পতির পূজোপলক্ষে নিরাশ প্রেমের পূজা করিতেন, আয়েষা তদ্রূপ নিজ হৃদয় মন্দিরে মহাশ্বেতার প্রণয় অপেক্ষাও অধিকতর নিরাশ প্রেমের দেবতা প্রতি-ষ্ঠাপিত করিয়া অহর্নিশ তাহার অর্চ্চনায়

নিরত হইলেন। মহাশ্বেতার তবু আশা ছিল তিনি একদা পুণ্ডরীককে পুনর্লাভ করিবেন; কিন্তু আয়েষা কোন্ আশয়ে তাহার যৌবন-প্রেমকে এতদূর বর্দ্ধিত ও পূজার্হ করিলেন? যদি প্রণয় কখন পবিত্র হইয়া থাকে, তাহা আয়েষাতে হইয়াছিল। উপন্যাসে আয়েষার প্রণয়ের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। ইহা ঔপন্যাসিক প্রেম-কল্পনার চূড়ান্ত সীমা। এ সীমা কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্ট মহাশ্বেতাকে দিয়াও দিতে পারেন নাই। তিনি মহাশ্বেতার হৃদয়ে পুণ্ডরীকের আশা কেন রাখিলেন? কেন তাঁহাদিগের মিলন সংঘটন করিয়াদিলেন? মহাশ্বেতাকে যখন আমরা একাকিনী নিভৃত বনবাসে ত্রিসন্ধ্যা ভবানীপতির পূজায় নিরত দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে আর মানুষী বলিয়া জ্ঞান হয় নাই। তখন তাঁহাকে আমরা প্রেমের পবিত্র-দেবী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আয়েষার নিরাশ প্রেমপূজা দেখিয়া তদপেক্ষাও চমৎকৃত হইলাম। এঞ্জেলিনা এড্‌উইনের জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এড্‌উইনকে কখন লাভ করিতে পারিবেন এঞ্জেলিনার এরূপ আশা ছিল। রিবেকা আইভ্যানহোর নিরাশ-প্রেমের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি আইভ্যানহোর বিবাহ দেখিয়া কি ভাবিয়া দেশান্তরে গেলেন, তাহা রিবেকাই মনে মনে জানিতেন। তাহা পাঠক অনেক দূর অনুমান করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু আয়েষা সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, জন্মাবচ্ছিন্নে আর কাহারও প্রণয় হৃদয়ে স্থান দিবেন না। তিনি জানিতেন তাঁহার সে প্রকৃতিতে আর কাহারও প্রণয় স্থান পাইবার যো নাই। তাহা জগৎসিংহের প্রণয়ে পবিত্র হইয়াছে।

অমরনাথের প্রণয় একদা এই রূপ পবিত্র হইয়াছিল। কিন্তু অমরনাথ কখন আয়েষার মত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নাই। তিনি প্রকৃতির আবেগকে উচ্চে তুলিয়াছিলেন মাত্র। তিনি সেই আবেগেরই অনুসারী হইয়াছিলেন মাত্র। তিনি পুরুষ, আয়েষা রমণী। পুরুষে সেই প্রণয় কি রূপে পরিণত হয়, অমরনাথ তাহার দৃষ্টান্ত। আয়েষা রমণী-প্রণয়ের দৃষ্টান্ত। অমরনাথের প্রণয়ও রমণীতে কতদূর উচ্চে উঠে, আয়েষা তাহা দেখান। পুরুষের উদাসীন প্রণয় কেমন আবার সংসারী হয়, অমরনাথ তাহা দেখান। কিন্তু রমণীর উদাসীন প্রণয় কেমন চিরদিনের জন্য পবিত্র হইয়া যায়, তাহা আয়েষার দৃষ্টান্তে স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতে থাকে।

এই প্রণয়ের উচ্চ কল্পনায় বঙ্গবিধবা সৃষ্ট হইয়াছেন। বৈধব্য রীতি কখন কখন এই প্রণয় জন্য পবিত্র হয়। ইহা ঔপন্যাসিক ভাব, অমানুষী ভাব। এই অমানুষীভাবেও কখন মানুষ উঠিতে

পারে। আমরা কোন কোন বঙ্গ-বিধবায় তাহা দেখিতে পাই। কোন কোন বঙ্গ-বিধবা এই প্রণয়ে পবিত্র হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ-বিধবা অনন্য-গতি; তিনি প্রণয়-ভাজনের মৃত্যুতে নিরাশিনী? তাহার পবিত্র প্রণয় মিলনের ফল। আয়েষাতে এ সকল কই? আয়েষা কাহার মৃত্যুতে নিরাশিনী। জগৎ সিংহ জীবিত, জগৎ সিংহ তিলোত্তমার অনুরাগী। আয়েষার সহিত জগৎসিংহের কবে মিলন হইল? তিনি জগৎসিংহের সেবা করিয়াছিলেন মাত্র, তিনি জগৎসিংহের প্রণয় কখন ফিরিয়া পান নাই। তিনি তাহার কৃতজ্ঞতা-সূচক স্নেহ পাইয়াছিলেন, কিন্তু যে প্রণয়ে তিনি জগৎসিংহকে দেখিতেন সে প্রণয়ের কোন উত্তর জগৎসিংহ দেন নাই। তথাপি তিনি জগৎসিংহের জন্য সর্ব্বত্যাগিনী ও পরম প্রণয়ানুরাগিণী। জগৎসিংহ জীবিত থাকিতেও আয়েষা বিধবা। জগৎসিংহ তিলোত্তমার প্রণয়ী হইলেও আয়েষা তাহার প্রণয়িনী। এ কথা অবিশ্বাস্য, এ ভাব অমানুষী; ইহা কেবল উপন্যাসেই সম্ভবে। যে অমানুষী ভাব বঙ্গ-বিধবাতে সম্ভাবিত, সেই অমানুষী ভাব একটা ঔপন্যাসিক সুন্দরী আয়েষাতেও সম্ভাবিত হইয়াছে। আয়েষা বঙ্গ-বিধবারও উচ্চে উঠিয়াছেন। কবির কাল্পনিক ভাব সুন্দরী-মানুষী-ভাবের উচ্চে উঠিয়াছে। আয়েষা কবি-কল্পনা। আয়েষা কাব্য-সুন্দরী।

কিন্তু রিবেকার মৃদু অনুরাগের মধ্যে এমত একটু মধুরতা আছে যাহা আয়েষার প্রবল অনুরাগে নাই। অতি সুখ-সময়ে রিবেকার অনুরাগ সঞ্জাত হয়। সেই অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া রিবেকা মুমূর্ষ প্রায় আইভ্যানহোকে সঙ্গী করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত, ধৃত, ও তাহাদিগের দুর্গ মধ্যে রুদ্ধ হয়েন। এই দারুণ কারাবাসে, দারুণ দুরবস্থায়ও রিবেকার সেবা ও সুখ দেখিলে কে না সুখী হয়। তিনি স্বচ্ছন্দে আইভ্যানহোর পার্শ্বে বসিয়া প্রণয়ের অনুরাগ-সুখে প্রিয়জনের সেবায় নিরত হইয়াছেন। সে কারামধ্যে সকলেরই অসুখ, কেবল রিবেকার সুখ। রিবেকা নিজ অন্তর্নিহিত অতি গোপনীয় অনুরাগের চরিতার্থতা সাধন করিতেছেন। তাহার সেই মৃদু অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। আইভ্যানহোর জীবনের আশার সঙ্গে, তাহার আরোগ্য লাভের সহিত তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আইভ্যানহোর সহিত কথা বার্ত্তায় তাহা বর্দ্ধিত হইতেছে। অবশেষে কারাবাস হইতে মুক্তি লাভের আশার সহিত আরো বর্দ্ধিত হইতেছে। রিবেকা নিবারিত হইলেও অনেক গোপনীয় স্বসম্বেদ্য-ভাবে কারাবাসের গবাক্ষদেশে দাঁড়াইলেন, এবং সেই দুর্গ আক্রমণের কথা, দস্যুদিগের সহিত আপনাদিগের পক্ষীয়গণের যুদ্ধ-বিবরণ

সমুদয়, আইভ্যানহোকে বলিতে লাগিলেন। তাহার এখনকার মনের ভাব অনেক আশায়, অনেক অনুরাগে, অনেক কৌতূহলে, অনেক সুখে মিশ্রিত ছিল। তাহার সেই গোপনীয় অনুরাগের দরুন এই সুখ। কিন্তু চিরদুঃখিনীর এ সুখ বহুকাল থাকিবার নহে। রিবেকা তৎপরে ঘোর বিপদে পড়িলেন। পূর্ব্বে যদিও প্রাণ-সংশয় বিপদের মধ্যে ছিলেন বটে, কিন্তু রিবেকা তাহা জানিতেন না, রিবেকা আপন প্রিয়জনের পার্শ্বে বসিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে ভোর হইয়াছিলেন। এবারে তিনি দারুণ সঙ্কটে পড়িলেন। এবারে তাহার প্রাণ সংশয়। কিন্তু সেই ঘোর বিপদের সময়েও রিবেকা স্থির ছিলেন। রিবেকা আইভ্যানহোর আশয়েও প্রণয়ের নৈরাশ্যে স্থির হইয়াছিলেন। তাহার আশা হইতেছিল, তিনি একদা যেমন আইভ্যানহোর প্রাণদান দিয়াছেন, আজি অবশ্য আইভ্যানহো আসিয়া তাহার মুক্তি সাধন করিবেন। ভাগ্যক্রমে আইভ্যানহো আসিলেন। আইভ্যানহো রিবেকার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রিবেকা আবার সুখে ভোর। প্রাণপতি তাহার জন্য প্রাণদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই বিপদের মধ্যেও একদা তাহার হৃদয় অনুরাগে পূর্ণ হইল, হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে সহসা নাচিয়া উঠিল। আইভ্যানহো তাহার কিছুই জানিতেন না। আইভ্যানহো কেবল প্রত্যুপকার সাধন করিতে আসিয়াছিলেন মাত্র। তাহার জন্য রিবেকার হৃদয়ে তখন যে ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে আইভ্যানহো তাহার কিছুই অবগত নহেন। আবার যখন রিবেকার মুক্তি সাধন হইল, যখন রিবেকার পিতা তাহাকে বলিলেন, চল আমরা প্রত্যুপকারী বীরের প্রতি এখনই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসি। রিবেকা তখন মনের আনন্দে আর দেখিতে পান না। কহিলেন, এখন থাক, তাহার সময় আছে; তাহা শুদ্ধ কথায় প্রকাশিত হইবে না। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আইভ্যানহোর পাঠক সমস্তই অবগত আছেন। কিন্তু রিবেকার বিপদের মধ্যে তাহার গোপনীয় অনুরাগের যে মধুরতা তাহা সেই রিবেকা ভিন্ন আর কেহই অনুভব করিতে ও বুঝিতে পারেন না। তাহার নিরাশ প্রেমের নৈরাশ্যভাব যেন অপনীত হইতেছিল; অনুরাগ শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। তিনি সেই বর্দ্ধমান অনুরাগের সুখভোগ করিতে, করিতে সহসা শুনিলেন, রাওয়েনার সহিত আইভ্যানহোর বিবাহ। প্রণয়িনীর সকল সুখে জলাঞ্জলি হইল।

তিনি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাইবেন সংকল্প করিলেন। দুঃখিনী রাওয়েনার প্রতি তাহার এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব সহানুভূতি জন্মিল। তাঁহার প্রতি এক

প্রকার অদ্ভুত আত্মীয়ভাবের সঞ্চার হইল। তাহার বিবাহকালীনই তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। রাওয়েনাকে বহুমূল্য রত্ন দিলেন। কিন্তু রাওয়েনা যখন আইভ্যানহোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন,তিনি যে কি ভাবে সে সাক্ষাতে অস্বীকৃত হইলেন,তাহা অতি অল্প লোকেই বুঝে। আবার রাওয়েনা যখন ভগিনীভাবে তাহাকে সহচরীর মত স্বগৃহেই অবস্থান করিতে বলিলেন, তখন রিবেকার অন্তরে যে ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল তাহা বাক্যে প্রকাশ হয় না। সে ভাব রিবেকা অতি গোপনে দমন করিয়া পলাইয়া আসিলেন।

রিবেকার গোপনীয় প্রণয়ের এই মধুরতা। কিন্তু আয়েষার প্রণয়ের মধুরতা অন্যবিধ। সে প্রণয়ের মধ্যে এমত কতিপয় সুন্দরভাব আছে যাহাতে তাহাকে রিবেকা হইতে সুন্দরতর করিয়াছে। আয়েষার প্রণয় যদিও নিরাশ বটে, যদিও সদ্যোজাত বটে, কিন্তু তাহা যুবতীর প্রথম ও প্রবল প্রণয়াবেগ। আয়েষা জগৎসিংহের সেবা করিতে বসিয়া তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন। সেবায় অনুরাগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অনুরাগে সেবায় যত্ন হইল। আয়েষার মন টলিল। কিন্তু কিছু দিন পরেই প্রকাশ হইল জগৎসিংহের মনে তিলোত্তমার রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি আরও বুঝিলেন জগৎসিংহ কখন নিজ কুলত্যাগ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তাহার মনে প্রেমের সঙ্গে নৈরাশ্য হইল। কিন্তু যখন তিনি জগৎসিংহকে একবার অজানতঃ ভালবাসিয়াছেন, তাহাকে ভাল না বাসিয়া আর থাকিতে পারেন না। আয়েষার অনুরাগ দমিত হইয়া আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। জগৎসিংহ যতই আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন আয়েষা নিরাশ ভাবে ততই স্বকক্ষ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগৎসিংহের সহিত বড় দেখা সাক্ষাৎ করেন না। শেষে একেবারেই জগৎসিংহের নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। কিজন্য আয়েষা জগৎসিংহকে নিতান্ত ভালবাসিয়াও তাহার কাছে আসিতেন না? আয়েষার মন তখন কি ভাবে ভাবিত? নৈরাশ্য, আয়েষার মনে ধীরতা, অভিমান, লজ্জা সকলই আনিয়া দিল। আয়েষারও কি লজ্জা আছে? লজ্জা কেমন আয়েষা জানিতেন না। যে লজ্জা কুলবধূকে বিনম্র, বাক্যহীন, অধোবদন ও সঙ্কুচিত করে সে লজ্জা আয়েষা জানিত না। কিন্তু যে লজ্জা অভিমানের সহিত উদয় হয়, যাহার জন্য প্রণয়ভাজনের নিকটে আসিতে সঙ্কুচিত হইতে হয় সেই লজ্জায় আয়েষা জগৎসিংহের নিকটে আর আসিতেন না। যখন জগৎসিংহের আরোগ্যলাভ হইল, যখন আয়েষার কার্য্যশেষ হইল, তখন কি বলিয়া তিনি

আর জগৎসিংহের নিকটে আসিবেন? পাছে জগৎসিংহ তাহার প্রণয় জানিতে পারেন," জানিতে পারিলে তিনি তাহা কি ভাবিবেন? জগৎসিংহ ত তাহার নয়, কখন হইতে পারেন না, তবে কেন তিনি জগৎসিংহের জন্য চঞ্চল হইবেন। আয়েষা এইরূপ কত ভাবিয়া আত্মগোপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আপন কক্ষমধ্যে আবদ্ধ রহিলেন। যুবতীর এ ধীরতা অতি অসামান্য। তিনি অতি ধৈর্য্যের সহিত অভিমানে পূর্ণ হইতে লাগিলেন। যে অনুরাগ তাহার মনোমধ্যে বৃদ্ধি হইতেছিল, সেই অনুরাগের সহিত অভিমান ও আত্মগোপন মিশিয়া তাহার মনকে গলাইয়া দিল। যে অনুরাগকে গোপন ও দমন করিতে যাওয়া যায় সে অনুরাগ আরও বাড়িতে থাকে। জগৎসিংহের অসাক্ষাতে আয়েষার মন অতি গোপনে গোপনে গলিয়া যাইতেছিল। জগৎসিংহের নিকট হইতে দূরস্থ হইয়া আরও তাহার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইতেছিল। অন্তর গোপনে গোপনে পূর্ণ হইতেছিল। সে হৃদয়স্ফীতি ও পূর্ণতা আর হৃদয়ে ধারণা হয় না। এমত সময় ঘটনাক্রমে একদিন জগৎসিংহ তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আয়েষা তখন অবিলম্বে জগৎসিংহের নিকট উপস্থিত। কিন্তু উপস্থিত হইয়াই দেখেন তিলোত্তমা মূর্চ্ছিতা। আয়েষা তখন সে প্রণয় ভুলিয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বকার্য্যে ব্রতী হইলেন। তিলোত্তমা আরোগ্যলাভ করিলে সাবধানে তাহাকে আত্মকক্ষে পাঠাইয়া দিলেন। পাঠাইয়া দিয়া পূর্ণহৃদয়া আয়েষা আর জগৎসিংহের নিকট হইতে যাইতে পারেন না। তিনি এতদিন যে ধীরতার সহিত তাহার নিকট হইতে দূরস্থিত ছিলেন সে ধীরতা আর তিনি রাখিতে পারেন না। যাহার জন্য তাহার হৃদয়স্ফীতি হইয়াছিল সেই জগৎসিংহকে দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারেন না। তাহাকে কি বলিবেন, কি করিবেন আয়েষার এখন সে জ্ঞান নাই। আয়েষা এখন আত্মহারা। আয়েষা এখন প্রণয়পূর্ণতায় অন্তরে অন্তরে গলিত। আয়েষা কেবল নীরবে জগৎসিংহের নিকট বসিয়া রহিলেন; তাহার হৃদয় যেমন গলিতেছিল অমনি তিনি অশ্রুধারায় পূর্ণ হইলেন। নীরবে, নির্জ্জনে, জগৎসিংহের পদতলে বসিয়া অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিন্দু বিন্দু অশ্রুধারা আয়েষার চিত্তভাবের পরিচয় দিতে লাগিল। সে ভাবে আয়েষা স্তম্ভিত। তখন তিনি এতদূর আত্মহারা যে একটু কিছু কারণ হইলেই যেন সে প্রণয়ের পরিচয় দিয়া ফেলেন। আর আত্মগোপন রাখিতে পারেন না। এমত সময় ওসমান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওসমানের পীড়নেই আয়েষা আত্মপ্রকাশ

করিয়া ফেলিলেন। আবার আয়েষা যখন জগৎসিংহকে বলিলেন, যদি ওসমান তাহাকে মনঃপীড়িত না করিত তবে তাঁহার দগ্ধহৃদয়-তাপ কখন প্রকাশ হইত না, কখন মনুষ্য-কর্ণগোচরও হইত না; তখন তাহার নিরাশ প্রণয় আরও কত মধুর বোধ হইতে লাগিল। এই আত্মপ্রকাশ কালীন আয়েষার প্রণয়-গভীরতা দেখিলে তাহাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এই দেখুন আয়েষা জগৎসিংহকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"শুন, ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর,—যাবজ্জীবন অন্যকেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইহাঁর শোণিতে আর্দ্র হয়" বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন; "তথাপি দেখিবে হৃদয় মন্দিরে ইহাঁর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর যদি আর চিরন্তন ইহাঁর সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইহাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব।"

আয়েষার এই প্রেম-গভীরতা দেখিলে তিলোত্তমার প্রণয়কে কি আর প্রণয় বলিতে ইচ্ছা করে। তিলোত্তমার প্রণয় চিরদিন অন্তর্লীন থাকিয়া তাহার গাম্ভীর্য্য ও প্রাবল্য কখন প্রকাশ হইতে পারে নাই। বঙ্কিমবাবু আয়েষার প্রণয়কে সুন্দর প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন; দেখাইয়া, তিলোত্তমার চিত্র অপেক্ষা আয়েষার প্রণয়-চিত্রকে উজ্জ্বলতর বর্ণে গৌরবিত করিলেন। তিলোত্তমা চিরদিন গোপন রাখিয়া তাহার প্রেমকে যেরূপ মধুর করিয়াছিলেন, আয়েষা তাহা প্রকাশ করিয়াও যখন বলিলেন সে প্রণয়, মনঃপীড়িত না হইলে, কখন প্রকাশ পাইত না তখন সে প্রণয়কে আরও মধুরতর বোধ হইল। ইহা তিলোত্তমার চিত্রের উপর উজ্জ্বল রেখা। এইরূপ সুন্দর বর্ণ-গৌরবে আয়েষার চিত্র উদ্ভাসিত হইয়াছে।—

বঙ্কিম বাবু যে দৃশ্যে মুক্তকণ্ঠে আয়েষার প্রণয় পরিচয় দিলেন, সে দৃশ্যটী নাটক সমুচিত। তিনি আয়েষার স্বকক্ষ মধ্যে তাহার হৃদয়কে গোপনীয় প্রণয়ে পূর্ণ করিতেছিলেন। আয়েষার হৃদয় যখন প্রণয়ে উথলিয়া পড়ে, যখন তাহা হৃদয়ে আর ধারণা হয় না, তখন কবি তাহাকে বাহ্যদৃশ্যে আনিয়া তাহার হৃদয়ের এতদিনকার সঞ্চিতভাব ও ভাবপূর্ণতা প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন। আয়েষা সে হৃদয়পূর্ণতা কেবল নীরব অশ্রুধারায় আস্তে আস্তে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাই নাটকীয় দৃশ্য; এরূপ ভাবব্যক্তিতে দর্শকের হৃদয় গলিয়া যায়।

কিন্তু এই প্রেমপূর্ণতার মধ্যেও

আয়েষার হৃদয়তারল্য তাহার প্রকৃতিতে সর্বপ্রবল ছিল। যাহা আয়েষার জীবিত-সর্বস্ব, যাহা আয়েষার প্রধান সম্পত্তি ও ধর্ম্ম, তাহা কি আয়েষার হৃদয় হইতে কখন অন্তর্হিত হইতে পারে? তিনি প্রেমপূর্ণ হইয়া আসিয়া হৃদয়-ব্যথায় সহসা গলিয়া গিয়াছেন। প্রেম ক্ষণেকের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। হৃদয়-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আয়েষা আপনার সঙ্গিনীকেও ভুলিয়া গিয়াছেন। হৃদয়-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আয়েষা কৃপাপাত্রী মূর্চ্ছিতা তিলোত্তমার সেবায় দেখিবামাত্র নিরত হইয়াছেন। প্রণয়ে পূর্ণ হইয়াও জগৎসিংহের কারাবাসের ক্লেশে বেদনা পাইয়াছেন, এবং তাঁহাকে মুক্ত করিয়া পাঠান গৃহ হইতে পাঠাইয়া দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। প্রণয় বরং প্রণয়-পাত্রকে নিকটে রাখিতে ভালবাসে, কিন্তু আয়েষার প্রণয় তাহার হৃদয়-বেদনা অপেক্ষা প্রবলতর ছিল না। তাহার হৃদয়-বেদনা প্রণয়কে পরাজয় করিয়াছিল এবং তিনি প্রণয়-পাত্র জগৎসিংহের ক্লেশ মোচনের জন্য অগ্রে ব্রতী হইয়াছিলেন। আয়েষার এই প্রকৃতি-বিশেষকে উজ্জ্বলতর করিবার জন্য বঙ্কিম বাবু এই কৌশলে তাহা প্রণয়ের মধ্য হইতেও প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। এক স্থানে তাহা আবার বিশেষরূপ পরিব্যক্ত দেখা যায়।

তিলোত্তমাকে স্বকক্ষে পাঠাইয়া দিয়া আয়েষা যখন জগৎসিংহের নিকট বসিয়া আছেন এবং নীরবে প্রণয় পরিচয় দিতেছেন এমত সময় ওসমান আসিয়া উপস্থিত। ওসমান বিদ্বেষানলে প্রজ্বলিত হইয়া আসিয়া যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেন। দেখিয়া সেই গাত্রদাহে আয়েষার প্রতি আক্রোশ করিতে গেলেন। আয়েষা তখন নব-প্রেমের প্রগাঢ় অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া আছেন। তখন কি রাজপুত্রী ওসমানের বিদ্বেষবাক্য সহ্য করিতে পারেন? আয়েষা চিরকাল রাজ-আদরে গর্ব্বিতা, তাহাতে এখন জগৎসিংহের প্রতি প্রেমানুরাগে অন্ধ। সে সময়ে ওসমানের তিরস্কারবাক্যে তাহার অনুরাগ গর্ব্বের সহিত দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। আয়েষা ওসমানের অনাদর করিয়া নিজ প্রেম পরিচয় দিলেন। শুদ্ধ প্রেম পরিচয় দিলেন না, তাহা এরূপ তেজস্বীবাক্যে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে, ওসমানের মনে দারুণ বেদনা বোধ হইল। ওসমান আয়েষার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। কিন্তু আয়েষার হৃদয়-কোমলতার তখনই পরিচয় হইল। আয়েষা প্রেমগর্ব্বে যে সকল অন্তর্বেদনার কথা ওসমানের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা আয়েষার হৃদয়কে তখনি ব্যথিত করিল। যেন সহসা তাঁহার হৃদয়ে কি ব্যথা বোধ হইল। অমনি আয়েষা ফিরিলেন, আয়েষা প্রকৃতিস্থ হইলেন। আয়েষা

যে প্রেমগর্ব্বে উচ্চে উঠিয়াছিলেন সহসা যেন তথা হইতে নামিলেন। এ সময়ে তাঁহার ভাবের প্রত্যাবর্ত্তন দেখিলে সহসা চমকিত হইতে হয়। এই মাত্র আয়েষা ওসমানের হৃদয়-ব্যথা তুচ্ছ করিয়া তাহার প্রতি দারুণ নির্দ্দয়-বাক্য প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু অমনি যেন আয়েষার সহসা চেতনা হইল। কোথা হইতে আয়েষার এ ভাবের উদয় হইল? আয়েষা কি জন্য আবার কৃপাম্বাকো অতি বিনীতভাবে ওসমানের হৃদয়-বেদনায় সান্ত্বনার শীতলবারি প্রদান করিতে গেলেন? কেন সেই তেজস্বিনী সহসা এত বিনম্রভাব ধারণ করিলেন? আয়েষার হৃদয়ে সহসা ব্যথা লাগিয়াছিল। সে ব্যথা তিনি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। অমনি সেই ব্যথায় গলিয়া গেলেন। গলিয়া ওসমানের মন তুষিতে গেলেন। এই খানেই আয়েষা। এই খানে আয়েষার কোমল-হৃদয়ের সুন্দর পরিচয়। যাহাতে পরের মনোবেদনা হইতে পারে আয়েষা তাহা যেন সহসা দিব্যজ্ঞানে বুঝিতেন। এতদূর কোমলতা আয়েষার হৃদয়েই সম্ভবে। এতদূর কোমলতা কেবল ভাববিপর্য্যয়েই সুন্দর প্রকাশিত হয়। নহিলে আয়েষা তখন যে ভাবে উন্নত, সে সময়ে এভাব সহসা সচরাচর লোকে সঞ্চারিত হয় না। আয়েষার মনে যেন কোথা দিয়া ব্যথা লাগিয়াছে। এই কোমলতা আয়েষার। এই কোমলতায় আয়েষা সুন্দরী। এই কোমলতায় আয়েষা ঔপন্যাসিক সুন্দরী।

এই ভাব-বিপর্য্যয় আমরা আর এক সুন্দরীতেও দেখিয়াছি। কিন্তু সেখানে ইহার ঠিক বিপরীত ভাব। আয়েষা উগ্রভাব হইতে কোমলতায় নামিয়াছিলেন; কারণ আয়েষাকে কোমলভাবে প্রদর্শন করা মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু সে সুন্দরীতে কোমলতা উগ্রভাবে পরিণত হইয়াছিল, কারণ সে সুন্দরীর তেজস্বিনী প্রকৃতি প্রদর্শন করাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য। সে সুন্দরী বিমলা। তেজস্বিনী বিমলা প্রিয়পতির সহিত শেষ সাক্ষাতের জন্য তাহার বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত। বিমলার মন একদা কাতর হইল। তিনি অন্তিমকালে প্রাণেশ্বরের চরণে পড়িয়া কাঁদিলেন। কত কাতরতায় বীরেন্দ্রসিংহের দৃঢ় চিত্তকে একদা গলাইয়া দিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ যখন বীরেন্দ্রসিংহ তাহাকে সে স্থান হইতে যাইতে বলিলেন, অমনি বিমলার চিত্তের চঞ্চলতা গেল, মনে সহসা অন্যভাবের সঞ্চার হইল। বিমলা কহিলেন, আমি স্বচক্ষে স্বামীর বধকার্য্য দেখিতে চাই। বিমলার চক্ষে অশ্রুবারি সহসা শুকাইয়া গেল। বিমলা রোষানলে প্রজ্বলিত হইলেন। তখন তিনি যে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত স্বামীর বধকার্য্য স্বচক্ষে দেখিলেন সে দৃঢ়তা ক্ষণিক পূর্ব্বে বিমলার কাতরতায় অনুমিত হয় নাই। প্রতি-হিংসা তখনি মনকে আরও কঠিনতর

করিত। বিমলার মনের সকল শক্তি জাগরিত হইল। বিমলার সমুদায় তেজ উদ্রিক্ত হইল। বিমলা তখনি হস্তের বলয় খুলিলেন; তখনি বিধবা হইলেন, এবং সেই বিধবা-বেশে ঘোর প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা করিলেন। সে প্রতিজ্ঞা বিমলা কেমন অবিলম্বে সুকৌশলে সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থেই বিবৃত হইয়াছে।

আর এক স্থলেও আয়েষার সুন্দর ভাব-বিপর্যায় আছে। সেই ভাব-বিপর্য্যয়ে আয়েষার প্রকৃতি অতি সুন্দর-তর প্রকাশিত হইয়াছে। বিবেকা অপেক্ষা আয়েষার অনুরাগ যে গভীরতর ছিল, তাহা তাহার নৈরাশ্যে প্রকাশিত হয়। কারণ, যে পরিমাণে অনুরাগের প্রগাঢ়তা হয়, সেই পরিমাণে নৈরাশ্যের আধিক্য বাড়ে। আয়েষার নৈরাশ্য, তাহাকে একেবারে, সংসারবিরাগিণী করিয়াছিল। আয়েষা ভাবিয়াছিলেন, তাহার যথাসর্ব্বস্ব প্রণয়-ভাজন জগৎ-সিংহকে দিয়া তিনি সংসার হইতে অপসৃত হইবেন। তবে যে আয়েষা জগৎসিংহের বিবাহ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ আছে। যত দিন না জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার পরিণয় হইয়াছিল, তত দিন জগৎসিংহ একাকী। তিনি কারাবাসেই থাকুন, অথবা মুক্ত হইয়া স্বদেশে অবস্থিতি করুন, যত দিন না জগৎসিংহ বিবাহ করিয়াছিলেন, তত দিন আয়েষার মনে এক অনির্ব্বচনীয় সুখ ও সান্ত্বনা ছিল। ইহা স্বাভাবিক। আয়েষা যেমন একাকিনী সংসারে আছেন, তাহার প্রীতিপাত্র জগৎসিংহও সংসারে একাকী। জগৎসিংহের স্বতন্ত্রতায় আয়েষার সহানুভূতি ছিল। যেখানে মিলন সংঘটন অসম্ভব, সেখানে পরস্পর অবিবাহিত থাকিলে, মনে মনে যে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় সুখানুভবের সঞ্চার হয়, একপ্রকার সহানুভূতি জন্মে, আয়েষা সেই সুখ ও সহানুভূতিতে জীবিত ছিলেন।

সেই সুখ যত দিন থাকিবে, আয়েষা ভাবিতেন, তত দিন বাঁচিয়া থাকাও সুখ। আয়েষা ভাবিতেন, যত দিন সে সুখ থাকিবে, তত দিন জীবিত থাকিব; সে সুখের অবসান হইলেই সংসার হইতে বিদায় লইব। সেই জন্য, তিনি অঙ্গুরীয়ের মধ্যে গরল রাখিয়াছিলেন। আয়েষা যে কি দুঃখে জগৎসিংহের বিবাহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কি দুঃখে বিবাহকালীন তিলোত্তমাকে যে অলঙ্কার-রাশি দিয়া আসেন, তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। সে বিবাহেও তাহার মনে যে একপ্রকার সহানুভূতি ও সুখের উদয় হইয়াছিল, তাহাও অনির্ব্বচনীয়। সেই তাহার শেষ সুখ। সেই তাহার ঘোর দুঃখ। সেই সুখ হইতে তাহার মনে অনন্ত ক্ষোভের উদয় হইল। আয়েষার মন একেবারে উথলিয়া উঠিল। তিনি সহসা

তিলোত্তমার নিকট হইতে বিদায় লইলেন; গৃহে আসিলেন; গৃহে আসিয়া নিভৃতে, নির্জ্জনে, স্বকক্ষমধ্যে বসিলেন। বসিয়া সে ঘোর দুঃখে আর কাঁদিতে পারিলেন না। মন যখন ঘোর দুঃখে স্তম্ভিত থাকে, তখন নয়নে জল আসে না। আয়েষা ঘোর দুঃখে বসিলেন; বসিয়া মনে মনে সকল ভাবিলেন। এ জীবন যে অসার, তাহার আর জীবিত থাকা যে বৃথা, তাহা একদা আয়েষা ভাবিলেন। তাহার এই সময়কার মনের আবেগ, বঙ্কিমবাবু সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন। আয়েষা একদা এই দুঃখে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন। পাঁচ বার গরলাধারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পাঁচ বার তাহার মন ফিরিয়া আসিল। যেন তাহার হৃদয় হইতে কি ভাব উঠিতে লাগিল। তাহার জীবনের অসারতার চিন্তার মধ্য হইতে তাহার কোমল হৃদয়ে এক সার পদার্থ সহসা উদয় হইল। যে হৃদয়ে আয়েষা জীবন বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলেন, সেই হৃদয়ে আয়েষা এক আশাদেশের প্রতি সহসা চাহিয়া দেখিলেন। তাহার আন্তরিক ঘোর অন্ধকারে যেন সহসা আলোকোদয় হইল। ঘোর নৈরাশ্য হইতে এক আশার সঞ্চার হইল। তাহার জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য অনুভব করিলেন। যাহা আয়েষার প্রাণ, যাহা আয়েষার প্রকৃতি, যাহা আয়েষার নিত্য ভাব, যাহা আয়েষার জীবিত-সর্ব্বস্ব, সেই মহৎ ভাব ও কার্য্য আয়েষার মনে সহসা উদয় হইল। ক্ষণিকের কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার জীবন হইতে অপসারিত করিয়া দিল। আয়েষা তাহার নিত্য-ভাবে জীবিত হইয়া উঠিলেন। সংসারের সন্তাপ ও দুঃখ, আয়েষার কোমল হৃদয়কে ব্যথিত করিল। তিনি সংসারের দুঃখ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ আপন দুঃখ ভুলিলেন। ঘোর ব্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। যে জন্য পরে বাঁচিয়া থাকিবেন, তাহা স্থির করিলেন। আয়েষা গরলাঙ্গুরীয় নদীতে নিক্ষেপ করিলেন;—নিক্ষেপ করিয়া এক নব-জীবনে জীবিত হইয়া উঠিলেন।

আয়েষার এ কি সুন্দর চিত্র! আয়েষার জীবনের কি সুন্দর ভাব! আয়েষার কোমলতার কি সুন্দর পরিচয়! যাহার যাহা প্রকৃতি ও ধর্ম্ম, তাহাই তাহাকে মৃত্যু হইতেও রক্ষা করে। এই ধর্ম্ম বিমলার প্রাণ এক দিন রক্ষা করিয়াছিল। যে তেজ বিমলার প্রাণ, সেই তেজ তাহাকে বীরেন্দ্রসিংহের বধ্য-ভূমিতে দারুণ ব্যবসায় হইতে রক্ষা করিয়াছিল। যে স্থলে কোন কোমল-হৃদয়া রমণী সহসা জীবন বিসর্জ্জন করিত, বিমলা সে স্থলে এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিমলার হৃদয়-তেজ ও শক্তি বিমলাকে রক্ষা করিল। যে কোমলতায় একদা

আয়েষা জীবন বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছিলেন, অবশেষে সেই কোমলতাই তাহাকে রক্ষা করিল। সহসা তাহার কোমল-হৃদয়ে যেন এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইল। স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ হইল। আয়েষা অমনি বাঁচিয়া উঠিলেন। পৃথিবী তাহার স্বর্গতুল্য হইল। তিনি সেই স্বর্গে পুনর্জ্জীবিত হইলেন। স্বর্গীয় কার্য্যে জীবনাতিপাত করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু এই দিন হইতে আয়েষার জীবন হইতে ঔপন্যাসিক মধুরতা গেল। আয়েষা যে উদ্দেশে জীবিতা রহিলেন, সে উদ্দেশ্য অতি স্বর্গীয় ও পবিত্র বটে, কিন্তু তাহাতে ঔপন্যাসিক রমণীয়তা নাই। যে সুখে আয়েষা বাঁচিয়া উঠিলেন, সে সুখ স্বর্গীয় সুখ বটে, কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর ঈষৎ দুঃখ-মিশ্রিত ও অন্যভাব-রঞ্জিত মধুরতা নাই। আয়েষার যে জীবনাংশ মধুর ও রমণীয়, বঙ্কিম বাবু সে জীবনাংশ চিত্রিত করিয়া দেখাইলেন। তৎপরে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কারণ, তৎপরে আয়েষা কোন স্বরদেবীর ন্যায় পৃথিবীর কেবল দুঃখ-মোচনের জন্য ব্যস্ত থাকিতে পারেন, সে কার্য্যে তিনি স্বর্গীয় বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারেন, আয়েষা সে বেশে কোন জীবনী-লেখকের সুন্দর পাত্রী হইতে পারেন, সে জীবনাংশ এক সুন্দর বর্ণে চিত্রিত হইতে পারে, কিন্তু সেই স্বর্গীয় কার্য্যে ঔপন্যাসিক রমণীয় বৈচিত্র্য নাই, সেই বিমলানন্দে পৃথিবীর মলিনতা নাই, সে জীবনাংশে উপন্যাস-লেখকের সুন্দর বর্ণ-বিন্যাস নাই, এবং তাহাতে বৈচিত্র্যের পরম রমণীয়তা নাই। হৃদয়-কোমলতা আয়েষার নিত্য ভাব। কৃপা ও দয়া, আয়েষার নিত্য ধর্ম্ম, পরদুঃখ-কাতরতা আয়েষার নিত্য স্বভাব। প্রণয় তাহাতে কিছু দিনের তরে মিশ্রিত হইয়াছিল মাত্র; মিশ্রিত হইয়া তাহার নিত্য স্বভাবকে অতি রমণীয় ও সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল। উপন্যাস-লেখক কেবল সেই জীবিতভাগ বাছিয়া লইলেন; বাছিয়া, তাহা অতি রমণীয় বর্ণরাগে চিত্রিত করিলেন। আয়েষাকে আমরা সেই রমণীয়-মূর্ত্তিতে হৃদয়-মধ্যে স্থান দিয়াছি। সেই রমণীয়তায় ভিন্ন আয়েষাকে আমরা আর দেখিতে চাহি না। তিনি সেই রমণীয়তায় আমাদিগের কল্পনা-ধামে জীবিত থাকুন। তাঁহার জীবনের মধুরতা আমরা উপলব্ধি ও সম্ভোগ করি। কিন্তু তাঁহার জীবনের উপদেশ ও প্রকৃতির স্বর্গীয় ভাব যেন হৃদয়কে চালিত করুক।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

যোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রথমে মৃদু সাধকের লক্ষণ ও তাহার ক্রিয়া লেখা যাইতেছে। যথা—

মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো
ব্যাধিস্থো গুরু-দূষকঃ।
লোভী পাপমতিশ্চৈব
বহ্বাশী বনিতাশ্রয়ঃ॥
চপলঃ কাতরো রোগী
পরাধীনোঽতিনিষ্ঠুরঃ।
মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো
জ্ঞাতব্যো মৃদু-মানবঃ॥
দ্বাদশাব্দে ভবেৎ সিদ্ধি-
রেতেষাং যত্নতঃ পরং।
মন্ত্রযোগাধিকারী স
জ্ঞাতব্যো গুরুণা ধ্রুবং॥

শিবসংহিতা, ৫ম পটল।

অল্প উৎসাহযুক্ত, মুগ্ধচিত্ত, রোগাক্রান্ত, গুরূপদেশ-বর্জ্জিত, অতি লোভী, পাপ কর্ম্মে রত, বহুভোজী, স্ত্রী-জিত অর্থাৎ স্ত্রৈণ, চঞ্চলপ্রকৃতি, অল্পে কাতর, মহা-ব্যাধিযুক্ত, সর্ব্বদা পরাধীন, নিষ্ঠুর, কুকর্ম্মশীল, অল্পবীর্য্য ইত্যাদি গুণাক্রান্ত লোককে মৃদু-সাধক বলা হইল। এ প্রকার লোক যদি যোগ-সাধনা করিতে চাহেন, তবে গুরু কর্ত্তৃক প্রথমে মন্ত্রযোগ-সাধনা করা উচিত। ইহারা মন্ত্রযোগ-সাধনেরই অধিকারী; যত্ন সহিত মন্ত্রযোগ-সাধনা করিলে, দ্বাদশ বৎসরে ইহাদিগের সিদ্ধিলাভ হইবে। ইহার পর চিত্ত-শুদ্ধি হইলে, হঠযোগ করিতে পারেন। এক্ষণে মধ্যবিধ সাধকের বিষয় বলা যাইতেছে। যথা:—

সম-বুদ্ধিঃ ক্ষমাযুক্তঃ
পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রিয়ংবদঃ।
মধ্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যেষু
সামান্যঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বৈব গুরুভি-
র্দীয়তে মুক্তিতো লয়ঃ॥

সমবুদ্ধি অর্থাৎ সকলকে সমজ্ঞানকারী, ক্ষমাশালী, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী, মিষ্ট অথচ হিত-ভাষী, মধ্যস্থ অর্থাৎ বিবাদভঞ্জক, সাধারণ লোক সদৃশ বড়ই জাঁক-জমক যে না করে, আর সন্দেহ-বিহীন এই সকল লক্ষণাক্রান্ত লোক মধ্যবিধ সাধক-নামে অভিহিত হন। গুরুদেব এরূপ সাধককে প্রথমে হঠ-যোগে দীক্ষিত করাইবেন। ১২ বৎসর হঠযোগ সাধনা করিলে, ঐ যোগে সিদ্ধ হইতে পারেন। হঠযোগ-সিদ্ধ হইলে, কালে মুক্তিদায়ক লয়-যোগ-সাধনা করিতে পারেন। পূর্ব্বানুবৃত্তি হেতু ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সময় অবধারিত হইয়াছে। অতঃপর অধিমাত্র সাধকের বিষয় লিখিত হইতেছে—

স্থিরবুদ্ধির্লয়েযুক্তঃ
স্বাধীনো বীর্য্যবানপি।
মহাশয়ো দয়াযুক্তঃ
ক্ষমবান্ সত্যবানপি॥
শূরো বয়েযু শ্রদ্ধাবান্
গুরুপাদাব্জ-পূজকঃ।
যোগাভ্যাস-রতশ্চৈব
জ্ঞাতব্যশ্চাধিমাত্রকঃ॥
এতস্য সিদ্ধিঃ ষড়্‌বর্ষৈ-
র্ভবেদভ্যাস-যোগতঃ।
এতস্মৈ দীয়তে ধীরো
হঠ-যোগশ্চ সাঙ্গকঃ॥

স্থির-বুদ্ধি, লয়-যুক্ত অর্থাৎ সমাধি-যোগ-ক্ষম, স্বাধীন, বীর্য্যবন্ত, মহাশয়, সর্ব্বত্র সম-দয়ালু, ক্ষমাশীল, সত্যবন্ত, শূর, সমাধিযোগে অচল, বিশ্বস্ত, গুরুপাদ-পূজায় নিতান্ত শ্রদ্ধালু আর যোগাভ্যাসে সর্ব্বদা উৎসাহী, এই সকল গুণাক্রান্ত লোককে যোগিশ্রেষ্ঠ অধিমাত্র সাধক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাঁরা যোগাভ্যাসে রত হইলে,৬ বৎসরে যোগসিদ্ধ হইতে পারেন। এ প্রকার সাধককে গুরুদেব সাঙ্গরাজ ও হঠযোগ প্রদান করিলে, গুরুদেবের উচিত কার্য্য করা হয়।

অতঃপর অধিমাত্রতম সাধকের বিষয় লেখা যাইতেছে—

মহাবীর্য্যান্বিতোৎসাহী
মনোজ্ঞঃ শৌর্য্যবানপি।
শাস্ত্রজ্ঞোঽভ্যাসশীলশ্চ
নির্ম্মোহশ্চ নিরাকুলঃ।
নব-যৌবন-সম্পন্নো
মিতাহারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ভয়শ্চ শুচির্দ্দক্ষো
দাতা সর্ব্বজনাশ্রয়ঃ।
অধিকারী স্থিরো ধীমান্
যথেচ্ছাবস্থিতঃ ক্ষমী।
সুশীলো ধর্ম্মচারী চ
গুপ্তচেষ্টঃ প্রিয়ংবদঃ॥
শাস্ত্রো বিশ্বাস-সম্পন্নো
দেবতা-গুরু-পূজকঃ।
জন-সঙ্গ-বিরক্তশ্চ
মহাব্যাধি-বিবর্জ্জিতঃ॥
অধিমাত্র ব্রতজ্ঞশ্চ
সর্ব্ব-যোগস্য সাধকঃ।
ত্রিভিঃ সংবৎসরৈঃ
সিদ্ধিরেতস্য নাত্র সংশয়ঃ।
সর্ব্ব-যোগাধিকারী স
নাত্র কার্য্য-বিচরণা॥

ইহাই শিবসংহিতোক্ত যোগসাধকের নিরূপণ।

মহাবীর্য্যবন্ত ও উৎসাহযুক্ত, সুন্দর-দেহবিশিষ্ট, শূর, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল, মোহশূন্য, নিরাকুল অর্থাৎ ব্যস্ততা-রহিত, নব-যৌবন-সম্পন্ন, পরিমিত-ভোজী, জিতেন্দ্রিয়, ভয়রহিত, বেদোক্ত শৌচাচারী, সর্ব্ব কার্য্যে নিপুণ, দাতা, শরণাগত-প্রতিপালক, অধিকারী, সুস্থির, বুদ্ধিমান্, যেমন ইচ্ছা তেমনি কার্য্যে অবস্থিত, ক্ষমাশীল, সচ্চরিত্র, ধর্ম্মশীল, সকল কার্য্যের চেষ্টা গোপন-কারী, সত্য-প্রিয়বাদী, শান্ত, শ্রদ্ধাবান্, দেবতা ও গুরুপূজক, জনসঙ্গ-বিবর্জ্জিত,

মহাব্যাধি-বিরহিত, অখলিত-রূপে ব্রত সম্পাদক, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি অধিমাত্রতম সাধক। অধিমাত্রতম সাধক সকল যোগে অধিকারী। তিন বৎসরে ইহাঁরা রাজযোগে সিদ্ধ হইতে পারেন, তদনন্তর জ্ঞান যোগ-সাধনা করিতে ক্ষমবান্ হন। অধিমাত্রতম সাধকের এই লক্ষণ জানিবে।

সকল যুগেই যোগোপাসনা চলিয়া আসিতেছে। কলিযুগের পক্ষে প্রথমে মন্ত্রযোগ, তৎপর হঠ-যোগ, তদনন্তর লয়-যোগ এবং সর্ব্বশেষ রাজ যোগ সাধনা করা কর্ত্তব্য। কলিযুগে অধিমাত্র ও অধিমাত্র-তম সাধক অতি দুর্লভ। মৃদু ও মধ্যবিধ সাধকই অধিক। মৃদু সাধকেরা অধিমাত্রতম সাধকের কার্য্য কখন নির্ব্বাহ করিতে পারেন না; বরং অধিমাত্রতম সাধকেরা আর আর তাবৎ সাধকের সাধ্য সাধনা অনায়াসে করিতে পারেন। এ বিষয়ে যোগ গুরুর বিশেষ অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। যোগশাস্ত্রে যেমন সাধকের শ্রেণী-ভেদ করা হইয়াছে, গুরুর বিষয় তেমনি কেবল বলা হইয়াছে।—

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অলোভী অপ্রমাদী চ সদ্গুরুর্গুরুলক্ষণং॥
শিব-সংহিতা।

শান্তস্বভাব, দাতা, কুলমর্য্যাদা-সম্পন্ন, সত্য-বাদী, জিতেন্দ্রিয়, অলোভী ও অপ্রমাদী এই সদ্গুণাক্রান্তই গুরু। এপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত গুরু ইহ সংসারে অতি অল্পই পাওয়া যায়। যদি ঠিক লক্ষণাক্রান্ত যোগ-শাস্ত্রবিশারদ গুরু না পাওয়া যায়, তবে উদাসীন গুরুর নিকটে যোগ-দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যোগদীক্ষায় ক্রম:—

বিপ্রান্ সন্তোষ্য মেধাবী
নানা-মঙ্গল-সংযুতঃ।
মমালয়ে শুচির্ভূত্বা
প্রগৃহ্নীয়াৎ শুভাত্মকং॥
সমস্তার্চ্চোৎসবং সম্যক্
কৃত্বা চ যোগমুত্তমং।
গৃহ্নীয়াৎ সুস্থিতো ভূত্বা
গুরুং সন্তোষ্য বুদ্ধিমান্॥
জীবাদি-সকলং বস্তু
দত্বা যোগবিদং গুরুং।
সন্তোষ্যাতিপ্রযত্নেন
যোগোঽয়ং গৃহ্যতে বুধৈঃ॥
সংন্যস্যানেন বিধিনা
প্রাক্তনং বিগ্রহাদিকং।
ভূত্বা দিব্যবপুর্যোগী
গৃহ্নীয়াদ্বক্ষ্যমাণকং॥
পদ্মাসন-স্থিতো যোগী
জনসঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ।
বিজ্ঞান-নাড়ী-দ্বিতয়-
মঙ্গুলীভ্যাং নিরোধয়েৎ॥

হয় শিবমন্দিরে, না হয় বিল্বমূলে পরম পবিত্র হইয়া নানাবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠানাদি অর্থাৎ অভ্যুদয়িক কার্য্যাবলি করিয়া বুদ্ধিমান্ সাধক উক্ত শুভাত্মক যোগ ক্রমশ সদ্গুরুর নিকটে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন ও গুরু-পূজা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবেন। পরে মন্ত্রাত্মক দেবতার পূজা, জপ ও হোম

কার্য্য, হয় নিজে, না হয় গুরু দ্বারা করিবেন বা করাইবেন। ইহার অপরাপর বিষয় পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। অতি প্রযত্ন-সহকারে সাধকের দেহাদি গুরুকে দান করিয়াও যোগ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গুরুদেবকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া এই চিন্তা করা উচিত যে, আমি গুরু-সন্তোষ দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরীয় কর্ম্ম-সম্ভব এই স্থূল দেহ গুরুদেবকে প্রদান করিয়া দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া, উক্ত যোগ গ্রহণ করিলাম। এখন অবধি যোগাচার বৈ পূর্ব্বাচারে লিপ্ত হইব না। এই চতুর্ব্বিধ যোগ-সাধনার অর্থাৎ পূর্ণাভিষেকের অগ্রে কুলাচারানুসারে বৈদিকী হউক বা তান্ত্রিকী হউক, দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অভিষিক্ত হইয়া দেব, পিতৃ ও আর্ষ কার্য্য করিবেন। তৎপরে যোগ-বিধি অবলম্বন করত যথারীতি ১২ বৎসর মন্ত্র-যোগ-সাধনা করিতে হইবে। অনন্তর অন্যান্য যোগ-সাধনা করিবার সময় থাকিলে, তাহাও করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানযোগ ভিন্ন অন্য সকল যোগে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলেও, হানি নাই। জ্ঞানযোগে—সংসারী হইয়াও, বৈরাগ্য অবলম্বন করা নিতান্ত বিধেয়। সংসার-ধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট। ধর্ম্মের অবিরোধে সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ পূর্ব্বক যোগারাধনার ন্যায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। এ বিষয়ে মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে প্রাচীন নর-রূপী অর্জ্জুন, তপস্বিগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

পূর্ব্বকালে কতক গুলি অজাত-শ্মশ্রু ব্রাহ্মণকুমার, ইতস্তত পরিভ্রমণ করাই অর্থাৎ দেশ ভ্রমণ করিয়া নানাদেশের আচার ব্যবহার পরিজ্ঞাত হওয়াই, প্রকৃত ধর্ম্ম এই বিবেচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারি-বেশে দেশে দেশে—বনে বনে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানদিগকে অনর্থক পর্য্যটন করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্র-হৃদয়ে স্বর্ণময় পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া উঁহাদিগের সাক্ষাতে কহিতে লাগিলেন, বিঘসাশীরা যে সকল কার্য্য করেন, সামান্য মনুষ্যের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুরূহ। ঐ কর্ম্ম দ্বারা লোকের পুণ্য সঞ্চয় হইয়া, জীবনের সার্থকতা ও চরমে উৎকৃষ্ট গতি-লাভ হইয়া থাকে। তখন ঋষিগণ পক্ষীর এতাদৃশ ধর্ম্মার্থযুক্ত সুস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে কহিলেন, ঐ দেখ পক্ষি-তিলক, বিঘসাশীদিগের কেমন প্রশংসা করিতেছেন। আমরাই সেই বিঘসাশী। এরূপ প্রশংসা আমাদিগকেই করিতেছেন। তখন ঐ পক্ষী কহিলেন, তপস্বি-কুমারগণ! তোমরা পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, রজোগুণাবলম্বী, উচ্ছিষ্টভোজী এবং মন্দবুদ্ধি; তোমরা কখনই বিঘসাশী নহ। আমি তোমাদিগের প্রশংসা

করি নাই। এই কথায় ঋষি-সন্তানেরা কহিলেন, বিহঙ্গম! আমরা উল্লিখিত ধর্ম্মকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া উহাই অবলম্বন করিয়াছি। যদি ইহা অপেক্ষা মঙ্গল-দায়ক ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহার উপদেশ প্রদান কর, আমরা বিশ্বস্ত চিত্তে তাহাই অবলম্বন করিব। তখন পক্ষী কহিলেন, তাপসগণ! চতুষ্পদ-মধ্যে গোধন, ধাতুদ্রব্য-মধ্যে স্বর্ণ, শব্দ-মধ্যে মন্ত্র সকল, এবং দ্বিপদ-মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত মন্ত্রোক্ত জাত কর্ম্মাদি দ্বারা সংস্কার হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের স্বর্গ-লাভের হেতু। যে ব্যক্তি দৃঢ়-বিশ্বস্ত হইয়া যে দেবতারে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া আরাধনা করেন, তিনি দেহান্তে সেই দেবতার সালোক্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। এরূপ গতি লাভ করা সকলেরই প্রার্থনীয়, কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এরূপ গতি লাভ করিতে পারা যায় না। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু-ভূত গৃহস্থাশ্রম অতি পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা এতাদৃশ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অশান্ত প্রকৃতির বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কেবল শিশ্নোদর পূরণ করে, তাহারা পরিশেষে কীট যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। অতএব, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম বিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে, প্রকৃত তপোনুষ্ঠান করিতে পারা যায় বলিয়া, তাহারই অনুরোধ করিতেছি। প্রত্যহ যথা-নিয়মে দেবারাধনা, পিতৃ-তর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা, গুরু-সেবা, অতিথি-সৎকার ও পোষ্যবর্গের ভরণ করিলে, অত্যুৎকৃষ্ট তপস্যার ফল লাভ হয়। এতাদৃশ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম যিনি নির্ম্মমতা, নির্ম্মৎসরতা এবং নিষ্কাম সহকারে করিতে পারেন, সকল প্রকার সিদ্ধি তাঁহার করতলস্থ হয়। হে তাপসগণ! যাঁহারা প্রাতঃ ও সায়ং-কালে পিতৃলোক, অতিথি, দেবতা, ও আত্মীয়গণকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক শেষে আপনারা ভোজন করেন, তাঁহারা প্রকৃত বিঘসাশী হন। বিঘসাশীদিগের তুল্য কঠোর নিয়ম পালন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। বিঘসাশী গৃহী, বিনা তপস্যায় ইহলোকে জন-সমাজে সম্মান-ভাজন হইয়া অন্তে অনন্ত কাল নিরাপদে ইন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থান লাভ করিতে পারেন। তখন ব্রাহ্মণগণ বিহঙ্গের ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃহস্থা-শ্রম ভিন্ন অন্যান্যাশ্রমে সিদ্ধি-লাভের সম্ভাবনা অল্প, ইহা স্থির করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সাত্ত্বিক জনের অবলম্ব্য। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোকদিগের পক্ষে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্ব যুগেই অবলম্বনীয়।

পঞ্চযজ্ঞান্নিহাপয়েৎ।

ধর্ম্ম-সংহিতা।

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যক্তি পঞ্চযজ্ঞ যেন পরিত্যাগ না করেন। এই শ্রুতি

বাক্যানুসারে সাত্ত্বিক গৃহস্থ সর্ব্বদা পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন।

পাঠোহোমো অতিথিশ্চ
সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ।
এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ
প্রাণস্তেঽপি ন হাপয়েৎ।

পঞ্চ যজ্ঞ গীতাদি ভগবদ্বাক্য পাঠ আর হোম অতিথি-সৎকার করা,সপর্য্যা অর্থাৎ পোষ্যবর্গ পোষণ আর গুরুসেবা,পিতৃ-তর্পণ আর বলি এই পাঁচটি কার্য্যকে পঞ্চ যজ্ঞ বলে। গৃহস্থ ব্যক্তি প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞ যদি অনুষ্ঠান করিতে পারেন,তাহা হইলে গৃহস্থ ব্যক্তির নিশ্চয় চিত্ত-শুদ্ধি হয়। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে, নিষ্পাপ হইয়া নারায়ণানুগৃহীত হইতে পারেন। কি যোগ, কি যাগ তাবৎ কার্য্যেই নিরভিমান ও নিষ্কাম হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

ন কর্ম্মণা মনারম্ভা-
নৈষ্কর্ম্মং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যাসনাদেব
সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

ভগবদ্গীতা।

যোগ-সাধনা পক্ষে প্রথমে যোগী ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত তাবৎ কার্য্য করিবেন,পরে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবেন। সন্ন্যাসার্থ ইন্দ্রিয়-সকল বশীভূত করিয়া তাবৎ বিষয়ে মমতাশূন্য হইতে পারিলে, সন্ন্যাসী হওয়া যায়। মমতা-পরিশূন্য হওয়া আর ইন্দ্রিয়-দমনই সন্ন্যাসের প্রধান উপকরণ।

যোগ-সাধনাবস্থাতে যোগী ব্যক্তির নিরন্তর অন্তর্ব্বাহ্য যাবদীয় ইন্দ্রিয় সংযম করিবার যে যে উপায় পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সেই সেই উপায় অবলম্বন করত যোগাভ্যাস করিবেন। তাহা হইলে নিশ্চয় যোগসিদ্ধি হইতে পারে।

সন্ন্যাসী হইয়াও যদি ইন্দ্রিয়-দমন করিতে অক্ষম হন, আর মমতা-বিরহিত না হন, তাহা হইলে সে সন্ন্যাসীর কোন মতে শ্রেয়-লাভ হইতে পারে না। যে গৃহস্থ মমতা-পরিশূন্য ও নিরহঙ্কারী হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় দমন করিয়া গৃহস্থাশ্রমোচিত যথাশক্তি নিষ্কাম কর্ম্ম করেন, তিনিই ধার্ম্মিক তিনিই যোগী। ভগবান্ তাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করেন না। পুরাতন ইতিহাসে এরূপ ব্যক্তির বিস্তর প্রশংসা আছে।

আত্মোপাসনা।—আত্মোপাসনা না করিয়া অন্যোপাসনা করা অপেক্ষা শাস্ত্রশ্রবণ করা ভাল। দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে আত্মেতর উপাসনার বিধান আছে। যে সকল যোগী—আসন, প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদিতে সক্ষম, তাঁহাদিগের আত্মোপাসনা ব্যতীত অন্য উপাসনা রুচিকর হয় না। যখন আত্মেতর অন্য উপাসনায় সাধকের অরুচি হইবে, তখন সাধকের চিত্ত নির্ম্মল হইবে। সিদ্ধ সাধকের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা লেখা যাইতেছে।

আত্ম-সংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা
বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।

হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য
ভ্রমতে জীবিতাশয়া ॥
শিব-সংহিতা।

স্বীয় হৃদয়-স্থিত সর্ব্বমঙ্গল-প্রদ পরম দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া, বাহিরে পরম দেবতা আছেন; এই জ্ঞান করিয়া, যে সুবোধ যোগী বহিঃস্থ দেবতার বাহ্য পূজা করেন,তিনি (অপবিত্র,মলিন-চেতা, নির্ব্বোধ লোকেরা যেমন হস্তস্থিত পিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অন্নার্থী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করে, তদ্রূপ) আপন হৃদয়স্থ দেবতা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের দেবতার অর্চ্চনা করেন।

আত্ম-লিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যা-
দনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা
সিদ্ধির্নাত্র কার্য্য-বিচারণা ॥

যে সিদ্ধ-যোগী আপন শরীরস্থ জীবাত্মার প্রতিদিন উপাসনা করেন, তাঁহার তাবৎ কামনা যে সিদ্ধি হয়, তাহা বিচার করিবার আবশ্যক নাই; কেন না ইহা শিব-উক্তি। এই প্রকার আত্মোপাসনা যে রূপে করিতে হইবে,—যোগী স্বীয় দেহের যে যে স্থানে যে প্রকার আত্মোপাসনা করিবেন, তাহার বৃত্তান্ত এই:—মানব-দেহ অসংখ্য শিরায় ও প্রধানত চতুর্দ্দশ নাড়ীতে পরিব্যাপ্ত; তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, নামক নাড়ী-ত্রয় প্রধান। উক্ত নাড়ী-সকল ভুক্ত দ্রব্যের রস সমুদায় বায়ু সহযোগে সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত করায়, শরীর রক্ষা হয়। স্থূল শরীর রক্ষা হইলে, সূক্ষ্ম লিঙ্গ-শরীরও সুস্থ হয়।

নাড়ীভিরাভিঃ সর্ব্বাভি-
র্ব্বায়ুঃ সঞ্চরতে যদা।
তদৈব সরসো দেহে
সামান্যেঽপ্রবর্ত্ততে ॥ শিব-সংহিতা।

শরীরের মধ্যে যে প্রধান চতুর্দ্দশ নাড়ী আছে, ঐ নাড়ী দ্বারা দেহের সর্ব্ব স্থানে বায়ু ও রস সঞ্চারিত হয়। তাহাতেই সেই রস ও তেজ বিধায়ক হয়। যে যে দ্রব্য আহার করা যায়, তাহাতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা ঐ চতুর্দ্দশ নাড়ী-গত হইয়া শরীরে তেজ আর বল জন্মে। কিন্তু ঐ নাড়ী-গত উক্ত দ্রব্যের রস বায়ুর সাহায্য ব্যতীত শরীরের সর্ব্ব স্থানে গতায়াত করিতে পারে না।

চতুর্ব্বিধস্য চান্নস্য
রসস্ত্রিধা বিভজ্যতে।
তত্রসারতমো লিঙ্গ-
দেহস্য পরিপোষকঃ ॥
সপ্ত-ধাতুময়ং পিণ্ড-
মেতি পুষ্ণাতি মধ্যগঃ।
যাতি বিণ্মূত্র-রূপেণ
তৃতীয় সপ্ততো বহিঃ ॥
আদ্য-ভাগ-দ্বয়ং নাড্যঃ
প্রোক্তা স্তাঃ সকলা অপি।
পোষয়ন্তি বপুর্ব্বায়ু-
মাপাদ-তল-মস্তকং ॥ ৩

চারি প্রকার অন্ন-রস অর্থাৎ চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের

সার-ভূত যে রস; তাহা শরীরের পোষণার্থে তিন-ভাগে বিভক্ত হইয়া, উহার সার ভাগ টুকু সপ্তদশ-অবয়ব-বিশিষ্ট লিঙ্গ দেহের পোষক হয়।

মানবগণের ত্রিবিধ দেহ।

প্রথম কারণ-শরীর। কারণ-শরীরে কেবল সত্য, জ্ঞান আর আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এমন কি; সত্ব, রজ, তম গুণেরও সম্পর্ক নাই। বেদে যাহাকে "ব্রহ্মজ্যোতিঃ রসোঽমৃতং" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে শরীর আত্ম-তত্ব-জ্ঞানীরাই জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারেন। উহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। কারণ, শরীর সাক্ষী-স্বরূপ-মাত্র। দ্বিতীয় লিঙ্গ-শরীর। এশরীর সপ্তদশ-অবয়ব-বিশিষ্ট। স্থূল শরীরে যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, লিঙ্গ-শরীরেও তাহা আছে। লিঙ্গ-শরীর অভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত অর্থাৎ ক্ষিত্যাদিতে নির্ম্মিত নহেন বলিয়া, অতীন্দ্রিয় পদার্থ। ইহার প্রধান উপাদান পঞ্চ বায়ু, মানসিক উৎকৃষ্ট বৃত্তি-সমুদায়, মন বুদ্ধি, অহঙ্কার আর পঞ্চ-তন্মাত্র। আর ষড় রিপু, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। এ শরীরও কারণ-শরীরের ন্যায় স্থূল-শরীর-বর্ত্তী। ইনিই কর্ত্তা ও সুখ দুঃখ-ভোক্তা। ইহার নাশ নাই। ইহা কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের বাধ্য। সেই কর্ম্মই ইহার জনন মরণের অর্থাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাবের হেতু। পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত কারণ-শরীরীকে জীবাত্মা বলিয়া থাকেন। নব-দ্বার-বিশিষ্ট স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীর লিঙ্গ-শরীরের আধার। আবার স্থূল শরীরের আধেয় লিঙ্গ-শরীর। পদ্ম-পত্রে জল থাকিলে, সেই জলের সহিত পদ্ম-পত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, তদ্রূপ স্থূল দেহের সহিত লিঙ্গ-শরীরের এবং লিঙ্গ-শরীরের সহিত কারণ-শরীরের সম্বন্ধ।

ঈশ্বরের কি দয়া দেখ, ঐ লিঙ্গ আর স্থূল শরীর প্রতিপালনের জন্য বাহ্য বস্তু সকল সৃষ্টি করিয়া সেই বাহ্য বস্তুর সহিত জীবগণের ভাল মন্দ সম্বন্ধ বদ্ধ করিয়া দেওয়ায়, জীবগণ তদনুসারে সুখ দুঃখে কাল-হরণ করিতেছে। যিনি সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, তিনি ক্লিষ্ট আর যিনি সুসম্বন্ধ অনুসারে চলেন, তিনিই সুখী হইতেছেন। ঐ সম্বন্ধ-জ্ঞানের কারণ জীবগণকে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়াছেন, সেই ইন্দ্রিয় সকল চালাইবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং লিঙ্গ-দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। লিঙ্গ-দেহে যদি আত্মা না থাকিতেন, তাহা হইলে কেহ জীবিত থাকিত না। আর সেই আত্মার উপাদান দোষাশ্রিত হইলে, ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও মন, বুদ্ধি থাকাতেও আমরা উন্মত্তের ন্যায় বিশৃঙ্খল হইয়া বেড়াইতাম। কোন রূপে সুখী হইতে পারিতাম না। তবে যে লোক সকল আত্মা সুস্থ থকিলেও, নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে, ইহারই বা হেতু কি? ইহার হেতু কেবল কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের হেতু জ্ঞান আর বুদ্ধি। সেই জ্ঞান আর

বুদ্ধির হেতু সত্ব, রজ, তমগুণ। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই। যাহার সাত্বিক প্রকৃতি, সে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম-শালী, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্। যে ব্যক্তির রাজসিক-প্রকৃতি, সে ব্যক্তি না সুখী, না দুঃখী; আর তমগুণাবলম্বী ব্যক্তির সুখের ভাগ অল্প, দুঃখের ভাগই অধিক।

সর্ব্বত্র ত্রিবিধাঃ লোকাঃ
উত্তমাধম-মধ্যমাঃ।

জগদীশ্বর যেমন ত্রিবিধ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ ও উদ্ভিদাদিও সৃষ্টি করিয়া লীলা বিস্তার করিয়াছেন। যদি বল, এরূপ করিবার কারণ কি? ইহার কারণ এই মাত্র অনুভব হয় যে, সংসার-সাগরের প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য। তিনি যদি ঐরূপ না করিতেন, তাহা হইলে সংসার বিশৃঙ্খল হইত। আর সুখ-দুঃখের তারতম্য যে ঘটে, তাহা কার্য্যের ফলানুসারেই হয়। বুদ্ধিমান্ যোগীরা সর্ব্বদা এইরূপ ভাবিয়া সমাহিত-চিত্ত হইয়া যোগাভ্যাস করেন।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

মিল ও স্বাধীনতাবাদ।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলি এমন অচিন্তনীয়—এমন সূক্ষ্ম অথচ অনিবার্য্য-বল-সম্পন্ন, এবং আমাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা এত অকিঞ্চিৎকর, যে মনুষ্য প্রথমে যে দিনে জগতের ক্রিয়া-কলাপের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিল, সেই দিন হইতেই তাহার বিশ্বাস জন্মিল—তাহার ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ক্রমশ এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। বহু পরিশ্রম করিয়া মনুষ্য ইষ্টক ও প্রস্তরে গৃহ নির্ম্মাণ করিল; যখন সেই গৃহ নির্ম্মিত হইল, লোকে ভাবিল, কস্মিন্ কালেও তাহার ধ্বংস নাই; ইতঃমধ্যে এক দিন নিষ্কলঙ্ক আকাশে হঠাৎ মেঘের সঞ্চার হইল, পবন বহিতে লাগিল, এবং ক্রমশ তাহা ভয়ানক ঝটিকায় পরিণত হইয়া সেই উচ্চশির প্রাসাদকে ভূমিসাৎ করিল। বহু পরিশ্রম করিয়া মনুষ্য ভূমি-কর্ষণ করিল, তাহাতে বীজ বপন করিল, এবং সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কাল-ক্রমে ধরিত্রীকে শ্যামল শোভায় বিভূষিত করিল; লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না; 'লক্ষ্মী অবতীর্ণা, আর ভয় কি? বৎসর সুখে অতিবাহিত হইবে; অন্নের জন্য আর ভাবিতে হইবে না; এখনও কিন্তু দুই এক পশলা বৃষ্টির আবশ্যক।—বৃষ্টি এখনও অনেক হইবে, বৃষ্টির ভাবনা কি?' কিন্তু আজ কাল করিয়া দিন

যাইতে লাগিল, অথচ বৃষ্টির কোন লক্ষণই নাই। ক্রমশ লোকের মন উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল ও মুখে চিন্তা দেখা দিল, এবং অবশেষে চারি দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল।—বৃষ্টির আবশ্যক, কিন্তু বৃষ্টি নাই। সর্ব্বনাশ হইল! শ্যামল শস্যক্ষেত্র—যাহার উপরে এত আশা এত ভরসা—সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় আশা অন্তত এক বৎসরের জন্য বিদূরিত হইল! এই রূপে মনুষ্য যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, সেই দিকেই সে দেখিল যে, জগতের কীটাণুকীটে এবং তাহাতে বিশেষ প্রভেদ নাই। সে যাহা ভাবে, ফলে তাহার ঠিক্ বিপরীত হয়; সে যাহা করিতে চাহে, কার্য্যে তাহার কিছুই হয় না। সমুদয় আয়োজন করিলাম; যত দূর চেষ্টা পাওয়া উচিত, তাহার কোন অন্যথা হইল না। ভাবিলাম, এবার অবশ্যই অভিলষিত ফল পাইব। কিন্তু যখন ফলের সময় আসিল, তখন দেখিলাম—এত চেষ্টা, এত যত্ন, সকলই বৃথা হইয়াছে। তবে জগতে মনুষ্য কি করিতে পারে? আমার ইচ্ছানুসারে যখন কোন কার্য্যই হইতেছে না, আমার ক্ষমতা যখন পদে পদে ব্যর্থ হইতেছে, তখন অবশ্যই এমন কোন অদৃষ্ট জীব আছে, যাহার ইচ্ছানুসারে জগতের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। এই অপরিজ্ঞাতস্বরূপ জীব অলক্ষিত ভাবে মনুষ্যের আয়োজনের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, তাহাকে ক্রীড়নকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে ও যখন ইচ্ছা হইতেছে, তখন তাহার আয়াস সফল করিতেছে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য সমাধা করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের অণুমাত্রও নাই, অথচ তাহার ইচ্ছা কি,—তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

বাহ্য জগৎ হইতে মনুষ্য যখন অন্তর্জগতের দিকে চক্ষু ফিরাইল, তাহাতেও ঠিক্ এইরূপ দেখিল। আমি বহু কষ্টে একটী অভিসন্ধি করিলাম, এবং মনে মনে ভাবিলাম যে, কিছুতেই আমাকে ইহা হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। পর মুহূর্ত্তে এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল যে, তাহাতে উহা একবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। লোকের কাছে আমি অতি সাধু পুরুষ বলিয়া পরিচিত, এবং আমি নিজেও এই বিষয় লইয়া মনে মনে অহঙ্কার করিয়া থাকি। এক দিন এমন এক প্রলোভনে পতিত হইলাম যে, কিছুতেই তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, এক মহীয়সী শক্তি (যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) আমাকে ধর্ম্মপথ হইতে বেগে আকর্ষণ করিয়া পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন করিল। সুতরাং আমার প্রতীতি হইল, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও ক্ষুদ্র মনুষ্য সম্পূর্ণ-রূপে—সেই

অপরিজ্ঞাত-স্বরূপ জীবের অধীনে রহিয়াছে। অন্ত-র্জগতেও মনুষ্যের স্বেচ্ছাচারিতার কোন সম্ভাবনা নাই।

এই রূপে অদৃষ্ট বা নিয়তিতে মনুষ্যের বিশ্বাস জন্মিল। কার্য্য-কারণ জ্ঞানে ইহার উৎপত্তি; আবার কার্য্য-কারণ জ্ঞানেই ইহার ধ্বংস। যত দিন কার্য্য কারণ জ্ঞান না জন্মে, তত দিন মনুষ্যের অদৃষ্টে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। আবার এই জ্ঞান যখন মার্জ্জিত ও দূরদর্শন-ক্ষম হয়, তখন নিয়তির প্রতি আর মনুষ্যের বিশেষ আস্থা থাকে না। এই বিশ্বাস কত দূর যুক্তি-সঙ্গত তাহা এস্থলে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমার নিজের কথা বলিতে হইলে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জগতে কার্য্য-কারণ-পারম্পর্য্য ব্যতীত আমি আর কিছু দেখিতে পাই না। এই পারম্পর্য্য ক্রমশ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অবশেষে অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। হইতে পারে, এই অন্ধকারের নাম নিয়তি। ইচ্ছা হয়, ইহাকে অন্য কোন নামে অভিহিত কর। কিন্তু তথাপি ইহা অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু নহে।

যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি-শক্তি বিশেষ মার্জ্জিত না হয়, তত দিন অদৃষ্টে বিশ্বাস মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ বলিতে হইবে। অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতবাসিগণ পুরুষানুক্রমে নিয়তির উপরে নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। সকল বিষয়েই আমরা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া থাকি। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের যে সকল উপায় আছে, তন্মধ্যে অদৃষ্ট দেবতার পূজাকে আমরা সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া গণ্য করি। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই বিশ্বাস ক্রমশ হীন-বল হইয়া আসিতেছে, ও তৎপরিবর্ত্তে নূতন নূতন বিশ্বাস দেখা দিতেছে। ইহাদের মধ্যে অন্যতম বিশ্বাস 'মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসটি কত দূর যুক্তি-সঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্য উপস্থিত প্রবন্ধ লিখিত হইল। 'কিন্তু মানব-ইচ্ছার স্বাধীনতা' বলিলে কি বুঝায়, তাহা অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, জড় জগতে স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতার লেশ-মাত্র নাই। আমরা যত দূর জানি, তাহাতে পরমাণু-সমষ্টি চিরকাল কার্য্য-কারণ-রূপ অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এবং (সম্ভবত) এইরূপ চিরকালই থাকিবে। কার্য্য, কারণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে; আবার এই কারণ অন্য কারণ হইতে কার্য্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে আমরা যত দূর যাই, কেবল কার্য্য-কারণের পারম্পর্য্য দেখিতে পাই। কুত্রাপি এরূপ লক্ষিত হয় না যে, পরমাণু স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতেছে। সুতরাং ইহা স্থির

হইল যে, বাহ্য জগতে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু বাহ্য জগতে ইহা না থাকুক, অন্তর্জগতে ইহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এক সম্প্রদায়-ভুক্ত মনোবিজ্ঞান-বেত্তারা বলেন 'না।' ইঁহাদের মতে, জড়জগৎ যেরূপ অলঙ্ঘ্য কার্য্য-কারণ-নিয়মের অধীন, অন্তর্জগৎও ঠিক্ তদ্রূপ। এই সকল দার্শনিকেরা অবশ্যম্ভাবিতা-বাদী (Necessitarian) নামে পরিচিত। ইঁহারা বলেন যে, বাহ্যিক কোন প্রতি-বন্ধক না পাইলে, আমাদের ইচ্ছা (Will) * অবশ্য কার্য্যে পরিণত হইবে; কিন্তু আমাদের ইচ্ছার উপরে আমাদের কোন ক্ষমতা নাই। বাহ্য জগতে যেমন কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, তদ্রূপ অন্তর্জগতে আমাদের ইচ্ছা সকল অলঙ্ঘ্য কার্য্য-কারণ-নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষা, বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থা প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইচ্ছার উৎপত্তি অভিলাষে (desire); অভিলাষের উৎপত্তি শিক্ষা ও অবস্থাতে, ইত্যাদি। মনুষ্যের চরিত্র বলিলে তাঁহার অভিলাষ (desire) সমষ্টি বুঝায়। সুতরাং কোন লোকের চরিত্র কিরূপ, তাহা যদি অভ্রান্ত-রূপে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে অবস্থা-বিশেষে সেই ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিতে পারা যায়। অবশ্য সাধারণতঃ আমরা লোকের চরিত্র দেখিয়া তাহার কার্য্য নিরূপণ করিতে পারি না। আমরা যাহাকে অতি সাধু পুরুষ বলিয়া জানি, সে ব্যক্তি এক সময়ে, এমন আচরণ করিতে পারে যে, আমরা শীঘ্র তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইব না। কিন্তু এরূপ বৈষম্যের এক-মাত্র কারণ এই যে, আমরা সেই ব্যক্তির চরিত্র সবিশেষ বুঝিতে পারি নাই। যেমন বাহ্য জগতে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি অনিবার্য্য, তদ্রূপ যে ব্যক্তির চরিত্র যেরূপ অভিলাষ-সমষ্টিতে গঠিত, তাহার ইচ্ছাও ঠিক তদনুযায়ী হওয়া চাই। মনুষ্যের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে তাহার অভিলাষের বিরুদ্ধে কোন ইচ্ছা করিতে পারে। বস্তুত মানুষ নিজে কোন ইচ্ছা করে না। তাহার প্রবৃত্তি-সকল তাহাকে যে দিকে টানিয়া লইয়া যায়, সে তাহাই ইচ্ছা করিতে বাধ্য। যদি ভিন্ন প্রকৃতির দুইটী প্রবৃত্তি এক কালে মনোমধ্যে উদিত হয়, তাহা হইলে যে প্রবৃত্তিটী অধিকতর বল-শালী, ইচ্ছা তদনুযায়ী হইবে। যদি দুইটীই অত্যন্ত প্রবল হয়, তাহা হইলে মনোমধ্যে যাতনা হইতে থাকে; এবং কখন কখন এরূপ যাতনা এত দুর্ন্নিবহ হইয়া উঠে যে,

* এই প্রবন্ধে ইচ্ছা ইংরাজী will শব্দের প্রতিবাক্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। অভিলাষ ও প্রবৃত্তি desire বুঝাইবে। will এবং desireতে যে প্রভেদ, এই প্রবন্ধে ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি বা অভিলাষে সেই প্রভেদ বুঝিতে হইবে। 'আমি ইহা করিব' এই স্থির সংকল্পকে ইচ্ছা কহে।

শরীর তাহাতে একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

অবশ্যম্ভাবিতাবাদি-গণের মত উপরে লিখিত হইল। ইঁহাদের বিরুদ্ধে অন্য এক সম্প্রদায়-ভুক্ত দার্শনিকেরা বলেন যে, জড় জগতের মধ্যে স্বাধীনতার কোন চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু অন্তর্জগতে ইহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই সম্প্রদায় স্বাধীনতাবাদী নামে পরিচিত। ইঁহাদের মতে মানবইচ্ছা, শিক্ষা ও বর্ত্তমান এবং অতীত অবস্থার উপরে নির্ভর করে না। মানবইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তোমার মনে যে কোন প্রবৃত্তি প্রবল হউক না, তোমার এমন ক্ষমতা আছে যে, তুমি ইহার বিপরীত প্রবৃত্তির সহায় না লইয়া ইহাকে দমন করিতে পার। তোমার মন স্বাধীন। স্বাধীন মনের ইচ্ছাও স্বাধীন। তোমার মনে যখন যে ইচ্ছা (will) হয়, তাহা তুমি নিজে করিতেছ; তাহা অবস্থা বা শিক্ষার ফল নহে। জড়-জগৎ-সম্বন্ধে কার্য্য-কারণ-রূপ অলঙ্ঘ্য নিয়ম সত্য বটে, কিন্তু ইচ্ছা সম্বন্ধে এ নিয়ম সত্য নহে। কারণ ইচ্ছা মনে স্বত উৎপন্ন হইয়া থাকে—কোন কারণ হইতে সমুদ্ভূত নহে।

উভয় সম্প্রদায়-ভুক্ত দার্শনিকদিগের মত বলা হইল। এক্ষণে মিলের অনুসরণ করিয়া দেখা যাক, স্বাধীনতাবাদ কত দূর যুক্তি-সঙ্গত।

কোন বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে একটী কথা অগ্রে বলিয়া রাখিব। অবশ্যম্ভাবিতাবাদীদিগের মত যত সম্ভব-পর বলিয়া বোধ হয়, স্বাধীনতাবাদীদিগের মত তত বোধ হয় না। জড়-জগতে যে কার্য্যকারণ নিয়ম বিদ্যমান রহিয়াছে, অবশ্যম্ভাবিতাবাদি-গণ অন্তর্জগতেও সেই নিয়ম প্রয়োগ করিতে চাহেন। কিন্তু স্বাধীনতাবাদীগণ বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম অবহেলা করিয়া অন্তর্জগৎ-সম্বন্ধে একটী নূতন নিয়ম প্রয়োগ করিতেছেন। অবশ্যম্ভাবিতাবাদি-গণ বলিবেন যে, তাঁহারা কোন নূতন কথা বলিতেছেন না। বাহ্য জগৎ তাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে। কিন্তু স্বাধীনতাবাদীগণ বাহ্য জগৎ-প্রদত্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া এক নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিতে চাহেন। সুতরাং প্রমাণ-ভার তাঁহাদেরই উপরে পড়িতেছে। তাঁহাদেরই দেখান উচিত যে, কার্য্য-কারণ নিয়ম অন্তর্জগৎ-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। বস্তুত যে পর্য্যন্ত না স্বাধীনতাবাদি-গণ তাঁহাদের মত নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইতেছেন ততদিন তাঁহাদের বৈরীরাই অবশ্য প্রবল থাকিবেন।

স্বাধীনতাবাদি-গণ বাহ্য-প্রকৃতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া প্রমার (consciousness) উপায় নির্ভর করেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মনোবিজ্ঞানে প্রমা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাক্ষী। প্রমা যাহা বলিবে তাহা স্বীকার করিতে আমরা

বাধ্য। কিন্তু ইহাতে একটী গোল আছে। প্রমার সাক্ষ্য সন্দেহাতীত হইলেও প্রমা কি সাক্ষ্য দিতেছে, এটি স্থির করা অতি দুরূহ। বস্তুত এই জন্যই মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে এত বিবাদ। আমাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত প্রমার বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমশঃ দর্শন-লব্ধ অনেক জ্ঞান এরূপে প্রমার সহিত মিশিয়া যায় যে, তাহারাও প্রমার উক্তি বলিয়া ভ্রম জন্মে। দর্শন ক্রিয়ায় ইহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। মনে কর, তুমি সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছ, এবং আমি তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছি। সূর্য্য-দর্শন-কালে তোমার বোধ হইবে যে তুমি যাহা দেখিতেছ, তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমিও ঠিক তাহাই দেখিতেছি। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সূর্য্য হইতে যে রশ্মিসূত্রগুলি তোমার চক্ষুর উপরে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার একটীও আমার চক্ষুর উপরে পড়ে নাই। এবং আমার চক্ষুর উপরে যে গুলি পড়িয়াছে, তাহার একটীও তোমার চক্ষুর উপরে পড়ে নাই। বাহ্য বস্তু দর্শন কালে আমরা আলোক-রশ্মি-মাত্র দেখিতে পাই; অর্থাৎ আমাদের চক্ষুর সংস্পর্শে আইলে। কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন রশ্মি-সূত্র আমাদের চক্ষুর উপরে আসিয়া পড়িতেছে, তখন আমি তোমার পার্শ্বে থাকিয়া তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা কখনই দেখিতে পাইতেছি না। অথচ আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, প্রমা বলিতেছে আমরা উভয়েই এক পদার্থ দেখিতেছি *। সুতরাং প্রমার উক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে বলিলেই, তাহা প্রমার উক্তি হইল না। কোন্‌টী প্রমার উক্তি, কোন্‌টী প্রমার উক্তি নহে, ইহা যুক্তির দ্বারা স্থির করা কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতাবাদিগণের মতে আমরা প্রমা দ্বারা জানিতেছি যে, ইচ্ছা-সম্বন্ধে আমরা স্বাধীন। মিল এ কথা স্বীকার করেন না। প্রমা বলিতেছে, আমার ইচ্ছা স্বাধীন, এ কথা বলিলে ইহাই বুঝায় যে, কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমি প্রমা দ্বারা জানিতে পারি যে, আমি পরস্পর-বিরোধী আচরণে সক্ষম। কিন্তু বস্তুত প্রমার এ কথা বলিবার কি অধিকার আছে?—প্রমা এ কথা বলিতে পারে না। আমি কি করিতে পারিব কি না পারিব, ইহা ভবিষ্যতের বিষয়, সুতরাং প্রমার বিষয়াতীত। আমি কি করিতেছি, প্রমা শুদ্ধ ইহাই বলিতে পারে। অতীত ও ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে প্রমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। তবে তুমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে

* আর একটী কথা বলা আবশ্যক। তুমি যখন সূর্য্যের (কি অন্য কোন বাহ্য বস্তুর) দিকে চাহিয়া দেখ তখন তোমার স্পষ্ট বোধ হয় যে, তুমি প্রমা দ্বারা বহুদূরস্থ এক বাহ্য বস্তু জানিতেছ। কিন্তু বস্তুত ইহা প্রমার উক্তি নহে; ইহা যুক্তি-সিদ্ধ জ্ঞান (inferred knowledge) মাত্র।

চাহ যে, তুমি পরস্পর-বিরোধী আচরণে সক্ষম—তোমার ইচ্ছা স্বাধীন-ভাবাপন্ন? ইহার উত্তরে কোন কোন স্বাধীনতাবাদী বলেন—আমি কি করিতে পারিব, কি না পারিব, ইহা অবশ্য প্রমার বিষয়াতীত; কিন্তু আমি পরস্পরবিরোধী আচরণ করিবার স্বাধীন শক্তি(free force) অনুক্ষণ অন্তর মধ্যে অনুভব করিতেছি; সুতরাং ইহা প্রমার বিষয়াতীত নহে। কিন্তু একথা বলিয়াও স্বাধীনতাবাদি-গণ নিস্তার পাইতে পারেন না। আমরা যদি যথার্থই এরূপ শক্তি অনুভব করি, তাহা তবে অবশ্য প্রমার বিষয়ান্তর্গত। কিন্তু বস্তুত কি আমরা প্রমা দ্বারা কোন শক্তি অনুভব করিতে পারি? কার্য্য না করিলে শক্তি কখনই বুঝিতে পারা যায় না। শক্তির অনুভব কার্য্যের উপরে নির্ভর করে। আমার সম্মুখে এক খানি পুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে, ও আমি জানিয়েছি যে, এই পুস্তক তুলিবার শক্তি আমার আছে। কিন্তু কেমন করিয়া আমার এই শক্তি, জ্ঞান হইল?—যেহেতু ইতিপূর্ব্বে এরূপ ভারযুক্ত সামগ্রী আমি অনেক বার তুলিয়াছি। পক্ষাঘাত রোগে ইহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়*। আমরা দিবানিশি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা শিখিয়াছি যে আমাদের সঞ্চালন শক্তি আছে। পরে যখন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হই, অথচ রোগের বিষয়ে কিছু-মাত্র জানিতে পারি নাই, তখনও মনে ভাবি যে, আমাদের সেই শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন একবার সঞ্চালন-চেষ্টা হঠাৎ বিফল হয়, তখনই আমাদের ভ্রম দূর হইয়া যায়; তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, সে শক্তি আর নাই। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, শক্তিজ্ঞান কার্য্যের উপরে নির্ভর করে। অগ্রে কার্য্য, পরে শক্তি-জ্ঞান। যে ব্যক্তি কখনও পৈশিক শক্তি প্রয়োগ করে নাই, তাহার পৈশিক শক্তি আছে কি না, সে বলিতে পারে না। যে ব্যক্তি কখনও চিন্তা করে নাই, তাহার চিন্তা-শক্তি আছে কি না সে বলিতে পারে না। পৈশিক শক্তি, চিন্তা-শক্তি, কি অন্য শক্তি, কোন শক্তি আমরা প্রমা দ্বারা জানিতে পারি না। অতএব প্রমা দ্বারা আমরা অনুক্ষণ স্বাধীন চিন্তা-শক্তি অনুভব করিতেছি, এ কথা কখনই বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। স্বাধীনতাবাদিগণ যাহা প্রমার উক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা যথার্থ প্রমার উক্তি নহে।

বস্তুত ইচ্ছা-সম্বন্ধে প্রমা যাহা বলিয়া থাকে, তদ্দ্বারা স্বাধীনতাবাদের ধ্বংস হইতেছে। তুমি কোন কার্য্য করিয়া যদি মনকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি অন্যরূপ আচরণ করিতে পারিতে কি না, তোমার মন বলিবে যে, যদি তোমার প্রবৃত্তি (desires) অন্যরূপ হইত, তাহা হইলে কোন বাহিক প্রতিবন্ধক না

* এই উদাহরণটী মিলের গ্রন্থে নাই সুতরাং ইহার প্রয়োজ্যতা সম্বন্ধে প্রস্তাব লেখক দায়ী।

থাকিলে, তুমি অবশ্যই অন্যরূপ আচরণ করিতে পারিতে। কিন্তু তোমার প্রবৃত্তিতে যদি কোন পরিবর্ত্তন না ঘটে, যদি তোমার প্রবৃত্তি একই অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহা করিতে সংকল্প করিয়াছিলে, এখনও সেই সংকল্প করিবে। এতদ্বারা কি সপ্রমাণ হইতেছে না যে, আমাদের ইচ্ছা (will) সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির অধীন?—যে, প্রবৃত্তি যে দিকে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যায়, আমরা তাহাই করিতে ইচ্ছা করি?—যে, আমাদের এমন স্বাধীনতা নাই যে মন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে?

স্বাধীনতাবাদিগণের আর একটী তর্ক আছে, এবং সেইটীর উপরে তাঁহারা কিছু অধিক নির্ভর করেন। এই দ্বিতীয় তর্ক মতে আমরা প্রমা দ্বারা স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য। স্বাধীনতাবাদিগণ বলেন যে, আমরা প্রমা দ্বারা অনুভব করিতেছি যে আমাদের দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব থাকিলে স্বাধীনতা বুঝায়; কারণ, যাহার স্বাধীন কার্য্য-ক্ষমতা নাই, সে কেমন করিয়া দায়ী হইতে পারে? অতএব প্রমা দ্বারা যখন দায়িত্ব অনুভব করিতেছি, তখন আমরা অবশ্যই স্বাধীন কার্য্যক্ষম জীব। মিল যেরূপে এই তর্ক খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

দায়িত্ব বলিলে দুইটী কথা বুঝায়—(১) দুষ্ক্রিয়ার ফল-স্বরূপ শাস্তি-ভোগ করিতে হইবে; (২) সেই শাস্তি ন্যায্য হইবে। সুতরাং প্রমা দ্বারা যদি আমরা দায়িত্ব অনুভব করি, তাহা হইলে প্রমা আমাদিগকে এই দুইটী কথা বলিতেছে। এক্ষণে এই দুই বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

(১) দুষ্ক্রিয়ার ফল-স্বরূপ শাস্তিভোগ হইবে, এই বিশ্বাসটী শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত হইতে উৎপন্ন—ইহা প্রমার উক্তি নহে। আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে, দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহার জন্য শাস্তি পাইতে হয়। আমাদের পিতা মাতা ও অপরাপর উপদেশকগণ এ বিষয়ে আমাদিগকে ভূয়োভূয় শিক্ষা দিয়াছেন। এত দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা সত্ত্বেও এই বিশ্বাসটি মনোমধ্যে দৃঢ়মূল না হওয়াই বিচিত্র। যাহা দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা দ্বারা উদ্ভূত হওয়া সম্ভবপর—শুধু সম্ভবপর নহে, আবশ্যক—তাহাকে প্রমার উক্তি বলিবার কোন অধিকার নাই। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে যে বিষয়টী অন্য কোন বিষয় দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না, তাহাই কেবল প্রমার উক্তি। যদি সকল কথাতেই প্রমার দোহাই দেওয়া হয়, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের অর্দ্ধেক গৌরব কমিয়া গেল।

দ্বিতীয়াংশ-সম্বন্ধে এক্ষণে মিলের তর্কের সার সংকলন করা যাইতেছে।—আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্যক্তি-মাত্রেরই কতকগুলি অধিকার আছে। আমার

অধিকার হইতে যদি কেহ আমাকে বিচ্যুত করিতে আইসে, তাহা হইলে আমি তখনই তাহার শাসন করিয়া থাকি। এই কারণ বশত অধিকার, ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য শাস্তি, এই দুইটীর মধ্যে ভাবযোগ (association) উৎপন্ন হয়। এইরূপে আমাদের মনে সংস্কার জন্মে যে, অধিকার হইতে বিচ্যুত করণের ন্যায্য ফল শাস্তি। সুতরাং আমি যদি কোন দুষ্কার্য্য করি, তাহা হইলে তাহাতে যে শাস্তির সম্ভাবনা আছে, তাহাকে আমি ন্যায্য বলিয়া মনোমধ্যে স্বীকার করি। অতএব দুষ্ক্রিয়া করিলে শাস্তি ন্যায্য হইবে, ইহাও প্রমার উক্তি নহে।

মিলের এই তর্কে আমরা একটী তর্ক যোগ করিতে চাহি।—বাল্যকাল হইতে আমরা দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা জানিয়াছি যে, কতকগুলি কার্য্য কর্ত্তব্য এবং আর কতকগুলি কার্য্য পরিত্যাজ্য। পরিত্যাজ্য কার্য্যগুলি নীতি-বিরুদ্ধ; এবং যাহা নীতি-বিরুদ্ধ তন্নিমিত্ত ইহলোকে পর-লোকে বা উভয়লোকে শাস্তি পাইতে হয়। এই শাস্তি অন্যায় নহে। কারণ (শিক্ষানুসারে) নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের উপযুক্ত ফল-শাস্তি; যে কেহ দুষ্ক্রিয়া করিবে, তাহার শাসন ন্যায়-বিরুদ্ধ নহে। এই সংস্কার আমাদের মনোমধ্যে দৃঢ়মূল হইয়াছে। সুতরাং আমরা নিজে যখন কোন দুষ্কর্ম্ম করি, অথবা করিবার সংকল্প করি, তখন এই ভাবটী মনের ভিতরে উদিত না হইবার কোন কারণ নাই। অতএব স্বাধীনতাবাদিগণের মতে যাহা প্রমার উক্তি, তাহা বস্তুত শিক্ষার ফল-মাত্র। শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহা সম্ভবপর, তাহাকে প্রমার উক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে কেহ বাধ্য নহে।

স্বাধীনতাবাদিগণের আর কোন তর্ক নাই; সুতরাং যাহা যাহা বলা হইল, তাহাতে যদি বিশেষ কোন ভ্রম না থাকে, তাহা হইলে স্বাধীনতাবাদের ধ্বংস হইল। বাহ্য জগৎ যে অলঙ্ঘ্য কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে, অন্তর্জগৎও তাহারই অধীন। 'অন্তর্জগৎ স্বাধীনভাবাপন্ন' এ কথা কল্পনা-প্রসূত-মাত্র। কারণ, বিজ্ঞান দ্বারা স্বাধীনতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে মনের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে দুষ্ক্রিয়ার জন্য শাস্তি-প্রদান কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হইল? আমি যাহা স্বাধীন ভাবে করিব, তাহারই জন্য আমি দায়ী; কিন্তু অলঙ্ঘ্য কার্য্যকারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমি যাহা করিতে বাধ্য, তাহার জন্য আমাকে দায়ী হইতে হইবে, কেন?—আমরা মিলের অনুসরণ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষা ও অবস্থা হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি। তুমি যেরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছ, পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় ছিলে ও এক্ষণে

আছে, তোমার প্রবৃত্তি ঠিক্ তদনুরূপ হওয়া চাই। ইহাতে তোমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই—অর্থাৎ, শিক্ষা ও অবস্থানুসারে তোমার যেরূপ প্রবৃত্তি হইবে, তুমি শুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া সেই প্রবৃত্তিকে অন্যরূপ করিতে একেবারে অক্ষম। পুনশ্চ, তোমার প্রবৃত্তি যেরূপ, তোমার ঠিক তদনুরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে। ইহাতেও তোমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই। কার্য্য-করণে ইচ্ছা (will) প্রবৃত্তির ফল-মাত্র। তোমার মনে যখন যে প্রবৃত্তিটী বলবতী হইবে, তোমার ইচ্ছা তদনুযায়িনী হইবে। যদি তোমার মনে এক কালে দুইটী প্রবৃত্তি দেখা দেয়, তাহা হইলে যে প্রবৃত্তিটী অধিকতর বলশালিনী, তদনুসারে তুমি কার্য্য করিবে। বিবেচনা কর, তোমার দুই হস্ত ধরিয়া দুই ব্যক্তি তোমাকে বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এ অবস্থায় যে ব্যক্তির অধিক বল, তুমি তাহারই দিকে যাইবে। মনের সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ। যে প্রবৃত্তিটীর অধিক বল, মন তাহার দ্বারাই আকৃষ্ট হইবে। এই সামান্য কথাটী বুঝিলে আর কোন গোল রহিল না। কুপ্রবৃত্তি যেমন আমাদিগকে দুষ্কার্য্যের দিকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ শাস্তি-ভয় আমাদিগকে তদ্বিপরীত দিকে টানিতে থাকে। সুতরাং যদি শাস্তি-ভয় কুপ্রবৃত্তির অপেক্ষা অধিক বলশালী হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই দুষ্ক্রিয়া হইতে বিরত হইব। কিন্তু বস্তুতঃ কি কুপ্রবৃত্তির অপেক্ষা শাস্তি-ভয় অধিক বলশালী হইতে পারে?—অবশ্য। যে সমাজে সুশাসন নাই, ও যে সমাজে ইহা আছে, তাহাদের মধ্যে কত প্রভেদ ভাবিয়া দেখ। অবশ্য আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, সকল স্থলেই শাস্তি-ভয় আমাদিগকে কুকর্ম্ম হইতে বিরত করিতে পারে। আমরা এই মাত্র বলিতেছি—অধিকাংশ স্থলেই ইহা সক্ষম। অতএব লোককে দুষ্ক্রিয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য শাস্তি-ভয় থাকা উচিত; কারণ, ইহাতে তাহার মঙ্গল আছে, পরেরও মঙ্গল আছে। কিন্তু শাস্তি-ভয় প্রবল রাখিতে হইলে, শাস্তিপ্রদান করা কর্ত্তব্য। কুকর্ম্ম করিয়া যদি তাহার জন্য সত্য সত্যই শাস্তি না পাইতে হয়, তাহা হইলে শাস্তি-ভয় থাকা অসম্ভব। আমাদের প্রয়োজন শাস্তি-ভয়ে—শাস্তিপ্রদানে নহে। কিন্তু শাস্তিপ্রদান ব্যতীত শাস্তি-ভয় থাকিতে পারে না। অতএব স্বাধীনতার অভাব সত্ত্বেও দুষ্ক্রিয়ার জন্য শাস্তিপ্রদান অন্যায় নহে। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে "শাস্তিপ্রদানে জীবের কষ্ট আছে।—শাস্তিপ্রদানে যে কার্য্য হয়, সুপ্রবৃত্তির দ্বারাও সেই কার্য্য হইয়া থাকে; অতএব শাস্তিপ্রদান পরিবর্ত্তে যাহাতে লোকের সুপ্রবৃত্তি হয়, শাসনকর্ত্তাদিগের সেই চেষ্টা দেখা উচিত"। এই তর্কের সারবত্তা অবশ্য

স্বীকার করিতে হইবে। উপস্থিত লেখক এই মতের বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা কত দূর প্রযোজ্য, বলিতে পারা যায় না। যত দিন উন্নতির সীমা বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত না হইতেছে, তত দিন শাস্তিপ্রদান একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে।

ইহলোকে শাস্তিপ্রদান তবে অন্যায় নহে; কিন্তু যিনি আমাদিগকে 'সৃজন করিয়াছেন, তিনি কি আমাদের দুষ্কৃতির জন্য আমাদিগকে ন্যায়ত শাস্তি দিতে পারেন?—এই প্রশ্নে আমরা প্রবেশ করিতে চাহি না। পাঠক স্বয়ং ভাবিয়া দেখুন। তাঁহাকে শুধু এই মাত্র বলিব যে, তিনি আমাদের তর্কের ভ্রমশূন্যতা স্বীকার করিয়া যদি পরে দেখেন যে, তদনুসারে পরলোকে শাস্তি অসম্ভব, অথবা ন্যায়সঙ্গত নহে, তাহা হইলে যেন ভয়বশতঃ হটিয়া না যান।

এ পর্য্যন্ত যাহা ২ বলা হইয়াছে তাহাতে আমরা মিলের সহিত একমত হইয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এক্ষণে আমাদিগকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে হইতেছে। মিলের মতে অন্তর্জগতে স্বাধীনতার কোন চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু তথাপি আমরা যদি চরিত্র-সংশোধনে অমনোযোগী হই, তাহা হইলে, কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হওয়া হইল। এ সম্বন্ধে মিলের মত তাঁহার নিজের কথায় আমরা পাঠকবর্গকে জানাইব;—

"If our character is such that while it remains what it is, it necessitates us to do wrong, it will be just to apply motives which will necessitate us to strive for its improvement, and so emancipate ourselves from the other necessity. In other words, we are under a moral obligation" (mark the words 'moral obligation') "to seek the improvement of our moral character. (1)"

মিলের এই মতটী আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। মিল স্বয়ং বলিয়াছেন—"we shall not indeed do so unless we desire our improvement, and desire it more than we dislike the means which must be employed for the purpose." (2) চরিত্র সংশোধনে ইচ্ছা আমাদের প্রবৃত্তির উপরে নির্ভর করিতেছে। শুধু তাহা নহে। চরিত্র সংশোধন করা উচিত কি না, ইহাই আমরা অনেক সময়ে বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারিলেও কুপ্রবৃত্তি, আলস্য, তাচ্ছল্য ও অপরাপর কারণ বশত আমাদের ইচ্ছা হয় না। সুতরাং চরিত্র সংশোধনে ইচ্ছা হইবার জন্য প্রথমত কয়েকটী মানসিক অবস্থার

(1) Examination of Hamilton's Philosophy Chapt. on 'Free Will.'

(2) Ibid.

প্রয়োজন, যথা—কুপ্রবৃত্তি দমন, আলস্য বশীকরণ, ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল শিক্ষা ও অবস্থা হইতে উৎপন্ন হয়—ইহাদের উপরে আমাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু তাহা যদি হইল, তবে 'moral obligation' কিরূপে সম্ভব? চরিত্রসংশোধন পক্ষে যাহা যাহা আবশ্যক, সে সকল আমার ক্ষমতাধীন নহে, অথচ আমি চরিত্র সংশোধন করিতে বাধ্য, ইহা অতি বিচিত্র কথা।

পাঠক বর্গ যদি আমাদের কথা বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে যখন এই দাঁড়াইতেছে যে, জগতে প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব নাই। এতদ্দ্বারা এমন কথা বলা হইল না যে, শিক্ষা দ্বারা মনে দায়িত্ব ভাব উৎপন্ন হয় নাই বা হইতে পারে না। সুতরাং মনুষ্যকে কুকর্ম্ম হইতে বিরত করিবার জন্য শিক্ষার আবশ্যক। এমন করিয়া লোককে শিক্ষা দাও যে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল উত্তেজিত না হইতে পারে। ইচ্ছা—সুতরাং কার্য্য, প্রবৃত্তির ফল-মাত্র। যে প্রবৃত্তি প্রবল হইবে, ইচ্ছা ঠিক তদনুরূপ হইবে। লোষ্ট্র ছুড়িলে তাহার ভূমিতে পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ প্রবৃত্তি প্রবল হইলে তদনুরূপ ইচ্ছাও অবশ্যম্ভাবী। বাহ্যজগতে যেমন এক শক্তি দ্বারা অপর শক্তি প্রশমিত হয়, তদ্রূপ অন্তর্জগতে এক প্রবৃত্তি দ্বারা অপর প্রবৃত্তি প্রশমিত হয়। সুতরাং সমাজে এরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত থাকা আবশ্যক যে, লোকের কুপ্রবৃত্তি সকল কোন ক্রমেই সুপ্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রবল না হইতে পারে। লোককে কুকর্ম্ম হইতে বিরত করিবার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। আমরা পূর্ব্বে শাস্তি-ভয়ের কথা বলিয়াছি। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাও আবশ্যক। কারণ, কুপ্রবৃত্তি যেমন আমাদিগকে দুষ্কর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ শাস্তি-ভয় দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করিবার চেষ্টা পায়, এবং অধিকাংশ-স্থলেই কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া থাকে।

শ্রী—মিত্র।

স্বাস্থ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গর্ভিণী, প্রসূতি ও সন্তান-পালন।

গর্ভিণী-কৃত্য-বিষয়ে চরকের শারীর স্থানে ও সুশ্রুতের শারীর স্থানে সবিশেষ উপদেশ আছে, তাহা গদ্যে লিখিত ভাব-প্রকাশ-কার চরকের ও সুশ্রুতের শারীর স্থানের প্রথম উপদেশ শ্লোকে বলিয়াছেন; তাহাই এস্থলে সংগৃহীত

হইল। (১) গর্ভিণী প্রথম দিবস হইতেই আহ্লাদিত, পবিত্র, অলঙ্কৃতা শ্বেতবস্ত্র-পরিধানা শুক্ল ও বিপ্রার্চ্চন রতা হইবে; মধুর স্নিগ্ধ অভিলষিত দ্রব্য বাহুল্য, লঘু, সুসংস্কৃত অগ্নিকর দ্রব্য নিত্যই আহার করিবে; গর্ভিণী ব্যায়াম, অনশন ব্যবায়, (সহবাস) অতি তর্পণ, রাত্রি জাগরণ, শোক, যানে আরোহণ, রক্তমোক্ষণ (কোনরূপে রক্ত পাত) মূত্র প্রস্রাবাদির বেগধারণ বা কষ্টজনক আসন ব্যবহার করিবে না। দোষ বা অভিঘাতে গর্ভিণীর যে যে ভাগ পীড়িত হয়, গর্ভস্থ শিশুরও সেই সেই ভাগ পীড়িত হয়। মলিনা, বিকৃতাকারা, অঙ্গবিহীনা, স্ত্রী স্পর্শ করিবে না, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ, নয়নের অতৃপ্তিকর দর্শন, কর্ণের অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ ত্যাগ করিবে; বাসি, শুষ্ক, ক্লেদযুক্ত অন্ন আহার নিষিদ্ধ চৈত্য (পূজনীয় বৃক্ষ) শ্মশান বৃক্ষ বা অযশস্কর ভাব ত্যাগ করিতে, বাহিরে বাহির হওয়া ক্রোধ করা শূন্যাগারে বাস করা ত্যাগ করিবে,—উচ্চে কথা বা যাহাতে গর্ভের কোন ক্ষতি হয়, এরূপ কার্য্য করিবে না,—অধিক তৈল-মর্দ্দন, বা গাত্র মর্দ্দন করিবে না। কঠিন শয্যায় বা উচ্চ শয্যায় শয়ন বা ভোজন করিবে না, এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করা গর্ভিণীর একান্ত কর্ত্তব্য। সুশ্রুতে মূঢ় গর্ভ (গর্ভের নানা বিকৃতি) রোগের কারণ স্থলে কথিত হইয়াছে (২) "গ্রাম্য ধর্ম্ম (সহবাস) যান বাহনে প্রথশ্রমে, প্রস্খলনে, (হোচোট খাইলে) পতনে, পীড়নে, ধাবনে (দৌড়াইলে) অভিঘাতে, বিপরীত রূপে শয়ন বা উপবেশন করিলে, উপবাসে, মলমূত্রাদির বেগরোধে, রুক্ষ, কটু, তিক্ত দ্রব্য, শাক অতিশয় ক্ষার

(১) গর্ভিণী প্রথমাদহঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ,
শুক্লাম্বরধরা শুক্ল-বিপ্রার্চ্চনে রতাঃ,
ভোজ্যন্তু মধুরং প্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রবং লঘু,
সংস্কৃতং দীপনীয়ঞ্চ নিত্যমেবোপযোজয়েৎ
গর্ভিণী নতু কুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতর্পণং,
ব্যবায়ং চ ন সেবেত নকুর্ব্যাদতিতর্পণং,
রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্যারোহণন্তথা।
রক্ত-মোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাদুৎকটাসনং।
দোষাভিঘাতৈ র্গর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে
স স ভাগঃ শিশো স্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে।
মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎ স্ত্রিয়ং
ন জিঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ং।
বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণি চ।
নান্নং পর্য্যুষিতং শুষ্কং ভুঞ্জীত ক্লিন্নং নচ,
চৈত্য শ্মশান বৃক্ষাংশ্চ ভাবাংশ্চাপ্য যশস্করান্,
বহির্নিষ্ক্রমণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জয়েৎ,
নোচ্চৈ ব্রূয়াত্তথা কুর্য্যাদ্যেন গর্ভো বিনশ্যতি,
তৈলাভ্যঙ্গোৎসাদনঞ্চ নাত্যর্থং কারয়েদপি,
নায়াসজননং কুর্য্যাৎ রাত্রাবুচ্চ শয়নাসনং,
এতাংস্তু নিয়মান্ সর্ব্বান্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গর্ভিণী।
(ভাব প্রকাশঃ)

(২) গ্রাম্যধর্ম্ম-যানবাহনাধ্বগমন-প্রস্খলন প্রপতন-প্রপীড়ন-ধাবনাভিঘাত-বিষম-শয়নাসনোপবাস-বেগাভিঘাতাতি-রুক্ষ-কটু-তিক্ত-ভোজন শাকাতি-ক্ষার-সেবনাতিসার-বমন-বিরেচন প্রেঙ্খোলনাজীর্ণ গর্ভশাতন-প্রভৃতিভির্বিশেষৈর্বন্ধনান্মুচ্যতে গর্ভঃ ফলমিব বৃন্তবন্ধনমভিঘাত-বিশেষৈঃ।
সুশ্রুত।

দ্রব্য ; ভোজনে অতিসারের প্রবলতায়, বমনে, বিরেচনে, দোলনে, অজীর্ণে বা গর্ভস্রাব করাইবার কোন কার্য্য করণ প্রভৃতিতে বৃন্ত-বন্ধন-চ্যুত ফলের ন্যায় গর্ভের বন্ধন শিথিল হয় ও গর্ভস্রাব প্রভৃতি উপদ্রব এই সকল কারণে তৎক্ষণাৎ হইয়াছে, অনেক দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা গর্ভিণীর যাহাতে কোন ভয় না জন্মে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক। এক-মাত্র ভয়ে যে গর্ভিণীর কত বিষম অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে বলা যায় না। সুশ্রুত ও চরক গর্ভিণীর সামান্য করণীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়া পরে গর্ভাশয় নিরাপদে রাখিবার জন্য প্রত্যেক মাসে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিয়াছেন। সুশ্রুত বলেন (৩) বিশেষ নিয়ম—গর্ভিণী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে মধুর শীতল ও দ্রব-বাহুল্য দ্রব্য আহার করিবে। বিশেষত কেহ কেহ বলেন, তৃতীয় মাসে ষাটধান্যের তণ্ডুল দুগ্ধের সহিত, চতুর্থ মাসে দধির সহিত, পঞ্চম মাসে দুগ্ধের সহিত ও ষষ্ঠ মাসে ঘৃতের সহিত ভোজন করিবে। চতুর্থ মাসে দুগ্ধ ও নবনীত-সংযুক্ত আহার করিবে, জাঙ্গল মাংসের সহিত হৃদয়-প্রিয় অন্ন-ভোজন করিবে (এ স্থলে হৃদ্য অর্থাৎ হৃদয়প্রিয় বলায় তাৎপর্য্য—যিনি মাংসে নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ, তাঁহার মাংস পথ্য ব্যবস্থা-সঙ্গত নহে); পঞ্চম মাসে দুগ্ধ ও ঘৃত-সংসৃষ্ট আহার, ষষ্ঠ মাসে গোক্ষুরীর সহিত সিদ্ধ ঘৃত অথবা যবাগূ, (ষড়্‌গুণ জলে দ্রব্যকে সিদ্ধ করিয়া যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহাকে যবাগূ কহে)। (যবাগূঃ ষড়্‌গুণেহম্ভসি) যবের মণ্ডই ব্যবস্থার অনুমোদিত), সপ্তম মাসে চাকুলে প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে, এই সকল নিয়মে গর্ভ বর্দ্ধিত হয়। (৪) অষ্টম মাসে শ্বেত বেড়েলা, গোরক্ষ, চাকুলে, শলুফা, মাংস, দুগ্ধ, দধির মাত, তিল তৈল, সৈন্ধব লবণ, ময়নার ফল, মধু ও ঘৃত, কুলের জলের সহিত পুরাতন পুরীষের শুদ্ধির ও বায়ুর অনুলোমের জন্য আস্থাপন করাইবে। তৎপরে যষ্টি-মধু সহ সিদ্ধ দুগ্ধে তৈলের সহিত

(৩) বিশেষতস্তু গর্ভিণী প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-মাসেষু মধুরশীতদ্রব-প্রায়মাহারমুপসেবেত ; বিশেষতস্তু তৃতীয়ে ষষ্টিকৌদনং পয়সা ভোজয়েৎ-চতুর্থে দধ্না, পঞ্চমে পয়সা, ষষ্ঠে সর্পিসা চেত্যেকে। চতুর্থে পয়োনবনীত-সংসৃষ্টমাহারয়েৎ, জাঙ্গল-মাংস-সহিতং হৃদ্যমন্নং ভোজয়েৎ, পঞ্চমে ক্ষীর-সর্পিঃ-সংসৃষ্টং, ষষ্ঠে শ্ব-দংষ্ট্রা-সিদ্ধস্য সর্পিষো মাত্রাং পায়য়েদ্যবাগূং বা, সপ্তমে সর্পিঃ পৃথক্‌পর্ণ্যাদি-সিদ্ধমেবমাপ্যার্য্যতে গর্ভঃ। সুশ্রুত।

(৪) অষ্টমে বদরোদকেন-বলাতিবলা-শতপুষ্প-পলল-পয়োদধিমস্তু তৈল-লবণ-মদনফল-মধু-ঘৃত-মিশ্রেণাস্থাপয়েৎ, পুরাণ-পুরীষ-শুদ্ধ্যর্থমনু-লোমনার্থঞ্চ বায়োঃ। ততঃ পয়োমধুর-কষায়-সিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েদনুলোমে হি বায়ৌ সুখং প্রসূয়তে নিরুপদ্রবা চ ভবতি। অত ঊর্দ্ধং স্নিগ্ধাভি-র্যবাগূভির্জাঙ্গলরসৈশ্চোপক্রমেদা প্রসব-কালাদেবমুপ-ক্রান্তা স্নিগ্ধা বলবতী সুখমনুপদ্রবা প্রসূয়তে। নবমে মাসি সূতিকাগারমেনাং প্রবেশয়েৎ। সুশ্রুত।

বিরেচন করাইবে, বায়ু অনুলোম হইলে সুখে প্রসব হয় ও কোন উপদ্রব ঘটে না। তৎপরে স্নিগ্ধ যবাগূ জাঙ্গল মাংসের কাথ প্রসব-কাল পর্য্যন্ত ব্যবস্থা। ইহাতে গর্ভিণী স্নিগ্ধা ও বলবতী থাকে; এবং সুখে অনুপদ্রবে প্রসব করে। নবম মাসে সূতিকাগার প্রবেশ করান ব্যবস্থা; অর্থাৎ নবম মাস হইতেই প্রসবের কাল। চরকাচার্য্য বলিয়াছেন, (৫) গর্ভ হইয়াছে জানিতে পারিলেই, আভ্যাসিক প্রকৃতি অনুযায়ী আহার করিবে ও অল্প অল্প শীতল আম দুগ্ধ পান করিবে, এইরূপ প্রত্যেক মাসে চরকাচার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা (৬)। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, গর্ভিণীর গর্ভ ও শরীর, পুষ্টি এবং রক্ষার জন্য এবং কোন মতে অজীর্ণ না হয়, এরূপ পথ্যাদির বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, এবং গর্ভের পূর্ণাবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠাশয় পরিষ্কৃত থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ থাকা কর্ত্তব্য। পথ্যের উপর নির্ভর করিয়া একটু সতর্ক থাকিলেই চলে, কিন্তু যাহার গর্ভের কোন বিকৃত ভাব লক্ষিত হয়, বা কখন স্রাব হইয়াছে, তাহাকে প্রত্যেক মাসে চিকিৎসকের অধীনে রাখিলে, আর গর্ভস্রাব ঘটে না। ইংরাজী আয়ুর্ব্বিজ্ঞানেও এ সকল বিষয়ে ঠিক এইরূপ উপদেশ আছে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের আচার অনুসারে গর্ভিণীর শ্মশান প্রভৃতি ভয়-জনক স্থানে গমন বিশেষ নিষিদ্ধ। নিদানে মূঢ় গর্ভের নিদান স্থলে সংক্ষেপে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে, (৭) ভয়, অভিঘাত, তীক্ষ্ণবীর্য্য, উষ্ণবীর্য্য ভোজন বা পানে গর্ভপাত হয়, এই সামান্য চারিটী উপদেশ হৃদয়ঙ্গম থাকিলেই গর্ভিণীর অনেক আশঙ্কা দূর হয়।

অন্য সময় অপেক্ষা গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী থাকা আবশ্যক। যেহেতু সে সময়ে একের অত্যাচারে উভয়ের অনিষ্ট হয়;— চরকাচার্য্য বলিয়াছেন, (৮) যে যে পীড়ার যে যে নিদান (আদি কারণ) বলা হইয়াছে, তাহা সেবন করিলে, গর্ভিণী সেই সেই পীড়া-বহুল সন্তান প্রসব করে।—গর্ভিণীর কোন পীড়া হইলে তাহার চিকিৎসাও অতি সাবধানে করা কর্ত্তব্য, তীক্ষ্ণবীর্য্য কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ নিতান্ত নিষিদ্ধ;— চরকাচার্য্য বলেন (৯) দ্বিতীয় বা তৃতীয়

(৫) প্রথমে মাসি শঙ্কিতং গর্ভমাপন্নং ক্ষীরমনুপস্কৃতং মাত্রাবচ্ছীতং কালে কালে পিবেৎ সাত্ম্যমেব চ পুনর্ভোজনক সায়ং প্রাতশ্চ ভুঞ্জীত। চরক।

(৬) চরক, শারীর-স্থান, অষ্টম অধ্যায় দেখ।

(৭) ভয়াভিঘাত-তীক্ষ্ণোষ্ণ-পানাশন-নিষেবনাৎ। গর্ভে পততি রক্তস্য সশূলং দর্শনং ভবেৎ। (রুগ্বিনিশ্চয়-সংগ্রহ।)

(৮) যস্য যস্য ব্যাধের্নিদানমুক্তং তত্তদা সেবমানান্তর্ব্বত্নী তদ্বিকার-বহুলমপত্যং জনয়তি। চরক।

(৯) দ্বয়োস্ত্রিষু বা মাসেষু পুষ্পং পশ্যেয়াস্যা গর্ভঃ স্থাস্যতীতি বিদ্যাৎ—অজাত-সারা হি তস্মিন্ কালে গর্ভাঃ। চরক।

মাসে পুষ্প দর্শন হইলে গর্ভ থাকিবে না, বিবেচনা করিবে। যেহেতু সে সময়ে গর্ভের সার জন্মে না। চতুর্থ মাস প্রভৃতিতে ক্রোধ, শোক, ঈর্ষা, ভয়, ত্রাস, সহবাস, ব্যায়াম, সংক্ষোভ, সংধারণ, বিষমাসন, বিষম শয়ন, বিষম স্থান, ক্ষুধা বা পিপাসার অতিযোগে বা কদাহারে পুষ্প দর্শন হইলে তৎকালীন চিকিৎসায় গর্ভরক্ষা হয়; (১০) এবং তাহারই উপদেশ চরকাচার্য্য বিষদরূপে দিয়াছেন। সেরূপ কোন চিহ্ন দেখিলে গর্ভিণীকে কোমল শীতল শয্যায় ঈষৎ অবনত-শির করাইয়া শয়ন করাইয়া রাখা কর্ত্তব্য,—এবং সুশীতল জলে যোনি-সেক করান উচিত। আজ কাল ইংরাজি-চিকিৎসায় বরফ সেক করাইবার পদ্ধতি দেখা যায়। প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদেরও তাহাই অভিপ্রায়, যষ্টিমধুর কাথ ও ঘৃত, পরম শীতল জলে তুলা ভিজাইয়া যোনিতে দিয়া রাখা চরকের অভিপ্রায়। পরম শীতল জলের স্থানে বরফই যুক্তির অনুমোদিত। কুমার নাভির অধঃদেশে শতধৌত বা সহস্রধৌত সর্পির প্রলেপ দেওয়াও কর্ত্তব্য; কিন্তু এ সকলই চিকিৎসার কথা। সুতরাং এস্থলে এ প্রস্তাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। চরকের বিশেষ উপদেশ দ্রষ্টব্য। সুশ্রুতের শরীর স্থানের দশম অধ্যায়েও এ বিষয়ের সুন্দর উপদেশ আছে। গর্ভে সন্তান অপুষ্ট বা মৃত হইলে বা গর্ভিণীর শারীরিক কোন ক্লেশ দেখিলে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া উচিত, এ প্রস্তাবের সে উপদেশও উদ্দেশ্য নহে।

গর্ভিণীকে সাধ দেওয়া আমাদের দেশের একটী আচার ও পদ্ধতি। উত্তর-রাম-চরিতে লিখিত আছে,—অষ্টাবক্র ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে আসিয়া রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—(১১) "ভগবতী অরুন্ধতী এবং দেবী শান্তা ইঁহা বারংবার বলিয়াছেন যে এই জানকীর যাহা কিছু গর্ভদোহদ, তাহা অচিরে সম্পাদন করাইবেন।" রামচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন (১২)—যদি

সা চেৎ চতুর্প্রভৃতিষু মাসেষু ক্রোধ-শোকের্ষা, ভয়ত্রাস-ব্যবায়-ব্যায়াম-সংক্ষোভ-সংধারণ-বিষমাসন-শয়নস্থান-ক্ষুৎপিপাসাতিযোগাৎ, কদাহারাদ্বা পুষ্পং পশ্যেৎ তস্যা গর্ভস্থাপন-বিধিমুপদেক্ষ্যামঃ।

(১০) পুষ্পদর্শনাদেবৈনং ব্রূয়াচ্ছয়নং তাবন্মৃদু-সুখশিশিরাস্তরণ-সংস্তীর্ণ-মীষদবনত-শিরস্কং প্রতিপদ্যেতি যষ্টিমধুক-সর্পির্ভ্যাং পরম শিশির বারি-সংস্থিতাভ্যাং পিচুমাপাব্যোপস্থ-সমীপে স্থাপয়েৎ তস্যা স্তথা শতধৌত-সহস্রধৌতাভ্যাং সর্পির্ভ্যাং অধোনাভেঃ, সর্ব্বতঃ প্রদিহ্যাদিত্যাদি চরক, ৮ অধ্যায়।

(১১) ইদং ভগবত্যারুন্ধত্যা দেবীভিঃ শান্তয়া চ ভূয়োভূয়ঃ সন্দিষ্টং যঃ কশ্চিদ্গর্ভদোহদোঽস্যাঃ সোঽচিরাৎ সম্পাদয়িতব্যঃ।

(১২) ক্রিয়তে যদ্যেষা কথয়তি। উত্তর রামচরিত।

উনি বলেন, তাহাই আমাদের দ্বারা করা হইবে।" আয়ুর্ব্বেদেরও এ বিষয়ে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ আছে। সুশ্রুত বলেন,(১৩) "গর্ব্ভিণীর ইন্দ্রিয়ের যাহা যাহা ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, গর্ভের পীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় তাহা তাহা পূরণ করা কর্ত্তব্য, গর্ব্ভিণী দৌর্হৃদ প্রাপ্ত হইলে, গুণবান্ সন্তান প্রসব করে, সেই ইচ্ছা পূরণ না হইলে, গর্ভ-সম্বন্ধে বা আপনাতে ভয় প্রাপ্ত হয়। গর্ব্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায়,
কবিরাজ।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এক্ষণে নেপোলিয়ন পূর্ণ-যৌবনে উপনীত হইয়াছেন; শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল সতেজ হইয়াছে; বাল্যকালে যে সকল ইন্দ্রিয় অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতেছিল—এক্ষণে যে সকল পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে—তরুণ বয়সে লোকে অস্থির-চিত্ত হইয়া পড়েন—বিবেক মনুষ্যকে নানা রূপে বিপর্য্যস্ত করে; মনের স্থিরতা প্রায় থাকে না—একটী কার্য্য এই মাত্র আরম্ভ করিলাম, পরক্ষণেই অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ; এইরূপ প্রায় সমুদায় কার্য্যেই অস্থির-চিত্ততা প্রকাশ হয়। এ সময় বুদ্ধি বিশেষ স্ফূর্ত্তিমতী বটে, কিন্তু তাহাতে গাম্ভীর্য্যের ভাগ অতি অল্প; এমন কি, নাই বলিলেই চলে। বুদ্ধি নানা দিকে ধাবিত হয় বটে, কিন্তু তাহা পরিণাম-দর্শনে পরাঙ্মুখ। বুদ্ধির প্রসর থাকে, কিন্তু গভীরতা থাকে না। কিন্তু নেপোলিয়ন্-সম্বন্ধে ইহার ঠিক বিপরীত; তাঁহার বুদ্ধির যেরূপ প্রসর ছিল, গভীরতাও সেইরূপ ছিল। তিনি যেমন নানা দিকে মনকে ফিরাইতে পারিতেন, পরিণামও সেইরূপ নানাবিধ অনুকূল ফলে পর্য্যবসিত হইত; তিনি যাহা করিতেন, তাহা সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে প্রথম অবেক্ষণ—বুদ্ধি দ্বারা তাহার পরিচালন

---

(১৩) ইন্দ্রিয়ার্থাংস্তু যান্ যান্ সা ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ব্ভিণী।
গর্ভাবাধভয়াত্তাংস্তান্ ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ ॥
সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত গুণান্বিতং, অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ং।
যেষু যেষিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে বৈ বিমাননা, প্রজায়েত সুতস্যার্ত্তিস্তস্মিংস্তস্মিংস্তথেন্দ্রিয়ে ॥
সুশ্রুত।

ও পরিণামে তাঁহার সুখময় ফল প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এই পরিণাম-দর্শিতা গুণ ছিল বলিয়াই, তিনি কোন কার্য্যে কখন প্রতিহত হন নাই—যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতেই অভীষ্ট-ফল-প্রাপণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

নেপোলিয়ন্ কর্শিকা দ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন করিতে না করিতেই, টুলোঁর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তৎসঙ্গে তাঁহার সুপ্রসন্ন ভাগ্য-লক্ষ্মী অদৃষ্ট-আকাশে পূর্ণ-কলেবরে সমুদিতা হইলেন; এই সময় হইতেই নেপোলিয়নের নাম চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল। টুলোঁ ফ্রান্সের একটী প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। এখানে নানাদেশীয় বণিক-বৃন্দ সর্ব্বদা বাণিজ্য জন্য গতায়াত করিতেন; সুতরাং ইংরাজ, স্পানিয়ার্ড প্রভৃতি জাতির সহিত টুলোঁর বিশেষ সংস্রব ছিল।

প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, ফরাসী জাতি সাধারণ দুইটী পৃথক দলে বিভক্ত হইয়াছিল; একটী রাজকীয় ও অপরটী হিতৈষী। যদিও হিতৈষি-দলের প্রভূত ক্ষমতা ছিল এবং অধিকাংশ লোক উহার পক্ষপাতী ছিলেন, তত্রাপি সভার কতকগুলি কার্য্য দৃষ্টে কোন কোন স্থানের লোক ইহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং সুবিধা মত সভার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেও তাহারা কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। টুলোঁর অধিবাসিগণও এই জন্য উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিল, এবং আপনাদিগকে রাজকীয় দলের অন্তর্বর্ত্তী করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল; যুদ্ধের নানা প্রকার আয়োজন হইতে লাগিল। টুলোঁবাসিগণ তথায় বাণিজ্যার্থে স্থিত ইংরাজ, স্পানিয়ার্ড, সার্ডিনিয়ান্, নিয়াপলিটান্ প্রভৃতি নানা জাতির সহায়তা প্রার্থনা করিল। চারি দিকে যুদ্ধ সামগ্রীর আয়োজন হইতে লাগিল। এ দিকে সাধারণ সভা হইতে বিদ্রোহি-দমনার্থ সৈন্য সকল সজ্জীভূত হইল; কিন্তু টুলোঁ যেরূপ স্থান ও তদধিবাসীরা যেরূপ সহায়তা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে বশীভূত করা সামান্য সৈন্য বা অপরিণামদর্শী সেনাপতির কর্ম্ম নহে। নগরটি সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী,—সম্মুখে মহাসমুদ্র,—পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরোণ-পুর্ব্বত-মালা; সুতরাং সহজে ইহাতে প্রবেশ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা একটী প্রাকৃতিক গিরি-দুর্গ-বিশেষ; উহাতে প্রবেশ করিতে হইলে, উহার পার্ব্বতীয় দুইটী দিক অবরোধ করা নিতান্ত প্রয়োজন—কিন্তু অবরোধকারী সৈন্যগণের পরস্পর একযোগে কার্য্য করিবার উপায় নাই—পরস্পর সাক্ষাৎ বা কোনপ্রকার সংস্রব রাখিবার কোন উপায়ই নাই; সুতরাং সেই দুই দলে দুইটী সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া অবরুদ্ধ দলের সুবিধার কারণ হইয়া পড়ে। বিশেষ অবরুদ্ধ

সৈন্য অক্লেশে সিসিলী-দ্বীপ বা আফ্রিকার বার্ব্বরী রাজ্য হইতে আহারীয় প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু অবরোধকারী সৈন্যের সেরূপ কোন সহজ উপায় নাই। কেন না, তৎকালে টুলোঁর চতুর্দ্দিকস্থ প্রভেন্স প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। সুতরাং এতগুলি বাধা অতিক্রম করিয়া তত্রত্য বিদ্রোহ নিবারণ করা সামান্য সেনা-পতির কর্ম্ম নহে।

সাধারণ সভার সৈন্যগণ টুলোঁ অবরোধ করিল। লর্ড মলগ্রেভ উহা-দিগকে ব্যর্থ করিতে লাগিলেন; অন্য দিক হইতে সার জর্জ্জ কিথ্ এল্‌ফিন্‌-ষ্টোন্ এক সাধারণ সৈন্যদলকে ওলি-উলেস্ নামক গিরিপথে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। সুতরাং টুলোঁ এক্ষণে এক প্রকার ইংরাজগণেরই হস্তগত হইল। সাধারণ সেনাপতি কার্ত্তো পশ্চিম ও সেনাপতি লাপয়েপি পূর্ব্ব দিক হইতে টুলোঁ আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, একবারে দুই জন দুই দিক হইতে যাইয়া নগরে প্রবেশ করেন; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে পর্ব্বত-মালার অন্তর্দ্দেশে ম্যামালও দুর্গ ও পশ্চিমে মাল্‌বস্কেট্ তাহাদিগকে প্রতিহত করিল। ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারগণ নগর-প্রবেশের সমুদায় দ্বার রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত টুলোঁর তিন দিকে দুর্গ-সদৃশ অত্যুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত করিয়াছিল ও সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উহার দুইটী মুখ সমুদ্র জলে প্রবিষ্ট হওয়ায় একটী সুন্দর কৃত্রিম উপসাগরের ন্যায় করিয়াছিল; তাহারই দুই মুখে দুইটী দুর্গ একটির নাম এগুইলটি, ও অপরটীর নাম বালাগিয়ার; এই দুইটী দুর্গ টুলোঁ নগরের কুঞ্চিকা-স্বরূপ হইল। ইংরাজগণ এই নব-নির্ম্মিত দুর্গের 'ফোর্ট মলগ্রেভ' নামকরণ করেন।

সাধারণসভার সহিত টুলোঁবাসিগণের অনেক যুদ্ধ হইল, কিন্তু কিছুতেই সভা জয় লাভ করিতে পারিল না। তাহাতে আবার লেফ্‌টেনাণ্ট জেনেরেল ও'হরা সৈন্য সমেত জিব্রাল্‌টার হইতে আসিয়া ইংরাজ সৈন্যের সহিত যোগ দিবেন। সাধারণ সমিতি এই সকল প্রতিকূল সংবাদে যৎপরোনাস্তি ত্রস্ত হইলেন; একে যুদ্ধের এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা, তাহাতে চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের হৃদয়-ভেদী আর্ত্তনাদ; সাধারণ সভা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিক হইতে যুদ্ধ-নিবৃত্তির জন্য সভায় আবেদন উপস্থিত হইতে লাগিল। টুলোঁ অধিকারের আশা কিছু দিনের জন্য লোকের মানস-ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইল; সকলেই টুলোঁ জয় দুরাশা বলিয়া ধারণা করিলেন। কিন্তু যৎকালে সাধারণ লোক কোন বিষয়ে প্রতিহত হইয়া তৎপ্রাপণাশায় জলাঞ্জলি দেন, মনস্বী লোক তাহা পাইবার উপায়-উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকেন; প্রকৃতির নিয়মই এইরূপ। নেপোলিয়নও তখন

তাহাই করিতেছিলেন। যৎকালে সমুদায় কাজ নিরাশা-পঙ্কে নিমজ্জিত, নেপোলিয়ন্ একাকী তখন তদুদ্ধারের উপায়-চিন্তনে তৎপর। ইনি এক জন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক প্রবল ছিল। সৈনিক বিদ্যালয়ে পাঠ-কালীন তিনি সময়ে সময়ে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেন, বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে সেই সকল তত্ত্বাবধায়কগণের পুস্তকে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ থাকিত। সৈন্য-সংক্রান্ত কোন কার্য্যে কাহাকেও নিযুক্ত করিবার সময় উপস্থিত হইলে সেই সকল লিপি কার্য্যকরী হইত। সাধারণ সভার সভ্যগণ তত্ত্বাবধায়কগণের পুস্তকে নেপোলিয়নের গুণগ্রামের বিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ব্রিগেডিয়ার জেনেরল পদে নিযুক্ত করিলেন এবং টুলোঁর যুদ্ধ-কার্য্যে তিনিই তখন সেনাপতি রূপে বৃত হইলেন। নেপোলিয়ন্ দ্রুত-পদে যুদ্ধক্ষেত্রেই নীত হইলেন। তথায় যুদ্ধের সমুদায় কার্য্য-প্রণালী দৃষ্টে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন; যাহা কিছু আয়োজন হইয়াছে, তৎসমুদায়ই অসম্পূর্ণ; যুদ্ধের বন্দোবস্ত সকল অকিঞ্চিৎকর। সময়ে সে সকল কোন কার্য্যকারকই হইবে না। ইংরাজগণের জাহাজ নষ্ট করিবার জন্য যে উদ্যোগ হইয়াছে, তাহা তুচ্ছ। যদিও আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু সেই সকল দ্রব্য এত দূরে সংস্থিত হইয়াছে যে, তাহা হইতে কোন সুফলেরই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সৈন্য-সংস্থান হইতে ইংরাজীয় রণপোত সকল তিন কামান দূরে অবস্থিত ছিল, সুতরাং তাহাদের বিপদের কোন কারণই ছিল না। গোলা গুলি কামান হইতে এত দূরে উত্তপ্ত করা হইতে ছিল যে, কামানের নিকটে আনিতে না আনিতেই, সে সকল সম্পূর্ণ শীতল হইয়া কার্য্যশক্তিহীন হইয়া পড়িত; সুতরাং তাহা হইতে অভীপ্সিত ফল প্রত্যাশা করা যায় না। এই সকল গোলযোগ দেখিয়া নেপোলিয়নের যুদ্ধ পরাজয়ের কারণ জানিবার আর অভাব হইল না। তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, এই সকল অসুবিধাবশতই সাধারণ সৈন্যগণ উপর্য্যুপরি পর্য্যুদস্ত হইতেছে। তাৎকালিক সেনাপতি কার্টোক্কে এই সকল অন্যায় বন্দোবস্ত স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত তিনি সেনাপতির নিকট দুইটী কামান করিবার অনুমতি করেন। তদনুসারে দুইটী কামানে অগ্নি-সংযোগ করা হইল; গোলাগুলি অভিপ্রেত স্থানের অর্দ্ধেক দূরে যাইয়া পতিত হইল। সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের সমুদায় কার্য্যই অযথা হইয়াছে। নেপোলিয়ন্ তথায় সভার উপস্থিত সভ্য গাস্পেরিনুকে শিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিবার অভিলাষ থাকে, তবে

এই বন্দোবস্তের আমূল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

এই সময়ে যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় একটী সভা আহূত হইল। সাম্পারিন্ সেই সভার সভাপতি হইলেন। কিরূপে যুদ্ধ করিতে হইবে, এই বিষয় লইয়া সভায় মহা আন্দোলন চলিল। অবশেষে একটী সাধারণ নিয়মে যুদ্ধ করাই স্থিরীকৃত হইল। কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না; কিন্তু নেপোলিয়ন্ তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন—তিনি সাধারণ নিয়মে নগর আক্রমণ করা অপেক্ষা একটী সহজতর উপায় স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—একেবারে নগর আক্রমণ করা কোন কার্য্যেরই হইবে না—তদ্বিপরীতে ছাটিয়ার ডি গ্রাসি নামক অন্তরীপ অধিকার করাই মুখ্য কর্ম্ম; পরে এগুইলেট্ ও বালানিয়ার অধিকার করা আবশ্যক। মাল্‌বর্কেট দুর্গ অধিকারও বিশেষ প্রয়োজনীয়। এগুইলেট্ ও বালানিয়ার দুর্গ হস্তগত করিতে পারিলেই তথাকার ইংরাজ-সৈন্যগণ তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে—নেপোলিয়ন্ ইহার কারণ সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি আরও বলিলেন, এই দুর্গ গুলি অধিকার করিতে পারিলেই ইংরাজগণের রণপোতের নিকট যাইবার রাস্তা আমাদের সুগম হইবে। উপসাগরের দুইটী মুখ হস্তগত করিলে জাহাজ আর উপসাগরে প্রবেশ করিতে না; সুতরাং সিসিলী, বার্ব্বরী প্রভৃতি হইতে নগরে যে খাদ্য সামগ্রী আসিতেছে, তাহা বন্ধ হইবে। কোন নূতন সৈন্য আসিয়াও উহাদিগের সহিত যোগ দিতে পারিবে না। তাহা হইলেই নগরস্থিত ইংরাজ সৈন্য অপর নূতন সৈন্যের সহায়-হীনতায় হয় টুলোঁ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে, না হয় অনশনে নগর আমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। এই সকল সদ্যুক্তি প্রদানে তিনি সকলেরই মন আকৃষ্ট করিলেন। সাধারণ সভা অনেক বিবেচনার পর তাঁহার এই যুক্তিতে সম্মত হইলেন; এবং যিনি এই সৎযুক্তির উদ্ভাবক, তাঁহারই হস্তে যুদ্ধের সম্পূর্ণ ভার সমর্পণ করিলেন। নেপোলিয়ন সৈন্যদল হইতে কতক গুলি উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ ও সুশিক্ষিত পদাতিক সৈন্য নির্ব্বাচন করিয়া সঙ্গে ২০০ কামান লইলেন; এই কামান গুলি তিনি এরূপ সুন্দর স্থানে সমাবেশ করিলেন যে, মল্‌গ্রেভ্ ও মালবর্কেট্ দুর্গ অধিকার করিবার পূর্ব্বেই ইংরাজগণ ইহা হইতে বিলক্ষণ ক্ষত বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেনাপতি কার্ত্তোর পরিবর্ত্তে ডপেট সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন—ইনি পূর্ব্বে চিকিৎসক ছিলেন; সুতরাং যুদ্ধ-কার্য্যে তাঁহার কিছুই পারদর্শিতা ছিল না। কার্ত্তোও এইরূপ পূর্ব্বে চিত্রকর ছিলেন। এই সময়ে মলগ্রেভ দুর্গস্থিত স্প্যানিশ সৈন্যগণ সাধারণ

সৈন্য-দল আক্রমণ করিল; বোনাপার্টি ক্রতগতি কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন; এবং সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু এই সময়ে সেনাপতি ডপেটের অনেক সহচর শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে, ডপেট তাহাতে সাতিশয় ভীত ও যুদ্ধ-জয়ে নিতান্ত হতাশাস হইলেন এবং সৈন্য-গণকে প্রতিগমন করিবার অনুমতি দিলেন। বোনাপার্টি যে ইহাতে অতি-মাত্র রাগান্বিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কার্তোর ন্যায় ইঁহারও অযোগ্যতা প্রমাণীকৃত হইল। সেনাপতি ডুগোমিয়ার্ উক্ত পদে নিয়োজিত হইলেন। এই বার উপযুক্ত হস্তে উপযুক্ত ভার সমর্পিত হইল। ডুগোমিয়ার্ যেরূপ বুদ্ধিমান্, সেইরূপ নির্ভীক। নেপোলিয়নের সহিত ইঁহার মনের মিলও বিলক্ষণ হইল। এক্ষণে জয়ের আশা আর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। বোনাপার্টি অতি তেজের সহিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; এমন কি, তাঁহার সমক্ষে এক জন গোলন্দাজ সৈন্য প্রজ্বলিত গোলায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে, তিনি সৈন্যগণকে অধিকতর উৎসাহিত করিবার জন্য স্বয়ং কামানে অগ্নি দিতে লাগিলেন; কিন্তু এ কার্য্যে তিনি কখন অভ্যস্ত থাকেন নাই, সুতরাং দৈবাৎ একটী অগ্নি-শিখা তাঁহার গাত্র-চর্ম্ম দগ্ধ করিল। কোন উত্তম চিকিৎসক তথায় না থাকায়, তাঁহাকে ইহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; অধিক কি, ইটালীর যুদ্ধ-যাত্রার সময়েও উহা ভয়ানক কষ্ট-প্রদ ছিল। উক্ত যুদ্ধে ডাক্তার কর্ভিসার্ট তাঁহাকে এই ক্ষত হইতে রক্ষা করেন। টুলোঁর যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময় একদা কিছু লিখিবার জন্য সৈন্যদলের মধ্য হইতে তিনি এক জন লিপি-কুশল সৈন্যের অনুসন্ধান করিতেছেন, এমন সময় স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া একটী সেনানী তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। শিবিরে আসিয়া ঐ সৈনিকটী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নেপোলিয়ন্ আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে লিখনটী সমাপ্ত হইয়াছে মাত্র, এমন সময় শত্রুপক্ষীয় একটী জলন্ত গোলা সম্মুখে পতিত হইয়া পত্র-খানি কর্দ্দমময় করিয়া ফেলিল। যুবক সৈনিক তৎক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, "তোমাকে ধন্যবাদ দিই—এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে আমরা মৃত্তিকা-লাভে সমর্থ হইব, তাহা আশা করি নাই।" নেপোলিয়ন্ যুবকের এইরূপ সুন্দর ও তেজঃ-পূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া যৎ-পরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতেই যুবক তাঁহার লক্ষ্য-স্থানীয় হইয়া রহিলেন। এই যুবক বিখ্যাত-নামা সেনাপতি জুনো। ইনি পরে ডি' আব্রান্টেসের ডিউক্ হইয়া ছিলেন। টুলোঁর যুদ্ধে অপর এক ব্যক্তি নেপো-লিয়নের মন আকৃষ্ট করেন—ইহার নাম ডুরোক। নেপোলিয়নের এরূপ

অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, কোন লোকের একটী সামান্য কার্য্য-মাত্র দর্শন করিলেই তাঁহার চরিত্র ও মানসিক বল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন। ইহাতে তিনি যে কত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

টুলোঁ অধিকার জন্য নেপোলিয়নের অভিপ্রায় মত সমুদয়ই বন্দোবস্ত হইতে লাগিল; কিন্তু এই যুদ্ধ-ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত পারিস নগরীতে যে একটী বিশেষ সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সভ্যগণ ইহাঁর কার্য্যের অযথা প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, টুলো নগর হইতে এতাধিক দূরস্থিত অন্তরীপ ও দুর্গ-অধিকার করিলে, নগর অধিকারের কোন বিশেষ উপকার হইবে না— নেপোলিয়ন্ কেবল বৃথা সময় ও অনর্থক সৈন্য এবং অর্থ নষ্ট করিতেছেন মাত্র। এই সভায় ফ্রেরণ্, রিকর্, সাল্ভিসেটি ও কনিষ্ঠ রবস্পিয়ার্ প্রধান সভ্য ছিলেন। ইহারা সকলেই নেপোলিয়নের কার্য্যের উপর খড়্গ-হস্ত হইলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন্ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তাঁহার সহিত তাঁহার স্বদেশবাসী সাল্ভিসেটি ও কনিষ্ঠ রবস্পিয়ারের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। সুতরাং উহাদিগকে কোন কৌশলে হস্তগত করিয়া তিনি আপনার অভিরুচি মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য করিতেছিলেন। নেপোলিয়ন্ মল্‌গ্রেভ্ দুর্গের পর্য্যন্ত সীমায় এরূপ গুপ্ত-ভাবে সৈন্য-সমাবেশ-স্থান প্রস্তুত করেন যে, দুর্গস্থিত ইংরাজ-সৈন্যগণ যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারে নাই। এই সৈন্য-সমাবেশ-স্থানের সম্মুখে তিনি এরূপ ভাবে বৃক্ষ রোপণ করেন যে, তাহা আর কোন ক্রমেই জানিবার উপায় ছিল না। সুতরাং কার্য্য-কালে উহা দেখিয়া ইংরাজ-সৈন্যগণ হঠাৎ চমকিয়া পড়িবে। এইটী প্রস্তুত হইয়া গেলে, সভা হইতে ফ্রেরণ্ ও রবস্পিয়ার্ সৈন্য-সমাবেশ দেখিতে আসিয়া এতদ্দৃষ্টে একেবারে চমকিয়া উঠিলেন এবং এমন সুসময়েও যে কামান স্থির রহিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা অবিলম্বে কামান প্রজ্জলিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা-মাত্র তাহা সম্পাদিত হইল। বিপক্ষ-পক্ষীয়গণ এই অসাময়িক আক্রমণে ত্রস্ত হইল; তাহাদের সেনাপতি ও'হরা এই অসম্ভাবিত বিপদ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কিসে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে, তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দুর্গ-ত্যাগ করিবার জন্য ও'হরার অধীনে তিন সহস্র যোদ্ধা প্রস্তুত হইল। ও'হরা সৈন্য সমেত দুর্গের বাহিরে উপস্থিত হইলেন; বোনাপার্টি পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন। ইংরাজ-সৈন্য, নেপোলিয়ন্ পলায়নপর হইয়াছে ভাবিয়া, অগ্রসর হইল; কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে

কেবল সুবিধাজনক স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন। যে স্থানে নিরাপদে সৈন্য রাখিতে পারেন, এমন স্থান নির্ণয় করিতেছিলেন এবং ইহাও দেখিতেছিলেন—ইংরাজ-সৈন্য কোন্ স্থানে আসিলে, উঁহাদিগকে একেবারে অগ্র ও পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আক্রমণ করিয়া পর্য্যুদস্ত করিতে পারিব। কিন্তু ইংরাজ-সৈন্যগণ নেপোলিয়নের সৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইল এবং দলে দলে নষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহাদের সেনাপতি আহত ও কারারুদ্ধ হইলেন। ইংরাজগণ ইহাতে একেবারে হতাশ্বাস হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিল। নেপোলিয়ন্ও এই যুদ্ধে নিতান্ত অক্ষত হইয়া যাইতে পারিলেন না—তাঁহার পদদেশ সঙ্গিন দ্বারা আহত হইল, কিন্তু তাহা তত সাংঘাতিক হয় নাই। ইংরাজ-সৈন্যের সহিত এইরূপ এক অহোরাত্র যুদ্ধ চলিলে পর, নেপোলিয়ন্ মল্‌গ্রেভ্ দুর্গ অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। সুতরাং প্রাতঃকালেই সৈন্য-শ্রেণী অগ্রসর হইল—কিন্তু বিপক্ষ-সৈন্য এরূপ তেজের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল যে, নেপোলিয়ন্কে প্রথম উদ্যমে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইয়াছিল; সেনাপতি ডুগোমিয়ার্ও নিরাশা-ব্যঞ্জক বাক্য-বিন্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বিজয়লক্ষ্মী নেপোলিয়নের অঙ্কবর্ত্তিনী হইলেন। স্পানিশ সৈন্য যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং দুর্গটীও অতি শীঘ্র বোনাপার্টির হস্তগত হইল। কিন্তু সাধারণ সভা এই দুর্গ-গ্রহণের কোন বিশেষ ফল দেখিতে পাইলেন না; তাঁহারা এত সৈন্য ও অর্থ নষ্ট করিয়া দুর্গ অধিকারের আবশ্যকতা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না; অথচ দুর্গাধিকারের সম্মান নেপোলিয়নের উপর অর্পিত হইল না। রিকর্, রব্‌স্পিয়ার্ ও সালিসেটিই সমুদায় সম্মানের ভাগী হইলেন। যাহা হউক, এই সুবিধাজনক সময়ে বোনাপার্টি টুলোঁ আক্রমণ করিতে বিস্মৃত হইলেন না। ইংরাজ-সেনাপতি হুড্, মল্‌গ্রেভ্ দুর্গ-পতনে তাঁহাদের বলের বিশেষ খর্ব্বতা হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন এবং ইহাও বুঝিলেন, মল্‌গ্রেভ্ দুর্গ বিপক্ষ-পক্ষের হস্তগত থাকিলে, টুলোঁ অধিকার তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইবে; সুতরাং তিনি মল্‌গ্রেভ্ দুর্গ পুনরধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন—কিন্তু বলিতে কি, তাহা কোনরূপেই ফলোপধায়ক হইল না। সেই সময় যার পর নাই বিভীষিকাময় সময় বলিতে হইবে। সেই কারণবশত তৎকালে সকলেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবার জন্য নিতান্ত বিব্রত হইল। ইংরাজ ও স্পানিশ সৈন্যগণ দলে দলে জাহাজে আরোহণ করিল। নাগরিকগণও তাহাতে বিরত হইল না। এই সময়ে সার্ সিড্‌নি-স্মিথ্ কতকগুলি অকর্ম্মণ্য অর্ণব-তরি জলমগ্ন করিয়াছেন এবং

আপনাদের বারুদ-পূর্ণ দুই খানি তরিও জলমগ্ন করেন। স্প্যানিশ সৈন্য-গণও এইরূপে আপনাদের দুই এক খানি জাহাজ জলমগ্ন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সাধারণ সৈন্যদল হইতে তাঁহাদের প্রতি অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করায় দুই এক খানি জাহাজ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এক খানি বারুদ-পূর্ণ জাহাজ জলিয়াও উঠিল। এই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাতে ইংরাজ ও স্প্যানিশ সৈন্যের ভয়ানক ক্ষতি হইল—সেই অগ্নি-ক্ষেত্রের মধ্যে ফরাসী জাহাজ প্রবেশ করিয়া শত্রু-তরি বিনষ্ট করিতে লাগিল। এক দিক দিয়া ইংরাজ প্রভৃতি সৈন্য পলায়ন-পর হইতে এবং অন্য দিক হইতে সাধারণ সৈন্য টুলোঁ প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল। এই সময় স্প্যানিশ সৈন্যগণ আপনারাই আপনাদের বারুদ-পূর্ণ তরণীতে অগ্নি দিতে লাগিল; তত্রাপি অধিকাংশ যুদ্ধ-জাহাজই সাধারণ সৈন্যের হস্তগত হইল—ইংরাজ-সৈন্যগণই কেবল কতকাংশে নির্ব্বিঘ্নে টুলোঁ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে সমর্থ হইল। এইরূপে অগ্ন্যুৎপাত, নাগরিকগণের কোলাহল—আর্ত্তনাদ ও রক্ত-স্রোতের মধ্য দিয়া টুলোঁ নগর অধিকৃত ও সেই সঙ্গে নেপোলিয়নের সৌভাগ্য-সূর্য্য নবীন-রাগে সমুদিত হইল। সেই সূর্য্য যদিও মধ্যে মধ্যে সামান্য মেঘ-খণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল, তত্রাপি তাহা ক্রমশই সুন্দর কিরণ বিকিরণ করিয়াছে। এই সময় হইতেই তাঁহার যশ-সৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হইতে থাকে। যদিও ফেরণ্ ও রবস্পিয়ার্ প্রভৃতি টুলোঁ অধিকারের সম্পূর্ণ সম্মান পাইয়াছিলেন এবং যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনী পাঠাইবার সময় তাঁহারা তাহাতে নেপোলিয়নের নাম-মাত্রও উল্লেখ করেন নাই—তথাপি জাতীয় সমাজ বুঝিলেন, এ যুদ্ধ কাহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে লব্ধ হইল। সেনাপতি ডুগোমিয়ার্—এই যুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি বিশেষ নির্ভীকতা ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে একটী তালিকা সভায় অর্পণ করেন, তাহাতে নেপোলিয়নের নাম বিশেষরূপে উল্লিখিত ছিল। তিনি তাহাতে এই লিখিয়া দেন যে, যদি নেপোলিয়ন্ কোন রূপে সম্মানিত না হন, তাহা হইলে সাধারণ সৈন্যের উন্নতির আর সম্ভাবনা নাই এবং নেপোলিয়ন্ যেরূপেই হউক, অন্য কোন সৈন্য-দলে প্রবেশ করিয়াও আপনার স্বাভাবিক অসামান্য প্রভা বিকীর্ণ করিবেন। যাহা হউক, টুলোঁ নগর নেপোলিয়নের বাহু-বলে হস্তগত হইল বটে, কিন্তু ইহাতে একটী ভয়ানক কলঙ্ক রটিত হইল। সৈন্যগণ টুলোঁ-বাসীর উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। যদিও তাহাতে অনেক লোক পলায়ন করিয়াছিল, তত্রাপি তখনও অনেক লোক টুলোঁ নগরে অবস্থান করিতেছিল—তাহাদের

অধিকাংশই সাধারণ সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইল। টুলোঁবাসীরা সাধারণ সৈন্যের যেরূপ ক্ষতি করিয়াছিল, সাধারণ সৈন্য তাহার চতুর্গুণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। সে যাহাহউক, এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে নেপোলিয়ন্ লিপ্ত আছেন ভাবিয়া, সমুদায় কলঙ্ক তাঁহার উপরেই পতিত হইল। প্রকৃত পক্ষে তিনি কিন্তু এ বিষয়ে দোষী ছিলেন না। এমন কি, জাতীয় সমিতি হইতে এইরূপ অত্যাচারের অনুজ্ঞা আসিলেও, তিনি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য-দলকে উহাতে যোগ দান করিতে অনুমতি করেন নাই—বরন্তু আপনার জীবন সংশয়াম্বিত করিয়াও পলায়নপর কাব্রিলাণ্ট পরিবারের জাহাজ দৈব-প্রতিকূলতা-বশত তীর সংলগ্ন হইয়া নেপোলিয়নের হস্তগত হইলে, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড দৃষ্টে তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উল্লেখ ছিল, এই হত্যাকাণ্ডের বিন্দু-বিসর্গও তাঁহার অভিমতিতে হয় নাই, তাঁহার অধীনস্থ একটী সৈনিকও এই অযথা ব্যবহারে যোগ দেয় নাই; কেবল বিপ্লব-সময়-প্রস্তুতীকৃত সৈন্য (Revolutionary army) কর্ত্তৃকই এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা সম্পূর্ণরূপে অভিনীত হইয়াছে। নেপোলিয়নের এই পত্র খানি যে অতি যথার্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

টুলোঁ নগর অধিকৃত হইলে, জাতীয় সমিতির ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল এবং সমুদায় দক্ষিণ ফ্রান্স তাহার সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিল। নগর অধিকারে ইংরাজগণের উপর সাধারণ লোকের বিশ্বাস অন্তর্হিত হইল। সকলেই নিশ্চয় করিলেন যে, টুলোঁ রক্ষা করা ইংরাজগণের অভিপ্রেত ছিল না; আপনাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধে স্বার্থ রক্ষা করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা কিন্তু প্রকৃত নহে, তথাপি এরূপ সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ আছে। কেন না, যদি তাঁহারা নগর রক্ষা করিতে মনস্থ করিতেন, তাহা হইলে অনিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষের উপর এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত হইত না। ইংরাজ-সৈন্যগণ কার্য্যক্ষেত্রে আপনাদের জাতীয় মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত পরিচালক অভাবে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। যাহা হউক, এই সময় ইংরাজ-সেনানী-মধ্যে এক জন উপযুক্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উপরেই টুলোঁ রক্ষার ভার অর্পিত হইলে, যুদ্ধের পরিণাম কিরূপ হইত, বলা যায় না। এই ব্যক্তি পরে লর্ড লাইন্‌ডক্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। *

* Mr Graham of Balgowan, afterwards Lord Lynedoch. He marched out on one of the sorties, and when the affair became hot, seized the musket and cartouch box of a fallen soldier and afforded such an example to the troops, as contributed greatly to their gaining the object desired. S. W. Scott's Life of Napolion p. 43, vol III.

এই যুদ্ধের পরেই নেপোলিয়ন্ ইটালীর সৈন্যাধ্যক্ষতার পদে নিযুক্ত হইয়া ভূমধ্য-সাগরোপকূলস্থ স্থান সকলের দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে অনেক গৃহ-বিবাদে পরিলিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কারণ, উপকূলবাসী অনেকেই জাতি-সাধারণের অভিলাষ ও উপকার বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, আপনাদের স্বত্ব-রক্ষার্থ বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন—সুতরাং অনেক কষ্টে নেপোলিয়নকে এই সকল লোককে স্ববশে আনিতে হয়। তিনি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহিত এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন এবং প্রথমত দুর্গ সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম, যে সকল দুর্গ প্রধান বন্দর ও পোতাশ্রয়-স্থল রক্ষা করিতে সমর্থ; দ্বিতীয়, যে সকল দুর্গ অল্প প্রয়োজনীয় বন্দর ও পোতাশ্রয়-রক্ষণে সমর্থ;—তৃতীয় যে গুলি সমুদ্র দিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিবে। এইরূপ শ্রেণী বিভাগ স্থির করিয়া তিনি সেনাপতি গুর্‌গডের (Gourgaud) নিকট ও জাতীয় সভায় এই প্রস্তাব করিয়া নাইস্ নগরে সাধারণ সৈন্যের সহিত যোগ দিতে গমন করিলেন। ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে বিপক্ষ অষ্ট্রিয়ান্ ও সার্ডিনিয়ান্ সৈন্য-দল রক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা সাধারণ সেনাপতি ডুমেট্‌কে পর্য্যুদস্ত করিয়া কল্‌ডিটেণ্ডি (Col di Tende) আল্‌স্ শ্রেণীর নিম্ন গিরির সঙ্কট সকল ও নাইস্ নগর হইতে টিরিণ্ যাইবার পথ সার্‌জিয়ো নগর প্রভৃতি রক্ষা করিতেছিল। বোনাপার্টি তথায় উপস্থিত হইয়াই বুঝিতে পারিলেন, বিপক্ষ-সৈন্য-দলকে সার্‌জিয়ো নগর হইতে বিদূরিত করিতে পারিলেই, এই সকল স্থান আপনা হইতেই অধিকৃত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সেনাপতি ডুমার বিয়ানের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন। ডুমারবিয়ান্ পূর্ব্ব হইতেই নেপোলিয়নের কার্য্যকালে প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন, সুতরাং বলিবামাত্রই তাহাতে সম্মত হইলেন। শত্রুগণও অবিলম্বে সামান্য চেষ্টাতেই সার্‌জিয়ো নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। এই নগর হস্তগত হইলে, অনেক যুদ্ধোপকরণও ফরাসীগণের হস্তে পতিত হইল। নেপোলিয়ন্ অগ্রসর হইলেন। অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্যগণ নিম্ন গিরি-সঙ্কট পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ সঙ্কট সকলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই অবকাশে বোনাপার্টি আল্‌স্ পর্ব্বতের সমুদায় অজ্ঞাত পথ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লইলেন। কাহারও অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ করা আর অধিক দিন তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। অতঃপর তাঁহাকেই প্রধান সেনাপতির পদগ্রহণ করিতে হইবে।

নেপোলিয়ন্ যখন এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময় জাতীয় সভায় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইল। অভিযোগের কারণ

এই ;—তিনি যখন ভূমধ্য-সাগরকূলস্থ স্থান সকল দৃঢ়ীভূত করিতেছিলেন, তখন মার্সিলিস্ নগরের সেণ্ট নিকোলাস্ নামক কারা-দুর্গটিকে পুনঃসংস্করণ করিয়া তাহা বারুদ রাখিবার উপযোগী দুর্গ (Powder Magazine) করিতে বলিয়া যান। কার্য্যও তদনুযায়ী হইতেছিল; কিন্তু ইহাতে পরিদর্শকগণ তদানীন্তন দুর্গসংস্করণ-ভার-প্রাপ্ত মারসিলিসে স্থিত কর্ম্মচারীকেই এ বিষয়ে দোষী স্থির ও তাঁহাকে জাতীয় সভায় স্বীয় দোষ ক্ষালনার্থ আহ্বান করেন। ইনি সভায় উপস্থিত হইয়া সেই কার্যটী নেপোলিয়নের অনুমতি মত হইতেছে, বুঝাইয়া দিলে, সমুদায় দোষ তাঁহার উপরেই পতিত হইল। তদনুযায়ী নেপোলিয়ন্ সভায় আহূত হইলেন—কিন্তু তিনি তখন ইটালীতে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তবে সেই স্থান হইতেই আপনার দোষ ক্ষালনার্থ দুর্গটীকে পরিবর্ত্তন করিবার কারণ বিস্তৃতরূপে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহাতেই তাঁহার দোষ একপ্রকার ক্ষালিত হইয়া গেল। যাহা হউক, কিছু দিন পরেই আর একটী কারণে তিনি পড়িয়া গেলেন।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে রবস্পিয়ার্—প্রজা-পীড়ন-দোষে নিহত হন। রবস্পিয়ারগণের সহিত নেপোলিয়নের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যখন ইটালীয় সৈন্যদলের নায়ক হইয়া নাইস্ নগরে গমন করেন, কনিষ্ঠ রবস্পিয়ার্ তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পথি মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিধন-সংবাদ-শ্রবণে তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন—আসিবার কালে নেপোলিয়নকে আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কোন ক্রমেই স্বীকৃত হন নাই। আসিতে সম্মত না হইয়া, তিনি বুদ্ধিমানের কার্যই করিয়াছিলেন। কেন না, তাহা হইলে, তিনি নিশ্চয়ই রবস্পিয়ারের ভাগ্য প্রাপ্ত অথবা সভায় বিশেষ দোষী সাব্যস্থ হইতেন, সন্দেহ নাই। রবস্পিয়ার্ অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ছিলেন, এই জন্য তিনি নিহত হন এবং নেপোলিয়নের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া, সভা নেপোলিয়ন্‌কেও এই পীড়নে লিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি এই জন্য সভার নিকট ভয়ানক দোষী হইলেন। কিন্তু ইহারই ঠিক পূর্ব্বে নেপোলিয়ন্ তাঁহার অপর এক বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে, তাঁহাকে এ বিষয়ে দোষী করিতে পারা যায় না। তিনি লিখিয়াছিলেন "কনিষ্ঠ রবস্পিয়রের মৃত্যুতে আমি ক্ষুব্ধ হইয়াছি, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই অত্যাচারের কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, তিনি আমার সহোদর হইয়াও আমার হস্তে নিহত হইতেন।"*

* I am some-what affected at the fate of the younger Robespierre ; but had he been my brother, I would have poniarded

কিন্তু এ সকল কিছুই "নেপোলিয়ন্‌কে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিতে পারিল না। এক্ষণকার জাতীয় সভা তাঁহার পূর্ব্ব শত্রু সকল লইয়াই সংরচিত হইয়াছিল; সুতরাং সহজে কোন সুফল পাইবার প্রত্যাশাই তাঁহার ছিল না। তাঁহারা সকলেই নেপোলিয়নের অধঃপতন অন্বেষণ করিতেছিলেন এবং এই ঘটনাকেই তাহার প্রধান সুযোগ জ্ঞান করিলেন—সুতরাং তাঁহার দোষ ক্ষালনের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল। নেপোলিয়ন্‌ সেইরূপ অবস্থাতেই আবদ্ধ রহিলেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার স্বদেশবাসী বন্ধু সলিসেটি তাঁহাকে এই আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। নেপোলিয়ন্‌ এই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই স্বীয় পরিবার দর্শনে মারসিলিসে গমন করিলেন এবং তথায় কিছু দিন অতিবাহিত করেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কর্ম্ম-প্রার্থনায় তিনি পারিস্‌ নগরীতে উপনীত হইলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কেহই তাঁহার সহয়তা করিল না। তিনি বান্ধব-হীন হইয়া নির্জ্জনে কিছু দিন পারিসে যাপন করিলেন। পরে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু টাল্‌মা তাঁহার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার উদ্যোগে অনেকেই নেপোলিয়নের জন্য প্রার্থনা করিল। অন্য দিকে বৃদ্ধ অব্রাই তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করতে লাগিলেন। ইনি সৈনিক সভার সভাপতি ছিলেন। যাহা হউক, পরিশেষে অব্রাই নেপো-লিয়ন্‌কে পূর্ব্বতন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পদাতিক সৈন্য-দলে কার্য্য করিতে অনুমতি করিলেন। নেপোলিয়ন্‌ এই অন্যায় কার্য্যের অনেক প্রতিবাদ ও অব্রাইয়ের সমুদায় আপত্তি যুক্তির সহিত খণ্ডন করিলেন। যখন অব্রাইয়ের সমুদায় আপত্তি যুক্তিতে খণ্ডিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, "নেপোলিয়ন্‌ যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সে কার্য্য কখনই উদ্ধত-স্বভাব যুবকের করণীয় নহে—বয়োবৃদ্ধই তাহার উপযুক্ত।" নেপো-লিয়ন্‌ তৎক্ষণাৎ সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "এই-সভা গৃহ যুবক বা বৃদ্ধের পরীক্ষা-গ্রহণের উপযুক্ত স্থল নহে; যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই তাহার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক।" নেপোলিয়নের এই সগর্ব্বোক্তিকে সভাপতি অপমান-কর বিবেচনা করি-লেন; বোনাপার্টি তাহা বুঝিতে পারিয়া, কর্ম্ম-প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না—কর্ম্ম-প্রার্থীদিগের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিত হইল। যাহা হউক, অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যের কোন রূপ সুবিধা হইল না; এই জন্য তিনি মুসলমান-সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন; তিনি আপনার ক্ষমতা বিলক্ষণ বুঝিতেন।

him with my own hand, had I been aware that he was forming schemes of tyranny.
Sir Walter Scott's "*Life of Napolion Bonaparte*. Vol. III. p. 48.

তুর্ক সৈন্য-দলে প্রবেশ করিলেও, তিনি যে শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন, ইহা তাঁহার মানস-ক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল। এই সম্বন্ধে তিনি এক বার বলিয়াছিলেন, "এক জন কর্শিকাবাসী সামান্য লোক জেরুজেলমের সিংহাসন অধিকার করিলে, কি বিস্ময়-জনক ব্যাপারই সমুদিত হয়?" যাহা হউক, তাঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ হইল না। অবশেষে সভার সভ্য বারাস ও ফ্রেরণের উদ্যোগে তিনি লাভেণ্ডি (Lavendee) দলের অধ্যক্ষতা করিতে অনুমত হইলেন; কিন্তু সে কার্য্যে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে ফ্রান্সে সৈন্য-পরিচালনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় ফ্রান্সে ভয়ানক অন্তর্বিবাদ চলিতে ছিল। ফ্রান্সের ন্যায় ফ্রান্স-বাসিগণও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের প্রাধান্য লাভ করিবার এই প্রধান সুযোগ ঘটিল। তাঁহার সাম্রাজ্য-প্রাপ্তি আর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। তদানীন্তন ভয়ানক সময়ে এমন প্রতিভা-বিশিষ্ট লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল, যিনি সকল প্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে পারেন। সৌভাগ্য-ক্রমে নেপোলিয়নে সেই সকল গুণ বিশেষ-রূপে ছিল—সুতরাং তিনি যে অতি শীঘ্রই উচ্চ পদে উন্নীত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

শ্রীকৈলাশচন্দ্র ঘোষ।

হিমাচল পরিভ্রমণ।*

[মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব্ব সৃষ্টি 'কুমার-সম্ভবের' হরযোগ-ভঙ্গের স্মৃতি।]

প্রিয়সখে! বহু দিন ত্যজি' নিজ দেশ
গিয়াছিনু বহু দূরে ভ্রমণ-উদ্দেশে,
উত্তর প্রদেশে যথা মেঘ-বস্ত্র পরি'
হিম-জটা-ভার শিরে, ক্রম-মালা গলে,
শ্যামবর্ণ তৃণাসনে যোগীবর-বেশে
স্থির-ভাবে নগ-রাজ রহে'ছেন বসি'
সদা বিভু-ধ্যানে রত। সুরম্য সে স্থল;
তথা প্রকৃতি সুন্দরী সতত নূতন
সাজে সাজিয়া যতনে, পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
নিত্য পূজেন গিরিশে। হায়! মূঢ় আমি
বর্ণিতে কি পারি কভু সে অপূর্ব্ব শোভা;
এক দিন যবে ঊষা আলোক-বরণী
প্রভাতীয় তারা-ভালে, গলে ফুল-মালা
হাসিয়া মধুর হাসি' উত্তরিলা
গিরি' পরে উজলিয়া রূপের ঠমকে
উপত্যকা, বন-রাজি, বিমল তটিনী।

---

* হিমালয়-পার্শ্বস্থ-প্রদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বন্ধুবর "ভারত-মহোত্সবের" উদ্যোগকর্ত্তার নিকট এই পত্রাকার রচনাটি লিখিত হইয়াছিল। শ্রীঃ।

হাসিলা প্রকৃতি ধনী, কুহরিল শাখে
পিক-কুল মাতাইয়া সে বিজন দেশ।
মৃদুল বসন্ত বায়ু বহিল চৌদিকে
চুম্বি' গিরি-পুষ্প-দলে প্রণয়ের ভরে। ২০
এহেন সুখদ কালে ভ্রমণ-মানসে
বাহিরিনু গৃহ হ'তে। দেখিনু উত্তরে
তুহিন-ধবল শৃঙ্গ ধবল পর্ব্বত—
ভেদিয়া জলদ-জাল ঠেকিয়াছে শির
নীল নভে। চতুর্দ্দিকে দৃশ্য মনোহর!
কেবল পর্ব্বত-শৃঙ্গ ঘোর বনাবৃত
বিরাজিছে চতুঃপার্শ্বে প্রাকার সমান।
শিহরিল সর্ব্ব অঙ্গ, উথলিল হৃদে
আনন্দ-লহরী সেই দৃশ্য-দরশনে।
নারিনু চলিতে আর; চিন্তায় মগন ৩০
বসিয়া রহিনু তথা' চাহি' গিরি-পানে।
হেন কালে কুহকিনী কল্পনা সুন্দরী
উতরিলা আসি' যথা' বসিয়া বিরলে
চিন্তায় মগন আমি; পরশিলা মোরে
ধীরে ধীরে; শিহরিনু সে সুখ-পরশে;
নিমীলিল আঁখি-দ্বয়, অবশ হইল
সর্ব্ব অঙ্গ। কিছু ক্ষণ থাকি' এই ভাবে
পুনরায় আঁখি-দ্বয় উন্মীলিনু আমি;
দেখিনু চমকি' মানস-মোহন দৃশ্য
অপূর্ব্ব কানন-রাজি গিরিবর-শিরে। ৪০
বিশাল বিজন বন প্রাণি-হীন যেন;
নীরব নিস্পন্দ সর্ব। নাহি নড়ে বৃক্ষে
পত্র। খেচর ভূচর সকলই নিস্তব্ধ
তেথা, যেন মায়া-বলে। চাহিনু চৌদিকে
আমি; দেখিনু সভয়ে বিভূতি-ভূষিত
অঙ্গ, দেব ত্রিলোচনে, বীরাসনে যোগিবেশে,
জটা-ভার শিরে। কর্ণদেশে অক্ষ-মালা,
কৃষ্ণ চর্ম্ম গলে। হায় রে সে নীলচর্ম্ম,
নীল কণ্ঠোপরি শোভিতেছে গাঢ়তর
নীলাভ বরণে মহাধ্যানে মগ্ন শূলী। ৫০
সম্মুখে অদূরে, কানন-প্রবেশ-দ্বারে
প্রতিহারি-বেশে স্থির ভাবে রহে নন্দী
হেম দণ্ড করে, বামেতরকরাঙ্গুলী
ওষ্ঠোপরে চাপি'। হেন কালে স্বাংস-দেশে
আসি' উতরিলা পার্ব্বতী, পর্ব্বত-সুতা,
পূজিতে মহেশে, ভূষিতা কুসুম-দামে।
হায়! কেমনে বর্ণিব সে রূপ-মাধুরী
আমি? কি আছে যে এ জগতে সে মুখের
তুলা? কি ছার তাহার কাছে সকলঙ্ক
শশী, কিম্বা ফুল্ল শতদল সরোবর- ৬০
মাঝে। ষোড়শী রূপসী বালা ক্ষণপ্রভা-
দ্যুতি, নব-জলধর জাল কেশ-পাশ।
অরুণ-বরণ বাসে বসানা সুন্দরী
নীলোৎপল কর্ণদেশে, সুরভি কুসুমে
জড়িত কুন্তল-দাম, লীলা-পদ্ম করে,
কটিতটে পুষ্প কাঞ্চী, হায় রে যেমতি
মোহিনী শিঞ্জিনী সৃজি' সুখে আরোপিল
সুচতুর পুষ্প-চাপ সে কোমল স্থানে।
সুন্দরীরে দেখি' শির নমাইয়া দ্বারী
চাহিলা মহেশ-পানে। বীরাসন ত্যজি' ৭০
সেই ক্ষণে ভূতনাথ চাহিলা চৌদিকে।
অগ্রসরি' প্রতিহারী প্রণমি' সম্ভ্রমে,
নিবেদিলা কর-পুটে "আগতা হিমাদ্রি-
সুতা পূজিবারে, প্রভো! ও পদ-রাজীব
[তব।
ইঙ্গিতে আদেশ শূলী দিলা দ্বার-পালে।
আনিলা উমারে নন্দী যথা' উমাপতি
বসিয়া শার্দ্দুল-চর্ম্মে। কৃতাঞ্জলি-পুটে

প্রণমিলা গিরি-সুতা গিরিশ-চরণে।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, পূজিলা সাদরে বালা
নিজ ইষ্টদেবে সযতনে। আশীষিলা ৮০
শূলপাণি। গিরিবালা প্রণমিলা পুন।
এহেন সময়ে লতা-গুল্ম পার্শ্ব ছাড়ি'
ধীরে বাহিরিলা চাপ হস্তে ফুল-ধনু।
অবসর বুঝি' আনুপাতি' মীনধ্বজ
আকর্ণ সন্ধানি' 'সম্মোহন শরে' শূর
বিন্ধিলা মহেশে। টলিলা অটল শূলী
অনঙ্গ-প্রভাবে; শিহরিল কলেবর—
সতৃষ্ণ নয়নে, চাহিলা উমার পানে;
হায় রে যেমতি চকোর সুধার আশে
শশধর-পানে। আনত করিলা মুখ ৯০
লাজে সুবদনী। চমকিলা শূলপাণি;
আশু সংমিলিলা যোগ-বলে চিত্ত পুন;
চাহিলা চৌদিকে নিরখিতে তপোবিঘ্ন;
দেখিলা সম্মুখে চাপ হস্তে ফুল-শরে।
রুষিলা পিণাক-পাণি। জ্বলিল ললাটে
ধক্ ধক্ ধকে বহ্নি; মহা কল কলে
কল্লোলিলা সুরধুনী হর-জটা-ভারে;
গর্জ্জিল ভুজগ-বৃন্দ। চাহিলা সরোষে
বিরূপাক্ষ। উল্কা-প্রায় বেগে হর-নেত্র-
ভব-বহ্নি পরশিলা আসি' মনসিজে; ১০০
হায় রে পতঙ্গবৎ হর-কোপানলে
ভস্মীভূত-দেহ কাম পড়িল ভূতলে।
ফিরিনু আতঙ্কে আমি। এ হেন সময়ে
মেঘ-দল আসি' আবরিল গিরি-বরে।
সংহারিলা মায়া-জাল কল্পনা সুন্দরী।
জাগিনু চমকি' আমি। জাগিনু তখন
বহু ক্ষণ সেই ভাবে চাহি' গিরি-পানে
বসিয়া রহেছি আমি সে বিজন দেশে।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

আমার জীবনের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হাসিয়া খেলিয়া।

শীতকালের রৌদ্রে চারি দিক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। শীতকাল!—হায় স্মৃতি-পটে ইহার ছায়া পড়িলে, হৃদয়ের ভিতরে কি করিতে থাকে, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব। ইহার নির্ম্মেঘ নিষ্কলঙ্ক আকাশ; ইহার বেগবাহী উত্তরিয়া বাতাস; ইহার স্বর্ণাভ রৌদ্র ও সেই মধুর উত্তাপ—এই সকলের সহিত কত সুখ, কত দুঃখ, কত কথা জড়িত রহিয়াছে, তাহা বুঝাই কেমন করিয়া! হায়! কে বুঝিবে, শীত ঋতুর সহিত এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের কি গূঢ় সম্পর্ক! কে বুঝিবে, কেন বা সে এক বার উল্লাসে উন্মত্ত হয়, পরক্ষণেই কেন চিন্তায় অবশ হইয়া পড়ে?

আমি বলিয়াছি যে, যখন আমরা

নামিয়া আসিলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা হইয়াছে। অনেক ক্ষণ রৌদ্রে থাকায়, আমার গায় ভিতরে অল্প অল্প জ্বালা করিতেছিল। সুতরাং ছায়ায় বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতে কত বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। বিনোদিনী বলিল—'দিদি চল, আমার ঘরে গিয়া দু' জনে খানিক বসিয়া থাকিগে।' আমি সহজেই তাহার কথায় সম্মত হইলাম। বিনোদ আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।

যাইবার সময়ে আমি দেখিলাম—কিঞ্চিৎ দূরে বারাণ্ডায় একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি ইহাকে এ পর্য্যন্ত দেখি নাই, সুতরাং বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কে। বিনোদ বলিল—'ভুবন মাসী।' স্ত্রীলোকটী দুই তিন বার আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, আমিও তাহার দিকে চাহিলাম; কিন্তু সে কথায়, কি ইঙ্গিতে কোনরূপ সম্ভাষণ না করিয়া একটী নিকটস্থ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং আমরাও বিনোদিনীর ঘরে গিয়া পৌঁছিলাম।

বিনোদিনীর ঘরটী খুব বড় নয়, কিন্তু অতি পরিপাটি। ঘরে প্রবেশ করিবার একটী দ্বার, আর সব গুলি জানালা। তুকিয়াই দক্ষিণ হাতি এক খানি সেগুন কাঠের খাট। তাহাতে বিছানা ধপ্ ধপ্ করিতেছে—কবিরা যাহাকে পয়ঃফেন-নিভ বলেন, ঠিক্ সেইরূপ। খাটের পরেই পূর্ব্ব দিকের দেয়াল; মধ্যে শুধু দুই হাত আন্দাজ ব্যবধান। দেয়ালের গায় বেস্ একটী বড় জানালা। সে দিকে বাতাস আসিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। খাটের উত্তরে উত্তর দিকের দেয়াল। তাহাতে দু'টী জানালা; একটী খাটের দক্ষিণে জানালার, ও অপরটী দোয়ারের কাছে। এই দুই জানালার মধ্যে একটী আনলা। তাহাতে নানাবিধ বিচিত্র পরিধেয় ঝুলিতেছিল। পশ্চিম দিকের দেয়াল, দরজার বাম দিক্ হইতে প্রায় তিন হাত অন্তরে। এই দেয়ালের এক কোণে একটী জলের কুঁজা। তাহার মুখে একটী পরিষ্কার কাচের গেলাস। তাহার উত্তরে এক পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে আবৃত এক খানি ছোট চৌকি, ও তাহার উপরে দুই তিনটী বাঁধা হুকা বৈঠকে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। তাহার উত্তরে একটী সুন্দর ছোট আলমারি, নীচে দেরাজ ও উপরে কাচের শার্সি। ইহার ভিতর দিয়া ডিস্, গেলাস, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিসি, প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর সুন্দর কাচের সামগ্রী শোভিতেছিল। এই আলমারিটির কাছে কয়েকটী সঙ্গীতের যন্ত্র সাজান রহিয়াছিল। সে গুলিও অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেয়ালের গায়ে কয়েক খানি ছবি ঝোলান দেখিলাম। কিন্তু সে গুলা দেখিয়া আমার মনে বড় বিতৃষ্ণার উদয় হইল। আমি এক বার দেখিয়া আর তাহাদের দিকে চাহিলাম না।

বিনোদিনীর ঘরের এই সকল আসবাব দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। 'অভাগিনীর কপাল অনেক দিন ভাঙ্গিয়াছে—তবে এ সব কেন?' কিন্তু এই সন্দেহটী জল-বুদ্বুদের মত এক বার উদয় হইয়া তখনই অদৃশ্য হইল। আর একটী কথা মনে উঠিল—'বিনোদের মা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন দেখ্‌ছি; তবে তাহার ভগ্নী পরের বাটীতে দাসীপনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে কেন?' আমি কিঞ্চিৎ অনন্য-মনে এই রূপ ভাবিতেছি, ও বিনোদ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'ভাব্‌ছ কি দিদি?' আমি উত্তর করিলাম——

'ভাব্‌ছি যে তোমার ছবি গুলি ভাল নয় ভাই।'

বিনোদ কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কেন? বেস্ ত। দেখ দেখি ঐ ছবি-খানি কেমন মজার! কেমন একটী—'

'আমার কিন্তু ঐ খানা সকলের চেয়ে জঘন্য বোধ হচ্চে।'

এবার বিনোদ হাসিয়া উঠিল। "বটে! তোমার বুঝি কালীঘাটের মা কালী না হলে আর কোন ছবি ভাল লাগে না।'

'তা যাই হোক, কিন্তু ভাই তোমার ছবিগুলি অতি বিশ্রী। এ রকমের ছবি আমি আর কখন দেখিনি।'

বিনোদ হাসিয়া উঠিল ও তাহার হাস্য-ধ্বনির বিরাম না হইতে হইতে একটী স্ত্রীলোক আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গত রাত্রিতে আমি যাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম, এ সেই—অর্থাৎ বিনোদিনীর 'নিস্তার মাসী।' নিস্তারের তখনকার বেশভূষা অতি অদ্ভুত দেখিলাম। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার পরে সেরূপ বেশ-ভূষা অনেকের অনেক বার দেখিয়াছি (তুমি কখন দেখিয়াছ কি না বলিতে পারি না); কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি সেরূপ কখন দেখি নাই। তাহার দুই পায় আট গাছা মল, হাতে অলঙ্কারের লেশমাত্র নাই, নাসিকার তিলক সেবা, পরিধান আট আঙ্গুলের কম নয় এক কালা পেড়িয়া শাটী। এই অদ্ভুত বেশে আমাদের সম্মুখে আসিয়া সে দাড়াইল ও তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ আমার গার ভিতরে শিহরিয়া উঠিল। হতভাগিনী আমার দিকে না চাহিয়া বিনোদিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'এত হাসি কিসের গো বিনোদ?'

'কিছু নয়; দিদির সঙ্গে ছবির কথা হচ্চেছিল।'

'দিদির সঙ্গে?—দিদি কে?'

'দেখতে পাচ্চ না, চোক্ নেই?'

চোক্ থাকবে না কেন মা? বুড়ো হাবড়ী নই যে চোকের মাথা খেয়েছি। তবু ভাল যে এত দিনে তোর একটা দিদি জুটলো। দেখো যেন দিদিমণি কোন গুণ জ্ঞান না করে'।'

এই বলিয়া সে তির্য্যক্ দৃষ্টিতে আমার দিকে এক বার চাহিয়া চলিয়া

গেল। আমি মুখ অবনত করিয়া রহিলাম—বিনোদের হাসি হাসি মুখ খানি ঈষৎ ম্লান হইল। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে 'নিস্তার মাসীর' কথায় বিনোদ অত্যন্ত বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়াছে। সে কোন কথা কহিল না, আমিও কোন কথা কহিলাম না; অথচ উভয়ের মানসিক ভাব উভয়েই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। এই অবস্থা কত ক্ষণ স্থায়ী হইত, বলিতে পারি না। কারণ, অবিলম্বে একটী নূতন বিষয়ের উত্থাপন হইল।

তাদৃশী অবস্থায় আমরা বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমি দেখিলাম যে, মাতু ও বিনোদের মা আমাদের দিকে আসিতেছে। মাতু কিয়দ্দূর আসিয়া বারাণ্ডায় এরূপ ভাবে রহিল, যেন সে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।—তাহার ভগ্নী ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিনোদকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'ও বিনোদ! এত বেলা হলো এখনও নাইলি নি, তোর কি ক্ষিধে তৃষ্ণা নেই?' বিনোদ একটু আবদারের স্বরে উত্তর করিল—'কত বেলা হয়েছে গা? সব বেলা কি ফুরিয়ে গেল?' 'যা জানিস্, তুই কর মা, কথা ত শুনবি নি।' এই বলিয়া বিনোদের মা আমাকে বলিল—'তুমি কেন মা ওর সঙ্গে কষ্ট পাচ্ছ? বেলা যে অনেক হয়েছে, নাবে না।'

'হাঁ, এই যে যাই।'

'একটা কথা বল্‌ছিলেম—তোমার খাওয়া দাওয়ার কি হবে?'

'কি জানি? যা হয় হবে।'—বস্তুতঃ, নূতন স্থানে নূতন লোকের মধ্যে আসিয়াছি, এখানে যদি কিছু দিন, অন্ততঃ দুই চারি দিন, থাকিতে হয়, তাহা হইলে সব নূতন পত্তন করা চাই'—ইত্যাদি কথা আসিয়া অবধি এক বারও আমার মস্তকে প্রবেশ করে নাই। উন্মত্ততা-চক্রে যাহারা বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহারা কি কোন কালে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখে!—বিনোদের মা বলিল—

'যা হয় বল্লে ত হবে না। একটা কিছু স্থির চাই ত।'

'কি স্থির কর্‌ব, বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি। মাতু কোথায় গেল?'

'মাতু এখনে আছে। আমি বল্‌ছিলেম কি—মিছে মিছে আর কষ্ট পাবে কেন? আমাদের—'

'তোমাদের কি?'

'বল্‌ছিলেম যে সেই ত আমাকে কি মাতুকে রাঁধ্‌তে হবে, তবে তুমি ছেলে মানুষ মিছে মিছে আর কেন—'

আমি এত ক্ষণে তাহার কথার ভাব বুঝিলাম। কি আশ্চর্য্য মাতুরা অন্ন পাক করিবে এবং সেই অন্ন আমি গ্রহণ করিব। আমি স্থির ভাবে উত্তর করিলাম—

'তা' কি কখন হয়ে থাকে?'

কেন, দোষ কি তায়? বিদেশ, বিশেষতঃ তুমি ছেলে মানুষ,—আমার

বিনোদের যে,তুমির সে—তার আর বোধ কি ?'

এই সময়ে মাতু প্রবেশ করিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম; কিন্তু সে আমাকে কোন কথা না বলিয়া,তাহার ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি হয়েছে ?'

'এত বেলা হয়েছে, তুই ত কিছু দেখ্‌বি নি। আমি ওঁকে বল্‌ছিলেম যে, উনি ছেলে মানুষ, বিশেষতঃ কখন অভ্যাস নেই, উনি আর কেন কষ্ট করে'—

আমি এবার একটু উদ্ধত স্বরে বলিলাম—যা হবার নয়, বারংবার সে কথায় দরকার কি ?' আমার বাক্যাবসান না হইতে হইতে, মাতু বলিল—'তা বৈ কি—না, না, কষ্ট কিসের ? আমি সব যোগাড় করে' দেব। তুমি যাও।'

তাহার ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল—'কি যোগাড় কর্‌বি বল্ দেখি ?'

'কেন, বাড়ীতে এক জন বামনের মেয়ে রয়েছেন, ভাবনা কি !' এই বলিয়া মাতু তাহার ভগ্নীর মুখের উপরে অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; এবং সেও তদ্রূপ দৃষ্টিতে মাতুর দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—

'আছেন ত; কিন্তু তিনি কি এত কষ্ট নেবেন ? আমি তাই ভাব্‌ছিলেম।'

আমি উত্তর করিলাম—'না, তারই বা দরকার কি ? তোমরা এক ডাক্‌ত কেন ?—আমার নিজের ত হাত পা আছে।' মাতু বলিল—

'কেন গা ? এই উপকারটা কি তাঁর দ্বারা হবেনা ? রোজ ত তাঁকে কেউ বল্‌তে যায় না।—আর তিনিও কিছু এমন অমানুষ নন; এ কথা জান্‌লে, তিনি কত খুসি হবেন।'

'তবে যা ভাল হয় কর্‌গে গরিবের বাড়ীতে উনি পায় ধুলো দিয়েছেন, দেখিস্, যেন কোন রকমে কষ্ট না হয়।' এই বলিতে বলিতে মাতুর ভগ্নী নিষ্ক্রান্ত হইল।

আমরাও উঠিলাম। মাতুর এই বন্দোবস্ত আমার ভাল লাগিল না; কিন্তু কি করি,তাহাতেই সম্মত হইলাম। ইহার পর যাহা যাহা হইল, তাহাতে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। একটী কথা শুধু বলিব। স্নান করিবার সময়ে কলের জল দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। কৌতুকপ্রিয়া বিনোদিনী তাহাতে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না ও তাহার 'নিস্তার মাসী' (হতভাগিনী তখন কার্য্য-বশতঃ সেখানে আসিয়াছিল) একটা ব্যঙ্গোক্তি করিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহাতে লজ্জিত হইলাম, ও বিনোদের মুখ ঈষৎ-রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু সে কোন উত্তর করিল না, কেবল হতভাগিনী পশ্চাৎ ফিরিলে এক বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল।

এই রূপে হাসিতে খেলিতে সেই

দিনের প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্ন এক রকমে কাটিয়া গেল। উত্তাল-তরঙ্গায়িত সমুদ্র কিয়ৎকাল স্তব্ধীভূত হইয়া রহিল। ভবিষ্যতের অন্ধকার-ছায়ার পরিবর্ত্তে অননুভূত-পূর্ব্ব সৌর কিরণে চারি দিক হাস্যময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিনোদিনীর প্রফুল্ল মুখ-খানি দেখিয়া, তাঁহার মধুর কথা গুলি শুনিয়া চক্ষু ও কর্ণ জুড়াইয়া গেল। কলিকাতার অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া হৃদয় বিমুগ্ধ হইল ও নূতন স্থানে আসিয়া আমার অতীতের স্মৃতি কিয়ৎ কালের জন্য বিলুপ্ত-প্রায় হইল। হায়! সুখ, হায়! শান্তি, হায়! ঘোর অন্ধকার রজনীর তড়িল্লতা,—হতভাগিনীর ক্ষুদ্র আকাশকে গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিবার জন্য কেন আসিয়াছিলে!

বিষম সন্দেহ।

মধ্যাহ্ন-কাল অতীত হইয়াছে। সুনীল আকাশ-পটের দক্ষিণ ভাগের মধ্যস্থল হইতে সূর্য্য কিঞ্চিৎ পশ্চিমে চলিয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর সকলেই সাংসারিক কর্ম্ম সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে। এবং আমি ও বিনোদ দুই জনে এক শয্যায় তাহারি ঘরে শয়ন করিয়া রহিয়াছি। বিনোদ কত গল্প করিতে লাগিল, এবং আমি তাহাতে শুধু সায় দিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ তাহার গল্প ফুরাইয়া আসিল—ক্রমশঃ তাহার সেই প্রফুল্ল হৃদয়-মিগ্ধকর চক্ষু দুটি মুদিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'বিনোদ, ঘুমুলে নাকি?' অমনি তাহার সেই মনোহর চক্ষু দুটি উন্মীলিত হইল—'না, ঘুমোবো কেন?' বিনোদ আবার দুই একটী কথা কহিতে আরম্ভ করিল। অচিরে আবার তাহার মধুর কণ্ঠ অবিস্পষ্ট হইতে লাগিল, কথা ফুরাইয়া গেল ও চক্ষু মুদিয়া আসিল। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'ঘুমুলে?' 'কৈ, না' নিমীলিত চক্ষুতে এই কথা বলিয়া বিনোদ আমার দিকে ফিরিল ও তাহার দক্ষিণ হস্ত-খানি আমার কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। আমি আর তাহাকে ডাকিলাম না।

নিদ্রাকর্ষণে বিনোদের মুখশ্রীতে কি অপূর্ব্ব সুস্নিগ্ধ লাবণ্য-রাশি দেখা দিল! সেই সদ্য-প্রস্ফুটিত স্থল-পদ্মের মত মুখ-খানি বারংবার দেখিয়াও আমার চক্ষুর পরিতৃপ্তি হইল না। শশিকলার মত তাহার সেই ক্ষুদ্র সুবিমল ললাটের উপর দিয়া অতি সূক্ষ্ম কৃষ্ণ রেখার ন্যায় বন্ধনোন্মুক্ত আকুঞ্চিত দুই এক গাছি কেশ নিমীলিত চক্ষুর উপরে পতিত হওয়ায়, কি সুন্দর দেখাইতেছিল! আমি অবাক্ হইয়া স্থির দৃষ্টিতে সেই রূপ-রাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, আমার ভ্রম হইতে লাগিল, যেন কোন ঐন্দ্রজালিক চিত্রকর, তুলিকা-মুখ-বিনিঃসৃত শয্যার উপরে এক সুষুপ্তা ষোড়শী অপ্সরী চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। আমার হৃদয় একেবারে বিমুগ্ধ হইল। আমি কি যে দেখিলাম, বলিতে পারি না, যে

প্রতিভা-বলে কবি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল একত্রে দেখিতে পান, যে প্রতিভা-বলে তিনি অন্ধ নয়ন-চক্ষুকে প্রকৃতির শোভায় বিমোহিত করেন, সেই অমানুষী প্রতিভার এক তিল যদি এই জড়-বুদ্ধিকে বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে, বলিতে পারিতাম, কিরূপে সুষুপ্তা রূপসীর রূপ বর্ণন করিতে হয়।

বিনোদ অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিল, এবং আমি বিমুগ্ধ-চিত্তে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় কিয়ৎ কাল অতিবাহিত হইলে পর, ক্রমশঃ (কেন বলিতে পারি না) আমার হৃদয়ের ভিতরে থাকিয়া থাকিয়া এক এক বার কেমন করিতে লাগিল। এই নূতন ভাব এত সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী হইয়া দেখা দিতে লাগিল যে, আমি শীঘ্র তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না-বিভূষিতা শারদ রজনীতে মেঘ-খণ্ড আসিয়া চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিলে, অকস্মাৎ যেমন মেদিনীর প্রফুল্ল মুখ ছায়াবৃত হয়, ও সেই ছায়া না দেখিতে দেখিতে, যেমন তখনই অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ আমার মনে এক এক বার বিষাদ-ছায়া পড়িতে আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ সেই ছায়া স্থায়ী ও গাঢ়তর হইতে লাগিল। চক্ষু ক্রমে ক্রমে বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপরে সংস্থাপিত হইল; অথচ তাহার প্রতিমূর্ত্তি অনুক্ষণ অন্তশ্চক্ষুর উপরে বর্ত্তমান রহিল। তখন আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি ছিল, এখন তাহা নাই; তাহা না পাইলে, জীবন-ভার বহন করিতে পারিব না—যেন একটী শুষ্ক পত্রে শায়িত হইয়া এক অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছি; কোথায় যাইতেছি, কি হইতেছে, কিছুই জানি না, জানিবার কোন ইচ্ছাও নাই;—যেন বিশ্ব সংসার এক বিশাল মরুতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে আর কেহ নাই, শুধু আমি ও আমার পার্শ্বে বিনোদিনী। বিনোদিনী!—আহা, কি হাসি হাসি মুখ খানি, কি সুন্দর চক্ষু দুটী। তবু তেমন নয়, তেমন আর হবে না!—সর্ব্বত্যাগিনী হইলাম, হায়, তবু পাইলাম না। আর কি কখন দেখিব?—দুরাশা-মাত্র! কাহারে বলিব? বুঝিবে কে?—যে কখনও আগুনে জ্বলে নাই, সে কি কখন আগুনের জ্বালা বুঝিতে পারে? অদৃষ্ট এক বার সুপ্রসন্ন হও। বহু কষ্ট দিয়াছ, আর কেন! এক বার দেখিতে দাও—অধিক চাহি না, এক বার শুধু দেখিতে দাও। পরে যাহা ইচ্ছা হয়, করিও; ইচ্ছা হয়, কাড়িয়া লইও—সেও ভাল; তবু প্রাণ শীতল হইবে, তবু মনকে বুঝাইতে পারিব যে, আমার কতক ফল ফলিয়াছে। সেই শেষ দেখা যদি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে, সাধ মিটাইয়া এক বার দেখিয়া লইতাম। তাহার পায় ধরিয়া বলিতাম—'এক বার দাঁড়াও, এক বার ভাল করিয়া দেখি।'

জন্মের মত তাহাকে দেখিতাম, আর মনের দুঃখ এক বার বলিতাম। সে রহিলে অভাগিনীর দুঃখ জগতে কেউ বুঝে না, তা বেশ জানি; কিন্তু কখনও বলিতে পারি নাই—সে যেন মুখ চাপিয়া ধরিত। যত আশা করিলাম, সকলই বিফল হইল। চির-দুঃখিনীর দুঃখই কেবল সার হইল। এখন আর কোন আশা করিতে চাহি না—শুধু এক বার যেন জানিতে পারে যে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াও, তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না!'—হরি! হরি!

এই রূপে নির্ব্বাণ-প্রায় অগ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল—কত ক্ষণ তাহা নিবিয়া থাকিবে! ইহার আর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে হৃদয়ে যে শান্তি অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা এখন কোথায়? সেই অন্ধকার, সেই বিষাদ,—সেই সব! তাহার উপরে নূতন চিন্তা।—'কি করিতে আসিলাম? ভাবিয়াছিলাম, এক বার কলিকাতায় যাইতে পারিলে হয়। তার পর কি হইল?—হতভাগিনীর মরণ কি হবে না? ঘরে বসিয়া মনে করিলাম, কলিকাতায় অবশ্যই—পাইব। কলিকাতায় ত আসিলাম। রাত্রি গেল, একটু পরে দিনও যাইবে,—আমার কি হইল? এখনও কি আশায় ঘুরিয়া মরিতেছি, বলিতে পারি না।' ক্রমশঃ চিন্তাস্রোত অন্য রূপ ধারণ করিল। 'এখানে রহিয়াছি, কিন্তু এক মাতু ছাড়া—অবশ্য বিনোদ, সে কিছু পর নয়—তবু মাতু বৈ আপনার বলিবার কেহ নাই। আর—মাতু কোথায় আনিল, তাও—' আমার হঠাৎ বোধ হইল, যেন নিদ্রা-বিহ্বলা বিনোদিনীর ভ্রূদ্বয় আকুঞ্চিত হইয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল; এবং তৎক্ষণাৎ চিন্তার গতি প্রতিরুদ্ধ হইল। আবার ভাবিলাম—'মাতু কোথায় আনিল, তাই বা—' ও আবার বোধ হইল, যেন সেই ভ্রূকুটী দেখা দিল। আমি তখন মনঃস্থ করিলাম—কোন চিন্তাকে হৃদয়ে আসিতে দিব না;—সেই উদ্দেশ্যে একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।—হায়, চেষ্টা ও যত্ন করিয়া কে কবে নিদ্রাকে লাভ করিয়াছে! চক্ষু মুদিয়া রহিল, কিন্তু মন কোথায় ঘুরিতে লাগিল, তাহা কে বলিতে পারে? কিয়ৎ কাল আমি এই অবস্থায় শয়ন করিয়া রহিলাম। এই সময়ে উত্তর দিকের একটা জানালার ভিতর দিয়া অত্যন্ত শীতল বাতাস বহিতেছিল। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম,—পাছে বিনোদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এজন্য জানালা বন্ধ করিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না।—বিনোদের সেই হতভাগিনী 'নিস্তার মাসী'—বিনোদের ঘরের আস্‌বাব, ইত্যাদির সহিত মনে নানা সন্দেহ আসিতে লাগিল। এক এক বার আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতে লাগিলাম, কিন্তু তবু সেই সন্দেহ;—কোন মতেই তাহা ঘুচিল না।

এই অবস্থায় কিয়ৎ কাল অতিবাহিত হইল। ক্রমশঃ শরীর ছট্ ফট্ করিতে লাগিল—বোধ হইল যেন তীক্ষ্ণ কণ্টক-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি। এক বার পাশ ফিরিয়া শুইলাম, আবার আর এক দিকে ফিরিয়া শুইলাম, কিন্তু কিছুতেই আরাম বোধ হইল না। অবশেষে নিঃশব্দে বিছানা হইতে নামিলাম; এক বার পশ্চাতে মস্তক ফিরাইয়া বিনোদের দিকে চাহিলাম, ও তখনই ঘরের ভিতর হইতে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন বারাণ্ডায় আর কেহ ছিল না; কেবল একটী স্ত্রীলোক (ইহাকেই বিনোদ প্রাতঃকালে 'ভুবন মাসী' বলিয়া ছিল) আলুলায়িত কেশে বারাণ্ডায় যেখানে একটু রৌদ্র আসিয়াছিল, সেই খানে বসিয়াছিল। ভুবন আমাকে দেখিয়া ধীরে মস্তকোত্তোলন করিল, তাহার কেশ-ভার ললাট ও মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিল, এবং ঈষৎ শির-শ্চালন করিয়া অতি নম্র স্বরে আমাকে বলিল—'এখানে এসো না।' ভুবনকে প্রাতঃকালে আমরা যেখানে দেখিয়া ছিলাম, তখনও সেই খানে। সে স্থানটী তাহার ঘরের ঠিক্ সম্মুখে। অপরের সে দিকে যাইবার প্রায়ই প্রয়োজন হয় না। আমি ভুবনের কাছে যাইলাম ও সে আমাকে তাহার ঘরের ভিতরে লইয়া চলিল। আমি আসিয়া অবধি প্রাতঃকালে এক বার শুধু তাহাকে দেখিয়াছিলাম, তাও ভাল করিয়া নহে; সুতরাং বলিতে হইলে, এই আমি তাহাকে প্রথম দেখিলাম। ভুবনের বয়স অধিক নয়—চব্বিশ পঁচিস হইবে এবং সৌন্দর্য্যে বিনোদিনীর অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন নহে। কিন্তু ভুবনের সৌন্দর্য্য অন্য রকমের। বিনোদের রূপ ঠিক্ যেন বালার্ক-রাগ-রঞ্জিতা উষার ন্যায়—উজ্জ্বল, প্রফুল্ল, সদা হাসি হাসি, চিন্তাশূন্য। ভুবনের ঠিক্ ইহার বিপরীত। সন্ধ্যা-সমাগমে বিশাল প্রান্তর-মধ্যে প্রকৃতির যে শোভা, তাহাই তাহার সৌন্দর্য্যের যথার্থ উপমাস্থল,—অনুজ্জ্বল, প্রশান্ত, স্থির, গাম্ভীর্য্যময়। মুখ-খানি প্রভাত-কালীন পূর্ণশশীর সমান চক্ষু দুটি স্থির ও চিন্তাশীল; অঙ্গ আভরণ-শূন্য; ও সূক্ষ্ম কেশ-গুলি যত্নাভাবে বদ্ধনোন্মুক্ত। ভুবনকে দেখিবামাত্রেই বোধ হয় যেন তাঁহার হৃদয় কোন গভীর চিন্তায় পরিপূর্ণ, এবং সেই চিন্তা-ভার সে অতি গোপনে দিবানিশি বহন করিতেছে। আমাকে সম্ভাষণ করিবার সময়ে যখন সে একটু হাসিল, সে হাসিটী কি মধুর; কিন্তু তথাপি আমার বোধ হইল, যেন সে হাসি-টুকু অনেক কষ্টে তাহার মুখে দেখা দিয়াছে।

ভুবন অতি আদরের সহিত আমাকে এক খানা চৌকির উপরে বসাইল ও আপনি আমার পার্শ্বে বসিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া, আমি এক বার চারি দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, জিনিষ-পত্র নিতান্ত

অল্প নহে, কিন্তু বিনোদিনীর ঘরের পারিপাট্য কিছুতেই লক্ষিত হইল না। দেখিলেই বোধ হয়, যেন গৃহ-স্বামিনীর সম্পূর্ণ যত্নের অভাব। ভুবন বলিল—

'কাল ভাই! তুমি এখানে এসেছ, এ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে এক বারও আলাপ কর্‌তে পারি নি; কিছু মনে ক'রো না।' ভুবনের কথা গুলি আমার কর্ণে অমৃতের মত প্রবেশ করিল। আমি উত্তর করিলাম—

'আমিই বা কোন্ আগে এসে আলাপ করিছি?'

'তোমার ত আগে আলাপ কর্‌বার্ কথা নয়'—ভুবন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—'এখানে তুমি এসেছ, আমাদের ভাগ্য। আমাদেরই উচিত, আগে তোমার সঙ্গে আলাপ করা।'

'এখানে এসে অবধি আমি কত যে সুখী হয়েছি, তা বল্‌তে পারিনে। তোমাদের যত্ন আমি জন্মে ভুল্‌তে পার্‌ব না।—মাতু কি তোমার দিদি হয়?'

ভুবন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল 'হাঁ।—দিদি বটে—বিশেষ কিছু নয়।' পরে সে স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মাতু দিদির সঙ্গে তোমার কেমন ক'রে আলাপ হ'ল?'

'মাতু অনেক দিন আমাদের বাড়ীতে আছে।'

'বটে!'—ভুবন আর কোন কথা না বলিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া, এক বার আমাকে নিরীক্ষণ করিল; পরে বলিল, 'এখানে আর কত দিন থাকা হবে?'

'তার কিছু স্থির নেই। হয়ত শীঘ্রই যাব।'

'কিছু দেরি হলেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? মাতু দিদির সঙ্গে তুমি এসেছ, বাড়ীর লোকে অবশ্য তাত জানেন?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ভুবন আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি কি উত্তর দিব, স্থির করিতে পারিলাম না। পরে ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—

'হাঁ।—তা অবশ্য জানেন—তা নৈলে ক—'

'তবে বিশেষ যদি কোন কষ্ট না হয়, ত পাঁচ সাত দিন আমাদের এখানে না হয় থাক্‌লে।—কলিকাতায় তোমার কি বিশেষ কোন বরাত আছে?' ভুবন উত্তরের অপেক্ষায় আবার স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

'না—বিশেষ কিছু বরাত নেই।'

'তবে হঠাৎ এখানে—'

'আমি এক বার মাতুকে বলেছিলেম যে, আমি কখন কলিকাতা দেখি নি; তাই মাতু আমাকে—'

'আমার বোধ হয়—অবশ্য আমি কেমন করে জান্‌ব—কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে যে, বাড়ীর লোকে জান্‌লে পাছে আস্‌তে না দেন, এই ভয়ে তুমি না বলে এসেছ' বলিয়া ভুবন আমার দিকে একটু চাহিয়া রহিল। আমিও অধোবদনে রহিলাম। সে আবার বলিতে

লাগিল—'ছেলে মানুষ,—না বুঝে হঠাৎ এক কায ক'রে ফেলেছ। এখন অল্প বয়সে কখন কি এমন অবস্থায় ঘরের বাহির হ'তে আছে। আহা, এমন কর্ম্মও করে!' এই বলিয়া ভুবন একটী নিশ্বাস ছাড়িল। সেই নিশ্বাসের অর্থ কি, আমি বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু আমার মনে বড় আশঙ্কা হইতে লাগিল। আমি ভুবনকে বলিলাম—

'তোমাদের কাছে যখন এসিছি, তখন ভয় কি?'

ভুবন এক বার কোন উত্তর না দিয়া, তাহার মুখ-খানি অন্য দিকে ফিরাইল। তাহাতে আমার মনে আরও আশঙ্কা হইতে লাগিল। গত রাত্রিতে নিদ্রা-রের ব্যাপার, পরে প্রাতঃকালে বিনো-দিনীর ঘরে যে সকল আস্‌বাব্‌ দেখিলাম, ইত্যাদিতে আমার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। আমি একটু হাসিয়া ভুবনকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—

'চুপ করিয়া রহিলে যে?'

ভুবন বলিল—'না, ভয়ের কথা বল্‌ছি নি, ভয় কিসের? কিন্তু তুমি এখানে অধিক দিন থেকো না। বাড়ীতে তাঁরা ভাবেবেন—যত শীঘ্র পার, বাড়ী যাবার চেষ্টা দেখ।'

ভুবন যে ভাবে এই কথা গুলি বলিল, তাহাতে আমার বুকের ভিতরে কাঁপিয়া উঠিল। আমি কি বলিব, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভুবনও আর কোন কথা বলিল না। এই সময়ে বিনোদ হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল; সুতরাং ভুবনের সহিত তখন আর কোন কথা হইল না।

শ্যাম।

সাগর-পারে।

কে কামিনী একাকিনী রজনী গভীরে?
দুই করে শির ধরি'
ভাসি'ছ সুর-সুন্দরি!
অবিরল, মরি মরি, নয়ন-আসারে,
অতল সুদূর ভীম জলধির পারে!
নিশীথ সময়ে সবে ঘুমে অচেতন,
প্রশান্ত ধরণী-তল,
সুস্থির সাগর-জল,
প্রকৃতি-সুন্দরী এবে মুদিত-নয়ন।

এ সময়ে বিষাদিনী এ বিরলে বসি'
ব্যাকুল করিয়া প্রাণ,
গাই'ছ দুঃখের গান,
এ নির্জ্জনে একাকিনী কে তুমি রূপসি!
মধুর মুরজ বেণু বাঁশরীর ধ্বনি,
সুতানে উঠিল ধীরে
চলিল সমীর 'পরে,
শ্রবণে পশিয়া করে ব্যথিত অন্তরে।

অনৈক হিন্দু-মহিলা।

নাটক-চন্দ্রিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অথ নাটক-ভেদ।

মুনিবর ভরত অত্যন্ত প্রাচীন, ইনি সত্যকালে জন্ম গ্রহণ করিয়া, লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাটক প্রস্তুত করেন এবং সেই নাটক উর্ব্বশীকে শিক্ষা দিয়া ইন্দ্রের সভায় উক্ত নাটকের অভিনয় করান।

অগ্নি-পুরাণে এই নাট্য শাস্ত্রের অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়; বেদব্যাসের লেখনী ঐ সকল কথা উদগার করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, মহাত্মা ভরত যখন ব্যাস দেবের অনেক পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া নাটক ও নাট্যসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তখন ব্যাস-কৃত নাট্যসূত্র সকল ভরতের অনুকরণ বলিতে হইবে। মহাভারতে উর্ব্বশী-পুরুরবা বৃত্তান্তে বেদব্যাস ভরত মুনির কথা লিখিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস আপনার কাব্য-নাটকাদিতে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক নহে। তিনি কোন মূল বিষয়কে আশ্রয় না করিয়া, কিছুই লেখেন নাই। তিনি বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটকে ভরত-মুনি-প্রণীত লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকের উল্লেখ করেন। এজন্য স্পষ্টই বোধ হয় যে, মহাত্মা ভরতই এই শাস্ত্রের প্রথম প্রণেতা।

মুনিবর ভরত দশবিধ নাটকের সূত্র করিয়াছেন। যথা—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন। এই দশবিধ নাটকের আর একটী নাম রূপক। রূপকের ন্যায় মুনিবর অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের কথা লেখেন। তাহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ পরে লিখিত হইবে। এক্ষণে কেবল রূপকের বিষয় লিখিত হইতেছে। ভারত-বর্ষে এই অষ্টবিংশতি প্রকার দৃশ্যকাব্য পূর্ব্বে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে সে সকল গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। তবে ইংরাজেরা বহু পরিশ্রমে ও বহু ব্যয়ে তাহাদের মধ্যে অনেক গুলি দৃশ্যকাব্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। নাটকের সূত্র ও উদাহরণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকরণাদি নয় প্রকার রূপকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। ইহাদের দোষ-গুণ সহৃদয় সামাজিকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

অথ প্রকরণ।

প্রকরণের উপাখ্যান-ভাগটী লৌকিক অথচ কবি-কল্পিত হইবে। আদ্যরস ইহার অঙ্গী এবং ব্রাহ্মণ, অমাত্য বা বণিক্ ইহাতে নায়ক হইবে। উক্ত নায়ক ধীর-প্রশান্ত * অথচ সাপায় ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ-পরায়ণ হইবেন।

---

* যিনি অনেকাংশে নায়ক-সামান্য গুণে বিভূষিত, তাঁহার নাম ধীর-প্রশান্ত। যেমন মালতীমাধবে মাধব।

যিনি স্বর্গের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, পুত্রাদির জন্য কাম-রিপুকে চরিতার্থ করেন ও ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করেন, তাঁহাকে সাধারণ-ধর্ম্ম-কামার্থ-পরায়ণ বলা যায়। বিপ্র-নায়ক যথা—মৃচ্ছকটিক। অমাত্য নায়ক যথা—মালতী মাধব। বণিক্ নায়ক যথা—পুষ্পভূষিত।

নায়িকা-ভেদে এই প্রকরণ ত্রিবিধ হয়। কোন স্থানে কুলস্ত্রী নায়িকা; যথা—পুষ্পভূষিত। কোন স্থানে বার-বনিতা নায়িকা যথা—রঙ্গদত্ত। কোন স্থানে বারাঙ্গনা ও কুলকামিনী দুইই নায়িকা, যথা—মৃচ্ছকটিক।

অথ ভাণ।

যাহাতে ধূর্ত্ত নায়কের চরিত ও নানা অবস্থা বিশেষ-রূপে বর্ণিত হয় এবং যাহার বিট * নামক পাত্র কার্য্যদক্ষ ও পণ্ডিত এবং যাহা একটী মাত্র অঙ্কে পরিসমাপ্ত, তাহার নাম ভাণ। আকাশ-বচনে কথোপকথনই ইহার জীবন। ইহাতে শৌর্য্য-বর্ণন দ্বারা বীর রস ও কোন গ্রন্থে বা সৌভাগ্যবর্ণন দ্বারা আদ্যরসও বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহার ইতিবৃত্ত কবি-কল্পিত এবং গেয়পদ † প্রভৃতি লাস্যাঙ্গের কোন একটী অঙ্গ ইহাতে থাকা আবশ্যক। উদাহরণ যথা—বসন্ততিলক ভাণ।

অথ ব্যায়োগ।

ইহা প্রখ্যাতি-বৃত্ত, অল্প স্ত্রী-জনে অলঙ্কৃত ও বহু-পুরুষ-যুক্ত এবং একটী অঙ্কে পরিসমাপ্ত। স্ত্রী-নিমিত্ত যুদ্ধ-বর্ণনই ইহার জীবন। আদ্য, হাস্য ও শান্ত রস ভিন্ন আর সমস্ত রসই ইহাতে বর্ণনীয় এবং ইহার ধীরোদ্ধত * নায়ক হয় দেব, কিংবা রাজর্ষি হইবে। যেমন সৌগন্ধিকা-হরণ ব্যায়োগ।

অথ সমবকার।

সমবকারে দেব কিংবা অসুরাশ্রিত কোন প্রখ্যাত বৃত্তান্ত তিন অঙ্কে বর্ণিত হইবে। ইহার নায়ক ধীরোদাত্ত † অথচ দিব্যাদিব্য ‡ হইবে। বীর রস ইহার অঙ্গী। আদ্য রস ভিন্ন আর সমস্ত রসই ইহার অঙ্গ-স্বরূপ। ইহার কাব্য-গুলি গায়ত্রী ও উষ্ণিক ছন্দে নিবদ্ধ হইবে। যুদ্ধ, বিগ্রহ, মায়া, ইন্দ্রজাল, ও বন্ধনাদি নানা বিষয় ইহাতে বর্ণনীয়। শঙ্কা, ভয় অথবা

---

* যিনি সম্ভোগহীন-সম্পৎ, ধূর্ত্ত, বাক্পটু, গোষ্ঠি-মধ্যে আদরণীয়, বেশোপচারে নিপুণ ও নৃত্যগীতাদি-পরায়ণ, তাঁহার নাম বিট।

† আসনে উপবেশন করিয়া, বীণাবাদনপূর্ব্বক শুষ্ক গানের নাম গেয়পদ।

* যিনি মায়াবী, প্রচণ্ড, চপল, অহঙ্কারপূর্ণ ও আত্মশ্লাঘা-নিরত তাহার নাম ধীরোদ্ধত; যেমন ভীম।

† যিনি আত্মশ্লাঘা-রহিত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, হর্ষশোকাদি দ্বারা অনভিভূত-স্বভাব, স্থিরপ্রকৃতি, বিনয় দ্বারা আচ্ছন্ন-গর্ব্ব ও দৃঢ়ব্রত, তাঁহার নাম ধীরোদাত্ত; যেমন রাম ও যুধিষ্ঠির।

‡ দেব হইয়া মানুষের ন্যায় যে নায়ক, তাহার নাম দিব্যাদিব্য নায়ক; যেমন রামচন্দ্র।

ভাগ-কৃত বিদ্রব অর্থাৎ সংভ্রম ইহাতে বিশেষ-রূপে বর্ণন করিতে হয়। যথা— সমুদ্রমথন।

অথ ডিম।

ডিম নামক রূপক—মায়া, ইন্দ্রজাল ও যুদ্ধাদি-ভূয়িষ্ঠ। ইহার আখ্যায়িকা খ্যাত-বৃত্ত হইবে। রৌদ্র রস ইহার অঙ্গী এবং আদ্য, শান্ত ও হাস্য ভিন্ন আর সমস্ত রসই ইহার অঙ্গ-স্বরূপ। ইহাতে বিষ্কম্ভক থাকিবে না এবং ইহা চারি অঙ্কে পূর্ণ হইবে। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ অথবা রাক্ষস ইহার নায়ক এবং অঙ্গ-স্বরূপ রস-গুলি ইহাতে উদ্দীপ্ত-রূপে বর্ণিত হইবে। যথা—ত্রিপুর-দাহ ডিম।

অথ ঈহামৃগ।

ইহার আখ্যায়িকা ভাগের কতক খ্যাত, কতক কল্পিত। মনুষ্য ইহার নায়ক এবং দেবতা প্রতিনায়ক * অথবা দেবতা নায়ক, মানুষ প্রতিনায়ক হইবে। ইহাও একাঙ্কে সমাপ্ত। ইহাতে দিব্য-স্ত্রী-ঘটিত যুদ্ধ বর্ণন করিতে হয়। প্রতি-নায়ক ছল পূর্ব্বক নায়িকা হরণ করেন বলিয়া, ইহাতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যথা কুসুমশেখর-বিজয়।

অথ অঙ্ক।

ইহা একাঙ্কে পূর্ণ। প্রাকৃত নর ইহার নায়ক, করুণ ইহার সর্ব্বত্র স্থায়ী রস। ইহার আখ্যায়িকা-ভাগ খ্যাতবৃত্ত ও বহুস্ত্রী-জনে সমাকীর্ণ হইবে। ভাণের ন্যায় লাস্যাঙ্গ † ইহাতে থাকা আব-শ্যক। জয় ও পরাজয় ইহাতে বর্ণনীয়। বাক্-যুদ্ধ ও নির্ব্বেদ-বচন এই দুইটী বিষয় ইহার জীবন। যথা—শর্ম্মিষ্ঠা যযাতি।

অথ বীথী।

বীথীও ভাণবৎ একাঙ্কে পূর্ণ। ইহার নায়ককে কবি অদ্বিতীয় করিয়া বর্ণন করিবেন। আকাশ-বাণী দ্বারা ইহার পাত্রগণ উক্তি প্রত্যুক্তি করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন। আদ্য রস ইহার অঙ্গী। অঙ্গ-স্বরূপ আর আর রস ইহাতে অল্প অল্প বর্ণনীয়। বীথী নামক রূপকের অনেক অঙ্গ আছে, তাহা এ স্থানে বর্ণনীয় নহে। নানা রস ও ভাব—মালার ন্যায় ইহাতে শোভা পায় বলিয়া, ইহাকে বীথী বলে।

অথ প্রহসন।

প্রহসনের আখ্যায়িকা-ভাগ কবি-কল্পিত নিন্দনীয় ব্যক্তির চরিত্রে পূর্ণ।

---

* যিনি নায়কের বিরোধী, তাঁহার নাম প্রতি-নায়ক ; যেমন রাবণ রামায়ণে প্রতিনায়ক।

† মুনিবর ভরত দশ প্রকার লাস্যাঙ্গের কথা লিখিয়াছেন যথা—"গেয়পদ (১), স্থিতপাঠ্য (২), আসীন (৩), পুষ্পগণ্ডিকা (৪), প্রচ্ছেদক (৫), ত্রিগূঢ়ক (৬), সৈন্ধব (৭), দ্বিগূঢ় (৮), উত্তমোত্তমং (৯), উক্ত প্রত্যুক্ত (১০)। প্রমাণ যথা—"গেয়পদং স্থিত-পাঠ্যমাসীনং পুষ্পগণ্ডিকা। প্রচ্ছেদক-ত্রিগূঢ়ক সৈন্ধবাখ্যং দ্বিগূঢ়কং। উত্তমোত্তমকং চান্যদুক্ত-প্রত্যুক্তমেবচ। লাস্যে দশবিধং হ্যেত-দঙ্গমুক্তং মনীষিভিঃ।"—ইতি সাহিত্যদর্পণ। ৬। ৫০৩ সূত্র। এই দশবিধ লাস্যাঙ্গের ব্যাখ্যা এস্থানে আর করা গেল না। যাঁহাদের প্রয়োজন হইবে, তাঁহারা সাহিত্য-দর্পণ দেখিবেন।

ইহাও ভাণবৎ একাঙ্কে পরিসমাপ্ত। ইহাতেও লাস্যাঙ্গ থাকা আবশ্যক। হাস্যরস ইহার অঙ্গী, আদ্য প্রভৃতি রস অঙ্গ। ধূর্ত তপস্বী অথবা বিপ্র ইহার এক-মাত্র ধূর্ত* নায়ক। যথা—কন্দর্পকেলি, ধূর্ত-চরিত, হাস্যার্ণব ইত্যাদি।

দশবিধ রূপকের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। ইহাদের মধ্যে কোন্ খানি ভাল, কোন্ খানি মন্দ, তাহা সহৃদয়-সংবেদ্য। এইক্ষণে নাটিকা প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ উপরূপকের সোদাহরণ লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

অথ উপরূপক।

নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ, ভাণিকা, এই অষ্টাদশবিধ নাটক-ভেদ উপরূপক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্রমে ইহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অথ নাটিকা।

ইহার উপাখ্যান-ভাগ কবি-কল্পিত, স্ত্রীজন-বহুল ও চারি অঙ্কে পরিসমাপ্ত। প্রখ্যাত অথচ ধীরললিত † রাজা ইহার নায়ক। নবানুরাগবতী অথচ রাজবংশ-সম্ভূতা কন্যা ইহার নায়িকা। রাজা এই কন্যাতে অনুরাগী; কিন্তু দেবীর ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত। রাজার মহিষীও নৃপবংশ-সম্ভূতা, প্রগল্ভা ও পদে পদে মানবতী। আদ্য-রস ইহাতে প্রধান। যথা—রত্নাবলী।

অথ ত্রোটক।

ত্রোটক—পাঁচ, সাত, আট বা নয় অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার প্রত্যেক অঙ্কে বিদূষকের প্রবেশ সূচিত হইবে এবং ইহার নায়ক-নায়িকার মধ্যে এক জন দিব্য, এক জন অদিব্য অর্থাৎ মনুষ্য হইবে। যথা—বিক্রমোর্ব্বশী।

অথ গোষ্ঠী।

প্রাকৃত অর্থাৎ অতিবিদগ্ধ নহে, এরূপ নয় বা দশ জন পুরুষ দ্বারা ইহা অলঙ্কৃত। ইহাতে যে সকল পাত্র প্রবিষ্ট হইবে, সকলই মৃদু মৃদু বাক্য কহিবে। আদ্য রস ইহাতে প্রধান এবং পাঁচ জন বা ছয় জন স্ত্রীলোক ইহাতে লিপ্ত থাকিবে। যথা—রৈবতক-মদনিকা।

অথ সট্টক।

সট্টক—অদ্ভুত-রস-প্রধান। ইহাতে বিষ্কম্ভক দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অবতারণা করিলে, দূষণাবহ হয়। ইহার অন্যান্য ব্যাপার নাটিকার ন্যায়, ইহা করুণ-রস-প্রধান। যথা—কর্পূর-মঞ্জরী।

অথ নাট্যরাসক।

ইহা একাঙ্কে পূর্ণ, তাল-লয়-বিশুদ্ধ ও গীত-বহুল। ইহার নায়ক ধীরোদাত্ত;

* কৃতাপরাধ ও তর্জ্জিত হইয়াও, যে নায়ক শঙ্কিত ও লজ্জিত হয় না এবং অপরাধ দেখাইয়া দিলেও, যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া, আপনার দোষ আচ্ছাদন করে, তাহার নাম ধৃষ্ট নায়ক।

† "নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ।" সা, দ, ৩। ৬৮ সূ।

উপনায়ক পীঠমর্দ্দ ‡। আদ্য মিলিত হাস্য রস ইহাতে প্রধান অঙ্গী। ইহার নায়িকা বাসক-সজ্জা ¶ ভাণের ন্যায় ইহাতেও লাস্যাঙ্গ থাকিবে। যথা—নর্ম্মবতী; বিলাসবতী।

অথ প্রস্থান।

প্রস্থানে দাস জন নায়ক; দাসী নায়িকা; অত্যন্ত নীচ-প্রকৃতি লোক উপনায়ক। ইহা দুই অঙ্কে সমাপ্ত। সুরাপানাদি দ্বারা ইহার উপসংহার করিতে হয়। তান-লয়াদি-সম্মিত গীতিকা ইহার একটী প্রধান অঙ্গ। আদ্য রস ইহাতে অঙ্গীরূপে বর্ণনীয়। যথা—শৃঙ্গার-তিলক।

অথ উল্লাপ্য।

উল্লাপ্য দিব্য-বিবরণ-সংঘটিত ও একাঙ্কে পরিসমাপ্ত। ইহার নায়ক উদাত্ত এবং ইহা হাস্য, আদ্য ও করুণ-রসে সংযুক্ত। মতান্তরে বলে যে, ইহা সংগ্রাম-বহুল, ত্রিপদী নামক গানে অলঙ্কৃত, চারি জন নায়িকা দ্বারা সুশোভিত এবং তিন অঙ্কে পরিসমাপ্ত। যথা—দেবী-মহাদেব।

অথ কাব্য।

ইহা একাঙ্কে সমাপ্ত; হাস্য-সঙ্কুল খণ্ড-মাত্রা ও দ্বিপদিকা প্রভৃতি গানে অলঙ্কৃত এবং আদ্য-রস-সূচক। ইহার নায়ক-নায়িকা উভয়ই উদাত্ত। যথা—যাদবোদয়।

অথ প্রেঙ্খণ।

ইহাতে সূত্রধার বা বিষ্কম্ভক নাই। ইহাও একাঙ্কে সমাপ্ত। বাহুযুদ্ধ ও রোষ-ভাষণ ইহাতে বর্ণিত হয়। প্রেঙ্খণে যে কোন ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে মঙ্গলাচরণ পাঠ করিয়া, অভিনয় সূচনা করিয়া দিবেন। যথা—বালিবধ।

অথ রাসক।

রাসক, পঞ্চ পাত্রে শোভিত, সাধু ও প্রাকৃত উভয়বিধ ভাষায় অলঙ্কৃত ও এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহা নৃত্য-গীতাদি বহুকলা-বিশিষ্ট। ইহাতে সূত্রধার নাই—ইহার নায়িকা বুদ্ধিমতী ও পণ্ডিতা। নায়ক মূর্খ, কিন্তু সৎ-স্বভাব-বিশিষ্ট; কৈশিকী বৃত্তি ইহার জীবন। যথা—মেনকাহিত।

অথ সংলাপক।

সংলাপক তিন বা চারি অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার নায়ক পাষণ্ড। করুণ ও আদ্য রস ভিন্ন আর সমস্ত রসই ইহাতে বর্ণনীয়। পুরাবরোধ, সংগ্রাম, বিদ্রব ও ছলনা ইহাতে বর্ণন করিতে হয়। কৈশিকী ভিন্ন আর সকল বৃত্তিই ইহাতে

---

‡ যিনি নায়কের বহু বিস্তৃত ইতিবৃত্তে সহায় ও নেতৃ-সামান্য গুণ হইতে কিঞ্চিদূন, তাঁহার নাম পীঠমর্দ্দ।

¶ প্রিয়তমের শুভাগমন হইবে বলিয়া, সুসজ্জিত বাস গৃহে যাহার বেশ-ভূষাদি বিহিত হয়, তাহার নাম বাসক-সজ্জা। তথাহি—"কুরুতে মণ্ডনং যস্যাঃ সজ্জিতে বাস-বেশ্মনি। সা তু বাসক-সজ্জাস্যাদ্বিদিত-প্রিয়-সঙ্গমা॥"

দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন মায়া-কাপালিক।

অথ শ্রীগদিত।

শ্রীগদিত এক অঙ্কে পরিসমাপ্ত ও প্রখ্যাত-বৃত্ত। ইহার নায়ক প্রসিদ্ধ ও ধীরোদাত্ত। শ্রীগদিতের নটী, শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীবেশ-ধারিণী বলিয়া, ইহার নাম শ্রীগদিত। যথা—ক্রীড়া-রসাতল।

অথ শিল্পক।

শিল্পক চারি অঙ্কে ও কৈশিকী প্রভৃতি চারি বৃত্তিতে অলঙ্কৃত। শান্ত ভিন্ন সমস্ত রসই ইহাতে বর্ণনীয়। ইহার নায়ক ব্রাহ্মণ। ইহাতে শ্মশানাদির বর্ণনা করিতে হয়। শিল্পকের উপনায়ক অত্যন্ত নীচ। তর্ক, সন্দেহ, তাপ, উদ্বেগ, প্রসক্তি, প্রযত্ন, অবহিথা, বিলাস, আলস্য বাষ্প, হর্ষ, মূঢ়তা, বিস্ময় ও বিস্মৃতি প্রভৃতি ইহাতে অতি সুন্দর-রূপে বর্ণন করিতে হয়। যথা—কনকাবতী-মাধব।

অথ বিলাসিকা।

ইহা একাঙ্কে সমাপ্ত,আদ্যরস-বহুল ও ভাণের ন্যায় লাস্যাঙ্গযুক্ত। ইহাতে বিদূষক বিট ও পীঠমর্দের প্রবেশ আবশ্যক। ইহার নায়ক নীচ; ইতিবৃত্ত-ভাগ সংক্ষিপ্ত ও নেপথ্য-ক্রিয়া সর্বাঙ্গ-সুন্দর। যথা—ইন্দিরা।

অথ দুর্মল্লিকা।

দুর্মল্লিকা চারি অঙ্কে সমাপ্ত ও নীচ-নায়ক-বিশিষ্ট। ইহার প্রথমাঙ্ক কেবল বিট নামক পাত্রের ক্রীড়াতে পূর্ণ। দ্বিতীয় অঙ্ক বিদূষকের কলাকৌশলে ভূষিত। তৃতীয়াঙ্ক পীঠমর্দের প্রবেশ-সংযুক্ত,চতুর্থাঙ্ক নায়কের ক্রীড়াকৌতুকে পরিপূর্ণ। ইহাও ভারতী-বৃত্তি-বহুল। যথা—ইন্দুমতী।

অথ প্রকরণিকা।

প্রকরণী ঠিক্ নাটিকার ন্যায়; কেবল ইহার নায়ক বণিক্—নায়িকা, নায়কের তুল্য-বংশ-সম্ভূত। ইহার উদাহরণ দর্পণকার ধরেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "মৃগ্যমুদাহরণম্।"

অথ হল্লীশ।

হল্লীশ একাঙ্কে সমাপ্ত। ইহাতে সাত, আট বা দশ জন স্ত্রীর প্রবেশ সূচিত হইবে; এবং ইহাতে পুরুষের মধ্যে কেবল নট। হল্লীশে বহুতর নৃত্য-গীত-কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—কেলিরৈবতক।

অথ ভাণিকা।

ভাণিকা একাঙ্কে সমাপ্ত ও আদিরস-বহুল। ইহার নায়িকা, উদাত্তা—নায়ক চঞ্চল। উপন্যাস, বিরোধ, ভয়, সমর্পণ ও সংহার প্রভৃতি অঙ্গ ইহার জীবন।

প্রসঙ্গ-ক্রমে যে কার্য্যের কীর্ত্তন, তাহার নাম উপন্যাস। (২) ভ্রান্তি-নাশের নাম বিরোধ। (৩) মিথ্যাপানের নাম ভয়। (৪) সোপালম্ভ ক্রীড়ার নাম সমর্পণ। (৫) কোন কার্য্য সমাপ্ত করার নাম সংহার। যেমন, কাম-কেলি-কৌমুদী।

—

এই সমস্ত রূপক ও উপরূপককে নাটক বলিলে, কোন রূপ অসুবিধা হইত বলিয়া বোধ হয় না। যদি সহস্র প্রকার নাটক থাকে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণনা, প্রণালী, উপাখ্যান, নায়ক-চরিত ও নায়িকার ভাব অবশ্যই পৃথক্ পৃথক্ হইবে, সন্দেহ নাই। এখন এক জন আলঙ্কারিক বাহির হইয়া, ঐ সহস্র প্রকার নাটকের গবৃত্তি, কবৃত্তি, হাম্বীর, শঙ্খ, রঙ্গপট্ট, পটমঞ্জরী ও জয়াজয়ন্তী প্রভৃতি হাজার প্রকার নাম দেন ও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ সূত্র করেন, আর দেশীয় সভ্যগণ যদি 'আমাদের দেশে সহস্রপ্রকার রূপক ও দুই সহস্র প্রকার উপরূপক আছে বলিয়া, যেই যেই করিয়া নাচেন, তাহা হইলে ঐ সভ্যগণের বুদ্ধিমত্তা যে কিরূপ, তাহা আর বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যে সকল লোক নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা ও পদার্থজ্ঞান-রহিত, তাহারাই ঐরূপ সূত্র করিয়া সামাজিকগণের অরুচি-ভাজন হইয়া পড়েন। নাটকের ভেদ দেখাইতে হইলে, দুই প্রকার ভেদ করা যাইতে পারে—একরূপ বাক্য-বহুল ও অন্যরূপ গান-বহুল।

সমাপ্ত।

শ্রীজটিল সন্ন্যাসী।

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

শৈলবালা (উপন্যাস) এক জন পরিব্রাজক-প্রণীত; বসুপ্রেস, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার রচনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াছি। উপন্যাস হইলেই যেমন বঙ্কিম বাবুর অনুকরণ হওয়া চাই, কাব্য হইলেই যেমন তাহা মাইকেল্ বা হেমচন্দ্রের ছাঁচে ঢালা হইতেই হইবে—বঙ্গে এই রীতি হইয়া উঠিয়াছে। এটী কেবল আমাদের নীচ অনুকরণ-প্রিয়তা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। প্রতিভার বিকাশ না হওয়াতে, অনুকরণ আজও আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছে। বাঙ্গালাতে যিনি অনুকরণের এই ভীষণ প্রলোভন ও আক্রমণের নিকট হইতে, অব্যাহতি লাভ করেন, তাঁহার ভারি জোর কপাল। শৈলবালার গ্রন্থকার এই শ্রেণীর লোক। তাঁহার অস্ফুট বর্ণনা, নায়ক-নায়িকার সুকৌশলময় চরিত্রের গাঁথনি এবং রচনার রাজ-গাম্ভীর্য্যে একদা আমাদের অননুভূত-পূর্ব্ব বিস্ময় জন্মাইয়া দিয়াছে। যে ভাষা-বৈচিত্র্য, ভাব-বৈচিত্র্য এবং বর্ণনা-চাতুর্য্য উপন্যাসের জীবন—শৈলবালায় তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে।

ইহার উপাখ্যান-ভাগের নায়ক—সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রর চরিত্র অতি-উচ্চ ও উদাত্ত-ভাব-ব্যঞ্জক। কেবল

এক স্থানে তাঁহার উদ্বেগ ব্যক্ত হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু তাহাও কেবল সাময়িক উত্তেজনা বা দুর্ব্বল দুর্ভাবনা বশতঃ ঘটিয়াছিল। তদ্ভিন্ন উপন্যাসের আর একটী ত্রুটি লক্ষিত হয়। স্থলে স্থলে, 'বলা বাহুল্য' 'এস্থলে বলা আবশ্যক' ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগে ঔপন্যাসিক ভাষার বাঁধনি কতক শিথিলিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, সকল দিক দেখিলে, ইহাকে উত্তম উপন্যাস গ্রন্থ বলিতে হয়। গ্রন্থকার সত্য সত্যই যদি পরিব্রাজক হন, তবে তিনি প্রকৃতির নব নব মাধুরী-পূর্ণ আরো উপন্যাস লিখিতে থাকুন। সর্ব্ব প্রথম চেষ্টাতেই সাফল্য, গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে।

আদরিণী (মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী) শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত; করপ্রেস্। বঙ্গদর্শন ও আর্য্যদর্শনের ধরণে যেমন হিন্দুদর্শন পত্রের নাম-করণ হইয়াছে; বান্ধব, ভারতী ও কল্পদ্রুমের প্রণালী অনুসারে যেমন "কল্পতরু"—সেইরূপ নলিনী এবং কল্পনার ভাবে "আদরিণী" প্রকাশিত হইতেছে। নলিনী এবং কল্পনার সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণে 'আদরিণী' গৌরবিণী, এ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। নাম-গত সাদৃশ্য দেখানই ঐরূপ বলার তাৎপর্য্য। 'আদরিণী' যে শ্রেণীর পত্রিকা, তাহাতে সেই শ্রেণীর উপযুক্ত লেখা বাহির হইতেছে।

প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় লিখিবার উপযুক্ত এক দল লেখক হওয়া আবশ্যক, সময়ে সময়ে আমরা এই অভাব অনুভব করি। সচরাচর দেখা যায়, এক শ্রেণীর লোকের বাঙ্গালা-রচনা-কার্য্যে প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু যোগ্যতা-বিরহে তাঁহাদিগ দ্বারা কোন ফল হয় না। তাঁহাদের সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থতার আধারের প্রয়োজন। তাঁহাদের রঙ্গভূমি নলিনী, কল্পনা এবং আদরিণী। ইহাদের লেখকগণ কালে প্রথম-শ্রেণীস্থ পত্রিকার লেখক হইতে পারিবেন। এখন 'আদরিণী' বঙ্গীয়গণের অন্তরের সোহাগিনী হইয়া বঙ্গ-রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকুন, এই আমাদের ইচ্ছা।

বঙ্গবিবাহ; শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত *। আজ কাল বাঙ্গালাদেশ এবং বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাহার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ বঙ্গদেশের জন্য কটীবদ্ধ হইয়াছেন। এই কথার অন্যতম প্রমাণ অদ্যকার এই পুস্তক। বঙ্গ-বিবাহ পাঠ করিয়া চন্দ্রবাবুকে এক মুখে আমরা কত প্রশংসা করিয়াছি, বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তিনি এই পুস্তকের কোথায় বাগ্মীর ন্যায় সদুপদেশ-পূর্ণ যথার্থ বক্তৃতা করিয়াছেন, কোথায় বুঝাইয়াছেন, কোন স্থানে যুক্তি দেখাইয়া দেশাচার-পিশাচের বিভীষণ প্রলোভন

* নব্য প্রেস, মূল্য ৷৵৹ আনা।

হইতে মুক্তির উপায় বলিয়া দিতেছেন, আর কোন স্থলে বা তুলনা করিয়া আমাদের বর্ত্তমান হীনশ্রী সামাজিকতার অমুপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা শুনিতে পাই, আমাদের অনেক বন্ধু ও সহযোগী বলেন, "আমরা 'বচন-বাণে' জর্জ্জরিত।" ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা বলি—না, এখনও হয় নাই—এখনও বিস্তর বাকী। এখনও অনেক যুবকের মত পরিপক্ক বা পরিণত হইতে পারে নাই। কেন না, অগ্রে কথা, পরে কাজ। অগ্রে মত-স্থৈর্য্য হউক, পশ্চাৎ ক্ষেত্রে কার্য্য দেখিতে পাইবে। তাই জন্যে বলি—বঙ্গে আজও কথার শেষ হইতেছে না কেন, যাঁহারা বলেন, তাঁহারা অদূরদর্শী। বাঙ্গালায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কি না, সূক্ষ্মদর্শী যিনি, তিনিই কেবল বুঝিতে পারিতেছেন। এই আরম্ভ ঘনতর হউক, 'বচন' আপনা আপনি নিবৃত্ত হইবে।

লোকে মহৎ ব্যক্তি বা সমকক্ষ বন্ধুকে উপহার দেয়। যেখানে ভক্তি বা প্রীতি গমন করে, উপহার সেই খানে যায়। বহু-বিবাহও সেই নিয়মে উপহৃত হইয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ প্রিয় ব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াই ইহা অর্পিত হয় নাই। চন্দ্র-বাবু 'বিবাহিতেচ্ছু অবিবাহিত' যুবক-দলের হস্তে তাঁহার "বহুবিবাহ" সমর্পণ করিয়া হৃদয়বত্তা ও ভাবগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের মতে অতি উপযুক্ত পাত্রে এই উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

সে দিন শুনিতেছিলাম, আর্য্যদর্শনের "পারিবারিক একতা" পাঠ করিয়া এক জন যুবক, "সমর্থ না হইয়া বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আশা করি, "বহুবিবাহ" পাঠে অনেকের ঐরূপ মত হইবে। বাঙ্গালার প্রতি-গৃহস্থ ব্যক্তি বহুবিবাহ এক বার মাত্র পাঠ করিয়া দেখুন—কি ভয়ানক অবস্থা-তেই আমাদের জীবন পর্য্যবসিত হইতেছে!"

চন্দ্রবাবুকে কয়েকটী ত্রুটির জন্য অনুযোগ করিতে আমাদের অধিকার আছে। বন্ধু-ভাবে আমরা তাঁহাকে পরামর্শ-স্বরূপ এই বলিতে চাই যে, তিনি কেন মনুকে অতি মাত্র রক্ষণ-প্রিয় ভাবিয়াছেন? ব্যাখ্যাতার দোষে, অনু-বাদকের দোষে মনু হেয় হইবেন, ইহা কখনই সহনীয় হইতে পারে না। মনু যে স্থিতিশীল নহেন 'বিবাহ ও 'পুত্রত্ব-বিষয়ে মনুর মত' আর্য্যদর্শনে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অদ্বিতীয় প্রমাণ। আর একটী কথা—চিরাগত প্রথানুযায়ী পুস্তক-মাত্রেই একটী করিয়া ভূমিকা বা মুখবন্ধ থাকে। চন্দ্র বাবু কি সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহারও আমূল সংশোধন আবশ্যক মনে করেন? গ্রন্থকারকে অনুযোগ করা শেষ হইল। এক্ষণে অবিবাহিত পাঠক মহাশয়দিগকে বলি, তাঁহারা এই গ্রন্থের

এবং এক খণ্ড ক্রয় করিয়া এতদনুযায়ী কার্য্য করুন। বিবাহিতদিগেরও ইহা পাঠ করিলে ফল হইবে। তাঁহারা ও কু-ফল ভুগিলেন; ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র ও কন্যাগণকে যাহাতে আর না ভুগিতে হয়, এই বেলা তাহার চেষ্টায় থাকুন। এরূপ কার্য্য বিনা যে আমাদের মুখশ্রী উজ্জ্বল হইবে না, তাহাতে দ্বিমত নাই।

চারুবোধ ব্যাকরণ; শ্রীযাদবকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সরস্বতী যন্ত্র; মূল্য ৵০ আনা। পুস্তকের নাম শুনিলে, সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বোধ হয়; কিন্তু ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণ নহে। যদিও বাঙ্গালা ব্যাকরণের বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি এ ব্যাকরণখানি ছোট ছোট বালকগণের উপকারে আসিবে। ইহার বক্তব্য বিষয় অতি সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে ব্যক্ত করায়, বুঝিবার সুবিধা আছে। কেবল একটী বিষয়ে আমরা যাদব বাবুর সুনির্ব্বাচন-শক্তির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। সেটী বর্ণের উচ্চারণ-স্থানের বিবরণ। উচ্চারণ লইয়া অক্ষর বিচার করা—সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্রেরই অধিকার এবং প্রয়োজন। বাঙ্গালায় তাহা নিরর্থক। নিরর্থক শুষ্ক বিষয়, বালকগণের শিক্ষার্থ-নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে সন্নিবেশিত না হইলেই, ভাল হইত।

ধর্ম্ম-বন্ধু; (পাক্ষিক পত্রিকা) মূল্য ৫ পয়সা। নীতি-সম্বন্ধে স্বল্প-মূল্যের পত্রিকা এদেশে প্রচারিত দেখিলে, আমরা নিতান্ত সুখী হই। 'ধর্ম্ম-বন্ধু' পত্র সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার ভাষা সরল বটে, কিন্তু বাঁধনি নাই। 'ইপিক্‌টেটাসের' সমস্ত জীবনবৃত্তটী শেষ করিতে পারিলে, নিশ্চয় একটী অভাব পরিপূরিত হইবে সত্য, কিন্তু তাহার বর্ণনা-প্রণালী হৃদ্য হইতেছে না। কোন কোন প্রস্তাবের নামকরণ কিছু অপূর্ব্ব-ভাবোৎপাদক হইয়াছে, যথা—"বায়ু-রাজ্যে ঈশ্বরের করুণা।" পত্রিকা-খানি যখন সমালোচনার্থ আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন নেতৃগণকে এই সময়ে একটী সৎপরামর্শ দেওয়া আবশ্যক। তাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতির সঙ্গে সাময়িক ঘটনা সন্নিবেশিত করিতে থাকুন; অন্যথা জানিবেন, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পত্রিকার জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিবে।

সংহিতা; শ্রীহরসুন্দর তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও মূল সহ প্রকাশিত* ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। হারীত-সংহিতা সম্পূর্ণ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনেক দূর বাহির হইয়াছে। তর্করত্ন মহাশয় এই মহোপকারক, সৎ উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, ভারতীয়গণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। লুপ্ত-প্রায় 'প্রাচীন' স্মৃতি-শাস্ত্র সানুবাদ প্রকটিত হওয়াতে, সাময়িক কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বেই (১ম ও ২য়

*সেরপুর, ময়মনসিংহ; প্রতি সংখ্যার মূল্য৷৷০

সংখ্যায়) তিনি সমগ্র অত্রি এবং বিষ্ণু-সংহিতার কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছেন। কার্য্যটী গুরুতর এবং ব্যয়-সাধ্য; অতএব প্রত্যেক বাঙ্গালীকে অনুরোধ করি, তর্করত্ন মহাশয়ের সাহায্য-স্বরূপ তাঁহারা এই পুস্তকের গ্রাহক-শ্রেণী-ভুক্ত হন।

আমরা আজও মিলিয়া কাজ করিতে শিখি নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও, পণ্ডিত জাতির উদ্ধারের উপায়ান্তর দেখি না। পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ও স্মৃতি-সংহিতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার যাজ্ঞবল্ক্যের ৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত সটীক ও সানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। দক্ষ-স্মৃতি বহু দিন সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয় এক্ষণে প্রকাশাবশিষ্ট বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য শেষ করিয়া পরাশর, অঙ্গিরা, আপস্তম্ব, লিখিত, গৌতম প্রভৃতি প্রচারিত করিলে, সমাজের মঙ্গল হইতে পারিবে। বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় যাজ্ঞবল্ক্যের পর, হারীত বা অত্রি-স্মৃতি যেন স্পর্শও না করেন।

মনু—সংহিতাকারগণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুসারে গণনা করিলে, সেই মনুর পরেই যাজ্ঞবল্ক্য। যাজ্ঞবল্ক্য তত প্রসিদ্ধ না হউন, মিতাক্ষরা টীকার মাহাত্ম্যে তাঁহার আসন মনুর নিম্নেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই আসনের প্রার্থী অনেকে—কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য তাহার ইজারা করিয়া বসিয়াছেন। অত্রি, দক্ষ, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের সংহিতা অল্লায়তন। সুতরাং সেই গ্রন্থ-গুলি তত ব্যয়-সাধ্য নহে। সেই জন্য আমাদের ইচ্ছা হয়, বেদান্তবাগীশ মহাশয় কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, ব্যাস, শংখাদির প্রচারণে মনোযোগ দেন। তর্করত্ন এবং বেদান্তবাগীশের প্রচারিত যাজ্ঞবল্ক্যের তুলনা করিয়া দেখিলাম—তর্করত্নের গ্রন্থে শ্লোকের উপরিভাগে হেডিং দেওয়ায় অপর-সাধারণ ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ উকীলগণের সুবিধা হইতেছে। এই গুণ-ভাগ বেদান্তবাগীশের গ্রন্থে নাই। কিন্তু অনুবাদের ভাষা ধরিয়া তুলনা করিলে, বেদান্তবাগীশের কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয় তর্করত্নের ভাষা অস্পষ্ট বলিতেছি না। আর একটী কথা। স্থানে স্থানে উভয়েরই মতভেদ দেখিলাম, এতৎ-সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি—"Who will decide, when Doctors disagree?"

শাসন-প্রণালী।

(২য় ভাগ, ১১ সংখ্যার পর।)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(প্রকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর আদর্শ।)

মানব-সমাজের দুইটী ধর্ম্ম, স্থিতি (order) ও উন্নতি (progress)। যত প্রকার উৎকৃষ্ট গুণ একটী সমাজে বিদ্যমান থাকে, তৎসমুদায় সংরক্ষণের অবস্থাকে স্থিতি কহে। যে সমাজ সভ্যতার কোন সোপানে আরোহণ করিয়া, তথা হইতে স্খলিত না হইয়া, তাহাতেই অবস্থিতি করে, তাহাকে স্থিতি-শীল সমাজ বলা যায়। কিন্তু সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া, যে সমাজ উত্তরোত্তর অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারে, তাঁহা উন্নতি-শীল সমাজ-নামে অভিহিত হয়।

বস্তুত এই দুইটী ভিন্ন নহে। স্থিতি, উন্নতির অন্তর্ভূত। উন্নতির অর্থই এই যে, সমাজের যাবতীয় সদ্গুণ-রাশি অটল ভাবে স্থির রাখিয়া অধিকতর মঙ্গলময় পদার্থের আহরণ করা। যেমন, এক ব্যক্তি অধিকতর ধন-সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করিলে, পূর্ব্ব-সঞ্চিত বিত্ত অপব্যয় না করা, তাহার প্রধান কর্ত্তব্য।

তাহাই প্রকৃষ্ট শাসন-প্রণালী, যদ্দ্বারা একটী সমাজ তাহার উৎকৃষ্ট গুণগুলি সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় এবং ক্রমেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করে। যে সমাজের মানব-মণ্ডলী যত ধার্ম্মিক এবং বুদ্ধিজীবী, তাহার শাসন-প্রণালী সেই পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করে। সুতরাং সমাজের সাধারণত এবং ব্যক্তিগত মানসিক নৈতিক এবং কর্ম্মিষ্ঠ গুণ বর্দ্ধন করা—প্রত্যেক শাসন-প্রণালীর প্রধান কর্ত্তব্য। পরন্তু, সমাজ-বিশেষের ব্যক্তি-ব্যূহের গুণাগুণের উপরেই তদীয় শাসন-প্রণালীর উত্তমাধমতা নির্ভর করে।

১। নৈতিক অবস্থা। বিচার-কার্য্য-সম্বন্ধে যতই কেন উত্তম উত্তম আইন ও নিয়মাবলি প্রথিত হউক না কেন, তথাপি যে যে ব্যক্তি দ্বারা সেই আইন এবং নিয়ম কার্য্যত প্রযুক্ত হইবে, তাহাদের নৈতিক অবস্থার উপরেই সদ্বিচার হওয়া না হওয়া নির্ভর করে। যদি সাক্ষি-গণ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং বিচারক এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ উৎকোচ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সু-বিচারের আশা কি? প্রাময়

পঞ্চায়িতদিগের বেতন-গ্রহণের পদ্ধতি নাই। সুতরাং সাধু এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিরা যদি উপেক্ষা করিয়া পঞ্চায়িতের কার্য্য গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে, কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার মানসে যদি দুষ্টমতি ব্যক্তিরা ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নির্ধন প্রজাবর্গের যে কত যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহার অন্ত নাই। কারণ, কোন অপরাধ না করিলেও, তাহাদের বহুতর পরিশ্রম-লব্ধ যৎকিঞ্চিৎ অর্থের নাশসাতে তাহাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ হইয়া থাকে। অথচ অনেক সময়ে প্রকৃত দোষিগণ পঞ্চায়িতগণের সাহায্যে অশান্তির আধার শান্তি-রক্ষক-গণের (পুলিস কর্ম্মচারিগণের) দক্ষিণ হস্তের পূজা করিয়া ন্যায় বিচারের প্রতারণা করিতে পারে।

যে যে দেশে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার ন্যায় প্রতিনিধি-সভা দ্বারা শাসন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, তথাকার প্রতিনিধি-নির্ব্বাচকগণ যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন না করিয়া, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে অধিকতর পরিমাণে উৎকোচ প্রদান করে, তাহাকেই সভায় সভ্য মনোনীত করেন, তবে সে দেশে সুশাসন-জনিত মঙ্গলের প্রত্যাশা কোথায়? অথবা সেই সভ্যগণ যদি প্রশান্ত-ভাবে দেশ-হিতকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান না করিয়া, রোষ-পরবশ হইয়া, বাক্যুদ্ধ হইতে, নিবৃত্ত হইয়া, সভা-গৃহে মল্ল-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, অথবা বাক্য-বাণ-প্রয়োগে ক্ষান্ত হইয়া, প্রতিপক্ষের প্রতি ঊনবিংশতি শতাব্দির প্রচলিত অগ্নি-বাণ (Revolver) বর্ষণ করেন, তাহা হইলে ঈদৃশ সভা হইতে কি সু-ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

যে দেশস্থ লোকের হিংসা-বৃত্তি এরূপ বলবতী যে, যদি এক ব্যক্তি কোন কার্য্যে সফল-প্রযত্ন হয়, তাহা হইলে অপর সকলে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, বদ্ধ-পরিকর হইয়া, তাহার কার্য্যের প্রত্যবায় ঘটাইবার চেষ্টা করে, তথায় শাসন-কার্য্য অথবা এবংবিধ কোন ব্যাপার যাহাতে অনেক ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা কদাচ সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। বস্তুত যেখানকার প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল স্বার্থ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সর্ব্ব-সাধারণের কিসে উপকার হয়, তৎপ্রতি অণু-মাত্রও দৃষ্টি-নিক্ষেপ না করে, সে দেশে সুশাসন অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত বুদ্ধির অবস্থা। শাসন-প্রণালীর সমস্ত কার্য্যই মনুষ্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়। সুতরাং কার্য্য-কারক-গণ এবং যাহারা তাহাদিগকে নিযুক্ত করে অথবা যাহাদের নিকট সেই কার্য্যকারকগণ কার্য্য-সম্বন্ধে দায়ী, কিংবা সমাজস্থ জন-সাধারণ, যাহাদের ভাল মন্দ মতের উপর পূর্ব্বোক্ত সকল ব্যক্তির দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, এই সমস্ত ব্যক্তিই যদি এক একটী বুদ্ধিমান্ গর্দ্দভাবতার

হয়েন, তাহা হইলে শাসন-প্রণালীর সমস্ত ব্যাপার-সম্বন্ধেই প্রতুল! লৌকিক প্রবাদের হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল।

তৃতীয়ত দেশের ধর্ম্মের অবস্থা। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত পণ্ডিত বেন্থামের সময় অবধি অধুনাতন অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, ধর্ম্মের সহিত শাসন-প্রণালীর বিশেষ সংযোগ নাই। আমেরিকাস্থ ইউনাইটেড্ ষ্টেটে স্বাধীন-তন্ত্র ইহার প্রমাণ-স্বরূপ দৃষ্টান্ত। এক জন সুবিজ্ঞ লেখক * বলেন যে, তথাকার অধিকাংশ লোক "রোমান্ কাথলিক"-ধর্ম্মাবলম্বী, ধর্ম্মের উপর তাহাদের অচলা ভক্তি আছে, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিরই দেশের শাসন-কার্য্য-সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। অথচ তথায় ধর্ম্ম-শাসন-প্রণালী সম্পূর্ণ-রূপে বিচ্ছিন্ন। বস্তুত যদিও, ধর্ম্মের সহিত পরলোকের সম্বন্ধই অধিক, তথাপি ধর্ম্ম ও নীতির সহিত বিশেষ সংযোগ থাকাতে, ইহলোকের কার্য্য-কলাপের উপরেও দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মের কিছু পরিমাণে কার্য্য-কারিতা অবশ্যই আছে।

অতএব সমাজ-বিশেষের মনুষ্যগণের বুদ্ধি-বৃত্তি এবং নৈতিক অবস্থাই উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর প্রধান নিদান। সুতরাং কোন শাসন-প্রণালী দ্বারা যে পরিমাণ একটী সমাজেই ব্যক্তি-ব্যূহের বুদ্ধি এবং নীতি-সম্বন্ধে উন্নতি সাধিত হয়, সেই পরিমাণে উহা উৎকর্ষ লাভ করে।

সমাজস্থ ব্যক্তি-গণ মানসিক, নৈতিক এবং কর্ম্মঠ গুণে অন্বিত হইলে, সেই সমাজের শাসন-প্রণালীও উৎকৃষ্ট হইবে; পক্ষান্তরে শাসন-প্রণালীরও নিঃস্বার্থ-ভাবে দেশ-হিতকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান-আশয়ে দেশস্থ সর্ব্ব-প্রধান এবং সৎ-স্বভাব-বিশিষ্ট লোকদিগকে শাসন-কার্য্যে নিয়োজিত করা উচিত। তাহা হইলেই, উভয়ত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। কারণ, তাহা হইলে, শাসন-কর্ত্তাগণ উপযুক্ত লোক হইবেন এবং জন-সাধারণেরও তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ সুন্দর-রূপে পর্য্যালোচনা করিবার ক্ষমতা থাকা নিবন্ধন তাঁহারা অধিকতর সাব-ধানতার সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে যত্ন করিবেন। বিচার-কার্য্য ইহার উদাহরণ। প্রাড়্‌বিবাকগণ যত উৎকৃষ্ট ও উত্তম লোক হয়েন এবং আপামর-সাধারণ লোকদিগের উচ্চ-ভাবাপন্ন মত দ্বারা তাঁহারা যত অধিক পরিমাণে পরিচালিত হন—বিচার-কার্য্য ততই শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করে। কিন্তু দেশ-বিশেষের শাসন-প্রণালীর উচিত যে—(প্রথমত) সর্ব্বোৎকৃষ্ট, বুদ্ধিমান্ এবং সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে বিচারক-পদে অভিষিক্ত করা, (দ্বিতীয়ত) কার্য্য-বিধি-সম্বন্ধে সুচারু পদ্ধতি প্রণয়ন করা (তৃতীয়ত) সমুদায় বিষয় প্রকাশ্য-ভাবে রাখা। কারণ, তাহা হইলে, যদি কোন দোষ

* M. De Tocqueville (vide his "Democracy in America."

থাকে, তাহা সাধারণের গোচর হইতে পারে, এবং সকল ব্যক্তিই তাহা পর্য্যালোচনা করিতে সক্ষম হয়। (চতুর্থত) সংবাদ-পত্রাদি দ্বারা যাহাতে স্বাধীন-ভাবে দোষ গুণের আন্দোলন হইতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া; (পঞ্চমত) যেরূপে সত্য-কথা গোপন না থাকে, এরূপ ভাবে প্রমাণ-গ্রহণের রীতি অবলম্বন করা; (ষষ্ঠত) যাহাতে দীন দুঃখী সকলেই সহজে বিচারকের নিকট স্বীয় আবেদন জ্ঞাপন করিতে পারে, এরূপ সুবিধা করিয়া দেওয়া; (সপ্তমত) অপরাধিগণকে ধৃত করিবার সুপ্রণালী ব্যবস্থা করা। প্রাগুক্ত সমুদায় ব্যাপারই বিচার-কার্য্য-সম্বন্ধে নিযুক্ত ব্যক্তি-নিচয়ের বুদ্ধি-বৃত্তি এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে।

সমাজের কার্য্য-সম্পাদন-বিভাগ সম্বন্ধেও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। যথা:—

(১) কার্য্য-সম্পাদক ব্যক্তিগণের উপযুক্ততা-সম্বন্ধে এবং

(২) যাহাতে তাঁহাদের শীঘ্র শীঘ্র পদোন্নতি হয়, তজ্জন্য সুন্দররূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

(৩) কার্য্যকারক-গণের যাহাতে সুবিধা হয়, এরূপ ভাবে তাহাদের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করিয়া দিতে হয়।

(৪) সকল কার্য্যই সুন্দর প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হওয়া উচিত।

(৫) কার্য্য সম্পন্ন হইলে, পরিষ্কার-রূপে কাগজপত্রে তাহার প্রকৃত নিদর্শন (নথি) রাখা আবশ্যক।

(৬) প্রত্যেক কার্য্যকারক কাহার নিকট দায়ী, তাহা তাহার স্বয়ং এবং অপর সাধারণের জানা চাই।

(৭) কার্য্য-সম্পাদক বিভাগের কোন কার্য্য-সম্বন্ধে শিথিলতা এবং ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি অযথা অনুগ্রহ অথবা অন্য কোনরূপ অবৈধ ব্যবহার যাহাতে না হইতে পারে, তাহার উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা।

যেরূপ আরোহী না থাকিলে, কেবল বল্গা দ্বারা অশ্ব চালিত হইতে পারে না, তদ্রূপ শাসন-প্রণালীর কেবল নিয়মাবলি পরিশুদ্ধ হইলে, কোন ফল নাই। সেই সমস্ত নিয়ম কার্য্যত প্রযুক্ত হয় কি না, ইহা দেখিবার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে, তাহারা যদি অধীনস্থ কার্য্যকারক-গণের ন্যায় কুচরিত্র অথবা শিথিল-প্রযত্ন হয়, এবং সকল ব্যাপারের মূলাধার-স্বরূপ জন-সাধারণে যদি নিতান্ত অজ্ঞ অথবা নির্জীব, জড়-পদার্থবৎ, কিংবা শিথিল এবং অমনোযোগী হয়, তাহা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী হইতেও, কোন মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, একটী উৎকৃষ্ট কল ভাল করিয়া না চলিলেও, অন্য একটী অপকৃষ্ট কল হইতে শ্রেয়স্কর। সেইরূপ শাসন-প্রণালী উৎকৃষ্ট হইলে, সমাজের কার্য্য-নিচয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত যাহা কিছু সদুপায় থাকে, তাহা যথা-

বিস্তৃতরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সমাজস্থ আপামর সাধারণ জন-গণের যদি, শাসন-প্রণালী-সম্বন্ধে সমুদায় বিষয় জানিবার উপায় থাকে, কিন্তু তাহারা যদি সেই সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে ঐরূপ প্রকাশ্য ভাবের কোন উপকারিতা নাই। তথাপি যদি প্রকাশ্য-ভাবে শাসন-প্রণালীর কার্য্য-গুলি সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে যদি কখন সর্ব্ব-সাধারণের তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার দ্বার একেবারে রুদ্ধ হয়। সুতরাং শাসন-কর্ত্তৃগণ অবলীলা-ক্রমে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিতে পারে। বস্তুত শাসন-কার্য্যে নিরত যে কর্ম্মচারীর স্বার্থপরতা এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞান একীভূত হয়, এই দুইটী মনোবৃত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, অপিচ দুইটীই তাঁহাকে একরূপ আচরণ করিতে সক্ষম করে, তিনিই কর্ম্মচারিগণের আদর্শ-স্বরূপ।

শাসন-প্রণালী উৎকৃষ্ট রূপে পরিচালিত হইতে হইলে, দেশস্থ প্রত্যেক অধিবাসীর উৎকৃষ্ট গুণ-রাশি একত্র মিলিত হইয়া দেশের সাধারণ কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং দুইটা ধর্ম্মের উপর শাসন-প্রণালীর উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে। ১ম, যে পরিমাণে সমাজস্থ জন-গণের মানসিক, নৈতিক এবং কর্ম্মঠ গুণের উন্নতি জন্মে এবং (২য়) যে পরিমাণে সমাজস্থ ব্যক্তি-নিচয়ের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান নৈতিকাদি গুণ-রাজি সম্মিলিত হইয়া, দেশের সাধারণ হিতকার্য্যানুষ্ঠানে নিয়োজিত হয়। এই দুইটী ধর্ম্মানুসারে শাসন-প্রণালীর উৎকর্ষ বিচার করিতে হইবে। একটী শাসন-প্রণালী সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে অবলম্বন করিয়াই সদসৎ ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অবস্থার উন্নতি বা অবনতি বিধান করে, সুতরাং এই দুইটী বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই, তাহার দোষ-গুণ নির্দ্ধারণ করিতে হয়। শাসন-প্রণালীর এই প্রথম ধর্ম্মটী—কি রাজতন্ত্র, কি স্বাধীন-তন্ত্র সকল প্রকারেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে। স্বাধীনতন্ত্রের সুচারু কার্য্য-পদ্ধতি যথেচ্ছাচারী রাজ-তন্ত্রেও বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নহে। কেবল আশঙ্কা-স্থল এই যে, যথেচ্ছাচারী রাজা উৎকৃষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি অবলম্বন না করিলেও, না করিতে পারেন। কিন্তু ইচ্ছা করিলে, তিনি শাসন-প্রণালীর যাবতীয় বিভাগের কার্য্য উপযুক্ত এবং সদ্গুণশালী ব্যক্তিদিগের হস্তেই ন্যস্ত করিতে পারেন। স্মৃতি-শাস্ত্র-বিশারদ ব্যক্তিকেই প্রাড়্‌বিবাক্‌-পদে নিযুক্ত করিতে পারেন। অর্থশাস্ত্রে পারদর্শী এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়-সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেই কোষাধ্যক্ষ করিতে পারেন। সিংহের ন্যায় বলবান এবং সমর-কুশল ব্যক্তিকে সেনাপতি-পদে বরণ করিতে পারেন এবং শৃগালের ন্যায় চতুর এবং কার্য্যক্ষম ব্যক্তিকে কোটালের কার্য্যে

নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় ধর্ম্মটী প্রতিপালন অর্থাৎ সমাজস্থ জনগণের মানসিক, নৈতিক উন্নতি এবং কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি সকল প্রকার শাসন-প্রণালী দ্বারাই হইতে পারে না। শাসন-প্রণালীর উৎকৃষ্ট আদর্শ তাহার নাম যদ্বারা সমাজের সাধারণত এবং ব্যক্তিগত মানসিক, নৈতিক এবং কর্ম্মিষ্ঠ গুণ প্রকৃষ্ট পরিমাণে সংবর্দ্ধিত হয়।

যে সমাজ যত পরিমাণে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তদনুসারে তত্রত্য শাসন-প্রণালী সংঘটিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমান ফ্রান্স অথবা ইংলণ্ড দেশের নিমিত্ত যেরূপ শাসন-প্রণালী উপযোগী, অসভ্য জুলু বা কুকী জাতির পক্ষে তাহা কদাচ কার্য্যকারী হইতে পারে না। সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীস্থ কোন জাতি ইতর পশু হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। অপর দিকে কোন জাতি এত উন্নত যে, তাহাদিগকে দেবতুল্য মনে করা যাইতে পারে। দেশ-বিশেষের মানব-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে তথাকার শাসন-প্রণালী অন্তত এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তদ্দেশস্থ ব্যক্তিগণ তদ্দ্বারা উন্নতির অব্যবহিত উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে। অসভ্যাবস্থায় সকলেই স্বেচ্ছাচারী এবং কেবল নিজের উদর পূর্ত্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত সমস্ত। এতাদৃশ অবস্থায় তাহাদের সর্ব্বপ্রথম স্বেচ্ছাচারিত্ব পরিহার করিয়া শাসন-কর্ত্তৃগণের আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিতে শিক্ষা করা আবশ্যক। সুতরাং এপ্রকার দেশের শাসন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে অনিয়ম-তন্ত্র হওয়া উচিত। এমত স্থলে এক জন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি শাসন-কর্ত্তা না হইলে, চলে না।

তাঁহার ক্ষমতা তিন প্রকার কারণে উদ্ভূত হইতে পারে। (১ম) ধর্ম্ম (২য়) যুদ্ধ-সম্বন্ধে বিক্রম (৩য়) ভিন্ন দেশের বলের সাহায্য।

সর্ব্ব-প্রথমে অসভ্য জাতিকে শাসন-কর্ত্তার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক। তৎপরে তাহাদের শাসন-প্রণালী এমত হওয়া উচিত, যেন তদ্দ্বারা তাহারা ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতে পারে এবং তৎপক্ষে কোন বাধা বিপত্তি না জন্মে। সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে, পুরাতন মিসর-দেশ-বাসিগণের মধ্যে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সংঘটন হইয়াছিল। তাহারা ধর্ম্মযাজকদিগের বশবর্ত্তী হইয়া, কিছু পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। পরন্তু য়িহুদিগণও ধর্ম্মানুশাসনের বশবর্ত্তী ছিল; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহারা পরিশ্রম করিতে শিখিল এবং তাহাদের মধ্যে একটী সাধারণ জাতীয় ভাবের উদ্রেক হইল। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের একটী চমৎকার ভাব এই যে, কোন কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং তাঁহারা

অনেক সময়ে য়িহুদিদিগের রাজার এবং ধর্ম্মযাজকগণের নিতান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেন। বর্ত্তমান সভ্য-সমাজে মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা দ্বারা যে উপকার সাধিত হয়, য়িহুদিদের ভবিষ্যৎ-বক্তাগণ দ্বারা প্রায় তদ্রূপ হইত। সুতরাং য়িহুদিগণ চীন-দেশবাসী এবং আসিয়া-মহাদ্বীপের অন্যান্য জাতিদের ন্যায় নিশ্চল-ভাবাপন্ন ছিল না। প্রাচীন কালে গ্রীসদেশ-বাসীদের নীচেই তাহারা অত্যন্ত উন্নতিশীল বলিয়া পরিগণিত।

এইরূপে একটী সমাজ উন্নতির এক পদবী হইতে, অন্য পদবীতে ক্রমশ আরোহণ করে। এই শ্রেণী-পরম্পরা বিবেচনা করিয়া, কোন্ প্রকার শাসন-প্রণালী কোন্ সমাজের পক্ষে উপযোগী, তাহা বিচার করিতে হয়। সুতরাং শাসন-প্রণালীর উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, তাহার এরূপ একটী আদর্শ অগ্রে স্থির করা উচিত, যাহা কেবল এক প্রকার উন্নতির পক্ষে নহে, পরন্তু সকল প্রকার উন্নতির পক্ষেই সম্যক্ রূপে অনুকূল। আদর্শ-স্বরূপ শাসন-প্রণালী স্থিরীকৃত করিয়া, পরে একটী সমাজস্থ ব্যক্তি-বৃন্দের মানসিক নৈতিক কি কি গুণ থাকিলে, উক্ত প্রকার শাসন-প্রণালীর উৎকৃষ্ট গুণ গুলি প্রতিভাশালী হইতে পারে, এবং সমাজের কি কি দোষে তাহার উপকারিতা বিনষ্ট হয়, এই বিষয়ে মীমাংসা করা আবশ্যক। তৎপরে সমাজের কোন্ অবস্থাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী নিয়োজিত হইতে পারে এবং কোন্ অবস্থাতে তৎ-পরিবর্ত্তে তদুপযোগী অপেক্ষাকৃত কিরূপ অপকৃষ্ট শাসন-প্রণালী হওয়া আবশ্যক, এই বিষয়ের নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত থাকা যাউক, "প্রতিনিধি-তন্ত্র" বা "সামন্ত-তন্ত্র" (Representative Govt.) প্রকার-ভেদই শাসন-প্রণালীর সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। ইহার প্রমাণাদি ক্রমশ আলোচিত হইবে।

শ্রীচন্দ্রমোহন মজুমদার।

বৈদূর্য্য।

"বৈদূর্য্য"—ইহা মণি বিশেষ অর্থাৎ এক প্রকার প্রস্তর। বিদূর দেশীয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হয় বলিয়া "বৈদূর্য্য" নাম হইয়াছে।* এই মণি অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীন পুস্তকেই ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্যবহারের বস্তু বলিয়া বৈদূর্য্য মণির

---

* "বিদূরে ভবং বৈদূর্য্যং" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এই মণি বিদূর নামক দেশে অথবা বিদূর নামক পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়

অনেক সংস্কৃত নাম পর্য্যায়-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র ইহার দুইটী মাত্র নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"বৈদূর্য্য" ও "বালবায়জ"; কিন্তু রাজনির্ঘণ্ট প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার "কেতু-রত্ন" "কেতব" "প্রাবৃষ্য" অভ্ররোহ" "খরাব্দাঙ্কুর" "বিদূর রত্ন" "বিদূরজ" নাম দৃষ্ট হয়। রাজবল্লভ গ্রন্থে ইহার রাসায়নিক বিবিধ গুণ বর্ণিত আছে। যথা—

"মুক্তা-বিদ্রুম-বজ্রেন্দ্র
বৈদূর্য্য-স্ফটিকাদিকম্।
মণি-রত্নং সরং শীতং
কষায়ং স্বাদু লেখনম্।
চাক্ষুষ্যং ধারণাত্তচ্চ
পাপালক্ষ্মী বিনাশনম্॥"

মুক্তা, বিদ্রুম, হীরক, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, ও স্ফটিক প্রভৃতি মণিরত্ন সকল সারক-গুণ-বিশিষ্ট, শীতল, কষায় রস, স্বাদু-পাকী, উল্লেখকর, চক্ষুর হিতকারী, এবং ধারণ করিলে পাপ ও অলক্ষ্মী নাশকারী হয়।

শাস্ত্রকারেরা যাহাকে "বৈদূর্য্য মণি" বলিয়া গিয়াছেন, বঙ্গভাষায় তাহাকে "বৈদূর্য্য" ভিন্ন অন্য কোন নামে ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু উর্দ্দু বা হিন্দি ভাষায় তাহার স্বতন্ত্র এক নাম আছে। আধুনিক জহরীরা যাহাকে "লহসুনীয়া" বলেন, তাহাই প্রাচীন কালের "বৈদূর্য্য।"

রাজনির্ঘণ্ট, গরুড়পুরাণ ও যুক্তি-কল্পতরু প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই বৈদূর্য্য মণির ছায়া বা বর্ণ ও পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে।

রাজনির্ঘণ্টকার বলেন, বৈদূর্য্যমণি সাধারণত কৃষ্ণ-পীতবর্ণ। কৃষ্ণ-পীত হইলেও, তাহার ছায়া বা কান্তি-গত বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। রাজনির্ঘণ্টকার বেণু পত্র প্রভৃতি বস্তুর সাদৃশ্য দ্বারা ইহার যে স্বরূপ কান্তি বর্ণন করিয়াছেন, অগ্রে তাহাই প্রকটিত হইতেছে।

"একং বেণু পলাশ কোমলরুচা
মায়ূরকণ্ঠত্বিষা।
মার্জ্জারেক্ষণ পিঙ্গলচ্ছবিযুতা
জ্ঞেয়ং ত্রিধাচ্ছায়য়া।
যদ্গাত্রং গুরুতাং দধাতি নিতরাং
স্নিগ্ধঞ্চ দোষোজ্ঝিতং।
বৈদূর্য্যং বিমলং বদন্তি সুধিয়ঃ
স্বচ্ছঞ্চ তচ্ছোভনম্॥"

কিন্তু, বিদূর নামক দেশ, কিংবা বিদূর নামক পর্ব্বত, কি তদ্দেশীয় পর্ব্বতের কোন বিস্পষ্ট বিবরণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না; সুতরাং বিদূর নামক দেশ, কিংবা বিদূর নামক পর্ব্বত নহই বলিয়াই অনুভূত হয়। বিদূরজ অর্থাৎ অতিদূর দেশ-জাত এইরূপ অর্থ করিলেই ভাল হয়। বোখারা প্রভৃতি অতিদূর উত্তরখণ্ড হইতে আর্য্যাবর্ত্তে আনীত হইত এতাদৃশ অবস্থায়ীরা বৈদূর্য্য নামে উল্লেখ সেচ্ছাচারিত পায়।

সংক্ষেপ অর্থ এই যে, বৈদূর্য্য-মণি তিন প্রকার ছায়া-রুচিযুক্ত হইয়া থাকে। এক প্রকার "বেণু পলাশ" অর্থাৎ বাঁশের পাতার রঙ। দ্বিতীয় প্রকার "ময়ূরকণ্ঠের রঙ। তৃতীয় প্রকার "মার্জার" অর্থাৎ বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ। যাহা বিশদ ও স্বচ্ছ হইবে, তাহাই উত্তম। ইহার সাধারণ পরীক্ষা এই—

"ঘৃষ্টং যদাত্মনা স্বচ্ছং
স্বচ্ছায়াং নিকষাশ্মনি।
স্ফুটং প্রদর্শয়েদেত-
দ্বৈদূর্য্যং জাত্যমুচ্যতে॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

ইহার ভাবার্থ এই যে, যে বৈদূর্য্য মণি "কষ্টি" নামক প্রস্তরে ঘর্ষণ করিলে, আপনার স্বচ্ছতা বিস্তার করে, সেই বৈদূর্য্য জাত্য; তদ্ভিন্ন বিজাতীয়।

গরুড় পুরাণে এই বৈদূর্য্য-মণির বিষয় যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে, এতৎ-সম্বন্ধে প্রায় কোন জ্ঞাতব্যই জানিতে অবশিষ্ট থাকে না।

পরন্তু গরুড় পুরাণ অপেক্ষা যুক্তি-কল্পতরু নামক গ্রন্থে কিছু বিস্পষ্টরূপে এই মণির দোষ-গুণ-পরীক্ষাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আমরা ক্রমে উভয় গ্রন্থেরই লিখিত পাঠ উদ্ধৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

সূত—নৈমিষারণ্যীয় ঋষিগণকে বলিতেছেন——

"বৈদূর্য্যপুষ্পরাগাণাং
কর্কেতে ভীষ্মকে বদে।
পরীক্ষাং ব্রহ্মণা প্রোক্তং
ব্যাসেন কথিতাং দ্বিজাঃ॥"

হে দ্বিজগণ! "বৈদূর্য্য-মণি" "পুষ্পরাগ-মণি" "কর্কেত-মণি" ও "ভীষ্মক" নামক মণি-সম্বন্ধে যে পরীক্ষার বিষয় প্রথমে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন এবং ব্যাস যাহা আমাদিগকে বলিয়াছেন, আমি তাহাই বলিতেছি; শ্রবণ করুন; এইরূপ বলিয়া, ক্রমান্বয়ে যাইয়া বলিলেন——

"অবিদূরে বিদূর্য্যস্য
গিরেরুত্তুঙ্গ-রোধসঃ।
কাম-ভূতিক-সীমান-
মনুতস্যাকরোঽভবৎ॥"

বিদূর-নামক পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশের নিকটে কামভূতি নামক স্থান, তাহার আকর অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান।

"বৈদূর্য্য-রত্নমণয়ো বিবিধাব ভাসা-
স্তস্মাৎস্ফুলিঙ্গ-নিবহা ইব সম্বভূবুঃ॥"

সেই আকর হইতে, নানা প্রকার ভাস অর্থাৎ দীপ্তিযুক্ত বৈদূর্য্য-মণি সকল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ-সমূহের ন্যায় আবির্ভূত হয়।

"তেষাং প্রধানং শিখিকণ্ঠনীলং
যদ্বা ভবেদ্বেণুদল-প্রকাশম্।
চাষাগ্রপক্ষ-প্রতিমশ্রিয়ো যে-
ন তে প্রশস্তা মণি-শাস্ত্রবিদ্ভিঃ।

বৈদূর্য্য বহুপ্রকার হইলেও, ময়ূরকণ্ঠ রঙের এবং বংশ-পত্র বর্ণের বৈদূর্য্যই প্রধান বা উৎকৃষ্ট। যাহার বর্ণ "চাষ"

নামক পক্ষীর পক্ষাগ্রভাগের ন্যায়—সে মণি প্রশস্ত অর্থাৎ উত্তম নহে।

"গুণবান্ বৈদূর্য্য-মণি র্যো
জয়তি স্বামিনং বরভাগৈঃ।
দোষৈ র্যুক্ত-দোষৈ-
স্তস্মাৎ যত্নাৎ পরীক্ষেত॥"

যেহেতু, গুণ-যুক্ত বৈদূর্য্য-মণি প্রভুর সৌভাগ্য আনয়ন করে, আর দোষবান্ বৈদূর্য্য যখন দোষ আনয়ন করে, তখন যত্ন পূর্ব্বক তাহা পরীক্ষা করিবেক।

"গিরিকাচ-শিশুপাল-
কাচ-স্ফাটিকাশ্চ ভূমিনির্ভিন্নাঃ।
বৈদূর্য্য-মণেরেতে
বিজাতয়ঃ সন্নিভা সন্তি॥"

"গিরিকাচ" "শিশুপাল" "কাচ" ও "স্ফাটিক" ভূমি-নির্ভিন্ন অর্থাৎ ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন উক্ত কএক প্রকার বস্তুই বৈদূর্য্য-মণির সদৃশ ও বিজাতীয়। অর্থাৎ উক্ত মণি-বিশেষ সকল বৈদূর্য্য-মণির ন্যায় দৃশ্য-মাত্র; পরন্তু পরীক্ষায় তত্তুল্য নহে—সুতরাং তাহারা বিজাতীয়। গিরিকাচ প্রভৃতির লক্ষণ এই যে,—

"লিখ্যা ভাবাৎ কাচং
লঘুভাবাচ্ছৈশুপালকম্।
গিরিকাচমদীপ্তিত্বাৎ
স্ফাটিকং বর্ণোজ্জ্বলত্বেন।"

লিখ্যাভাব অর্থাৎ প্রমাণ-গত ক্ষুদ্রতা হেতু "কাচ" লঘুভাব অর্থাৎ ওজনে হালকা বলিয়া "শিশুপাল" দীপ্তিহীনতা হেতু "গিরি-কাচ" বর্ণের উজ্জ্বলতা থাকায় "স্ফটিক" বলিয়া জানিতে হইবেক।

"যদিন্দ্রনীলস্য মহাগুণস্য,
সুবর্ণ-সংখ্যা-কলিতস্য মূল্যম্।
তদেব বৈদূর্য্য-মণেঃ প্রদিষ্টং
পলদ্বয়োন্মাপিত-গৌরবস্য॥

এক সুবর্ণের দ্বারা যে পরিমাণ নির্দ্দোষ "ইন্দ্রনীল" মণি লাভ হয়, ওজনে দুই পল পরিমাণ বৈদূর্য্য-মণির সেই মূল্য; ইহা রত্ন-শাস্ত্রবেত্তারা বলিয়া থাকেন।

"স্নেহ-প্রভেদো লঘুতা-মৃদুত্বং
বিজাতি-লিঙ্গং খলু সার্ব্বজন্যম্।"

অন্যান্য মণির ন্যায় বৈদূর্য্য-মণিরও বিজাতি আছে। "স্নেহ প্রভেদ" অর্থাৎ লাবণ্যের ত্রুটি, "লঘুতা" অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, "মৃদুত্ব" অর্থাৎ অকঠিনতা, এই কএকটী বিজাতি-পরীক্ষার সর্ব্বজন-বিদিত চিহ্ন। অর্থাৎ এই কএকটী লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই, তাহা জাত্য মণি নহে বলিয়া জানিতে হইবেক।

"আকরান্ সমতীতানাং উদধেস্তীর-সন্নিধৌ
মূল্যমেতন্মণীনান্তু ন সর্ব্বত্র মহীতলে॥

শাস্ত্রে যে প্রকার মণি-মূল্য উক্ত হইয়াছে, আকর-স্থান অতিক্রম করিলে, সে মূল্য পৃথিবীর স্থান-সাধারণের নিমিত্ত নহে। সমুদ্র-তীরের নিকটবর্ত্তী দেশ-সমূহেই উল্লিখিত মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে।

"সুবর্ণো বহুলা যস্তু
প্রোক্তঃ ষোড়শ-মাষকঃ।
তস্য সপ্ততিতমো ভাগঃ
সংজ্ঞারূপং করিষ্যতি॥"

শাণশ্চতুর্ম্মাষাণ্যো
মাষকঃ পঞ্চকুঞ্চলঃ।
পলস্য দশমো ভাগো
ধরণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
ইতি মানবিধিঃ প্রোক্তো
রত্নানাং মূল্য-নিশ্চয়ে॥" গ, পু, ৭৩অ

মনু ১৬ মাষা পরিমাণ কাঞ্চনকে সুবর্ণ সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাহার ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ নাম উৎপাদন করে। ৪ মাষায় ১ শাণ, ৫ মাষায় কুঞ্চল, পলের দশম ভাগ ধরণ নামে উক্ত হয়। রত্ন-সকলের মূল্যাবধারণের জন্যই এই সকল পরিমাণ উক্ত হইয়াছে।

গরুড় পুরাণে এতদ্ভিন্ন আরও ২।৪টী বচন আছে। নিষ্প্রয়োজনতা বিধায় সে কএকটী পরিত্যাগ করা গেল। যুক্তি-কল্পতরু গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

"সিতঞ্চ ধূম্রসঙ্কাশং
ঈষৎকৃষ্ণমিতং ভবেৎ।
বৈদূর্য্যং নাম তদ্রত্নং
রত্নবিদ্ভিরুদাহৃতম্॥

অল্পকৃষ্ণ মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ যে মণি-বিশেষ, রত্নবেত্তৃগণ তাহাকে বৈদূর্য্য নামক রত্ন বলিয়া থাকেন।

"ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্র-
জাতিভেদাচ্চতুর্ব্বিধম্।
সিতনীলো ভবেদ্বিপ্রঃ
সিতারক্তস্তু বাহুজঃ।
পীতাদীলস্তু বৈশ্যঃ স্যাৎ
নীল এব হি শূদ্রকঃ॥"

বিদূর্য্য-মণিও জাতি-ভেদে চারি প্রকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার জাতি। যাহা "সিত-নীল" অর্থাৎ শ্বেত-কৃষ্ণ-মিশ্রিত বর্ণবান্, তাহা ব্রাহ্মণ-জাতীয়। "সিতারক্ত" অর্থাৎ ঈষৎরক্ত-মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ হইলে, তাহা ক্ষত্রিয়। "পীত-রক্ত" অল্প রক্ত মিশ্রিত পীতবর্ণ হইলে, তাহা বৈশ্য জাতীয় এবং কেবল কাল হইলে তাহা শূদ্রজাতীয় হইবেক॥

"মার্জ্জারনয়নপ্রখ্যং
রসোন-প্রতিমাং হি বা।
কলিলং নির্ম্মলং ব্যঙ্গং
বৈদূর্য্যং দেব-ভূষণম্॥

মার্জ্জার-নয়ন অর্থাৎ বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় কিংবা রসুনের বর্ণের ন্যায় এবং কলিল, নির্ম্মল ও ব্যঙ্গ-গুণ-বিশিষ্ট যে বৈদূর্য্য—তাহা দেবভূষণ অর্থাৎ দেবতারাও তাহা ভূষণার্থ ধারণ করেন। শ্লোকস্থ "কলিল" ও "ব্যঙ্গ" শব্দের অর্থ কি? তাহা বলা যাইতেছে—

"সুতরাং ঘনমত্যচ্ছং
কলিলং ব্যঙ্গমেবচ।
বৈদূর্য্যাণাং সমাখ্যাতা
এতে পঞ্চ মহাগুণাঃ॥"

"সুতরাং" "ঘন" "অত্যচ্ছ" "কলিল" ও "ব্যঙ্গ" এই পাঁচটী বৈদূর্য্য-মণির মহাগুণ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

"সুতরাং" গুণের লক্ষণ এই যে—

———"উর্দ্ধিবপ্রিব দীপ্তিং যোহসৌ সুতার ইতি গদ্যতে।"

মণি যদি দীপ্তি অর্থাৎ তেজ বমন করিতে থাকে, তবে তাহাকে "দ্যুতা" নামক মহাগুণ বলা যায়।

"ঘন" প্রভৃতি মহাগুণ কি,? তাহাও বলা যাইতেছে——

"প্রমাণতাল্পকং গুরু যৎ
ঘনমিত্যাভিধীয়তে।
কলঙ্কাদি-বিহীনং,
তদত্যাচ্ছমিতি কীর্ত্তিতম্।
ব্রহ্মা-শত্রং কলাকার-
শ্চঞ্চলো যত্র দৃশ্যতে।
কলিলং নাম তদ্রাজ্ঞঃ
সর্ব্বসম্পত্তিকারকম্।"
বিশ্লিষ্টাঙ্গন্তু বৈদূর্য্যং
ব্যঙ্গমিত্যাভিধীয়তে।"

প্রমাণে অল্প,কিন্তু পরিমাণ-গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারি; এইরূপ হইলে, তাহাকে "ঘন" গুণ বলা যায়। কলঙ্ক প্রভৃতি দোষ-রহিত হইলে, তাহা "অত্যচ্ছ" গুণ বলিয়া কথিত হয়। যাহাকে চন্দ্রকলাও ন্যায় এক প্রকার চঞ্চল পদার্থ দেখায়, তাহাই "কলিল" এবং তাহা রাজা-দিগের সম্পত্তি-দায়ক। যাহার অবয়ব বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ বিশেষরূপে সংহত, তাহা "ব্যঙ্গ"।

যেমন পাঁচটী গুণ প্রাধান্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ পাঁচটী দোষও নির্ণীত হইয়াছে। যথা——

"কর্কর়ং কর্কশং ত্রাসঃ
কলঙ্কো দেহ ইত্যপি।
এতে পঞ্চ মহাদোষা
বৈদূর্য্যাশামুদীরিতাঃ।"

মণি-শাস্ত্র-বেত্তারা কহিয়াছেন, বৈদূর্য্য-মণির পাঁচটী প্রধান দোষ আছে। "কর্কর" "কর্কশ" "ত্রাস" "কলঙ্ক" "দেহ"—এই পাঁচটী মহাদোষ এবং ইহাদের লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে। যথা——

"শর্করাযুক্তমিব যৎ
প্রতিভাতি তচ্চ কর্করম্।"

যাহা দেখিবা-মাত্র কর্করাযুক্তের ন্যায় (কাঁকর-যুক্ত) বোধ হয়, তাহাই "কর্কর" নামক দোষ।

"স্পর্শেঽপি চ যত্তজ্জ্ঞেয়ং —
কর্কশং বন্ধুনাশনম্।"

স্পর্শ করিবা-মাত্র যাহা কাঁকর-যুক্ত বলিয়া অনুভব হয়, তাহাই "কর্কশ" নামক দোষ। এই দোষ বন্ধু নাশ করিয়া থাকে।

"ভিন্ন-ভ্রান্তিকরস্ত্রাসঃ
স কুর্য্যাৎ কুল-সংক্ষয়ম্।"

যাহা দেখিবা-মাত্র ভাঙ্গা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, তাহাই "ত্রাস"-নামক দোষ-দুষ্ট বৈদূর্য্য। ত্রাস—দোষ-ধারণ-কর্ত্তার বংশ-বিনাশ করিয়া থাকে।

"বিরুদ্ধবর্ণো যস্যাঙ্কে
কলঙ্কঃ ক্ষয়কারকঃ।"

যাহার ক্রোড়ে বিজাতীয় বর্ণ লক্ষ্য হয়, তাহার সেই দোষের নাম "কলঙ্ক"। এই কলঙ্ক-দুষ্ট মণি ধারণ করিলে, বিনষ্ট হইতে হয়।

"মলবিন্দুইবাভাতি
দেহো দেহ-বিনাশকৃঃ।"

যাহা দেখিতে মল-বিন্দুর ন্যায়, তাহাও সদোষ। এই দোষকে "দেহ" দোষ বলা যায়। এই দেহ-দোষ-দুষ্ট বৈদূর্য্য শরীর ক্ষয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ রোগ জন্মায়।

গরুড় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপে বৈদূর্য্য-মণির দোষাদোষাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আমরা বৈদূর্য্য-সম্বন্ধে এতদধিক কোন পরীক্ষাদি প্রাপ্ত হই নাই। যাহা পাইয়াছি, তাহাই পাঠকগণকে উপহার দিলাম এবং প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম।

বৈদূর্য্য (Lapis lazali) পারস্য, বেলুচিস্থান, চীন, বোখারা এবং সাইবিরিয়া দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন চীনদেশে এক প্রকার নিকৃষ্ট শ্রেণীর বৈদূর্য্য পাওয়া গিয়া থাকে। অতি উৎকৃষ্ট বৈদূর্য্য ইতালীয় এবং স্পেন-দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্ম-মন্দিরের বেদির উপর সুশোভিত দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। রুসীয় জার স্কোসেলো নামক রাজ-প্রাসাদের একটী হর্ম্ম্যের ভিত্তি উত্তম বৈদূর্য্য দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। উহা দ্বিতীয় কাথারিনের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীরামদাস সেন।

ছায়া।

১

ওই ছায়া—
প্রকৃতির কোলে ওই, 'শুক্ল নিশিথিনী ছায়া
পড়েছে প্রসারি'
কৃপালুর মায়া মত মধুর গম্ভীরে ছায়া
অনন্ত বিস্তারি'!

২

কি গভীর দৃশ্য ওই—
বিপুল এ শূন্য মর্ত্ত্য বিরাজে অনন্য-কায়
উজ্জ্বল ছায়ায়,
জীবনের কূট তত্ত্ব সজীব ভাষায় যেন
ভাসি'ছে উহায়!

ছায়া তুমি!

শূন্যে শূন্য বর্ণে ভাস, অর্থহীন বোধহীন,
তোমার আভায়—
প্রাণের নিগূঢ় কথা, মর্ম্মের নিভৃত সাধ
কেমনে মিশায়!

৪

প্রাণের নিভৃত প্রাণ, গোপনে মানব যাহা
রাখে সাবধানে;
কেমনে নিরখি' তুমি অবিকল চিত্র তা'র
আঁকিলে বিমানে!

৫

বড়ই সুন্দর!

জড় হৃদয়ের এই প্রীতির পীযূষ-মাখা
মনোহর রেখা,
বড়ই মধুর ওই প্রকৃতির শূন্য হৃদে
ছায়ার আবেশ!

৬

নাহি তায়—

আশার দুরন্ত তৃষ্ণা স্মৃতির জলন্ত লেখা
স্বার্থের গরল,
শূন্য হৃদে শূন্য ছায়া, শুধুই নয়নে ভাসে
কেবলি সরল!

৭

প্রকৃতি তোমার—

নিরেট নির্ম্মম প্রাণ, এ অখ্যাতি কেন হায়!
ঘোষি'ছে মানবে?
এহ'তে হৃদয়-মাখা, এহ'তে পরাণ ঢালা
দৃশ্য কি সম্ভবে!

৮

বিশাল বিস্তৃত হৃদে, শিক্ষার অনন্ত পত্র
রেখেছ খুলিয়া,

দুর্গম জীবন-তত্ত্ব, সরল ছায়ায়, নেত্রে
ধরে'ছ আঁকিয়া !

৯

বড়ই সুন্দর !
জড় অজড়ের এই হৃদয়ে হৃদয় ঢালা
মনোহর বেশ !
প্রকৃতির বুকে ওই, প্রাণীর পরাণ-মাখা
ছায়ার আবেশ !

১০

নাহি তায়—
আশার দুরন্ত তৃষ্ণা স্মৃতির জ্বলন্ত লেখা
স্বার্থের গরল।
শূন্য হৃদে শূন্য ছায়া কেবলি নয়নে ভাবে
শুধুই সরল !

১১

তুমি ছায়া—
নর হৃদয়ের তুমি প্রাণের পরাণে লেখা
কাল ভুজঙ্গিনী
তুমিও ত শূন্য ছায়া তবে কেন মর্ম্মে তুমি
অক্ষয় লেখনী !

১২

প্রথম প্রথম—
সরসীর হৃদে ওই পৌর্ণমাসী ছায়া মত
মধুরে মিশাও,
ভূত ভবিষ্যত ঢাকি' নবীন করিয়া চিত্ত
পরাণ মাতাও।

১৩

দেখিতে দেখিতে——
গাঢ় অমাবস্যা মত, ছড়া'য়ে অনন্ত পথ
জীবন আঁধারি'
মত্ত দিগম্বরী মত, রুধিরাক্ত বেশে বক্ষে
বেড়াও বিচরি'।

১৫

এ চাতুরী কেন তব!

মায়ার লেপনী মত, নীরবে ছড়া'য়ে পড়ি'
নিভৃত অন্তরে,
মধুরে মধুরে কেন, সোহাগে না যাও মিশি'
প্রাণের ভিতরে!

১৬

দেখিলে ত ওই—

সান্ধ্য গগনের ছায়া, ভাতিল কি ভাবে ওই
সরসী-সলিলে,
মধুরে পতিত হ'য়ে, মধুরে মিশা'য়ে গেল
নিরমল জলে!

১৬

কিম্বা ওই—

তরু-মূলে দুর্ব্বাদলে আঁধারের ছায়া মত
ক্ষণেক আবরি'
অমনি করিয়া কেন অক্ষত রাখিয়া প্রাণ
নাহি যাও সরি'!

১৭

কি শিক্ষা প্রকৃতি তবে, ধরিয়া রেখে'ছ তুমি
মানব-নয়নে!
নশ্বর জগতে যদি সকলি ক্ষণিক, তবে
ছায়া কেন প্রাণে—

১৮

এতই গভীরতর এতই অনন্ত-স্থায়ী
এতই অক্ষয়
প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তে হৃদয়ের ছায়া কেন
নাহি হয় লয়?

১৯

ভৌতিক জগতে নর সহজে ভ্রান্তির বশ—
সহজে দুর্ব্বল!

হৃদয়ের অনুভূতি নিভৃত পরাণে তা'র
বড়ই সরল।

১০

এমন সরল প্রাণে কেন ছায় এ চাতুরী?
করিয়া মিশাও
অনাথ দরিদ্র নরে জীবন আঁধার করি'
কেনই কাঁদাও?

শ্রীঈঃ—

আধুনিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের প্রচলিত বিবাহ-প্রথা।

সকলেরই ইচ্ছা, আমি বড় হই, আমার দেশ বড় হউক। কেন না, তাহা হইলে আমি সুখী হইব। কিন্তু,সেই ইচ্ছা মনে উদ্ভূত হইয়া মনেই বিলীন হইলে, তাহাতে কোন ফল নাই; সেটী অলস, চঞ্চল চিত্ত মনুষ্যদিগের আকাশে মার্গ নির্ম্মাণ-মাত্র। আমার মনে যে ইচ্ছা হইল, আমি যদি প্রাণ-পণে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হই, তথাপি তাহাতে কিছু না কিছু উপকার আছে। কার্য্য করিয়া নিষ্ফল হইলেও, আমার মনও কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হয়। কেননা,সে নিষ্ফলতার কোন দোষ নাই, (যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?) তখন আমি মনকে বুঝাইতে পারি, ইহা আমার সাধ্যাতীত এবং হয়ত অচির-কাল-মধ্যে মদ্দর্শিত পথে কোন সাধু অনায়াসেই সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন। আমি অনেককে পথ দেখাইয়া দিলাম। কেহ উদ্যোগকর্ত্তা হইলে, তাহাতে যে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বলিতে পারি। যে যে বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে, তাহার জন্য তাঁহাকে সতর্ক করিতে পারি এবং যে কারণে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, তাহা বিশদরূপে দেখাইয়া দিয়া তাঁহাকে পণ্ডশ্রম হইতে রক্ষা করিতে পারি, সুতরাং আমা দ্বারা তাঁহার, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও যে কিয়ৎপরিমাণে উপকার হইবে, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন দেশকে উন্নত করিতে হইলে বিদ্যা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির ন্যায় সামাজিক

উন্নতিও প্রার্থনীয়। বিদ্যাহীন মনুষ্য যেরূপ পশুর সমান, সেইরূপ অসংস্কৃত সমাজের লোকেরাও যথার্থ মনুষ্য-নামের অধিকারী হইতে পারে না।

কোন্ দেশ কি পরিমাণে সভ্য, তাহা তাহাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার দ্বারা জানিতে পারা যায়। সামাজিক আচার-ব্যবহার অনুসারে কোন্ দেশ সভ্য-চূড়ামণি, কোন্ দেশ অর্দ্ধ-সভ্য, এবং কোন গুলিই বা নিতান্ত অসভ্য বন্য পশুর ন্যায় মনুষ্যাকৃতি জীবের আবাস-ভূমি-মাত্র ইত্যাদি বিষয় জানা যায়; সুতরাং বলা বাহুল্য যে, সামাজিক উন্নতিই দেশের ভিত্তির-স্বরূপ। সমাজ-সংস্করণ করিতে হইলে, অগ্রে বিবাহ-প্রথার সংস্করণ আবশ্যক। আমাদিগের হিন্দু-সমাজ অতি প্রাচীন; তাহাতে বহু কাল কোন প্রকার সংস্কার হয় নাই* সুতরাং জীর্ণ সংস্করণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অচিরাৎ সংস্করণকে কার্য্যে পরিণত না করিলে, সমাজের এক-কালে অধঃপতনের সম্ভাবনা। অনেকে মনে করিতে পারেন, অট্টালিকা প্রভৃতি পুরাতন হইলে, জীর্ণ সংস্করণ করিতে হয় বটে; কিন্তু সমাজ সেরূপ কোন পদার্থ নহে। সমাজের আবার জীর্ণ-সংস্করণ কি? এ প্রশ্ন নিতান্ত রহস্য-জনক। উক্ত মত যাঁহারা মনে স্থান দেন, তাঁহাদের বিশেষ ভ্রম। সমাজেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। বহু কাল সংস্করণ না হইলে, তাহা জীর্ণ হইয়া পড়ে।

আমাদের সমাজ এত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার কোন কোন অঙ্গ একেবারে ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করিয়া গঠিত করিতে হইবে। জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদন ও আধুনিক প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতির সংস্করণ আশু আরম্ভ না হইলে, সমাজের অবস্থা কি ভয়ানক শোচনীয় হইবে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন।

শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, ধনী নির্ধন সকল সমাজেই বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। জগতের আরম্ভ হইতে, এই প্রথার আরম্ভ বলিলেও বলা যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে আডাম্ এবং ইভ্ পৃথিবীর প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী। তাঁহারাও পরস্পর প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আমরা যাহাকে বিবাহ বলি, ইউরোপীয়রা (marriage) ম্যারেজ বলেন, মুসলমানেরা সাদি বলেন। জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বাক্য দ্বারা ঐ ভাব ব্যক্ত করেন। বিবাহের অর্থ কি? না, একটী পুরুষ ও একটি স্ত্রীর, যাবজ্জীবন বা কোন দীর্ঘ কালের জন্য যে ঘনিষ্ঠতর সম্মিলন, তাহাকেই আমরা বিবাহ বলিয়া গ্রহণ করি। বিবাহ এই কথা-টির ধাতু ও প্রত্যয়-গত যৌগিক অর্থ

* সম্প্রতি কিয়ৎপরিমাণে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহাকে প্রকৃতরূপ সংস্কার বলা যায় না।

কি, তাহা আমরা এক্ষণে বলিব না; স্থানান্তরে বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে দেখা যাউক যে, সামান্য স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-মাত্রে বিবাহের কি প্রকারে উৎপত্তি হইল এবং তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যই বা কি। তাহার অভাবেই বা কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

কি পশু, কি পক্ষী, কি মনুষ্য সকল জীবে সন্তানোৎপাদনের উপায়—স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ; সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একটি এরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, যাহাতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অল্প বা অধিক আসক্ত। আমাদের মতে জগৎ-স্রষ্টার আশ্চর্য্য মহিমাই ইহার কারণ। সামান্য নীচ পশুদিগের মধ্যে ঐ প্রথা কিরূপ, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, তাহা আমাদিগের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। সামান্যত দেখা গিয়া থাকে, একটী কপোত-যুগ্ম পরস্পরের প্রতি এত আসক্ত যে, একের মৃত্যু হইলে, অপরটি দুই তিন দিন আহার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে এবং কিছু কাল পরে অপর একটির সহিত মিলিত হয়। কিন্তু, পরস্পরের জীবদ্দশায় কেহই অন্য কপোত কিংবা কপোতীর সহিত মিলিত বা আসক্ত হয় না। ব্যাঘ্র প্রভৃতি অন্যান্য বন্য জন্তুরও বিষয় এই প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়। গৃহ-পালিত গো-মহিষাদি পশুর মধ্যে এই প্রথার বিলক্ষণ বৈপরীত্য। কিন্তু যাহারা স্বাধীনতা-রত্ন হারাইয়াছে, শৃঙ্খল যাহাদিগের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে, তাহাদের যে স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? পশুদিগের কথা উল্লেখ করাতে—পশুরাও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া থাকে বা বিবাহ তাহাদের স্বাভাবিক—ইহা আমরা প্রমাণ করিতে বসি নাই। স্বর্গ নরকে, ধনী দরিদ্রে, সভ্য অসভ্যে যে বিভিন্নতা, মনুষ্য ও পশুতে তদপেক্ষা সহস্র-গুণ বিভিন্নতা। মনুষ্য প্রজ্ঞাশালী, পশুজাতি উচ্চজ্ঞান-বিরহিত। অসভ্য আরণ্য মনুষ্যদিগের মধ্যেও বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে। বিবাহ-প্রথা পরিণত-মনুষ্য-বুদ্ধির একটী অমৃতময় ফল। অনেকে বিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকেন; এমন কি, বিবাহ যে সামাজিক ও মানসিক অমঙ্গলের একটি প্রধান কারণ, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে ত্রুটি করেন না। আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে বলিতে বাধ্য হইলাম, তাঁহারা আপনাপন স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ অলৌকিক ও অসার বাক্য প্রয়োগ করিয়া পবিত্র বিবাহ-প্রথাকে দূষিত করেন। পবিত্র বিবাহ-প্রথার উন্মূলনে যে কি বিষময় ফলের উৎপত্তি হয়, তাহার বিশদ প্রমাণ স্পার্টার ইতিহাস। যেখানে প্রণয়, সেখানে ভালবাসা, সেই খানেই সন্দেহ। আমার আদরের বস্তু অন্যকে ভোগ করিতে দেখিলে, দুর্ব্বল মনুষ্য-হৃদয় তাহা

সহ্য করিতে পারে না। মনুষ্যের কথা দূরে থাক্‌, জিতেন্দ্রিয় মুনি-ঋষিগণও হিন্দুদিগের সভ্য-চূড়ামণি দেবতারাও সহ্য করিতে পারেন নাই। পুরাণ তাহার শত সহস্র প্রমাণ দিতেছে। ইন্দ্র ও গৌতম অগ্নার দৃষ্টান্ত-স্থল। আমার স্নেহের সামগ্রী, আমার আদরের পালিত পক্ষী আমাপেক্ষা অন্যকে অধিক ভালবাসে, এই সামান্য সন্দেহ-মাত্র মনে উদয় হইলেও, মন শোকে, দুঃখে, ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে। বিবাহ-প্রথা এই সকল অসহনীয় বিপত্তিকর ঘটনা-সমূহের এক-মাত্র নিবারক। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুরোহিত-সমীপে গম্ভীর শপথ করা, ধর্ম্ম-মন্দিরে বর কন্যা, ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ গমন করিয়া ধর্ম্ম-যাজক-সমীপে প্রতিজ্ঞা করা প্রভৃতি সামাজিক বিবাহ-প্রথাকেই যে বিবাহ-নামে অভিহিত করিতেছি, এমন নহে। লোকালয়ে হউক, অরণ্যে হউক, জন-সাধারণ-সমক্ষে হউক; কিংবা নির্জ্জনে হউক, স্ত্রী-পুরুষের আপনাপন ইচ্ছানুসারে পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক পবিত্র আসক্তি বশতঃ যে প্রতিজ্ঞা দ্বারা আজীবন প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হওয়া, তাহাকেই যথার্থ বিবাহ বলে এবং সেই বিবাহই যথার্থ বিবাহ-নামের উপযুক্ত। বিবাহ সমাজের জীবন; বিবাহ মনুষ্যকে নব-জীবন প্রদান করে—বিবাহ মনুষ্য-জীবনের সুখের প্রধান উপাদান। বিবাহ-প্রথা ব্যতীত জগতের সৃষ্টি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কোন সমাজ চলে নাই—চলিতেও পারিবে না। সকল ধর্ম্মে, সকল ভাষায় বিবাহিতা স্ত্রীকে মানব-শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। সুতরাং বিবাহ না করিলে, মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব হইতে পারে না। বিবাহ দ্বারা দৃঢ়ীভূত পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়ের অমৃত-ময় ফল, সন্তান।

আমি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করি কেন? শুদ্ধ কি আপন সুখের নিমিত্ত? না—তাহা নহে। আমার স্ত্রী-পুত্রকে সুখে রাখিব এবং সেই সঙ্গে আপনিও সুখী হইব। সমস্ত দিন ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, স্নেহময়ী প্রেম-প্রতিমা প্রণয়িনীর মধুর বাক্য ও স্বামীর শ্রমাপনোদন-চেষ্টা এবং শিশু বালক-বালিকার অমৃতবৎ সম্ভাষণ শ্রবণ করিলে, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া মানব-মন হংস-শ্রেণীর ন্যায় সুখের তরঙ্গে ভাসিতে থাকে। পাঠক, আপনি যদি এরূপ সুখ কখন অনুভব না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনি জীবনের একটী প্রধান সুখে বঞ্চিত আছেন। তাহা হইলে, আপনি এই চিত্রের মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিবেন না।

যাহার জগতে আমার বলিবার কেহ নাই—সে হতভাগ্য দ্বারা

জগতের কোন প্রকার উপকার হইতে পারে না। যদিও কখন কখন ইহার বৈপরীত্য দেখা যায়, কিন্তু তাহা অতি বিরল। বাটী আমাদিগের শিক্ষা-গৃহ। আপনাপন স্ত্রী-পুত্রদিগকে ভালবাসিতে যত্ন করিতে করিতে, আমরা স্বজাতীয় ও জগতের নীচ প্রাণীদিগের উপর সদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষা করি। অনেকে বলিতে পারেন—স্ত্রী-পুত্রকে কেন, অন্য কাহাকেও ভাল-বাসিতে প্রথম হইতে শিক্ষা কর না! ইহার উত্তর—যে দ্রব্যটী আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি—যে দ্রব্যটী আমরা সচরাচর দেখিতে পাই এবং যে গুলির সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ আছে, সেই গুলিই আমাদের অধিক প্রীতিকর—অধিক আদরের। সেই জন্যই জন্মভূমি আমাদিগের এত প্রিয় স্থান।

আপন স্ত্রী-পুত্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমরা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাই না—একত্রে মিশিতে পারি না, সুতরাং স্নেহ তত দূর দৃঢ়ীভূত হইতে পারে না। কেহ জগতের সৃষ্টি হইতে, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সকল দেশ, সকল সমাজের অনুসন্ধান করুন, দেখিতে পাইবেন—বিবাহ-প্রথা এই মূর্ত্তিতে কি মূর্ত্ত্যন্তরে প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন যে, বিবাহ ব্যতীতও দাম্পত্য-সুখ অনুভব করিতে পারা যায়। পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল সময়েই বারা-ঙ্গনা নামে একটী অসামাজিক স্ত্রী-জাতি আছে। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কেমন সুখী—এই বিষয়ে তাঁহারা কি উত্তর পান? তাহারা সুরম্য, সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করে; অর্থ, দাস-দাসী প্রভৃতি কিছুরই তাহাদের অভাব নাই। কিন্তু তাহারা বাস্তবিক কি সুখের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে না,—দুঃখের শেষ সীমায় তাহারা আনীত হইতেছে। দুঃখ ও হতাশ্বাস তাহাদিগের নিত্য সহচর, যন্ত্রণায় তাহা-দিগের মন সদাই জর্জ্জরিত হয়। তাহারা বিবাহিত জীবনের সুখ হিংসা করে। বিবাহিত হইয়া দরিদ্র স্বামীর সহিত থাকিলে, তাহারা অপেক্ষাকৃত অনেক সুখী হইতে পারিত, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা-দিগের এইরূপ বিশ্বাস। যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন দাম্পত্য-সুখভোগ সম্ভব হয়, তবে বারাঙ্গনাগণ অসুখী কেন?

চির অবিবাহিত পুরুষও অত্যন্ত অসুখী। বালক-কালে পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া যৌবন-দশায় সমাগত হইলে, আমরা প্রায়ই সামান্য বিষয় গ্রাহ্য করি না। সে সময় ইন্দ্রিয় সকল প্রবল ও সবল থাকে; মন তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ হয়, সুতরাং কোনরূপ কষ্ট বোধ হয় না। অবিবাহিত জীবনের কষ্ট আমরা বৃদ্ধাবস্থায় সম্পূর্ণ অনুভব করি। বৃদ্ধাবস্থায় শরীরের সহিত মনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পীড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শরীর জরাগ্রস্ত হয়, মনে উৎসাহ থাকে না, তখন জীবনকে একটী দুর্ব্বহ ভার

বলিয়া বোধ হয়। এপ্রকার অবস্থায় সচরাচর অন্যের সাহায্য ব্যতীত চলিতে আমরা একান্ত অক্ষম। রুগ্ন শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, স্ত্রী-পুত্র ভিন্ন রাত্রি দিন আর কে শুশ্রূষা করিতে পারে? তাহারা ভিন্ন জরাগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ, অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধকে আর কে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে? যাহারা বিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছা করেন, এই সমস্ত চিত্র গুলি মানস-পটে অঙ্কিত করুন, দেখিতে পাইবেন—চিত্রের কি ভয়ানকত্ব! তখনই বুঝিবেন—বিবাহের আবশ্যকতা আছে কি না। বিবাহের সামাজিক আবশ্যকতার বিষয় আমরা যথেষ্ট বলিলাম; এক্ষণে বিবাহের দোষের বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব।

যেখানে সুখ, সেই খানেই দুঃখ। অবিচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ জগতে নাই, কেহ কখনও তাহা ভোগ করিতে পায় নাই। বিবাহে যেরূপ অনেক সুখের কারণ আছে, সেইরূপ নানাপ্রকার অসহনীয় দুঃখও ভোগ করিতে হয়। অর্থাভাবই বিবাহিত জীবনের দুঃখের প্রধান কারণ। স্ত্রী পুত্রের ভরণ-পোষণ, পুত্রগণের শিক্ষা-প্রদান, পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্যই ব্যয়-সাধ্য সুতরাং বিবাহ করিলেই, অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্য বিবাহ করিবার অগ্রে সকলেরই এই সমস্ত বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিয়া কার্য্য করা উচিত। অর্থহীন বিবাহিত জীবন যে কি ভয়ানক শোচনীয়, তাহা আমরা অহরহ দেখিতে পাইতেছি। কেবল আমাদিগের অপরিণামদর্শিতার জন্যই আমরা এত কষ্ট পাই। আমাদের দেশ এত দরিদ্র, তথাপি আমরা সাবধান হই না! চক্ষু থাকিতেও আমরা অন্ধ,—দেখিয়াও দেখি না। এরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়—অনেক মধ্যবিত্ত ব্যক্তি আপনাদের পুত্রাদিকে—সুশিক্ষা দূরে থাক—সামান্য শিক্ষা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে অক্ষম।

"মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী,
যেন বালো ন পাঠিতঃ।
সভা-মধ্যে ন শোভন্তে
হংস-মধ্যে বকো যথা॥"

পিতা মাতা একথা স্মরণ রাখেন না। সুরীতি-প্রবর্ত্তক সুশিক্ষার অভাবে হয়ত একটী পুত্র চৌর-বৃত্তি অবলম্বন করিল, আর একটী দুষ্ক্রিয়াসক্ত হওয়ায় কারাগারে জীবন যাপন করিতেছে। এবং আর একটী পীড়াগ্রস্ত! এদিকে পিতার অর্থ নাই! হতভাগ্য অপত্য সামান্য চিকিৎসার অভাবে অকালে শমন-সদনে গমন করিয়া অন্যান্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল। সময়ে সময়ে অনাহারেও হতভাগ্যগণকে ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিতে হয়। এখন মনে করুন দেখি, হতভাগ্য পিতামাতার কি ভয়ানক যন্ত্রণা! তাহারা প্রিয় সন্তানগণকে অতি কষ্টে প্রতিপালন করিয়াছে, আবার

তাহারাই তাহাদিগের মৃত্যুর কারণ হইল। কি ভয়ানক দৃশ্য! এইরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিয়াও, লোকে সাবধান হয় না। বিবাহ করাই যেন তাহাদিগের মানব-জন্মের মুখ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে। সকলেই মনে করে, সুখী হইব। কিন্তু সেই সুখ কয় জন লোকের ভাগ্যে সহজে ঘটিয়া থাকে? সুখ এত সুলভ নহে যে, সকলেই তাহা লাভ করিবে।

আজ কাল আমাদের বিবাহ করাই এক-মাত্র জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান করায় যে কি ভয়ানক বিপত্তির উৎপত্তি হইতেছে, তাহা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে বলিয়াছি এবং আরও কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, এপ্রকার বিবাহ-পদ্ধতির কি প্রকারে উৎপত্তি হইল, তাহাতে আর কি কি দোষ আছে এবং তাহার কি প্রকার পরিবর্ত্তন হওয়া কর্ত্তব্য।

যখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষে পদ-প্রবেশ হইয়া, সিন্ধুনদের তীরে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখনও তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাহ-রীতি প্রচলিত ছিল; কিন্তু সে সময়ে বিজিত জাতির আদিম নিবাসীদিগের সংখ্যা অধিক থাকায়, তাঁহাদের উক্ত প্রথা তত সুদৃঢ় ছিল না। আমরা মনুর সময় হইতে নীতিবদ্ধ আর্য্য-সমাজের প্রারম্ভ বলিয়া গণ্য করিব। মনুসংহিতা প্রভৃতি মনু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্রই পুরাকালীন ও আধুনিক হিন্দুসমাজের পরিচালক। মনুর নিয়ম-মাত্রই যে অভ্রান্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু মনুর বিবাহ-প্রথা যে পরিমার্জ্জিত, পরিশীত ও মানব-বুদ্ধির আদর্শ-স্বরূপ হইয়া হিন্দু সমাজের গৌরব বজায় রাখিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য-মাত্র। তিনি জাতি-ভেদ স্থাপন করিয়াও নিম্নশ্রেণীর সহিত উচ্চ শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক মতে মনুষ্য-শরীরের উন্নতি-সাধন জন্য (Inter-marriage) অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিয়া যান। তাঁহারই সুবাক্ত নিয়ম-বলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতি নীচ জাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন*। গান্ধর্ব বিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথাও তিনি অনুমোদন করেন†। সামাজিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা গান্ধর্ব্ব বিবাহ। বিবাহিত হইলেই যে, স্ত্রী-পুরুষ যাবজ্জীবন সেই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে, এমত নহে; তিনি আবশ্যক মতে তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিন্দু-সমাজের বিবাহ-প্রথা

* সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং,
প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানা
মিমাস্যুঃ ক্রমশো হবরা ঃ॥

† আর্য্যদর্শন-সম্পাদক লিখিত-শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর 'বিবাহ ও পুত্রত্ব-বিষয়ে মনুর মত' নামক পুস্তকের বিস্তারিত সমালোচন (১২৮১ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র এবং ১২৮২র বৈশাখ সংখ্যক আর্য্যদর্শন) দেখ।

যে অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণ ছিল, তাহার অধিক প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। যে আর্য্য-সমাজ জগতের আদর্শ-স্বরূপ ছিল, যাহার প্রতাপে চীন হইতে সুদূর আরব্য দেশ পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল, যাহার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উন্নতি অদ্যাপি সুসভ্যপাশ্চাত্য-সমাজের অনুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে, সেই আর্য্য-নাম আজ নাম-মাত্র-শেষ অন্তঃসলিলা ফাল্গুর ন্যায় জীবন-মাত্রাবশিষ্ট হইয়া আর্য্য-নামের অসারতা দেখাইতেছে। আমরা আর্য্যগণের অসীম গুণ-গ্রাম বিস্মৃত হইয়াছি; তাঁহাদের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সামাজিক নিয়ম, অদ্ভুত দার্শনিক উন্নতি, প্রবল প্রতাপ, সুললিত, সুপরিষ্কৃত সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি কুৎসিৎ সামাজিক তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছি। সেই সমস্ত তথ্যের মধ্যে জাতিভেদ ও আধুনিক বিবাহ-প্রথা অধিক দূষ্য ও অনিষ্টকর।

হিন্দুসমাজ-প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি দ্বারা একটী পুরুষ ও এক বা ততোধিক স্ত্রী আজীবন সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ হয়। স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকিবে, ঐ স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীকে আজীবন ভরণপোষণ করিতে বাধ্য। বিবাহিতা স্ত্রী আপন স্বামী ভিন্ন এবং বিবাহিত পুরুষ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত দাম্পত্য সুখ অনুভব করিতে পারিবেন না। বিবাহ ব্যতীত দাম্পত্য সুখ-ভোগ অসামাজিক এবং দূষ্য—এইটী সাধারণ নিয়ম; কিন্তু বঙ্গ-সমাজে তাহার বিচিত্র বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবাহ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পক্ষে অন্য কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীর সহিত দাম্পত্য সুখভোগ নিষিদ্ধ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই নিয়ম স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই কঠিন ভাবে প্রযুক্ত হয়; পুরুষের পক্ষে একপ্রকার কিছুই নহে বলিলেও বলা যায়। পুরুষ যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত দাম্পত্য-সুখ সম্ভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার তত দোষ হয় না। বিবাহের নিয়ম আজীবন কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এটীও স্ত্রীর পক্ষে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। পুরুষ লম্পট হউক, চোর হউক, স্ত্রী তাহাকে দেবতা জ্ঞান করিতে বাধ্য। কিন্তু স্ত্রীর ব্যভিচারিণী হওয়া দূরে থাক্ যদি তাহার চরিত্রের উপর সন্দেহ হইল, অমনি তাহাকে পরিত্যাগ, কারণ সে স্ত্রী-জাতি। আর ব্যভিচারিণী হইলে ত কথাই নাই সে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও যে সমাজে থাকিবে, তাহারও যো নাই। গণিকাবৃত্তিই তাহার তখন একমাত্র উপায়। এ অতি বিচিত্র নিয়ম। ব্যভিচার উভয়ের পক্ষেই সমান দোষাবহ। তবে একের প্রতি এত পীড়াপীড়ি অন্যের পক্ষে কিছুই নহে, ইহার কারণ কি? ইহাপেক্ষা অধিক

হাস্য-জনক ও পক্ষপাতী নিয়ম আর কি হইতে পারে? স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে, পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিলেন; কিন্তু পরিত্যক্তা রমণীর যে কি উপায় হইবে, সমাজ এক বার তাহা ভাবিল না। এ কথায় চক্ষু তুলিয়া দেখিল না। পরিত্যক্তা রমণী নিরাশ্রয়া বার-বিলাসিনী। কিন্তু পুরুষ যদি ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে স্ত্রী সেই পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে পারে না কেন? কই সমাজ লম্পট পুরুষকে কি দণ্ড দেন? হতভাগ্যের বিবাহিতা স্ত্রী যে রাত্রি দিন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, নির্দ্দোষী অবলার চক্ষু-জলে যে ধরাতল প্লাবিত হইতেছে, সমাজ তাহার কি উপায় করিলেন? দাম্পত্য-সুখ কি সে জীবনের মত বিসর্জ্জন দিবে? তাহার দুঃখ কি দুঃখ নহে? এই কি সভ্য-সমাজের সুবিচার! এই কি সভ্যতার আদর্শ! অসহায়ের উৎপীড়ন করা কি জগতের নিয়ম? কই সভ্য পাশ্চাত্য ইউরোপ, আমেরিকায়ও ত এ নিয়ম নাই। তথাকার মহিলাগণ ত এত উৎপীড়িত হন না। তাঁহারা ত দাসীর ন্যায় পুরুষের সামান্য ভোগ্য বস্তু নহেন। পুরুষও মনুষ্য, স্ত্রীজাতিও মনুষ্য। আমাদের স্ত্রী-জাতি কি মানুষী নহেন! ইঁহারা কি পুরুষের উপভোগ্য সামান্য পশুজাতি-মাত্র? কেন ইঁহারাও ত মনুষ্যাকৃতি। ইঁহাদেরও ত মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধি-বৃত্তি আছে। তবে ইঁহাদিগের এত দুর্নাম কেন? কারণ, স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল। যদি দুর্ব্বল বলিয়া আমরা স্ত্রীজাতিকে দাসী করিয়া রাখিতে কুণ্ঠিত না হই, যদি স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল বলিয়া, আমরা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে সঙ্কুচিত না হই, তাহা হইলে বঙ্গবাসিগণ! তোমরা বিজেতা মুসলমান ও ইংরাজদিগকে কেন দোষ দাও? তাঁহারা তোমাদিগ অপেক্ষা কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন? তাঁহারা তোমাদিগ অপেক্ষা সহস্রগুণে উন্নত। কেন না, তাঁহারা তোমাদিগকে সামান্য পশুর ন্যায় জ্ঞান করেন না। তাঁহারা তোমাদিগের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করেন। তবে তোমরা কেন স্ত্রীজাতির প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে না? তোমাদের যদি সভ্য-নামের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা যায়, তোমাদিগের যদি যথার্থ দাম্পত্য-সুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা থাকে, তোমরা যদি নাম-মাত্রাবশিষ্ট আর্য্য-জাতির উন্নতি সাধন করিতে চাও, তাহা হইলে, স্ত্রীজাতিকে দাসত্ব হইতে মুক্ত কর—স্ত্রী-জাতিকে কিছু স্বাধীনতা দাও। স্ত্রী-জাতির উন্নতি না হইলে, তোমরা উন্নত হইতে পারিবে না। তোমরা যতই কেন চেষ্টা কর না, স্ত্রীজাতি অবনত থাকিতে, তোমাদিগকে কদাচ অগ্রসর হইতে দিবে না।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কোন একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের ভবিষ্য-পুরুষদিগকে

উন্নত করিতে হইলে, কোন্ প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। তাঁহাতে তিনি এই উত্তর দেন যে, ফ্রেঞ্চদিগের মাতৃগণকে সুশিক্ষা দেওয়াই একমাত্র উপায়। বিবাহতত্ত্ব উল্লেখ করিতে করিতে, প্রসঙ্গত স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে কিছু আলোচিত হইল। সম্প্রতি পুনশ্চ মূল বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বিবাহ কথাটি এত সামান্য যে, উচ্চারণ করিতেও কোন কষ্ট নাই। শুনিতে তিনটি অক্ষর-মাত্র। কথাটি যেমন ক্ষুদ্র, কার্য্যেও আমরা সেইরূপ সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকি। কি আশ্চর্য্য! বিবাহ যে গুরুতর বিষয়, বাঙ্গালীরা তাহা অদ্যাপি বুঝিতে পারিল না। তাহারা মনে ধারণাও করিতে পারে না যে, বিবাহ এই সামান্য কথাটিতে কত গুরুত্ব, কত দায়িত্ব, কত মহৎ-ভাব ও গুরুভার বিন্যস্ত আছে। কোথায় গুরুভার, আর কোথায় ক্রীড়া? বালক-বালিকারা আপনাপন পুত্তলিকা লইয়া যখন ক্রীড়া করে, তখন তাহারা একের পুরুষ পুতুলের সহিত অপরের স্ত্রী পুত্তলিকার কাল্পনিক বিবাহ দেয়। আমরা তাহা দেখিয়া, না হাসিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু পাঠক! আপনি ভাবিয়া দেখুন, বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের বিবাহ-প্রথার সহিত বালক-বালিকাদিগের ক্রীড়া-বিবাহের কিছু পার্থক্য আছে কি না। স্থূল-দৃষ্টিতে দেখিলে, কোনই পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র বিভেদ, শিশু কুমার-কুমারীগণ বর কন্যাধ্যক্ষ এবং ইহারা বয়ঃ-প্রাপ্ত বা বৃদ্ধ; শিশুদিগের পাত্র ও পাত্রী অচেতন মৃণ্ময়, দারুময় বা ধাতুময় কোন মনুষ্যাকৃতি পদার্থমাত্র এবং ইহাঁদের বর কন্যা সজীব পদার্থ। অনেক সময়ে উভয়ই প্রায় জ্ঞান-শূন্য। কিন্তু স্থল-বিশেষে বাঙ্গালী-পাত্রের জ্ঞান থাকে। বালক-বালিকাদের ক্রীড়া-বিবাহ নির্দ্দোষ; কিন্তু বঙ্গীয় বিবাহ নানা প্রকার অসহনীয় বিপত্তির মূল। এখন দেখা গেল, মূলত পার্থক্য অতি সামান্য। আমাদিগের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—যদি কেহ আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে অমনোযোগী হয়, তাহা হইলে তাহাকে তিরস্কার করিবার জন্য বলিয়া থাকে—"যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়সির ঘুম নেই।" যদিও কথাটি ব্যঙ্গ করিয়া বলা হয়, কিন্তু বাঙ্গালীদের বিবাহের সময় বস্তুতই যাহার বিবাহ হইবে, তাহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না। যুবক! আপনি আজ শুনিলেন যে, আপনার বিবাহ হইবে। আপনি বিবাহ করিয়া দাম্পত্য-নিয়মাবলি প্রতিপালন করিতে পারুন, আর নাই পারুন, ভবিষ্যতে আপনার স্ত্রী-পুত্রদিগকে ভরণ-পোষণের ক্ষমতা থাক্ বা নাই থাক্, আপনার স্ত্রী আপনার মনোনীত হউন, আর নাই হউক, আর আপনি আপনার ভবিষ্য পত্নীর উপযুক্ত হউন বা নাই হউন, আপনার কর্ত্তৃপক্ষীয়ের ইচ্ছা

হইয়াছে, আপনি বিবাহ করেন। কন্যা স্থির হইল। আপনি কেবল শ্রবণ করিলেন যে, অমুক দিন অমুক স্থানে অমুকের বাটীতে আপনার বিবাহ হইবে। হয়ত ইহাও শুনিলেন যে, মেয়েটী মন্দ নয়, কিংবা ভাল। যদি পাত্রীটি নিতান্ত কুরূপা হয়, তাহা হইলে শুনিতে পাইলেন, মেয়েটি তত ভাল নহে; তবে আহামরিও নয়, কিন্তু ছিছিও নয়। আপনার ভবিষ্য-পত্নীও এই প্রকার শুনিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যা পরস্পরের চির-সহচরের এই পর্য্যন্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইল। বিবাহের দিন উপস্থিত—উভয় বাটীতেই মহা আনন্দ। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবগণ অনেকেই বাটীতে আসিয়াছেন। উভয় বাটীই মহোৎসবে ভাসিতেছে। রাত্রিতে বর-কন্যা যথাকালে বিবাহ-স্থলে উপস্থিত হইল। সে সময় তাহাদের মনে কি ভয়ানক চিন্তা-তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে, তাহা বিবাহিত-বর্গের মধ্যে অনেকেই বিশেষ-রূপ অনুভব করিয়াছেন। উভয়েই পরস্পরকে দেখিবার জন্য উৎসুক। তাহারা অদ্য অভেদ্য-বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল; কিন্তু জীবন-সহচর কি প্রকার লোক জানা দূরে থাক্, অবয়ব পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না। এক মুহূর্ত্ত পরে হয় অপার আনন্দে ভাসমান হইবে, না হয় একেবারে ইহ জীবনের মত সুখাশা বিসর্জন দিবে। পরক্ষণেই শুভ-দৃষ্টির সময় উপস্থিত। সেই সময় উভয়েই কিয়ৎপরিমাণে পরস্পরের আকৃতি দেখিতে পাইল। শুভদৃষ্টি অনেকের পক্ষেই অশুভ দৃষ্টিতে পরিণত হয়। জগতে অভাগার সুখের শেষ হইল; কিন্তু দুঃখের শেষ কোথায়? মৃত্যুই তখন তাহার একমাত্র আশ্রয়। এ প্রকার বিবাহ-প্রথাকে অদ্ভুত রহস্য ভিন্ন আর কি বলিব? এই জন্যই আমার বলিতেছি, ইহা বালকের ক্রীড়াপেক্ষা সহস্রগুণ নীচ ও ঘৃণাকর। প্রচলিত বিবাহ-প্রথায় যে বঙ্গ-সমাজের কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বাক্যাতীত। কত হতভাগ্য যে জীবনের সুখাশা পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিতেছে, তাহার সংখ্যা কে গণনা করিতে পারে? কত কৃতবিদ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রত্ন, সুখাশায় হতাশ হইয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িতেছেন, তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য। হতভাগ্য নিষ্ঠুর বঙ্গ-সমাজ! তোর কত শত উন্নত-চরিত্রা ধর্ম্ম-পরায়ণা রমণী-রত্ন আজি রোদন করিয়া অমূল্য জীবন ক্ষয়িত করিতেছেন! সে রোদন কেহ দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শোনে না। যদি আমরা জাতিস্মর হইতাম, তাহা হইলে কি এই নিষ্ঠুর, হৃদয়-শূন্য অসার বঙ্গ-সমাজে জন্মগ্রহণ করিতাম?

যে সমাজের লোকে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে পারে, যে সমাজে বর-কন্যার জীবন-সহচর-নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা আছে, যে সমাজে স্ত্রীজাতি দাসীর

ন্যায় পুরুষের সামান্য ভোগ্য বস্তু নহে, যে সমাজে দাম্পত্য-প্রণয় একটি অমূল্য-রত্ন-স্বরূপ আদৃত হয়, সেখানেও—সেই সুসভ্য পাশ্চাত্য-সমাজেও—ভ্রম-বশত অনেক সময় অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতী-দিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, বিজ্ঞবর মহাকবি মিলটনও এই যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারেন নাই।

পাঠক! বিবেচনা করিয়া দেখুন, সেই পরিমাণে আমাদের সমাজে কত লোক অসহ্য যন্ত্রণা আজীবন সহ্য করিতেছে। পাশ্চাত্য-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রণয়ের অভাব হইলে, তাহারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য স্বামী ও স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের সে উপায় কোথায়? আমাদের যন্ত্রণা, জীবনের চির-সহচর। বিবেচনা না করিয়া, বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজীবন প্রণয় রক্ষা করিব। কিন্তু প্রণয়রক্ষা কি প্রতিজ্ঞার কাজ? যে কোমল বস্তু সামান্য উত্তাপে বিগলিত হয়, সামান্য বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তাহা কি কখন বলপূর্ব্বক রক্ষিত হইতে পারে? বিবাহের অখণ্ডনীয়ত্ব এবং অপরিচিতের সহিত বিবাহ, বঙ্গীয় বিবাহের এই দুই প্রধান কলঙ্কই এই অসংখ্য অসহনীয় যন্ত্রণার মূল। অনেকে বোধ হয়, দেখিয়া থাকিবেন (অন্তত শুনিয়াও থাকিবেন) অনেক স্বামী স্ত্রীকে সময়ে সময়ে ভয়ানক প্রহার করে। অনেক স্থলে সেই প্রহারের পরিণাম স্ত্রী-হত্যায় পর্য্যবসিত হয়। যে ঘৃণিত প্রথা দুই জন অপরিচিত ও অজ্ঞাত-স্বভাব মনুষ্যকে আজীবন অবিচ্ছেদ্য ভাবে বাঁধিয়া রাখে, সে নিয়ম যে, অশেষ বিপত্তির আকর হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই! যেখানে কোমল প্রণয়-সূত্রের বন্ধন আবশ্যক, সে স্থলে কঠিন, কর্কশ, দুর্ভেদ্য সামাজিক বল-প্রয়োগ! ইহা হইতে মনুষ্যের স্বাধীনতার প্রতি তাচ্ছিল্য এবং পবিত্র প্রণয়কে আর কি প্রকারে অশ্রদ্ধা করা যাইতে পারে, আমরা অবগত নহি। উঃ কি ভয়ানক প্রথা! যে দম্পতীর মধ্যে পবিত্র প্রণয়ের পরিবর্ত্তে প্রবল ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়াছে, যাহারা প্রণয়ী না হইয়া, পরস্পরের সাংঘাতিক শত্রু হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ! সমাজের কি শোচনীয় অবস্থা! এরূপ অবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই একের কিংবা দুই জনেরই প্রাণ-হানি হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের যে সন্তান-সন্ততি জন্মায়, তাহাদিগের স্বভাবও আশৈশব বিকৃত-ভাবাপন্ন হয়। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গলের জন্য দম্পতীর পার্থক্য সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। সভ্য পাশ্চাত্য-সমাজ ইউরোপ ও আমেরিকায় এ নিয়ম প্রচলিত আছে। বঙ্গ-সমাজেও যে এ নিয়ম প্রচলিত হইলে, অশেষ মঙ্গলের কারণ হইবে, তাহাতে কিছু-মাত্রও সন্দেহ নাই।

অসাময়িক বিবাহ বঙ্গীয় সমাজের তৃতীয় দোষ। বিবাহের মৌলিক অর্থ কি?—বিশেষ-রূপে বহন করা, অর্থাৎ আমি যাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলাম, তাহাকে যাবজ্জীবন বিশেষ যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিব, তাহার প্রয়োজনীয় তাবৎ অভাব মোচনে সচেষ্ট থাকিব, এবং দাম্পত্য-প্রণয়-তরু-জাত সন্তান-কুসুম-কলিকাবলির ভরণ-পোষণ ও উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিব। বিবাহ করিবার সময় পরিবার-প্রতিপালনের ক্ষমতা না থাকিলেও, বিবাহ করাকে অসাময়িক বিবাহ নির্দ্দেশ করা যায়। আমাদিগের অধিকাংশ বিবাহই এই শ্রেণীভুক্ত। বাল্য-বিবাহও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বাল্যোদ্বাহ-বিষয়ে স্থানান্তরে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

এক দিন কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ কালেজের সুযোগ্য অধ্যাপক মহাশয় কৌতূহল-বশতই হউক কিংবা কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই বা হউক, প্রথম বর্ষীয় ছাত্রদিগের (First year students) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই শ্রেণীর কত জন অবিবাহিত। এই প্রশ্ন প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে (আমি তখন সেই শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম) আমি লজ্জিত ভাবে বলিলাম, আমি বিবাহিত। কিন্তু পর ক্ষণেই দেখিলাম, আমার লজ্জার কোন কারণ নাই। কারণ, আমাদিগের শ্রেণীতে ২৫ জন বালকের মধ্যে ১ জন-মাত্র অবিবাহিত, সুতরাং আর সকলেই আমার দলে। তখন আমাদিগের বয়ঃক্রম ১৭ কি ১৮ বৎসরের অধিক হইবে না। বলা বাহুল্য, অধ্যাপকমহোদয় ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া এদেশের প্রাকৃতিক নিয়ম-রক্ষার বিলক্ষণ সন্তোষজনক পরিচয় পাইলেন।

পুত্রের ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম না হইতেই, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, পুত্রকে শীঘ্রই গৃহস্থ এবং স্থায়ী করা আবশ্যক, অতএব আর বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না। সে লেখা পড়া না শিখিল, তাহাতে ক্ষতি কি? ভবিষ্যতে স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণে সক্ষম হইল না, তাহাতেও আপত্তি নাই! কিন্তু বিবাহ দেওয়া চাই। বিবাহ হইতে না হইতেই একটী, ক্রমশ দুইটী তিনটী ইত্যাদি ক্রমে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া হতভাগা যুবককে অসময়ে সংসারে প্রবিষ্ট করিল এবং যে পিতা মাতা আদর করিয়া বহু যত্নে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিতই পুত্র ও পুত্রবধূর কলহ আরম্ভ হইল। তখন উভয় পক্ষই প্রায় সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দেন। ইহার বিশেষ বিবরণ আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। যেহেতু, এ শ্রেণীতে বঙ্গীয় সমাজের অধিকাংশই ভুক্তভোগী।

যাঁহারা স্বীয় কর্ত্তৃপক্ষের অভাব প্রযুক্ত অপেক্ষাকৃত বয়ঃস্থ হইয়া বিবাহ করেন, তাঁহারাও প্রায় পরিবার প্রতি-পালনের ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া,

এই গুরুতর ভার গ্রহণ করেন। অতি অল্প কাল-মধ্যেই তাঁহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অদূরদর্শিত্বের বিষময় ফল উৎপন্ন হয়।' তাঁহারা অচিরাৎ পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, পুন্নাম নরক-যন্ত্রণার ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। বর্ষে বর্ষে একটী একটী নরকত্রাতা তাঁহাদের কুল পবিত্র ও গৃহ আলোকিত করিয়া ফেলেন। নরকত্রাতারা তখন নরক-নির্ম্মাতা হইলেন। তাঁহারা হতভাগ্যের জন্য ইহ লোকেই অপূর্ব্ব নরক রচনা করিল। হতভাগ্য বঙ্গ-যুবক! 'পুৎ' নরক দূরবর্ত্তী, সে নরকে জীবিত মনুষ্য গমন করে না; সুতরাং জীবিতাবস্থায় তোমাকেও সেখানে যাইতে হইত না। এক্ষণে নরকত্রাতাদিগের কৃপায় জীবিতাবস্থাতেই তদপেক্ষা সহস্র গুণ ভীষণ নরক-যন্ত্রণায় তুমি অহরহ দগ্ধ হইতেছ। এখন পুন্নরক তাহার পক্ষে অদৃশ্য স্বর্গ। কোন প্রকারে সেখানে গমন করিতে পারিলে, সে সমগ্র যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করে এবং জগদীশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। পাঠক, আপনি চক্ষু তুলিয়া একবার-মাত্র দেখুন, দেখিতে পাইবেন, আপনার চতুর্দ্দিকে (অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না) অসংখ্য হতভাগ্য প্রাণী এই অসহ্য নরক-যন্ত্রণায় অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া, জীবন-ভার বহন করিতেছে। হতভাগ্যের কোন সন্তানটী পীড়াক্রান্ত হইয়া, ঔষধাভাবে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইল। আর একটী পুত্র অর্থাভাবে মূর্খ হইয়া আত্মীয় বন্ধুগণের গলগ্রহ হইল, কোনটী সাংসারিক কার্য্যের উন্নতি-কারণে, হতাশ্বাস হইয়া সামান্য উদর-পূর্ত্তির জন্য ঘৃণিত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। দুর্ভাগ্য পিতা মাতা এই প্রকারে দগ্ধ হইয়া অবশেষে অসময়ে মৃত্যুর কোমলাঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউঃ—

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

আমরা অদ্য একটী সাধক মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইলাম। ইঁহার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। বঙ্গদেশে একদিন এ বিষয়ে কেবল রামপ্রসাদই আদর পাইয়া আসিতেছিলেন; অন্য কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। আমরা যতই বঙ্গীয় প্রাচীন শাস্ত্র অনুসন্ধান করিতেছি, ততই নূতন নূতন মহাপুরুষ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের লক্ষ্য-স্থানীয় হইতেছেন—আমরা ততই নব নব কবি দেখিতে পাইতেছি।

কবি কথাটী কি মনোহর! শব্দটী

আমাদের মনোরম মানসক্ষেত্রে সমুদিত হইলেই, আমরা কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করি! কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, মিল্টন, গেটি প্রভৃতি মহাত্মাগণের নাম আমাদের স্মৃতিপটে সমুদিত হইলেই, আনন্দে আমাদের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়; তাঁহাদিগকে আমাদের অন্তরের অন্তরতম কুটুম্ব বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাঁহারা কোথায়? সকলেই অনন্ত কালের সুন্দর-প্রাসাদস্থিত সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত। করাল কালের কঠোর শাসন প্রতিবিধান করিতে, কেহই সমর্থ নহেন; তবে কবিগণ কি প্রকারে তাহাতে সমর্থ হইবেন? কিন্তু কাল না হয় তাঁহাদের দেহই ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা বলিয়া কি তাঁহাদের দর্শন-লাভ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছে? কখনই নয়। আমরা শয়নে—স্বপনে—জাগ্রতে দিবানিশিই তাঁহাদের মনোহর বাক্য-বিন্যাসে প্রীতি লাভ করি; সততই তাঁহাদের সহিত মধুরালাপ করিয়া থাকি। কালিদাস কত কাল পূর্ব্বে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনন্ত শয্যায় শায়িত হইবার পর, কত প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে! কত প্রলয় হইয়াছে—কত লোক আসিয়াছে, আবার গিয়াছে; কিন্তু শকুন্তলা! তুমি এক বার-মাত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, অদ্যাপিও জীবিতা! আরও কত কাল এই রূপ থাকিবে, তাহার ইয়ত্তা কি? এ অমরত্ব কোথা হইতে আসিল? এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর সংসারে এ স্বর্গীয় ভাব কোথা হইতে সমুদিত হইল? বুঝিয়াছি—ইহা বীণাপাণির অতুলা প্রসাদ, বাগ্দেবীর সুধাসিক্তি অমূল্য বরদান। এই প্রসাদ-কণা-লাভে যিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনিই ধন্য—তিনিই জগজ্জন-পূজিত—তিনিই সকলের আদরের ধন! তিনি জগৎপূজিত 'কবি' নামে আখ্যাত; তাঁহার রচনা "কাব্য" নামে অভিহিত। এই অভিধান সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যদি তাহা হইত, তবে ইহার এত আদর হইত না। তত্রাপি প্রায় সকলেই এই সুধাসম আখ্যা প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত। সকলেই মনে মনে আপনাকে কবি বলিয়া জ্ঞান করেন; এই জন্যই বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে আমরা কবি-নাম-ধারী অনেককেই দেখিতে পাই। ছুটে ছুটে দুই একটা শব্দের মিলন করিতে পারিলেই, অনেকে আমাদের দেশে কবির মান্য পাইয়া থাকেন; কেহ লিখিলেন "তুমি কে," কেহ লিখিলেন, "বউ কথা কও," কেহ লিখিলেন "তুমি কি বল,"। ইহারা সকলেই কবি বলিয়া আখ্যাত হইলেন। সুতরাং বঙ্গদেশে কবি বড় শস্তা, এত আর কিছুই নয়। চক্ষুর সমক্ষে যে কিছু দ্রব্য পতিত হয়, বঙ্গদেশে সে সকলই মহার্ঘ্য—শস্তা কেবল কবি। একটি কবি বহু শতাব্দীর পুণ্যের ফল। শত শত বৎসর ব্যবধানে এক একটী

কালিদাস, সেক্ষপীয়র, বায়রন্, গেটি ও কবিকঙ্কণ জন্মে; কিন্তু বঙ্গদেশে তাহার বিপরীত। প্রতিদিনই আমরা নূতন নূতন কবি দেখিতে পাই। যাহা হউক, আনন্দের বিষয় এত দিনে বঙ্গবাসী যথার্থ কবির মর্য্যাদা বুঝিতেছেন। যে কেহ কবি বলিয়া পার পাইয়া যাইতে পারেন না। এটি অবশ্য বঙ্গভাষার উন্নতির পরিচায়ক।

এক্ষণে দেখা যাউক, কত দিন হইতে লোকে এই কাব্যের রসগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। আমরা যে কোন সমাজ বা যে কোন সাহিত্য পর্য্যালোচনা করি না, তাহাতেই কবিগণ প্রথম আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকেন। ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত যে, সমাজ প্রথমত সদ্য-মথিত নবনীতবৎ কোমল থাকে; তখন যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকেই তাহাকে ফিরান'যায়। বিশেষত তখন তাহা কোন প্রকার কঠিন বস্তুর প্রতিঘাত সহ্য করিতে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ। যখন সমাজ কোন প্রকার কঠিন বস্তুর প্রতিঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ, তখন যে সকল লোক লইয়া সেই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল লোকও দুরূহ ভার-বহনে সর্ব্বপ্রকারে অক্ষম। সহজ সহজ ভার-বহনে অপেক্ষাকৃত সবল হইলে, ক্রমশ উচ্চতর ভার-বহনে সমর্থ হইবে। ভাব, চিন্তা ও যুক্তি এই তিনটী স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহারা এক বারে মনুষ্য-মনে কখনই উদিত হইতে পারে না; অথচ এই তিনটীই পরস্পর-সাপেক্ষ। একের উৎপত্তি হইলে, অপর গুলির উৎপত্তি স্বতঃসিদ্ধ। প্রথমে ভাব, তৎপরে চিন্তা ও পরিশেষে যুক্তি দ্বারা তাহার মীমাংসা। মানব-মনে স্বতঃই ভাবের উদয় হইয়া থাকে। মনুষ্য আপনার চতুর্দ্দিকে যে সকল পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে, ভাব তাহা হইতেই তাহার মনে অলক্ষিত ভাবে সমুদিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি দেবী সততই ভাব-প্রদানে মুক্ত-হস্তা। নিদাঘীয় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণের পর স্নিগ্ধকর সুখসেব্য সায়ং-সমীরণ—গগনে মনোমুগ্ধকর চন্দ্রমা-কান্তি;—তামসী নিশায় শুক্রতারা—নিকটে গগনস্পর্শী অদ্রিমালা—বহুদূর-বিস্তৃতা অরণ্যানী;—কল কল নিনাদিত মনোহর উপত্যকা—রজত-কান্তি, কুল-কুল-নিনাদিনী নির্ঝরিণী প্রভৃতি সম্মুখে—পশ্চাতে—পার্শ্বদেশে যাহাই দেখি না, তৎসমুদায়ই ভাবদ্যোতক; সুতরাং মানব মন যে, প্রথমেই ভাবে পরিপূর্ণ হইবেক, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এদিকে প্রাথমিক সমাজ নবনীতবৎ কোমল; সুতরাং এই সকল ভাব লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই সকলেই মন এরূপ পরিপূর্ণ হয় যে, অন্য কিছুই আর মনে স্থান অধিকার করিতে পারে না। কেন না, সেই সমাজস্থ সকল লোকের মনও তখন কোমল—অধিক ভার-বহনে অসমর্থ। মনে কর, কোন লোক পূর্ণ

চন্দ্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন, তিনি তাহার অভ্যন্তরে কলঙ্ক-রেখা দেখিবার অগ্রেই চন্দ্রের মনোহর রজতচ্ছটা দেখিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিবেন; এবং তাহাতেই তাঁহার মন এত দূর প্রীত হইবে যে; সেই কলঙ্ক-রেখা হয়ত তখন তাঁহার চক্ষুর অধিকারেও আসিবে না। সেইরূপ প্রাথমিক সমাজ মনোহর ও আশ্চর্য্য পদার্থ-নিচয়-সন্দর্শনেই যথেষ্ট পরিতোষ লাভ করিত—তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা হইত না—কিংবা তখন তাহাদের সে ক্ষমতাও থাকে না। ক্রমে সমাজ বদ্ধমূল ও সবল হইয়া আসিলে শনৈ শনৈ সে ক্ষমতা জন্মে; তখন কলঙ্ক-রেখা দেখিতে পাওয়া যায়—এবং তাহা কি? কি প্রকারেই চন্দ্রে সেরূপ হইল? এই সকল জানিবার নিমিত্ত মন ব্যগ্র হয়—সুতরাং চিন্তা—পরে যুক্তি দ্বারা তাহার মীমাংসা হয়। কাজেই সমাজে প্রথমে ভাব-সম্পন্ন কাব্যের সৃষ্টি—পরে চিন্তা ও যুক্তি-পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের সৃষ্টি-সাধন হয়। যে সমাজ, বিজ্ঞানালোচনা করিতে শিখিয়াছে, সে সমাজ অনেক উন্নত হইয়াছে—তাহা আর প্রাথমিক অসম্পূর্ণ সমাজ নহে। আমরা যে কোন সাহিত্য পর্য্যালোচনা করি না, তাহাতেই দেখি—প্রথমে কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয়, সৃষ্টির প্রথমে ভাষা সৃষ্ট হওয়ারও অনেক পূর্ব্বে কবির জন্ম। যখন মানব-মন নানাপ্রকার ভাবাক্রান্ত থাকে, তখন তিনি সুরাপায়ীর ন্যায় মত্ত। কি ব্যবহার করেন,—তাহার স্থিরতা থাকে না—হয়ত এমন শব্দ প্রয়োগ করিলেন, যাহা ভাষা কখন স্বপ্নেও অনুভব করে নাই,—তাঁহার বাক্য হয়ত সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু, ইহা বলিয়া তাহা কর্কশ নহে—প্রত্যুত মধুরতা-পূর্ণ। শুনিলে, শরীর মন পুলকিত হয়। তিনি যে একই প্রকার স্বর ব্যবহার করিবেন, তাহারই বা স্থিরতা কি? যখন যে স্বর তাঁহার মনঃপূত হইল, তিনি তখন সেই স্বরই ব্যবহার করিলেন। কাহার সাধ্য তাহার প্রতিরোধ করে? যে সময় কবি জন্মগ্রহণ করেন, ব্যাকরণ বা অলঙ্কার-শাস্ত্র তখন শৈশব-দোলায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। ইহারা সেই ঘোর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া দেখেন। কবিগণ তাঁহাদের পাদ-বিক্ষেপের জন্য বহু-কাল পূর্ব্বেই পদ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এই পরিত্যক্ত পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়াই, তাঁহাদের গতি। অন্যথা অচল—নড়িবার সাধ্য নাই। কবি কোন নিয়মের অধীন নহেন। তিনি স্বাধীন—আপনার স্বাধীন নিয়মেই পরিচালিত। সে স্বাধীনতা কর্কশময় নহে—মধুর। ব্যাকরণ বা অলঙ্কার-শাস্ত্র সে মাধুর্য্য-প্রদানে কখনই সমর্থ নহে। কবিই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের উপাদান যোগাইয়া থাকেন।

এক্ষণে একটি প্রশ্ন সহসা মনোমধ্যে

উদিত হইতেছে, তাবোন্মত্ত মানব-রসনা হইতে যাহা প্রথম স্ফুরিত হয়, তাহা কবিতা না গীতিকা? আমাদের মতে গীতিই প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কেন না চতুর্দ্দিকস্থ মনোহর পদার্থ-নিচয়-সন্দর্শনে মনুষ্য তাহাদের প্রশংসা করিবার নিমিত্ত স্বর নিঃসরণ করিতে পারেন এবং তাহাই গীতিকা। সাহিত্য আলোচনা করিলে, আমরা ইহাই দেখিতে পাই। অতুলিত সংস্কৃত-সাহিত্য-ভাণ্ডারে জগজ্জন-পূজিত বেদ, সুদীন বঙ্গীয় সাহিত্যে কলকণ্ঠী বিদ্যাপতির সুমধুর ঝঙ্কার, প্রভৃতি যে কোন সাহিত্যই পর্য্যালোচন করি না, তাহাতেই অগ্রে গীতি রচনা দেখিতে পাই। এ পর্য্যন্ত যত দূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমাদের বেদই সর্ব্বপ্রাচীন মানব-প্রসূত গ্রন্থ। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন কোন গ্রন্থ কোন সাহিত্যেই নাই। এই জন্যই ইহা জগজ্জন-সেবিত, সকলের পূজার বস্তু—সকলেরই আদরের সামগ্রী।

যে স্থলে প্রকৃতি-দেবীর রমণীয়তা যত অধিক, সেই স্থলেই কবিতার মধুর উচ্ছ্বাস তত বলবান্। ভারতবর্ষ—প্রকৃতি-দেবীর বিলাস-কানন—সাধের আনন্দ-ভবন। ইহা বীণাপাণির অপরূপ, সুন্দর কেলিকুঞ্জ। আবার বঙ্গদেশে সেই বিলাস-কানন-স্থিত, মনোহর লতা-কেতন, প্রমোদ-ভবন-স্থিত, সুন্দর পর্য্যঙ্ক; সুতরাং বাগ্দেবী ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই জন্যই আমরা বঙ্গদেশে অনেক স্বভাব-কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি। আমরা পূর্ব্বকালীন যত গ্রন্থকার দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ই কবি—পদ্য-গ্রন্থকার নাই বলিলেই চলে। ইহার একটি মাত্র কারণ। পদ্যে মন যত আকৃষ্ট হয়, গদ্য-রচনায় তত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, যৎকালে লিখন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তখন মানবকে সমুদায় স্মরণ করিয়া রাখিতে হইত। স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে পদ্য যত উপযোগী, গদ্য সেরূপ নহে; সুতরাং পদ্যেরই সমধিক আদর হইয়াছিল। এমন কি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্র শিখিবার সময়েও, পদ্য-রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু পদ্যে রচনা করিলেই যে, তাহা কবিতা হইল, এমন নহে। অনেক গদ্য-রচনাও কবির সম্মান পাইতে পারে—এমন কি, পাইয়াছে। যাহাতে আমাদের উৎকৃষ্টতর মানসিক বৃত্তি উত্তেজিত হয়, সাধারণতঃ তাহাকেই কবিতা বলে। যাহা মানস-ক্ষেত্রে কোন স্থায়ী দৃঢ় ভাব অঙ্কিত করে, তাহাই কবির কার্য্য। আমরা বঙ্গদেশে অনেক কবি-নাম-ধারী ব্যক্তি দেখিতে পাই। তন্মধ্যে কতক গুলি আমাদের চিরপরিচিত। কিন্তু অনেকেই আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমরা তাঁহাদের কোন সংবাদ রাখি না। তাঁহারা অতি দীন ভাবে সামান্য কুটীরে বসবাস করিতেছেন।

গীর্ব্বাণে যে মহাত্মার নাম অশিত

হইলে, ইনিও এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু কমলাকান্ত নিতান্ত অবহেলিত হইবার লোক ছিলেন না। সাধকবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন যে জন্য বঙ্গীয় সমাজে এতাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন, কমলাকান্ত তত দূর না হউন, কিয়ৎ পরিমাণে সেই প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। কবিরঞ্জন তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের নিমিত্ত তত প্রতিষ্ঠা-ভাজন নহেন। তাঁহার অপূর্ব্ব মনোহর গীত-গুলিই তাঁহার অমরত্বের নিদান। বঙ্গভাষা যত দিন জীবিত থাকিবে, সেই সকল গীতের প্রাধান্য তত দিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রামপ্রসাদের গীত-গুলির যেন কি মনোহারিণী শক্তি আছে! শুনিলেই শরীর সুশীতল হয়—মন আর্দ্র হয়। গভীর নিশীথ সময়ে যদি রামপ্রসাদের কোন গীত শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে মনে যে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়, তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন—অন্যথা অসম্ভব। রামপ্রসাদ এক জন পরম সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আবাস-ভূমিতে একটি সিদ্ধস্থান ছিল। তাহার উপরে বসিয়া তিনি 'সমাধি' করিতেন। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও ঠিক্ তাঁহারই ন্যায়। গীত ভিন্ন কমলাকান্তের প্রশংসার আর কিছুই নাই—গীতগুলিই তাঁহার সর্ব্বস্ব। ইঁহার কৃত সংগীত রামপ্রসাদের ন্যায় তত উৎকৃষ্ট না হইলেও, নিকৃষ্ট নহে। এবং শুনিলেই তাহা যে এক জন সাধক পুরুষের মুখ হইতে অনর্গল নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। আমরা কমলাকান্তের যে গানই শুনিয়াছি, তাহাতেই প্রীতি লাভ করিয়াছি—তাহাতেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। এইরূপ কিংবদন্তী—কমলাকান্ত তাঁহার যজ্ঞগৃহে সতত্ই তপ, জপ করিতেন; এবং সময়ে সময়ে তাঁহার মুখ হইতে এক একটী গীত নিঃসৃত হইত। আমরা এই স্থলে তাঁহার রচিত একটি গীত উদ্ধৃত করিলাম;—

শ্যামা-ধন কি সবাই পায়।
অবোধ মন বুঝে না একি দায়॥
শিবের অসাধ্য সাধন, মন মজ না
রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি-সম্পদ-সুখ,
তুচ্ছ হয় যে ভাবে তায়।
সদানন্দ সদা ভাবে,
শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ইন্দ্র,
যে পদ না ধ্যানে পায়।
নির্গুণ কমলাকান্ত,
তবু সে চরণ চায়॥

এই রূপ আমরা কমলাকান্তের যে গান শুনিয়াছি, তাহাতেই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার এই রূপ দুই শতেরও অধিক গীত এক্ষণে প্রচলিত আছে। আর কত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কে বলিতে পারে? বর্দ্ধমানাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ

মহাতাবচাঁদ বাহাদুর তাঁহার কতকগুলি গীত, পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহাতেও কমলাকান্তের সমুদায় গীত সন্নিবেশিত হয় নাই; ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত তাঁহার আরও অনেক পদাবলি আছে।

আমরা এই স্থানে কমলাকান্তের আর একটি গীত উদ্ধৃত করিতেছি। একদা তিনি স্বীয় জন্ম-স্থান হইতে বর্দ্ধমান আসিতেছেন। সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড প্রান্তর—চতুর্দ্দিকে গ্রাম বা জনপদের চিহ্ন-মাত্র নাই। আমাদের বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে এই প্রান্তরটী অতি বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর স্থল। এমন কি, পূর্ব্বকালে এই স্থল হইতে, কোন ব্যক্তি কখন অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিতেন, কি না সন্দেহ। এই মাঠের নাম ওড়গ্রামের মাঠ। সেই দুরন্ত প্রান্তর দিয়া এখনও যাইতে হইলে, সশঙ্ক হইতে হয়। কমলাকান্ত সেই ভয়ঙ্কর প্রান্তর পার হইয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে দস্যুগণ তাঁহার গতিরোধ করিল. কমলাকান্ত নির্ভীক ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন—মুখে বিষাদের চিহ্ন-মাত্রও নাই। সেই জন-শূন্য প্রান্তরে—সেই দস্যু-বেষ্টিত স্থানে সেই অন্তিম সময়ে, তিনি বিষাদশূন্য ও নির্ভীক। দস্যুগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত যাই যষ্টি নিক্ষেপ করিল, অমনি কমলাকান্ত গান ধরিলেন;—

আর কিছু নয় (কেবল) শ্যামা মায়ের
দুটী চরণ আশা॥
তনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, অতেব
হইলাম হতাশা॥
জ্ঞাতি, বন্ধু, সুত, দারা,
সুখের সময়, সবাই তারা,
এমন বিপদ-কালে কেউ কোথাও নাই,
ঘর বাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা॥
নিজ গুণে যদি তার,
করুণা-নয়নে হের,
নইলে জপ করে' যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভুতের বাসা॥
কমলাকান্তেরই কথা,
মাকে বলি মনের ব্যথা,
জপের ঝুলি, জপের কাঁথা মা!
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥

গানটিতে পাষণ্ডগণের কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তাহারা কমলাকান্তকে সেই ভয়ঙ্কর স্থলে সেই ভয়ানক সময়ে, সেই বিপদাপন্ন অবস্থায় রাখিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। এদিকে কমলাকান্ত স্বীয় অভীষ্ট স্থান বর্দ্ধমান নগরীতে উপস্থিত হইলেন।

অনেকে বলেন, কমলাকান্তের বাসস্থান বর্দ্ধমানেই ছিল; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বর্দ্ধমান হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ উত্তরে চন্না গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তবে বর্দ্ধমানেই তিনি সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। এই নগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী কালী-মূর্ত্তি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত লোকে উঁহাকে "কমলাকান্তের কালী" বলিয়া থাকে। বর্দ্ধমানাধিপতির আনুকূল্যে

অধুনা ইহার পূজাদি হইয়া থাকে। আমরা প্রাচীন লোকের নিকট শুনিয়াছি, কমলাকান্ত যে গৃহে বসিয়া জপাদি করিতেন, তাঁহারা সেই গৃহ দেখিয়াছেন। তিনি অতিশয় কালী-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতি নিশ্বাসেই কালী-নাম বহির্গত হইত এবং সময়ে সময়ে এক একটী গান ধরিতেন। প্রতিদিন নূতন গান রচনা করিয়া কালী দেবীর অর্চনা করিতেন। বিশেষত কালী-পূজার দিনে তাঁহার মুখ হইতে অবিশ্রান্ত গীত বহির্গত হইত। তিনি অতিশয় কালীভক্ত ছিলেন, এই নিমিত্ত সুরাপানও করিতেন। রামপ্রসাদও সুরাসেবী ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত দুই একটী গীত দেখিলেই, স্পষ্টত অনুভূত হয়। যথাঃ—

সুরাপান করি না আমি সুধা খাই রে
কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥

রামপ্রসাদকে কেহ মাতাল বলিয়া উপহাস করিলে, এই গীতটি গাহিয়াছিলেন বলিয়াই, প্রতীয়মান হয়। এইরূপ তাঁহার আরও দুই একটী গীত আছে।

এইরূপ কিংবদন্তী, কমলাকান্ত এক বৎসর কালী-পূজার রাত্রে সুরা সেবন করিয়া বসিয়া আছেন, আর মুখ দিয়া অবিরত গান বহির্গত হইতেছে;—

মা কি আমার কাল রে।
(কে কি বলে, মন কি বল, রাখি
আমার কাল রে।)
কাল রূপে ঘোর তিমির নাশে রে॥
কাম-রিপু অমনি ভুলিল রে।
অনন্ত বিশ্বময়ী, শতকোটী ইন্দু-সম
শীতল রে।
কমলাকান্ত! ওরূপ হের রে, আর নাহি
দেখি সমতুল রে॥

শঙ্কর-উরে, কে বিহরে, বামা রঙ্গিণী
না বাঁধে চিকুর, না পরে বাস,
বিধু-বদনে মধুর হাস,
চিত্তামৃত নীরজ-প্রকাশ,
(কে রে) সশিব শিব নিতম্বিনী॥
তারণ-কারণ চরণ-যন্ত্র,
যে জন না জানে, সে জন ভ্রান্ত,
কৃতান্ত নিতান্ত শান্ত,
কমলাকান্ত-বন্দিনী॥

কমলাকান্তের মুখ দিয়া এই রূপ গীত অবিরল নিঃসৃত হইতেছে। এ দিকে পূজার সময় অতীত হইয়া যায়। তাঁহার ভৃত্য বিষ্ণু স্বর্ণকার বলিল, পূজার সময় অতিক্রান্ত হইতে চলিল। ও দিকে ভয়ঙ্কর মেঘ করিয়া আসিতেছে; আর বিলম্ব কি? আমাকে পূজার সমুদায় আয়োজন করিতে অনুমতি করুন। কমলাকান্ত বলিলেন, পূজার আয়োজন করিবে কি? মহিষ না হইলে, মায়ের পূজা হইতেছে না, একটী মহিষ লইয়া আইস। একে অমাবস্যার রাত্রি— তাহাতে ভয়ঙ্কর বৃষ্টিপাত, সুতরাং বিষ্ণু উত্তর করিল, এ রাত্রে কোথা হইতে মহিষের অনুসন্ধান করিব। বেলা

থাকিতে বলিলেও,কোন প্রকারে সন্ধান করিতাম। এ ভয়ানক রাত্রে কিছুতেই হইবে না। যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপই পূজা হউক। কমলাকান্ত বলিলেন, তাহা হইবে না। তুমি এক বার বেড়াইয়া দেখ; অবশ্যই মহিষ পাইবে। বিষ্ণু অগত্যা বহির্গত হইল, এবং একটী প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া বরাবর যাইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় কিছু দেখিতে পাইল না; পরিশেষে একটী ক্ষীণালোক তাহার নয়ন-গোচর হইল। আলোটী সেই রাস্তা ধরিয়াই আসিতেছে। বিষ্ণুরাম দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল,আলোক-ধারিগণ অগ্রসর হইয়া নিকটে উপস্থিত হইল। বিষ্ণুরাম আশ্চর্য্যের সহিত দেখিল, কতক গুলি লোক একটী মহিষ লইয়া যাইতেছে। সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ এবং কোথায় যাইবে?" তাহারা উত্তর করিল, আমরা অনেক দূর হইতে আসিতেছি। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কালীর নিকট আমাদের মুনিবের একটী মানসিক মহিষ ছিল; তাহা লইয়া তাঁহার নিকট যাইতেছি।" বিষ্ণুরাম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল; এবং যাইয়া কমলাকান্তকে মহিষের কথা বলিল। অতঃপর তাঁহার অনুমতি-ক্রমে যথারীতি আয়োজন ও পূজা শেষ হইল। ইঁহার সম্বন্ধে এবম্বিধ নানাপ্রকার অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সে সকল আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, এই সকল জনশ্রুতিই এই যে, তিনি এক জন অসাধারণ লোক ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিংবদন্তী আছে—কমলাকান্ত নিজে এক জন উত্তম গায়ক ছিলেন; সুতরাং তাঁহার পদ-গুলি যে রীতিমত গীত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? আমরা অধুনাতন এক জন গায়কের নিকট শুনিয়াছি যে, রামপ্রসাদের গীত অপেক্ষা কমলাকান্তের গীতগুলি সঙ্গীত-পক্ষে শ্রেষ্ঠ; এবং ইঁহার গীতগুলি বেশ আরম্ভ করিয়া রীতিমত তাল-লয়-মান-সহযোগে গান করিতে পারা যায়। রামপ্রসাদের গীত-গুলি সেরূপে গান করিতে হইলে, সময়ে সময়ে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। রামপ্রসাদের অধিকাংশ গীত একইরূপ নূতন সুরে গ্রথিত; অধুনা তাহা প্রসাদী সুর বলিয়া অভিহিত। আমরা কমলাকান্তের গীত-মধ্যেও সেইরূপ সুরের দুই একটী গান দেখিতে পাই। ওড়গ্রামের মাঠে কমলাকান্ত যখন দস্যু-হস্তে পতিত হন, তখনকার যে গানটী আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি,তাহা কতকটা প্রসাদী-সুরে গেয়।

একণে দেখা যাউক, কমলাকান্ত কোন্ সময়ের লোক। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই; অধিক কি, গান-গুলিও পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন

নাই। তাঁহার রচিত গীত-গুলি কেবল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে মাত্র; সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতেও তাঁহার সময়-নির্ণায়ক এমন কোন গীতই নাই যে, তাহা ধরিয়া আমরা তাঁহার সময়ের কতকটা নিদ্ধারণ করিব। তবে ইহা নিশ্চিত যে, তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুরের সময়ে আপনার কালিকা দেবী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেই সময়েই তাঁহার মন্দিরও নির্ম্মিত হয়। মহারাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুর কত দিনের লোক দেখিতে গেলে, আমরা শত বৎসর পূর্ব্বে উপনীত হই; অতএব ধরিতে হইতেছে, কমলাকান্ত এক শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলেই আমরা ১৭০০ শকে উপনীত হইতেছি। অতএব স্থূলতঃ বলিতে হইলে, বলা যায়—কমলাকান্ত ঐ সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে ইহাই জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে—অন্যান্য বিষয় দুজ্ঞের্য়। কমলাকান্তের উত্তরাধিকারী এক্ষণে আর কেহ নাই। শুনিয়াছি, সেই বংশের কেবল একটী বিধবা নারী আছেন—তাঁহারও সন্তানাদি কিছু-মাত্র নাই। কমলাকান্ত-সম্বন্ধে অপরাপর ঘটনা প্রাপ্ত হইলে, বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ।

গঙ্গা-বক্ষে।

বহে সান্ধ্য সমীরণ মৃদু মন্দ স্বনে,
খেলি'ছে কতই খেলা তরঙ্গিণী 'পরে,
ধরিয়া চুম্বিয়া ফেলে ঊর্ম্মি থরে থরে
শ্যামল-সৈকত-বক্ষে আপনার মনে।
ভাসিয়া সুবর্ণ-স্রোতে চলি'ছে তরণী;
যা' দেখি সকলি আজ উজলতা-ময়;
এ শোভা দেখিয়া কা'র না নাচে হৃদয়,
শুনিয়া এ সুমধুর কল কল ধ্বনি!
শোভি'ছে পাদপ-চূড়া, পর্ব্বত-শিখর
কিরীট ভূষণে; অনন্ত-গগন-দেশে
মালাকার সারসের মধুর নিনাদ;
নিস্তেজ মলিন হেরি' পতি দিনকর
মুদিতেছে কমলিনী; ক্রমে রুদ্র-বেশে
আক্রমি'ছে সুখময় সংসার বিষাদ।

শ্রীশঃ।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও লর্ড রিপণ।

কেন আজ অকস্মাৎ ভারতের চৌদিকে হর্ষ-ধ্বনি শুনা যাইতেছে? কি সুখের জন্য ভ্রাতৃগণ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন? অনন্ত বিষাদে এ হর্ষের দীপ্তি কেন? দাস! প্রভুর অনুগ্রহে আজ তোমার এত হাসি কেন? সাত শত

বৎসরের শিক্ষায় তোমার জ্ঞান হইল না? এই সাত শত বৎসরে তোমাকে কত বার হাসাইতেছে, কত বার কাঁদাইতেছে, তবু তোমার হাসিতে লজ্জা বোধ হইতেছে না? যে হাসি তোমার নিজের আয়ত্ত নহে, যে আনন্দের উপর তোমার নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই, যে হর্ষের উপর তোমার নিজের স্বাধীনতা নাই, সে হাসি—সে আনন্দ—সে হর্ষ সমস্তই ভাবী বিষাদের মূল। এক দিনের লেজিস্‌লেটিভ্ সভায় লর্ড লিটন্ যে হাসি কান্নায়, ও যে হর্ষ বিষাদে পরিণত করিয়াছিলেন, আজ আবার সেই হাসি হাসিয়া, ও সেই হর্ষ প্রকাশ করিয়া কেন আর আপনাদিগের উন্মত্ততা প্রকাশ কর! বালককে যেমন ক্রীড়নক দেখাইলে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলে, তোমরা ঠিক সেইরূপ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-রূপ ক্রীড়নকু আবার দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলিতেছ! মহামতি প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত লর্ড রিপণ আজ দয়া করিয়া তোমাদিগের অপহৃত ক্রীড়নক তোমাদিগকে ফেরৎ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু কাল যে আর এক জন লর্ড লিটন্, রিপণের সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়া, তাহা পুনরায় কাড়িয়া লইবেন না, তাহার প্রমাণ কি? যদি জানিতাম, লর্ড রিপণ আজন্ম ভারত-সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলেও হাসিতাম; কেন না জানিতাম যে, চিরদিন এইরূপ হাসিতে পাইব। কিন্তু এরূপ উঠবসী-পাট্টায় তোমাদের কি বলিয়া হাসিতে প্রবৃত্তি হইতেছে, জানি না। বহু দিন দাসত্বে পড়িলে, মানুষের ভাবী দর্শন বিলুপ্ত হয়। ভবিষ্যতে কি হইবে, ভাবিতে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। এই জন্য সে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে চাহে না। আজকার উৎসবে সে ভূত ভবিষ্যৎ নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে চাহে। এই জন্য সে আজকার সুখে পাগল হইয়া উঠে, তাই নৈমিত্তিক সুখ-কণায় সে প্রাণ ভরিয়া হাসে। নিত্য সুখ যার অদৃষ্টে নাই, নৈমিত্তিক সুখ সে কোন্ প্রাণে ছাড়ে?

হাস ভাই হাস! আমি তোমাদিগের ক্ষণিক সুখে বাধা দিতে চাই না। কিন্তু ভাই! আমায় তোমাদের হাসিতে যোগ দিতে ডাকিয়াছ; কিন্তু আমি যে হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলি! আমার অন্ধ নয়ন ত ভারতের তমসাচ্ছন্ন গগনে আলোক-রেখা-মাত্র দেখিতে পাইতেছে না। আমার নিকট যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারই রহিয়াছে। তবে কি বলিয়া হাসিব। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এ বড় কথা! এ মহামূল্য স্বত্বে আমাদের অধিকার কি? ইংলণ্ড অনেক দিনের সংঘর্ষে রাজ-রুধিরের বিনিময়ে তবে এ স্বত্বে অধিকারী হইয়াছেন। ইংলণ্ডের স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ সেই সংঘর্ষের দিনে অধীর হইয়া, স্বদেশের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া, এই মহামূল্য স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য আমেরিকায় গিয়া

উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তথায় গিয়া যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, আজ সে বীজ প্রকাণ্ড-তরু-রূপে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লইয়া উন্মত্ত, তাহা জীবন্ত ও অলঙ্ঘ্য। সে অলঙ্ঘ্য স্বত্ব এক অধিবেশনে বিলুপ্ত হইবার নহে। দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞাপত্র দ্বারা তাহা সুদৃঢ়-রূপে পরিরক্ষিত। এক বার ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম চারল্‌স তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া মস্তক দিয়াছিলেন। তাহার পর আর কোন রাজপুরুষ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু দাসের আবার স্বাধীনতা কি? যাহার কোন স্বাধীনতা নাই, তাহার আবার জাতীয় জীবনের মূল-মন্ত্র-স্বরূপ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা কোথায়? ৯ আইন উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহার অভাব মোচন করিল। ৯ আইন ইংরাজের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে দিব না বলিয়া, বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, পরিশোধিত দণ্ডবিধি তোমাকে তজ্জন্য কারাগারে পাঠাইবে বলিয়া খড়্গহস্ত হইয়া রহিল। 'এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার?' তবে বুঝিবার বিড়ম্বনায় দরুণ যে ভিন্ন বোধ। যত দিন বৈদেশিক শাসনের অধীনে থাকিতে হইবে, বৈদেশিকদিগের জুতা লাথি খাইয়া থাকিতে হইবে। তবে বেশী আর কম। ইংরাজেরা স্বাধীনতার উপাসক, স্বাধীনতার মূল্য বুঝেন বলিয়াই, দয়া করিয়া আমাদিগকে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিতেছেন বটে, কিন্তু যত ক্ষণ আমরা তাঁহাদিগের কৃপার পাত্র হইয়া রহিয়াছি, যত ক্ষণ আমাদিগের সর্ব্বস্ব তাঁহাদিগের দয়ার অগ্রে রহিয়াছে, তত ক্ষণ সে স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। 'পরের সোণা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হ্যাঁচ্‌কা টানে'—এই মহামূল্য জাতীয় প্রবাদটী যেন ভুলিয়া যাইও না। যাহা নিজের আয়ত্ত নহে, তাহার জন্য এত হুল্লি হাসিও না, এত হর্ষ প্রকাশ করিও না। কারণ, কাকতা হ'লে তোমাকে সেই পরিমাণে কাঁদিতে হইবে! সেই পরিমাণে বিষাদে মগ্ন হইতে হইবে!

আর হর্ষের কারণই বা কি? আমরা কি পাইয়াছি? লিখিবার স্বাধীনতা? মনের ভাব ব্যক্ত করিবার অধিকার? কই তাই বা পূর্ণ ভাবে পাইয়াছি কই? আমরা নিরন্তর যে সকল দুর্ব্বিষহ অত্যাচার সহ্য করিতেছি, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি কই? সংবাদপত্রে সেই সকল অত্যাচার প্রচারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকাশ করে কে? যে চাকর, যে অধীনে কাজ করিতেছে, বাক্য-যন্ত্রণা, তাড়না, নিষ্ঠুরতায় যাহার অস্থি-মজ্জা নিরন্তর জর্জ্জরিত, সে ইংরাজ-বিরুদ্ধে সংবাদ-পত্রে কিছু লিখিতে পাইবে না। কেন না, সে চাকর। চাকরের স্পর্দ্ধা বাড়িতে দেওয়া হইবে না। যে সাহস করিয়া কিছু লিখিবে, তাহার

চাকরী যাইবে। দরিদ্র অন্নাভাব-প্রপীড়িত ভারতবাসী তাহা পারে কই? ঘরে ছেলে পিলে কাঁদিতেছে যার, সে প্রভুর বিরুদ্ধে কলম ধরিতে পারে কই? কলম ধরিলে দণ্ড—কর্ম্মচ্যুতি। কোন্ প্রাণে সে সে কঠোর দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়? সুতরাং সে 'কিল খাইয়া কিল চুরি' করে। পিঠের ধুলা মুছিয়া লোকের নিকট চড়ুকে হাসি হাসে! যে গম্ভীর-প্রকৃতি ও উন্নতমনা, সে হাসে না; বিষাদ-ছায়া তাহার মুখে সতত লাগিয়া থাকে। নির্জ্জন পাইলেই, অশ্রু-জল তাহার নয়ন ভেদ করিয়া বাহির হয়! সে পাষাণভেদী অশ্রু কয় জন দেখিতে পায়? কোন্ সংবাদপত্রে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়? বড় বড় প্রকাশ্য অত্যাচার-গুলি সংবাদপত্রে উঠে বটে, কিন্তু মফঃস্বলে নিরন্তর ছোট খাট যে সকল ধারাবাহিক অত্যাচার চলিতেছে, তাহা সংবাদপত্রে উঠে কই? উঠিবার উপায় কই? নিরন্তর ছোট খাট অত্যাচারে জাতীয় জীবন যেরূপ বিনষ্ট হয়, বড় বড় অত্যাচারে সেরূপ হয় না। বড় বড় অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাতে জাতীয় সহানুভূতি পাওয়া যায়; সুতরাং মন তত নির্ব্বীর্য্য, নিস্তব্ধ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে না। আজ জননী জন্মের মত ইহ জীবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন,—ইচ্ছা এক বার শেষ পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যান। শোকাকুল পুত্র এক দিনের বিদায় চাহিলেন। সাহেব প্রভু দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া, বলিয়া উঠিলেন—'তোমার মা মরা আগে, না আমার কাজ আগে?' পুত্র দাস—সুতরাং নিরুত্তর। নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে ডেস্কে আসিয়া বসিলেন। এ দিকে জননী পুত্রমুখ না দেখিতে পাইয়া দ্বিগুণিত মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে সংসার-লীলা সংবরণ করিলেন।

কথায় কথায় গালি-বর্ষণ, কথায় কথায় তিরস্কার—এ গুলি চাকুরে-মাত্রকেই প্রায় সহ্য করিতে হয়। তিনি সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রাণ দিয়া খাটিয়াও প্রভুর মন যোগাইতে পারেন না। রবিবার বিশ্রামের দিন। সে দিন কাহাকেও খাটান খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-নিষিদ্ধ। কিন্তু মফঃস্বলে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আরও অনেক ছোট খাট অত্যাচার আছে, যাহা ব্যক্ত করায় আমাদের অধিকার নাই। যত দিন চাকরদিগকে মুক্ত কণ্ঠে সকল প্রকার অত্যাচার ব্যক্ত করিবার অধিকার না দেওয়া হইতেছে, তত দিন "মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা" শব্দ-মাত্রে পর্য্যবসিত থাকিবে। সুতরাং এত হর্ষ-প্রকাশের বিশেষ কারণ নাই।

আর এক কথা। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কার্য্যোপযোগিতা বিজিত দেশে বেশী নাই। নিরন্তর রোদন করিতে করিতে, একটী আধটী কথা প্রভুরা শুনিতে পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু

যেখানে স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেখানে আমাদের রোদনে তাঁহারা কর্ণপাত করিবেন না, নিঃসংশয়িত-রূপে বারবার প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ইংরাজ চাকরদিগের স্বার্থ-সাধনের জন্য কুলিদিগের স্বাধীনতা হরণ করা, ম্যানচেষ্টার-বণিক্‌গণের কোষপুষ্টি ও তুষ্টি-বিধানার্থ তুলাকর তুলিয়া দেওয়া, এদেশীয়দিগকে উঠিতে না দিবার উদ্দেশে উচ্চপদ গুলি সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের করতলস্থ রাখা, ভাবী জাতীয় স্বাধীনতা সুদূর-পরাহত করিবার নিমিত্ত অস্ত্র-ব্যবহার-নিষেধক আইন জারি, ইংরাজ-দণ্ডের প্রতি, দেশীয় বিচারকগণের দণ্ডপ্রয়োগে অনধিকার, প্রভৃতি অসংখ্য বৈষম্য-দুষ্ট ব্যবস্থা ইংরাজ-শাসনের কলঙ্ক-স্বরূপ চির দিন ভারতে বিরাজমান থাকিবে। তোমাদের ঐকতানিক ক্রন্দনেও, সে কলঙ্ক তাঁহারা কখনই ক্ষালিত করিবেন না। যেখানে স্বার্থ-সংঘর্ষ নাই, সেখানে তোমাদের ক্রন্দন শুনিলেও শুনিতে পারেন, এইমাত্র। ইহার জন্য এত হর্ষ, এত উৎসাহ কেন?

তবে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ! তাঁহাতে আমার আপত্তি নাই। কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির ইহাতে আপত্তি থাকিতে পারে? ফল যত দূর হউক বা না হউক, বরদাতাকে আমরা প্রাণ ভরিয়া নমস্কার করি। লর্ড রিপণ যে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা অল্প-দিন-মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি যে সকল মহতী প্রস্তাবনা করিয়াছেন, সে সকল যে তাঁহার আদর্শ অনুসারে কার্য্যে পরিণত হইবে, আমাদের মনে এরূপ আশা নাই। কারণ, কয় জন ভারতবাসী ইংরাজ তাঁহার মত ধার্ম্মিক, অপক্ষপাতী ও প্রকৃত-প্রজা-হিতৈষী? যদি অধিক ইংরাজই তাঁহার মত হইত, তাহা হইলে, জেতৃ-বিজিত-বিদ্বেষ-ভাব এত দিনে উভয়জাতি হইতে চলিয়া যাইত! কিন্তু সে ভাব না কমিয়া দিন দিন বাড়িতে চলিয়াছে! কিন্তু লর্ড রিপণ! তোমাকে তাহার জন্য দায়ী করিতে চাহি না। তোমার অপরাধ কি? মানব-সুলভ স্বার্থপরতা ইহার মূলে বিরাজ করিতেছে। যত দিন উভয় জাতির স্বার্থের একীকরণ না হইতেছে, তত দিন উভয় জাতির সমীকরণ দুরাশামাত্র। কিন্তু তুমি বিশ্ব-প্রেমিক ও বিশ্ব-নাগরিক। সুতরাং তুমি প্রপীড়িত, পদদলিত ভারতবাসীর পূজ্য। তোমার বসতি ইংলণ্ডে বলিয়া তোমায় আমরা বৈদেশিক বলিয়া গণনা করিব না। আমাদের দুঃখে তুমি কাতর, সুতরাং তুমি ভারতবাসিগণের হৃদয়-বাসী। তুমি আমাদিগকে তুলিতে চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু তোমার আয়াস বৃথা হইবে! কারণ, তোমার ভ্রাতৃগণ উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে। যাহা হউক, তোমার শুভ-কামনার জন্য আমরা চির দিন তোমার নিকট ঋণে আবদ্ধ রহিলাম। দীন ভারতসন্তান তোমায় আর কি দিয়া পূজা করিবে? প্রীতি-অশ্রু গ্রহণ কর।

যোগ।

হিন্দু-যোগ-সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয়দিগের উদার মত।

যখন যে ধর্ম্মের রাজা, রাজ্য-শাসন করেন, প্রজা-পুঞ্জও সেই ধর্ম্মের পক্ষপাতী হয়; ইহা একপ্রকার নৈসর্গিক নিয়ম। ইউরোপ-খণ্ডের অধিকাংশেই খ্রীষ্টিয়ান্ রাজাদিগের অধিকার বলিয়া, তথাকার অধিকাংশ প্রজা খ্রীষ্টিয়ান্। আসিয়া-খণ্ডের মধ্যে যে রাজ্য মুসলমানদিগের আধিপত্যের অধীনে আছে, তথাকার প্রজাপুঞ্জও মুসলমান-ধর্ম্মের পক্ষপাতী। এই ভারত-ভূমি যখন প্রকৃত-হিন্দু-রাজাদিগের দণ্ডাধীনে ছিল, তখন ভারতে হিন্দুধর্ম্ম বৈ অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না। হিন্দুধর্ম্মের মূল নিতান্তই সুদৃঢ় বলিয়া, এত দিন এত ধর্ম্ম-বিপ্লাবনেও এ ধর্ম্ম নির্ম্মূল হয় নাই। এ ধর্ম্ম যে কোন কালে নির্ম্মূল হইবে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। হিন্দুধর্ম্মকে এ দেশের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এ ধর্ম্মে ভ্রম-প্রমাদাদি কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর অন্যান্য যাবদীয় ধর্ম্মে ভ্রম-প্রমাদাদির হস্ত স্পৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি অতি প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র। এই শাস্ত্র সকল এমনি সারবান্ ও প্রত্যক্ষ-ফলদায়ক যে, এ শাস্ত্র যিনি সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই হিন্দুধর্ম্মের সার মর্ম্ম অবগত হইতে পারিয়াছেন। হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্র-সকল হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান রক্ষক। হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকগণ যখন খড়্গ ধরিয়া তাহার মূলচ্ছেদনে বদ্ধপরিকর হইল, তখন ঐ সকল 'দর্শন'-সেনাপতিরা বিধর্ম্মী বৌদ্ধ-চার্ব্বাকদিগকে বাগ্বাণে পরাভূত করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। অমিত্র বৌদ্ধ পরাভূত হইলে, কিছু কাল হিন্দুধর্ম্ম নিরাপদ ছিল। পরে মুসলমান-রাজ-অত্যাচার ক্রমাগত ৮ শত বৎসর সহ্য করিয়াও জীবিত থাকিয়া বর্ত্তমান খ্রীষ্টান্ রাজার হস্তে পতিত হইয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তবে যে হিন্দু-সন্তান-সন্ততিগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, তাহার কারণ—

১। বাল্যকাল হইতে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর উপদেশ-গ্রহণ ও তৎ-সহবাস-জনিত তদনুকরণ-করণ-প্রবৃত্তি ক্রমশ বলবতী হওয়া।

২। অনুকরণ-করণে আত্মীয়গণের প্রতিবন্ধক না হওয়া।

৩। স্বজাতীয় ধর্ম্ম না জানা।

৪। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কপটতা-সঞ্জনন।
৫। ব্রাহ্মণগণের বেদ-জ্ঞান-বিহীনতা।
৬। যোগাভ্যাসের অভাব।
৭। হিন্দু-ধর্ম্ম-রক্ষার্থ রাজ-দৃষ্টির অভাব।
৮। অনৈক্য।
৯। তেজোহীনতা।
১০। স্বজাতীয় ব্যবসায়ের অভাব।

এতাদৃশ অভাব-পরম্পরা সত্বেও, ভয়ঙ্কর কাল-স্রোতে হিন্দুধর্ম্মে লোকের যে অটল আস্থা জন্মিবে, তাহা প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা-মাত্র। তবে যদি নিম্নোক্ত প্রবন্ধত্রয় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ধর্ম্মে আস্থা হয়, তাহাই যথেষ্ট। পাঠক! আমরা যে ইউরোপীয়দিগের মত অনুকরণ করি, তাঁহারা কি বলিতেছেন, শুনুন—

অমৃতত্ব ও পরলোক-তত্ত্ব।

১। জেনেরল্ ষ্টুয়ার্ট* বলেন যে—"যে ভারতবর্ষ, জীবের অমৃতত্ব ও পরলোক-তত্ত্ব-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের উজ্জ্বল আকর-স্থান, আমাদের উচিত, সেই ভারতের প্রতি নম্রতার সহিত ভক্তি করি এবং তথায় যে গভীর বিজ্ঞান হইতে পারলৌকিক সত্য ও অমৃতত্ব বিকশিত হইয়াছিল, সেই বিজ্ঞানের পবিত্র চরণে উপযুক্ত পূজা প্রদান করি। উন্নতির চিরবিরোধী বিষয় বিদ্যা হইতে মনকে উদ্ধার করিয়া, সেই আদি কালকে গভীর ভাবে ভক্তি পূর্ব্বক ধ্যান করি। সেই কালে উক্ত গভীর সিদ্ধান্তসকল বিবিধ ধর্ম্ম ও দর্শন-শাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া, পূর্ব্বদিকস্থ গগনমণ্ডলকে আলোকময় করিয়াছিল এবং তৎকালীন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলকে সমস্ত পৃথিবীর মানবজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানিরূপে প্রকাশ করিয়াছিল।"

২। পাদরি মরিস্ সাহেব ফরবস্ সাহেবের চিত্রশালায় গিয়া মহারাষ্ট্রদেশীয় একটি অতি প্রাচীনকালীয় হিন্দুদিগের পূজার ঘণ্টা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন† "যে দেবার্চ্চনার বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য উক্ত ঘণ্টা সত্য সত্যই নাদিত হইত, তাহা মনে করিয়া আমি ঐ চিত্রশালায় উহার রব শুনিয়া অন্তরে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। যে আদি কালে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম, মহারাষ্ট্রদেশীয় গিরি-গহ্বরে মহা সমারোহে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, আমার মন আনন্দগদগদ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই আদি কালের ধ্যানে নিমগ্ন হইল। তাহাতে আমি ক্ষণ-কাল নিস্পন্দ হইলাম। পশ্চাৎ মহোৎসাহে পরিপূর্ণ হইলাম। আমার বোধ হইল, পূজনীয় বৃদ্ধ ঋষিকগণ সুদৃশ্য উত্তরীয় ও মস্তকাভরণ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে সমবেত হইয়াছেন।

* Vindication of the Hindus, 1808. দেখ।

† Indian Antiquity, 1811. দেখ।

তাঁহাদের মন্ত্র-ময় গীত যেন আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। আমি যেন তথাকার গন্ধ-পুষ্পের মনোহর আঘ্রাণ পাইলাম; এবং ঈশ্বরের মূর্ত্তি-স্বরূপ সম্মুখস্থ বঞ্জীয়াগ্নিতে ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে লাগিলাম।”

৩। এম্, লরিস্ জ্যাকোলিয়ট্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন *:—

“হে প্রাচীন-ভারত-ভূমি, হে মানবের আদি প্রতিপালিকে! তোমাকে আরাধনা করি। হে পূজনীয়ে, সুনিপুণ-ধাত্রি-স্বরূপে! শত শত বৎসরেও বিজাতীয় আক্রমণে অদ্যাপি তোমাকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। হে ধর্ম্ম, প্রেম, কাব্য ও পরমার্থ-শাস্ত্রের জননি! তোমার পূজা করি। সকাতরে প্রার্থনা করি, যেন উত্তর-কালে আমাদের ইউ-রোপে তোমার প্রাচীন জ্ঞান ও ধর্ম্ম পুনর্ব্বিকশিত হয়। হে সুধির! ঐ সকল ভিন্ন-বর্ণীয় ভারত-প্রেমিক মহাত্মা-দিগের প্রেম-বাসনা, তৃষ্ণা, ব্যাকুলতা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা চিন্তা করিয়া বল দেখি— বিধাতা-পুরুষের লেখনী তাঁহাদের ললাটে কোন্ বর্ণে ও কোন্ বংশে পুনর্জন্ম লিখিয়াছেন? যিনি বাঞ্ছা-কল্প-তরু-বাসনার ফলদাতা, তিনি কি তাঁহাদিগকে হিন্দু-কুলে জন্ম বিধান করিয়া, প্রকৃত রূপে ভারতের প্রতিমূর্ত্তি দেখাইবেন না? ঐ সকল মহাত্মা-দিগের ভারতীয় জ্ঞান-ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রার্থনা যত দিন পূর্ণ না হইবে, তত দিন তাঁহাদিগের স্বর্গ-ভোগ করাও যন্ত্রণা-মাত্র। সুতরাং স্ব স্ব বাসনা-বিরচিত অদৃষ্ট-বলে শ্রীহরির প্রসাদে তাঁহারা অবশ্যই ভারতে বিশিষ্ট কুলে হিন্দু-জাতিতে জন্ম-লাভের অধিকারী। যেহেতু, গীতাতে আছে যে, “যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং, ত্যজত্যন্তে কলেবরং” ইত্যাদি।

“কোন দেশের লোক, এই রূপে হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মুক্তির সোপান প্রাপ্ত হইতে পারে—ইহা মিথ্যা নহে। সেই মুক্তির পথে হিন্দু-ধর্ম্ম কবাট বন্ধ করিয়া রাখেন নাই। কেন না, যিনি স্ব-জাতীয় ধর্ম্ম-সাধনা করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই ধর্ম্ম দ্বারা বৈরাগ্য উপার্জ্জন পূর্ব্বক সেই বৈরাগ্য-রূপ সৌভাগ্য-বলে হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়-কামনা করিবেন, তিনি অবশ্যই হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মাধীনে আসিয়া ভারতে জন্মপরিগ্রহ করিবেন। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিগণের নিকটে ভারতীয় শাস্ত্রোক্ত মোক্ষ-পথ অবারিত আছে। নতুবা যে ব্যক্তি ভোগে উন্মত্ত, তাহার পক্ষে ঐ পথ কখন অবারিত নহে। কারণ, ভোগই উহার বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মানু-সারে ভোগী, রোগী ভিন্ন আর সকলেই মুক্তিপথের অধিকারী।

“সেই মুক্তিপথের প্রথম সোপান ভারতে জন্ম লাভ।

“দ্বিতীয় সোপান, ভারতীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ।

* Bibliothica Indica. অনু ক্রমিক।

"তৃতীয় সোপান যোগীদিগের গৃহে, কিংবা সন্ন্যাস-পরায়ণ ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ-দিগের বংশে জন্ম। কিন্তু, যেমন ভারতে উক্ত প্রকারে জন্ম ব্যতীত উপর্য্যুপরি কোন সোপানই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেন না, অন্যান্য বর্ষে ব্রাহ্মণ নাই, যোগী নাই, ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয়ও নাই—সেইরূপ ভারতে জন্মিয়া ভারতীয় ধর্ম্মে সুদৃঢ়-রূপে দীক্ষিত হইতে না পারিলে কোন ফললাভ হয় না। যেহেতু, ঐ ধর্ম্মের জন্যই ভারতের এত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা।

"মনুষ্যের ত কথাই নাই। দেবতারা পর্য্যন্ত মুক্তি-প্রার্থী হইলে, ভারতে আসিয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া কৃতার্থ হন। কেন না, সে নিয়মাধীনে অপরাপর দ্বীপা-দির লোকদিগের দেব-সেব্য পার্থিব-পুরীর সুখ-সম্ভোগ সকল মুক্তি-পথের নিতান্ত প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। কিন্তু সেই ভোগ-ক্ষয় ভিন্ন মুক্তিলাভের অধিকার হয় না। এ জন্য যে সকল স্বর্গবাসী দেবতারা মুক্তির মর্ম্ম জানেন, তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য-বর্ষীয় ভারত-প্রেমিক মহাত্মা-দের ন্যায় ক্রমে ক্রমে স্বর্গীয় সুখ-ভোগে বিরক্ত হইয়া, মোক্ষের জন্য এই রূপ গান করিয়া থাকেন :—

দেবগীত।

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি,
ধন্যাস্তু তে ভারত-ভূমি-ভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদ-মার্গ-ভূতে,
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥১॥
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিত তৎ-ফলানি,
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে।
অবাপ্য তাং কর্ম্ম-মহীমনন্তে
তস্মিল্লয়ং যেত্বমলাঃ প্রয়ান্তি॥২॥
জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং বিলীনে,
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধে।
প্রাপ্স্যামো ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যাঃ
যে ভারতে নেন্দ্রিয়-বিপ্রহীনাঃ॥৩॥
(বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অধ্যায়।)

"দেবতারা এই গান করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেবতা হইতেও বড় এবং ধন্য। যেহেতু, তাঁহা-দিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। তাহা স্বর্গ ও অপবর্গ-লাভের আস্পদ। নির্ম্মল, নিষ্পাপ লোকেরা ঐ কর্ম্মভূমিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ফল-কামনায় সন্ন্যাস করত যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা পরমাত্মা অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হন। আমরা ইহা বলিতেছি না যে, কবে আমাদের স্বর্গ-জনক পুণ্য ক্ষয় হইবে এবং কবে আমরা ভারতবর্ষে জন্ম-পরিগ্রহণ করিব। কারণ, যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব মানবদেহ-সহকারে ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করেন, তাঁহারাই ধন্য।"

উদারমনা সাহেবেরা ভারত-সম্বন্ধে যে সকল বাক্য-বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন, এ কালের অনেক আর্য্যবংশীয় জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি তেমন হৃদয়গ্রাহী জ্ঞান ও ভক্তির সহিত প্রেমপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মের সারবত্তা ও বরণীয়তা বলিতে পারেন না। বর্ষান্তর-

বাসী, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভারত-প্রেমিক মহাত্মাদিগের ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্মের এত পক্ষপাতিত্ব যে গুণে হইয়াছিল, আমাদিগের উচিত—সেই গুণবান্ পুরুষত্রয়কে ভক্তির সহিত একান্ত হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও মান্য করি। ভগবদ্ভক্ত ভিন্নবর্ণীয় লোককে পূজা করা,ভগবদ্ভক্তের নিতান্ত কর্ত্তব্য; তাহাতে জাতি-বিচার করিতে নাই। যথা—

হরিভক্তঃ শ্বপচোঽপি
বিজ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণাধিকঃ।
স কথং ব্রাহ্মণো যস্তু
হরিভক্তি-বিবর্জ্জিতঃ॥

পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ১ অধ্যায়।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

INDEPENDENT TIPPERAH LAW REPORTS. 1880. BOSE PRESS. বাঙ্গালীকে বিচারপতি করিলে, সুবিচার সংঘটিত হইতে পারে, হাইকোর্টের দ্বারকানাথ, শম্ভুনাথ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। বাঙ্গালী প্রধান মন্ত্রী হইলেও, সেই পদে দক্ষতা-প্রদর্শনে সক্ষম, অদ্য তাহার প্রমাণ দিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ মুখুর্য্যের মেগাজিনের (Mukerjee's Magazine) সুযোগ্য সম্পাদক বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বাধীন ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, কত দূর দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য-সাধন করিতেছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শম্ভু বাবুর ইংরাজীতে অভিজ্ঞতা, রাজনীতি-বিশারদতা, বিজ্ঞান ও আইনাদিতে পারদর্শিতাদির বিষয় সাধারণের অবিদিত নাই। কিন্তু, তিনি যে এক জন সুবিচারকের সূক্ষ্ম কার্য্যেরও উপযুক্ত, এই রিপোর্টেই তাহা অবগত হইয়া আমরা নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছি। এই পুস্তকে একটী ভয়ঙ্কর হত্যার বিচার নিবদ্ধ করা হইয়াছে।

CALCUTTA JOURNAL OF MEDICINE. Vol: X, No. 1. Edited by MAHENDRA LAL SIRCAR, M.D. গ্রাহকের অত্যাচারে বঙ্গদেশের সাময়িক পত্র রীতমত চলে না; কিন্তু "কলিকাতা জর্নালের" কথা স্বতন্ত্র। যথাযোগ্য লেখকের সাহায্যাভাবেই পত্রিকা অসময়ে প্রকাশিত হইত। তদ্ভিন্ন সুযোগ্য সম্পাদকের নিরবসরতা ও অসুস্থতা নিবন্ধন পত্রিকার বিস্তর ক্ষতি হইত। কিন্তু, এক্ষণ হইতে যথারীতি প্রচারিত হইবে জানিয়া,অপরিসীম হর্ষিত হইলাম। সম্পাদক-বিরচিত প্রথম প্রস্তাব বিলক্ষণ যোগ্যতার সহিত লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তিন বৎসরের একটী অদ্ভুত স্থূলকায় বালিকার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া একান্ত বিস্মিত হইয়াছি। এই পত্রিকার পুনর্জ্জন্মলাভ সর্ব্বত্র-আদরেরই আবশ্যক।

আহ্বান।

আর যে পারি না! ঐ দুর্ব্বহ যন্ত্রণাময় জীবন আর যে বহিতে পারি না! যে চাকরীতে আমাদের দেশ মাতিয়া রহিয়াছে, সে চাকরীর মদে আমার মন মত্ত হইতেছে না কেন? আমার মন সর্ব্বদা হু হু করে কেন? আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে কেন? অন্তরে সর্ব্বদা রাবণের চিতা জ্বলিতেছে কেন? খুনী আসামীর অন্তরের যে নিরন্তর অন্তর্দাহী যাতনা, তাহা আমি ভোগ করি কেন? উচ্চ পদের পোশাক পরিয়া সকলেই অহঙ্কারে টল মল হইয়া হাসিয়া খুসিয়া আমোদ-আহ্লাদে নিতান্ত বিভোর হইয়া বেড়াইতেছে! কিন্তু সে পোশাক আমার শেল বোধ হইতেছে কেন? শ্বেত-চরণে অঞ্জলি দিতে কত পোশাক-ধারী নবীন উৎসাহে মাতিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু সে দৃশ্যে আমার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় কেন? মধুর সঙ্গীত শুনিয়া আর সকলের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে, কিন্তু আমার মন কাঁদিয়া উঠে কেন? সকলের মুখে গাল-ভরা হাসি, কিন্তু আমার চক্ষে কত্তর অন্তর্বাহিণী ধারা কেন? অন্তঃস্থিত বজ্রের স্ফুরণে সকলকেই চমকিত করিতেছে—তাহার প্রহারে নিরুপায় স্বদেশীয়ের মস্তক চূর্ণীকৃত করিতেছে, আমাদের [illegible] কিন্তু তাহাতে আমার হৃদয় কাতর হয় কেন? দলে দলে বসিয়া বৃথা জল্পনায়, পরের নিন্দায় সকলেই মনের স্ফূর্ত্তিতে জীবন কাটাইতেছে, কিন্তু আমার হৃদয় বিষাদে পূর্ণ কেন? বিলাতী পরিচ্ছদে দাস-দেহ বিভূষিত করিয়া বিলাতী চর্ব্বা-চোষ্যে লেলিহমান রসনাকে পরিতৃপ্ত করিয়া, ও বিলাতী পেয়ে দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে বিঘূর্ণিত করিয়া, বঙ্গীয় যুবক আনন্দে কেমন জ্ঞান-শূন্য! কিন্তু কি পাপে এ দৃশ্যে তুষানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়? এ বিশ্বব্যাপী আনন্দে, এ সর্ব্বগ্রাসী আমোদ-আহ্লাদে আমি যোগ দিতে পারি না কেন? চতুর্দ্দিকে শ্বেতাননের পূজার ঘোর ঘটা! ভ্রাতৃবৃন্দ ভক্তিতে গদ্গদচিত্ত;—পঞ্চ আননে শ্বেতাননের স্তব করিতেছেন, বাছিয়া বাছিয়া পুষ্প চয়ন করিয়া চরণে অঞ্জলি দিতেছেন, ধূপ ধূনা গুগ্গুলের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। [illegible] উপাসকগণ শঙ্খ ঘণ্টা বাদন করিতেছেন; অন্ত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব বলি পড়িতেছে, [illegible] পরিষদের [illegible] আশার অনুরূপ নৈবেদ্যের আয়োজন হইতেছে। দেব-দেবীর প্রসাদ-ভক্তেরা ভক্তিভাবে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিতেছেন। আনন্দের সীমা নাই। কেন ভারতে

কি সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইয়াছে। যেন আট শত বৎসরের পর ভারতের অদৃষ্ট-গগনে আবার সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে! এমন উৎসবের সময় আমার প্রাণ কাঁদে কেন? কাঁদে কেন, কাহাকে বলিব? যাঁহাদের জন্য কাঁদিতেছে, তাঁহারাই যে উৎসবে উন্মত্ত। তাঁহারাই যে দেব-যাত্রায় সং সাজিতে বিশেষ মজবুৎ। শ্বেত দেবতার সন্তোষার্থ তাঁহারা বহুরূপী হইয়া পড়িয়াছেন। কখন রাজা, কখন রায় বাহাদুর, কখন ডেপুটি, কখন চাপরাশী নানা রূপ ধারণ করিতেছেন। পরকে ভুলাইবার জন্য সং সাজুন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু সং সাজিতে সাজিতে ক্রমে আসল সং হইয়া দাঁড়াইতেছেন, ইহাই যে সর্ব্বনাশের মূল। তাঁহাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই।— অথবা লক্ষ্য নাই বা কেমন করিয়া বলি? নিজের বেতন-বৃদ্ধি, নিজের বেশ-ভূষা—নিজের আসবাব, নিজের ভোজন-পারিপাট্য প্রভৃতিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বগ্রাসী লক্ষ্য। তাঁহার স্বজাতি নাই, স্বদেশ নাই, আত্মীয় স্বজন নাই, জ্ঞাতি নাই, কুটুম্ব নাই—"আমিই তাঁহার সর্ব্বস্ব।" 'স্বদেশ রসাতলে যাউক; স্বজাতির বংশ লুপ্ত হউক, আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব অনাহারে মরুক— সে সকল ভাবনা ভাবিয়া মাথা ঘুরাইতে পারি না। যাহারা পারেন, তাহারাই ও সকল ভাবনা ভাবুক'—[illegible] মন এই বলিয়া কিয়ৎক্ষিৎ আত্ম-গ্লানির হস্ত এড়াইয়া থাকে। 'ভায়া খুড়া জেঠা মামা খুড়ী জেঠী মাসী—তাঁহারা বসিয়া থাকিবেন, আর আমরা কপালের ঘাম পায় ফেলিয়া নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইব—আলস্যের ভরা পূর্ণ করিব—এ'ত পারি না' এই বলিয়া তিনি নিজের স্বার্থ-অন্ধ চরিত্রের সমর্থনা করিয়া থাকেন। যখন তিনি অসংখ্য ডিস্-শোভিত টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার চামচ-কণ্টকীর সঞ্চালনে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, তখন স্বর্গ যেন তাঁহার করতলস্থ হয়! 'সে সুখ ছাড়িয়া কে স্বজাতি-গৌরব ও স্বদেশানুরাগ লইয়া বৃথা সময় কাটাইবে? যে সকল উন্মত্ত যুবকের খাইয়া দাইয়া আর কাজ নাই, তাহারা ঐ সকল পাগলামী লইয়া থাকুক'—বিলাতী লোহিত জলে যখন মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়, মহম্মদী ডিসের সর্ব্বসঞ্চারী-রসে যখন রসনা গলিয়া যায়, তখন বঙ্গীয় যুবকের মুখে এই সব মর্ম্মভেদী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যে সকল যুবক বিদ্যা-মন্দিরের উচ্চতম সোপানে উঠিয়াও, আজ কাল কর্ম্মাভাবে অন্ন বিনা মারা যাইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি না। তাঁহাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তাঁহাদিগের শুষ্ক রসনায় এরূপ স্ফূর্ত্তির কথা বাহির হইতে পারে না। যাঁহারা বিদ্যার জোরে বা মুরুব্বির [illegible] পাইয়া—

ছেন, বা ওকালতীতে সাইন করিয়াছেন; তাঁহাদিগের মুখেই এইরূপ কথা শুনিতে পাই। অদৃষ্টের কথা কি বলিব? যাঁহারা জনক-জননীর চক্ষু অন্ধ করিয়া, প্রিয়তমাকে পাগলিনী করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন, সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিলাতী তেজ, বিলাতী স্বাধীনতা-স্পৃহা লইয়া আসিয়া নিস্তেজ ভারতের শিরায় শিরায় সেই সকল সংক্রামিত করিবেন—পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানালোকে আঁধার ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন; কিন্তু হায়! কি পাপে আমরা তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাবে দেখিতে পাই? তাঁহারা দেশকে ভুলিবেন কি? বিলাত হইতে দেশে পদার্পণ করিয়াই তাঁহাদিগের মনে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। হোম্ (Home) ছাড়িয়া আসিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদিগের মন হু হু করিতে থাকে! বাঙ্গালীর অর্দ্ধাচ্ছাদিত দেহ দেখিয়া তিনি লজ্জায় অধোবদন হয়েন! তাই বন্ধুর গায় জামা নাই, পায় মোজা নাই, পেন্‌টুলন্ কোট পরা নাই দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে, তাঁহাদিগের সহিত মেশামিশি করিতে, অধিক কি ভাই বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেও, লজ্জা বোধ করেন। 'আমি জজ, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট্, আমি সিবিল্ সার্জ্জন, আমি ব্যারিষ্টার্—আমার বাপ, আমার ভাই, আমার বন্ধু অর্দ্ধাবৃত দেহে বাড়িতে থাকে, আসনে বসিয়া আঙ্গুল চাটিয়া অসভ্যের মত ভাত খায়, অসজ্জিত ঘরে সামান্য শয্যায় শয়ন করে—এ'ত প্রাণে সহে না—কেমন করিয়া ইহাদিগকে বাপ, ভাই, বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিব? কেমন করিয়া এ লজ্জার কথা সাহেবের কাছে বলিব? সাহেব ইহা টের পাইলে যে আর সঙ্গে মিশিতে দিবে না?' এই সকল চিন্তায় বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী আকুল। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া অনন্যোপায় হইয়া শেষে তফাৎ থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেন।

এ দিকে জমিদার-শ্রেণী বিলাসিতার ক্রোড়ে চিরলালিত! পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদে না। কেন না, অভাব কি পদার্থ, তিনি জানেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি তোষামোদ-কারিগণেই পরিবেষ্টিত। তাহাদিগের মুখনিঃসৃত যশঃ-সৌরভে তাঁহার চিত্ত সতত আমোদিত! তাহাদিগের মুখে তিনি ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির, বিক্রমে ভীম, দান-শৌণ্ডে দাতাকর্ণ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বিদ্যায় তর্কপঞ্চানন! তিনি সর্ব্বগুণের আধার। তাঁহার এমন বন্ধু নাই যে, তাঁহার দোষ দেখাইয়া দেয়, অথবা বন্ধু থাকিলেও, তাহার সাহস হয় না যে, তাঁহাকে তাঁহার দোষ দেখাইতে পারেন! কারণ, তাহা হইলে বন্ধু তৎক্ষণাৎ তাঁহার দরবার হইতে নিষ্কাশিত হইবেন। তিনি হাই তুলিলেন, অমনি সকলে এক সঙ্গে তুড়ি দিতে লাগিল। তাঁহার মাথা

ধরিলে সকলে এক-বাক্যে আহা করিয়া উঠিল। এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে একটী জড়পিণ্ডবৎ হইয়া উঠেন। তাঁহার নিজের ভাবনা আসিতে হয় না। কারণ, তাঁহার পর্য্যাপ্ত ধন আছে। পরের জন্য কিরূপে ভাবিতে হয়, সে শিক্ষাও তিনি পান না। তিনি ক্রমে স্বার্থ-পরার্থ-বিহীন এক মুক্ত পুরুষ হইয়া উঠেন; কিন্তু পূর্ণ মুক্তি তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তিনি সকল বিষয়ে নিঃস্পৃহ হইয়াও, এক বিষয়ে স্পৃহাবান্। তিনি উপাধি-ভিখারী—এই জন্য তিনি শ্বেতাননের উপাসক। তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি একটী উপাধি কিনিতে পারেন, তিনি তাহাতেও কুণ্ঠিত নহেন। পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদে না, আপনা হইতে সুতরাং পরের দুঃখ-মোচনে তিনি এক পয়সা দিতে প্রস্তুত নহেন। তবে শ্বেতাননের ইঙ্গিতে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত। কি বিষয়ে অর্থব্যয় হইবে, তাহা তিনি জানিতে চান না, শ্বেত দেবতার তুষ্টি-বিধানই তাঁহার জীবনের এক-মাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য-সিদ্ধ হইলেই তিনি চরিতার্থ। কলেজ কর, দুর্ভিক্ষে ব্যয় কর, খাল কাটাও, রাস্তা কর, অথবা আপনারা খাও—কিছুতেই তাঁহার আপত্তি নাই। তাঁহার পক্ষে সবই সমান। শ্বেতানন! তবে তিনি কেবল তোমার নিকট এক বিষয়ে ভিখারী। তিনি তোমার নিকট [illegible]-প্রার্থী। তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটী উপাধি দেও। পতনোন্মুখ রোম-সাম্রাজ্যের ন্যায় তুমিও উপাধি-দান-বিষয়ে মুক্তহস্ত। তোমার কটাক্ষপাতে যখন দীন দুঃখীও রাজা হইতেছে, তখন যাহাদের কিঞ্চিৎ আছে, তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে?

এইরূপ অন্তঃসার-শূন্য, নির্লজ্জ, আপাত-ভোগ-তুষ্ট, ভাবিদর্শন-বিরহিত, স্বার্থমোক্ষ জড়পিণ্ড সকল লইয়া আমাদের সমাজ গঠিত। তাহার জন্যই বৈদেশিকেরা আমাদিগকে ক্রীড়া-পুত্তলীর ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা, ও যে প্রকারে ইচ্ছা সঞ্চালিত করিয়া থাকেন। এই জন্য আমাদের জাতীয় জীবন নাই, জাতীয় গৌরব নাই, জাতীয় মমতা নাই। বৈদেশিকেরা আমাদিগকে কুকুরের ন্যায় ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন—আজ জুতা লাথি খাইলেও, কাল আসিয়া তাহারা হাজির হইবে। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা স্বার্থের জন্য সমস্ত সহিতে পারে। তাহাদিগের মান অপমান বোধ নাই, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, আত্মগ্লানি নাই। তাহারা কিঞ্চিৎ বেতন-বৃদ্ধির জন্য—একটী উপাধি পাইবার জন্য, কখন কখন জন্ম ভরিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির আশায়—বৈদেশিকের চরণে জাতীয় স্বার্থ বলি দিতে পারে। তাহাদিগের উপযাচক হইয়া স্বদেশীয় ভ্রাতার দুখ [illegible], [illegible], [illegible] বিনা অপরাধে বৈদেশিকের সৌহি-

তাঁজন হইতে লজ্জা বোধ হয় না। তাহাদিগের প্রচুর ফটোগ্রাফ্ মাথায় করিয়া দাসীকে (গৃহীকে) দেখাইবার জন্য গৃহে লইয়া যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিতে ঘৃণা বোধ হয় না। তাহাদিগের—আমি তোমার গোলামের গোলাম, আমার চৌদ্দ পুরুষ তোমার গোলাম—ইত্যাদি লজ্জাকর স্তুতি-বাক্যে প্রচুর মনস্তুষ্টি-বিধানে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হয় না।

আর কত বলিব? এ মর্ম্মভেদী কাহিনী যে আর গাইতে পারি না। এ আত্ম-গ্লানি-কর জাতীয় দুর্গতির কথা লেখনীতে আর যে লিখিতে পারি না! এই সকল জাতীয় অগৌরবের ইতিহাস আর যে প্রচার করিতে পারি না! বুক যে ফাটিয়া যাইতেছে! চক্ষু দিয়া যে রক্ত বাহির হইতেছে! কাহার নিন্দা করিতেছি? যাহার নিন্দা করিতেছি, সে যে আমার প্রাণ! আমি যে পৃথিবীতে আর কিছু জানি না! ভারতবাসী! তুমিই যে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সবই যে তুমি। তবে কেন নিন্দা করিতেছি? ভাই! প্রাণাধিক! তোমার নিন্দা সহিতে পারি না বলিয়াই তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছি। ক্ষমা কর। আমার তিরস্কারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া আত্মদোষ সংশোধন কর। তুমি যে চিরদিন বৈদেশিকের চরণে দলিত হইবে, ইহা আমি দেখিতে পারিব না, এই জন্য ক্ষত-স্থান দেখাইয়া দিতেছি। ক্ষত-স্থান বাড়িতে দিও না। সঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ কর। আবার জাতীয় জীবন পাইবে! এখন আমাদের সময় নয়। উন্মত্তের ন্যায় নির্লজ্জ হাসি হাসিয়া দিন কাটাইও না। জাতীয় তরি ডুবু ডুবু হইয়াছে, এখন নৃত্য রাখ। একার কাজ নয়। আইস—আমরা বিংশতি কোটী মিলে জল ছেঁচিতে আরম্ভ করি। যে জল ঢুকিয়াছে, কত দিন তাহা ছেঁচিয়া উঠিতে পারিব, বলিতে পারি না; তবে 'কালস্য কুটিলা গতিঃ।' কে বলিতে পারে যে, আমরা এক দিন ছেঁচিয়া, উঠিতে পারিব না? ঐ দেখ, প্রাচ্যে নগণ্য জাপান ঠেলিয়া উঠিতেছে, ঐ দেখ প্রতীচ্যে পতিত ইতালী আবার উঠিয়াছে! তবে কেন ভয়! মিলে সব ভাই এক মনে, এক প্রাণে সাধি স্বদেশের কাজ। ভাই ভাই গাওরে এস মা তাই ভাবত।'

শ্রীকরুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্ধু-বিয়োগ।

কি কুক্ষণে নদীয়ায় ম্যালেরিয়া জ্বর প্রবেশ করিয়াছে! কত যে পরিবার প্রিয়-জনের শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহা গণনা করিয়া উঠা যায় না।

হাহাকার শব্দে গগন বিদীর্ণ হইতেছে! পুত্রশোকাকুলা জননী ও পতিবিয়োগ-বিধুরা রমণীর অশ্রু-জলে ধরাতল অবিরত অভিষিক্ত! নিরাশার-আঁধারে চতুর্দ্দিক্‌ আচ্ছন্ন! সকলেই বিষণ্ণ! সকলেই কাতর! যে নদীয়ার প্রতিভা, ও পাণ্ডিত্য গৌরবে জগতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল, যে নদীয়া ভাষা ও সভ্যতার বহু কাল ধরিয়া বঙ্গের আদর্শ, সরস্বতীর বিলাসভূমি, রাজরাজেশ্বরী, সেই নদীয়া, এখন রসাতলে যাইতেছে দেখিয়া কাহার প্রাণ না কাঁদিবে?

যে প্রিয় সুহৃদের মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া আজ আমরা আর্য্য-দর্শনের শরণাপন্ন হইয়াছি, যাঁহার পবিত্র-স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত আর্য্যদর্শনের ক্রোড়ে আজ তাঁহাকে শায়িত করিতেছি, তাঁহার নাম ভদ্রনাথ মুকুল। যাঁহাদের অকাল-মৃত্যুতে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর শোকাকুল, ইনি তাঁহাদিগের শীর্ষ-স্থানীয়।

যেমন নিবিড়-কানন-স্থিত সরোবরের পদ্ম আপনি ফুটিয়া আপনি বিলীন হয়, দুই এক জন পথিক কদাচিৎ সেই পথ দিয়া যাইলে, তাহার সৌরভে মুগ্ধ হয় মাত্র, সেইরূপ আমাদের প্রিয় বন্ধু ভদ্রনাথ, নির্জ্জনে ফুটিয়া সৌরভে পার্শ্বস্থ বন্ধু-বান্ধব ও পরিজন-বর্গকে আমোদিত করিয়া পূর্ণ-বিকসিত হইতে না হইতেই অকালে বিলীন হইয়াছেন। ১২৫৫ সালের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯) ভদ্রনাথ কৃষ্ণনগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। ছয় বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি কৃষ্ণ-নগরে ব্রজ বাবুর স্কুলে, দশম বৎসরে চর্চ্চ-মিশন স্কুলে এবং চতুর্দ্দশ বৎসরে কালেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় ক্রমান্বয়ে ষোল বৎসরে এণ্ট্রান্স, ১৯ বৎসরে এল্ এ, ২১ বৎসরে বি এ, ও ২২ বৎসরে বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৩ সালে তিনি বারে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু তথায় সুবিধা না হওয়ায়, ১৮৭৪ সালের জুন মাসে সব্ ডেপুটী কালেক্টরের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু তাঁহার তেজস্বী মন বহু দিন এরূপে আবদ্ধ হইবার নহে। এক বৎসর অতীত না হইতেই, তিনি দাসত্ব-শৃঙ্খল ভেদ করিয়া ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে আবার বারে প্রবিষ্ট হন। এবার বার তাঁহাকে উৎক্ষিপ্ত করিল না। দিন দিন তাঁহার প্রাক্‌টিশ বাড়িতে লাগিল। তিনি নিজেরকার্য্যেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন এরূপ নহে; সাধারণ অনেক কার্য্যে তাঁহার সময়ের অনেকটা ব্যয়িত করিতেন। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল-কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক, মিউনিসিপাল কমিসনর ও জন্মমৃত্যুর রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি অনেক গুলি সাধারণ অবৈতনিক পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি দীন দুঃখীর মা বাপ ছিলেন। দরিদ্রের কুটীরে রোগীর রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে ভদ্রনাথ সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হইতেন। তাঁহার যেরূপ পসার ছিল, তিনি [illegible] না,

কারণ, দীন দুঃখীর নিকটে তিনি পয়সা লইতেন না। কৃষ্ণনগর কালেজের ব্যবহার-শাস্ত্রের অধ্যাপক, সুযোগ্য ব্যবহারাজীব বাবু প্রসন্নকুমার বসু ভদ্রনাথকে ফৌজদারী আইনের অভিজ্ঞতা-বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন, কালে ভদ্রনাথ কৃষ্ণনগরের প্রধান উকিল হইবে।

ভদ্রনাথ কি রকম দরের উকীল ছিলেন, তাহা লইয়া আন্দোলন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। উচ্চ-শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিমার্জ্জনার সহিত হৃদবৃত্তির ভূয়সী পরিচালনা হইলে, মানুষ যে দেবতা হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই আমাদের এই উদ্যম। ভদ্রনাথের হৃদয় কাচবৎ স্বচ্ছ ছিল। ভদ্রনাথ মূর্ত্তিমতী সরলতা ছিলেন। এই জন্য তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। তাঁহার সমসাময়িক কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্রেরা অনেকেই উচ্চ পদে অভিষিক্ত রহিয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তিনি সকলেরই শান্তিস্থল ছিলেন। প্রত্যেকেই ভাবিতেন যে, ভদ্রনাথ তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। বস্তুতঃ ভদ্রনাথ সকলকেই প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে পারিতেন, এই জন্য কেহই কোন বৈষম্য উপলব্ধি করিতে পারিত না। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় সকলকেই হৃদয়ে ভরিয়া রাখিতে পারিত। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার বিচ্ছেদ অসহ্য মনে করিতেন। তিনি যেখানে থাকিতেন, ভদ্রনাথের সংবাদ দুই দিন না পাইলে, অধীর হইতেন। ভদ্রনাথের হৃদয় বিদেশস্থ বন্ধু-বান্ধব-গণের জন্য সতত কাঁদিত। ভদ্রনাথের আপন পর বড় বোধ ছিল না। এই জন্য কৃষ্ণনগরের প্রতি পরিবার ভদ্রনাথকে আপনার বলিয়া জানিত। ভদ্রনাথের প্রফুল্ল হৃদয় কৃষ্ণনগরকে প্রফুল্লিত করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি সকলের দুঃখে ব্যথিত হইতেন, এবং প্রাণপণে যত দূর সাধ্য সকলের দুঃখমোচন করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আয়ের অধিকাংশই পরের দুঃখ-মোচনে ব্যয়িত হইত। দরিদ্রের বন্ধু, বন্ধুর প্রাণ, কৃষ্ণনগরের জ্যোৎস্না—সেই ভদ্রনাথ ১২৮৮ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে দীন-দুঃখীকে অনাথ করিয়া, বন্ধুগণকে অর্দ্ধ-মৃত করিয়া, ও কৃষ্ণনগর আঁধার করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। ভারতগগন হইতে একটী নক্ষত্র খসিল! ভদ্রনাথ কাল-সাগরে বিলীন হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি অনন্ত কালের জন্য লেখক-হৃদয়ে বিরাজমান রহিল।

একণে ভদ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধুগণের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা—তাঁহারা সকলে মিলিয়া ভদ্রনাথের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার নামে কৃষ্ণনগর কালেজে একটী স্কলার্সিপ সংস্থাপন করুন। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী

লালমোহন ঘোষ, লক্ষীপুরের প্রথম মুন্সেফ শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ...সাযের একষ্ট্রা আসিষ্টেণ্ট কমিসনর যোগেশচন্দ্র চাট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গুলি বিশিষ্ট লোক তাঁহার অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। আশা করি—তাঁহারা সকলেই উদার ভাবে এই কার্য্যে উদ্যোগী হইবেন।*

শ্রীশ্যামমাধব রায়।

চুঁচুড়া।

বাল্মিকী-কল্পকুঞ্জ-দৃশ্যাবলি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—কৈলাস পর্ব্বত।

ভগবতী অভিমানিনী—মহাদেব সম্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান।

মহাদেব।—

নিরানন্দময়ী আজি কেন দয়াময়ি।
ভব-তলে আজি শুক্লাষ্টমী
মহা-ভক্তি ভাবে ভব-জন আজি
ভজি'ছে শ্রীপাদ-পদ্ম তোমার অন্নদে!
মহা-ভক্তি-ভাবে পূজিব শ্রীপাদ-পদ্ম
আজি—তবে কেন চির-সুপ্রসন্নময়ী
নিরানন্দ মুখে?—চিরদিন এ তাপস
হে অম্বিকে! তব পদাম্বুজ ভ'জি—তবে
কি পাপে এ বিষ-যোগ সহসা হইল?
তব পাদ-পদ্ম ধ্যানে আজীবন এ যোগী,
যোগময়ি!—তবে কেন বিরস বদনে
বৈস বসু সিংহাসনে ভকত-বৎসলা?
প্রেমের পাগল ভোলা পূজিবে তোমারে।

ভগবতী।—

কি পাপে শ্রীপদে কেন দোষী এ কিঙ্করী।
আজীবন শিব-পদে নতুবা পূজিয়া
সহি হেন কষ্ট নাথ!—
তব প্রিয় নহে যাহা তাই চিন্তিয়াছি
তাই বুঝি এ যন্ত্রণা সহি সেই পাপে?
দাসীর অচিন্ত্য তুমি, কায়-মনে ভজি
আজীবন—তবু নাথ নারিনু চিনিতে।
শুনে'ছি শ্রীমুখে দাসী—কিঙ্করীর দেহে
ফুটিলে কণ্টক নাথ!—শ্রীঅঙ্গেতে নাকি
ভীষণ ও শূল চেয়ে বাজে গুরুতর!
অজানিত নহে নাথ—কি না জান তুমি?
পড়িলে শোকের ধারা সতীর নয়নে
যে জ্বালা সহে এ দাসী (অবিদিত নহে
তব হে সর্ব্বজ্ঞ।) অসংখ্য ত্রিশূলাঘাত—
ত্রৈলোক্য-সংহারী—নহে তার সমতুল।
তাই নাথ! নিশ্চয় জেনে'ছি—নহে কেন
সহি জ্বালা পূজি' কায় মনে সে চরণ

---

* আমার অনুরোধে ও আমার মতের ভাব লইয়া আমার প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধু সুযোগ্য আর্য্য-দর্শন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই ক্ষুদ্র জীবনী লিখিয়া দিয়াছেন।

ভজি যাহে ভব-জন মহাপাপে পাপী
হয় পার অবহেলে ভীম ভবার্ণবে ?
তোমার অনিচ্ছা বাঞ্ছা তাই চিন্তিয়াছি
এ যন্ত্রণা বিশ্বনাথ ! সহি সেই পাপে !—
আজি হ'তে এ নিয়ম স্থাপিলী কিঙ্করী
স্বর্গ-মর্ত্ত্যে সর্ব্ব-স্থলে সতী যেই নারী
কদাচ চিন্তিবে নাহি—নহে প্রিয় যাহা
পতির ;—সতীর পাপ হে খণ্ড-পরশু
পতি তুমি,ক্ষম নাথ—ক্ষম কৃপা করি' ।
[illegible]—সেই দিন হ'তে
কৃপায় করুণাময় তার হে কিঙ্করী !
(গললগ্ন বস্ত্রে শিব-পদে অঞ্জলি প্রদান)

মহাদেব।—
(আদরে ভগবতীকে উৎসঙ্গ-প্রদেশে বসাইয়া)
জানি আমি মহাদেবী কি হেতু দুঃখিতা
কি হেতু এ বিধু-মুখ মলিন করিয়া
অধোমুখে।—কব কায় নগরাজ-বালে !
কত যে আদরে মোরে পুজে রক্ষরাজ—
কত ভালবাসি আমি রক্ষ-কুলেশ্বরে—
শক্তিধরাধিক হায়—জান তুমি ভালে।
প্রাক্তনের গতি এবে কা'র সাধ্য রোধে !
কনক উদয়াচলে— বিদরে হৃদয়
স্মরিলে সে কথা হায় নগেন্দ্র-নন্দিনি !—
কনক উদয়াচলে উদিবার আগে
দেব দিনমণি, রক্ষ-কুলাদিত্য হায়
বীরেন্দ্র রাবণি হইবেন অস্তমিত
ডুবা'য়ে কনক লঙ্কা অনন্ত তিমিরে।
নির্ভয়ে অমরালয়ে উন্মত্ত উৎসবে
হবেন দেবেন্দ্র কালি দেব-দল সহ !—
তোষি' মোরে ভীমবাহু লঙ্কার দুয়ারে
সুমিত্রা-নন্দন শুর-বীর-সঙ্গায়কে

অসা'সে লভিবে বর রাক্ষস-বিনাশে।—
প্রাক্তনের গতি দেখি ! কা'র সাধ্য রোধে ?
—ঐ শুন মর্ত্ত্যলোকে বাজে ঘোর রোলে
নানা বাদ্য—ভব-জন মহা ভক্তি-ভাবে
পূজি'ছে দুর্ল্লভ পদ তোমার আমোদে !
কেন এ ছলনা পাত অকিঞ্চন জনে
শঙ্করি ?—কিঙ্কর এ বিক্রীত চরণে।
ত্যজ নিরানন্দ এবে পূর্ণানন্দময়ি !
প্রসন্ন-বদনে বৈস রত্ন-সিংহাসনে।
নবীন প্রকৃতি নবীন সকল
সৃষ্টি-[illegible] ([illegible]
যত দেখিয়াছি এই সৌরি-[illegible]—
অনাদি—অনন্ত কাল—পুজি'ছি শ্রীপদে
এ ছলনা আজি কেন পাত মহামায়া ?
জানি আমি মহা-দোষে দোষী শ্রীচরণে
বহু দুখ দিয়াছি তোমায় নগবালে—
ক্ষম অপরাধ এবে নগেন্দ্র-নন্দিনি !
বৈস হৈম-সিংহাসনে অন্নপূর্ণা-রূপে
পুরাও ভক্তের বাঞ্ছা ভকত-বৎসলে !—
(হেমদণ্ড হস্তে নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী।—(প্রণামান্তে)
স-কুঙ্কুম বিল্ব-দলে ল'য়ে সযতনে
দাঁড়ায়ে নিয়তি দেবী কৈলাস-দুয়ারে
পূজিতে শ্রীপাদ-পদ্ম !—মকরন্দ-মাখা
পারিজাত ল'য়ে স্বাগত অমরদল,"—
নাচিছে উল্লাসে পূজিতে ভবের রাণী !—
মাহেন্দ্র-যোগ যায় অকারণে যোগেন্দ্র !
পুরাও অমর-বাঞ্ছা বাঞ্ছা-কল্প-তরু !—

মহাদেব।—
হে নন্দি ! ত্বরায় হেথা আন নিয়তিরে !
সর্ব্বকালে—সর্ব্বস্থলে—যাহে মা অমরে—

ব্রহ্মার এ সৃষ্টি মাঝে—নাহি হেন স্থান
বারিত দুয়ার যাহে নিবারে তাহারে ?
আন হেথা ত্বরা নন্দি !—হের দেব-দলে
মহা ব্যগ্র পূজিবারে উমার শ্রীপদ !
মহা ব্যগ্র পূজা হেতু আমিও আপনি !
জানি আমি যেই হেতু আসিছে নিয়তি
আন ত্বরা নাশি' বিঘ্ন পূজিব উমারে !—

মহাদেব।—
বিদরে হৃদয় মোর হায় মহাদেবি !
স্মরিলে সে কথা হায় ! কত যে আদরে
পুত্রের মঙ্গল হেতু পূজে লঙ্কেশ্বর
না পারি কহিতে আর ! কার সাধ্য রোধে
তব গতি, খণ্ডে আর প্রাক্তনের ফল ?—
যেই অস্ত্রে নাশিলাম স্বহস্তে ত্রিপুরে
এই সেই মহা-অস্ত্র !—ইহার আঘাতে
[illegible] শচীনাথে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিয়তি।—(প্রণামান্তে)—
কি হেতু আইনু আজি দরশিতে পদ
হে পরেশ ! অবিদিত নহে কিছু তব।
যে দিন সৃজিলা, প্রভো ! এ সৌর-মণ্ডল
ব্রহ্ম রূপে, সে দিন হইতে আদেশিলা
এ দাসীরে, নাশিবিতে বিশ্ব-ভার দেব !
মৃত্যু-রূপে বিশ্বপতি !—তব বরে প্রভো
নিয়মিত কালে দাসী ভ্রমে মর্ত্ত-লোকে
জীর্ণ কলেবর নাশি !—এত দিনে প্রভো
সমাগত রক্ষ-কুল-নির্ম্মূলের কাল !
অবিদিত নহে তব হে শম্ভু পরেশ !
আদিত্য উদয়াচলে উদিবার আগে
চির অস্তমিত হ'বে কর্ব্বুরের রবি
বাসব-বিজয়ী আজি বীরেন্দ্র রাবণি !
আছে বাসী রক্ষকুল প্রভুর রক্ষিত
তাই দাসী অনুমতি হেতু এ আনন্দ-ধামে
আগত প্রভো !—কি সাধ্য লঙ্কায় দেব !
অমঙ্গল সাধে, যত দিন বাম প্রভু
না হন আপনি তার প্রতি !—কালাগত
সমাগত এ কিঙ্করী তাই শ্রীচরণে !—

দেয় অস্ত্র রামানুজে—পশি' মায়া-বলে
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, বীরাচারে তোষি'
শূর-সিংহ আমায় হে মহাদেবি ! আজি
দেবের অসাধ্য যশ লভিবে সৌমিত্রি !—
সাবধান !—নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ-সমাপনে
অজেয় সবার বীর বাসব-বিজয়ী !—
উমার ইচ্ছা কভু নাহি রহে অপূর্ণ।—
(অসি প্রদান)
আজীবন আমা দোঁহে পূজি রক্ষরাজ
এই কি পাইলা ফল হে করুণাময়ি ?—

(নিয়তি দেবীর প্রস্থান।)

ভগবতী।—
(উৎসঙ্গ-দেশ হইতে নামিয়া, গললগ্ন-বস্ত্রে
এবং করপুটে)—
বিশ্বনাথ ! দাসীর মান রাখিলা আপনি
হে স্বয়ম্ভু ! শ্রীচরণে এ মিনতি মম
চিরকাল শ্রীচরণে থাকে যেন মতি !—
করুণা ন্যায়ের নারি হে করুণাময়
দয়ায় দাসীর আশা মিটাইলা আজি !—
নূতন ব্যাপার প্রভো—নভ-দেশে সবে
সমাগত দেবদল পূজিতে দাসীরে
বিশ্বনাথ তব সহ !—[illegible] দেব

পূরাও হে দয়াসিন্ধো! এতুচ্ছ দাসীরে—
শিবময় তব ইচ্ছা জানে দাসী নাথ—
শিব ইচ্ছা-তব নাথ হউক পূর্ণিত!—
যে ইচ্ছা দাসীর প্রতি আদেশ দাসীরে।

মহাদেব।—(দাঁড়াইয়া করপুটে)—
কিঙ্করে শঙ্করি! আজি ত্যজহ ছলনা!
বৈস রত্ন-সিংহাসনে অন্নপূর্ণা-রূপে
অন্নদা! পূজিব সাধে চরণ-যুগলে!—
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হেতু মহা শক্তি যবে
সৃজিলেন আমা তিনে—সেই দিন হ'তে
এ তাপস ও চরণ-ধ্যানে নিয়োজিত!—
নিমগ্ন তপঃ-সাগরে আছিলাম যবে
কারণ-নীরে কৃপায় হে করুণাময়ি,
কৃতার্থ করিলা দাসে অর্দ্ধ-অঙ্গ-দানে!—
কে তুমি করুণাময়ি! অচিন্ত্য যদিও
সবাকার—তবু দাস তোমার প্রসাদে
জানে ইহা, অচিন্ত্য যে তুমি চিন্ময়ি!—
দিব্য জ্ঞান দেও গো অন্নদে! ভক্তি-ভাবে
ভকত-বৎসলা যেন পাই পূজিবারে!—

(ভগবতীর হৈম-সিংহাসনে উপ-
বেশন, শূন্য হইতে কুসুম-
বর্ষণ এবং দেবগণের
স্তোত্র—)

জয় মা তারিণী, রুদ্রেন্দ্র-গৃহিণী
কলুষ-নাশিনি গণেন্দ্র-জননি।
পূরাও জননি! অমর-বাসনা
জয় বিশ্বমাতা জয় ত্রিনয়না!
সর্ব্ব জীবে দয়া কর হেন জন্য
পাপ দৈত্যে নাশি' অয়ি মহামায়া!—
তোমার সংসারে দুষ্ট অহঙ্কারে
তব জীবে নাশি সমরূপে ফিরে!—
যে দিন সৃজিলা এ সৌর-মণ্ডল
পরম পবিত্র তখন আছিল!
রোগ শোক তাপ ভবে নাহি ছিল—
সকলি পবিত্র সুন্দর আছিল।
নদী-রজ-রেখা নিত নিরমল
শব্দ-বহ-ভেদী তুঙ্গ হিমাচল!
রজতের ধারা মৃদুল-বাহিনী!
মকরন্দ-মাখা বন-সুশোভিনী!
নবীন প্রকৃতি নবীন সকল
মগন উৎসবে মূঢ় নর-দল!
পাপের পীড়নে পড়ে নাই তবে।
জানে নাই মাতঃ এমন যে হবে!
ভবের সাগরে ভাসিয়া বেড়ায়
জলবিম্ব জলে বিমিলিত হয়!
নরের জীবন বড় শোচনীয়!
স্মরিলে জননি! মর্ম্মে ব্যথা হয়!
পাপ-প্রলোভন না পারে এড়াতে
প্রলোভনে মজি' মজে নিরয়েতে!
না জানে কি হবে, না জানে কি হয়
নর-দশা হেরি বুক ফেটে যায়।
নরের যন্ত্রণা নাশ মা অম্বিকে!
জয় জয় জয় জগত-পালিকে!
জয় জয় জয় জগত জননি!
দুষ্ট পাপাসুর-শির-বিঘাতিনি!
জয় দয়াময়ি দুর্গতি-নাশিনি!
পাপ-প্রলোভনে তার মা তারিণি!
হতভাগ্য নর তোমার ভুবনে!
যেন নাহি ডরে পাপের পীড়নে!
তোমার ভুবন যেন মা উল্লসে
পূজি তব পদ আনন্দে হাসে!

পাপ দৈত্য যেন আর সনাতনি !
কলঙ্কিত নাহি করে তোমার ধরণী
না করে !—আহ্লাদে মহিমা কীর্ত্তন
স্তব স্তোত্র ভবে করে সর্ব্বজন !
জয় জীব জন্ম মৃত্যু জয় জায়া !
জয় বিশ্ব-রূপা জয় মহামায়া !
জীবের যাতনা ঘুচাও জননি
জয় জয় জয় ব্রহ্মসনাতনী !
জয় জয় জয় অনাদি ব্রহ্মাণী !
জয় ভব দারা শান্তি-বিধায়িনী !
পূরাও জননি অমর-বাসনা !
জয় মা শঙ্করি ! কর মা করুণা !—
(কৈলাস দ্বার হইতে নন্দী—)
'জয় জয়' বলি দিয়া করতালি
উঠ রে উল্লাসে অখিল মণ্ডলি !
পাপ-চক্ষু বুজি জ্ঞান-চক্ষু খুলি
দেখরে সকলে হয়ে কুতুহলি—
এ আনন্দ-ধামে, মহানন্দে মজি
পূজে সদানন্দ আনন্দময়ী আজি !
সূর্য, শশী, রাহু, বুধ, শনৈশ্চর—
গ্রহ, উপগ্রহ আনন্দে বিভোর !
ক্ষিতি, অপ, তেজ, ব্যোম, সমীরণ
পল, অনুপল, বার, তিথি গণ—
সদানন্দ সহ আনন্দিত মন
পূজিছে আনন্দে অন্নদা-চরণ !
আনন্দে ছুটিছে সুরপ্রবাহিনী
সুর-পুরে অই স্বর্ণমন্দাকিনী।
মর্ত্ত্যে সুরধুনী মৃদু কল কলে
উচ্ছ্বাসে বারতা সিন্ধু-কানে ঢালে !
স্মিতা ভোগবতী উল্লাসে উথলে
আপনার মনে অই রসাতলে !

'জয়' 'জয়' রবে অই ত্রিলোচন
ভরিয়া অঞ্জলি পুষ্প বরিষণ
করে শক্তিপদে ;—ভাবে গদ গদ
মুখে বম্ বম্ ভাবে উমাপদ !
আঁধিয়া ডাধিয়া ডমরু বাজা'য়া
শিবার আসন ঘুরিয়া ঘুরিয়া
আনন্দে বিভোর দেব-ত্রিলোচন
ভক্তি-সিন্ধু-মাঝে হয়ে নিমগন !
'জয়' 'জয়' রবে দেবের মণ্ডলী
আসারে কুসুম ভরিয়া অঞ্জলি !—
হের ব্রহ্মলোকে দেব পদ্মযোনি
অষ্ট চক্ষু মুদে চিন্তে সনাতনী !
উচ্ছ্বাসে কাঁপিছে অই ব্রহ্মপুরী
কমণ্ডলু অই যায় গড়াগড়ি !—
শ্রীধামে রমেশ মহাকুতূহলী
চতুর্ভুজে অই ঘন করতালি !
"জয়" "জয়" মুখে সুরভি-নিশ্বাসে
পরিমলময় সমীরণ হাসে
দোলায়ে কৌস্তভে !—ক্ষীরোদের জলে
খেলে সমীরণ মহা কুতূহলে !
ক্ষীরোদ-লহরী আনন্দে উথলে
গা ঢালি অনিল মৃদু মৃদু দোলে !—
আনন্দে নন্দনে অই মনমথ
ফুলে ফুলে উড়ি প্রজাপতি মত
ফুলচাপে যত ফুলদলে যুড়ি
নন্দন-রঞ্জন যতেক মঞ্জরী !
মনসিজ আজি মনের হরষে
শিবা-শিব-পদে সঘনে বরষে !
"জয়" "জয়" রবে গুঞ্জরি ভ্রমর
উমার শ্রীপদে ছাড়িছে ঝঙ্কার !
পাশে পাশে ধায় প্রজাপতি-দল

ব্রহ্মাণী-চরণে নাচিছে ব্রহ্মল।—
তাল, তমাল, কদম, বকুল,
অশোক, রসাল আদি তরুকুল
হর্ষ-অশ্রুপাত করে ঘন ঘন।
বিটপীর তলে যম বরিষণ।—
মর্ত্ত্যে নরলোক উচ্ছ্বাসে নাচিয়া
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশী, বাঁশী বাজাইয়া
উর্দ্ধনেত্রে সবে।—মুখে "জয়" "জয়"!
জয় সনাতনী— জয় জয় জয়।
জয় জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়-জায়া!
জয় বিশ্বরূপা জয় মহামায়া!
জীবের যাতনা ঘুচাও জননি!
জয় জয় জয় ব্রহ্মসনাতনী!
পূরাও জননি! জীবের বাসনা
জয় মা শঙ্করি, জয় ত্রিনয়না!—

(মর্ত্ত্য হইতে)—

জয় জয় জয় জয়দে বরদে!
সারদে, সুখদে, মোক্ষদে জ্ঞানদে!
জয় ত্রিনয়না জয় মা তারিণি!"
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনি!
জয় জয় জয় আদ্যা সনাতনি।
জয় মা অম্বিকে ভূভার-হারিণি!
কিঙ্কর চরণে করে মা মিনতি
আজীবন যেন রহে পদে মতি!—

"—মহিষঘ্নি! মহামায়ে! চামুণ্ডে!
মুণ্ডমালিনি!
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমস্তুতে।
ভূত-দৈত্য-পিশাচেভ্যো রক্ষোভ্যশ্চ
মহেশ্বরি!
দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ ভয়েভ্য
স্ত্রাহি মাং সদা।
সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে! শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে!
উমে! ব্রহ্মাণি! কৌমারি! বিশ্বরূপে!
প্রসীদ মে!
পুত্রান্দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ
দেহি মে!
চন্দনেন সমারব্ধে কুঙ্কুমেন বিলেপিতে
বিল্বপত্র কৃতাবাসে দুর্গেহহং শরণং গতঃ।"

(নন্দন কানন হইতে কামদেব,—)

"অশোক-নির্ভর্ৎসিত-পদ্মরাগং
আকৃষ্ট-হেমদ্যুতি-কর্ণিকারং
মুক্তা-কলাপীকৃত-সিন্ধুবারং
বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তি!
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব—
বাসোবসানা তরুণার্করাগং
পর্য্যাপ্ত-পুষ্প-স্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব
সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিবৃদ্ধ-তৃষ্ণং
বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফং
প্রতিক্ষণং সংভ্রমলোল দৃষ্টি-
লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী।"†

(ব্রহ্মলোক হইতে—)

"জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দু-কৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নতপয়োধরাং
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং॥
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং
ক্রমাদধঃ॥

† কুমারসম্ভব।

তীক্ষ্ণবাণাং তথাশক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্ মহিষং তদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥
শিরচ্ছেদোদ্ভবং দানবং খড়্গপাণিনং।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং ॥
রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটী-ভীষণাননং ॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা ॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ স্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং ॥
শক্রক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদাং ॥*"

(গোলোক হইতে—)

"ভগবতি ভগবন্ধেহে ভবভাবিনি কামদা।
শঙ্করি কৌশিকি ত্বং হি কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে ॥
প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে।
কুলদ্যোতকরে দেবি জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥
উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে ত্বং প্রচণ্ডবলনাশিনী।
রক্ষ মাং সর্ব্বতো দেবি বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তুতে ॥
দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভ-নিবারিণী।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভব ॥
দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি মাং শঙ্করপ্রিয়ে।
মহিষাসুরসংহন্ত্রে প্রণতোঽস্মি প্রসীদ মে ॥
হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভং।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারং হরপ্রিয়ে ॥
কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
ধর্ম্মার্থ-মোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥*"

মহাদেব—

"করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কলিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাং ॥
সদ্য-ছিন্ন-শিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ-করাম্বুজাং।

* কালিকা পুরাণ।

* কালিকা পুরাণ।

অভয়াং বরদাঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাং ॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথৈবচ দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীং গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং ॥
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-
পয়োধরাং ॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীংহসন্মুখীং
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্তা ধরাং বিস্ফুরিতাননাং ॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়-
বাসিনীং।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাং
দন্তুরাং দক্ষিণাব্যাপি মুক্তালম্বি কচোচ্চয়ং

* * * *

শিবাভির্ঘোর রাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং
মহা কালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং ॥
সুখ-প্রসন্ন-বদনাং স্মেরানন-সরোরুহাং ॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং
মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মহেশ্বরি
মদাশ্রয়ং ॥—"

যবনিকা পতন।

(ক্রমশঃ)

কান্না।

We wandering, go
Through dreary wastes and weep each others woe—POPE.

গত বৈশাখ মাসের আর্য্যদর্শনে প্রকাশ হইয়াছিল,—হাস্য; আজ আমরা লিখিতেছি, কান্না! মিত্র মহাশয় "হাঁসি"—লিখিয়া অনেককে হাঁসাইয়াছেন,—অনেক স্থলে ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন, অনেককে উত্তেজিত করিয়াছেন, আর আমার কান্নার কথা। কান্নার কথায় কেহ হাসিবেন, সে—প্রত্যাশা অল্প,—কান্নার কথায় কেহ যে আদর করিবে—সেও অন্যায় আশা! কিন্তু কান্নার কথায় কাঁদ, আর হাস, দুই সমান। আমি বলি, বঙ্গে হাসির দিন গিয়াছে,—ভারত-ললাটে হাসির ছবি আর নাই, কাঁদিবার সময় বাঙ্গালির, দাসত্বই জীবন, বল বুদ্ধি ভরসা সমস্তই কান্নায়,—এখন হাসিলে চলিবে কেন? বাঙ্গালির ভুলিয়া হাসিলেও পাপ! বাঙ্গালি ভুলিয়া হাসিত বলিয়াই ৯ আইনের সৃষ্টি! এখন যদি কাঁদিতে শিখি,—তবেই দেশের—সমাজের মঙ্গল! কান্না জীবনের প্রথম অবলম্বন, প্রথম সহচর। তুমি যদি পৃথিবীর মুখ দেখিয়াই না কাঁদিয়া থাক, তোমার মাতা তোমাকে কাঁদাইবার জন্য নিশ্চয়ই কত চেষ্টা করিয়াছেন,—তোমার প্রথম জীবনের সহায়, মঙ্গলেচ্ছু ধাত্রী কত

করিয়া তোমায় কাঁদাইয়াছেন। যে ভূমিষ্ঠ হইয়া না কাঁদে, নিশ্চয়ই তাহার পিতা মাতা কাঁদেন। আর এই জীবনের শেষ অবলম্বন—শেষ প্রচরও সেই কান্না! তোমার জন্য শেষ সময়ে যদি জগৎ কাঁদে তবেই তো তোমার জীবনের সার্থকতা। তাই, সে কান্না ভুলিলে চলিবে কেন?

তুমি বালক কালে যদি হাসিয়া কাটাইয়া থাক, তবে পর জীবনে তোমার কাঁদিয়াই কাটাইতে হইবে। সে হাসির সুদ সমেত কান্না তোলা রহিয়াছে, নিশ্চয়ই তুমি কাঁদিবার সময় হাসিতে বলিয়া পাপী! পিতা মাতাও যদি তোমায় বালক কালে কেবল হাসাইয়া থাকেন, তাঁহারাও তোমার এবং নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন,—তোমার শেষ তাহা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে হইবে,—তোমার পিতা মাতারও কান্না তোলা রহিয়াছে; ইংরাজী প্রবাদ বলে, "He who spareth the rod, spoileth the child."—আবার যে বালক তাড়নায় না কাঁদে, তাহার শিক্ষার বিষয়ে গয়া! শিশু স্তন্য পান করিবে, তাহার জননী সাংসারিক কার্য্যে বিব্রত, বালক একটু কাঁদিয়াই সকল ভুলায়। তখনি স্নেহময়ী জননীর স্নেহের অঙ্কে উঠিয়া হাসে! সে বালক সরল—কাঁদিতে জানে বলিয়া। কাঁদিতে জানিলে তবে হাসিতে পারিবে। সে কান্না ভুলিয়া কেবল হাসিলে চলিবে কেন?

মানুষের কাঁদে না কে? সুখে দুঃখে রাগে অভিমানে, সকল অবস্থাতেই মানুষ কাঁদে; যে না কাঁদে, তাহার হৃদয় নাই! মাতা পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া সেই পুত্রকে যদি আবার দেখিতে পান, তবে হৃদয়ের বেগে আনন্দের প্রতিঘাতে কাঁদেন! সে কান্না হৃদয়ের চরম সুখের ফল! দুঃখে তো কান্নার ছবি সর্ব্বত্র। রাগে বা অভিমানে একান্ত আক্রান্ত হইয়া না কাঁদিলে, নিশ্চয়ই থাকিতে পারে না! এক কান্নায় সব হয়! শিশু কাঁদে জনক জননীর স্নেহ বাড়াইতে; যুবক যুবতী কাঁদে পরস্পরের হৃদয় বিনিময় করিতে; পাড়া-কুঁদুলি কাঁদে, আপনার কোন্দলের জয় পতাকা উড়াইতে; অপরাধী কাঁদে নিজের অপরাধ ঢাকা দিতে! যুবতী শাশুড়ীর সঙ্গে কলহ করিয়া স্বামীর নিকট কাঁদে তাহার সদসৎ বিচারশক্তি কাড়িয়া লইতে; স্বার্থময়ী যুবতী যুবকের গলা ধরিয়া কাঁদে, তাহার সর্ব্বনাশ করিতে!—হাসিতে যাহা না হয়, কান্নাতে নিশ্চয়ই তাহা ঘটে,—তুমি তোমার সহোদরকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতে, তাহার একটু অসুস্থতায় অস্থির হইতে, ইহ জগতে এক মাত্র আত্মীয় বলিয়া জানিতে—আর তাহা যদি একেবারে ভোল সে কিসে? তোমার চতুরা প্রণয়িনীর কান্নায়! তাহার দুই বিন্দু অশ্রু জলে তোমার হৃদয়ের সে স্নেহ, সে ভালবাসা গিয়াছে। তাহার সর্ব্বনাশ

করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছ,—হাসি একেবারে কখনই এত বিপরীত করিতে পারে না। ঐ যে তুমি কর্জ্জ করিয়া তোমার প্রণয়িনীর অলঙ্কার গড়াইতেছ, সেও তোমার প্রণয়িনীর কান্নার। কান্নায় যাহা হয়, তাহা আর কিছুতেই হয় না। কবির উক্তি,—

"সা পত্যুঃ প্রথমাপরাধ-সময়ে
সখ্যোপদেশং বিনা,
নো জানাতি সবিভ্রমাঙ্গবলনা-
বক্রোক্তি-সংসূচনং।
স্বচ্ছৈরচ্ছ-কপোলমূল-গলিতৈঃ
পর্য্যস্তনেত্রোৎপলা,
বালা কেবলমেব রোদিতি
লুঠল্লোলালকৈরশ্রুভিঃ॥"

"সে স্বামীর প্রথম অপরাধের সময় সখীর কোন উপদেশ পায় নাই; হাব, ভাব, বক্রোক্তি কিছুই জানিত না; কেবল বিস্ফারিত নেত্র-পদ্ম অশ্রুতে সিক্ত করিয়া সেই বিমল কপোল আর্দ্র করিয়া অলকা দুলাইয়া কাঁদিয়াছিল!" সে রোদন সরলতাময়, হৃদয়মর্দ্দক, মধুরতার বিমলচ্ছবি, শিক্ষা দিবার অদ্বিতীয় উপকরণ—প্রণয়ের সুদৃঢ় বন্ধন! সে কান্না অন্তস্তল ভেদ করে, তাহা কখন ভুলিবার নহে,—যে পর্য্যন্ত রমণীকে শোধিত রহিবে, সে পর্য্যন্ত ভুলিবে না। যে অপরাধে সে কান্না দেখিয়াছ, তাহা আর কখন করিবে না, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছ। তাহা শত শত কথায় হয় না। হাসির এরূপ ক্ষমতা নাই যে, সে ভাব প্রকাশ করে,—তাহা কেবল সেই কান্নার ক্ষমতা।

চক্ষু, ওষ্ঠ, কপোল প্রভৃতিতে চিহ্ন অধিক প্রকাশ পায়, কিন্তু কান্নার কার্য্য শরীরের সকল স্থলে ব্যাপ্ত থাকে। হৃদয়ে শোক, দুঃখ, আহ্লাদ, মান, অভিমান প্রভৃতির দারুণ আঘাতের ফল কান্না। সেই আঘাতের বেগ অশ্রু-জলে কতকটা নিঃসৃত হয়। যে কান্নায় অশ্রুজল নাই, সে কান্না অসহ্য। মিত্র মহাশয় হাসির প্রভাবে হাস্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,"হাসির মার বড় মার।" সে হাসি নহে, তাহা অশ্রু-হীন কান্নার রূপান্তর-মাত্র। রত্নাবলী-কার শ্রীহর্ষ যে হাসি দেখিয়া রাজার মাতা ঘুরাইয়াছেন, তাহা বাসবদত্তার অভিমানের কান্নার রূপান্তর!—কান্নার রূপান্তরে হৃদয় মথিত হয়, লক্ষ্যের শরীর শিথিল হয়। কান্নার যেরূপ মন আর্দ্র করে, আর, কিছুতেই সেরূপ করে না। মহাকবি শেক্সপীর রিচার্ড থার্ড নামক নটিকে দেখাইয়াছেন,—এক কান্নায় মোহিত হইতে হয়—বঞ্চিত হইতে হয়! রিচার্ড থার্ড বঞ্চনায় অদ্বিতীয়,—স্বার্থ-সাধনে চতুর। এডওয়ার্ডের বিধবা পত্নী এনকে মোহিত করিবার শেষ উপকরণ কান্না। এন্ জানিতেন,রিচার্ড থার্ড বঞ্চক, তাহার স্বামীঘাতী, চিরশত্রু; তাহার অসাধ্য কিছুই নাই; তথাপি এক কান্নায় মোহিত হইলেন। বঞ্চক রিচার্ড থার্ড এনের পূজা, ভক্তিভাজন শ্বশুরের

মৃত দেহ সমাধি দিতে লইয়া গিয়া অবলার মনকে ফিরাইল, সেই শোকের সময়ে এনের মন অশ্রু-বারিতে সিক্ত করিয়া সকল ভুলাইল। কবি দেখাইয়াছেন,—রিচার্ড থার্ড এনের মন কিছুতেই ফিরাইতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন :—

"Those eyes thine from mine have drawn salt tears,
"Shamed their aspect with store of childish drops,
"These eyes, which never shed remorseful tear,
"No, when my father York and Edward wept,
"To hear the piteous moan that Rutland made
"When black-faced Clifford shook his sword at him,
"Nor when thy warlike father like a child
"Told the sad story of my father's death
"And twenty times made pause to sob and weep,
"That all the standers by had wet their cheeks
"Like trees bedashed with rain; in the Seed time
"My manly eyes did scorn an humble tear;
"And what these sorrows could not thence exhale,
"Thy beauty hath, and made them blind with weeping."

সেই কান্নাই এনের মনকে ক্রমশ ফিরাইতে লাগিল। সেই কান্নাই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিবাহ করাইয়া সর্ব্বনাশ করিল! না কাঁদিলে আর শত শত উপকরণেও, এনকে হস্তগত করা রিচার্ড থার্ডের ক্ষমতা ছিল না;—বঞ্চনার প্রধান উপকরণ কান্না। হাসিতে যাহা হয় না, কান্নায় তাহা ঘটে। ঐ মহাকবি ম্যাক্বেথ্ নামক নাটকে লিখিয়াছেন,—লেডী ম্যাক্বেথ্ ডন্‌কন্-রাজকে স্বামী দ্বারা হত্যা করিবার সময়ে নানা রকম বুঝাইল, স্বামীকে আশা-ভরসায় উত্তেজিত করিয়া যখন দেখিল তাহার স্বামী ভয়ে অগ্রসর হইতেছেন না, তখন তাঁহাকে বঞ্চনার প্রধান উপকরণ স্মরণ করাইয়া দিল,—

——Who dares receive it others,
As we shall make our griefs and clamour roar.
Upon his death?

আমাদের নামে দোষ দিতে কে ভরসা করিবে? আমরা তাহার মৃত্যুর পরই দুঃখ করিব,—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিব,—এক কান্নায় জগৎকে বঞ্চনা করিব। ম্যাক্বেথ্ স্মরণ করিল, কান্নাই বঞ্চনা করিবার প্রধান উপকরণ,—তাহাতে জগৎ বঞ্চিত হইবে—আর ভয় কি?—

লেডী ম্যাক্‌বেথের সেই কথাতেই সকল ভয় গেল; ম্যাক্‌বেথ্ প্রস্তুত হইল,— উত্তেজিত স্বরে বলিল,—

——I am settled and bend up
Each corporal agent to this terrible feat.

আমি দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলাম, এই ভয়ানক কার্য্যে শারীরিক সকল ক্ষমতা একত্র করিব।—এই ভয়ানক কার্য্যে সাহস দিল বঞ্চনার রোদন!

কান্নায় অসৎ-প্রবৃত্তির যেরূপ উত্তেজনা করে, সৎ-প্রবৃত্তিও তেমনই উত্তেজিত হয়। কাঁদিতে জানিলে, দুই বিন্দু অশ্রুতে যাহা হয়, তাহা অশ্রুতে সিক্ত করিলে হয় না। অশ্রুসেক উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত সময়ে করিলে, অসাধ্য সাধন ঘটে! দৈত্রণ যুবক যে তাহার জননীর স্নেহ ভুলিয়াছে—তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছে, সে কেবল তাহার নিষ্ঠুরা প্রণয়িনীর উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রে অশ্রুপাতের ফল! সেই কাঁদ কাঁদ মুখে অশ্রুসিক্ত দুইটি অক্ষরে তোমার হিতাহিত জ্ঞান যায়, তুমি কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাও। রাসায়নিক পণ্ডিতেরা জানেন না, অশ্রুতে কি মোহিনী প্রতিভা বা বিদ্যুতীয় শক্তি আছে! তাহাতে না পারে, এরূপ কার্য্যই নাই। তোমায় যে ভালবাসিতে চাহে, তাহাকে যদি বিষ-নয়নে দেখ, আর যদি সে কাঁদিতে জানে—দুই বিন্দু অশ্রু উপযুক্ত সময়ে ফেলিতে পারে, নিশ্চয়ই তুমি তাহার হইবে। তোমার মনের ভাব দুই, বিন্দু অশ্রুতেই ফিরাইবে। তুমি যাহার চিরকাল অনিষ্ট করিয়াছ, কখনও সে তোমায় ক্ষমা করিবে বলিয়া ভাব নাই; তুমি যদি কাঁদিতে জান, নিশ্চয়ই সে ক্ষমা করিবে এবং তোমার নিকট আবার ক্ষমা চাহিবে! লম্পট গুরুজনের তিরস্কারে, সমাজের তিরস্কারে, বনিতার শত শত কথায়, আত্মীয়গণের শত শত উপদেশে, আপনার দুর্ম্মতিকে ফিরাইতে পারে না, কিন্তু পরিণীতা রমণী যদি উপযুক্ত সময়ে কাঁদিতে জানিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে পারে, তবে স্বামীর অনিবার্য্য মনকে ফিরাইতে পারে! শেষে সেই স্বামীই নিজের অপরাধে নিজেই লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়! কান্নায় মন ফেরে, কান্নায় রাগ বাড়ে, কান্নায় মান হয়, কান্নায় মান যায়। তাই বারংবার বলি, কান্নায় না হয়, এরূপ কার্য্য নাই!

কবি দীনবন্ধু কিসে বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রথিত-যশা?—কান্নার কতক তত্ত্ব জানিতেন বলিয়া।—জামাই-বারিকে অহঙ্কারিণী গৌরবিণী নায়িকার হৃদয়ে নায়িকার দুই বিন্দু অশ্রুজল সিক্ত করিয়া প্রণয়ের মধুর ছবির অঙ্কপাত করাইলেন, নায়কের হৃদয়ের জ্বালায়, মান অভিমানে "পদ্ম-জল" (চক্ষুর জল পড়িল) হৃদয়ভেদী অশ্রুসিক্ত ধ্বনি নায়িকার হৃদয়ে আঘাত করিয়া মরম ভেদিল। সেই দুই বিন্দু অশ্রুতে অহঙ্কার, অভিমান, স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা সকল লোক

করিয়া পূত প্রেমকে আশ্রয় দিল। যাহা পিতা মাতার তিরস্কারে হয় নাই—ভগ্নীর ভয়াবহ দৃষ্টান্তে হয় নাই—শত শত উপদেশে ঘটে নাই, তাহা এক কান্নায় হইল! যে কান্নার কি মূল্য আছে? এরূপ কোন হাসি নাই যে, তাহার সহিত তুলনা হয়? যিনি কান্নার ছবি আঁকিতে পারেন, তিনি তো কবি। কালিদাস কুমার-সম্ভবের চতুর্থ সর্গে রঘুবংশের অজ-বিলাপে, শকুন্তলার চতুর্থ-অঙ্কে কান্নার জ্বলন্ত ছবি আঁকিয়া আজ পৃথিবীর সাহিত্য-সমাজে স্বর্ণাসন পাইয়াছেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে শকুন্তলাকে স্নেহের কান্না কাঁদাইয়া বিষয়-বাসনা-ত্যাগী, বৃদ্ধ, রিপুঞ্জয়ী কণ্বকে কাঁদাইয়া বনের হরিণ-গুলি ও প্রকৃতিকে কাঁদাইয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন! শান্ত তপোবন করুণার উৎসে সিক্ত করিয়া কবিত্বের অসাধারণ পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বে তাই বলিয়াছি, যিনি কান্নার ছবি আঁকিতে পারেন তিনি কবি, যিনি তাহাতে কাঁদাইতে পারেন, তিনি কবি-চূড়ামণি। তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র। তিনি ভাবুকের ইষ্টদেবতা। ভবভূতি উত্তর-রাম-চরিতে কান্নার ছবি আঁকিয়াছেন—জগৎকে কাঁদাইয়াছেন বলিয়া, আজ কালিদাসের সহিত তুলনায় পরিমিত হইতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার কতক ছায়া দেখাইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের অভাব পূরণ করিয়াছেন; আর বঙ্কিম বাবু সেই কান্নার ছবি আঁকিতে পারেন বলিয়া সাহিত্য-জগতে পরিচিত হইয়াছেন! দুর্গেশ-নন্দিনীর শেষে আয়েষা কাঁদিতে কাঁদিতে জগৎসিংহকে যে পত্র লিখিলেন, তাহা পাঠ করিয়া জগৎসিংহ কাঁদিতে কাঁদিতে যে উত্তর লিখিলেন—তাহা পাঠ করিলে কেনা বঙ্কিমবাবুকে ভক্তি করিবে? কাঁদিতে কাঁদিতে জগৎসিংহ লিখিলেন, "আয়েষা! তুমি রমনীরত্ন!—" সেই উত্তর কান্নায় যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন জগতে ঘুষিবে—আয়েষা রমণী-রত্ন!—রমণী-চরিত্রে আয়েষা অমূল্য রত্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! সে কান্নার ছবি দেখিলে, ভাবুককে হয়ত মুগ্ধ হইতে হইবে। জয়দেব প্রেমের কান্না দেখাইয়াছেন। আর শঙ্করাচার্য্যের ভক্তির কান্না! যে কান্নার তত্ত্ব জানে, সে জগৎকে জয় করিতে পারে। চৈতন্য ভক্তিতে কাঁদিতে জানিতেন বলিয়া দেবাবতার! শাক্যসিংহ কান্নার তত্ত্ব জানিতেন, সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত! ম্যাট্‌সিনি কাঁদিয়াছিলেন বলিয়াই ইতালির অভ্যুত্থান! বিদ্যাসাগর বঙ্গের বিধবার জন্য কাঁদিয়াছিলেন, এই জন্য চিরস্মরণীয়! অভিনয়ে যে কাঁদাইতে পারে, সেই যথার্থ অভিনেতা। সেই দর্শকের হৃদয়ে দ্রষ্টব্য প্রতিবিম্বিত করিয়াছে, প্রমাণিত হয়। যে যাত্রায় কাঁদায়, তাহারই তো প্রশংসা! হাঁসাইতে অনেকেই পারে, কিন্তু কাঁদান বড় কঠিন!

উত্তেজনার প্রধান উপকরণ, কান্না! কবি-প্রবর ভট্টনারায়ণ বেণী-সংহারে

দ্রৌপদীর দুই বিন্দু অশ্রু-পাতে ভীমের ক্রোধাগ্নি শত গুণে পরিবর্দ্ধিত করাইলেন। ভীম ক্রোধের অনন্ত মূর্ত্তিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন—

"দেবি!—কিমলীকাশ্বাসেন—

"ভূয়ঃ পরিভবক্লান্তি-লজ্জা-বিধুরিতাননং,
"অনিঃশেষিতকৌরব্যং ন পশ্যসি বৃকোদরং।"

"দেবি! বৃথা আশ্বাসে প্রয়োজন নাই। তুমি আর পুনরায় পরিভব-ক্লেশে লজ্জা-বিধুরিত-মুখ, অনিঃশেষিত-কুরুদল বৃকোদরকে দেখিবে না!—যে পর্য্যন্ত বৃকোদর কুরুদল সমূলে ধ্বংস করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত আর এ মুখ দেখাইবে না।" এ প্রতিজ্ঞার উত্তেজনা দ্রৌপদীর কয়েক বিন্দু অশ্রু। সে অশ্রু নাই বলিয়াই ভারত আজ ম্লান! সে অশ্রু নাই বলিয়াই বাঙ্গালি-জীবন অসুখী। ভাই! তোমরা সে অশ্রু ভুলিয়া হাসিতেছ বলিয়াই, আজ আমাদের কোন আশা নাই!

মনোবৃত্তির চরম সীমার ফল কান্না। মনুজ-জীবনের যে অবস্থা সুখের আধার—যাহা স্মরণ করিলে, তুমি আবার প্রার্থনা করিবে—সেই মধুর শৈশবকালে কান্নাই সহচর ছিল। কান্নাই তোমার দেহকে বাড়াইয়াছে; কাঁদিয়াই তুমি এত বড় হইয়াছ; তখন সরলতার হৃদয় পূর্ণ ছিল, জগতের বঞ্চনা জানিতে না, সুতরাং হৃদয়ের আবরণও ছিল না। সকল বিষয়েই মুক্ত হৃদয়ে কাঁদিতে! যে দিনে বঞ্চনা শিখিয়াছ, সেই দিনেই হৃদয়ের আবরণ দিতে শিখিয়াছ; সুতরাং সরলতার ছবি কান্নাকেও ঢাকিয়াছ। অভিমানে অধরোষ্ঠে আগে ওষ্ঠ বিকম্পিত করিয়া কাঁদিতে,—আর এখন দন্ত বিকশিত করিয়া হাস! সে হাসিও কান্নার রূপান্তর-মাত্র!—তাহা কেবল বঞ্চনার পরিচয়। সে হাসি দেখিয়া সহানুভূতি হয় না, কিন্তু কান্নায় হইত। ভাই, তুমি, হৃদয়কে বঞ্চনা করিয়া হাসিতেছ, হাস—কিন্তু কান্না তাহাতে মাখান! রমণী সরলা বলিয়া কাঁদিতে জানে! কাঁদিয়া হৃদয় মুগ্ধ করে! ভগবান্ শিব সরলতার অতুল নিদর্শন। সতীর শব লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিলেন, সরলতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, প্রেমের চরম সীমার চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। আর হৃদয়ের আবরণ দিতে যে পটু, সে কাঁদিয়াও কাঁদে না; কিন্তু যে না কাঁদে, তাহার হৃদয় নাই—অথবা সে বঞ্চক—নিষ্ঠুর!

অতুল আনন্দে চক্ষু অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। সেক্সপীরের সরলা নায়িকা মাইর‍্যাণ্ডা অতুল আনন্দে ভাসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল——

——I am a fool to weep at what
I am glad of.

সে কান্না হাসির উচ্চপদস্থ সুখের কার্য্য। সে চরম সুখে হাসি হয় না, চক্ষু সজল হয়। মহাকবি কালিদাস

শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের সময় কাঁদাই-লেন, তাঁহার সরল হৃদয় দারুণ আঘাতে আহত হইয়া সরলতার মুকচ্ছবি কাহাকে দেখাইল। পাপ-মুগ্ধ, ধর্ম্মভীত সম্পূর্ণ-বিস্মৃত সেই কান্নার হৃদয় দহিতে লাগিল! কেবল রাজা লৌকিক বঞ্চনায় শিক্ষিত বলিয়া কাঁদিলেন না! কিন্তু হৃদয়ে কান্নার চূড়ান্ত ছবিচ্ছায়া দিল। অঙ্গুরীয়-দর্শনে যখন শাপমুক্ত হইলেন, সেই ছবি বিকাশ পাইল, তখন কেবল কাঁদিলেন! তখন সেই শকুন্তলার অশ্রু-বিন্দু হৃদয়ের প্রত্যেক মর্ম্ম-স্থানে শূলের ন্যায় আঘাত করিতে লাগিল, সকল ভুলিয়া শকুন্তলার সেই কান্নার ছবি তাঁহার হৃদয়-দর্পণে দেখা দিতে লাগিল। সেই অবস্থা কখন আর বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; বয়স্য বিদূষককে বলিলেন—

"ইতঃ প্রত্যাদিষ্টা স্বজন-
মনুগন্তুং ব্যবসিতা
স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্ব্বদতি
গুরু-শিষ্যে গুরুসমে,
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকর-
কলুষামর্পিতবতী——
"ময়ি ক্রুরে যত্তৎ সবিষ-
মিবশল্যং দহতি মাং।"

আমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি আত্মীয়দিগের অনুগমন করিতে চেষ্টা করিলে গুরুসমান গুরুশিষ্য উচ্চৈঃ-স্বরে "তিষ্ঠ" বলিলে তিনি দাঁড়াইয়া পুনরায় বাষ্পকলুষিত দৃষ্টি, খল আমাকে যে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা বিষাক্ত শল্যের ন্যায় আমাকে দহন করিতেছে।"

শকুন্তলার সেই অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি দুষ্মন্তের প্রত্যেক শিরায় বিদ্ধ করিয়াছে। তিনি সকল ভুলিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা ভুলিবার নহে—তাহা তাঁহার হৃদয় মথিত করিতে লাগিল। তিনি কেবল কাঁদিলেন। সে কান্না পাপের প্রায়শ্চিত্ত—সরলতার বিমলাবির্ভাব! এদিকে যখন উভয়ের মিলন হইল, অতুল আনন্দ-উৎস অপ্রতিহত-বেগে বহু দিনের পর ছুটিল; তখনও সেই কান্না!—শকুন্তলার কণ্ঠ অশ্রুতে বদ্ধ হইল, জয় শব্দও সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু কেবল কান্নায় সকল ভাব প্রকাশ হইল, তাহা শত শত কথায় শেষ হইবার নহে, কিছুতেই তৃপ্ত হইবার নহে, কেবল কান্নায় পর্য্যবসিত হইল! দুষ্মন্তের লজ্জা-প্রণয় সকলও সেই কান্নার ছবিতে দেখা গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন;—

"প্রিয়ে!————
"বাষ্পেন প্রতিরুদ্ধেঽপি
জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কার-
পাটলোষ্ঠমিদং মুখং।"

যে কান্নার মোহিনী ছবি দেখিলে, মোহিত হইতে হয়!

"যত হাসি তত কান্না,
বলে গেছে রামশর্ম্মা!"

প্রবাদটি অমূল্য। বুঝিয়াছ—যা হাসিলে, হাসির পরই কান্না তোলা রহিয়াছে।

তুমি যুবক—হাসিতেছ ? সুখ—তোমায় কাঁদিতে হইবে বলিয়া ! তুমি যুবতী, অত হাসিতেছ,—কিন্তু আবার উহার শত গুণ কাঁদিতে হইবে ! সময়ে কাঁদ—হাসিতে পারিবে !

তুমি উকীল বাবু কাঁদিতে শিখ, আসামী খালাশ করিতে পারিবে। কেবল হাসিলে কি বিচারকের দয়া হয় ? তুমি দেশহিতৈষী কাঁদিতে শিখ—নিজের ইষ্ট-সিদ্ধি করিতে পারিবে, তুমি নূতন-ধর্ম্ম-প্রচারেচ্ছু কাঁদ, জগত তোমার কথা শুনিবে। দেখ কেশব বাবু কাঁদিতে জানেন বলিয়াই, তাঁহার এত দলপুষ্টি !

নবীন বয়সে হাসির কথাই ভাল লাগে ; কিন্তু যখন বয়স হয়, তখন কেবল কান্না ! প্রণয়ের ঐকান্তিকতায় কান্না, ধর্ম্মের ঐকান্তিকতায় কান্না, দুঃখে তো কান্না আছেই—হৃদয়ের আবরণ উন্মোচিত হইলেই কান্না !! সে কান্না এ বয়সে ভুলিয়া হাসির কথা—ছি !!

কিন্তু যাই বলি—মিত্র মহাশয় "হাসি" লিখিয়া তবে যশ রাখিয়াছেন। আমার কান্নার কথা, যশের প্রত্যাশা নাই। তবে কেহ কিছু বলিলে, ঊর্দ্ধসংখ্যা কাঁদিব। আমি এই বসন্তকালের রাত্রে কালী কলম নষ্ট করিয়া তেল পোড়াইয়া এত লিখিলাম—কি কাঁদিবার জন্য ? নিশীথে নির্জ্জনে কান্নার কথা লিখিয়া যদি কাঁদিতেই হয়, তাহাতে ক্ষতিই বা কি? হাসির কথায় কাঁদিলে লজ্জা, কান্নার কথায় কাঁদিতে আপত্তি কি ? লোকের তো বলিতে হইবে—কান্নার কথায় কাঁদিয়াছে !

নৃঃ কুঃ রায়।

নাস্তিকতা।

প্রস্তাবনা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ধর্ম্মের আলোচনা হইয়া আসিতেছে। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতে এখানে নাস্তিকতাও প্রচলিত আছে। কিন্তু কথা এই, নাস্তিকতা ভারতে বিদ্যমান থাকাতেও, আস্তিকতার কেন চিরকাল প্রাদুর্ভাব ছিল এবং এখনও রহিয়াছে। ইহার কতিপয় কারণ আমরা এই রূপ স্থির করিয়াছি।

প্রথমতঃ। নাস্তিকতা জ্ঞান ও যুক্তি-মূলীয় এবং আস্তিকতা কল্পনা ও বিশ্বাস-মূলীয়। সচরাচর সর্ব্বলোকে কল্পনায় বিমুগ্ধ এবং বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়। কারণ, বিশ্বাস ও কল্পনার পথ অতি সহজ ; জ্ঞান ও যুক্তির পন্থা অতি কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ। বিদ্যালোচনা করা এখানে

ব্রাহ্মণ-জাতিরই কার্য্য ছিল। সুতরাং সকল জ্ঞান, বিচার ও পাণ্ডিত্য, ব্রাহ্মণ-জাতি-মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ-জাতি এদেশে ধর্ম্ম-প্রভুত্বে শ্রেষ্ঠ হইয়া ছিলেন। তাঁহারা যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আধিপত্য ভারতবর্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, সে আধিপত্য-বিনাশক মতামত প্রচলিত ও প্রবল হইতে দিতেন না। সাধারণ জনগণ অজ্ঞ। তাহারা বিদ্যালোচনা ও পাণ্ডিত্যের ধার ধারিতেন না; সুতরাং ব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যে কি বিচার চলিতেছে ও কি ঘটিতেছে তাহার খবরও রাখিতেন না। বলিতে গেলে, ব্রাহ্মণ-জাতি যেন এক রাজ্যে বাস করিতেন এবং অপরাপর জাতি-নিচয় যেন আর এক রাজ্যে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণজাতি অতি চতুর। যাহাতে স্বার্থহানি হয়, সেই নাস্তিকতা প্রবল হইতে তাঁহারা কেন দিবেন?

তৃতীয়তঃ। প্রাচীন নাস্তিকতা কেবল তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা-মূলীয় ছিল। তত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যায় তখন যে সমস্ত সত্য ও সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত লইয়াই নাস্তিকতা সৃষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে যেমন ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ও পদার্থতত্ত্বে নাস্তিকতা ক্রমশ বলপ্রাপ্ত হইতেছে, তখনকার কালে নাস্তিকতা এ সহায়তা প্রাপ্ত হইত না। তখনকার কালে নাস্তিকতা তত্ত্ব আধ্যাত্মিক অথবা দার্শনিক প্রণালীতে (Subjective or the Metaphysical Method) তর্ক অবলম্বন করিয়া থাকিত; এখনকার কালের প্রত্যক্ষ অথবা বৈজ্ঞানিক (Objective or the Scientific method) প্রণালী-গত তর্কের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিত না। সুতরাং তখন নাস্তিকতা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অসম্পূর্ণ হইল; এবং আস্তিকতা বিপক্ষীয় দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শনৈ শনৈ বর্দ্ধিত ও সম্পন্ন হইত।

এদেশে নৈয়ায়িক তর্ক-পদ্ধতি (Logical or Deductive) প্রায় সম্পূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু শুদ্ধ সেই তর্কপদ্ধতি যথেষ্ট নহে। বেকন যে উন্নয়ন (Inductive) তর্কপ্রণালীর পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সে তর্কপ্রণালী প্রচলিত না থাকাতে, নৈয়ায়িক পদ্ধতি যে সমস্ত বাক্য তর্ক-মূলীয় করিত, সেই সমস্ত বাক্যে যদি অসত্য ও ভ্রান্তি মিশ্রিত থাকিত, সে ভ্রম-প্রমাদের আর নিরসন হইত না। সুতরাং সে তর্কে যে সিদ্ধান্ত হইত, তাহাও ভ্রমসঙ্কুল থাকিত। সকল বিষয় সম্পূর্ণ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রণালী আদৌ প্রচলিত ছিল না। এক্ষণকার ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ পরীক্ষা প্রণালীতে (The Positive Method) যেমন এক দিকে এরিষ্টটল অন্য দিকে বেকন দাঁড়াইয়া থাকেন, প্রাচীন কালে সেরূপ দুই দিকে দুই মহাত্মা দাঁড়াইতেন না?

এক গৌতম যাহা করিতেন, তাহাই হইত। অক্ষপাদ ব্যতীত অন্য পদ্ধতি কেহ জানিত না। ইহাতে এই দোষ ঘটিত, মূলবাক্য (Major Premisc) ও সিদ্ধান্তে যে ভ্রান্তি থাকিত, তাহার আর পরীক্ষা হইত না। সুতরাং সে সমস্ত ভ্রান্তির নিরসন হইত না।

চতুর্থতঃ। নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হওয়া অত্যন্ত ঘৃণার্হ ছিল! যে দিকে বহু-লোক, সে দিক স্বাভাবিকই ভারী হয়, অন্য দিকে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা সুতরাং বহু লোকের ঘৃণার্হ হইয়া পড়েন। নাস্তিকতার বিপরীত দিক কেন ভারী হইবে, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ-ত্রয় বিবেচনা করিলেই অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে; সুতরাং নাস্তিকের সংখ্যা অতি অল্প। এজন্য যাহারা নাস্তিক, তাহারা একঘরে; সুতরাং অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র। এরূপ স্থলে নাস্তিক-নামে পরিচিত হইতে কে ইচ্ছা করিবে? প্রাচীন পোলাণ্ড প্রভৃতি ইয়োরোপীয় দেশে যেমন নাস্তিকদিগকে একেবারে অগ্নিদগ্ধ অথবা অন্য প্রকারে নিহত করা হইত, * ভারতবর্ষে যদিও তত দূর ছিল না, কিন্তু এখানে নাস্তিকেরা যে নিতান্ত অবজ্ঞাপাত্র ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। যেহেতু, এরূপ অবস্থা স্বাভাবিক, ইহা কেহ নিবারণ করিতে পারে না।

আমরা ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা অপরাপর দেশেও খাটে। যে যে কারণে ভারতবর্ষে নাস্তিকতা প্রবল হইতে পারে নাই, অন্য দেশেও সেই সমস্ত কারণ প্রায় বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন কালের সমস্ত কারণ আমরা নির্ণয় করিতে অশক্ত হইতে পারি; কিন্তু যাহা প্রকটিত হইল—এগুলি যে প্রধান কারণ ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং এই সমস্ত কারণ যে অন্যান্য দেশে বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও এক প্রকার নিশ্চিত। অন্যান্য দেশে ব্রাহ্মণ-জাতি না থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-জাতি স্থলে অন্যান্য দেশে পুরোহিত-জাতি বিদ্যমান ছিল। এবং সে পুরোহিত-জাতির কার্য্য ও প্রভাব ঠিক ব্রাহ্মণ-জাতির ন্যায় ছিল—ইয়োরোপীয় ইতিবৃত্তে ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়।

ইয়োরোপে নাস্তিকতা এক্ষণে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাহার মহা মহা পণ্ডিতগণ অনেকেই এক্ষণে ভিতরে ভিতরে নাস্তিক। সমাজে সকলে নাস্তিক-নামে পরিচয় না দিলেও, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে যে রূপ মতামত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে নাস্তিকতা বেশ প্রচ্ছন্ন দেখা যায়; যেন সাহস করিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। ইংলণ্ডীয় সুশিক্ষিত জন-গণ এক্ষণে অনেকেই স্বদেশীয় ধর্ম, ভ্রম-বিশিষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ

* কাসিমির লিসিনস্কি পোলাণ্ডে নাস্তিক বলিয়া দণ্ডিত ও অগ্নিদগ্ধ হয়েন। মার্কোটিনের বৃত্তান্ত দেখ।

করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিক না হইন, তাঁহাদিগের গতি নাস্তিকতার দিকে। আমাদিগের এই কথা প্রমাণার্থ আমরা নিম্নে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"I allege that in England the highest intelligence of the nation is not only not in harmony with the nation's creed, but is distinctly at issue with it, does not accept it largely, indeed, repudiates it in the distinctest manner, or for peace and prudence's sake, discountenances it by silence, even where it does not demur to it in words, and that in this dis-harmony and divorce lies a grave and undeniable peril for the future. The fact is not new, but its dimensions are; the dis-harmony is spreading to many classes, and is assuming a more pronounced significance, no candid observer will deny it, and no wise patriot or statesman will regard it as a matter to be ignored."—Quoted by Grant Duff in his address delivered at the opening of the annual course of lectures in the Philosophical Institution of Edinburgh on the 30th October, 1874 from Mr. Greg's book under the title of *Rocks Ahead*; or *Warnings of Cassandra.*

নাস্তিকতা ইংলণ্ডে এই রূপ কার্য্য করিতেছে। ইহার কারণ এই, ইংলণ্ডে বিদ্যালোচনায় সর্ব্বসাধারণে অধিকারী। বিদ্যালোচনার যতই বৃদ্ধি হইবে, নাস্তিকতারও তত বৃদ্ধি হইবে। নাস্তিকতা দ্বারা ভ্রান্ত বিশ্বাস সকল বিনষ্ট হয়। ইহা ভ্রম ও মিথ্যা বিশ্বাস হইতে সত্যকে আবিষ্কার করে। সুতরাং জ্ঞানালোচনার যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই নাস্তিকতারও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

প্রচলিত ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য ও ভ্রান্ত থাকে, তাহাই নিরসন ও নির্ণয় করা নাস্তিকতার কার্য্য। এরূপ কার্য্য যদিও কঠিন ও অপ্রিয় বটে, কিন্তু ইহা কখন অনিষ্টকর নহে। ইয়োরোপে যে সমস্ত মহাজনগণ * নাস্তিক-

* The best men have often been branded as atheists. The following benefactors of the world have borne that stigma. Thales Anaxagoras, Pythagoras, Socrates Plato, Aristotle, Zenophanes, and both the Zenos; Cicero, Seneca, Abelard, Galileo, Kepler, Des Cartes, Leibnitz Wolf, Locke, Cudworth, Samuel Clarke, J. Bohme, Kant, Fichte, Shelling and Hegel. Possevin puts Luther and Melancthon among the atheists. Mersenne, in his Comment, says that in 1622 there were 50,000 atheists in Paris alone. Dr Woods places Dr Priestley, De la Mettrie, Von-Holbach (or La-Grange), Helvetius, Diderot and D' Alembert among the modern atheists.—Theodore Parker.

নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্ম-জগতের সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্ম-জগতে এক এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের অবনতি সাধন না করিয়া তাহার উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের পন্থায় বিচরণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজ-পন্থায় চলিয়া এক এক মহাজন হইয়া গিয়াছেন। তাহারা ধর্ম্ম-জগতের অজ্ঞান-রাশি সম্মার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

আশ্চর্য্য এই, নাস্তিকেরা ধর্ম্ম-জগতে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, কোপার্নি-কাস্, গেলিলিও, নিউটন্, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জ্ঞান-জগতে সেই কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্ম-সংস্কারক-গণ নাস্তিক-নামে অভিহিত হইয়াছেন, আর পদার্থ-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ প্রকৃত পণ্ডিত-নামে পূজ্য হইয়া আছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ও কার্য্য ধরিতে গেলে, দুই দলই এক শ্রেণী-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। সুতরাং দুই দলই সমান পূজার্হ ও প্রতিষ্ঠা-ভাজন।

অনেকে বলিয়া থাকেন, নাস্তিকের উদ্দেশ্য অথবা কার্য্য অনিষ্টকর না হইতে পারে, কিন্তু নাস্তিকেরা প্রচলিত ধর্ম্মের বিপরীত মত প্রচার করিয়া ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল করিয়া দিতে পারেন; এজন্য তাঁহাদিগের মতামত অনিষ্টকর হইতে পারে। এতদুত্তরে আমরা এই বলিতে চাই যে, সত্য-প্রচারে জগতের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এ পর্য্যন্ত সত্য-প্রচারে জগতের কোন অনিষ্ট-সাধন হয় নাই। মানব-সমাজের এরূপ সংরক্ষণী শক্তি আছে, এরূপ শাসন আছে যে, তন্মধ্যে যেরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাস প্রচলিত থাকুক না কেন, তাহা সেইরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাসে সংগঠিত হইয়া উঠিবে। এবং পৃথিবীতে তাহাই ঘটিয়াছে। সক্রে-টিসের পরবর্ত্তী কালে কি গ্রীসের ধর্ম্ম-জগতের কিছু বিশৃঙ্খলা হইয়াছিল? খৃষ্টান-ধর্ম্ম-প্রচারের পর ইউরোপীয় ধর্ম্ম-জগতের মতামত পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, সামাজিক ইষ্ট না অনিষ্ট ঘটিয়াছে? প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম হইতে রোমান্ কাথলিক-গণ যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম স্থাপিত হইলে, সমাজ-মধ্যে কি সে আশ-ঙ্কার কোন কারণ ঘটিয়াছে? মানব-সমাজ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে যখন যে প্রভাব পড়িয়াছে, সেইরূপে চালিত ও সংগঠিত হইয়া আসিয়াছে। বাস্তবিক নাস্তিকেরা ধর্ম্ম-জগতের গেলিলিও, ও নিউটন্। তাঁহারা সময়ে সময়ে উত্থিত হইয়া ধর্ম্ম-জগতের অনেক ইষ্ট-সাধন করিয়া গিয়াছেন।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাত্মা রামমোহন রায়কেও নাস্তিক বলিয়া গিয়াছেন।

সাধারণ-জন-গণ কাহাকে নাস্তিকতা বলেন, তাহা উল্লিখিত নাস্তিকদিগের নাম দেখিলেই প্রতীত হইবে। সাধারণ-জন-গণ যাহাকে নাস্তিকতা বলেন, আমরাও নাস্তিকতার সেই রূপ সাধারণ ভাব এবং বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্ম বিনষ্ট করা নাস্তিকতার কার্য্য নহে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা নির্ণয় করা নাস্তিকতার কার্য্য। এক এক ধর্ম্মে অসংখ্য মতামত ও বিশ্বাস প্রচলিত থাকে। সেই সমুদায় মতামত ও বিশ্বাস যে অভ্রান্ত, এমত কখনই হইতে পারে না। এই সমস্ত মতামত ও বিশ্বাস পরীক্ষা করাই নাস্তিকতার কার্য্য। নাস্তিকতা কেবল বিচার করিয়া দেখিবে, অমুক মতটি সত্য, কি সত্য নয়? এই বিশ্বাসটি ভ্রান্ত, কি অভ্রান্ত। এই পর্য্যন্ত নাস্তিকতার কার্য্য। এইরূপ পরীক্ষায় যদি নাস্তিকতা দ্বারা একটী ধর্ম্মের সমুদায় অংশও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং পূর্ব্বকার অপধর্ম্ম অনেক দূর সত্য-পথে আইসে, এমন কি, যদি এই নাস্তিকতা দ্বারা একটী পুরাতন ধর্ম্ম সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য একটী নূতন-ধর্ম্ম-রূপে উদিত হয়, তাহা হইলেও সমাজের কোন অনিষ্ট সম্ভাবিত হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ, হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সৃষ্টি। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হিন্দু-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমত কি প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মে পারলৌকিক বিশ্বাস পর্য্যন্ত নাই! কিন্তু পরলোকে অবিশ্বাস করায় কি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সমাজে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে? না পরলোকের চিরদাহন-শাস্তির ভয়ে ইউরোপীয় ক্যাথলিক-সমাজে পাপের কিছু মোচন হইয়াছে? বরং ইউরোপীয় ক্যাথলিক-সমাজের ভয়ানক পাপাচার ও নিষ্ঠুর ব্যবহার শুনিলে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মীয় সমাজ কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই সমস্ত নিষ্ঠুর পাপাচার যখন ইতিবৃত্তে পাঠ করা যায়, তখন জ্ঞান হইতে থাকে। এরূপ পারলৌকিক সমাজ অপেক্ষা বৌদ্ধ-দিগের অপারলৌকিক সমাজ শত গুণে শ্রেষ্ঠ। পরলোকে বিশ্বাস করিয়া সমাজ যেরূপে চলিতেছে, পরলোকে অবিশ্বাস করিয়া বরং সমাজ তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট-রূপে চলিতেছে। বাস্তবিক সমাজ ঈশ্বর-ভয়ে, কি পরলোক-ভয়ে চালিত হয় না। তাহার সংগঠন ও সংরক্ষণী শক্তি স্বতন্ত্র *।

প্রচলিত ধর্ম্ম-মাত্রই নাস্তিকতাকে ভয় করে। কারণ, নাস্তিকতা—ধর্ম্মের নিকষ-মণি। হিন্দু-ধর্ম্ম খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে ভয় করিবে না, কিন্তু নাস্তিকতাকে ভয় করিবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভয় করিবে না; কিন্তু নাস্তিকতাকে ভয় করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে ভয় করিবে না, কিন্তু নাস্তিকতাকে ভয় করিবে। অন্ধকার আলোককে ভয় করিবে। অজ্ঞানতা জ্ঞানকে ভয় করিবে। ভ্রান্তি সত্যকে ভয় করিবে। শুদ্ধ বিশ্বাসের উপরে যে সমস্ত ধর্ম্ম স্থাপিত, তাহা অবশ্য ভ্রম-বিশিষ্ট হইবেই হইবে। কারণ, বিশ্বাস যাহা ইচ্ছা তাহা হইতে

* ১২৮৩ সালের আর্য্যদর্শনে "পরলোক ও সমাজ" নামক প্রবন্ধ দেখ।

পারে। সেই জন্য সেই বিশ্বাসের উপরে যে সমস্ত মতামত স্থাপিত, তাহাও ভ্রান্তি-বিশিষ্ট হইবেই হইবে। নাস্তিকতা ধর্ম্মের শাখা, প্রশাখা ও মূলদেশ সকলই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিবে। সুতরাং তাহার সহিত ভ্রান্ত ধর্ম্মের বনিয়া উঠা অসম্ভব। ভ্রান্ত-ধর্ম্ম, নাস্তিকতাকে গালি দিয়া হটিয়া আইসে। নাস্তিকতাকে ঘৃণা করিয়া পরাজয় করে।

অন্য ধর্ম্মের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে, প্রচলিত ধর্ম্মের মতামত পরীক্ষা করা নাস্তিকতার কার্য্য। সুতরাং বুদ্ধি ও জ্ঞান ইহার অস্ত্র। এই জ্ঞান ও বুদ্ধি যে পরিমাণে বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত, সেই পরিমাণে নাস্তিকতা বলবতী। যেখানে বুদ্ধি প্রখর, নাস্তিকতাও সেখানে প্রখরা। যেখানে জ্ঞান সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ, সেখানে নাস্তিকতাও সম্পূর্ণ এবং বিশুদ্ধ। জ্ঞান ও বুদ্ধির উপরে নাস্তিকতার বল সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নাস্তিকতা যেখানে পরাজিত হয়, সেখানে হয় বুদ্ধি অন্ধ হইয়াছে, না হয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

তাই বলিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিশীল পণ্ডিতমাত্রই যে নাস্তিক হইবেন, তাহা নহে। নিউটন্, ও বয়েল্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নাস্তিক ছিলেন না। কিন্তু লাপ্লাস্, লাগ্রেঞ্জ, ইউলার্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নাস্তিক ছিলেন। ইহার কারণ, ডাক্তার হুয়েল্ অতি সুন্দর ও বিস্তারিতরূপে নির্ণয় করিয়াছেন।* তিনি বলেন যে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নাস্তিক নহেন; তাঁহারা এই উন্নয়ন-তর্ক-প্রণালীতে বরাবর অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহা নাস্তিকতায় লইয়া যায় না†। কিন্তু সার কথা এই, যে সকল বুদ্ধিশীল পণ্ডিত বিশ্বাস-প্রবণ নহেন, অথচ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, তাঁহারাই নাস্তিকতায় উপনীত হইয়াছেন। নহিলে এমতও ঘটিয়া থাকে যে—অনেকে অত্যন্ত বুদ্ধিশীল হইয়াও, নাস্তিক হয়েন নাই। তাহার কারণ এই, হয়—তাঁহারা অত্যন্ত বিশ্বাস-প্রবণ, না হয় তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে ইচ্ছা করেন নাই। বেকন্ যেমন বুদ্ধিশীল ছিলেন, তাঁহার কল্পনাও তদ্রূপ তেজস্বিনী ছিল। পতঞ্জল বুদ্ধিশীল ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস-প্রবণতা, ভক্তি ও কল্পনা তেজস্বিনী ছিল, বলিয়া, তিনি কপিল-মতে সায় দিতে পারেন নাই। তিনি এক যোগশাস্ত্রের প্রণেতা হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস-প্রবণতা যোগশাস্ত্র আনিয়া দিয়াছে। কণাদ মীমাংসায় সম্পন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বেদের অভ্রান্ততা প্রভৃতি কতিপয় মৌলিক অভ্যুপগমে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া

* Vide Chaps V and VI, Book III, Astronomy and General Physics by W. Whewell D. D.

† ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাসের আর্য্যদর্শনে "বিজ্ঞান ও ঈশ্বর" নামক প্রবন্ধ দেখ।

নাস্তিকতায় আসিতে পারেন নাই। মানুষিক প্রকৃতি ও স্বভাবের উপরে গঠনের ন্যায় নাস্তিকতা নির্ভর করে।

৫ কল্পনা ও বিশ্বাসের উপরই অধিকাংশ প্রচলিত ধর্ম্ম স্থাপিত। প্রচলিত ধর্ম্মে দেখা যায়, কাল্পনিক মত ও বিশ্বাস সকল থরে থরে সজ্জিত আছে। যে সমস্ত ভাব অত্যন্ত হৃদ্য, এবং অনায়াসে কল্পনাকে আকৃষ্ট ও মোহিত করিতে পারে, তাহা প্রচলিত ধর্ম্মে গ্রথিত আছে। এই ভাব নানা বিষয় হইতে গৃহীত হইয়াছে। পরে সকলকে একত্রে সম্বদ্ধ করা হইয়াছে। ইহারা পরস্পর সংলগ্ন অথবা সঙ্গত হউক, আর নাই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। তাহারা লোকের কল্পনাকে আকর্ষণ করিতে পারিলেই, যথেষ্ট হইল। প্রচলিত ধর্ম্মের এই সমস্ত অসঙ্গত মতামত ও বিশ্বাস নাস্তিকতা পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহাদিগের অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করে এবং তাহারা কত দূর কাল্পনিক ও অগ্রাহ্য, তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করে। ইয়োরোপীয় প্রচলিত ধর্ম্মের ঐশ্বরিক ভাব ও স্বরূপ-জ্ঞানাদি কত দূর পরস্পর অসঙ্গত, তাহা সুবিখ্যাত মিল্‌ প্রদর্শন করিয়াছেন।

অন্য ধর্ম্মের সহিত তুলনায় আমরা বলিতে পারি, নাস্তিকতার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম ও মত নাই। কিন্তু, ইহার যে একেবারে কিছুই ধর্ম্ম-মত ও বিশ্বাস নাই, এ কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। প্রচলিত ধর্ম্মের মূল-ভিত্তির সহিত নাস্তিকতার তুলনা করিলে প্রতীত হইবে যে, নাস্তিকতার মতামত ও বিশ্বাস-সকল ভিন্ন-প্রকৃতিক। প্রচলিত ধর্ম্মের মতামত সকলের মূল-ভিত্তি—কল্পনা ও অনুমান-মূলীয় বিশ্বাস। নাস্তিকতার মূল-ভিত্তি—প্রত্যক্ষ-জ্ঞান (Positive knowledge) ও তন্নিদান-ভূত কতিপয় মূল-বিশ্বাস-মাত্র। ডেকার্ট যখন তাঁহার দর্শন-শাস্ত্র আরম্ভ করেন, তখন তিনি সকল প্রচলিত মতামত অগ্রাহ্য করিয়াও সর্ব্বতর্কমূলীয় কতিপয় আদি-বিশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত মূল বিশ্বাস সকল জ্ঞানের নিদান-ভূত; তদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ-জ্ঞানও অসম্ভব। সেই সমস্ত বিশ্বাস তর্কের মূল-স্বরূপ। তদ্ব্যতীত তর্ক সম্ভবে না। যাহারা সকল জ্ঞানের মূলে, তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া জ্ঞানও দাঁড়াইবার স্থল পায় না। সুতরাং নাস্তিকতা এ সমুদায় অগ্রাহ্য করে না। যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপরে তাহার সমুদায় তর্ক প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানও এই সমস্ত মূল বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান দ্বারা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, নাস্তিকতা তন্মাত্র গ্রাহ্য করে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য কল্পনা ও বিশ্বাস ইহার অগ্রাহ্য। যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যায়, সেই পর্য্যন্তই ইহার সীমা। সে গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ইহা কল্পনার বিশাল রাজ্যে অনর্থক ভ্রান্ত হয় না।

প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যে কতিপয় মূল বিশ্বাস গ্রাহ্য করিয়াছে,সেই কতিপয় মূল বিশ্বাস দেখিয়া আস্তিকেরা তর্ক করেন যে, যখন বিশ্বাস ব্যতীত মানব চলিতে পারে না, তখন আমরা বিশ্বাসের বিরোধী কেন হইব। তাঁহারা এই সূত্র পাইয়া বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাস আনিয়া, ধর্ম্মকে অসংখ্য,অসঙ্গত বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ও ভূষিত করেন। যাহা মূল বিশ্বাস নহে, তাহাকেও তাঁহারা মূল বিশ্বাস বলিয়া ধরিয়া লয়েন। তাঁহারা এক বার সূত্র পাইয়াছেন যে,নাস্তিকেরাও কতিপয় মূল বিশ্বাস গ্রাহ্য করেন, সেই সূত্রে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাবতীয় বিশ্বাসকে মূল-বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্ত্তব্য করেন। এই লইয়া নাস্তিকের সহিত আস্তিকের বিবাদ উপস্থিত হয়। নাস্তিক দেখাইয়া দেন যে, যাহারা মূল বিশ্বাস—তাহারা পরস্পর ও কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু যাহা যাহা মূল-বিশ্বাস নহে, তাহারা পরস্পর এবং সর্ব্ববিধ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সহিত সঙ্গত নহে। সে সমস্ত বিশ্বাস, আস্তিক-দিগের কল্পনা-বিজৃম্ভিত-মাত্র।

বিশ্বাস-সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, অনুমান ও কল্পনা সম্বন্ধেও তাহা প্রযুক্ত হইবে। নাস্তিকদের এই কতিপয় মূল বিশ্বাসের মূলে যে অল্পাংশে অনুমান আছে, সেই অনুমানের সূত্র ধরিয়া আস্তিকেরা তর্ক করেন যে, যখন নাস্তিকেরাও কল্পনা গ্রাহ্য করিতেছেন, তখন কল্পনা কখন অগ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহারা এই সূত্র পাইয়া কল্পনার একটী বিশাল রাজ্য সৃষ্টি করিয়া বসেন। এই কল্পনা-সমুদায় অত্যন্ত সুন্দর ও মনোহর। সুতরাং তাহা সাধারণ-জন-গণের সহজে চিত্ত হরণ করে। সাধারণ-জন-গণ তলিয়া দেখে না যে, এই সমস্ত কল্পনা অত্যন্ত অসম্বদ্ধ ও অসঙ্গত। ইহাদিগের সহিত মানব-লব্ধ কোন জ্ঞানের সঙ্গতি নাই। কি পদার্থতত্ত্ব, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, সর্ব্ব বিদ্যাই এই সকল কল্পনার বিরোধী। নাস্তিকতা অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহকারে এই সমস্ত কল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। পরে ইহাদিগের কৃত্রিমতা, সৃষ্টি-কৌশল ও অলীকতা দেখাইয়া দেন।

প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-লব্ধ সিদ্ধান্ত সমুদায় নাস্তিকতার ধর্ম্ম ও বিশ্বাস। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ব্যতীত নাস্তিকতা অন্য প্রমাণ গ্রাহ্য করে না। সাক্ষ্য-জ্ঞান (Testimony) অবশ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিরোধী অনুমান ও কল্পনা নাস্তিকতার গ্রহণীয় নহে। সকল জ্ঞান,বিশ্বাস ও অনুমান এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ইহা পরীক্ষা করে। সেই পরীক্ষায় যাহা রক্ষিত হয়,তাহা গ্রহণ করিতে নাস্তিকতা সঙ্কুচিত নহে। তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। কারণ, সেই জ্ঞান ও বিশ্বাস তাহার অমূল্য ধন।

কপিঞ্জল।

দিল্লী।

• City of my soul
*　　*　　*
Lone mother of dead empires.

Childe Harold.

দিল্লী ! ভারত-কীর্ত্তি কলঙ্ক-অঙ্গন
রাজমাতা ! আজি কেন দুঃখিনীর বেশ?
কোথা' তব অরিন্দম পূর্ব্ব-সুত-গ্রণ
কোথা' সে ঐশ্বর্য্য-দম্ভ অতুল অশেষ ?
শূন্য তব ক্রীড়া কুঞ্জ, প্রমোদ-ভবন
নীরব বীণার ধ্বনি গায়কের দল,
ভগ্ন-শেষ সৌধ-মালা হায় রে যেমন
শ্মশানে বিকীর্ণ, ভগ্ন নৃ-মুণ্ড সকল।

দিল্লী ! মানব-ভাগ্য-পরীক্ষার স্থল
প্রত্যেক ভূ-খণ্ড তব পবিত্র পাবন,
স্বাধীনতা রঙ্গভূমি সমাধি-মণ্ডল
বিগত কালের সাক্ষী গৌরব-কেতন ;
অতীত-কালের স্মৃতি আননে তোমার
শিরে, কৃষ্ণ কেশজাল—কলঙ্কের ভার।

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত।

হিন্দুসমাজের প্রচলিত বঙ্গীয় বিবাহপ্রথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদিগের সমাজে কু-প্রথা এত দূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বিবাহ করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করা দূরে থাক্, আপাতত বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইলেও, অনেক নির্ব্বোধ ব্যক্তি বিবাহ করিয়া জগতে দুঃখের স্রোত বর্দ্ধিত করে।

অনেকেই জানেন—আমাদিগের দেশে এমন অনেক লোক আছে, যাহাদিগকে টাকা দিয়া বিবাহ করিতে হয়। তাহারা কন্যার বিবাহে টাকা পায়; (অর্থাৎ কন্যা বিক্রয় করে) এবং পুত্রের বিবাহে টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করে। এই শ্রেণীতে অনেকে সম্পত্তিশালী আছে; কিন্তু তাহাদিগের বংশ-গৌরব হীন হওয়ায়, এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর হীনাবস্থদিগকে বিবাহ করিতে দেখিলে, কি মনে হয়? বাতুল ভিন্ন তাহাদের উপযুক্ত অন্য উপাধি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া দুর্ঘট হয়। ৪০।৫০ বৎসর [illegible] কোন কুলীনের [illegible] অপরে

জীবনের সার ভাগ অতিবাহিত করিয়া যখন মস্তকের কেশ রাশি ধবল ও দন্ত-গুলি প্রায় তিরোহিত হইল, তখন মনে সাধ হইল আইবড় নাম ঘুচাইতে হইবে—বিবাহ করিয়া বাঙ্গালী-জীবনকে সার্থক করিতে হইবে। অর্থ বিনা বিবাহ হইতে পারে না বলিয়া ভাবিলেন যে, দুইটী উপায় আছে। প্রথমতঃ বাস্তু বাটী ও ৪।৫ বিঘা নিষ্কর-ভূমি মাত্র যাহা সম্পত্তি আছে, তাহাই বিক্রয় করিলে কিছু টাকা হইবে। দ্বিতীয়তঃ কিছু ভিক্ষা করিলেও অবশিষ্ট সংগৃহীত হইবে। এই দুই উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিয়া ৩।৪ বৎসরের একটী বালিকা যুটিল। বালিকার পিতা মাতা অর্থ-পিশাচ; টাকা হইলেই তাঁহাদের হইল; তাহাতে মেয়ে বাঁচুক আর মরুক; সুতরাং বিবাহের আর বাধা কি? বালিকা যৌবন-পথে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই হতভাগা লীলা খেলা শেষ করিয়া নিরাশ্রয়া মন্দ-ভাগিনী বালিকাকে অনন্ত-দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া জীবনের সাধ মিটাইল। নির্দ্দোষী সরল বালিকা হৃদয়-শূন্য পিতা-মাতার অনুগ্রহে বিবাহের বয়ঃ-প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বিধবা—বালিকা-বয়সে সন্ন্যাসিনী হইল। মনুষ্য-জীবনের সাধ, দাম্পত্য-সুখ-ভোগ ঘুচিয়া গেল, উদরান্নের জন্য বালিকা-বয়সে পথের ভিখারিণী। যে সমাজ এ প্রকারে বিবাহ অনুমোদন করে, যে সমাজ এরূপ হৃদয়-বিহীন পিতা মাতাদিগের [illegible] অভাগাদিগকে যত্ন সহকারে আশ্রয় দেয়, যে সমাজ এই সমস্ত বাল-বিধবার পুনঃ-বিবাহের ক্ষমতা হরণ করিয়াছে, সেই সমাজকে ধিক্! যে সমাজ নির্দ্দয়, হৃদয়-শূন্য পশুবৎ—সে সমাজ জগৎ হইতে বিলীন হউক—সে সমাজ অনন্ত-সাগর-গর্ভে নিহিত হউক; তাহা হইলে জগতের পাপ-পঙ্ক কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইবে।

বাল্য-বিবাহ বঙ্গীয় বিবাহের চতুর্থ দোষ। এই প্রথার ফল যে কত দূর ভয়ানক ও বিষময়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। বালক-দিগের ক্রীড়া-বিবাহ দেখিয়া আমরা হাসি; কিন্তু পাঠক বঙ্গ-দেশের বাল্য-বিবাহ কি বালকদিগের ক্রীড়া-বিবাহ অপেক্ষা অধিক হাস্যজনক ব্যাপার ও শত সহস্র গুণে অনিষ্টকারী নহে? বাল্য-বিবাহ বঙ্গসমাজের একটী বিষময় বীজ। এই বিষময়-বীজোৎপন্ন বৃক্ষ যে কত শত বিষময় ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা সহৃদয় পাঠক-মাত্রেই দেখিয়া থাকিবেন। বঙ্গ-সমাজ প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্ত্তে সেই বিষময় ফল আস্বাদন করিতেছে; কিন্তু চৈতন্য নাই—বিষ-ভক্ষণে উন্মত্ত—বিষের অপকারিতা অনুভবে অক্ষম। সময়ে সময়ে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় এক একবার জাগরিত হইয়া আবার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। সুসভ্য বঙ্গ-সমাজে অনেক মহাত্মাগণের, কুকুর প্রভৃতির বিবাহ দিয়া পুত্র-পুত্রী-দিগের [illegible] [illegible] বং [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] মাতিয়া

থাকেন। বালক-বালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ। পিতা, মাতা, আত্মীয় বন্ধুদিগের আমোদই প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহাদের সামান্য আমোদের জন্য যে দুইটী নির্দ্দোষী জ্ঞান-শূন্য বালক-বালিকা চির-দুঃখে নিপতিত হইল, তাহা জ্ঞান নাই, শুদ্ধ আপনাদের আমোদ হইলেই হইল। সপ্তম কিংবা অষ্টম-বর্ষীয়া বালিকার সহিত দ্বাদশ কি একাদশ বর্ষ-বয়স্ক বালকের বিবাহ হইল! বালক ও বালিকা বিবাহের কি বুঝিল? বিবাহ কাহাকে বলে, বিবাহ খাইতে হয়, কি পরিতে হয়, লোকে বিবাহ করে কেন, বিবাহ করিতে হইলে কি কি করা আবশ্যক, বিবাহ হইলে স্বামীর স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি মনের ভাব কিরূপ, বিবাহিত দম্পতির ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য কি, এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি তাহাদিগের নিকট কি উত্তর আশা করেন? তাহারা বাক্‌শূন্য হইয়া আপনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিবে,—না হয় লজ্জিত হইয়া একটু হাসিবে। পরিণত-বয়স্ক যুবক যুবতী যে সকল প্রশ্নের উত্তর বিশেষ বিবেচনা না করিয়া প্রদান করিতে অক্ষম, ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালক বালিকা যে, সে প্রশ্নের উত্তর-দানে সমর্থ হইবে, ইহা কে প্রত্যাশা করিতে পারেন?

[illegible]

বিভক্ত করিব। প্রথমতঃ বালকের সহিত বালিকার বিবাহ, দ্বিতীয়তঃ তরুণ-বয়স্ক যুবক বা বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহ। আমরা প্রথমতঃ বালক ও বালিকার যে বাল্য-বিবাহ হয়, তাহারই দোষ-গুণের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব। বঙ্গীয় বিবাহ একান্ত অবিচ্ছেদ্য হওয়াতে ভূরি ভূরি অশুভ ঘটনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব শৈশবাবস্থায় কুমারমতি বালক-বালিকাদিগকে এরূপ চির-শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলে ভবিষ্যতে যে কত বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। অকাল-মৃত্যু, অকাল-বৃদ্ধত্ব, শারীরিক ও স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, কার্য্যে স্বাভাবিক উৎসাহ, মানসিক নিস্তেজতা বাল্য-বিবাহের বিষময় পরিণাম। অজ্ঞাত-চরিত্র, অজ্ঞাত-নামা, চির-অপরিচিত দুইটী বালক বালিকা যাবজ্জীবনের জন্য সংযোজিত হইল; অনিষ্টাদপি অনিষ্টতর-রূপে পবিত্র-প্রণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। তাহাদের একের সুখে অন্যের সুখ—একের দুঃখে অন্যের দুঃখ। এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জগতে আর কিছুই নাই। এরূপ সুদৃঢ় শৃঙ্খল আর কি আছে? যতই কেন ক্লেশ হউক না, কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। যাহার সহিত সুখ-দুঃখ-ভাগী হইয়া একত্রে যাবজ্জীবন কাল-ক্ষেপণ করিতে হইবে, [illegible]

পরস্পরের চরিত্র, মনের ভাব, এবং পরস্পরের প্রতি উভয়েরই আসক্তি প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া বিশেষ সতর্কতা সহকারে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পরীক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকায় (courtship) বরকন্যার স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বাচন-প্রথা প্রচলিত থাকায় অনেক সুখের কারণ হইয়াছে। সে প্রথা প্রচলিত থাকাতেও, যখন সময়ে সময়ে যুবক-যুবতীগণ যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারে না, তখন বাল্য-বিবাহ যে অসহ্য যন্ত্রণার আকর, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? বালক বালিকা হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক যুবতী পর্য্যন্ত কাহাকেও বরকন্যা দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিতে দেয় না, দিলেও অজ্ঞান বালক-বালিকার পক্ষে বিবেচনা সেরূপ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করা অসাধ্য ও অসম্ভব। বাল্য-কালে জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না, তখন সকলে এক প্রকার অন্ধ। বালক বালিকা পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রমশ বয়ঃস্থ হইলে আপনাদিগের বিপদ বুঝিতে পারে। স্বামী স্ত্রীর কিংবা স্ত্রী স্বামীর মনোমত নহে, সুতরাং তাহারা কখনই একত্রে সুখে কাল যাপন করিতে পারে না। বিভিন্ন-প্রকৃতি দুই জন লোক পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইতে পারে না। বাহিক আচার ব্যবহারের উপরে সমাজের কর্তৃত্ব আছে; কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপরে সমাজের ক্ষমতা কি? আমার ইচ্ছা হইল না, তোমাকে ভালবাসিতে পারিলাম না; তজ্জন্য সমাজ আমাকে কি দণ্ড দিতে পারেন? কিন্তু বঙ্গসমাজে কি উপায়? যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অচ্ছেদ্য ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। এক-মাত্র মৃত্যু ভিন্ন কেহই সে শৃঙ্খলচ্ছেদে সমর্থ নহে। মনে শান্তি না থাকিলে জীবন দুর্ব্বহ-ভার-স্বরূপ হইয়া পড়ে। যে জীবনের জন্য অশীতি-বর্ষীয় বিকলাঙ্গ বৃদ্ধও লালায়িত, সেই অমূল্য জীবনকে তাহারা বিসর্জ্জন দিতে কিছু-মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সুখের যৌবনে তাহারা সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিল, জগৎ তাহা-দিগের নিকটে জীর্ণ অরণ্যবৎ বোধ হইতে লাগিল। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জা-শীলা, মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না; পাছে পবিত্র-সতীত্ব-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হয়, সুতরাং নির্জ্জনে বিলাপই তাহার এক-মাত্র অবলম্বন। সময়ে সময়ে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেককে জীবন পর্য্যন্ত শেষ করিতে হয়। যে কুল-মান, স্বভাব-সুলভ লজ্জা এবং সতীত্ব-রত্ন স্ত্রীলোকের ভূষণ, তাহাও বিসর্জ্জন দিয়া ঘৃণিত গণিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতেও দেখা যায়। কিন্তু পুরুষ স্বাধীন। সে হঠাৎ সুখ-সাগরে যাবজ্জীবনের মত বিসর্জ্জন দিতে পারে না; অন্য কোন উপায়ে বাঞ্ছা-সুখ-ভোগের চেষ্টা করে। কিন্তু মনের সুখ কোথায় পাইবে? অবশেষে [illegible]

পাদমর্দ্দিত। মনে শান্তির লেশ-মাত্র নাই। অভেবন হতভাগা সর্ব্বযন্ত্রণা-নাশক সুরা-দেবীর আরাধনায় এবং কোন কুলটার অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইল। সাম না আকু-প্রণার জন্য এক জন শিক্ষিত শান্ত-স্বভাব যুবক অধুনা মদ্যপায়ী, নির্লজ্জ ও নিলম্পট।

পাঠক ইহা আমার কল্পনা-প্রসূত কি ইহার যাথার্থ্য আছে, তাহা আপনি একটু চেষ্টা করিলেই দেখিতে পাইবেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন-স্বরূপ উপাধি-ধারী প্রসিদ্ধ ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে অন্বেষণ করুন, সেখানেও দুই একটী দেখিতে পাইবেন। নামোল্লেখ করা সঙ্গত নহে, সুতরাং নাম করিয়া দেখাইয়া দিতে পারিলাম না। যেন কেহ মনে না করেন যে, সকলের পক্ষেই এইরূপ ঘটে; অনেকের পক্ষে সৌভাগ্য-ক্রমে শুভ-জনকও হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে স্ত্রীসংসর্গ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষময়, ইহা চিকিৎসা-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশদ-রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। শরীর বেশ সু-গঠিত না হইতেই তাহার ক্ষয় আরম্ভ হওয়ায় শরীর স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দৌর্ব্বল্য আসিয়া উপস্থিত হয়; বুদ্ধি-বৃত্তি ও স্মরণ-শক্তির স্বাভাবিক প্রাখর্য্য নষ্ট হয়; সুতরাং নানা প্রকার রোগ আসিয়া হতভাগাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে। হতভাগ্যের বিদ্যাশিক্ষার সময় এই সমস্ত অভাবনীয় বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাহার জীবনের সমস্ত উচ্চ অভিলাষকে বিদূরিত করিয়া দেয়। বিদ্যাশিক্ষা শেষ না হইতেই বালক-বয়সে হতভাগা পিতা হইলেন! শত সহস্র ক্লেশের সহিত আর একটী সংযুক্ত হইল। অভাগার চিন্তা-তরঙ্গে আর একটী ঢেউ আসিয়া মিশিত হইল। পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, পুত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, পিতা কোন প্রকারে আমার পাঠোপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন; কিন্তু আমার পুত্রগণের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-প্রদান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং পাঠ পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে হইল। তাহাতে আবার আজকাল চাকরী যোগাড় করা অতিশয় বিষম দায়। আজ কাল এলে পাস করিলেও টাকায় দুইটার দরে খাটিতে হয়। নানা প্রকার রোগ এবং দুশ্চিন্তায় অকাল মৃত্যু আসিয়া অভাগার জীবন অসময়ে হরণ করিল। নিরাশ্রয়া বিধবা ও পিতৃহীন শিশুগণকে দুঃখ-স্রোতে ভাসাইয়া দিল। পিতা মাতার অপরিপক্কাবস্থায় যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারাও সুগঠিত হয় না এবং আজন্ম রুগ্ন হয়। সুতরাং তাহাদের জীবন যে অতীব শোচনীয় হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। শারীরিক অঙ্গসৌষ্ঠব না হইলে বুদ্ধিবৃত্তিও পরি-পুষ্ট হয় না এবং মানব-দেহ স্বভাবতঃই হীনবল হইয়া পড়ে। এই অপরিপুষ্ট বালক বালিকার সন্তান সন্ততি যে আরও

হীনবল, রুগ্নকায় ও নিস্তেজ হইবে; তাহাতে অণু-মাত্র সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বদাই বাল্য-বিবাহের এই বিষময় ফলটী প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এবং বঙ্গবাসীরা স্বভাবতঃ ক্ষীণকায় ও হীনবল তাহাতে আবার এই কু-প্রথা প্রচলিত থাকায় আমাদিগের শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। সুতরাং এ প্রথা প্রচলিত থাকিলে বঙ্গবাসীদিগের একেবারে অকর্ম্মণ্য হওয়া অসম্ভব নহে। এই প্রথা পরিবর্ত্তিত না হইলে, আমরা যে কখন স্বাধীনতার অমৃতময় রসাস্বাদনে সমর্থ হইব তাহার, বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই।

আমাদিগের দেশে পিতা মাতা যে নিঃস্বার্থ বাল্যবিবাহ অনুমোদন করেন, তাহা মনে করিবেন না। এক দিকে আমোদ, পুত্রকে দৃঢ়রূপে সংসারে আবদ্ধ করা এবং সেই সঙ্গে কিছু লাভ। অন্য দিকে যত শীঘ্র কন্যাদায় হইতে মুক্তি হয়, ততই মঙ্গল। আমাদিগের দেশে বদ্ধমূল কুরীতি-গুলির সহিত আবার নূতন একটী আসিয়া মিলিত হইতেছে, সেটীও অচিরকাল মধ্যেই যে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে হীনাবস্থ হইলে সকল জাতিতেই অনেকে কন্যা-বিক্রয় করিত, কিন্তু আজিকাল সকল অবস্থার লোকেই পুত্র বিক্রয় ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বাপর সকলেই কন্যা-বিক্রয়কে ঘৃণা করে, কিন্তু পুত্র-বিক্রয়ে ঘৃণা দূরে থাক্, সকলেই গৌরব বলিয়া মনে করেন। আজ কাল পুত্র সন্তান অনেকের পক্ষে একটী সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। পিতা মাতার অবস্থানুসারেই প্রায় পুত্রের দর হইয়া থাকে। কখন কখন পাস অনুসারেও দর চুক্তি হইয়া থাকে। আজ কাল চাকরী এত মহার্ঘ হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পাস করা ছেলের দর সেই পরিমাণে কমিতেছে না। মধ্যে দিন কতক পাস-করা ছেলের বাজার ভয়ানক গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ কাল আর সেরূপ নাই। চাকরির দুর্দ্দশা দেখিয়া আর লোকে শুদ্ধ পাশ চায় না। এক্ষণে বিবাহের সময় কন্যাকর্ত্তা প্রায়ই পাত্রের অবস্থা দেখিয়াই বিবাহ দিয়া থাকেন এবং বরকর্ত্তাও আর কন্যা দেখেন না; বৈবাহিক কত টাকা দিতে পারিবেন, তাহা জানিতে পারিলেই হইল। কন্যাটি কুরূপা হউক, অঙ্গহীনা হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু তাহার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ টাকা পাইলেই হইল। এ প্রথাটী প্রচলিত হওয়ায়, সকলের পক্ষেই বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ ভদ্রলোকের পক্ষে ভয়ানক বিপদ হইয়াছে। তাঁহাদের সৎ-পাত্রে কন্যা দান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব্বোক্ত কারণে (অর্থাৎ পিতার অর্থাভাব-প্রযুক্ত) এবং অন্যান্য কারণেও হীনাবস্থ ভদ্র লোকদিগকে বয়স্থা অর্থাৎ দশ কিংবা

ষোড়শ-বর্ষীয়া কন্যাকে প্রৌঢ়বয়স্ক বৃদ্ধ পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে হয়। তাহাকেও বাল্যবিবাহ বলিতে হইবে। বর কন্যা উভয়েই অথবা এক জন অপরিণত-বয়স্ক হইলেই বাল্যবিবাহ বলা যায়। এ প্রথাটীও অত্যন্ত দূষ্য। যেরূপ প্রকৃতির সামঞ্জস্য ভিন্ন প্রণয় জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ বয়ঃ-সাম্য ভিন্ন প্রকৃতির সামঞ্জস্য হয় না। বৃদ্ধের সহিত বালিকা কিংবা যুবতীর মনের ভাব এক হইতে পারে না। ইহা স্বভাবের বিরুদ্ধ। সুতরাং বৃদ্ধ স্বামী ও যুবতী ভার্য্যার প্রণয় অসম্ভব। এরূপ স্থলে বিবাহ পবিত্র প্রণয় ও দাম্পত্য-সুখের কারণ না হইয়া অধিকাংশ স্থলেই উভয়ের পক্ষে ভয়ানক অসুখের কারণ হইয়া পড়ে। পিতা মাতা কন্যাকে বৃদ্ধ প্রৌঢ় পাত্রের হস্তে দিয়া কন্যাভার হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, কিন্তু বালিকা বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে পড়িতে হইবে শুনিয়াই, কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং কাঁদিয়াই জীবনের অবশিষ্টাংশ শেষ করিল। বালিকা-বয়সে ভালবাসা কি প্রণয়, বুঝিতে পারিল না, কিন্তু যৌবনাবস্থায় তাহাকে সেই স্বাভাবিকী প্রবণতা হইতে কে নিবারণ করিতে পারে? তখন সে প্রণয় ভালবাসা বুঝিল। কিন্তু পিতামহ-বয়স্ক বৃদ্ধের সহিত প্রণয়ালাপে নবযুবতী কখনই পরিতুষ্ট হইতে পারে না। বৃদ্ধ স্বামী তরুণী ভার্য্যাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিল বটে, কিন্তু যুবতী তাহাকে ভালবাসিতে পারে কই? ভালবাসিলেই যদি ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া যাইত, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইত; প্রণয় এত দুর্লভ পদার্থ বলিয়া গণ্য হইত না; তাহা হইলে লোকে প্রণয়ের জন্য লালায়িত হইত না—তাহা হইলে প্রণয়ে হতাশ হতভাগ্যদিগকে কাঁদিতে হইত না। দম্পতিদিগের মধ্যে বয়সের প্রভেদ যত অল্প হইবে, প্রণয় তত ঘনীভূত হইবে। যুবতী বৃদ্ধকে ভালবাসিতে পারিল না, তাহাদিগের প্রণয়াশা চরিতার্থ হইল না। বৃদ্ধ অগত্যা নৈরাশ্য সহ্য করিতে পারে, কিন্তু যুবতী পারে কই? সে অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া অবৈধ উপায়ে প্রণয়াশা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন সে সতীত্ব-রত্ন বিসর্জ্জন দিয়া, কুলবধূ-নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলটা-নাম ধারণ করিল। বৃদ্ধ দুঃখে হতাশ হইয়া অচির-কাল-মধ্যেই কাল-স্রোতে ভাসিয়া গেল। এই প্রকার বিবাহের আর একটী দোষ আছে। বৃদ্ধেরা অচির-কাল-মধ্যেই ভব-লীলা সাঙ্গ করিয়া অকাল-বিধবার সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন।

আরও এক প্রকারে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে, সেটি পরিবর্ত্ত-বিবাহ। অনেকে অর্থাভাবে বিবাহ করিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কতকগুলি যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু বিত্ত থাকে, তাহাই বিক্রয় করিয়া

মনুষ্য-জন্মের সাধ মিটাইলেন—বৃদ্ধ বয়সে আইবুড়-নাম ঘুচাইলেন—সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া এক পাইখানা প্রস্তুত করিলেন। অপর কতকগুলি লোক, হয় কন্যাক্রয় করিয়া কিংবা বিনিময় করিয়া বিবাহ করেন। পরিবর্ত্ত-বিবাহ কিরূপ, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহা যে একটি অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রথা, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। হয়ত ৪০ বৎসর অতীত হইয়াছে—বিবাহ হয় নাই, অর্থ নাই; সুতরাং সে সম্ভাবনাও ছিল না। হঠাৎ দুর্ভাগার ভাগ্য-ক্রমে সহোদর ভ্রাতা কিংবা নিতান্ত আত্মীয়ের একটি বালিকা হইল। এই কন্যা তখন তাঁহার ভরসার স্থল—তাঁহার বংশরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। মহা আনন্দ, পরম সৌভাগ্য, বিবাহ হইবে। সেইরূপ আর এক হতভাগ্যের হয়ত প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কিংবা অন্য কোন আত্মীয়ের একটী কন্যা আছে। সম্বন্ধ স্থির হইল, বিবাহ হইয়া গেল। হতভাগারা পৌত্রের দৌহিত্রীর বয়স্কা শিশুদিগকে বিবাহ করিয়া তাহাদিগের বাক্যস্ফূর্ত্তি না হইতেই ইহ-লোক পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু হতভাগিনী বালিকার উপায় কি? তাহারা মাতৃ-গর্ভ হইতেই বিধবা—বাল্য-কালেই তাহাদিগের জীবনের সাধ মিটিল। সংসারে দুঃখই তাহাদিগের একমাত্র সহচর। হতভাগ্য বঙ্গ-সমাজ এ প্রকার বিধবারও পুনর্বিবাহ অনুমোদন করে না।

বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকা বঙ্গ-সমাজের বিবাহ প্রথার ৪র্থ দোষ। পুরাকালে হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা আর অন্যদিগকে নূতন করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। পরমশ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়া সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আপাততঃ কলিযুগ উপস্থিত হওয়ায় বন্ধ আছে। অধ্যাপক মহাশয়েরা আজকাল অধিকাংশই বিদ্যাশূন্য। অনেকেরই সুদীর্ঘ টিকি ও ফোঁটা মাত্র সার; তাঁহারাই হিন্দু-সমাজের ব্যবস্থা-দাতা ও নেতা। তাঁহারা পিতামহী কিংবা প্রপিতামহীর নিকট গল্প শুনিয়াছিলেন যে, কলিতে বিধবা-বিবাহ রহিত আছে। সুতরাং তাঁহাদেরও তাহাই বলা চাই। বস্তুত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও যুক্তি-সঙ্গত কি না তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু প্রতিবাদ না করিলেও, শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখান হয় না; সুতরাং কোন মতেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইতে দেওয়া হইল না। বিধবা-বিবাহের অভাবে সমাজে যে কি ভয়ানক ভয়ানক লোম-হর্ষণ ব্যাপার ঘটিতেছে, এবং সমাজের কি ঘৃণিত শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই অবগত আছেন। প্রতিদিন বঙ্গ-সমাজে যে কত ভ্রূণ-হত্যা ও স্ত্রী-হত্যা হইতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? প্রকাশ্যে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না; কিন্তু একটু চেষ্টা করিয়া

দেখিলে, দেখিতে পাই কি ভয়ানক চিত্র! প্রচ্ছন্ন ভাবে কি ভয়ানক দুর্নীতি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আমি অধ্যাপকদিগকে বিধবা-বিবাহের প্রধান অন্তরায় বলিয়া তিরস্কার করিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগের সুসভ্যতাভিমানী সুশিক্ষিত উপ[illegible] দুই এক জন লোকের মুখেও [illegible]হের বিরুদ্ধে কথা বার্ত্তা ও [illegible] প্রকার স্বার্থপূর্ণ যুক্তি শুনিতে পাই এমন কি দুই এক খানি বঙ্গীয় মাসিক পত্রিকাতেও ইহার বিরুদ্ধে এক আধটী প্রবন্ধ দেখা গিয়াছে। ধন্য বঙ্গদেশ! ধন্য বঙ্গ-সমাজ! তোমার অপার মহিমা। বঙ্গভূমির কি আশ্চর্য্য গুণ! আমরা কাহারও ভাল দেখিতে পারি না; "তোর ঢাকা থাক্ মোর বিকিয়ে যাক্" কি ভয়ানক স্বার্থপরতা! তোমরা [illegible]ষা; স্বভাবতঃই হিতাহিত জ্ঞান আছে। [illegible]াহাতে আবার শুনিতে পাই, সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সুশিক্ষার জ্যোতিতে [illegible]নের অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে; [illegible] হরি! এই সুশিক্ষার ফল! [illegible]ই যদি সুশিক্ষার ফল হয়, তাহা হইলে [illegible]মি এমন সুশিক্ষা চাই না—আমি [illegible]ন্ধকারে থাকিলে সুখী হইব। না ইহা [illegible]শিক্ষার ফল নহে; ইহা আমাদিগের [illegible]তৃভূমি বঙ্গদেশের মাটির দোষ। আসাম [illegible] হইতে উৎকৃষ্ট সুখাদ্য কমলা-লেবু [illegible]নিয়া বঙ্গের মাটিতে রোপণ করুন, [illegible] কমলাবৃক্ষে অপূর্ব্ব বিস্বাদ গোঁড়া লেবু জন্মাইবে। আমি এক্ষণে দেখিতেছি আমাদের সুশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকেরা ইউরোপীয় অপূর্ব্ব কমলার কলম বটে, কিন্তু ফলে গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন। তোঁহাদের গায়ে জোর আছে, স্ত্রীজাতি হীনবল। সুতরাং সাহসী সুশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের আপনাপন বিক্রম ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিবার স্থল হতভাগা বঙ্গীয় স্ত্রীজাতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আপনাদিগের শত সহস্র স্ত্রী-বিয়োগ হইলে শত সহস্র বারই বিবাহ করিলেন। এমন কি, মরিবার আগের দিনও বিবাহ করা হইল; তাহাতে কোন দোষ নাই। তাহাতে আপত্তি করে, কাহার সাধ্য? সে সময় "মাকড় মারলে ধোকড় হয়।" আর যত দোষ হতভাগা বিধবাদের বিবাহের সময়। কেন তাহারা কি মানুষ নহে? তাহাদের জীবনে কি কোন সাধ নাই? না তাহারা সুখানুভবে অক্ষম? একটী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইল তাহার আর বিবাহ করিবার যো নাই; কিন্তু অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের বিবাহে কোন আপত্তি নাই। সমাজের কি মহান্ উদার ভাব! এরূপ উদারতা নহিলে বঙ্গসমাজ কি করিয়া উন্নত হইবে? ভবিষ্যতে এই বাল-বিধবার চরিত্র বিশুদ্ধ থাকা কখনই সম্ভাবিত নহে। এই প্রকারে দিন দিন যে কত পাপ-স্রোত পরিবর্দ্ধিত হইয়া বঙ্গভূমি প্লাবিত করিতেছে, তাহা অন্ধ সমাজ দেখিয়াও দেখে না, আপনাদিগকে অন্ধ বলিয়া ভাণ করে।

সুতরাং বলা বাহুল্য যে—বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, সমাজের এই সমস্ত পাপ-স্রোত বিদূরিত হইবে এবং সেই সঙ্গে সুখ ও শান্তি বিরাজিত হইয়া আমাদিগের সমাজকে নব জীবন প্রদান করিবে। বালকের সহিত বালিকার, যুবকের সহিত যুবতীর, প্রৌঢ়ের সহিত প্রৌঢ়ারই প্রণয় সম্ভব। কিন্তু প্রৌঢ়ের সহিত বালিকার প্রণয় অস্বাভাবিক। সুতরাং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকিলে, কাহারও পত্নী-বিয়োগ হইলে তিনি সমবয়স্কা অন্য বিধবাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া উভয়ে পরম সুখে জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিতে পারেন। এই প্রকারে সকলেরই পত্নী কিংবা স্বামি-বিয়োগ হইলে, সকলেই উপযুক্ত পত্নী কিংবা স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই সমস্ত সামাজিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন বঙ্গ-সমাজ কখনই উন্নত হইতে পারিবে না। আমি আশা করি, সুশিক্ষিত-যুবক-মণ্ডলী সকলেই একাগ্র-চিত্তে এই সমস্ত কুরীতি যথাসাধ্য সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিবেন। এক্ষণে আমাদিগের কার্য্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন হইতে বিশেষ যত্ন না করিলে, আমাদের সমাজ সংস্কৃত হইবে না—আমাদের দেশ উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হইতে পারিবেনা।

শ্রীউঃ ভঃ।

স্বাস্থ্য।

আজ কাল আমাদের দেশে গর্ভস্রাব সচরাচর ঘটিয়া থাকে। সে সকল স্থলে উপযুক্ত চিকিৎসকের অসদ্ভাবে অনেক অনিষ্ট ঘটে; সুতরাং গর্ভস্রাবের চিকিৎসা সামান্যতঃ ও সংক্ষেপে সকলেরই জানা উচিত—এই বিবেচনায় এ স্থলে সুশ্রুতের গর্ভ-রক্ষা করিবার প্রক্রিয়া লেখা যাইতেছে। পূর্ব্ব-কথিত কারণে(১) গর্ভস্রাব হইবার পূর্ব্বে গর্ভাশয়, কটী, উরু ও বস্তিদেশ কন্ কন্ করে। এই অবস্থায় শীতল জল পরিষেচন,

---

(১) তত্র পূর্ব্বোক্তৈঃ কারণৈঃ পতিমাত্রি গর্ভে গর্ভাশয়-কটী-বঙ্ক্ষণ-বস্তি-শূলানি রক্তদর্শনঞ্চ তত্র শীতৈঃ পরিষেকাবগাহ-প্রদেহাদি-ভিরুপচরেজ্জীবনীয়-শৃত-ক্ষীরপানৈশ্চ গর্ভস্ফুরণে স্রুতে চ কং-সঞ্চারণার্থং ক্ষীর-মৃৎপলাদি-সিদ্ধং পায়য়েৎ প্রস্রংসমানে স-দাহ-পার্শ্ব-পৃষ্ঠ-শূলাসৃগ্দরানাহ মূত্রসঙ্গাঃ স্থানাৎ স্থানঞ্চোপক্রামতি গর্ভে কোষ্ঠে সংরম্ভত্র স্নিগ্ধশীতাঃ ক্রিয়াঃ। বেদনায়াং মহাসহাক্ষুদ্র-সহাশ্বদংষ্ট্রা কণ্টকারিকা-সিদ্ধং পয়ঃ শর্করা-ক্ষৌদ্র-মিশ্রং পায়য়েৎ মূত্রসঙ্গে দর্ভাদি-সিদ্ধং। আনাহে হিঙ্গু-সৌবর্চ্চল-লশুন-বচা সিদ্ধং।—সুশ্রুত; শারীর-স্থান, ১০ম অধ্যায়।

অবগাহন ও শীতল প্রলেপাদি দিবে এবং জীবনীয়া-সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইবে। গর্ভ-স্ফুরণ হইতে দেখিলে, গর্ভ-সংধারণের জন্য মুহুর্মুহু উৎপল-সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইবে। স্রাব হইতে থাকিলে, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও দাহ, রক্ত-স্রাব, মল, বায়ু ও মূত্রের রোধ হয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কুক্ষি-মধ্যে গর্ভ-সঞ্চরণ করিতে থাকিলে, কোষ্ঠদেশে সংরম্ভ হয়। তাহাতে স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া করা আবশ্যক। গর্ভাশয়ে বেদনা বোধ হইলে মাষাণী, মুগাণী, যষ্টিমধু, গোক্ষুরি ও কণ্টকারি সহ সিদ্ধ দুগ্ধ, শর্করা ও মধু মিশ্রিত করাইয়া সেবন করাইবে। মূত্র বদ্ধ হইলে, কুশ-মূল কেশের মূল, শরের মূল ও বেণা-মূল সহ সিদ্ধ দুগ্ধ পান করান ব্যবস্থা। বায়ু ও মল রোধ হইলে হিং, সৌবর্চ্চল, লশুন ও বচ সহ সিদ্ধ দুগ্ধ দিবে।

অত্যন্ত রক্ত-স্রাব (২) হইলে, গৃহ-মধ্যস্থ মৃত্তিকা-পিণ্ড, মাঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল, নবমালিকা-ফুল, মনঃশিলা, ধুনা, রসাঞ্জন এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করাইবে, অথবা ন্যগ্রোধাদি-গণ অথবা বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, অর্জ্জুন, আম্র, কেওড়া, চোর-কাঁটা, তেজ-পত্র, যাম, বন-যাম, পিয়াল, যষ্টি-মধু, কটক, কদম্ব, কুল, গাব, শাল, লোধ, সাবর-লোধ, ভেলা, পলাশ, নন্দী-বৃক্ষ,—ইহার মধ্যে যাহার যাহার ত্বক্ ও প্রবাল পাওয়া যায়, তাহা পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

অথবা নীলোৎপল, কুমুদ, সৌগন্ধিক পদ্ম-কাষ্ঠ, নীল-পদ্ম, শ্বেত-পদ্ম ও যষ্টি-মধু পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করাইবে; অথবা কেশুর, শিঙাড়া ও শালুক বাটিয়া দুগ্ধের সহিত কিংবা যজ্ঞডুম্বুরের ফলের রস বা তাহার কন্দের কবাথ পক্ক দুগ্ধ সহ পান করাইবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত ন্যগ্রোধাদি-গণের রসে শালি তণ্ডুল পেষণ করিয়া শর্করা ও মধু মিশ্রিত করাইয়া পান করাইবে, কিংবা বস্ত্রে মাখাইয়া স্রাব-পথে দিবে। শোণিত স্রাব না হইয়া কেবল বেদনা হইলে, যষ্টি মধু দেবদারু ও পয়স্যা (ক্ষীর কাকোলী) সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে কিংবা অশ্মন্তক, শতাবরী, পয়স্যা

(২) অত্যর্থং স্রবতি রক্তে কোষ্ঠা-গারিকাগার-মৃৎপিণ্ড-সমঙ্গা-ধাতকী-কুসুম-নবমালিকা-গৈরিক-সর্জ্জরস-রসাঞ্জন-চূর্ণং মধুনাবলিহ্যাদ্‌যথালাভং ন্যগ্রোধাদি-ত্বক্-প্রবাল-কল্কং বা পয়সা পায়য়েচ্ছুৎপলাদিকল্কং বা কশেরু-শৃঙ্গাট-কশালুক-কল্কং বা শৃতেন পয়সোডুম্বর-ফলোদক-কন্দ-কবাথেন বা শর্করা-মধু-মধুরেণ শালি-পিষ্টং ন্যগ্রোধাদি-স্বরস-পরিপীতং বা বস্ত্রাবয়বং যোন্যাং ধারয়েৎ, অথাদুষ্ট-শোণিত-বেদনায়াং মধুক-দেবদারু-পয়স্যা সিদ্ধং পয়ঃ পায়য়েৎ; তদেবাশ্মন্তক-শতাবরী পয়স্যা সিদ্ধং বিদারি-গন্ধাদি-সিদ্ধং বা বৃহতী-দ্বয়োৎপল-শতাবরী-সারিবা-পয়স্যা মধুক-সিদ্ধং চৈবং [illegible] উপাবর্ত্ততে [illegible] গর্ভ[illegible]।—সুশ্রুত।

ইহাদিগের কষায় কিংবা বিদারি-গন্ধাদি-গণে উল্লিখিত দ্রব্য-সমূহের কষায় কিংবা বৃহতী, কণ্টকারি, উৎপল, শতাবরী, অনন্ত-মূল, পয়স্যা ও যষ্টিমধুর কষায় পান করাইবে। শীঘ্র এই প্রণালীতে প্রতিকার করিলে গর্ভস্রাব না হইয়া ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চিকিৎসায় গর্ভ-স্থিত হইলে অর্থাৎ গর্ভস্রাবের আর কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে, যজ্ঞ-ডুমুর দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করাইয়া পান করাইবে। (৩)

গর্ভিণীর কৃত্যাকৃত্য-বিষয়ে মৎস্য-পুরাণে কশ্যপের কথিত উপদেশ-স্থলে লিখিত আছে (৪):—গর্ভিণী উভয় সন্ধ্যায় ভোজন করিবে না, বৃক্ষ-মূলে সর্ব্বদা বাস করিবে না বা তথায় যাইবে না। বেদবারে (বাটনার উপর) মুষলে বা উদূখলে বসিবে না, জলে অবগাহন করিবে না, শূন্য গৃহে থাকিবে না, বল্মীক-স্তূপে থাকিবে না, উদ্বিগ্ন-চিত্তা হইবে না, নখ, অঙ্গার বা ভস্ম দ্বারা ভূমিতে লিখিবে না; সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবে না, ব্যায়াম ত্যাগ করিবে; তুষ, অঙ্গার, ভস্ম, অস্থি বা কপাল-ময় প্রদেশে যাইবে না, কাহারও সহিত কলহ করিবে না, গাত্র-ভঙ্গ ত্যাগ করিবে, মুক্তকেশা থাকিবে না, কদাচ অশুচি হইবে না, কখন উত্তর বা অপর-শিরা, বস্ত্রহীনা, উদ্বিগ্না, আর্দ্র-চরণা হইয়া শয়ন করিবে না, অমঙ্গলকর কথা কহিবে না, অধিক হাস্য করিবে না, মঙ্গল-কার্য্যে রত হইয়া গুরু-শুশ্রূষা করিবে, সর্ব্বৌষধি-সম্পৃক্ত (চম্পক প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধি বলে) কবোষ্ণ জলে স্নান করিবে, রক্ষা-কার্য্যে, সুভূষা ও বাস্তু-পূজন-

(৩) ব্যবস্থিতে চ গর্ব্ভেদোডুম্বর-শলাটুসিদ্ধেন পয়সা ভোজয়েৎ। সুশ্রুত।

(৪) সন্ধ্যায়াং নৈব ভোক্তব্যং

গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি!

ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা।
নোপস্করেষু পবিশেৎ মুষলোলূখলাদিষু।
জলঞ্চ নাবগাহেত শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
বল্মীকেষু ন তিষ্ঠেত নচোদ্বিগ্নমনা ভবেৎ।
বিলখেন্ন নখৈর্ভূমিং নাঙ্গারেণ ন ভস্মনা।
ন শয়ালুঃ সদা তিষ্ঠেদ্ব্যায়ামঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
ন তুষাঙ্গার-ভস্মাস্থি-কপালেষু সমাবিশেৎ।
বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকে গাত্র-ভঙ্গঞ্চ

বর্জ্জয়েৎ।

ন মুক্তকেশা তিষ্ঠেত নাশুচিঃ স্যাৎ

কদাচন।

ন শয়ীতোত্তরশিরা ন চাপরশিরাঃ কচিৎ।
ন বস্ত্রহীনা নোদ্বিগ্না ন চার্দ্রবসনা সতী।
নামাঙ্গল্যাং বদেদ্বাচং ন চ হাস্যাধিকা

ভবেৎ।

কুর্য্যাচ্চ গুরু-শুশ্রূষাং নিত্যমঙ্গলতৎপরা।
সর্ব্বৌষধীভিঃ কোষ্ণেন বারিণা

স্নানমাচরেৎ।

কৃত-রক্ষা সুভূষা চ বাস্তু-পূজন-তৎপরা।
তিষ্ঠেৎ প্রসন্ন-বদনা ভর্ত্তুঃ প্রিয়-হিতে

রতা।

দান-শীলা তৃতীয়ায়াং পার্ব্বত্যা

নক্তমাচরেৎ।

যস্ত তস্যা ভবেৎ পুত্রঃ শতায়ুর্বৃদ্ধিসংযুতঃ।
অন্যথা গর্ভ-পতনমবাপ্নোতি ন সংশয়ঃ।
তস্মাদ্যত্নবতা কৃত্যা গর্ভেঽস্মিন্ যত্নমাচর।

মৎস্য-পুরাণ।

তৎপরা হইবে, সর্ব্বদা প্রসন্ন-বদনে স্বামীর প্রিয় ও হিত বিষয়ে রতা থাকিবে, দান-শীলা ও তৃতীয়া তিথিতে পার্ব্বত্য রাত্রি আচরণ করিবে। এইরূপ স্ত্রীলোক-মাত্রেরই আচরণ করা উচিত; বিশেষত গর্ভিণী এ সকল নিয়ম যত্নে প্রতিপালন করিবে। তাহার যে পুত্র হইবে, সে শতায়ু ও বুদ্ধি-সংযুক্ত হইবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলেই নিঃসন্দেহ গর্ভ-পতন হয়, ইত্যাদি। এই সকল নিয়মই গর্ভিণীর করণীয়। এই জন্যই আমরা পূর্ব্বে জানাইয়াছি, আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র সমস্তই স্বাস্থ্যের সহিত সংযত।

নবম বা দশম মাসে গর্ভিণী সন্তান প্রসব করে (৫); একাদশ বা দ্বাদশ মাসে প্রসব করিতেও দেখা যায়। তাহার অতিরিক্ত হইলে, পীড়া বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুশ্রুতাচার্য্য তাঁহার চিকিৎসা-স্থলে শারীর স্থানের দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন(৬) প্রসব কাল অতীত হইলে, লবণ ও স্নেহ (ঘৃত তৈল প্রভৃতি)-বর্জ্জিত যবের মণ্ড এবং কু-ধান্য-বর্গোক্ত উদ্দালক প্রভৃতি পাক করিয়া যত মাসে গর্ভ, তত দিন সেবন করাইবে। বস্তি ও উদরে শূল জন্মিলে, পুরাতনগুড়—অগ্নি-বৃদ্ধি-কর দ্রব্যের সহিত সেবন করাইবে, অথবা অরিষ্ট পান করাইবে। বায়ু জন্য উপদ্রবে গর্ভ-পথ সঙ্কুচিত হইলে, প্রসবের কাল অতীত হইয়া গর্ভ বিনষ্ট হয়, তাহাতে মৃদু স্নেহাদি ক্রিয়া দ্বারা প্রতীকার করিবে।

উৎক্রোশ পক্ষীর (৭) মাংসের কাথে

(৫) নবমে দশমে মাসি
নারী গর্ভং প্রসূয়তে।
একাদশে দ্বাদশে বা
ততোঽন্যত্র বিকারতঃ॥
ভাব-প্রকাশ।

(৬) অতীতে লবণস্নেহবর্জ্জাভির্যবাগূভি-রুদ্দালকাদীনাং পাচনীয়োপসংস্কৃতাভি-রুপক্রমেত যাবন্তো মাসা গর্ভস্য তাব-ন্ত্যহানি বস্ত্যুদর-শূলেষু পুরাণগুড়ং দীপ-নীয়-সংযুক্তং পায়য়েদরিষ্টং বা। বাতো-পদ্রব-গৃহীতত্বাৎ স্রোতসাং লীয়তে গর্ভঃ সোঽতিকালমবতিষ্ঠমানো ব্যাপদ্যতে তাং মৃদুনা স্নেহাদি-ক্রমেণোপচরেৎ।

(৭) উৎক্রোশ-রস-সংসিদ্ধামস্নেহাং যবাগূং পায়য়েৎ; মাষ-তিল-বিল্ব-শলাটু-সিদ্ধান্ বা কল্মাষান্ ভক্ষয়েন্মধু-মাধ্বীকং চানুপিবেৎ সপ্তরাত্রং। কালাতীত-স্থায়িনি গর্ভে বিশেষতঃ সধান্যমুদূখলং মুষলেনাভিহন্যাৎ; বিষমে বা যানাসনে সেবেত। বাতাভিপন্ন এব শুষ্যতি; গর্ভঃ সমাপ্তঃ কুক্ষিং ন পূরয়তি মন্দং স্পন্দতে চ, তং বৃংহণীয়ৈঃ পয়োভির্মাংস-রসৈ-শ্চোপচরেৎ। শুক্র-শোণিতং বায়ু-নাভি-প্রপন্নমবক্রান্ত-জীবমাধ্মাপয়ত্যুদরং তৎ-কদাচিদ্যদৃচ্ছয়োপশান্তং নৈগমেষাপহৃত-মিতি ভাষন্তে, তমেব কদাচিৎ পালীয়-মানং নাগোদরমিত্যাহুস্তত্রাপি লীনবৎ প্রতীকারঃ।

অত ঊর্দ্ধং মাসানুমাসিকং বক্ষ্যামঃ,—
"মধুকং শাক-বীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ।
অশ্মন্তকস্তিলাঃ কৃষ্ণাস্তাম্রবল্লী শতাবরী॥
বৃক্ষাদনী-পয়স্যা চ লতা চোৎপলসারিবা।
অনন্তা সারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ॥
বৃহত্যৌ কাশ্মরী চাপি ক্ষীরিশুঙ্গাস্ত্বচো
ঘৃতং।

সংসিদ্ধ অত্যন্ত স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত-যুক্ত যবের মণ্ড পান করাইবে। মাষকলাই-তিল ও অপক্ক বিল্বের কাথ অথবা মধু কিংবা পুঁনাসব অনুপান সহ কুলথ ভোজন করাইবে। প্রসবের কাল অতীত হইলেও, যদি প্রসব না হয়, তবে উদূখলে ধান্য রাখিয়া মুষল দ্বারা আঘাত করাইবে; কিংবা উচ্চ নীচ স্থানে যান দ্বারা গমন বা উপবেশন করাইবে। বায়ু জন্য গর্ভ শুষ্ক হইলে, গর্ভিণীর কুক্ষি-দেশ গর্ভ কর্ত্তৃক স্ফীত হয় না, মন্দ মন্দ স্পন্দন করে, তাহাতে পুষ্টিকর দুগ্ধ, মাংস-রস প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বায়ু কর্ত্তৃক শুক্র-শোণিত বিকৃত হইলে, জীব সঞ্চার না হইয়া উদর আধ্মাত হয়; তাহা কখন কখন স্বতই আরোগ্য হয়। তাহাকে নৈগমেষ কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়া বলে। কখন কখন সেই গর্ভ স্বয়ং বিলীন হয়, তাহাকে নাগোদর বলে। এরূপ অবস্থায় বৃংহণাদি ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বের কথিত লীন গর্ভের ন্যায় প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। সুশ্রুতাচার্য্য পরে মাসের সংখ্যানুসারে গর্ভস্রাব নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন:—

প্রথম মাসে গর্ভ-স্রাবের সম্ভাবনা হইলে, যষ্টি-মধু, শাক-বীজ, পয়স্যা ও দেবদারু; দ্বিতীয় মাসে অশ্মন্তক (আমল-কুচা), কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী; তৃতীয় মাসে বৃক্ষের উপরি-জাত চারা, পয়স্যা লতা, উৎপল শ্যামলতা; চতুর্থ মাসে অনন্ত-মূল, শ্যামালতা, রাস্না, পদ্মচারিণী ও যষ্টিমধু; পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারী, যাহার দুগ্ধ আছে, তাহার শুঙ্গা ত্বচ্ ও ঘৃত; ষষ্ঠ মাসে চাকুলে, বেলেড়া, শজনা, গোক্ষুরি ও গুলঞ্চ; সপ্তম মাসে পানিফল, মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টি-মধু ও চিনি দুগ্ধের সহিত এই সকল দ্রব্য যেরূপে হউক, সেবন করিবে; অষ্টম মাসে বৃহতী, বিল্ব, পটোল, ইক্ষু ও কণ্টকারি এই সকল দ্রব্যের মূলের সহিত পক্ক দুগ্ধ সেবন বিধি। নবম মাসে শুঁঠ, যষ্টি-মধু ও দেবদারু দুগ্ধে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে এবং দশম মাসে শুঁঠ ও পয়স্যা সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করা কর্ত্তব্য।

এই সকল সামান্য উপায় জানা থাকিলে গর্ভস্রাব হয় না।

এখন সংক্ষেপে সূতিকাগৃহের কথা।—আমাদের দেশে অতি কদর্য্য স্থানে সূতিকা-

পৃশ্নিপর্ণী বলাশিগ্রুশ্চ শ্বদংষ্ট্রা মধুপর্ণিকা।
শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু-মধুকং সিতা
বৎসৈতে সপ্তযোগাঃ স্যুরর্দ্ধশ্লোক-
সমাপনাঃ।

যথা সংখ্যং প্রযোক্তব্যা
গর্ভস্রাবে পয়োযুতাঃ।

কপিত্থ-বৃহতী-বিল্ব-পটোলেক্ষু-নিদিগ্ধিকা।
মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি পায়য়েদ্ভিষগষ্টমে।
নবমে মধুকানন্তা পয়স্যা সারিবাঃ পিবেৎ
ক্ষীরং শুণ্ঠী পয়স্যাভ্যাং সিদ্ধং স্যাদ্দশমে
হিতং।
সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং সুর-দারু চ।
এবমপ্যায়তে গর্ভ
স্তীব্রারুক্ চোপশাম্যতি।
সুশ্রুত।

গৃহ নির্ম্মাণ করা রীতি আছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ কর্ত্তৃক সেই উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। সুশ্রুত বলিয়াছেন (৮) "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত। বিল্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক এই চারি প্রকার কাষ্ঠে চারি জাতির যথাক্রমে সূতিকাগারে পর্য্যঙ্ক নির্ম্মাণ করিবে। সেই গৃহের ভিত্তি লেপন করা উচিত। তাহার দ্বার পূর্ব্ব কিংবা দক্ষিণ দিকে হওয়া আবশ্যক। গৃহ দীর্ঘে ৮ হাত ও প্রস্থে চারি হাত হইবে, এবং রক্ষা ও মঙ্গল-সম্পন্ন হইবে।"

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায়।

বঙ্গ-ভূমি জননী আমার।

১

ধরায় সৌন্দর্য্য-রাশি একত্র করিয়া
নিরমিলা বঙ্গ-ভূমি জগত-নির্ম্মাতা;
ভূ-স্বর্গ ভারত-ভূমি
তা'র প্রিয়তমা তুমি
বঙ্গ-মাত! ধরা-খ্যাত ঐশ্বর্য্য তোমার
প্রকৃতির রাজ্যে তুমি সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার।

২

পশ্চিম উত্তর পূর্ব্বে দুর্জ্জয় প্রাচীর,
গিরি-চয় আগে উর্দ্ধে তুলি' শত শির,
তুলিয়া অনন্ত বীচি
রত্নাকর নাচি' নাচি'
চুম্বি'ছে দক্ষিণ তট, অনল্প-রতনে
নিয়ত মনের সাধে পূজি'ছে চরণে।

৩

গঙ্গা, ব্রহ্ম-পুত্র দুই সৌভাগ্যের ধারা
আর্য্যের প্রাচীন স্মৃতি মর্ম্মে জাগাইয়া
সুমধুর কল কল
গাহিতেছে অবিরল,
কত দেশ এক নদে স্বর্গ-খ্যাতি পায়
শত নদ শত ধারে বঙ্গে বহি' যায়!

৪

বাঙ্গালার ধান্য-ধন অসীম-প্রসার,
ভারতের শস্যাগার বাঙ্গালার ভূমি;
অসংখ্য অর্ণব-তরি
শস্যে গর্ভ পূর্ণ করি'
ছুটিতেছে অবিরাম দূর দেশান্তরে
বিদেশীর ধন-তৃষা-ক্ষুধা শমিবারে।

৫

দীর্ঘ কাল পরাধীনা যদিও বাঙ্গালা,
অগ্নুত্তেজ নির্ব্বাপিত নহে তবু তা'র;
প্রগাঢ় তিমির-স্রাবে
ভারত প্লাবিত যবে,
তখনও জ্ঞান-জ্যোতি বিস্তারিয়া শিখা,
মাঝে মাঝে বাঙ্গালায় দিয়াছিল দেখা।

---

(৮) "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং শ্বেত-রক্ত-পীত-কৃষ্ণেষু ভূমি-প্রদেশেষু-বিল্ব-ন্যগ্রোধ-তিন্দুক-ভল্লাতক-নির্ম্মিতং সর্ব্বাগারং তথর-পর্য্যঙ্কমুপলিপ্ত-ভিত্তিং সু-বিভক্ত পরিচ্ছদং প্রাগ্দ্বারং দক্ষিণ-দ্বারং বাষ্টহস্তায়তঞ্চতুর্হস্ত-বিস্তৃতং রক্ষা-মঙ্গল-সম্পন্নং বিধেয়ং।"

৬

হাহাকারে পূর্ণ যবে সমস্ত ভারত,
দুঃখের ক্রন্দন বই না পশিত কাণে,
তখনও কুতূহলে
বসি' বাঙ্গালার কোলে
গাইলেন "জয়দেব" মধুর সংগীত,
শুনিয়া জগত-বাসী হইল মোহিত !

৭

অর্দ্ধেক পৃথিবী যবে যবন-কৃপাণে
নিপীড়িত, রক্ত-স্রোত বহিল ধরায়,
মৃত্যু কিম্বা জাতি-দান
এক-মাত্র পরিত্রাণ
ছিল যবে ; প্রেম-ভক্তি বিলা'য়ে প্রচুর,
বাঙ্গালা মাতা'য়ে ছিলা 'গৌরাঙ্গ ঠাকুর !'

৮

উনবিংশ শতাব্দীর যৌবনে যখন
পাশ্চাত্য-জ্ঞানের প্রভা প্রাচ্য সংক্রামিল,
যখন ভারত-দেশ
ভগ্ন চূর্ণ নাম-শেষ,
"স্বার্থশক্তি" মহামন্ত্রে ভারত শাসিত,
রাজপুত, মহারাষ্ট্র, মোগল পেষিত,

৯

তখনও বাঙ্গালায় "রাজা রামমোহন"
সানন্দে করিলা ব্রহ্ম-নাম বিঘোষণ !
একেবারে মহোল্লাসে
পৃথিবীর দেশে দেশে
উঠিল দিগন্ত ব্যাপি' প্রতিধ্বনি তা'র
ঘোষিল ধর্ম্মের জয় সমস্ত সংসার !

১০

কত ধর্ম্ম—কত মত—কত বাহাদুরি—
ফুটিছে ভাসি'ছে পুন পাইতেছে লয়,
কিন্তু সে সত্যের রেখা
একবার দিয়া দেখা
বাড়িতেছে দিন দিন ভেদিয়া পাষাণ,
বহিতেছে বেগে যথা নদী বর্দ্ধমান।

১১

কেন তবে বাঙ্গালীর এ ঘোর দুর্নাম ?
বাঙ্গালী-কলঙ্কে কেন পূর্ণ ধরা-ধাম ?
কাপুরুষ ভীরু বলি'
কেন তা'র এত গালি ?
দস্যুতা, শঠতা-আদি যা'র ব্যবসায়,
সেও বাঙ্গালীর নামে কেন লজ্জা পায় ?

১২

দূর-তর অতীতের আঁধারে যখন
ভাঙ্গে নাই মূকের গর্ব্বিত-স্বপন ;
তখন শূরত্বে মাতি'
যে জাতির অধিপতি
"নিবিড়-জলদ-নিভ গজ-সৈন্য" ল'য়ে
বর্ষিলা পাণ্ডব-রক্ত কুরু-পক্ষ হ'য়ে ;

১৩

সে জাতির বংশ যদি ভীরু নীচাশয়,
জগতে সাহসী তবে কাহারে বলিব ?
অথবা অর্ণব-তরি,
"সিংহল-বিজয়" করি'
সমুদ্রে সগর্ব্বে যেই প্রোথিল কেতন,
এই অপবাদ তা'র অদৃষ্ট-লিখন !

১৪

সুবর্ণ-কিরণ-জাতি শশাঙ্ক কোথায়,
যা'র ভয়ে বিকম্পিত বৌদ্ধ-রাজ-গণ ?
উপাড়ি' বৌদ্ধের মূর্ত্তি,
বিলোপিতে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি,

অলঙ্ঘ্য আদেশ যাঁ'র হইল ঘোষিত,
ভীরু অপবাদ তাঁ'র অতি অনুচিত!

১৫

সপ্ত দশ অশ্বারোহী করি' দরশন
করিলেন বঙ্গ-পতি ভয়ে পলায়ন!
এ বিষম গাঁজাখোরি
কেমনে বিশ্বাস করি?
না ছিল সৈনিক যদি, ছিল না কি তাঁ'র
দ্বার-রক্ষী, তনু-রক্ষী, ভৃত্য-বর্গ আর?

১৬

আছে কোন অভিসন্ধি অতি গূঢ়-তর
ছদ্ম-বেশে লুকাইয়া ইহার ভিতর,
যুগ-যুগান্তর যাবে,
কত ইন্দ্র-পাত হ'বে,
হ'বে বঙ্গ-ভাগ্য-চক্রে শত আবর্ত্তন,
ঘুচিবে না তবু এই ছদ্ম-আবরণ!

১৭

বাঙ্গালী সাহসী কি না, নিদর্শন তা'র
শোণিত-অক্ষরে লিখা ব্রহ্মপুত্র-তীরে,
জয়-মদ-দুর্নিবার
বঙ্গ-জেতা বক্তিয়ার্
যা'র জলে জয়-আশা করি' বিসর্জ্জন,
পলাইল দ্রুত-পদে লইয়া জীবন।

১৮

ত্রিপুরা-পতির সঙ্গে আর এক বার
বাজি' ছিল যবনের মহা সঙ্ঘর্ষণ;
অভ্র-বর্ম্ম-গিরি-গায়
অগণ্য-তরঙ্গ-চয়
বাজে যথা বেগ-ভরে, তেমনি বাজিয়া
ফিরিল যবন-বীর্য্য বিফল হইয়া।

১৯

বিক্রান্ত যশোর-পতি "প্রতাপ-আদিত্য"
গৌরবে উজ্জ্বল যাঁ'র বঙ্গ-ইতিহাস;
বঙ্গে অনিদিত কা'র
অতুল বীরত্ব তাঁ'র?
তবু যে বাঙ্গালী ভীরু কোন্ শাস্ত্র-মতে
কত ক'রে চাহিলাম পারিনি বুঝিতে!

২০

বাঙ্গালীর শেষ-বীর্য্য স্বাধীন শোণিত,
শ্রীহট্টে সরমা-তটে হইল পতিত;
সেনাপতি "রাধানাথ"
করিয়া অরাতি-পাত
অগণ্য-যবন সৈন্য-বেগ নিবারিল,
যবন-বিজয়-লক্ষ্মী টলিতে লাগিল;

২১

অবশেষে অবিশ্বাস-নিহত-জীবন
প্রভুর রক্তাক্ত শির শূলাগ্রে নিরখি'—
"নিহত প্রভু আমার!
কা'র তরে যুদ্ধ আর?
যথা কৃষ্ণ তথা রাধা" বলিয়া অমনি
বক্ষে নিমজ্জিয়া অসি পড়িল ধরণী!

২২

সেই শেষ-বীর-রক্ত রাধানাথ-সনে
সরমার স্বচ্ছ জলে পড়িল চলিয়া,
সেই শেষ স্বাধীনতা
হারাইল বঙ্গ-মাতা,
বাঙ্গালীর কণ্ঠ হ'তে স্বাধীন চীৎকার
কাঁপাইল শত্রু-দল সেই শেষ বার!

২৩

স্বাধীনতা-লোপ-সনে নিস্তব্ধ ক্রন্দন
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে করিল প্রবেশ;

সুদীর্ঘ ক্রন্দন পরে
তীব্র জ্বালা ভুলিবারে
বিলাসে বাঙ্গালী-চিত্ত হইল মগন,
অদৃষ্টের "ভীরু" নাম কে করে খণ্ডন ?

২৪

কিন্তু ইতিহাসে ইহা নহে ত নূতন,
গ্রীক্-জাতি এ সত্যের জীবন্ত প্রমাণ ;
য' দিন স্বাধীন ছিল,
গুণে বিশ্ব বিমো'হিল,
বীর্য্য-বলে উড়াইল বিজয়-নিশান !
আজি সেই তুরকীর ভয়ে ম্রিয়মাণ !

২৫

বীর-প্রসূ ইটালীর দুর্দ্দশা ভাবিলে,
হৃদয়ে বিষাদ-স্রোত কা'র না উথলে ?
যেই জাতি দর্প-বলে
কাঁপাইয়া ধরা-তলে,
অর্দ্ধেক-ধরণী-খণ্ড করে'ছিল গ্রাস,
সে জাতিও হ'য়েছিল বিলাসের দাস।

২৬

কিন্তু, হায় ! ঘুচিয়াছে তা'দের দুর্নাম,
স্বাধীন কিরীট পুন ধরিয়াছে মাথে ;
আমাদের স্বাধীনতা
চির-তরে অস্তমিতা !
উদ্দীপনা-সুরা-পানে মাতিয়া বাঙ্গালী,
ফেলিবে না ভীরুত্বের কলঙ্ক প্রক্ষালি' !

২৭

অথবা ভাবীর দ্বার করি' উন্মোচন
কে দেখিবে কত রত্ন গর্ভে আছে তা'র ?
কে বলিবে চির-দিন
বাঙ্গালী গৌরব-হীন
রহিবে ধরণী-ধামে ?—ভেদিয়া আঁধার
বাঙ্গালীর সুখ-সূর্য্য উদিবে না আর ?

২৮

বিলাসী ইটালী যদি ঘোরনিদ্রা ছাড়ি'
ম্যাটসিনির বজ্র-নাদে জাগিয়া উঠিল ;
বিলাসী বাঙ্গালী তবে
কেন চির-নিদ্র রবে ?
ছয় কোটি শুনে যদি "ভারত-সংগীত" ;
কেন না বাঙ্গালী-বীর্য্য হ'বে প্রজ্বলিত ?

২৯

বঙ্গবাসী ! হইও না আতঙ্কে নিরাশ,
ভাবিও না বঙ্গ-পুন আর্য্য-কুলাঙ্গার,
জাতি-অনুরাগ ছাড়ি'
আত্মাদর পরিহরি,
শুনিও না ক্ষুদ্র চেতা 'মেকলের' গালি,
অসার প্রলাপে তা'র—যাইও না ভুলি'

৩০

এক দিন, দুই দিন, দশ দিন নয়,—
আজন্ম-সাধন কর ব্রত আপনার,
শুভ দিন বাঙ্গালার
বহু দূরে নহে আর
ছাড়িও না এ সুযোগ আমোদে মাতিয়া,
রহিও না নিরাশার কূ-নাগ্রে ডুবিয়া।

৩১

গভীর-ধরণী-গর্ভ এক দিনে ছাড়ি'—
উঠেনি হিমাদ্রি-শৃঙ্গ গগন ভেদিয়া,
দিনেকের তপোবলে
পাপ-পূর্ণ মহী-তলে
আসে নাই ভাগীরথী পবিত্র-সলিলা,
এক দিনে ভাসে নাই সেতু-বন্ধে শিলা।

৩২

অমৃত লভিতে যদি নিতান্ত বাসনা,
মিল তবে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর
বাসুকী করিয়া দড়ি
সুমেরু পর্ব্বত বেড়ি'
কিছু কাল দুর্ব্বলতা হ'য়ে বিস্মরণ,
সমবেত-বলে কর সমুদ্র-মন্থন।

৩৩

বঙ্গ-মাতঃ! কেন তব বিষণ্ণ বদন,
কেন মা নয়নে সদা বহে অশ্রু-ধারা?
ছয় কোটী পুত্র যা'র,
কিসের অভাব তা'র?
মা বলিয়া ছয় কোটী সম্ভাষে যখন,
সানন্দে হৃদয় কি মা! নাচে না তখন?

৩৪

দিয়াছে অনেক গালি নিন্দুক পামর
তাই কি বিষাদে ম্লান বদনের ভাতি?
আর কিছু দিন পরে
সে দুর্নাম যা'বে দূরে,
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য সকলে জানিবে,
হস্ত-আবরণে সূর্য্য ঢাকা পড়ে কবে?

৩৫

যখন যে দেশে যা'ব, সকলের কাছে
বলিব গৌরব করি'—"বাঙ্গালী আমরা"
হিন্দু-ধর্ম্ম-অনুসারে,
মৈলে যদি জন্মি ফিরে,
জন্মি যেন বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ঘরে,
বাঙ্গালীর স্নেহ-প্রেম ভুঞ্জিবার তরে।

৩৬

যদিও আঁধারে ঢাকা বঙ্গের বদন,
যদিও চরণ বদ্ধ কঠিন নিগড়ে,
সমাজের অত্যাচারে
যদিও পেষি'ছে তা'রে,
যদিও জ'ড়েছে তা'রে শত কুসংস্কার
তবু সে ত বঙ্গ-ভূমি——জননী আমার

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"Pity me not, but lend thy serious hearing
To what I shall unfold"—Hamlet.

গিরিবালার সুখ কোথায়? সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য, দেবেন্দ্রের অমরাবতী ও ধনাধিপের কোষশোভন মহার্হ রত্নাদি উৎসর্গীকৃত করিলেও, কি তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদিত হয়? না, গিরিবালার সুখ একটীমাত্র সামগ্রীতে নিহিত। কিন্তু সে সামগ্রী দুর্লভ—দুষ্প্রাপ্য। তাহা স্বর্গীয় হইলেও, পৃথিবীতে অবস্থিত;—নিরাকার হইলেও, আপন রূপ-মাধুর্য্যে মানব-হৃদয়কে মোহিত ও উন্মত্ত করে। তবে গিরিবালার সে সুখের সামগ্রী কোথায়? পাঠক! বুঝিয়াছেন—তাহা সতীশের হৃদয়ে।

যে জন্য গিরিবালা আপনাকে চির-জীবনের জন্য অভাগিনী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে সতীশ

জানিতেন না ; এই জন্যই তিনি গিরি-বালার দুঃখ-কর্ষিত বিষণ্ণ-ভাব দেখিতে পারিতেন না পরে সে দিবস রমেশের পরুষ বচন শ্রবণ করিয়া তাহা বিলক্ষণ বিদিত হইয়াছেন। কিন্তু এতদ্ভিন্ন গিরি-বালার মনোবেদনার আর একটী বিষময় কারণ—তিনি সতীশের হৃদয় কিছুই অবগত ছিলেন না। রমেশের নিধন-বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইলেও, তিনি ঐ কারণটীকে তাঁহার সুখ-পথ-রোধকারী দুর্দ্ধর্ষ বৈরি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, তিনি সতীশের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারেন নাই ; সুতরাং সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার মনের ভ্রম-মাত্র। সদসদ্বিবেকবিহীনা সরলা বালিকা কি প্রকারে এক গুপ্ত-মন্ত্র বীর-পুরুষের হৃদয় অবগত হইবেন ? কূল-পরিপ্লাবনী কল্লোলিনীর ন্যায় তাঁহার প্রণয়-স্রুতি অন্তর্বিকারী নদের গূঢ় সম্মিলন অনুভব করিতে পারেন নাই। গিরিবালা প্রণয়ে উন্মাদিনী হইয়াছে—সতীশ তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন। গিরি-বালা সতীশের মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অহর্নিশ তাঁহাকে নয়ন-সমক্ষে দেখিবার জন্য উদ্বিগ্না,—সতীশ তাঁহাকে অপ্রকাশে হৃদয়-নিহিত করিয়া অন্তরে অন্তরে তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াই পরিতৃপ্ত।

যে দিন রজনী-যোগে সতীশ সমরের অনুসন্ধানে যাইতে যাইতে দুষ্ট রমেশের দুরভিসন্ধি-জালে জড়িত হইয়া, গিরি-গুহা মধ্যে রুদ্ধ হইলেন, তিনি আপন মুক্তির জন্য উপায় অনুসন্ধান করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশাস হইয়া অতি ক্লেশে সে নিশা-ভাগ তথায় অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়া বিশ্রামার্থ শুভ্র-শিলাসনোপরি শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল পরে সর্ব্বদুঃখাপহারিণী বিরাম-দায়িনী নিদ্রার শুশ্রূষায় বীতক্লম হইয়া সুপ্তাবেশে একটী মোহন স্বপ্ন সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার বোধ হইল—যেন তিনি গিরিবালার সহিত পশ্চিমাচলের এক অত্যুচ্চ-শিখর-দেশে পাদচারণ করিতেছেন এবং অনন্ত-নীলাম্বুময় উত্তাল-বীচি-সঙ্কুল আরব-সাগরের বক্ষঃ-বিহারী বৃহদ্বৃহৎ অর্ণব-পোত সকল সন্দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সৌম্যদর্শনাধার শ্বেতশ্মশ্রুল এক পুরুষ বর বারি-নিধির গাঢ় উর্ম্মি-মালা ভেদ করিয়া উদ্গত হইলেন এবং তাঁহার মুখ-মণ্ডল স্থির-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ব্যোমপথে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পুরুষোত্তম সতীশের নিকটবর্ত্তী হইয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন "বৎস সতীশ ! আর তোমায় অধিক দিন বিষণ্ণ-বিষে জর্জ্জরিত হইতে হইবে না। অতি ত্বরায় তোমার চির-নিরুদ্দেশ জনক-জননীর সাক্ষাৎ পাইবে।" সতীশ আনন্দ-নীরে আপ্লুত হইয়া গদ্গদ-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাভাগ ! আপনি

কে? যখন করুণাপূর্ণ-হৃদয়ে এ হতভাগ্যকে শ্রীচরণ দর্শন দিলেন, তখন আপনার যথার্থ পরিচয় অবগত করাইয়া তাহার জন্ম সফল করুন।" তাঁহার এই বাক্য শেষ না হইতে হইতেই,সেই পুরুষবর অকস্মাৎ বেগে অন্তর্হিত হইলেন। "আমিই তোমার সেই নিরুদ্দেশ জনক! তোমার নৃশংসাত্মা পিতৃব্যের শোণিতপিপাসু খড়্গের ভয়ে ছদ্মাকারে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি।" সতীশ শুনিতে পাইলেন এবং সাশ্চর্য্যে দেখিলেন, সেই অতুল-মূর্ত্তি পুনর্ব্বার সেই সমুদ্র-নীরে নিমগ্ন হইতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট যাইবার জন্য লম্ফ দিয়া যেমন জল মধ্যে পতিত হইবেন, অমনি যেন সমর আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন। "কুমার! উঠ উঠ!" নিদ্রাবেশে পতন-বশত তিনি চমকিত হইয়া গতনিদ্র হইলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন, সমর তাঁহার হস্তধারণ করিয়া "কুমার! উঠ উঠ!" সেই কথাই বলিতেছেন। সতীশ নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলেন,এবং কহিলেন "সমর! এ কি! তুমি এখানে কি প্রকারে আসিলে?"

"সে কথা পরে বলিব" সমর সহাস্যে উত্তর করিলেন এবং সতীশের বাম-পার্শ্বে শুভ্র-শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "কুমার! তুমি কি প্রকারে এই বিজন-পর্ব্বত-গুহায় নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছিলে?"সতীশ সমরের এ বাক্যের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া, তাঁহার হস্তধারণ করিয়া আর্ত্ত-স্বরে কহিলেন "সমর! আমি পিতৃদেবের নিকট গমন করিতেছিলাম, তুমি কেন আমাকে জাগরিত করিলে?"

"সে কি! তুমি কি নিদ্রাবেশে কোন প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছিলে?"

তখন সতীশ তাঁহার স্বপ্ন দর্শনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিয়া সমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সমর! ভ্রাতঃ এ স্বপ্ন কি যথার্থ স্বপ্নে পরিণত হইবে? ইহ-জন্মে কি আর পিতৃদেবের চরণ-কমল দর্শন-লাভ করিব না?"

"ভ্রাতঃ! ক্ষান্ত হও। স্বপ্ন নিষ্ফল হইলেও, অদ্য ইহা তোমার পক্ষে ফলপ্রদ হইবে। দিবস-ত্রয়ান্তে ইহা কল্পপাদপের ন্যায় তোমার চির-বাঞ্ছিত সুফল প্রসব করিবে।"

"সমর! আমি স্বপ্ন-কথিত বাক্যের কিছুই মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। 'অতি ত্বরায় তোমার চির-নিরুদ্দেশ জনক-জননীর সাক্ষাৎ পাইবে।' ভ্রাতঃ! আমার জননী পুনর্ব্বার কি প্রকারে জীবিত হইলেন? আমিও তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তৎ-সমীপে উপস্থিত ছিলাম, তবে এ বাক্যের অর্থ কি?" সতীশ প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষায় সমরের মুখের দিকে সোদ্বেগে চাহিয়া রহিলেন।

সমর। "কুমার! উদ্বিগ্ন হইও না। যাহা বলি, অবহিত-চিত্তে শুনিতে থাক।

যাঁহাকে তোমার এক-মাত্র জননী বলিয়া জ্ঞান ছিল, শাস্ত্রানুসারে তিনি তাহাই বাচ্য হইতে পারেন; কিন্তু তিনি তোমার যথার্থ প্রসূতি নহেন। তোমার রাক্ষস পিতৃব্যের অনুমত্যানুসারে পিশাচী ধাত্রী তোমার জন্ম রাত্রেই তোমার মদ-বিহ্বলা জননীর নিকট হইতে—নৃশংস-স্বার্থ-সাধনের জন্য উৎকট মাদক দ্রব্য পান করাইয়া অজ্ঞানাবস্থায় রাখিয়াছিল—তোমাকে হরণ করিয়া নদী-জলে নিক্ষেপ করে। ভাগ্য-ক্রমে তোমার পিতা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তোমাকে সেই আসন্ন-মৃত্যু-গ্রাস হইতে উদ্ধার করেন এবং দয়াশীলা পালিকার নিকটে আসিয়া তোমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। ভ্রাতঃ! তোমার ধর্ম্ম-পরায়ণ পিতা-মাতার আনন্দ-বর্দ্ধন এবং তোমার নর-পিশাচ পিতৃব্যের দুরভিসন্ধি-জাল ছিন্ন করিবার জন্যই জগদীশ্বর তোমাকে এক-হর জননীর নিকট হইতে অন্তরিত করিয়া অপর এক জনের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। উঃ! নরাধমের আততায়িতা স্মরণ হইলে হৃৎ-কম্প উপস্থিত হয়; প্রতিহিংসা আপন হইতেই রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসি-হস্তে সেই রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হয়।" সমর সতীশের আরক্ত ও বিঘূর্ণিত চক্ষুর্দ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "কিন্তু স্থির হও—ধৈর্য্যাবলম্বন কর! তোমার জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে, পিশাচ 'বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শনচ্ছলে তোমার অগ্রজকে—"

সতীশ। "অগ্রজ!—আমার?—জগৎপতে!"

সমর। "হাঁ! তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইয়া সুকুমার অবস্থাতেই কতিপয় দস্যু-হস্তে সমর্পণ করিয়া আইসে এবং নগরে আসিয়া ঘোষণা করে যে, পার্ব্বতীয় অসভ্য মনুষ্যগণ তাঁহাদিগকে পথি-মধ্যে আক্রমণ করিয়া জ্যেষ্ঠ-কুমারকে বলপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছে। তোমার পিতা অকপট-হৃদয়ে তখন তাহাতেই বিশ্বাস করিলেন; বুঝিলেন না যে, তাঁহার সেই নরাধম দুষ্টভ্রাতা নর-মাংসাশী রাক্ষসদিগেরও ঘৃণার্হ মার্গে পদ-ক্ষেপ করিয়া অভিন্ন-শোণিত স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে জীবন্তই গ্রাস করিয়াছে।"

সতীশ উদ্ধত-কেশর বাণবিদ্ধ কেশরীর ন্যায় চকিত হইয়া নিষ্কোশ অসি হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন—"রে নর-রাক্ষস কুক্কুরাধম! ঘোর নারকী! আজ সমস্ত জগৎ একত্রিত হইলেও, এই তরবারের করাল গ্রাস হইতে তোকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। সে কে? সমর! শীঘ্র বল—শীঘ্র বল। বসুন্ধরা কি এরূপ পাপ-পিশাচকে বক্ষে স্থান দিয়াছেন?"

সমর। "সে কথা পরে বলিব। এখন নিরস্ত হও। সময় উপস্থিত হইলে, শূন্যের সামান্য পতঙ্গও সেই নর-শার্দ্দূলের মৃত্যু সাধন করিবে; কিন্তু এক্ষণে তাহার সহায়-বল বিলক্ষণ।

সতীশ মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় শূন্য-মনে পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হইলেন। "সমর! তাঁহার পর কি হইল? পিতা কি আমার অগ্রজকে পুনঃ-প্রাপ্ত হইলেন?"

সমর। না। পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন না; কিন্তু চর-মুখে তাঁহার যথার্থ সংবাদ অবগত হইয়া গর্ভাশ্মিক অচলের ন্যায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাহার দুই বৎসর পরেই তুমি সূর্য্য-করতলে নিক্ষিপ্ত হও। ভ্রাতঃ! তদানুষঙ্গিক কঠোর ঘটনা-বৃত্তান্ত তোমার স্মৃতি-পটে উজ্জ্বল-বর্ণে অঙ্কিত আছে; এক্ষণে রজনী প্রভাত-প্রায়। ঐ শুন, পিক-কুল কলতূর্য্য-নিস্বনে দিননাথের আগ্রতি-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। চল, এই বেলা আমরা এখান হইতে বহির্গত হইয়া বাস-স্থানাভিমুখে যাত্রা করি। নতুবা সূর্য্যোদয় হইলে, আমাদের বিপৎ-পাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।"

এই সময়ে সমরের ইঙ্গিতানুসারে উপর হইতে রজ্জু-সংলগ্ন দুই খানি কাষ্ঠ-ফলক নিক্ষিপ্ত হইল। "কুমার এই দেখ, এই যান অবলম্বনেই আমি ঐ গহ্বর-মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছি।" সমর দোদুল্যমান কাষ্ঠ-ফলক দৃঢ় ধারণ করিয়া সহাস্যে উত্তর করিলেন, "এবং ইহাদের সাহায্যে আমরা এই দুর্নির্গম গিরি-গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব। ভ্রাতঃ! তুমি ঐ খানিতে আরোহণ কর, আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" সতীশ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন; "সমর! তোমার ন্যায় এরূপ অকৃত্রিম স্নেহ, অগ্রজও কনিষ্ঠের প্রতি প্রকাশ করে না। দুরভিসন্ধি রমেশের দুষ্ট-মন্ত্রণা-জালে জড়িত হইয়া এই বিজন গিরি-গহ্বরেই আমার জীবিতাবশেষকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। ভ্রাতঃ! যদ্যপি আমার অগ্রজ জীবিত থাকেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার অস্তিত্ব তোমাতেই যেন অর্পিত হয়।" তৎপরে উভয়েই দোদুল্যমান কাষ্ঠ-যান-দ্বয়ে আরূঢ় হইলেন। তৎক্ষণাৎ যান-দ্বয় উপরি-ভাগে উত্তোলিত হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"——I have supp'd full with horrors;
Direness, familiar to my slaught'rous thought,
Cannot once start me."—MACBETH.

একি ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড! ক্ষুধা-হীন সর্ব্বভুক্ কি আজ স্বীয় ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে? না—ভগবান্ সহস্রাংশু-মালী জগতের সন্তানগণের পাপাধিক্য-দর্শনে তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে এই ঘোর-নিশাযোগে অগ্নিময়ী দূতী-সকলকে প্রেরণ করিয়াছেন? আরক্তিম প্রচণ্ড শিখা সকল প্রজ্বলিত করকা ও ধূমপুঞ্জ উদগার করিতে করিতে ভীম-নাদে গগনমার্গে উত্থিত হইতেছে। মধ্যোক্ত হর্ম্ম্য-বিচ্যুত ইষ্টক সকল প্রলয় পবন-বেগে বহমান হইয়া সহস্র উল্কাপিণ্ডের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। বিহঙ্গম-গণ অকস্মাৎ

এই রুদ্র-মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া আকুল হৃদয়ে হাহাকার-রবে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় পলায়ন করিবে? এ জগতে আর তাহাদের আশ্রয়-স্থান কোথায় আছে? ঐ দেখ, সকলে জাল-ধৃত মীন-কুলের ন্যায় এক দিকেই আকৃষ্ট হইল। ঐ সর্ব্বনাশ! সকলেই জড়পিণ্ডের ন্যায় সর্ব্ব-সংহারক বিভাবসুর গ্রাস-মধ্যে পতিত হইল! উঃ! কি ভীষণ সংহার-মূর্ত্তি! সকলই হতজীবন হইল! কেহই নিষ্কৃতি পাইল না! কি রোষে জগদীশ্বর এই বিজন-কাননস্থ অট্টালিকাকে অগ্নিসাৎ করিলেন! ক্রমশ রুদ্রতেজা বহ্নি সহস্র অগ্নিময় হস্ত প্রসারণ করিয়া অট্টালিকার চতুঃ-পার্শ্ব আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ পুরী কি মানব-শূন্য? না, ঐ যে কি মর্ম্মভেদী আর্ত্ত-নাদ শ্রুত হইল! ঐ দেখ, কতিপয় সশস্ত্র পুরুষ হতাশ হৃদয়ে চতুর্দ্দিকে মোক্ষণা-ন্বেষণ করিতেছে। বন্ধুর প্রতি মমতা নাই;—আত্ম-শরীরে আস্থা নাই। সম্মুখে প্রিয়তম বন্ধু কম্পিত কলেবরে সজল নয়নে প্রদীপ্ত শিখাকে আলি-ঙ্গন করিতেছে, প্রাচীর-চ্যুত রক্তোত্তপ্ত ইষ্টকে আত্ম-শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই; আত্মজীবন-রক্ষায় একান্ত ব্যগ্র; আকুলান্তঃকরণে বহি-র্দ্বারাভিমুখে আসিল, ক্ষিপ্র-হস্তে অর্গল মুক্ত করিল। কি সর্ব্বনাশ! দ্বার খুলিল না! দ্বার বহির্ভাগ হইতে রুদ্ধ! সকলের প্রাণ উড়িল। বাটীর অভ্যন্তরে আসিল, সোপান মঞ্চে আরোহণ করিয়া ছাদে যাইতে চেষ্টা করিল। লম্বমান সশস্ত্র কোষ প্রতিপদে প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ করিতে লাগিল; ঐ দেখ দুই জন হতভাগ্য পদ-স্খলিত হইয়া কঠিন অঙ্গন-ভূমে পতিত হইল। ঐ গেল! সর্ব্বনাশ হইল! কৃষ্ণবর্ম্মার ভীম-প্রহারে অট্টালিকার দক্ষিণাংশ গম্ভীর গর্জ্জনে ভূপতিত হইয়া দুর্ভাগ্য সকলকে সজীবনে প্রোথিত করিল! শাণিত তরবার! কাপুরুষ ভয়োদ্দীপক! তুমি কেবল ভ্রূকুটি করিয়া ভীরু লোকের শিরশ্ছেদ করিতে পার, কিন্তু এই বার তোমার অসীম বিক্রম কোথায় রহিল?

বাটীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ একটী প্রকোষ্ঠে এক বৃদ্ধ এত ক্ষণ নিদ্রা যাইতেছিল। এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর শব্দে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; জাগরিত হইবা-মাত্র দেখিল, গৃহের বাতায়ন সকল চট্ চট্ শব্দে জ্বলিতেছে, অমনি লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইল এবং দ্বারোন্মোচন করিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গৃহ হইতে এক পদও বহির্গমন করিতে পারিল না, রাশি রাশি ইষ্টক-সমূহে দ্বার-পথ রুদ্ধ হইয়াছে; স্তম্ভিত ভাবে ভয়-বিহ্বল নয়নে কক্ষার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিল। উদ্দেশে ঈপ্সিত বিষয় সমূহও প্রিয়-সুহৃদের নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিল। এই সময়ে

বহ্নিসখা প্রিয় সহচরের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিকট হাস্যে নৃত্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধ আরও হতাশ হইয়া পড়িল কিন্তু মুক্তি অন্বেষণে বিরত হইল না। ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ দ্রুত-পাদক্ষেপে গৃহাভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সে দিকে যায়, সেই দিক হইতেই হুতাশনের প্রচণ্ড উত্তাপ তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে হঠাৎ বহির্দ্দেশ হইতে যেন অস্ফুট মানব-রব শ্রুত হইল; অমনি দহ্যমান বাতায়ন পার্শ্বে গমন করিয়া স্থিরোন্নত কর্ণে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল "প্রাণে হতাশ—না—যা—ছি" এই অস্পষ্ট আশ্বাস বাক্য অতি কষ্টে শ্রুত হইল। অমনি তৎক্ষণাৎ একটী বাতায়ন ভগ্ন হইয়া গভীর শব্দে কক্ষামধ্যে পতিত হইল, তৎসঙ্গে এক জন সশস্ত্র বীর-বর লম্ফ দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং চকিতে, মুমূর্ষু বৃদ্ধকে স্কন্ধে করিয়া সবলে তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই দহ্যমান অট্টালিকার চতুঃপার্শ্ব অনতিঘন কাননা-বলিতে পরিপূরিত। অধিকাংশ পাদপ-সকল কক্ষয়ের উষ্ণ-নিশ্বাসে দগ্ধ হইয়া দিগম্বর দৈত্যকুলের ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছে। বীরপুরুষ এই কাননের অনতিদূরস্থ এক পুষ্করিণীর প্রশস্ত সোপানাঙ্কনে তাঁহাকে শায়িত করিয়া তাহার বিশীর্ণ-মুখমণ্ডলে অজস্র জলসেক করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বৃদ্ধের মূর্চ্ছা অপনোদিত হইলে সে অতি কষ্টে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতরস্বরে কহিল "আপনি কে? আপনি কে? আপনি দেব না মানব?

"মহাশয়! আমার এমন কি দিব্য গুণ আছে যে, আমি দেবত্বের অধিকারী হইতে পারি? আত্মত্যাগ ও পরহিতৈষিতা মানব-মাত্রেরই অঙ্গভূষণ। কিন্তু এ হতভাগ্য ত সে স্বাভাবিক মানবীয় গুণদ্বয়েরও অধিকারী হইতে পারিল না। কেন না এক্ষণে আপনি যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, তাহাতে আমার মনুষ্যত্বের কিছুই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। যদ্যপি আত্মজীবন উৎসর্গেও আপনাকে হুতাশনের গ্রাস হইতে অক্ষত-শরীরে মুক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমি আপনাকে ক্ষণ কালের জন্য মানব বলিয়া সম্বোধন করিয়া সুখী হইতাম; কিন্তু তাহাও নয়, এ দুর্ভাগ্য অসভ্য ভিলদিগের অপেক্ষাও নৃশংস।" বীর-বর এক খানি প্রশস্ত পদ্ম-পত্র বৃদ্ধের বহ্নিতাপ-দগ্ধ অঙ্গে ঘন ঘন ব্যজন করিতে লাগিলেন।

"না, বৎস! ও রূপ আত্মদ্রোহিতা নিতান্ত দূষণীয়। যথার্থ ক্ষত্রিয়-বীরের রীতি-অনুসারে তুমি আত্ম-জীবনে তুচ্ছ হইতে পার—সত্য, কিন্তু আমার জীবন যদ্যপি এরূপ বিপন্ন না হইত, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতাম, এক্ষণে ইহাতে আমার দুঃখের কারণ কিছুই নাই—আমি যথোচিত সুখী। জননী বসুন্ধরার পবিত্র বক্ষকে পাপশূন্যে বিদ্ধ করিয়া

ক্ষত বিক্ষত করিয়াছি কি সেই ঘোর পাপাচরণ জন্য আজ আমার এই প্রায়শ্চিত্ত হইল। আমি এক্ষণে পাপ-জীবন হইতে মুক্ত হইব,—বসুন্ধরা সুখী হইবেন, এই আমার আনন্দ। কিন্তু এরূপ অবস্থায় হুতাশনের গ্রাস হইতে মুক্ত না হইলে, আমার এ বিমল আনন্দের অধিক ব্যাঘাত ঘটিত। জগৎ দারুণ ক্লেশ-ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও, তাহার কিছুই উপকার হইত না।"

"মহাশয়! আপনার বাক্য-শ্রবণে বোধ হইতেছে যে, এ সমুদায় আপনার পূর্ব্ব-কৃত কোন এক পাপানুষ্ঠানের অনুতাপ।"

"কোন এক?—না বৎস! আকাশের নক্ষত্র-রাজি মরু-ভূমির বালুকা-সমূহ,—অনন্ত সাগরের উর্ম্মি-মালা গণনা দ্বারা সংখ্যা করা যাইতে পারে, তথাপি এ নারকী-কৃত অগণ্য-পাপ-নিচয়ের সংখ্যা নাই।— ওঃ! সেই সমস্ত দুষ্কৃতির কি ইহাতেই প্রায়শ্চিত্ত হইল? না না। তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত অনন্ত-কাল-ব্যাপী—তাহা অননুভবনীয়—চিন্তায় ধারণা করা যায় না—ভাবিলে হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। বোধ হয়, বিধাতা এ নরাধমের জন্য চির-বহ্নি-জ্বালা-ময় অনন্ত ভীষণ নরক সৃজন করিয়াছেন। নতুবা তাহার যাত্রা-কালে তদস্বরূপ যন্ত্রণাময় দ্বারে প্রবেশ করিতে হইবে কেন? কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নহি। পরকালের ভাবী যন্ত্রণা হইতে আমি আর কোন ক্রমে ভীত নহি। স্মৃতি— উঃ! পাপময়ী স্মৃতি বিষ-ছুরিকা দ্বারা আমার হৃদয়কে বারংবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছে। উঃ! সে দারুণ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। স্মৃতি! পিশাচি! দূর হও!—দূর হও! আর নয়—আর নয়!—আর যন্ত্রণা দিস্ না! ঐ তোর রক্ত-পিপাসু ছুরী আমার হৃদয়-শোণিত পান করিবার জন্য ভ্রূকুটী করিয়া আসিতেছে!—ঐ—ঐ—নিবৃত্ত হও!—নিবৃত্ত হও!" বৃদ্ধ উন্মত্তের ন্যায় সলম্ফে সোপান হইতে উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু দৌর্ব্বল্য-বশত অর্দ্ধোত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার তদুপরি পতিত হইল। বীর-বর হস্ত-দ্বয় পাতিয়া তাহাকে ধারণ করিলেন এবং নিজ অঙ্কে তাহার মস্তক স্থাপন করিয়া ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন—"ওকি! আপনি উন্মত্ত হইলেন না কি? এরূপ অবস্থায় আপনার শান্ত থাকা কর্ত্তব্য; নতুবা যন্ত্রণা-বৃদ্ধির অধিক সম্ভাবনা। স্থির হউন কি এরূপ স্নিগ্ধ-ব্যজনেও কি আপনার শরীর-জ্বালা শীতল হইতেছে না?"

"বৎস! বাহ্য যন্ত্রণা যেন শীতল হইল, কিন্তু দারুণ অন্তর্বেদনা? এ দুর্দ্দম হৃদয়-হুতাশন কে শান্ত করিবে? শরীরে ত এই সমস্ত ক্ষত দেখিতেছ, কিন্তু হৃদয় যদ্যপি প্রকাশ্যে দেখাইবার হইত—দেখাইতাম যে, তাহা বিষম ক্ষত প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ পৃথিবীতে আর আমার কিছুই সান্ত্বনার বস্তু নাই, এক-মাত্র যাহা আছে, তাহা তোমারই ইচ্ছাধীন। তুমি

তাহা সম্পন্ন করিতে সত্য করিলে,' আমার এ দুঃসহ হৃদয়-যাতনার কথঞ্চিৎ শমতা হয়।"

যুবক স্বীয় তরবার কোষোম্মুক্ত করিয়া কহিলেন—"যে প্রিয়তম বস্তু ক্ষত্রিয়ের এক-মাত্র অবলম্বন, আমি সেই তরবার হস্তে সত্য করিতেছি যে, আপনার মনস্তুষ্টি সম্পন্ন করিবই করিব।—এক্ষণে আপনার অভীষ্ট প্রকাশ করুন।"

বৃদ্ধ যুবকের মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া সস্নেহ-বচনে কহিলেন, বৎস! তোমার এরূপ মহত্বে যে কি পর্য্যন্ত প্রীত হইলাম,তাহা বাক্যাতীত। আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্ব-কার্য্যে বিজয়-লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়-গৌরব বৰ্দ্ধন করিবে।" এবং তৎপরেই কতিপয় বর্ণাঙ্কিত একটী হীরকাঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিতে করিতে কহিলেন"আহা! এরূপ নিঃস্বার্থ ঔদার্য্য ও মহত্বের একত্র সমাবেশ এ পৃথিবী-তলে অতি বিরল। একটি বিষয় আমার জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছে না।"

"কি জিজ্ঞাসা করিবেন—করুন, অকপট হৃদয়ে তাহার যথার্থ প্রত্যুত্তর দিব।"

"এরূপ মহত্ত্ব-কৌমুদী কোন্ কুলকে আলোকিত করিয়াছে?" বৃদ্ধ অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া নিজ দক্ষিণ কর-তলে রক্ষা করিল।

"আলোকিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং এ হতভাগ্য দ্বারা তাহা কলঙ্কিত হইয়াছে। যে নরাধম স্বীয় পিতা মাতা ও আত্ম-পরিচয়-জ্ঞানে আজীবন অন্ধ রহিল, তাহার আবার কুল-গৌরব কি?" বলিতে বলিতে অপাঙ্গে যেমন দুইটি অশ্রু-বিন্দু উদ্গত হইল, যুবক তাহা মুছিয়া ফেলিলেন।

"সে কি! তুমি তোমার জনক জননীকে কখন দেখ নাই?" বৃদ্ধ বিস্মিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ও বিষাদিত যুবকের অঙ্ক হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া স্থির নয়নে তাহার মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"অদ্যাবধি নয়!" যুবক সনিশ্বাসে উত্তর করিলেন। "ভাল বৎস! তোমার পিতার নাম কি?"

"এ পাপ মুখে সে পবিত্র নামোচ্চারণ অযোগ্য। তাঁহার নাম সুরশেখর,—আর এ নরাধম তাঁহার পুত্রত্বানুচিত—নরেন্দ্র—"

"ওঃ! সুরশেখর!—নরেন্দ্র!—ন—রে—এ—" শিখর-চ্যুত শিলা-খণ্ডের ন্যায় বৃদ্ধ অকস্মাৎ যুবকের ক্রোড় হইতে সোপানোপরি পতিত হইলেন। নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন—"একি ইনি আমাদের নাম-শ্রবণ-মাত্রেই অকস্মাৎ এরূপ মূর্চ্ছিত হইলেন কেন!" তিনি বৃদ্ধের মূর্চ্ছাপনোদনের জন্য যথোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণ-মধ্যে বৃদ্ধের সমস্ত বহিরাকারে এক বিকট মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। নিমীলিত নয়ন-দ্বয়—নিষ্প্রভ বদন-মণ্ডল এবং নির্জীব বিকলে-

প্রিয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদায়ই নব-বলীকৃত যন্ত্রের ন্যায় অকস্মাৎ বিচলিত হইয়া পড়িল। পাদ-দ্বয় বাত-প্রতাড়িত বৃক্ষ-শাখার ন্যায় শূন্যে ঘন ঘন প্রক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল; হস্ত-যুগ মুষ্টিবদ্ধ হইয়া কখন সবলে বক্ষে তাড়ন করিতে লাগিল, কখন বা উদ্ধত-কেশ ও শ্মশ্রু-রাজি ধারণ করিয়া সবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনর্গল রক্তস্রাবে মস্তক—বদন—গলদেশ স্নাত হইল। বিস্ফারিত রক্ত-তাম্রবর্ণ নয়ন দুটী কখন ঊর্দ্ধে ধাবিত, কখন বা চপল-ভাবে ঘন ঘন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ওষ্ঠাধর সঘনে কম্পিত ও দন্তে দন্ত ঘর্ষিত ও সংলগ্ন হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বৃদ্ধের এই সমস্ত বিকট অঙ্গ-ভঙ্গি দর্শন করিয়া অতীব উদ্বিগ্ন হইলেন,—ক্ষিপ্র-হস্তে তাহার মস্তকে ও নয়ন-যুগে জলসেক করিতে লাগিলেন। শরীর-যন্ত্র পুনর্ব্বার বিকল ও নির্জীব হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ ক্ষণকাল নীরবে ক্রন্দন করিয়া বাষ্প-প্লাবিত-লোচনে ভগ্ন-স্বরে কহিলেন, "নরেন্দ্র! প্রিয়তম! এই তোমার স্নেহ নরপিশাচ পিতৃব্য ভবানীশঙ্কর;—এই দুষ্ট শার্দ্দূলই তোমাদের সমস্ত দুঃখের মূলীভূত কারণ!—উঃ! আমার তুল্য রাক্ষস এ পৃথিবী-তলে আর কেহই নাই। নর-মাংসাশী হিংস্র ভিলদিগেরও ঘৃণিত-মার্গে পদ-ক্ষেপ করিয়া অভিন্ন-শোণিত, প্রাণাধিক, প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র-দ্বয়কে অনায়াসে কালগ্রাসে প্রেরণ করিতে সঙ্কুচিত হই নাই—দেব-পূজ্য পিতৃ-তুল্য অগ্রজকেও বধ করিতে খড়্গহস্ত হইয়াছিলাম! যে এক-মাত্র অনর্থকারিণী রাজ্য-লিপ্সা-বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এই অনন্ত-শোণিত-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, তাহাতে কি ফলোদয় হইল? পদে পদে আত্ম-পরিজন-গণের দীর্ঘ-নিশ্বাস-বাত্যা প্রাদুর্ভূত হইয়া গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল—অবশেষে দেহ-তরি পাপ-ভারে পরিপূর্ণ হইয়া আপনিই নিমগ্ন হইয়া পড়িল। উঃ!—বৎস! যে দিন হইতে পূজ্যবর সুরশেখর তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মিথ্যা নিধন-বার্ত্তা-শ্রবণে শোক-বিহ্বল হইয়া লক্ষ্মী-প্রতিমা জায়া-সমভিব্যাহারে অদৃশ্য হইলেন, সেই দিন হইতে লব্ধ-রাজ্যে নিষ্কণ্টক হইয়াও কখন এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তার বিষদংশন হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই। অবশেষে সে কাল সর্পীকে এক বারে নিহত করিবার মানসে দেশে দেশে গুপ্ত-চর প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এত দিন কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পরে কল্য তোমাদের অবস্থিতি-বার্ত্তা লোক-মুখে শ্রুত হইয়া ভীষণ জিঘাংসা-বৃত্তির অনুধাবন করিয়া কতিপয় সৈনিক-সমভিব্যাহারে ঐ ভগ্ন অট্টালিকায় অজ্ঞাত ভাবে বাস করিতেছিলাম—এমন সময় সর্ব্বনিয়ন্তা সূক্ষ্মদর্শী জগদীশ্বর এই ভয়াবহ কালাগ্নি-ভাণ্ডে আমাদের সকলকে আচ্ছন্ন করিলেন। আমার সহায়-বল সমস্তই বিনষ্ট হইল—চির-লালিতা আশা-লতা আমূল দগ্ধীভূত হইল। কেবল এ

নারকী-কৃত ভীষণ পাপ-ঘোষণা জগতে প্রকাশিত করিবার জন্য এ নরাধমের পাপ জীবন, এ দুর্বিহ পাপ দেহ হইতে এখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু তাহাতেও আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি এক্ষণে দারুণ বিষময় মৃত্যু-বাড়বানলে ভাসিতেছি—প্রতিপদে জ্বলন্ত অনলকে অঞ্জলি করিয়া পান করিতেছি।—শীঘ্রই সেই অনিবার্য্য অগ্নি-সাগরে এ কলুষ-কলঙ্কিত দেহ পর্য্যবসিত হইবে। এই অল্প-কাল-মধ্যে দুরন্ত হৃদয়-যাতনা কথঞ্চিৎ শান্ত করিব—দুর্ব্বহ-পাপ-ভার স্বল্প-পরিমাণে লাঘব করিব।” ভবানী-শঙ্কর কম্পিত কলেবরে ও চঞ্চল নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—যেন সোদ্বেগে কোন বস্তু অন্বেষণ করিতেছেন। নরেন্দ্র তাঁহার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি ওরূপ চঞ্চল—ওরূপ চঞ্চল নয়নে কি অনুসন্ধান করিতেছেন?”

“হস্তস্থিত হীরকাঙ্গুরীয়ক।”

“বোধ হয়, আপনার অঙ্গোৎক্ষেপণ-কালে তাহা হস্ত-স্খলিত হইয়া নিম্ন-ভূমে পতিত হইয়াছে। ভাল, আমি তাহার অন্বেষণ করিতেছি।” নরেন্দ্র সোপান ও তন্নিকটস্থ পুষ্প-মঞ্চের চতুষ্পার্শ্ব তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইলেন না।

বৃদ্ধ এক বারে গভীরতর হতাশ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, অন্তর্দ্দাহক দারুণ অনুতাপ-বহ্নির প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে দ্বিগুণতর অস্থির হইয়া পড়িলেন। “উঃ! বুঝিলাম—বিধাতা এ নরাধমের প্রতি নিতান্ত নিষ্করুণ—নতুবা এই ঘোর যন্ত্রণার সময় সে ক্ষণ-সুখের বস্তুকেও হরণ করিবেন কেন? যে দুর্লভ সামগ্রীর উদ্দেশে শত শত ঘোর নৃশংস কার্য্য সম্পন্ন করিতেও সঙ্কুচিত হই নাই—তাহা কোথায়? সিংহাসন-পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতৃপুত্র-দ্বয়কে নির্ব্বাসিত করিলাম—দেবতুল্য পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠ সোদরকেও রাজ্য বহিষ্কৃত করিলাম!—কিন্তু কই?—যাহার উদ্দেশে এই ভীষণ পাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলাম—তাহা কোথায়?—এক দিনের তরে—এক মুহূর্ত্তের তরেও সে সামগ্রীত নয়ন-গোচর হয় নাই!——অবশেষে তাহাতে সন্তরণ করিতে করিতে এই জ্বলন্ত বাড়বানলে সেই স্বর্গীয় সামগ্রীকে ক্ষণপ্রভার ন্যায় চঞ্চল-ভাবে নৃত্য করিতে দেখিলাম—প্রাণে হতাশ হইয়া তন্মধ্যে পতিত হইলাম। কিন্তু, হায়! দুর্ভাগ্যবশত তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইল! ওঃ! ওঃ—এক্ষণে বুঝিলাম—সুখ আকাশ-কুসুম, পাপ-জীবন-মরুভূমে মরীচিকাবৎ।

“আপনি একটী সামান্য অঙ্গুরীয়কের জন্য এরূপ উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন?”

“সামান্য!—না, বৎস! সেই সামান্য বস্তুরই জন্য অসামান্য পৈশাচিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি—জীবনকে দুস্তর পাপ-পঙ্কে লিপ্ত করিয়াছি। সেই সামান্য

বস্তুই আমার পাপ-জীবনপতঙ্গের প্রদীপ্ত অনল—আশা-মৃগীর দুরন্ত মরীচিকা।” ভবানীশঙ্কর বিষম যাতনায় ক্রমশ নিঃস্পন্দ হইতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র এ সমস্ত বাক্যের কিছুই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। বিষম সন্দেহ ও কৌতূহল-রূপ দুই প্রতিকূল তরঙ্গের মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠ-খণ্ডের ন্যায় অস্থির হইয়া সোদ্বেগে কহিলেন, “পিতৃব্য! দুর্ভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র এ জটিল বাক্যের কিছুই মর্ম্মভেদ করিতে পারিল না।” প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষায় তিনি বৃদ্ধের জলদাবৃত প্রাবৃট্-দিবাকর-তুল্য বদন প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ আশা তাঁহার আপন হৃদয়-মধ্যে বিলীন হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার অনুতাপানল-দগ্ধ মুমূর্ষু পিতৃব্য বাক্যোচ্চারণে বিফলোদ্যম হইয়া গলদশ্রুনয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎপরেই দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার মস্তকে স্থাপন করত নীরব-রোদনে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত রহস্য-নিচয় তাঁহাতে অদ্ধক্রম হৃদয় কূপে নিহিত ছিল, তাহাদের উদ্ধার-সাধনে তিনি দুরন্ত মৃত্যুর সহিত অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই সেই সর্ব্ব-বিজয়িনী শমন-দূতীর করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। যতক্ষণ তাহার ভীষণ আক্রমণ হইতে দূরবর্ত্তী ছিলেন, ততক্ষণ নরেন্দ্রকে যথাসাধ্য তাঁহার পিতৃ-রাজ্য বিবরণ পরিজ্ঞাপিত করিলেন; অবশেষে বিস্মৃতি-সাগরের ঘোর-তমসাচ্ছন্ন সলিল-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া স্বীয় পাপ-দগ্ধ হৃদয়কে শান্ত করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

> "1. *Cit.*—O most Bloody sight!
> "2. *Cit.*—We will be revenged; revenge; about seek,—burn,—fire,—kill—slay!—"
>
> JULIUS CÆSAR.

কালিকুট নগরে আজ আর আনন্দের পরিসীমা নাই। দেশের সুখ-শান্তির বৈরী, দুর্দ্ধর্ষ দস্যুপতি ধৃত হইয়াছে—অদ্য তাহার বিচার-দিবস। হয়ত সর্ব্বসমক্ষে দুরাত্মার শিরশ্ছেদন হইবে। এই আমোদ-জনক ব্যাপার-দর্শন-মানসে সমস্ত প্রজাবর্গ রাজ-প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সুবিস্তৃত সভামণ্ডপ ও প্রশস্ত অঙ্গন-ভূমির চতুঃপার্শ্বে দর্শক-সমূহের উপবেশনোপযোগী আসনাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। সভা-প্রাঙ্গণের মধ্যস্থ রত্ন-ভূষিত দারু সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া কালিকুটাধিপতি সামরিণ সম্মুখস্থ শৃঙ্খল-বদ্ধহস্ত কতিপয় সৈনিক-রক্ষিত দস্যুপতিকে হাস্যোৎফুল্ল নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সভাস্থল—স্থির—গম্ভীর। দর্শক-সমূহ প্রস্তরোৎকীর্ণের ন্যায় উপবিষ্ট। সামান্য নিশ্বাস-বায়ুও সকলে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিতেছে। সকলেরই নির্নিমেষ নয়ন সামরিণের মুখের দিকে সংবত। যেন তাঁহার জড়তা দূরীকরণ করিবার জন্য সকলের দৃষ্টি-শর অক্ষুণ্ণ-

গহ্বিতে নিঃসারিত হইয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতেছে।

ক্ষণ-পরে সাম্রিণ দস্যুপতির আপাদ-মস্তক স্থির-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জন্য আমার রাজ্যে প্রজাদিগের বারংবার উৎপীড়ন করিয়াছ?"

"কোন বিষয়ে আমি আপনার প্রজাদিগের উৎপীড়ন করিয়াছি?" দস্যুপতি তদনুরূপ-স্বরে উত্তর করিলেন।

"সে বিষয়ের বিবরণ তোমাকে দিবার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি কি জন্য আমার রাজ্য-মধ্যে শত শত ঘোর পৈশাচিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সুন্দর-শাসন-প্রণালীর সমধিক ব্যাঘাত সংঘটন করিয়াছ?"

"যে মূঢ় সেই মহাত্মার কার্য্যকে পৈশাচিক কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করে, সে স্বয়ং পিশাচাধম। নর-মাংসাশী রাক্ষসকে বধ করা, পরধনাপহারক চৌরকে দণ্ডিত করা—যে নরাধম নৃপতির সুন্দর-শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধ নিয়ম—সে আবার কি প্রকারে আপনাকে নৃপতি বলিয়া পরিচয় দেয়?"

"কি দুর্ব্বৃত্ত!" সাম্রিণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—"তুই আপন মৃত্যু-কালেও বিনীত হইলি না! কেন এ অল্প-কালের জন্য বিষাক্ত বাণ প্রক্ষেপ করিয়া বিনীত হইলি না! কেন এ অল্প-কালের জন্য বিষাক্ত বাগাণ নিক্ষেপ করিয়া আমার দুরন্ত ক্রোধকে দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিস্?"

"সাম্রিণ! তুমি যখন বিশ্বাস-ঘাতকের ন্যায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বিনা দোষে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়াছ, তখন আর তোমার প্রজ্বলিত ক্রোধ-হুতাশনের শমতা প্রার্থনা করি না। তোমার ন্যায় কাপুরুষ নৃপতির এরূপ জঘন্য, নৃশংস ব্যবহারে আমি কিছু-মাত্রও আশ্চর্য্য হই নাই।—কেবল এই টুকু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তুমি এখনও আমাকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ না করিয়া এই রূপ নিশ্চিন্ত রহিয়াছ।"

নাগরিক-বর্গ দস্যুপতির এরূপ উচ্চ নির্ভীকতা দর্শন করিয়া বিস্মিত নয়নে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

সাম্রিণ। "সে আমার ইচ্ছা। আমি ইচ্ছা করিলে, এই দণ্ডেই তোর শির-শ্ছেদন করিতে পারি; আবার ইচ্ছা করিলে, তোকে দণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্ত করিতেও পারি, তা জানিস্।"

দস্যু। "হাঁ চোর রাজ্য-পালকের এই প্রকার প্রভূত পরাক্রম বটে। যে মূর্খ—অপহৃত ধনকে অর্থ-বিনিময়ে—না, না, হীরকাঙ্গুরীয়ক-বিনিময়ে ক্রয় করে, সে চৌর-অপেক্ষা শত-গুণে নিকৃষ্ট।"

"কি নরাধম! তুই আমাকে চৌরা-পবাদ দিলি?"

"শত বার! সহস্র বার! যত ক্ষণ না জিহ্বা বাক্‌শক্তি-বিরহিত হইবে, তত ক্ষণ

বলিব—সামরিণ কাপুরুষ। সামরিণ চৌরাপেক্ষা সহস্র-গুণে নিকৃষ্ট।”

“সতীশ! যদিও তুই ক্ষণ-কাল জীবিত থাকিতে পারিতিস্, কিন্তু তোর এরূপ উদ্ধত বিদ্রোহী ভাব তোর প্রতিকূল হইল। আমি আর একটী কথা তোকে জিজ্ঞাসা করিব। ভাল, আমাকে চৌরাপবাদ তুই কিসে দিতেছিস্?”

“কিসে! তুমি আমার পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধ পিতৃদেবকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া রাজ্যাপহরণ করিয়াছ,—আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম অগ্রজকে সুকুমার অবস্থায় নির্ব্বাসিত করিয়াছ—আর এই হত-ভাগ্যকে জন্ম-রাত্রেই নদী-জলে নিক্ষেপ করিয়াছ। উঃ! নরাধম! ইহাতেও কি তোমার মহাত্মার প্রধান গৌরব প্রজা-সমক্ষে বর্দ্ধন করিতে চাও! ইহাতেও কি তোমার ঘোর কলঙ্কময় চৌরাপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাও!—তবে মাহাত্মা—গৌরব নরমাংসাশী অসভ্য পার্ব্বতীয়দিগকে আশ্রয় করুক।”

এই সময়ে প্রজামণ্ডল-মধ্যে “সুর-শেখর—রণেন্দ্র—নরেন্দ্র—সতীশ” এই প্রকার কলরব উত্থিত হইল। তাহারা সামরিণকে নিষ্কোষ অসি হস্তে সতীশের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—“সামরিণ! সামরিণ! নিবৃত্ত হও—নিবৃত্ত হও! মূর্খতা সংবরণ কর! সতীশ এখনও অনেক কথা বলিবেন।”

সামরিণ আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না।

সতীশ বলিতে লাগিলেন, “সামরিণ! যখন আমি দস্যু-অপবাদে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া তোমার সম্মুখে নীত হইয়াছি, তখন আর তোমার শোণিতাক্ত হস্তে আমার জীবনের প্রত্যাশা করি না। আমি বধ্য। অল্প-সময়ের মধ্যেই আমার হৃদয়-শোণিত-দানে তোমার ঐ রক্ত-পিপাসু খড়্গের তৃষা নিবৃত্তি করিব। কিন্তু ক্ষণ-কাল স্থির হও। তোমার প্রিয়ানুরাগী প্রজা-সমূহের অনুরোধ রক্ষা করি।” তিনি পর-ক্ষণেই প্রজাবর্গের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন “সুহৃদ-গণ! বান্ধব-বর্গ! আমি নৃশংসের ন্যায় তোমাদের সকলকে কত বার উৎপীড়ন করিয়াছি—কত বার তোমাদের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া তোমাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছি, কত বার তোমাদের আত্ম-পরিজন বিনাশ করিয়া তোমাদিগকে দারুণ শোকানলে দগ্ধ করিয়াছি। সেই সমস্ত পৈশাচিক দুষ্ক্রিয়ার প্রতিফল আজ আমি তোমাদের ধার্ম্মিক-প্রবর ঐ নৃপতির নিকট প্রাপ্ত হইব—তোমাদের সর্ব্ব-সমক্ষে আমার শিরশ্ছেদন হইবে। আজ হইতে তোমরা সকলে নিষ্কণ্টক হইবে—আজ হইতে তোমরা সকলে নিরুদ্বেগে নিদ্রাসম্ভোগ করিবে,—আজ তোমাদের সুখ-শান্তির দুর্দ্দর্ষ বৈরী বিনষ্ট হইবে—আজ তোমাদের রাজ্য শান্তির আস্পদ হইবে। কিন্তু বোধ হয়,

এখনও বিংশতি বৎসর অতীত হয় নাই—যে দিন তোমাদের পূর্ব্বতন অধিপতি সুরশেখর রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন—”

“সুরশেখর—রাজ্যচ্যুত! উঃ! নরক! রসাতল! পৃথিবীকে গ্রাস করুক।” নাগরিকগণ এক স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

“হাঁ—রাজ্যচ্যুত!—নির্ব্বাসিত! নৃশংস ব্যবহারে—শোচনীয় অবস্থায়! সেই দিন হইতে আজ বোধ হয়, বিংশতি বৎসর পরিপূর্ণ হয় নাই, সেই পুত্র-শোকার্ত্ত বৃদ্ধ সুরশেখর নিরীহ মেষের ন্যায় রাজ্য-নিষ্কাষিত হইয়া সামরিণের ভীষণ জিঘাংসা-বৃত্তির পরিপোষণের জন্য উৎপীড়িত হইয়াছিলেন—সে দিনে নর-রাক্ষস ভবানীশঙ্কর দুষ্ট সামরিণের পরামর্শে তোমাদের লক্ষ্মী-স্বরূপা রাজ্ঞীকে ভিখারিণী-বেশে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। বন্ধুগণ! আমার হস্তদ্বয় বদ্ধ; নতুবা এ হৃদয়-পট বাহির করিয়া সেই ঘোর কলিমাময় ভীষণ ঘটনা-চিত্র তোমাদের নয়ন-সমক্ষে ধরিতাম।”

“শীঘ্র শৃঙ্খল মোচন করিয়া দাও—ছিন্ন কর—ভাঙ্গিয়া ফেল—শীঘ্র—শীঘ্র!” এই শব্দ অকস্মাৎ সভাগৃহে উত্থিত হইল। অমনি কতিপয় নাগরিক সলম্ফে ধাবিত হইয়া সতীশের হস্তদ্বয় বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিল “—সেই দিন! ওঃ! সেই দুর্দ্দিন! একটি-মাত্র সূর্য্যের উদয়াস্তে গণিত হয় নাই—তাহার মধ্যে শত শত সূর্য্য উদিত হইয়াছে—আর সামরিণের দুষ্ক্রিয়া-রূপ ঘোর তমসা দ্বারা আবৃত হইয়া লুক্কায়িত হইয়াছে। সুহৃদ্বর্গ তোমরা সকলেই অবগত আছ যে, তোমাদের জ্যেষ্ঠ রাজ-পুত্র রণেন্দ্র সিংহ দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু, যে দুর্ব্বৃত্ত দস্যু তাহাকে হরণ করিয়াছিল, ঐ দেখ—সে তোমাদের সম্মুখে রাজবেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ নরপিশাচ বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন-ব্যপদেশে রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া পথিমধ্যে দস্যুদিগকে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিল!—ঐ!—ঐ দেখ! নরাধমের মুখ-মণ্ডলে সে চিত্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে! ঐ দেখ, দুরাত্মা পলায়নোদ্যত হইতেছে—”

“ধর—ধর—বন্ধন কর—শিরশ্ছেদন কর!” নাগরিকগণ উন্মত্তের ন্যায় দ্রুত-বেগে ধাবিত হইয়া পলায়মান সামরিণকে ধৃত করিয়া যথোচিত অবমাননা সহকারে রাজ-সভায় আনয়ন করিল।“সভ্য নাগরিকগণ! এক দিন যে নরপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় ঐ রত্নভূষিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ও সুক্ষ্মদর্শনে তোমাদের সকলকে পুত্রাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, যাহাকে তোমরা আপনাপন মস্তকে রাখিয়াও শান্ত থাকিতে পারিতেন না;—যাঁহার চরণে কণামাত্র ধূলিস্পর্শ হইলে, তোমরা মস্তকের কেশরাজি দ্বারা তাহা পরিষ্কৃত করিয়া দিতে। আজ দেখিবে চল—

তাঁহার বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া প্রজা-মণ্ডলী শোকোন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতেছে।" নগরবাসী সকলেই তাঁহাদের পূর্ব্বতন অধিপতি সুরশেখরকে দেখিবার জন্য একান্ত সমুৎসুক হইল। আহা! সতীশের প্রতি এত দূর অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার সৎকার্য্য ও অভীষ্ট-সাধনের জন্য প্রিয়-জীবনকেও উৎসর্গ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইল। বিংশতি বৎসর ধরিয়া তাহাদের হৃদয়াকাশে যে গৌরব-শালী প্রভাকর দুর্বৃত্ত সামরিণ ও ভবানী-শঙ্করের কাল-মেঘ-জালে আবৃত ছিল, অদ্য প্রবল বাত্যা-তাড়নে সে মেঘ সহসা অপসারিত হইল। গগন পুনর্ব্বার পরিষ্কৃত হইল—পুনর্ব্বার সে তেজস্কর-সূর্য্য-প্রভায় উজ্জ্বলিত হইল। তাহারা সে সূর্য্যকে বহিরাকাশে না দেখিয়া থাকিতে পারিল না। সেই সূর্য্য পুনর্ব্বার মধ্য-গগনের জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে আসীন হইবেন, তাহারা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিবে—এই উল্লাসে সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য একান্ত উদ্বিগ্ন হইল। সতীশ তাহাদের সেই কৌতূহল নিবারণের ভার গ্রহণ করিলেন। দুষ্ট সামরিণকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া তিনি পিতৃ-দর্শন-মানসে বহির্গত হইলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"He was not there.

* * * * *

Mount, grotto, cavern, valley searched in vain.

* * * *

---Moons roll on Moons away,
And Conrad comes not—came not since that day!!"

THE CORSAIR.

সতীশ স্বীয় পিতৃ-দর্শন-মানসে বহির্গত হইলেন। তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ সমরের উপদেশানুসারে কালিকূটের পশ্চিম-পার্শ্বস্থ কোন এক নির্দ্দিষ্ট দেব-মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজ তাঁহার হৃদয়-সাগরে শত শত আশা-লহরী ধীরে ধীরে নৃত্য করিতেছে। কোনটী উত্থিত হইবা-মাত্র ক্ষণ-কাল নৃত্য করিয়া সেই খানেই বিলীন হইল। কোনটী আবার অপ্রতিহত-বেগে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিল, ক্রমশ দৃষ্টির বহির্গত হইয়া পড়িল—সতীশ আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

সম্মুখে সেই দেবমন্দির—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল-পরিবেষ্টিত শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র দেব-মন্দির। পশ্চিম দিকের পর্ব্বত-শ্রেণী ক্রমশ স্তরে স্তরে উন্নত হইয়া অবশেষে নীলাকাশে ধূম-স্তম্ভের ন্যায় মিশিত হইয়াছে। অপর দিকেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত-সমূহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমশ সঙ্কীর্ণ-ভাবে সুদূর-প্রসারিত পশ্চিমাচলে সম্মিলিত হইয়াছে। স্থানটী, বিজন—গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ! কোন জীব-জন্তুর কোলাহল নাই। তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র

হৃদয় সহসা ভক্তি ও ভয়ে স্পন্দিত হইতে থাকে—সজোরে পদ-বিক্ষেপ করিতেও সাহস হয় না! সতীশ নিজ ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে সতর্কিত ভাবে মন্দির-দ্বারে উপনীত হইলেন। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন, সেই দিক হইতেই যেন শৈল সমুদায় বিস্মিত ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতেছিল। কোন দিকেই লোচনানন্দকর হরিৎ-দৃশ্যে তাঁহার নয়ন স্নিগ্ধ হইল না। বাসন্তী লতিকার নয়ন-প্রীতিকর নৃত্য—মুকুলিত-পাদপ-কুলের সুদৃশ্য অলঙ্কার কোন দিক হইতেই তাঁহার নয়নগোচর হইল না। কল-কণ্ঠ বিহঙ্গের সুমধুর গীত-ধ্বনি—সুমন্দ মলয়-পবনের কোমল বংশী-স্বর কোন দিক হইতেই প্রবাহিত হইল না। সমগ্র প্রকৃতি যেন ধূসর-বাসে গাত্রাবৃত করিয়া নীরবে যোগ-মগ্ন রহিয়াছে। সতীশ চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে করিতে সতর্কে দেবালয়-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দ্বার অনর্গল। মন্দ মন্দ পদ-বিক্ষেপে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শুভ্র-শিলাসনোপরি শুভ্র-প্রস্তরোৎকীর্ণ বুদ্ধদেব-মূর্ত্তি। সতীশ দেব-বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, "ভগবন্! এ দাসকে আর কেন কষ্ট দেন? প্রিয়সুহৃদ্ সমরের উপদেশানুসারে আপনার শ্রীপদ-দর্শনে দারুণ হৃদয়-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু কই?—সমস্তই কি বৃথা হইল? আজন্ম-কাল কে পিতা, কে মাতা, কে আত্ম-পরিজন, কিছুই জানিতে পারিলাম না। জানি, সমর এক-মাত্র প্রিয়-সুহৃদ। তাঁহারই অনুকম্পায় ও অকৃত্রিম স্নেহে আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছি। নতুবা এত দিন শত সহস্র প্রবল বিপদ-স্রোতে কোথায় প্রবাহিত হইতাম! দেব! আর কে—ন"—এই সময়ে অঙ্গুলি দ্বারা কে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। সতীশ চমকিয়া দেখিলেন অপূর্ব্বযোগি-মূর্ত্তি!—রক্তাম্বর-পরিহিত, সুচিক্কণ-কৃষ্ণশ্মশ্রুল অপূর্ব্ব-যোগি-মূর্ত্তি! অমনি প্রণত হইলেন। যোগি-বর "মনোভিলাষ পূর্ণ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সতীশের হস্ত-ধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন ও সস্নেহ বচনে কহিলেন "কুমার! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিলে না?" সতীশ 'কুমার' নাম শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন—সমরশেখর! অমনি বিস্মিত ভাবে কহিলেন—

"সমর! এ কি! তোমার এ বেশ কেন?"

"কেন? কুমার! এ বেশ কি পরিধান করিতে নাই?"

সমর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কই! এত দিন ত তোমাকে এ বেশ কখন পরিধান করিতে দেখি নাই!"

"এত দিন তাহা আবশ্যক হয় নাই, আজ হইয়াছে বলিয়া পরিধান করিলাম" সমর সস্নেহ বচনে উত্তর করিলেন।

সতীশ বিস্মিত হইলেন এবং সমরের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—দেখিলেন, তাঁহার অপাঙ্গে দুইটী অশ্রু-বিন্দু উদ্গত হইয়া পতনোন্মুখ হইতেছে।

"ও কি! সমর! তুমি কাঁদিতেছ?"

"না কাঁদিব কেন? ভ্রাতঃ! তোমার সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিয়া আমার অপাঙ্গে আনন্দাশ্রু উদ্গত হইতেছে।"

"হতভাগ্যের আবার সৌভাগ্য কি? সমর! যে নরাধম আজন্ম-কাল দুর্ভাগ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে, সে কি কখন সৌভাগ্য-লোকে আনীত হইবে?"

"কেন, কুমার! আর তোমার বিষাদের প্রয়োজন কি? ভ্রাতঃ! তোমার সৌভাগ্য-সূর্য্য অচিরে উদিত হইবে।"

"সমর! এই ত সেই দেব-মন্দির, তবে আমার পিতৃদেব কোথায় রহিলেন?"

"কেন, রাজধানীতে? সেখানে কি তাঁহার কোন অনুসন্ধান কর নাই?"

"না, তোমার বাক্যে ভাবিয়াছিলাম, এই খানেই তাঁহার দর্শন পাইব।"

ভ্রাতঃ! এত ক্ষণ তিনি প্রজা-বর্গের জয়োল্লাসে রাজাসনে আরূঢ় হইয়াছেন। বিশ্বাস না হয়—যাইবা-মাত্র দেখিতে পাইবে।"

"জগদীশ্বর যে এ হতভাগ্যের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। সমর! চল, তবে আমরাও প্রজাবর্গের জয়োল্লাসে সংযুক্ত হইব। ভ্রাতঃ! তুমি কি এই বেশেই যাইবে?—তোমার অশ্ব কোথায়?"

"অশ্ব নিষ্প্রয়োজন, বেশান্তরও নিষ্প্রয়োজন। যাইলে এই, বেশেই পদচারণে যাওয়া যায়।"

সতীশ প্রথমে সন্দিগ্ধ, তৎপরেই বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন, "সমর! তোমার এ বাক্যের অর্থ কি? তবে কি তুমি রাজধানীতে যাইবে না?"

"এ কথার উত্তর দিতেছি।"

"কখন?"

"এখনি। অগ্রে তুমি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর।"

"কি অনুরোধ, সমর?"

"অগ্রে এই ত্রিপুরেশ্বর ভগবান্ বুদ্ধদেবের সাক্ষাতে সত্য কর—আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে।"

সতীশ অকপট হৃদয়ে বলিলেন "সমর! আমি এই ত্রিলোকনাথ ভগবান্ বুদ্ধদেবের চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিবই করিব। এক্ষণে কি তাহা প্রকাশ কর।"

"নরেন! তোমার এ হতভাগ্য অগ্রজ রণেন্দ্রসিংহকে ভুলিয়া যাও। ভাই! রাজধানীতে যাও—বৃদ্ধ পিতা মাতা, স্নেহশীল সোদর ও অনুরক্ত প্রজাবর্গের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য পিতৃ-সিংহাসন গ্রহণ কর। আর একটী অনুরোধ—দুঃখিনী গিরিবালার পাণি-গ্রহণ করিয়া তাহার মৃতদেহে নব-জীবন প্রদান করিও। ভ্রাতঃ! আজ আমার কি আনন্দের দিন! যে গৌরব-সূর্য্যের পুনরুত্থানের জন্য বিংশতি বৎসর ধরিয়া মহামন্ত্র

জপ করিয়াছিলাম, আজ তাহা সফল হইল। আজ সেই সহস্রাংশুর হাস্যময় কিরণে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইল—জগতের গাঢ় অন্ধকার অন্তরিত হইল।”

নরেন্দ্রের হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় আকাশ-পথে উঠিতে উঠিতে অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকারময় অতল গহ্বরে পতিত হইল। তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে যে সুখময়ী আশা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছিল, এত দিনের পর আজ তাহা ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইল; কিন্তু কোথা হইতে আবার প্রলয়-প্রভঞ্জন উত্থিত হইয়া তাহাকে সমূলে ছিন্ন করিল। নরেন্দ্র দারুণ হৃদয়-যাতনায় একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এরূপ চিত্ত-বিকার সন্দর্শন করিয়া রণেন্দ্র কোমল ভৎর্সনা-বাক্যে কহিলেন “নরেন! এ কি! তুমি ভগবান্ বুদ্ধদেবের চরণ স্পর্শ করিয়া সত্য করিলে, আবার তাঁহারই সম্মুখে তাহা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ! যাহা সত্য করিলে—পালন কর। রাজ্যে যাও—সস্ত্রীক রাজাসন গ্রহণ কর—এ হতভাগা অগ্রজকে ভুলিয়া যাও!” নরেন্দ্র নির্ব্বাকে ক্ষণ-কাল অশ্রু-প্লাবিত বদন অবনত করিয়া রহিলেন—সহসা মস্তক উত্তোলন করিলেন—যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের অতি গাঢ়তর অন্ধকার আর তথায় নাই।—উচ্চ করুণ-স্বরে বারংবার আহ্বান করিলেন—উত্তর পাইলেন না—মন্দিরের চতুর্দ্দিক, বিজন-পর্ব্বত-প্রদেশের চতুঃপার্শ্ব তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও আর রণেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না!!

যোগ।

(দেহ-তত্ত্ব।)

বহির্জ্জগতস্থ যাবতীয় পদার্থের সহিত মানব-দেহ এবং প্রকৃতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ,তাহা যোগীদিগের একান্ত জ্ঞাতব্য। এই হেতু তত্ত্বসার তন্ত্রানুসারে তাহা লেখা যাইতেছে। যথা—

> মহাভূতানি পঞ্চেতি
> দেহ-মধ্যে ইধুনা শৃণু।
> মহাভূতানি পঞ্চেতি
> পৃথ্বীতেজো মরুৎখকং।
> এতেষাঞ্চ তথা পঞ্চ
> গুণস্থানং শৃণু প্রিয়ে! তত্ত্বসার, ১ অ।

ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব ভগবতী পার্ব্বতীকে যোগোপলক্ষে বলিতেছেন—প্রিয়ে! অধুনা দেহীদিগের দেহ-মধ্যে যে পঞ্চ মহাভূত ও তদ্গুণ আছে, তাহা বলিতেছি—শুন। আর শরীরের যে যে স্থানে যে যে মহাভূত ও তাহার গুণ আছে, তাহাও শুন। শরীরের মধ্যে পৃথিবী,জল,অগ্নি, বায়ু ও আকাশ আছে। এই সকল এবং ইহাদিগের গুণ-পঞ্চকের স্থান এই:—

অস্থি-মাংসং লোম-নাড়ী
ত্বক্‌ চেতি পৃথিবী-গুণাঃ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণালস্য-নিদ্রা-
গ্লানিশ্চ সলিল-গুণাঃ।
রাগ-লজ্জা-ভয়োদ্বেগ-
ধারণা চ মরুদ্গুণাঃ। তত্ত্বসার, ২।

অস্থি, মাংস, লোম, নাড়ী ও ত্বক্‌ এই পঞ্চ পদার্থ পঞ্চ মহাভূতের স্থান। আবার ঐ পঞ্চ বস্তুতে কেবল পৃথিবীরই গুণ আছে। আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা এবং গ্লানি এই সমুদায় সলিলের গুণ। রাগ, লজ্জা, ভয়, উদ্বেগ ও ধারণা এই গুলি মরুতের গুণ। এতদ্ভিন্ন তেজ ও আকাশের বিষয় পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।

এতজ্জ্ঞানেনৈব তেষাং
বুদ্ধিরুৎপদ্যতে শুভা। পঞ্চদশী।

দেহস্থ এই সকল ভূত ও ভূতগুণ জ্ঞাত হইলে, শুভকরী বুদ্ধির উৎপত্তি হয়। শুভকরী বুদ্ধি না হইলে, মতি স্থির হয় না। অতএব যোগি-গণ শুভকরী বুদ্ধি-লাভের জন্য দেহ-তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া কৃতার্থ হন।

অনন্তর মন প্রভৃতি পঞ্চ প্রকার অন্তঃকরণ-সম্ভূত পদার্থের গুণ লেখা যাইতেছে :—

মনোবুদ্ধিরহঙ্কার-
শ্চিত্ত-চৈতন্যমেবচ।
এতে পঞ্চ প্রকারাশ্চ
অন্তঃকরণ-সম্ভবাঃ। তত্ত্বসার, ৩।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত আর চৈতন্য এই পঞ্চ পদার্থ অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগের গুণ :—

মনানাং মননং জ্ঞেয়ং
বুদ্ধ্যাদি পঞ্চ পঞ্চ তু।
বিবেক-শান্তি-সন্তোষ-
ক্ষমা-বৈরাগ্যমেব চ।
এতে পঞ্চ গুণা বুদ্ধে-
রহঙ্কার-গুণান্‌ শৃণু॥ ঐ, ৪।

মনন আর আমনন নামক গুণ। (অর্থাৎ সঙ্কল্প আর বিকল্প) এই দুইটী অন্তঃকরণের গুণ। বিবেক, শান্তি, সন্তোষ, ক্ষমা, ও বৈরাগ্য এই পাঁচটী বুদ্ধির গুণ। অতঃপর অহঙ্কারের গুণ বলা যাইতেছে—

অহঙ্কার-মহঙ্কাদি যুগান্তং হিসনং তথা
বৃত্তিঃ স্মৃতির্ম্মতি স্তজ্যা নিরাশং
চৈচিকা গুণাঃ। ঐ, ৫॥

অহঙ্কার অর্থে আত্মাভিমান অর্থাৎ আমার ন্যায় ধনী, মানী, জ্ঞানী ও সুশ্রী ভদ্র কে আছে, এইরূপ জ্ঞান; আর সকলে মরিতেছে, আমি মরিব না, যুগের অন্ত পর্য্যন্ত থাকিব; পর-হিংসা করিব ইত্যাদি গুণ সকল অহঙ্কার-সম্ভূত; আর বৃত্তি, স্মৃতি, মতি-সমাহিত ও বুদ্ধি ত্যজ্য অত্যজ্য বিচার-শক্তি চিত্তের গুণ।

নিস্পৃহতা-হৃষ্টতা-ধৈর্য্যং
বিমর্ষং চিন্তনং তথা।
চিত্তে গুণা হ্যয়ো জীব-
গুণান্‌ শৃণু মহেশ্বরি। ঐ, ৬॥

নিস্পৃহতা, অদ্বেষ, ধৈর্য্য, বিমর্ষ, চিন্তা এই সকল গুণ চৈতন্যের।

চৈতন্য শব্দে ইন্দ্রিয়-বিশেষ—পরমাত্মা নহে—চিত্তকে বুঝাইতেছে।

স্বপ্ন-জাগ্রতি-সুষুপ্তানি চৈতন্যং
জীবিকাগুণাঃ। তত্ত্বসার॥

স্বপ্ন, জাগ্রতি, সুষুপ্তি এই অবস্থা-ত্রয় আর চৈতন্যাবস্থা এই চারিটী অবস্থা কেবল জীবেরই গুণ, অন্যের নহে। চৈতন্যাবস্থাকে তুরীয় অবস্থা বলা যায়। জাগ্রতি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি-অবস্থান্বিত জীবকে প্রবৃত্তি-মার্গ-ভ্রমণকারী জীব বলা যায়। এতাদৃশ জীবের বারংবার কৃত কর্ম্মের ফল-ভোগার্থ জননীর পয়োধরের রস পান করিতে হয়। ইহাদিগকে মায়া-শৃঙ্খলা-আবদ্ধ, সংসার-কারাবাসী জীব বলে। যোগ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইলে মায়া নিগড়-চ্ছেদ করত জীব বিমুক্ত হইয়া যায়।

প্রবৃত্তি-মার্গ-ভ্রমণকারী জীব যখন নিবৃত্তি-মার্গে আরোহণ করে, তখন তাহাকে তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। অর্থাৎ মায়োপাধি হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যের-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। মায়া গুণোপাধিরহিতের অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষমতাতীত হওয়াই ইহার দৃষ্টান্ত। অতুরীয় অবস্থান্বিত জীব আর ঐর অবস্থাপন্ন জীবের জাগ্রৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সত্ত্ব গুণের কার্য্য, আর স্বপ্নাবস্থায় রজঃ, সুষুপ্তি অবস্থায় তমঃ গুণের কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া ঐরূপ সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু তুরীয় অবস্থায় ইহার বিপরীতে আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া আত্মময় হইয়া জগতে অবস্থান করেন। ইহাকে পরম হংসের পদ বলে।

ভগবদ্গীতায় জাগ্রৎ অবস্থাকে যে সত্ত্ব-গুণের কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেরূপ জাগ্রৎ অবস্থার কার্য্য সাধারণ জাগ্রৎ অবস্থা হইতে অত্যন্ত পৃথক্। ইহা সমাধিস্থ সিদ্ধ যোগীদিগেরই ঘটিয়া থাকে। যে জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-বর্গ অ-কর্ম্মণ্য হয়, কেবল জ্ঞান দ্বারা জ্ঞান-স্বরূপ এক পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থাকেই প্রকৃত জাগ্রদবস্থা বলে। ইহাই সত্ত্ব-গুণ-সম্ভূত। আর যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়-বর্গ দ্বারা বাহ্য মায়িক জগতীয় বিষয় ভোগ হয়, তাহাকে সত্ত্ব-রজঃ মিশ্রিত গুণের কার্য্য বলিয়া জানা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-দিগের কর্ত্তব্য।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং
তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। ভগবদ্গীতা।

সর্ব্ব ভূতের যে নিশা, সেই নিশাতে সংযমীরা জাগিয়া থাকেন। এই ভগবদ্বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম উপরে বলা হইয়াছে।

সত্ত্ব-গুণের কার্য্য-সম্বন্ধে তত্ত্বসার যাহা বলিয়াছেন, তাহা

আস্থা-শ্রদ্ধা-কৃপা-ভক্তি-সত্যং সত্ত্ব-গুণাঃ স্মৃতাঃ। তত্ত্বসার।

আস্থা অর্থাৎ গুরু আর শাস্ত্রে, বিশ্বাস কৃপার্থ দয়া, ভক্তির অর্থ ঈশ্বরে এবং

গুরুতর ব্যক্তিতে শ্রদ্ধা ও সত্য-কথন এই গুলি যাহাতে থাকে, সেই ব্যক্তিই সাত্ত্বিক-প্রকৃতির লোক।

ত্যাগ-ভোগশ্চ শ্রদ্ধা চ স্বার্থ-বস্তু স্পৃহা তথা। রজঃ পঞ্চগুণাশ্চৈতে তামসস্য গুণান্ শৃণু। তত্ত্বসার।

ত্যাগার্থ দান, ভোগার্থ ইহ-পারলৌকিক সুখ-ভোগ, (শ্রদ্ধার্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) স্বার্থ পদে নিজ ইষ্ট-বস্তু-স্পৃহা অর্থাৎ ন্যায়োপাত্ত ধন-সংগ্রহ। এই পাঁচটী রজোগুণের ধর্ম্ম।

প্রমোদঃ স্বাদঃ কলহো বিবাদো ভ্রান্তি-বর্দ্ধনং। বঞ্চনঞ্চ তথা শোকং, তামসস্য গুণা ইমে। তত্ত্বসার।

অযথা আমোদের নাম প্রমোদ; ষড়-রস-গ্রহণের নাম স্বাদ; অনর্থ বিবাদের নাম কলহ; বিবাদার্থ আত্ম-মত ও প্রভুত্ব-সংস্থাপক দ্বন্দ্বের নাম বিবাদ এবং ভ্রান্তি-পদে এক বস্তুতে অন্য বস্তু জ্ঞানকে ভ্রান্তি বলে। এই সকল তমোগুণের কার্য্য।

সত্ত্বাদি গুণানুসারে যেমন লোক সকল ভাগ-ত্রয়ে বিভক্ত, তেমনি তাহাদিগের কার্য্য-কলাপ ত্রিবিধ। সত্ত্ব-প্রকৃতিক মনুষ্যের বুদ্ধি নির্ম্মল, চিত্ত সদা বৈরাগ্য-যুক্ত, ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্, নির্ম্মল আমোদে আসক্ত—ইত্যাদি। রজঃ-প্রকৃতিক লোক অত্যন্ত বিষয়ী, বহু-গোষ্টিক, লোভ-মোহ-যুক্ত, গান-বাদ্য-প্রিয়, আত্মাভিমানী, অসৎ কর্ম্মে নিরত।

তমোগুণাবলম্বীরা ধর্ম্ম-প্রমাদী, শঠ, পরদ্রব্য-লোভী, অভিমানী, নির্দ্দয়, অনাচারী, চতুর, মিথ্যাভাষী, পরদ্বেষ্টা ও অবৈধ-কার্য্যকারী ইত্যাদি।

ত্রিধাতুর বিষয়।

"সত্ত্বাদি গুণ-ত্রয়ানুরূপ মানবদিগের শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতু আছে বলিয়া তাহাদিগের কার্য্যও তদনুরূপ।

"সত্ত্বাধিক পুরুষের বায়ু-প্রধান ধাতু। রজোঽধিক ব্যক্তির পিত্ত-প্রধান। তমো-গুণাবলম্বী লোকের কফাধিক্য হয়।

"যাহার যেমন ধাতু, তাহার ক্রিয়া-কলাপ তদ্রূপ। বাতাধিক লোক নিঃ-স্বার্থ ভাবে বিশুদ্ধ কার্য্য করে, হিংসাদি-গর্হিত কার্য্য সকলকে ঘৃণা করে। দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণ ইহাদিগের ভূষণ।

"রজোগুণাবলম্বী লোকের পিত্তাধিক্য ধাতু। ইহারা সর্ব্বদা নিজ-সুখ-সাধনার্থ ব্যস্ত ও সকাম কর্ম্মে অভিরত।

"কফাধিক্য পুরুষের কুকর্ম্মে অনুরাগ।" আয়ুর্ব্বেদে এই মতগুলি উল্লিখিত আছে।

"শরীরের মধ্যে যেমন ত্রিগুণ ও ত্রি-ধাতুর বিষয় আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দেশিত আছে, তদ্রূপ বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধ এই অবস্থাত্রয়ের বিষয় বর্ণিত আছে। তমোগুণাধিক ব্যক্তির বাল্যাবস্থায় কফধাতু। রজোগুণাধিক লোকের যৌবনাবস্থায় পৈত্তিকধাতু। সত্ত্ব-গুণাধিক মানবের বৃদ্ধাবস্থায় বাতাধিক্য ধাতু। বাল্যাদি অবস্থা ত্রয়ের মধ্যে আর কতিপয় অবস্থা যে আছে, তাহাও এস্থলে

বলা আবশ্যক হেতু বলা যাইতেছে।

বাল্য, শৈশব, অপোগণ্ড, কৈশোর, এই চারি অবস্থা বাল্যাবস্থার অন্তর্গত। যুবা, প্রৌঢ়, অতি প্রৌঢ় এই অবস্থা তিনটী যৌবনের—আর বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ও পলিত, বৃদ্ধাবস্থার অন্তর্নিবিষ্ট। এই দশ প্রকার অবস্থা পুরুষের।

স্ত্রীলোকের অবস্থা চারি প্রকার—

যোড়শাব্দা ভবেদ্বালা যুবতী স্ত্রিংশতাব্দিকা।
পঞ্চপঞ্চাশতো তাবৎ প্রৌঢ়বৃদ্ধা ততঃ পরং। যামল।

স্ত্রীলোকের ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্যাবস্থা, ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত যুবতী। তৎপর ৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়াবস্থা, তৎপর মরণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধাবস্থা।

এই সকল অবস্থা দ্বারা স্ত্রী পুরুষ তাবতেরই গুণত্রয়ের কর্ম্ম স্পষ্টরূপে জানা যায়। বাল্যে কফাধিক্য প্রযুক্ত জ্ঞানের অল্পতা হেতু হিত কার্য্যাদিতে জ্ঞান থাকে না। পিত্তাধিক যৌবনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ হিতাহিত জ্ঞান জন্মে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-বর্গ প্রবল থাকায় সর্ব্বদা বিষয়াভিলাষ জন্মে। এ অবস্থায় কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিতে ব্যস্ত; তৎপরে বৃদ্ধাবস্থায় বাতাধিক্য, তাহাও সম্যক্ হিতাহিত, কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান জন্মে; ইন্দ্রিয়গ্রামের তত উদ্ধতা থাকে না। মন স্থির-ভাব ধারণ করিতে চেষ্টা পায়। মনু প্রভৃতি ঋষিগণ এই কালে সংসারত্যাগের বিধি দিয়াছেন। ঐ কাল ত্রয়ে সত্বাদি গুণ-ত্রয় স্পষ্টই জানা যায়।

এ বিষয়ে সুশ্রুত বলিয়াছেন,—

মধ্যে ষোড়শ-সপ্তত্যো-
র্মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ।
চতুর্থাঃ মধ্যমং প্রাহু-
র্যুবা দ্বাত্রিংশতো মতঃ॥
চত্বারিংশৎ সমারাঢ়
তিষ্ঠেৎ বীর্য্যাদি-পূরিতঃ।
ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণঃ স্যাৎ
যাবদ্ভবতি সপ্ততিঃ॥

ষোড়শ বৎসরের পর সপ্ততি বৎসরের মধ্যে চতুঃপঞ্চাশৎ বৎসরকে মধ্যাবস্থা বলা যায়। ঐসময়কে চারি ভাগে বিভক্ত করিলে, ৩২বৎসর পর্য্যন্ত যুবা, ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত রস-রক্তাদি সপ্তধাতু-পরিপূর্ণ থাকে এবং ইন্দ্রিয় বলোৎসাহ সমানরূপে থাকে, কিছুই ব্যত্যয় হয় না।

৪০ বৎসরের পর পুরুষের সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত ধাতু সমুদায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। যেমন ধাতু ক্ষয় পায়, অমনি বল-বীর্য্যাদি ও ক্ষয় পাইতে থাকে।

ততস্তু সপ্ততেরূর্দ্ধং
ক্ষীণধাতুরসাদিকং।

সপ্ততি অর্থাৎ সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলে, পুরুষের ধাতু ও রসাদি ক্ষয় পায়। ধাতু রসাদি ক্ষয় পাইলে মেধা ক্ষয় হয়। মেধা ক্ষয় হইলে স্মৃতিভ্রংশ হয়; স্মৃতি ক্ষয় পাইলে বুদ্ধি নষ্ট হয় এবং বুদ্ধি নষ্ট হইলে মৃত্যু হয়।

গ্রহাণাং মণ্ডলঞ্চৈব শৃণু বক্ষ্যামি পার্ব্বতি!

তন্ত্রং।

শ্রীপার্ব্বতীকে পশুপতি বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! মানব-শরীরে গ্রহ মণ্ডল

যে আছে, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর।
"নাদ-চক্রে স্থিতঃ সূর্য্যঃ বিন্দু-চক্রে চ চন্দ্রমাঃ। লোচনে মঙ্গলঃ প্রোক্তঃ হৃদি সোম-সুতস্তথা। তন্ত্র।

আজ্ঞাখ্য চক্রের উর্দ্ধভাগে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি যে রেখা যোগীরা চিন্তা করেন, সেই রেখাকে তন্ত্রশাস্ত্র নাদ-চক্র বলেন। সেই নাদচক্রের মধ্যে গ্রহপতি সূর্য্যদেবের অবস্থিতি হয়। তাহার নিম্নস্থ তারাকার বিন্দুকে বিন্দু-চক্র বলে। সেই বিন্দু-চক্রে তারাপতি চন্দ্রদেব বাস করেন। চক্ষুর্দ্বয়ে মঙ্গল গ্রহ বাস করেন; এবং হৃদয় সোম-সুতের বাস-স্থান।

"উদরে চ গুরুশ্চৈব শুক্রে শুক্রেস্তথৈব চ। নাড়ী-চক্রে স্থিতো মন্দো মুখে রাহুঃ স্থিতঃ সদা। পাদে নাভৌ চ কেতুশ্চ শরীরে গ্রহ-মণ্ডলং॥ তন্ত্র।

উদরে গুরু, শুক্র-স্থানে শুক্রাচার্য্য, নাড়ী-চক্রে শনি, মুখে রাহু, নাভিতে আর পাদ-দ্বয়ে কেতু গ্রহ বাস করেন। ইতি গ্রহ-গণের স্থান-নির্ণয়।

দেহস্থ ব্যাহৃতি।

ভূ র্ভুবঃ স্বঃ এই বাক্য-ত্রয়কে ব্যাহৃতি বলা যায়। এই ব্যাহৃতির অর্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে বুঝায়। ভূঃ ব্যাহৃতি ব্রহ্মা সৃজন-কর্ত্তা, ভুবঃ ব্যাহৃতি বিষ্ণু পালন-কর্ত্তা, স্বঃ ব্যাহৃতি শিব সংহার-কর্ত্তা। শরীরের মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফ-রূপ ধাতু-ত্রয়কে যোগীরা ব্যাহৃতি বলিয়া ধ্যান করেন। বায়ুতে শরীর উৎপন্ন, পিত্তে শরীর রক্ষা, কফে শরীর ধ্বংস হয়। তজ্জন্য উহারা ব্যাহৃতি-পদ-বাচ্য।

এই বায়ু, পিত্ত, কফ ধাতু-ত্রয় যেমন দেহীর দেহ সৃজন, পালন এবং ক্ষয় করিতেছেন, সেই বাহ্য জগতীস্থ বায়ু অগ্নি ও জল দ্বারা বাহ্য জগতীয় তাবৎ পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হই-তেছে। যোগীরা ইহা স্থির জানিয়া দেহস্থ বায়ুকে যোগ দ্বারা পবিত্র ও বশীভূত করিয়া যোগ-সাধনে কৃতকার্য্য হন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যোগের আদিতে যে পবনাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই ফল দৈহিক-ব্যাহৃতি-সাধন।

দেহস্থ গ্রহগণের গতি।—সূর্য্য যেমন বাহ্য জগতে সময়ে সময়ে চন্দ্রের উর্দ্ধে ও নীচে গমন করেন, তদ্রূপ চন্দ্রও বিন্দু-চক্রে থাকিয়াও স্বীয় কেন্দ্রে ক্রমশ ভ্রমণ করিতে করিতে নাদ-চক্র বেষ্টন করেন। তাহাতে নাদ-চক্রস্থ সূর্য্যও, চন্দ্রের নিম্ন-ভাগে পড়েন। এ জন্য চন্দ্রের ছায়াতে সূর্য্য গ্রহণ হয়। অমাবস্যাও এই কারণে ঘটে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—

"ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থো ঘন-বদ্ভবেৎ।" চন্দ্র, অধঃস্থ মেঘের ন্যায় গাঢ়-তমসাচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করেন বলিয়া, সূর্য্যগ্রহণ হয়; অর্থাৎ অধঃস্থ সূর্য্য-মণ্ডলে উর্দ্ধস্থ চন্দ্র-মণ্ডলের ছায়া পড়ায় সূর্য্য-গ্রহণ হয়। যে যোগী দৈহিক সূর্য্যগ্রহণ-জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিতে

পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী—তিনিই বাহ্য জগতীয় সূর্য্য-গ্রহণকে তত আদর করেন না।

চন্দ্র-গ্রহণ।

সূর্য্যেণাচ্ছাদিতশ্চন্দ্রঃ পৌর্ণমাস্যাং নরাধিপ। পুরাণ-মত।

পৌর্ণমাসীতে সূর্য্য দ্বারা চন্দ্র আচ্ছাদিত হন বলিয়া, চন্দ্র-গ্রহণ হয়।

এতদুভয় গ্রহণ দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্র স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যে স্থানান্তরিত হন, তাহাই প্রমাণিত হইল।

ভ্রূ-মধ্যে ও মূলাধারে পৃথিবী অবস্থান করেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মাতৃক ন্যাস করিবার সময় মূলাধারে লং এই পৃথ্বী বীজ জপ করিতে হয়। পৃথিবী স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রূমধ্যে চন্দ্রের নিকটস্থ হন, এজন্য অন্তর্মাতৃক-ন্যাসের সময় ভ্রূতে, 'ল' বীজ উচ্চারণ করা উচিত।

এতাবৎ শরীরের মধ্যে ললাট স্থানকে উর্দ্ধ স্থান বলায় তথায় যে, নাদ-বিন্দু আছে, সেই নাদের উপরি বিন্দু তাহার দৃষ্টান্ত। এই বিন্দু-চিহ্ন সূর্য্য, আর অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন চন্দ্র। ইহাতে সূর্য্যের নীচে চন্দ্র-মণ্ডল যে আছে, তাহা সিদ্ধান্ত হইল। মূলাধার-পর্দ্ম শরীরের অধোভাগে থাকায়, উহাকে যোগীরা পৃথিবী বলিয়া জানেন। এই পৃথিবীতে কুণ্ডলিনী নিদ্রাবিভা হইয়া থাকেন। এই পৃথিবীর উপরি লিঙ্গ-মূলে জল, তৎপরে নাভি-মূলে অগ্নি, তদূর্দ্ধে হৃদয়ে বায়ুমণ্ডল, তদূর্দ্ধে কণ্ঠ-দেশে আকাশ, তদূর্দ্ধে ভ্রূ মধ্যে মন, ভ্রূর উর্দ্ধ ললাটের নিম্ন ভাগে বুদ্ধি, ললাটের মধ্যভাগে অহঙ্কার, তদূর্দ্ধ ভাগে মহৎ তত্ত্ব, তদূর্দ্ধে মস্তকে পরমাত্মা নিত্য বিরাজমান।

শরীরের মধ্যে যে যে স্থানে যে যে রাশি অবস্থান করিতেছেন, তাহা বিশ্বসার তন্ত্রানুসারে লিখিত হইতেছে।

> শীর্ষে মুখে তথা বাহ্বো
> হৃদয়ে চোদরে ক্রমাৎ।
> কটৌ বস্তৌ চ গুহ্যোরৌ
> জানু-জঙ্ঘাঙ্ঘ্রিষু স্থিতাঃ।
> মেষাদ্যা রাশয়ো দেহে
> তেষাং রূপাণ্যতঃ শৃণু।
>
> বিশ্বসার-তন্ত্র।

মস্তক, মুখ, বাহু-দ্বয়, বক্ষঃস্থল, উদর, কটিতট, বস্তিদেশ, গুহ্য, জানুদ্বয়, জঙ্ঘা, উরু ও পাদ-দ্বয় এই দ্বাদশ স্থানে নাড়ী রূপে মেষাদি দ্বাদশ রাশি বাস করিতেছেন। অর্থাৎ—মস্তকে মেষ ১। মুখে বৃষ ২। বাহুদ্বয়ে মিথুন ৩। বক্ষে কর্কট ৪। উদরে সিংহ ৫। কটিতটে কন্যা ৬। বস্তিদেশে তুলা ৭। গুহ্যে বিছা ৮। উরুতে ধনু ৯। জানুদ্বয়ে মকর ১০। জঙ্ঘাতে কুম্ভ ১১। পাদ-দ্বয়ে মীন ১২।

নক্ষত্র-স্থান।

> মূর্দ্ধ্নি ভ্রূ-যুগলে চাক্ষোঃ
> কর্ণয়োর্নাসি গণ্ডয়োঃ।
> ওষ্ঠয়োর্দন্ত-পঙ্‌ক্তৌ চ
> জিহ্বায়াং গ্রীব-মূলকে।

স্তন-দ্বয়ে তথা বক্ষ
পার্শ্বয়োর্নাভি-দেশকে।
নিতম্বে চ তথা পৃষ্ঠে
গুহ্যে চ পাদয়োঃ পুনঃ।
পাদমেকং দ্বি-নক্ষত্রং
রাশীনাং পরিণামকং।

বিশ্বসার-তন্ত্র।

মস্তকে অশ্বিনী, ভ্রূ-যুগলে ভরণী ও কৃত্তিকা, চক্ষু-দ্বয়ে রোহিণী ও মৃগশিরা, কর্ণ-দ্বয়ে পুষ্যা ও অশ্লেষা, গণ্ড-দ্বয়ে মঘা ও পূর্ব্ব-ফাল্গুনী ও ঠ-দ্বয়ে উত্তর-ফাল্গুনী ও হস্তা, জিহ্বাতে বিশাখা, গণ্ড-মূলে অনুরাধা, স্তন-দ্বয়ে জ্যেষ্ঠা ও মূলা, বক্ষঃস্থলে পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তর পার্শ্বে উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণা, নাভিদেশে অভিজিৎ, নিতম্বে ধনিষ্ঠা ও শতভিষা, পৃষ্ঠে পূর্ব্ব-ভাদ্রপদ, গুহ্যে উত্তর-ভাদ্রপদ এবং পাদ-দ্বয়ে রেবতী।

পরিচালিকা অপরিচালিকা। শক্তির বিষয়।

যে শক্তি দ্বারা জগৎ-নিয়ন্তা জগদীশ্বর জগতের তাবৎ কার্য্য সাধন করিতেছেন, সেই শক্তির নাম পরিচালিকা ও অপরিচালিকা। এই শক্তি-দ্বয়কে গুণ-সূত্র বলা হইয়াছে। গুণার্থ সত্ব, রজঃ, তমঃ। জগদীশ্বর পঞ্চ মহাভূতান্তর্গত পৃথিবীকে তাবৎ গুণে ভূষিত করিয়া সর্ব্ব-ভূতের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। পার্থিব পদার্থে সকল গুণ আছে। পৃথিবী রসময়ী গুণময়ী ও রূপময়ী। পার্থিব পদার্থও রসময়, গুণময় ও রূপময়।

পৃথিবী নব কোটী, নবতি লক্ষ, নবতি-সহস্র প্রকার পদার্থের পরমাণু-সমষ্টি মাত্র। যত প্রকার পদার্থ পৃথিবী প্রসব করিতেছেন, এত পদার্থ অন্য কোন মহা-ভূত উৎপন্ন করিতে পারেন না। তাহার কারণ, অন্য মহাভূতের গুণ-গরিমা পৃথিবী অপেক্ষা অল্প; আর পরমাণুও তাহা-দিগের তদ্রূপ। পৃথিবীর যত পরমাণু তদপেক্ষা জলের পরমাণু অল্প; জল হইতে অগ্নির পরমাণু; অগ্নি হইতে বায়ুর পরমাণু অল্প; এতদপেক্ষা আকাশের পরমাণু আরও অল্প। আকাশে পরমাণু যে নাই, এ কথা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। পঞ্চী-করণে পঞ্চমহাভূতের পরমাণু পঞ্চ মহা-ভূতে আছে। আকাশে নিজ পরমাণু অর্দ্ধেক; অন্যান্য মহাভূত সকলের পরমাণু ৵ দুই দুই আনা হিসাবে আছে। এই অপরাপর মহাভূতের পরমাণু, তাবৎ মহাভূতে পরিচালিকা ও অপরি-চালিকা শক্তি থাকায় জগতীয় কার্য্য-কলাপ সুচারু-রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

এইরূপে যোগীদিগের শরীরের নিদান-ভূত পৃথিবীর পরিচালিকা আর অপরি-চালিকা শক্তির বিষয় চিন্তনীয়; সুতরাং তাহার বিষয় তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতানুসারে লেখা যাইতেছে।

পৃথিবীতে তাবৎ রস, তাবৎ গন্ধ ও তাবৎ রূপ আছে। পৃথিবীর কোন্ স্থানে কোন্ রস, কোন্ গন্ধ ও কোন্ রূপ আছে, তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। পৃথিবীর যে স্থানে ইক্ষু হইতেছে,

সেই স্থানে লবণ ও কটু কষায়াদি দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। ইহার নিদান অনুসন্ধান করিতে গেলে, পরিচালিকা আর অপরিচালিকা শক্তি বৈ অন্য কিছুই উপলব্ধ হয় না। যে গাছে মিষ্ট রস দিবার প্রয়োজন, পরিচালিকা শক্তি পৃথিবী হইতে সেই রস লইয়া বৃক্ষে বিতরণ করায় ইক্ষু মিষ্টরস প্রদান করিয়া থাকে। এই ইক্ষু বৃক্ষের মূল-দেশে লঙ্কার গাছ যদি থাকে, তবে ঐ প্রকারে পরিচালিকা শক্তি-প্রভাবে লঙ্কা ফলে কটু রস প্রবিষ্ট হয়।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি।

তৃতীয় অধ্যায়।

এই সময় ফরাসী জাতি সাধারণ জাতীয় সমিতির প্রতি বীত-শ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সকলেই সভাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতে লাগিলেন। সভা দুই বৎসর কাল টেররিষ্ট (Terrorist)-সম্প্রদায়ের অধীনে থাকিয়া যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর কিছুতেই পূরণ করিয়া উঠিতে পারিল না; সুতরাং সকলেই উহার ধ্বংস কামনা করিলেন। সভার সভ্যগণও ইহা বুঝিলেন; কিন্তু একেবারে সভার সংস্রব পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা ভবিষ্যৎ-রাজ্য-শাসনের উপায়-চিন্তনে ব্যাপৃত রহিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের স্থাপিত জাকোবীয় সভা (Jacobin constitution) ক্ষমতা-সম্পন্ন না থাকিলেও, কাগজ পত্রে এখনও বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বে যদিও সকলে শপথ পূর্ব্বক 'ইহার একটীও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তত্রাপি ইহার আর তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের স্থাপিত জিরণ্ডিষ্ট সভাও (Girondist constitution) কোন কার্য্যকারক নহে; সুতরাং কি উপায়ে রাজ্যের কার্য্যসকল চালিত হইবে, এই এক বিষম বাদানুবাদ উত্থাপিত হইল। ঐ সমুদায় সভা যদিও প্রথমে সাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত শপথ পূর্ব্বক ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা কেহই সুনীতি অনুসারে পরিচালিত হয় নাই—সুতরাং তাহাদের উপর সাধারণ লোকের আর সেরূপ আস্থা ছিল না।

এদিকে কোন বিপ্লবের পর সে দেশের রাজ্য-শাসন-প্রণালী যেরূপ হইয়া থাকে, সেই চিন্তায় সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এখনও সকলের মনে রবস্পিয়রের অত্যাচার জাগরুক ছিল, এবং সভা যেরূপ প্রথম হইতেই কর্ম্ম-নির্ব্বাহক ও ব্যবস্থাপক সভার (Executive and legislative) একত্রীভূত হইয়া সকলেরই ভীতি-বিধায়ক হইয়াছিল, তাহাও কাহারই অজ্ঞাত ছিল না। যাঁহারা

ব্যবস্থাপক সভার সভা, তাঁহারাই আবার কার্য্য-নির্ব্বাহক হইলে, কিরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই কতিপয় লোকের পীড়নে প্রমাণীকৃত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সকলে অন্যবিধ অথচ স্থায়ী ও সুন্দর প্রণালী অনুসরণ করিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন। এই সময়ে এই রূপ প্রস্তাব হইল যে কার্য্য-নির্ব্বাহক ও ব্যবস্থাপক এই দুইটী সভা পরস্পর বিভিন্ন হইবে এবং একের সহিত অন্যের কোন সম্পর্কই রহিবে না, অথচ এক-দল পীড়ন করিতে উদ্যত হইলে, অন্য দল স্বাধীন ভাবে তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে পারিবেন; অধিক কি, এই প্রণালী কিয়দংশে ইংরাজী শাসন-তন্ত্র-প্রণালীর অনুকরণে গঠিত হইল। যদি এই প্রথাই সুনিয়মে পালিত হইত, তাহা হইলে ইয়ুরোপ কখনই বিংশতি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকিয়া রক্ত-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিত না। তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী পঙ্গপালের মত দলে দলে ইহলোক হইতে অকালে লোক-লীলা সংবরণ করিত না। দুঃখের বিষয়—ইহা মুখে উচ্চারিত হইয়া মুখেই পর্য্যবসিত হইল, কার্য্যে কিছুই ঘটিল না।

যৎকালে সাধারণ-লোকের মনের অবস্থা এই রূপ, সেই সময় অপর কতক-গুলি লোক রাজাতন্ত্র-প্রণালীর সহিত, রবস্পিয়র ও থারমিডোরিয়ান্ (Thermidorians)-গণের তুলনায় রাজকীয় পক্ষ অবলম্বন করিল। ফ্রান্সের বোর্ব্বোঁ-বংশীয় রাজা এক্ষণেও বিদেশে অবস্থান করিতেছিলেন; এবং তৎসঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তি সকল, বিদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিলে, তাঁহাদের সমুদয় সম্পত্তি সাধারণ-তন্ত্রের লোক সকল আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি সম্পত্তি কোন সাধারণের কার্য্য জন্য বিক্রীতও হইয়া গিয়াছিল; রাজ্য-তন্ত্র-প্রণালী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজ-পক্ষীয় লোক সকলও পুনরাগমন করিবে; তাহা হইলেই তাহাদের সম্পত্তির জন্য নানা গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। এই সকল ভাবিয়া অনেকেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না; সুতরাং এক্ষণে কি উপায়ে দেশ শাসিত হইবে, সেই চিন্তাই সকলের চিন্তাকর্ষণ করিল।

পরিশেষে স্থিরীকৃত হইল, সর্ব্বপ্রধান একটী সভা থাকিবে। পাঁচ জন সভ্য লইয়া এই সভা সংগঠিত হইবে। ইহারা রোমীয় ডিকেটটর্-গণের ন্যায় কার্য্য করিবে; কিন্তু রোমীয় ইতিহাস স্মরণে ইহাতে অনেকেই ভীত হইলেন। কেন না, এই পাঁচ জনের উপর সমান ক্ষমতা থাকিলেও, কাল-ক্রমে তাহার মধ্যে কেহ না কেহ একটু ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেই পরিশেষে রোমেরই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। রোম অনেক চেষ্টা করিয়াও, তিন জনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। এই সভার অধীনে

আর দুইটী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব হইল। একটী প্রাচীন লোকের সভা; ইহাতে চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধতন বয়স্ক ব্যক্তিগণ স্থান পাইবেন; কিন্তু উক্ত বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষ হইলে, সভায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন না। কেন না, বিবাহিত পুরুষ ভিন্ন সংসারের সুতরাং সমাজের প্রকৃত অভাব-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব; দ্বিতীয়টী কনিষ্ঠগণের সভা। ইহাতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পর্য্যন্ত সকলেই স্থান লাভ করিতে পারিবেন, এবং সর্ব্ব-সমেত ইহাতে পাঁচ শত সভ্য থাকিবেন। ইহারা সকলেই নির্ব্বাচন-প্রথা-অনুসারে নির্ব্বাচিত হইবে। সকল প্রকার বিধি ব্যবস্থাই প্রথমত এই কনিষ্ঠ সভায় উত্তোলিত হইয়া আন্দোলিত হইবে ও পরে তাহা প্রাচীন সভায় প্রেরিত হইয়া অনুমোদিত হইবে। প্রাচীন সভায় অনুমোদিত না হইলে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে না; সুতরাং এই সভা অপেক্ষা প্রাচীন সভার ক্ষমতা কিঞ্চিৎ অধিক হইল। ইহারা কনিষ্ঠ সভার অনুমোদিত কোন ব্যবস্থার অনুমোদন অনিষ্ট-কর বিবেচনা করিলে তাহা অগ্রাহ্যও করিতে পারিবেন। ডিরেক্টর-গণের সভা এই উভয় সভারই কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। সকলের মতানুসারে পরিশেষে এই প্রণালীটিই স্থিরীকৃত হইয়া গেল (১৭৯৫)। কিন্তু ইহার মধ্যেও নানাপ্রকার গোলযোগ রহিল। ধনী ও দরিদ্র এই দুই দলের সংস্রবে কোন সাধারণ-শাসন-কার্য্য চলিতে পারে না। ধনিগণের যে প্রকার বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন, দরিদ্র বা মধ্য-বিত্ত-গণের তাহা কষ্টকর হইতে পারে। যাহাই হউক উপর্য্যুপরি আশু ভয়ানক বিপ্লব নিবারণার্থ এই প্রণালীটীই সকলের মনোনীত হইল। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরেই নির্ব্বাচন-প্রথা লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। অত্যাচারী রবস্পিয়র থারমিডোরিয়ান্ (Thermidorian) গণের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। সেই অবধি থারমিডোরিয়ান্‌গণই দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ইহারা প্রজা-পীড়ন-দোষে রবস্পিয়রকে নিহত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে ইহারা সমধিক অত্যাচারী হইয়া সকলেরই বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়েন। ফ্রান্সের অধিকাংশ লোকই অন্তরে ইহাদের পদ-চ্যুতি কামনা করিতেছিলেন; এমন সময় নির্ব্বাচন-প্রথার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল।

সাধারণ লোকে থারমিডোরিয়ান্-গণের উপর বিরক্ত—তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। সুতরাং নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, তাঁহাদেরই সমূহ ক্ষতি। এই ভাবিয়া তাঁহারা এই প্রথার নানা দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইহাদের অধিকাংশই তখন উচ্চ-পদে প্রতিষ্ঠিত, রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভু; সুতরাং ক্ষমতাও বিলক্ষণ ছিল। এমন কি

রবস্পিয়রের হত্যার পর হইতে সকলেই অন্তরে তাঁহাদিগকে ভয় করিত ও তাঁহাদের আজ্ঞা কঠিন হইলেও, তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিত। থার্মিডোরিয়ানগণ নির্ব্বাচন-প্রথা আপনাদেরই হস্তে রাখিবার কল্পনা করিলেন; কিন্তু মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া তাঁহারা সভায় নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে এইরূপ দুইটী প্রস্তাব করিলেন:—প্রথমত জাতীয় সভা যে সকল সভ্য লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল, তাহারই মধ্য হইতে লোক নির্ব্বাচন করিয়া বর্ত্তমান সভা দুইটীর অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, জাতীয় সমিতি অবশিষ্ট স্থান আপনারাই পূরণ করিয়া লইবেন। অন্য কথায় যেরূপ লোক লইয়া শাসন-কার্য্য এত দিন চলিয়া আসিতেছিল, তাহারই পুনরভিনয় হইবে মাত্র। এই প্রস্তাবে জাতীয় সভা সম্মত হইল; এবং যাহাতে ইহা সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়, তাহারাই বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রস্তাবটী চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইলে, অনেকেই ইহার আভ্যন্তরীণ বিপদ-রাশি সন্দর্শন করিয়া ইহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। বিশেষত পারিস-বাসি-গণ ইহার উপর ভয়ানক বিরক্ত হইল, এবং জাতীয় সভায় এ সম্বন্ধে নানা প্রকার বাদানুবাদ ও প্রশ্ন তুলিল। পারিসবাসিগণ ইহার অভ্যন্তরে সেই অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

পরিশেষে যৎকালে জাতীয় সভা সর্ব্বসাধারণের সম্মতি-ক্রমে এই দুইটী প্রস্তাবই পরিগৃহীত হইল, এই রূপ প্রচার করিয়া দিলেন, তখন পারিসবাসিগণ অতিশয় শঙ্কিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া এই ঘোষণা অমূলক ইত্যাদি শব্দে সভায় ক্রোধোদ্দীপন করিয়া তুলিল। কেবল ইহাই নহে। তাঁহারা অনেক সম্বক্কার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল এবং তাহারাই ফ্রান্সের স্বাধীনতা রক্ষা করিবে, সভায় এই রূপ কথা জানাইল। নানা দিক হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া তাহাদের সংখ্যা পুষ্ট করিতে লাগিল। এই রূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই পারিস-বাসি-গণ অতিশয় বলীয়ান্ হইয়া উঠিল।

এ দিকে সভা সাহায্য-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; পাঁচ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। এতদ্ব্যতীত বাষ্টিল (Bastille) নামক দুর্গ অধিকার করিবার পর হইতেই যে সকল সৈন্য সভার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল, তৎ-সমুদায়ই আসিয়া যুদ্ধ জন্য সজ্জীভূত হইল। এই রূপে সভার পক্ষেও বিস্তর সৈন্য প্রস্তুত হইল। পারিস-বাসি-গণ ডানিকান্‌কে সেনাপতিত্বে বরণ করিল। মেনু সভার পক্ষে মনোনীত হইলেন। ইনি সভা কর্ত্তৃক লিবেলিষ্টিয়র নামক

স্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি তদনুযায়ী যাত্রা করিলেন। কিন্তু পারিস্-বাসিগণ তথায় এরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল যে, তদ্দর্শনেই মেনু বুঝিতে পারিলেন, ইহাদিগকে দমন করা সহজ ব্যাপার নহে; সুতরাং তিনি যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন। মেনুর অকর্ম্মণ্যতা এই রূপে প্রমাণীকৃত হইলে বারাস্ (Barras) তৎপদে নিয়োজিত হইলেন। এক্ষণে ইহার অধীনে থাকিয়া কেবল যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন, এমন এক জন সেনাপতির আবশ্যক হইল। এই পদের জন্য নানা লোকে নানা ব্যক্তির কথা উত্থাপন করিল; কিন্তু বারাস্, কারনট্ ও টালিয়নকে বলিয়া পাঠাইলেন, "এই দুর্দ্দিনের উপযুক্ত একটী লোক এখানে বিদ্যমান আছেন; আপনারা তাঁহাকেই নিযুক্ত করুন; আমি তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানি। ক্ষুদ্র কর্শিকা দ্বীপবাসী কর্ম্মচারী ভিন্ন এমন সময়ে আর উপযুক্ত লোক কোথায়? টুলোঁর যুদ্ধের সময় বারাস্ নেপোলিয়নের গুণ-গ্রামের পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি নেপোলিয়নের প্রতি অতি মাত্র প্রীত হন; সুতরাং এই সুযোগে যে তিনি তাঁহার কথা উত্থাপন করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? বারাসের অভিপ্রায় মত নেপোলিয়নই সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার ক্ষমতা দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি যুদ্ধার্থ সমুদায় বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ১০ই আগষ্ট তারিখে পারিস-বাসিগণ যে রাজধানী আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে ও যদৃষ্টে তিনি বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন "এক জন উপযুক্ত সেনাপতি কেমন অক্লেশে এই বিদ্রোহ নিবারণ করিতে পারেন" সেই রূপে আক্রান্ত সেই রাজধানী রক্ষার্থই এক্ষণে অগ্রসর হইলেন। এক্ষণে নেপোলিয়নের অধীনে পঞ্চ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য, পঞ্চদশ শত ভলন্টিয়ার এবং দুই শত কামান ছিল; সুতরাং সমুদয় স্থানটী রক্ষা করা তাঁহার মত লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। তিনি প্রথমত যে যে পথ দিয়া শত্রু-সৈন্য প্রবেশ করিতে পারে, সেই সেই রাস্তায় এক একটী সৈন্যের আড্ডা স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয়ত যে সকল সেতু ছিল, তৎসমুদায় আপনার আয়ত্তাধীনে রাখিলেন। তৃতীয়ত লুই কুইঞ্জ (Louis Quinze) নামক স্থানে সুদৃঢ় সৈন্য-সমাবেশ-স্থান প্রস্তুত করিলেন। তাঁহাকে অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত এই সকল কার্য্য সমাধা হয়। কেন না, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব রাত্রে তিনি দ্বিতীয়-সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—সুতরাং এই সকল বন্দোবস্ত করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় পাইয়াছিলেন মাত্র।

পারিসবাসিগণ প্রথমে নেপোলিয়নের সৈন্য-সমাবেশ স্থানে খাদ্য সামগ্রী যাইবার পথ বন্ধ করিয়া ক্রমশ তাঁহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে;

কিন্তু মেন্নুর পলায়নে তাঁহাদের সৈন্য-মণ্ডলী এতাদৃশ উৎসাহিত হইয়াছিল যে, যুদ্ধে কিঞ্চিৎ-মাত্রও বিলম্ব তাহাদের অসহনীয় হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ বলিল, জাতীয় রক্ষক সৈন্য (পারিস-বাসিগণের পক্ষীয়) এক্ষণে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে একত্র করা আবশ্যক; নচেৎ হয়ত বিভিন্ন দলে বিভক্ত থাকিয়া অবশেষে বিপক্ষ-দলেরই সুবিধার কারণ হইয়া পড়িবে। তাহারা আরও বলিল, সকলে মিলিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে, জাতীয়-সভা শঙ্কিত হইয়া নির্ব্বাচন-প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এই কথা বলিয়া সৈন্যগণ যুদ্ধের নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল; সুতরাং যুদ্ধানল অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল; ইহারা দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ধরিয়া জাতীয়-সভা-গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতি স্থানেই নেপোলিয়নের সৈন্য দ্বারা প্রতিহত হইতে লাগিল। সীন নদীর পর-পারে একটি বৃহৎ সৈন্য-দল রাজবাটীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, আর এক দল সেণ্ট হনোরী রাস্তা ধরিয়া টুলেরিস্-অভিমুখে অগ্রসর হইল; কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। সেণ্ট হনোরীতে যুদ্ধারম্ভ হইল। এখানে বিপক্ষ-সৈন্য-গণ অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; সম্মুখে ও পশ্চাতে নেপোলিয়নের কামান কর্ত্তৃক দলে দলে বিনষ্ট হইতে লাগিল। বিস্তৃত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এতাধিক সৈন্যের সহিত নেপোলিয়নকে যুদ্ধ করিতে হইলে, যুদ্ধের পরিণাম কি হইত, বলা যায় না। কিন্তু সঙ্কীর্ণ রাস্তায় বিপক্ষ-সৈন্য কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না; বিশেষত উপযুক্ত সেনাপতির হস্তে বিপক্ষ-সৈন্য ন্যস্ত ছিল না; যুদ্ধ-ব্যাপারে ডানিকানের সহিত নেপোলিয়নের তুলনাই হইতে পারে না। যাহাহউক, এক ঘণ্টার মধ্যেই ডানিকান্ সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হইলেন। জাতীয় সভার সৈন্যগণ নানা দিকে প্রধাবিত হইয়া ভয়ানক যুদ্ধে পরিলিপ্ত হইল। কিন্তু এই সকল যুদ্ধেই নেপোলিয়ন্ জয়ী হইলেন।

এই যুদ্ধের পর জাতীয় সভা কঠিন নিয়ম অবলম্বন করেন নাই। বিপক্ষ-পক্ষীয়-গণের মধ্যে কেবল লাফণ্ড নিহত হইলেন এবং অপরাপর অপরাধীরা পলায়ন-পর হইলেও, সভা তাহাদিগকে ধরিবার জন্য বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করিলেন না। যাঁহাদিগ দ্বারা যুদ্ধে জয় হইল, তাহাদিগকেও সমধিক সম্মানিত করিলেন—নেপোলিয়নের উপর সে দিনের যুদ্ধের সমুদায় মান্য অর্পিত হইল। যুদ্ধের পাঁচ দিবস পরে প্রধান সেনাপতি বারাস্ নেপোলিয়নের পদোন্নতির জন্য সভায় প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন। তিনি তদনুসারে দ্বিতীয়-সেনাপতির-পদবীতে

স্থাপ্তি-[illegible] হইলেন। এই রূপে সমুদা[illegible]ক্ত হইয়া গেলে পর, সভা[illegible]তন-প্রণা-পরিবর্ত্তনের ভাণ করিয়া কার্য্যতঃ বিভিন্ন আকারে তাহাই রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদ্যত হইলেন।

বারাস্, সাইয়েস্, রিউবেল, লাটুর্ণার্ ডি লা মাক্সি, এবং রেভেলিয়র্ লিপো এই পাঁচ জন লইয়া ডিরেকটর্-সভা সংগঠিত হইল। কিন্তু কিছু দিন পরে সাইয়েস্ কার্য্য-করণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, কার্‌নেট তৎ-পদে নিয়োজিত হইলেন। নেপোলিয়নের সৌভাগ্য-সূর্য্য পূর্ব্বেই নবীন-রাগে পূর্ব্বাকাশে সমুদিত হইয়াছে; এক্ষণে সেই সূর্য্য প্রায় মধ্য গগনে আসিয়া সমুপস্থিত। বারাস্ ডিরেক্টর্-সভার সভ্য হইয়া গমন করিলে, নেপোলিয়ন্ জাতীয় সৈন্যের প্রধান সেনাপতি হইলেন। এই সময় হইতেই তিনি সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় সৈন্য-সংখ্যা বা জাতীয় বল বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যুদ্ধ-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে লাগিলেন। যাহাতে আর কোন বিদ্রোহ উপস্থিত না হয়, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু প্যারিস্-নগরীর সাধারণ লোকের অন্তর হইতে অসন্তোষের কারণ কিছুতেই বিনষ্ট হইল না। তাহারা সভার প্রতি সেই রূপই অসন্তুষ্ট রহিল। নেপোলিয়ন্ নানা উপায়ে তাহাদিগকে স্ব-বশে আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সময়ে সময়ে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যে তৎসমুদায়ই প্রশমিত হইল। একদা নেপোলিয়ন্ বিদ্রোহ-প্রশমনার্থ অগ্রসর হইতেছেন, সম্মুখে বহু বিপক্ষীয় লোক—এমন সময় একটী স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়নকে উল্লেখ করিয়া সেই লোক-সমিতি-সমক্ষে বলিল—"এই সকল ফুলবাবুকে গ্রাহ্য করিও না, আমরা অন্নাভাবে মরিয়া গেলেও, ইহাদের মনে বিন্দু-মাত্র করুণার সঞ্চার হইবে না,—ইহারা আপনারা খাইবেন ও আপনারাই মোটা হইতে চাহেন।" বোনাপার্টি তৎকালে অতিশয় কৃশ ছিলেন, তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"ভদ্রে! আমার প্রতি চাহিয়া দেখ এবং তুমি ও আমি এই দুই জনের মধ্যে কে মোটা, আমায় বলিয়া দাও।" লোক-সমিতির সকলে এই কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য হাসিয়া তথা হইতে সরিয়া গেল। নেপোলিয়ন্ যাহা করিতে যাইতেছিলেন, বিনা-ব্যয়ে তাহা সমাধা হইল।

এই সময়ে নেপোলিয়নের ভবিষ্য-জীবন-নাটকাভিনয়ের একটী সুন্দর গর্ভাঙ্কের সূত্রপাত হইল। একদা তিনি আপন শিবিরে একটী সামান্য দরবারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময় একটী দশম-বর্ষীয় বালক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকটী দেখিতে অতি সুশ্রী; এবং

তাহার বিনীত ভাবে সকলেরই হৃদয়ে করুণার সঞ্চার করিল। বালক আসিয়া বলিল—"আমি ভাইকাউণ্ট ডি বুহার্ নয়িসের পুত্র, আমার নাম ইয়ু-জিনি বুহার্ নয়িস্। আমার পিতা বিপ্লব-কারী দলের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন; তিনি রাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সন্দেহে পদ-চ্যুত ও অপরাধী হন। বিচারে রবস্পিয়রের হত্যার চারি দিবস পূর্ব্বে নিহত হয়েন। এক্ষণে আমি আমার নিহত পিতার প্রাণ-তুল্য তরবারি খানির প্রার্থনা জন্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।" এই বলিয়া বালকটী নীরব হইয়া রহিল। নেপোলিয়ন্ তাহার মধুর বাক্যে কত দূর প্রীত হইলেন যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না; এবং তাহাকে অতি যত্ন এবং সমধিক মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিয়া তাহার অভীপ্সিত কামনা পূর্ণ করিলেন। বালক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় মাতার নিকটে সমুদায় বিবৃত করিলে, ম্যাডাম্ বুহার্ নয়িসের নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিল।

এই স্থলে ম্যাডাম্ বুহার্ নয়িসের (ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্ঞীর) কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। ইনি সেণ্ট ডোমিঙ্গোর একটী কৃষকের কন্যা। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম মেরি জোসেফ রোজ টাস্চার ডি লা পাগেরি, (Marie Joseph Rose Tascher de la Pagerie); ইঁহার স্বামী সেনাপতি বুহার্ নয়িস্ যৎকালে বিপ্লবের অন্তর্ভূত থাকিয়া সন্দেহ জন্য অপরাধী স্থাব্যস্থ হয়েন, সেই সময়ে ইনিও সেই সন্দেহে দোষী স্বীকৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই স্থানে মাডাম্ টালিয়োনের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা জন্মে। ইহাতে পরে উভয়েই বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন।

ম্যাডাম্ বুহার্ নয়িস্ নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আগমন করিলে, তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি ও মৃদু অথচ সুমিষ্ট কথা নেপোলিয়নের হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়া গেল,—তাহা আর কিছুতেই বিনষ্ট হইল না। বুহার্ নয়িস্ও নেপোলিয়নের প্রতি অতি-মাত্র প্রীত হইলেন; সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই নেপোলিয়ন্ তাঁহার হৃদয়-অধিকারে সমর্থ হইলেন। যৎকালে বোনাপার্টির সহিত বুহার্ নয়িসের প্রণয় সঞ্চার হয়, তখন বুহার্ নয়িস্ তাঁহা অপেক্ষা বয়সে বড়। নেপোলিয়ন্ বলিয়াছিলেন—"যদিও বুহার্ নয়িস্ তাঁহা অপেক্ষা দুই কি তিন বৎসরের বড়, তথাপি তাঁহার মনোহর স্বভাব, যুবতী-জন-সুলভ অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও সুন্দর মূর্ত্তিই তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে।"*

নেপোলিয়ন্ নিজে এক জন ঘোরতর অদৃষ্টবাদী ছিলেন। কোন কার্য্য করিতে হইলে, তিনি তাহা গণনা দ্বারা স্থির না

---

* Bonaparte was then in his twenty sixth year; Josephine gave herself in the marriage contract for twenty eight.—

Life of N. Bonaparte.

করিয়া তাহাতে অগ্রসর হইতেন না।* মেরি জোসেফ্ যৎকালে নিতান্ত বালিকা ছিলেন, সেই সময়ে একটী আফ্রিকা-বাসী যাদুকর তাঁহার সম্বন্ধে যে একটি ভবিষ্যৎ কাহিনী বলিয়া যায়, বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান পান নাই। ঐ যাদুকর বলিয়াছিল, এই বালিকা রাজ্ঞী হইতেও শ্রেষ্ঠ পদে আরূঢ়া হইবেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহা হইতে অধঃপতিত হইবেন (†)। অদৃষ্টবাদী অনেকেই এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি সুন্দর ফলে পরিণত হইতে দেখিয়া অদৃষ্টের উপর, বিশেষ আস্থাবান্ হন। যাহা হউক, নেপোলিয়ন্ বুহার্ নয়িসকে অতি-মাত্র ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার ভাগ্যের সহিত নিজের ভাগ্য জড়িত আছে, সুতরাং তিনি সম্রাট হইবেন—এই উচ্চ আশা তাঁহার মানস-ক্ষেত্রে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া রহিল। বুহার্ নয়িসকে এখন হইতে আমরা জোসেফাইন্ বলিয়া অভিহিত করিব। কারণ, নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার মিলন হওয়া অবধি তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জোসেফাইনের নানাবিধ সদ্গুণ ছিল; তাঁহার বিনীত স্বভাবে তিনি সকলকেই শান্ত ও বশীভূত করিতে পারিতেন; সুতরাং নেপোলিয়ন্ কখন রাগান্বিত হইয়া কোনকার্য্য করিতে উদ্যত হইলে, জোসেফাইন ধীরে ধীরে তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া দিতেন। জোসেফাইনের আর একটী মহৎ গুণ এই, তিনি মানবীয় উন্নতির পরিপোষক ছিলেন ও কোন লোকের প্রতি অযথা ব্যবহার দেখিতে পারিতেন না।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখে নেপোলিয়নের সহিত জোসেফাইনের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরেই তাঁহার যৌতুক-স্বরূপ নেপোলিয়ন্ ইটালীয় সৈন্যের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব-ভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় যাইতে অনুমতি পাইলেন। এই সকল যুদ্ধে নেপোলিয়নের নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই যুদ্ধেই তাঁহার মনোগত উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে আরও উর্দ্ধে লইয়া তুলিল। বিবাহের পরে বোনাপার্টি স্ত্রীর সহিত তিন দিবস-মাত্র অবস্থান করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি স্বীয় পরিবারাদি-দর্শন-মানসে মার্সিলিসে গমন

* A lady of high rank, who happened to live for some time in the same convent at Paris, where Josephine was also a pensioner or boarder, heard her mention the prophecy, and told it herself to the author just about the time of the Italian expedition, when Bonaparte was beginning to attract notice. Another clause is usually added to the prediction—that the party whom it concerned should die in an hospital, which was afterwards explained as referring to Malmaison. This the author did not hear from the same authority. The lady mentioned used to speak in the highest terms of the simple manners and great kindness of Madame Beauharnois.—

Sir Scot's life of Napoleon Bonaparte, Vol. III P. 82.

করেন; এবং তথা হইতে শীঘ্রই ভাগ্য কর্ত্তৃক আহূত হইয়াই যেন তিনি ইটালীয় সৈন্যের অধিনায়কতা করিতে অগ্রসর হইলেন। সেই সময়েই তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য মধ্য-গগনে সমুপস্থিত হইল।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

প্রবেশিকা।—(সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করিবার সোপান) ৺ রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত; ২য় সংস্করণ, সরস্বতী যন্ত্র, মূল্য ॥৵০ আনা। সংস্কৃত ভাষা নিরতিশয় সুমধুর হইয়াও যে রসাল সহকারের ন্যায় চিত্তাকর্ষক নহে, প্রত্যুত নারিকেলের সহিতই সাদৃশ্য হইয়া থাকে, তাহার কারণ উহার দুরবগাহ ব্যাকরণ-শাস্ত্র। নারিকেলের কঠিন আবরণ ভেদ করিলে, যেমন উহার মধ্যগত সুস্বাদু পদার্থ আয়ত্ত করা যায়, তদ্রূপ ব্যাকরণ-রূপ দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ না করিয়া কোনও ক্রমেই সংস্কৃতের রসাস্বাদনে অধিকারী হওয়া যায় না। সেই আবরণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার যিনি সুপথ প্রদর্শন করেন, তিনি আর্য্যজাতির পূজ্য—সুতরাং সংস্কৃত ভাষার পরম বন্ধু। প্রবেশিকার গ্রন্থকার এই শ্রেণীস্থ। পুস্তকের উপকারিতা-সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে—Latinia Principiaর ধরণে ইহা সংরচিত হইয়াছে। ইহার গ্রন্থকর্ত্তা ইংরাজী-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ যখন আমরা এই অদ্ভুত তত্ত্ব অবগত তখন গ্রন্থকারের পরলোক গত আত্মাকেও ধন্যবাদ দিয়া ফেলি। ইনিই বঙ্গ ও সংস্কৃত ভাষার নিরুপম "প্রকৃতিবাদ অভিধান"-কার। এতৎ-সম্বন্ধে অধিক আর বলিবার ইচ্ছা নাই, তবে এই মাত্র বলি যে, এরূপ পুস্তক বিদ্যালয় ও গৃহ-পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী।

বঙ্গবাসী (সংবাদ-পত্র) বঙ্গবাসীতে এমন অনেক লেখা বাহির হইতেছে, যাহা সাময়িক-পত্রের উপযুক্ত। ইহা বঙ্গদেশের একটী সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু সকল লেখকের রচনা পরিমার্জ্জিত বলিতে পারি না। বঙ্গবাসী যেরূপ সুপরিচ্ছদে বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা অতিশয় প্রীতিকর। সুঘটিত কলেবর এবং পরিপাটী মুদ্রাঙ্কণ—অথচ সুলভ মূল্যের একত্র সমাবেশে আমাদের নিতান্ত আহ্লাদ হইয়াছে। এদেশে এরূপ স্বল্প মূল্যের সংবাদ-পত্রিকা স্থায়ী হইলেই, আমরা সুখী হইব।

রাজ-উদাসীন (শাক্যসিংহ ও রামমোহন রায়) শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বীণাযন্ত্র, ।০ আনা। সংস্কারক-প্রমুখ, অদ্বিতীয়

ধর্ম্মবীর, পুরুষসিংহ শাক্যসিংহ এবং ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী বঙ্গের আদি সংস্কারক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে মহান্ মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের মায়া-মোহে জলাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই পুস্তকের তাহারই বর্ণনা পদ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব ও রামমোহন রায় যে সত্য-প্রচারের জন্য দীক্ষিত ভাবিয়া ত্যাগ-স্বীকারের জীবন্ত ও জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই পতিত বাঙ্গালীর না—সমস্ত ভারতীয় জাতির অপূর্ব্ব আদর্শ। ভারতবাসিন্ যদি ভারতকে ভুলিতে চাও—যদি ভারতের হৃদয়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পুরুষ-রত্নের আবির্ভাব দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে এই মহান্ সুচিত্র স্বদেশীয়গণের সমক্ষে ধর।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে বিলক্ষণ কবিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন। তবে যে স্থানে স্থানে ভাবময় কবিতা হয় নাই, সে কেবল উৎকট বিষয়ের অবতারণার কারণ। প্রথম দৃশ্যের ন্যায় দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভে গদ্যে একটী সংক্ষিপ্ত সূচনা সংযোজিত আছে। এখানে গ্রন্থকার বলিতেছেন, তিনি (রামমোহন রায়) "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালী" গ্রন্থ রচনা করাতে "গৃহ হইতে তাড়িত হইলেন।" কিন্তু আমরা বিলক্ষণ জানি—রামমোহন রায় পিতার ও আত্মীয় স্বজনের বিরাগ-ভাজন হইয়া স্বয়ংই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। এতদ্ভিন্ন দুই এক স্থানে এই রূপ আরও কিছু কিছু ঐতিহাসিক ভ্রান্তি আছে। আশা করি, নবীন কবি দ্বিতীয় বারে সেই গুলি সংশোধন করিয়া দিবেন। গভীর নিশীথ ও উষার বর্ণনা বেশ হৃদ্য হইয়াছে।

নীতিপাঠ; শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত *। পণ্ডিত দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ "নীতিসার" রচনা করিয়াছেন এবং Moral Class Book হইতে বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় "নীতিবোধ" অনুবাদ করিয়াছেন। নীতিসারে বালকগণের শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। এক কালে নীতিবোধও বাঙ্গালা-সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। কিন্তু, এক্ষণে "এই নীতিপাঠ" ও "নীতিবোধ" লইয়া তুলনা করিয়া দেখিলে, প্রথমোক্তকে উচ্চ পদবী প্রদান করিতে হয়। কেন না, নীতিবোধের প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণে বৈদেশিক-গণের ক্রিয়া-কলাপ কীর্ত্তিত। এদিকে সমালোচ্য পুস্তকের প্রায় তাবৎ দৃষ্টান্তই ভারতবর্ষ হইতে সমাহৃত। দেশের মহত্ত্ব-উদ্বোধন দেশীয় দৃষ্টান্তে যত দূর ও যত শীঘ্র কার্য্য করিবে, বৈদেশিক দৃষ্টান্তে কার্য্য হইবে বটে,—কিন্তু তত দূর ও তত শীঘ্র হইবার অনেক বাধা। কিন্তু যে সকল চরিত্রের সমাবেশ আমাদের দেশে আদৌ নাই, তাহা অবশ্যই ইউরোপ, আমেরিকা এমন কি, আফ্রিকাতেও পাইলে, লইতে হইবে। অন্যথা জাতীয় অভাব

* হুগলী, বুধোদয় যন্ত্র, মূল্য।০ আনা।

পরিপূরিত হইবে না। বর্ত্তমানকে ভারতে যত উন্নতি হইয়াছিল, এত আর কোন দেশেই হয় নাই; সুতরাং ধর্ম্মবীরের মহত্ব, শৌর্য্যাদির জন্য আমাদের কাহারই মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্বদেশানুরাগের চূড়ান্ত জীবন্ত জলন্ত দৃষ্টান্ত ইউরোপ এবং আমেরিকাতেই সম্ভবে। বর্ত্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকারও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বিদেশ হইতে গৃহীত হউক, ইহাতেও আমাদের স্বদেশানুরাগ পরোক্ষভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে।

এই পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তা কালিদাস ও হলায়ুধে বিদ্যার মাহাত্ম্য, অর্জ্জুনে মনোনিবেশ, গদাধর শিরোমণি ও একলব্যে উদ্যোগিতা, পরীক্ষিতে অবিমৃষ্যকারিতা, মথুরনাথ ও বুনোরমানাথে সন্তোষ, কৃষ্ণপান্তিতে অসাধারণ সত্যবাদিতা, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কালঙ্কারের গম্ভীর অলঙ্কার-নিস্পৃহতা; উড়িয়া বালকের মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, 'সুইলিস'-ভাতৃ-দ্বয়ের ভ্রাতৃস্নেহ, রাজ্ঞী ইলিয়ানের পাতিব্রত্য এবং তৈমুরলঙ্গের অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয় সহজ ও সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, এই জন্যই শিক্ষা-সমিতিকে আমাদের অনুরোধ— এইপ্রকার গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য-রূপে পরিগৃহীত করুন।

THE INDIAN HOMŒOPATHIC REVIEW. Edited by Beharilal Bhaduri, L.M.S. Vol 1. No. 1 & 2. হোমিওপ্যাথিক চর্চ্চার ভূরি প্রচার হইলে, আমরা বুঝিতে পারিব— আমাদের দেশ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার সরকারের জর্ণালই এ পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল। এক্ষণে বিহারী বাবু ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া সুকার্য্যই করিতেছেন, বলিতে হইবে। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখা গুলি সারগর্ভ অথচ সরল ভাষায় লিখিত হইতেছে। আমরা ইচ্ছা করি, এদেশের কবিরাজ ও এলোপ্যাথগণ ঐ বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া দেশের অমঙ্গলে গা ঢালিয়া দিবেন না।

আদর; (প্রিয়তমার প্রতি) শ্রীকল্পনাকান্ত গুহ প্রণীত। আলবার্ট যন্ত্র, ।১০ আনা।

আদরের আর একটুকু; ঐ প্রণীত; বিদ্যারত্ন যন্ত্র, ৵০ আনা।

পুস্তক দুই খানির রচনা সহজ ও মিষ্ট। বর্ণনাও স্থানে স্থানে সুন্দর হইয়াছে। যেরূপ বিষয় লইয়া কাব্য দুই খানি রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন স্থলে তারল্যের হাত এড়ান বঙ্গীয় কবির পক্ষে একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে। বর্ত্তমান পুস্তকা দুই খানিরও ভাগ্য ঐরূপ হইয়াছে। কিন্তু তরল-ভাবপূর্ণ স্থানের অধিকাংশই সুমধুর-পদবিন্যাস ও কবিত্বে পূর্ণ। ভদ্ররুচি রসজ্ঞ লোক এতৎ-পাঠে আনন্দিত হইতে পারিবেন।

উপদেশ শতকম্; শ্রীহরসুন্দর তর্করত্ন-প্রণীতম্ †। সংস্কৃত কবিতা

† তারক বিদির যন্ত্র।

গুলি সুখ-বোধ হইয়াছে; তবে ইহার নূতনত্ব বড় একটা নাই। গ্রন্থারম্ভে তর্করত্ন মহাশয় শেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র চৌধুরীর গুণ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আত্ম-পরিচয়ও দিয়াছেন। হরচন্দ্র বাবু বর্ণিত প্রশংসার পাত্র হইলে, সুখের কথা। এ প্রকার গ্রন্থের পাঠক বঙ্গদেশে দুর্লভ, সুতরাং ইহা অনাবশ্যক।

স্মৃতি-সংহিতা; শ্রীকাশীবর বেদান্ত-বাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদিত ‡ ১—৮ সংখ্যা। দক্ষ স্মৃতি সম্পূর্ণ হইয়া মিতাক্ষরা টীকার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের ২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত শ্রাবণ সংখ্যক আর্য্য-দর্শনে শ্রীযুক্ত হরসুন্দর তর্করত্নের সংহিতা-সমালোচনে মুদ্রাকর-প্রমাদ-বশত বেদান্তবাগীশের স্মৃতি-সংহিতার "৪ র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত" প্রকটিত হইয়াছে, মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই সমালোচন-স্থলে আমাদের একটী বিষয় বলা হয় নাই। বেদান্ত বাগীশের স্মৃতি-সংহিতা বাহির হইবার অনেক পরে তর্করত্নের সংহিতা-গ্রন্থের প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের স্মৃতি-সংহিতা-সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য ছিল, শ্রাবণ সংখ্যক আর্য্যদর্শনে বলা গিয়াছে।

কবিতা-কুসুম, ১ম ভাগ; শ্রীকৈলাস-গোবিন্দ গুপ্ত প্রণীত ††। ইহার কবিতা গুলি মধ্যবিধ, প্রাঞ্জল এবং বালকগণের পাঠের অনুপযুক্ত নহে।

শুভঙ্করী ও প্রমানসাঙ্ক-মূলক আর্য্যা; শ্রীকামিনীকুমার চক্রবর্ত্তি-প্রণীত; ২য় সংস্করণ ভারতমিহির যন্ত্র, ।০ আনা। আজ কাল শুভঙ্করের আর্য্যা বিষয়ক দুই এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হওয়াতে দেশীয় অঙ্ক শিখিবার সুবিধা হইতেছে। শুভঙ্করী অঙ্ক কসিবার প্রণালী-বিষয়-কর্ম্ম ও জমিদারী কার্য্যের সুবিধা-জনক বটে, কিন্তু গুরুমহাশয়দিগের হস্তে তাহার বিকৃতাবস্থা ঘটিয়াছিল। নর্ম্মাল্ বিদ্যা-লয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র-গণের উদ্যোগে সেই জটিল পথ প্রশস্ত হইয়াছে। কমিনী বাবুর গ্রন্থে শৌভঙ্করী আর্য্যার বিশদ ব্যাখ্যানে দেখিয়া হৃষ্ট-চিত্ত হইলাম।

জ্ঞান-প্রবেশ—শ্রীরসিক লাল দাস প্রণীত। হুগলীবুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

এই পুস্তক খানি আমরা আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। ইহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী বিবিধ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নীতি, বিজ্ঞান ও পশ্বাদির বিবরণ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কথোপকথনচ্ছলে ছাত্রদিগকে নানা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। কবিতাকারে বালকগণকে উৎকৃষ্ট নীতি সকল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপত এ পুস্তক-খানি সর্ব্বথা বিদ্যা-লয়ে পাঠনার উপযোগী হইয়াছে।

‡ নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

†† ভারতমিহির যন্ত্র, /০ আনা।

এক্ষণে গ্রন্থকারের অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই আমরা সুখী।

রক্তদন্তা বা আম্মাদ-নগর-পতন; (ঐতিহাসিক দৃশ্য-কাব্য) শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। আলবার্ট প্রেস্. ৷৷০ আনা।

ইতিহাস-পাঠক-মাত্রেরই জানা আছে আকবরের রাজ্য-সময়ে দক্ষিণাপথে অনেক লোমহর্ষণ ভীষণ যুদ্ধ ঘটে। বিজয়নগরের রাজা রামের মৃত্যু হইবার পরবর্ত্তী কাল হইতে রক্তদন্তার সূচনা। আমদনগরের মৃত নিজাম মর্জ্জিজার দুহিতা চাঁদ বিবির (চান্দার) পরাজয় পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়া গ্রন্থের উপসংহার হইয়াছে। মৃত রাম-রাজার ছদ্মবেশিনী বিধবা পত্নীর (সন্ন্যাসিনী রক্তদন্তার) ওজস্বী স্বভাব, সাধারণ-স্ত্রীজন-সুলভ ভীরুতাময় না হইয়া বরং যে উদ্দীপক তেজোময়-ভাব-পরিপূর্ণ ছিল, এই কাব্যে তাহার একটী অতি বিশদ ও সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। এই পুরুষোচিত ওজস্বিতা ও মনস্বিতায় রামরাজ-পত্নীর এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সীমাবদ্ধ প্রসরের মধ্যেও যজ্ঞেশ্বর বাবু আমাদিগের জন্য বীর্য্য-সম্পন্ন, গাম্ভীর্য্য-দ্যোতক যথেষ্ট বীর-ভাব-পরিলিপ্ত গাথা রাখিয়াছেন। যদিও কোথাও কোথাও ছন্দঃপাত-দোষ ঘটিয়াছে, যদিও স্থান বিশেষে বর্ণনা এবং রচনা গাঢ় হইয়াছে, যদিও কল্পনা-জাল সকল স্থানে তত প্রাঞ্জল নহে—তথাপি পুস্তকের অনেক গুণ আছে, স্বীকার করিতে হইবে। সেই গুণ গুলি কি, ইচ্ছা ছিল—যথেষ্ট স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিব, কিন্তু স্থানের অল্পতা হেতু পারিলাম না।

আচাভুয়ার বোম্বাচাক, (প্রহসন) শ্রীহাঁদাপেটা নাদারাম-প্রণীত। সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্র, মূল্য ৷৷০ আনা।

কর্ম্ম-কর্ত্তা, (প্রহসন) বসু যন্ত্র, মূল্য ।০ আনা।

শুষ্ক উপদেশ অনেক সময় দোষ-সংশোধনে ব্যর্থ হয়। তাহার কারণ, উপদেশের অযোগ্যতা নহে—লোকের প্রবৃত্তি। মানুষ সাধারণতঃ বিশুষ্ক উপদেশ চায় না। ভারতের যে দিন এক সময়ে ছিল, যখন ভারতীয় মানব কেবল নীরস উপদেশের বশবর্ত্তী হইতেন। সংস্কৃত প্রহসন ও "হিতোপদেশের" সময়ে উপদেশ বিশুষ্ক বলিয়া প্রতীত হয়। বিষ্ণুশর্ম্মা তজ্জন্য

> "যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ
> সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
> কথাচ্ছলেন বালানাং
> নীতিস্তদিহ কথ্যতে ॥"

বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন। যে ব্যক্তি নীরস উপদেশের অনুগত, তিনি কার্য্য ও প্রকৃতিতঃ ইংরেজ। যিনি প্রচ্ছন্নচ্ছলে উপদেশ শিখাইয়া দিলে, শুনিতে আপত্তি করেন না, তিনি ম্লেচ্ছ। বলিতে কি, এক্ষণে আমরা কার্য্যে ম্লেচ্ছ। এই জন্যেই বক্তৃতা, নবন্যাস, নাটকাদির ন্যায় প্রহসনের সৃষ্টি। কিন্তু সমাজের সামান্য

ত্রুটি বা সামান্য অভাব যে প্রহসনে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান—তাহার নৈতিক ফল কদাপি সাধু নহে।

বক্ষ্যমাণ প্রহসন-দ্বয়ে বর্ত্তমান-কালিক অসামাজিকতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ আছে। "আচাভূয়ায়"অধুনা-প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতে আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। প্রহসন-কার পাত্র-বিশেষের মুখ দিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা-সম্বন্ধে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের উপরে যে দোষ-ভার চাপাইয়াছেন, আমাদের মতে তাহার কোন মূল নাই। কোন কোন ঈর্ষান্বিত অদূরদর্শী ব্যক্তির মুখে এত দিন যাহা শুনিয়া আসিতেছিলাম, কেশব বাবুর মস্তকে গুরুতম সেই দোষারোপ দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। কেশব বাবুর আর যে দোষ থাকুক, এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা যত দূর, তাহাতে তিনি" নির্দ্দোষ। প্রহসনের চিত্র নাকি যথাযথ ও নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক, তাই আমরা এই কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। ইহার মধ্যে হাস্যরস ও আমোদ আহ্লাদের ভাণ্ডার ছবি অনেক। এবং অন্যান্য যে' যে চিত্রের ছায়াপাত করা হইয়াছে, তৎসমস্তই প্রকৃত।

'কর্ম্মকর্ত্তী' দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রহসন। ইহাতে একটী বিষয়েরই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থ নাই, অথচ ঋণ করিয়া বাহিরে জাঁকজমক দেখাইব,এক শ্রেণীর লোকের রোগ। সেই 'বিষয় অত্যুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত আছে। আলেখ্যে দুই একটী অস্বাভাবিক ঘটনা না থাকিলে, ইহা অত্যুত্তম হইত।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ; *শ্রীচিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্র, মূল্য ৸০ আনা।

শব্দতত্ত্ব-কৌমুদী; (বামন-সম্মত বাঙ্গলা ব্যাকরণ); শ্রীজয়গোপাল গোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রণীত ষ্ট্যানহোপ প্রেস্, মূল্য ৸০ আনা।

দুই খানিই যত্নের সহিত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। এক্ষণে তুলনা করিয়া তারতম্য বুঝাইব। চিন্তামণি বাবু স্ব-গ্রন্থকে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ-পদ-বাচ্য করিবার জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং অনেক নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন। বলা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে তিনি অনেক পরিমাণে কৃত-কার্য্যতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। ইহাতে ঔপমিক ভাষাতত্ত্ব-সাহায্যে হৃদয় হইতে হিয়া, গ্রন্থ হইতে গাঁথ প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তির বিবরণ দৃষ্ট হইল।

* বাক্য-বিশ্লেষণ (Analysis of sentence) প্রকরণটী ও ইহাতে নূতন নিবেশিত হওয়ায়,ভালই হইয়াছে।

* সংস্কৃত ভাষার অদ্বিতীয় 'পাণিনি ব্যাকরণের' সূত্র-ভাগ পাণিনি-মুনি-রচিত। কাত্যায়ন তাহার উপর বৃত্তি রচনা করিয়া সূত্রাংশের যাহা অসম্পূর্ণতা ছিল, নিরাকরণ করেন। তাঁহার আবার যে ত্রুটি রহিল,পতঞ্জলির মহাভাষ্যে তাহার

পূরণ হইল। কিন্তু এই ভাষ্যের পরেও ন্যূনতা থাকায় কৈয়টাচার্য্য আবার যখন টীকা লিখিলেন, তখনও অভাব। সুতরাং বিবরণকার প্রভৃতির উদ্যোগ আরম্ভ হইল। এই সময়েই আচার্য্য বাম্মিন টিপ্পনী দ্বারা পাণিনীয় ষড়ধ্যায়ী সূত্রের যথাযোগ্য ব্যাখ্যান নির্ম্মাণ করেন। পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামীর বঙ্গীয় ব্যাকরণ বঙ্গ-ভাষার পক্ষে কতক অংশে ক্রমোন্নতিতে পাণিনির অনুরূপ বলিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গলা অদ্যাপি সজীব অবস্থায় চলিতেছেন, সুতরাং ইহাকে কখনই সংস্কৃতের তুলাদণ্ডের পরিমিত করা সম্ভব নহে। এই ব্যাকরণে অনেক প্রয়োজনীয় নূতন কথা দেখা গেল। ইহার ভিতরে কয়েকটী এমত মত অন্তর্নিবিষ্ট, যাহা কোন মতেই অনুমোদনীয় নহে—প্রত্যুত আপত্তি-যোগ্য। যথা—'বঙ্গভাষায় ক্লীব লিঙ্গের প্রবেশাধিকার দান' 'বর্ণের উচ্চারণ-স্থানের বিবরণ।' আর আমাদের মতে সন্ধি-প্রকরণ প্রথমে না বলিয়া তদ্ধিতের পূর্ব্বে স্থাপিত করিলেই চলিত। এই কয়েকটী অপূর্ণতা ও ভ্রম বাদ দিলে, স্বীকার করিতে হইবে, শব্দতত্ত্ব-কৌমুদী অত্যুত্তম ব্যাকরণ। আর এক কথা—উভয় ব্যাকরণের কয়েকটী এমন সাধারণ মত আছে, যাহা হইতে উভয়েই বঞ্চিত। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থ দুই খানির স্বতন্ত্র সেই কয়েকটী ধর্ম্মই উভয়ের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জয়গোপাল বাবুর শব্দতত্ত্ব-কৌমুদীতে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা-বৈয়াকরণিক অংশের অধিক পরিমাণে যোগ না থাকিলে, উহা কখনই অধুনাতন-কালীয় প্রধানতম বঙ্গীয় শব্দ-ব্যুৎপাদক-শাস্ত্রের শীর্ষ-স্থানীয় হইবে না।

আনন্দরহো; (নাটক) শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।*

গিরিশ বাবু নেশনাল্ থিয়েটারের এক অতি উৎকৃষ্ট অভিনেতা। তাঁহার এই আনন্দরহো অভিনয়ে কি দাঁড়াইয়াছে, জানি না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, এই নাটকে ইতিহাস পদ-দলিত হইয়াছে। "অশ্রুমতী" উত্তম নাটক হইলেও, এই জন্য আমাদের চক্ষে তত আদরের নহে। রাণা প্রতাপ সিংহের নিষ্কলঙ্ক কুলে অশ্রুমতী কালী দিয়াছে। রাণা প্রতাপের কন্যা ম্লেচ্ছ সেলিমকে কখনই আদর করিতে পারে না—ইহা রাজপুত-বীর্য্যের পরিণাম নহে। সেই জন্যই এ চিত্র যার পর নাই অস্বাভাবিক। ভারতীয় মোগল-সম্রাট্-কুল-ভূষণ আকবরের চরিত্র কল্পনার বর্ণে অনুরঞ্জিত দেখিলে, গ্রন্থকারের উপরে বিজাতীয় বিরাগ জন্মে। ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্য-কাব্য লিখিতে বসিয়া ইতিহাসের অবমাননা? গ্রন্থকার জানিবেন—আকবর কেবল মোগল-সম্রাট্-কুল-তিলক নহেন, তিনি অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র হইতেও উদারতা-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। রামচন্দ্র

* টাউন যন্ত্র, মূল্য ১৲ টাকা।

হিন্দু বিশেষত ব্রাহ্মণ-গণের প্রতি একরূপ অবিচলিত প্রেমই দেখাইয়াছেন—শূদ্র তপস্বীর অকাতরে শিরশ্ছেদন করিয়াছেন। এদিকে যে আকবর হিন্দু-মুসলমান-অভেদে বিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত করেন, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে নিজ রাজ্যের উচ্চ কর্ম্মচারীর পদবী পর্য্যন্ত প্রদান করেন—সামাজিকতায় অতি উচ্চ ও বহুমূল্য মত দিয়া যান—হিন্দু-বিধবা-গণের পুনর্ব্বিবাহের অনুমোদন করেন—কোরাণকে ঈশ্বর-প্রদত্ত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া না মানিয়া উপনিষৎ প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্রীয় মর্ম্ম গ্রহণ করেন, সেই আকবর এক জন অর্থ-গৃধ্নু, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন।

আবার মানসিংহের কন্যার (লহনার) চরিত্রের চিত্রিতাংশ কি জঘন্য! সম্রাট, যুবরাজ সেলিম হইতে সামান্য রাজ-কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। এবং সেও সকলের মন রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।—এ নাটককে বিয়োগান্ত (Tragedy), মিলনান্ত (Comedy) অথবা বিয়োগ-মিলনান্ত (Tragi comedy) কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। এতদ্ভিন্ন ইহার সর্ব্ব প্রধান দোষ—নাটকীয় ভাগের অসম্পূর্ণতা। অদ্ভুত জীব মানন্দোরহোও উদ্দেশ্য-বিহীন নর-পশু।

সীতার বনবাস; (পৌরাণিক-ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্য-কাব্য) ঐ প্রণীত। মেট্রোপলিটান্ প্রেস্, মূল্য ১ টাকা।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন; ঐ; মূল্য ।০ আনা।

সীতার বনবাস নামক নাটক খানি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। এবং পাঠ করিয়া আনন্দও অনুভব করিতে পারিয়াছি। সাধারণ লোকে প্রথম দৃশ্যে হয়ত ইহার ছন্দ দেখিয়া ও সামান্যাকারে পাঠ করিয়া পাঁচালী বলিয়া ভাবিবেন, কিন্তু অভিনয়ের জন্য এই ছন্দ শ্রুতি-সুখকর। পাঠক ইহার মধ্যে হৃদয়-দ্রাবক অনেক কথা—অনেক ভাব—অনেক চিন্তা পাইবেন। ইহার এক এক স্থল এত নবনীত-সুকোমল যে, কুসুম-সুকুমার মৃদু-প্রকৃতি বাঙ্গালী-হৃদয় তাহাতে গলিয়া যায়। লব ও কুশের উক্তিতে এই কোমলতা। ভারতের উদাত্ত গভীর ভাবের কবি ভবভূতির উত্তর-রাম-চরিতই পাঠ করি, মাইকেলের মেঘনাদবধই পাঠ করি—কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বঙ্গীয় পদ্য রামায়ণই বা পাঠ করি—বিদ্যাসাগরের অনুবাদিত সীতার বনবাসই পাঠ করি, আর গিরিশ বাবুর এই সীতার বনবাস দৃশ্যকাব্যই পাঠ করি—প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতি ভাবোন্মত্তায় আদি-কবি কবিগুরু বাল্মিকীকে মনে পড়ে। যে ভারত-বাসী মহাকবি বাল্মিকীর করুণ-রস-ভূয়িষ্ট রামায়ণ অভিনিবেশের সহিত না দেখিয়াছে, সেই বলে, বিয়োগান্ত কাব্যের প্রথা ও তদ্বিষয়ক অনুকৃতি গ্রীক্ জাতি ও গ্রীস দেশ হইতে ভারতে সমানীত হইয়াছে।

আজ যে বঙ্গ-সমাজ এরূপ করুণ-রস-প্রবাহী গাথা গাইতেছে, সে কেবল কবি

গুরুর প্রসাদে। কিন্তু গিরিশ বাবু স্থলান্তরে মূল বাল্মিকী বা ভবভূতির মতানুসারী না হইয়া কৃত্তিবাসের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। ইহাতে সীতার চিত্র তত গাম্ভীর্য্যময় হয় নাই। আত্মারাম, ভূমি-লিখিত দশাননমূর্ত্তি দেখিবামাত্র আত্ম-গত হইয়া "কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী!" বলিয়া উঠিলেন!—সীতাময়-জীবিত, সীতাপ্রেম-মুগ্ধ,উচ্চ-প্রকৃতিক রামচন্দ্রের এই স্বগত উক্তি প্রাকৃত-জনোচিত। শত্রুঘ্নও লব প্রভৃতির উক্তি-বিশেষ স্বগত ও জনান্তিকে হওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

লক্ষণবর্জ্জনে মাতাইবার বড় একটা কিছু নাই। তবে চুট্‌কি ধরণের ছন্দ ও গিরিশ বাবুর অনন্য-সাধারণ সহজ কথায় গাঁথা কবিত্বের ক্ষমতা ইহাতে দেখা যায়।

১। রাজপুর বান্ধব পুস্তকালয়ের চতুর্থ সাংবৎসরিক বিবরণ, ১২৮৭ সাল।

২। যোড়াসাঁকো লাইব্রেরির নিয়মাবলি ও গ্রন্থ-নির্ণয়,১২৮৭।

এই দুইটী পুস্তকালয়েরই শৃঙ্খলা সন্তোষ-জনক। যোড়াসাঁকোর পুস্তকালয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। বান্ধব পুস্তকালয়ও তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। বহুবাজারে ৺অক্রূর দত্তের বাটীতে "সাবিত্রী লাইব্রেরি" দ্বারা বঙ্গ-ভাষার অনেক উন্নতি হইতেছে। "সাবিত্রী লাইব্রেরীর" উদ্যোগ-কর্ত্তা যুবক-মণ্ডলীর উৎসাহ,সৎ সাহস প্রশংসনীয়। যোড়াসাঁকো-অঞ্চলে এই পুস্তকালয়ও অনেক কর্ম্ম করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও করুক—এই আমাদের ইচ্ছা। ইয়োরোপ ও আমেরিকার পুস্তকালয় প্রত্যেক গ্রন্থকার-প্রণীত একাধিক গ্রন্থ খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থকার-কুলের সাহায্য করেন। বাঙ্গালা দেশের পুস্তকালয়ও সেই কার্য্যে ব্রতী থাকুক। মফঃস্বল ও কলিকাতায় এইরূপ পুস্তকালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া স্থায়ী না হইলে, বাঙ্গালা দেশ ও ভাষায় উন্নতি বিলম্বিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু যে পুস্তকালয় ভিক্ষা-প্রার্থী, তাহা আমাদের উপেক্ষার বস্তু।

Calcutta Journal of Medicine, Vol. X. No. 2. Edited by Mahendra Lal Sircar M. D. বঙ্গীয় চিকিৎসক-দলের মধ্যে ডাক্তার সরকারই প্রকৃত প্রস্তাবে বদ্ধ-পরিকর। তিনি চিকিৎসিত রোগীদিগের রোগোপশম, রোগীর পীড়া-কালের বিশদ বর্ণনা,ঔষধ-প্রয়োগ, চিকিৎসকের কৃতকার্য্যতা বা অকৃতকার্য্যতার মন্তব্যাদি দিয়া স্বীয় জর্নালের উপদেয়তা বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথি উভয় প্রণালীরই সম্মাননা করিতেছেন। আমাদের বৈদ্য মহাশয়েরা কি করিতেছেন? তাঁহারা ডাক্তার সরকারের সহিত যোগদান করুন, অথবা যদি আপত্তি থাকে বা সুবিধা না হয়, স্বতন্ত্র

---

† ৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।

ভাবে মহেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত পথের অনুসারী হউন। ধন্বন্তরি, চরক, সুশ্রুতাদির কালের ন্যায় আজও ভারতের অরণ্যে বিস্তর বনৌষধি—ধাতুর খনি-প্রদেশে ধাতু—বৃক্ষ-রাজির ভূরি পরিমাণ ত্বক, ফল, মূল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবে কেন আর্য্য-চিকিৎসার উৎকর্ষ বর্দ্ধিত হইবে না? কেন বৈদ্যিক তত্ত্ব আমূল পরীক্ষিত সত্য-রূপে ভারতে পরিগৃহীত হইতেছে না?

মহেন্দ্র বাবুকে আমাদের তিনটী অনুরোধ। (১) তিনি চরকের প্রচারণে মনোযোগী হউন, (২) ভারতে হোমিওপ্যাথি-প্রচারের ইতিবৃত্তটী (৩) হানিমানের জীবনবৃত্ত—জর্নালে প্রকাশ করুন।

তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকা যে নিতান্ত সমদর্শী ভাবে চালিত হইতেছে, তাহার আর সংশয় নাই। তিনি হোমিওপ্যাথি-কেই সর্ব্বেসর্ব্বা বলেন না। তবে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত 'চিকিৎসা-শাস্ত্রের দৌড় যত দূর গিয়াছে, তাহাতে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, হোমিওপ্যাথি অনেক পরিমাণে অতি নিশ্চিত-ফল-প্রসূ এবং পরীক্ষিত সত্যের জনক।

দুই ভগ্নী। (উপন্যাস) শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়-প্রণীত, মেট্রোপলিটন্ প্রেস্, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তকের নায়ক যোগেন্দ্র এবং বিনোদিনী নায়িকা। কমলিনী নামে বিনোদিনীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিল। কমলিনী বাল-বিধবা এবং স্বীয় ভগ্নী-পতি যোগেন্দ্রনাথের প্রণয়-ভিখারিণী। যোগেন্দ্র অধ্যয়নোপলক্ষে কলিকতায় থাকিতেন। কমলিনী কৌশল উদ্ভাবন করিয়া প্রিয়তমা কনিষ্ঠা ভগিনী বিনোদিনী ও যোগেন্দ্রের মধ্যে মনোবাদ বাধাইয়া দেন। শেষে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে স্বাভিলাষে অপূর্ণ-মনোরথ হইলেন। সামাজিক কুরীতি বঙ্গ-সমাজের বক্ষে কি ভীষণ পদাঘাত করিতেছে! বিধবারা বিবাহার্থিনী—কিন্তু কঠোর সমাজ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাতে ফল কি হয়?—বিষপান—আত্মহত্যা।

দামোদর বাবুর এই আখ্যানের ঘটনা-যোজনা মনোরম হইয়াছে। এবং ইহা অধ্যয়ন করিয়া অনুপম আনন্দ পাইয়াছি।

সরলা; শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-রচিত, ক্যানিং প্রেস্, ৵০ আনা। বাল্য ও বিধবা বিবাহের দোষোৎ-কীর্ত্তন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিরও উদ্দেশ্য। ইহার উপাখ্যান, পাত্র-সংযোজনে কতক পারিপাট্য আছে। ইহাকে নবন্যাস (Novel) বলিতে পারি না। তবে আখ্যায়িকা (Romance) বলিবার কোন বাধা নাই। পুস্তিকা খানি মন্দ হয় না।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ; (গীতাভিনয়) শ্রীমতিলাল রায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও শ্রীশ্রীরাম ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, মূল্য ১।০ টাকা। আমরা শুনিয়াছি, কিছুদিন পূর্ব্বে মতিলাল বাবু শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শুনা কথায় বিশ্বাস অল্পই হয়, অথবা নাই বলিলেও চলে। তবে তিনি যে

শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁহার ভাষায় তাহার প্রমাণ আছে। তদ্রচিত গান সকল সুশ্রাব্য ও অনায়াস-গেয়। কিন্তু তিনি পুস্তক-মধ্যে কি জন্য গীতিকাবলির রাগ-রাগিণী ও তাল-মানের সন্নিবেশন করেন নাই, বুঝা গেল না। বোধ করি, তাঁহার গান অধুনাতন নাট্যশালার গীতিকার ন্যায় "রাখালে গান" হইয়া যাইবে—যে সে গাইবে—এই জন্য ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। আমাদের মতে পাত্র-বিশেষের কথা-বার্ত্তার ভাব ও ভাষা প্রাঞ্জলতর হইলে, সমধিক আকর্ষক হইত। মতি বাবুর উদ্যম ধন্য-বাদ-যোগ্য।

কল্পনা; (সমালোচিনী মাসিক পত্রিকা) শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, ক্যানিং প্রেস্। ইহার প্রকাশক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক জন নাম-মাত্র প্রকাশক নহেন। তিনি প্রায়ই প্রস্তাব লিখিয়া কল্পনার আহার সংস্থান করিয়া থাকেন। 'আর্য্যদর্শনে' পূর্ণ বাবু বঙ্কিম বাবুর সুন্দরীগণকে যে ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন—তাহা "বাঙ্গলা ভাষায় নূতন সৃষ্টি।" তিনি স্ত্রী-চরিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা চিত্রের উত্তম ভাস্বরতা দেখাইয়াছেন। "কল্পনায়" যোগেন্দ্র বাবু বঙ্কিম বাবুর পুরুষ-চিত্রের মধ্যে "চন্দ্রশেখরের" প্রতাপ-চরিত্রের বিস্তারিত সমালোচন আরম্ভ করিয়াছেন। সম্পাদকও গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনা দিয়া পত্রিকা চালাইতেছেন। কোন কোন প্রস্তাবের আদৌ গভীরতা দেখা যায় না, অবশিষ্ট গুলি প্রীতিপ্রদ। কল্পনার এক্ষণে বয়ঃক্রম দ্বিতীয় বর্ষ।

আগমনী* (গীতিকা); বিজয়া* (গীতিকা) শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। সংগীত গুলি মধ্যম রকমের। কিন্তু পুস্তিকা দুইটীর আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র আকৃতির না করিয়া ৩।৪ খানি একত্র করিয়া এক খান প্রস্তুত করিলে, গ্রন্থকার ও পাঠক উভয়ের সুবিধা হয়।

যাবনিক পরাক্রম (উপন্যাস) শ্রীনীলরতন রায়চৌধুরী‡ মূল্য ১০ আনা। ইহার ভাষা গদ্য-কাব্যেই শোভা পায়। রচনা আদ্যোপান্ত জটিল না হইলেও, একইবিধ, উৎকট এবং প্রগাঢ়। নায়ক-নায়িকার সম্মিলন করিয়া দেওয়া উপ-ন্যাসের উদ্দেশ্য। ইহারও উপসংহৃতি তদ্রূপ। তবে ঘটনাবলি প্রচলিত প্রণালী হইতে কিছু বিভিন্ন। গ্রন্থকার যুদ্ধে জয়ী করিয়া নায়ককে প্রণয়িনী মিলাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার রুচি মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ। উপন্যাসাংশে ইহার মাধুরী অতি অল্প।

প্রায়শ্চিত্ত, শ্রীহরিদাস বন্দ্যো পাধ্যায় প্রণীত ক্যানিং প্রেস, ।৵০ আনা। বিদেশাগত, সৎ-স্বভাব, বুদ্ধিমান্ যুবকও কুসংসর্গ, নাট্যশালা ও বেশ্যামদ্যে কি

* ইণ্ডিয়ান্ ট্রেডস্ এসোসিয়েশন্, প্রত্যেকের মূল্য /০ আনা। ‡ মেট্রোপলিটান যন্ত্র।

রূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়—'প্রায়শ্চিত্তে' তাহার প্রতিফলন দেখা যায়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাম দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম বুঝি, ইহা কোন দোষ-গুণের বিধান-গ্রন্থ। গ্রন্থকার নায়ক বা নায়িকা কিংবা উভয় নায়ক-নায়িকা-মিশ্রিত নামে পুস্তকের আখ্যা প্রদান না করায় পাঠকগণের মনোযোগাকর্ষণের এক মন্দ ফন্দিবাহির করেন নাই। প্রায়শ্চিত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মনোরম উপন্যাস।

মায়াবতী (অপেরা); শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত কবপ্রেস, ৷৴৹। কালকেতু ও তাহার সাধ্বী পত্নী ফুল্লরার প্রতি দেবী ভগবতীর অনুগ্রহ বৃত্তান্ত মায়াবতীর বর্ণনার বিষয় ইহার গীত গুলি সুচারু। মায়াবতী অভিনয়-যোগ্য, তাহাব কোন সন্দেহ নাই।

অদৃষ্ট-বিজয় (মহাকাব্য); শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ-প্রণীত, বসু প্রেস, ১৷৹ টাকা। মিত্রাক্ষর ছন্দে হরিমোহন বাবু যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই গ্রন্থ রচনা করায় তাঁহার ক্রমোন্নতি-স্পৃহতার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। কৃতকার্য্য হইয়াও ক্রমাগত একবিধ চেষ্টাতেই যে মানব, জীবন পর্য্যবসিত করেন, সে জীবন স্বল্প মূল্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে হরিমোহন বাবুর কবিতা স্থল-বিশেষে ভ্রম-প্রসূত সুতরাং জটিল হইয়াছে বটে, তথাপি সাধারণত তাঁহার কল্পনা তেজস্বিনী এবং নব-ভাব-মাধুরীতে পরিপূর্ণ।

১। গোবিন্দ-গীতিকা (তত্ত্ব-সঙ্গীত);

২। শারদোৎসব (গীতি-নাট্য)

নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন-প্রণীত, ষ্ট্যানহোপ প্রেসে মুদ্রিত। গ্রন্থ দুই খানিতে মূল্যের উল্লেখ নাই। বোধ হয়, বিক্রয়ার্থ ইহা প্রস্তুত নাই। গোবিন্দ-গীতিকার প্রথম অধ্যায়ের উপক্রমণিকাভাগে সঙ্গীতের একটী সূচনা-প্রকরণ দেওয়া হইয়াছে। গীত গুলিন উত্তম তান-লয়-বিশুদ্ধ। সাত্ত্বিক-ভাবোদ্দীপক শারদোৎসব নাট্যালয়ের আদিরস ও অশ্লীল-ভাবপূর্ণ অনেক নাট্যগীতিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জমীদার-বৃন্দের এরূপ বিদ্যোৎসাহিতা দেখিলে, বঙ্গ-জননীর প্রাণে জীবন সঞ্চার হইতেছে, এই আশ্বাস হয়। বিলাসিতার ক্রোড়ে বঙ্গের যে ভূমাধিকারী সুষুপ্ত না হইয়া, এই প্রকারের নিজ জীবনে সজীব বিদ্যার্থীর ভাব প্রদর্শন করেন, তিনি স্ব-শ্রেণীর আদর্শ পুরুষ।

আমাদের অভাব।*

ভ্রাতৃগণ, আমি অনুরুদ্ধ হইয়া এই আসন পরিগ্রহ করাতে আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছি। কিন্তু এই আসন পরিগ্রহ করিয়া সদালাপে যে আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব, এমত শক্তি আমার নাই। শুদ্ধ কতিপয় বন্ধুর অনুরোধ-রক্ষার্থ আমি আপনাদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান। কোন সামাজিক বিষয় লইয়া আপনাদিগের সহিত সদালাপ করা আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে যে অল্প কাল অবসর পাইয়াছি, তাহাতে যে আমার এই প্রস্তাব অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ভ্রাতৃগণ, আমরা বৎসরের মধ্যে একবার কি দুইবার কখন এইরূপ প্রকাশ্য সভায় একত্রে মিলিত হই। কিন্তু আমাদিগের এক্ষণে যেরূপ হীন অবস্থা তাহাতে এরূপ নিস্তব্ধ ও শান্ত ভাব অবলম্বন করা আমাদিগের পক্ষে শোভা পায় না। মনে করুন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কি ছিলেন, এক্ষণে আমরা কি হইয়াছি। আমরা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছে। এক্ষণে সেই পূর্ব্বপুরুষগণের কোন ধর্ম্মই আমাদিগের শরীরে নাই। একে একে আমরা তাহাদিগের সকল মহৎগুণই হারাইয়াছি। আমরা যে দিকে চাই, সেই দিকেই আমাদিগের সহস্র সহস্র অভাব দেখিতে পাই। অথচ এত অসংখ্য অভাব মধ্যে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। কি জন্য বসিয়া আছি?—আমাদিগের এই সমস্ত অভাবের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই। আমরা যতদিন না এই সমস্ত অভাব প্রকৃত পক্ষে উপলব্ধি করিতে পারিব, যতদিন না এই সমস্ত অভাব প্রকৃতপক্ষে অভাব বলিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আঘাত করিতে থাকিবে, ততদিন আমাদিগের এই নিশ্চেষ্ট জড়ভাব অপনীত হইবে না। এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, এই অভাবনিচয় আমরা সর্ব্বদা আলোচনা করি। আমাদিগের কর্ত্তব্য, এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ্য সভায় সর্ব্বদা মিলিত হইয়া আপনাদিগের হীনাবস্থা সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করি, সেই অবস্থা হইতে উন্নতি-সাধনের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করি, জাতীয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হই, এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই। পৃথিবীর আর কোন জাতি, এরূপ হীনাবস্থায়,

* কলিকাতা বহুবাজারস্থ সাবিত্রীলাইব্রেরীর তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সভাস্থলে বিগত ১৮ই বৈশাখে (১২৮৯) এই প্রবন্ধটী পঠিত হয়।

আমাদিগের মত নিশ্চিন্ত ও নিরীহ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিত না। আমরা নিতান্ত অসার বলিয়াই এইরূপ জড়ভাব অবলম্বন করিয়া আছি।

আমাদিগের অভাব যে কতপ্রকার, ও কত সহস্র, তাহা আপনারা একটু পর্য্যালোচনা করিলেই মনে মনে বুঝিতে পারিবেন। আমি সে সমস্ত অভাব বলিতে আসি নাই। তন্মধ্যে গুটিকত প্রধান অভাব লইয়া অদ্য আপনাদিগের সহিত পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই অভাবকে আমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভাব। আমি এ প্রস্তাবে শুদ্ধ রাজনৈতিক অভাব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভাব এত অধিক যে, এখানে তাহা পর্য্যালোচিত হইতে পারে না।

আমাদিগের রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, আমরা একটী অধীন জাতি। আমরা এক্ষণে বৈদেশিক ইংরাজগণের প্রভুত্বে বাস করিতেছি। আমরা এক্ষণে এই রাজনৈতিক অধীনতায় অসুখী নহি। বরং আমরা এই অধীনতায় অবস্থিত বলিয়া আমাদিগের সৌভাগ্য জ্ঞান করিব। আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন, এই অবস্থায় আসিবার পূর্ব্বে আমাদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কতদূর হীন ও জঘন্য ছিল। ইংরাজগণ আমাদিগকে সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; আমাদিগকে মুসলমানগণের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়াছেন; মুসলমানরাজ্যের অরাজকতা ও যথেচ্ছাচারিতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তখন আমরা নিতান্ত নির্জ্জীব ও অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদিগের ব্রাহ্মণীয় সভ্যতার সমস্ত বল ব্যয়িত হইয়াছিল। সে সভ্যতার আর উন্নতি-সাধিনী শক্তি ছিল না। সে সভ্যতা একদা উন্নত হইয়া কিছুকাল বৈদ্যুতিক প্রভায় প্রভাসিত হইয়া, বহুকাল পূর্ব্বে একেবারে নিবিয়া গিয়াছিল। তাহার সমস্ত তেজ ব্রাহ্মণজাতি আপনাদিগের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সেই তেজঃপ্রভাবে অপর সর্ব্বজাতি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল। এদিকে মুসলমান দিগের শাসনদণ্ড ও নিপীড়ন সমস্ত ভারতবাসিগণকে উত্ত্যক্ত ও পদ-দলিত করিয়া রাখিয়াছিল। চারিদিকেই অন্ধকার,—অজ্ঞানতার অন্ধকার,—অরাজকতার অন্ধকার,—পীড়নের অন্ধকার ও নৈরাশ্য। মুসলমানগণ নিতান্ত অপদার্থ ও অসার হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাদিগের নিকট আমাদিগের কিছুই শিক্ষণীয় ছিল না। তাঁহারা বরং আমাদিগের প্রভাবে নীয়মান হইয়া আমাদিগেরই মত হীন ও অবজ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন সমস্ত ভারতবর্ষে কেবল অরাজকতা, লুণ্ঠন,

অত্যাচার,ডাকাইতি প্রভৃতি অপ্রতিহত প্রভাবে বিস্তারিত ছিল, যখন সমস্ত ভারতবাসিগণ নির্জ্জীব, নিঃসহায় ও নিপীড়নে উত্ত্যক্ত, এবং জ্বালাতন হইয়া আছেন, যখন সমস্ত ভারতবাসিগণ অহরহঃ কেবল অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, কেবল দৈবসহায় খুঁজিতেছেন, দেবতাগণকে দিনরাত্রি ডাকিতেছেন, সেই অন্ধতম সময়ে, সেই ঘোর নৈরাশ্যের সময়ে দেবতাগণ তাঁহাদিগের ক্রন্দন শুনিলেন, তাঁহাদিগের সহায় ও অবলম্বন পাঠাইয়া দিলেন। ভারতের এককোণ হইতে ইংরাজগণের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। ভারতের এককোণে অরুণের আলোক জ্বলিল, সুখ-সূর্য্যের প্রভাত হইল। যেমন ঘোর অন্ধকার মধ্যে একটু আলোক দেখিলে সমস্ত পতঙ্গ-প্রবাহ সেই দিকে ধাবিত হয়, নিরাশ ভারতবাসিগণও তদ্রূপ এই আলোক-দিকে ধাবিত হইলেন। সকলেই ইংরাজগণকে অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ইংরাজগণও ছল পাইয়া এবং ছিদ্র খুঁজিয়া কৌশল ক্রমে ভারতের অধীশ্বর হইতে লাগিলেন। এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্য তাঁহাদিগের করতলস্থ হইল। এক্ষণে তাঁহারা ভারতের একাধীশ্বর। ভারতের মঙ্গলের জন্য, ভারতের উদ্ধারের জন্য, ইংরাজগণের অভ্যুদয় ও রাজত্ব পরিস্থাপিত হইয়াছে।*

আমরাই ইংরাজগণের অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ। পলাশীর যুদ্ধ-বিজয়ই ইংরাজ রাজত্বের মূল-ভিত্তি। আমরাই মুসলমানগণ হইতে নিস্তার পাইবার

---

* Vide "Speeches of Babu Surendra Nauth Banerjea." *On England & India.*

* ইংরাজগণ যে এই উদ্দেশ্যে ভারত বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, একথা বলা আমার অভিপ্রায় নহে। তাঁহাদিগের অভিসন্ধি যাহাই থাকুক, তাঁহাদিগের ভারত-বিজয়ে ভারতবাসিগণের কি লাভ হইয়াছিল, এস্থলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে ইংরাজ রাজত্বের সহিত মুসলমান রাজত্বের তুলনা করাও আমার অভিপ্রায় নহে। তবে মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে ভারতের চারিদিকের সাধারণ অবস্থা কেমন হীন ছিল, মুসলমান গবর্ণমেণ্টের শাসন-রজ্জু শিথিল হওয়াতে চারিদিকে কেমন অরাজকতা, লুণ্ঠন ও অত্যাচার হইতেছিল, তাহাই মাত্র বলা আমার অভিপ্রায়। বাস্তবিক আরঙ্গিব রাজত্বের শেষকাল হইতে ইংরাজগণের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত, ভারতময় অরাজকতায় পূর্ণ হইয়াছিল কি না, তাহা নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় পর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারা যায়।

১। এ সময়ে সমুদয় ভারতমধ্যে কোন প্রকার গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত ছিল কি না? এসময়ে রাজা প্রজার যথেচ্ছাচারিতার শাসন হইত কি না?

২। এসময়কার বাদসাহগণ দুর্ব্বল হওয়াতে চারিদিকে সকল নবাব সুবা প্রভৃতি মুসলমান দেশপালগণ এবং হিন্দু রাজা ও কর্ম্মচারিগণ স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া পড়িয়াছিল কি না? ইহারা কি কোন শাসন মানিত?

৩। এই মুসলমান এবং হিন্দু-রাজগণের স্বাধীন কর্তৃত্বে প্রজামণ্ডলীর মান ও মর্য্যাদা, স্বত্ব ও অধিকার, জাতি ও

জন্য ইংরাজ-শীরে রাজমুকুট অর্পণ করিয়াছিলাম। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, সেই মুকুট উপযুক্ত শিরেই অর্পিত হইয়াছিল। এক্ষণে আমাদিগের সেই কার্য্য এই জন্য গৌরবের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

কুল এবং জীবন ও প্রাণ, উপযুক্ত শাসন-প্রণালী দ্বারা রক্ষিত হইত কি না?

৪। এসময়ে চারিদিকে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ-বিগ্রহ, ও লুণ্ঠন সর্ব্বদাই ঘটিত কি না?

৫। চারি দিকের যুদ্ধ-বিগ্রহের গোলযোগে ভারত মধ্যে প্রজাগণের কতদূর সুখ ও শান্তি ছিল?

৬। ঠগি, ডাকাইতি, বর্গির হাঙ্গামা প্রভৃতি সামাজিক উপদ্রব এই সময়ে ঘটে কি না?

৭। হিন্দু সুন্দরীগণের প্রতি মুসলমানেরা অত্যাচার করিত কি না? এবং ধনবান্ লোকের ধন-সম্পত্তি বল-পূর্ব্বক কাড়িয়া লইত কি না?

৮। এই সময়কার সামাজিক অশান্তি-স্থলে শান্তি স্থাপন করিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কত কাল লাগিয়াছিল?

৯। হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করিয়া সেরাজ-দ্দৌলাকে অপদস্থ করিতে কেন চেষ্টা পায়?

১০। পূর্ব্বে মুসলমান রাজত্ব যে রূপ থাক্ তাহা বিচার্য্য নহে। কথা এই, ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে তাহা কি রূপ হইয়া উঠিয়াছিল?

এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, সুরেন্দ্র বাবুর উপরি উক্ত কথাগুলি অযথা বলিয়া প্রতীত হইবে না।

যখন আমরা ইংরাজগণকে রাজত্ব দিই, তখন আমাদিগের এই একমাত্র অভাব ছিল, কিসে আমরা মুসলমানগণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাই। তখন আমরা যে ঘোর অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়াছিলাম, তাহাতে আমরা আপনাদিগের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, আমাদিগের তখন আর একটী প্রধান অভাব সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা তখন বুঝিতে পারিতাম না যে, আমাদিগের প্রাচীন সভ্যতা আমাদিগের নিতান্ত অনিষ্টকরী হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সভ্যতা-প্রভাবেই আমরা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য ও নিপতিত হইয়া সকলই হারাইয়াছি,—আপনাদিগের দেশ হারাইয়াছি,—গৌরব হারাইয়াছি, মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি—হারাইয়া কেবল ব্রাহ্মণসেবা ও মুসলমান-সেবায় নিরত আছি। এই সভ্যতা ক্রমশঃ আমা-দিগকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ করিয়াছিল। আমরা নীচতার অতি অধস্তলে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা অতি অসাড় ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আমাদিগের যে এই হীনাবস্থা ঘটিয়াছিল, সে জ্ঞানমাত্র আমাদিগের ছিল না। আমরা তখন জানিতে পারি নাই যে, আমাদিগের আর এক বিধ সভ্যতার প্রয়োজন হইয়াছিল, আর এক বিধ বল নহিলে আমরা উঠিতে পারিব না। তখন কি

জয়ী, কি জিত, কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভারতীয় সর্ব্বজনেই প্রাচ্য সভ্যতার একচাপে নিমজ্জিত ছিলাম। সকলেই এক স্তরে স্তরীভূত হইয়া ছিলাম। এক জড়তায় সকলেই অভিভূত ছিলাম। উঠিবার ও নড়িবার শক্তি ছিল না। তখন প্রাচ্য সভ্যতা অতি নির্জ্জীব ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার আর উন্নতি-সাধিনী শক্তি ছিল না, তাহার আর উত্তেজনী শক্তি ছিল না। আমাদিগের এই অচেতন অবস্থা কিসে অপনীত হইল? কোন্ বল আমাদিগকে জাগরিত করিল? সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, এই বল ইয়োরোপীয় সভ্যতা। ইংরাজরাজত্ব স্থাপনের শতাধিক বৎসর পর এখন আমরা এই নববলের শক্তি ক্রমে ক্রমে অনুভব ও অল্পে অল্পে উপলব্ধ করিতে পারিতেছি। আমা-দিগের পূর্ব্বতন অভাব কি ছিল, জানিতে পারিতেছি। সেই অভাব কিসে মোচন হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি।

আমরা দেশ হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু স্বদেশ রক্ষা করিবার আমাদিগের শক্তি ছিল না। জনকত মুসলমানে বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল, জনকত ইংরাজে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে। গ্রীকদিগের আক্রমণের পরও আমরা স্বদেশ রক্ষার জন্য বিহিত উপায়াদি অবলম্বন করি নাই। বিদেশীয়গণকে প্রতাড়িত করিবার জন্য সৈন্যবল প্রস্তুত রাখি নাই, স্থানে স্থানে দুর্গসকল নির্ম্মাণ করি নাই, ভারতীয় সমস্ত রাজন্যবর্গকে এক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করি নাই। বৌদ্ধেরা গ্রীক দিগকে তাড়াইয়া দিলেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম, আর ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবিলাম না। ভবিষ্যতেও যে অন্য বিদেশীয়গণ আবার ভারত আক্রমণ করিতে পারেন তাহা একবারও মনে করিলাম না। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থসাধনে ব্যস্ত ছিলাম। তখন ভারতে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মযুদ্ধ চলিতেছিল; বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের যুদ্ধ। এই ব্যাপার লইয়াই তখন ভারতবর্ষ ব্যস্ত। তখন সাধারণ ভারতের জন্য কেহ ভাবে নাই। অযোগ্য সন্তানগণের হস্তে ভারতমাতা নিজ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীয় সভ্যতা এদেশকে চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া-ছিল। সকল জাতিকে বিভিন্ন করিয়া দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছিল। সকলেরই মন ইহকাল হইতে পরকালে ন্যস্ত করিয়াছিল। সকলকেই নিজ নিজ স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। স্বদেশ, কি সমাজের জন্য কেহ ভাবিত না। গ্রীক আক্রমণের শিক্ষায় তাহারা শিক্ষিত হইল না। সকলই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন এমত সময় মুসলমানগণের সৈন্য-প্রবাহ ভারতের দিকে ধাবিত হইল। সে তরঙ্গ কাটিয়া উঠেন ভারতের তখন এমত বল নাই। সুতরাং ভারত পতিত হইল। ভারত

চিরদিনের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইল। স্বাধীনতার বিনাশের সহিত ভারত-পতন দ্বিগুণ বলে সাধিত হইতে লাগিল। যে পতন দুই বৎসরে হইত, এখন তাহা দুইদিনে সম্পন্ন হইতে লাগিল। ভারতের সকল তেজঃ একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। আজি আটশত বৎসর পরাধীনতায় ভারতের আর কিছুই সারবত্তা নাই।

এক্ষণে ইংরাজগণ আমাদিগের প্রভু। তাঁহারা আমাদিগের শুদ্ধ রাজা নহেন, আমাদিগের শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। এখন বিস্তর বিষয় তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা শিক্ষা করিতেছি। আমরা তাঁহাদিগকে স্বদেশ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে যাহা দিতেছেন, তাহা অমূল্যধন। তাঁহাদিগের বিদ্যায় এবং সভ্যতায় আমরা অনেক বিষয় শিখিতেছি। তাঁহাদিগের চরিত্রে আমরা অনেক মহৎগুণ অবলোকন করিতেছি। এক্ষণে ইংরাজরাজত্বের স্থায়িত্বের জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা অরাজকতার হস্ত হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। অরাজকতার স্থানে ভারতে রাজশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের রাজ্যশাসন এক্ষণে আমাদিগের পক্ষে স্বর্গসুখ বোধ হইয়াছে। তাঁহাদিগের স্বদেশে যে শাসন-প্রণালী প্রচলিত আছে, সে শাসন-প্রণালী এখানে প্রবর্ত্তিত করেন নাই বটে, কিন্তু যে শাসন-প্রণালী আমাদিগকে দিয়াছেন তাহাতেই আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে সুখী হইয়াছি। আমাদিগের জীবন, মান, স্বত্ব, অধিকার, ধন, জাতি, কুল ও ধর্ম্ম সকলই সুরক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদিগের শাসন-প্রণালীতে আমরা অনেক বিষয় শিখিতে পারিতেছি। এক্ষণে আমাদিগের সুষুপ্তি হইতে জাগরণ হইয়াছে, ঘোর অজ্ঞানতা হইতে জ্ঞানোদয় হইতেছে। এক্ষণে বিটিশরাজ্য আমাদিগের অতি প্রিয়তম পদার্থ হইয়াছে। এই ভারতের জ্ঞানালোকের প্রভাত মাত্র। ভারতবাসিগণের বলোদ্রেকের প্রারম্ভ মাত্র। আমাদিগের এখনও দাঁড়াইবার শক্তি জন্মে নাই। আমরা জাগরিত হইয়া চারিদিকে চাহিতেছি মাত্র। আমাদিগের কত শত অভাব আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি।

ভারতে বিটিশসিংহের পরাক্রম এখন অনিবার্য্য। তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় এমত সাধ্য ভারতবাসীর মধ্যে কাহারও নাই। বিটিশসিংহ অপ্রতিহত প্রভাবে এখন ভারতারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। সকলই তাঁহার কবলস্থ। যে দিকে যাও, ব্রিটিশসিংহের ভীষণমূর্ত্তি বিরাজমান। সুতরাং বিটিশরাজত্ব এদেশে এক্ষণে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই নাই। ভারতবাসিগণ ইচ্ছা করুক, আর নাই করুক, তাহাদিগকে

এক্ষণে বিটিশরাজত্বের অধীনে থাকিতেই হইবে। কিন্তু বিটিশ-রাজের এ বড় সন্তোষের বিষয় যে, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা প্রার্থনীয়ও হইয়াছে। আমরা এখন ইচ্ছা করি, ব্রিটিশরাজ্য স্থায়ী হউক। অতএব বিটিশরাজত্ব এক্ষণে উভয়ই অবশ্যম্ভাবী ও প্রার্থনীয়। অবশ্যম্ভাবী এই জন্য যে,ইহা অনিবার্য্য, প্রার্থনীয় এই জন্য যে, ইহার শাসনে আমরা সুখী হইয়াছি, ইহা হইতে আমরা অনেক মঙ্গল লাভ করিতেছি।

বিটিশরাজত্ব যদি ভারতে অনিবার্য্য হইল, তবে আমাদিগের প্রয়োজন এই, যাহাতে সেই রাজত্বে সুখে থাকিতে পারি তাহার চেষ্টা দেখা উচিত। যে রাজশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতেই হইবে, এক্ষণে আমাদিগের এমত চেষ্টা করা উচিত কিসে সেই রাজশাসনের বশবর্ত্তিতা অসুখকর না হয়?—কিসে সেই রাজশাসনকে আপনাদিগের সুখসাধনোপযোগী করিয়া আনিতে পারি। প্রথমতঃ আমাদিগের দেখা উচিত যে,যে রাজশাসন প্রণালী আমাদিগের সুখের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,যে সমস্ত ব্যবস্থা ও বিধান যথার্থ ন্যায়পরতার অনুবর্ত্তী হইয়া বিধানিত হইয়াছে, সেই শাসন-প্রণালী ও ব্যবস্থাবলি রাজকর্ম্মচারিদিগের ভ্রম-প্রমাদ অথবা অত্যাচার জন্য, তাঁহাদিগের প্রকৃতি, মেজাজ, অথবা মূর্খতা জন্য, যেন প্রজামণ্ডলীর অসুখকর না হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের দেখা উচিত, কিসে আমাদিগের রাজশাসন প্রণালীর ক্রমশঃ এমত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যাইতে পারে যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ ভারতবাসী প্রজামণ্ডলীর সুখ-ভাগের বৃদ্ধি করিতে পারে। এই দুইটী উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র;—একের বিষয় সুখসাধনোপযোগী ব্যবস্থা ও শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য যাহাতে বিফল না হয়, যাহাতে তাহা হইতে অসুখের উৎপত্তি না হয়, যাহাতে রাজ্যের অত্যাচার ও অনিষ্টাপাত নিবারিত হয়, এরূপ উপায় সকল অবলম্বন করা উচিত;—অন্যতরের বিষয়, যাহাতে রাজ্যের ক্রমশঃই সুখের বৃদ্ধি হয়, সুখ সাধনোপযোগী নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এবং রাজকার্য্যাদির সূত্রপাত ও অনুষ্ঠান হয়, এরূপ উপায় সকল অবলম্বন করা উচিত। একের বিষয়—দুঃখের নিবারণ; অন্যতরের বিষয়—সুখের বৃদ্ধিসাধন।

রাজার কর্ত্তব্য যাহা, তাহা রাজা করিতেছেন। বৈদেশিক ভূপতি হইয়া ইংরাজরাজ এদেশের পক্ষে যাহা করিতেছেন, তাহা ভাবিতে গেলে আমাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। তাঁহারা যে প্রকারে রাজ্য গ্রহণ করুন না কেন, কিন্তু গ্রহণ করিয়া এক্ষণে যেরূপ শাসনে রাজত্ব করিতেছেন তাহাতে প্রজামণ্ডলীর অপেক্ষাকৃত অনেক সুখবৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা যদি আপনাদিগের সুখপ্রার্থী

হই, তবে সেই ইংরাজরাজ আমাদিগকে আহ্বান করুন, আর নাই করুন, আমরা আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বিনা আমন্ত্রণে ইংরাজগণের রাজকার্য্য-প্রণালীর সহিত, তাহাদিগের রাজকার্য্য-নির্ব্বাহের সহিত যোগ দিতে আমরা চেষ্টা করিব। দশবার তাঁহাদিগের দ্বারে আঘাত করিলে যদি একবারও তাঁহারা আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করেন, তাহাতে আমাদিগেরই লাভ। শুনিলেন না বলিয়া এখন অভিমানে চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদিগেরই স্বার্থহানি ভিন্ন আর কিছু লাভের প্রত্যাশা নাই। ইংরাজেরা আপনাদিগের কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু আমাদিগের যাহা অভাব, তাহা আমাদিগকেই অবশ্য মোচন করিতে হইবে। নহিলে আপনারাই অসুখিত হইব।

আপাততঃ আমাদিগের যে দুইটী প্রধান রাজনৈতিক অভাব তাহা বিবৃত করিয়াছি। এই দুইটী অভাব বর্ত্তমান। আর একটী অভাবের বিষয় যদিও অনেক দূরবর্ত্তী বটে, কিন্তু এই বর্ত্তমান অভাবদ্বয়ের মোচনের সঙ্গে সঙ্গে সেই তৃতীয় অভাব-মোচনেরও উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ইংরাজগণ ভারতের বৈদেশিক ভূপতি। তাঁহারা ভূপতি বটে, কিন্তু এদেশের সহিত তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই রাজ্যশাসনরজ্জু সেই দূরবর্ত্তী ইংলণ্ডের হস্তে। তাঁহারা ভারতকে আপনাদিগের অধীনস্থ দেশ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন না। স্বদেশে যাইবার জন্য তাঁহাদিগের অর্ণবপোত রাত্রিদিন সজ্জিত আছে। তাঁহারা সকলেই এখানে দুইদিনের জন্য আসেন। তাঁহারা এখানে থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মন ও মায়া সেই স্বদেশের জন্য পড়িয়া আছে। তাঁহারা শুদ্ধ কর্ত্তব্য-সাধনানুরোধে যা ভারতবর্ষের জন্য দুই এক ঘণ্টাকাল চিন্তা করেন, নহিলে তাঁহারা সর্ব্বদাই স্বদেশের জন্য ভাবিতেছেন। তাঁহারা এখানে—তাঁহাদিগের পরিবারবর্গ হয়ত বিলাতে। তাঁহারা সর্ব্বদাই বিলাতে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এখানকার সম্বন্ধ শুদ্ধ চাকরি, অথবা বাণিজ্য-ব্যবসা। তাঁহাদিগের এখানকার বন্দোবস্ত শুদ্ধ কায চালাইবার মত। তাঁহাদিগের ধনাগার বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক। তাঁহারা কায চালাইবার মত এখানে সৈন্য রাখিয়াছেন, কায চালাইবার মত রাজকর্ম্মচারিগণকে আনেন। তাঁহাদিগের সৈনিক ও রাজকার্য্যের পুরস্কার সেই ইংলণ্ডে প্রদত্ত হয়। ক্লাইব, স্যার কলিন ক্যাম্বেল, হার্ডিঞ্জ, গফ্, নেপিয়ার, লরেন্স ইংলণ্ডে গিয়া লর্ড হইলেন। ভারতবর্ষের সহিত ইংরাজেরা এরূপ পৃথক হইয়া আছেন, যে এখনি প্রয়োজন হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজত্বের এই বিস্তৃত-জাল গুটাইয়া লইতে পারেন। তাঁহারা আজিও আমাদিগের সঙ্গে

মিশিলেন না। তাঁহারা শুদ্ধ আপনাদিগেরই সঙ্কীর্ণ ও গঠিত সমাজ মধ্যে বিচরণ করেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজগণ শুদ্ধ বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য যেরূপ নিঃসম্পর্কীয়ভাবে ভারতবর্ষে থাকিতেন, আজি ভারতবর্ষের রাজা হইয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা প্রায় সমান নিঃসম্পর্কীয় ভাবে রহিয়াছেন। প্রভেদ এই, তাঁহাদিগের ব্যবসায়ের প্রয়োজনের উপর আর একটী নূতন প্রয়োজন আসিয়াছে মাত্র। পূর্ব্বে শুদ্ধ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন ছিল, এখন তৎসঙ্গে একটী রাজনৈতিক প্রয়োজন যোজিত হইয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যপ্রিয় স্বার্থপর ইংরাজগণ সেই রাজনৈতিক প্রয়োজনকেও অনেক দূর আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির দ্বার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। অনুমান হয়, যত দিন ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের স্বার্থসিদ্ধি করিবে, ততদিন ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ। সে দিনও একজন প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ রাখিয়া ইংরাজগণের ক্ষতি লাভ কি? তাঁহারা এখন ক্ষতিলাভ-তুলায় ভারতরাজত্বকে পরিমাণ করিতে যান। তাঁহাদিগের রাজকার্য্যপ্রণালীতে যদিও এতদূর অনুদার ভাব না থাকুক, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শিতে পারে।

এই ইংরাজ-রাজত্বে আমরা বাস করিতেছি। যাহাদিগকে আমরা আপনার বলিয়া জ্ঞান করিব, দেশের রাজা বলিয়া যাহাদিগকে আপনাদিগের পতিত্বে বরণ করিব, যাহাদিগের উপর সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিশ্চিন্ত থাকিব, যাহাদিগের সহিত ক্রমশঃ আপনাদিগের ঘনিষ্টতা ও আত্মীয়তা ভাবের বৃদ্ধি করিব, আজি বলিতে বুক বিদীর্ণ হয়, সেই ভারতের সর্ব্বস্বের প্রভু ইংরাজরাজ ভারত হইতে সর্ব্বদাই বিচ্ছিন্ন রহিয়াছেন। আমরা এরূপ হৃদয়শূন্য জাতি নহি যে, শুদ্ধ রাজাকে রাজা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। রামরাজ্যে পৌরজনেরা রাজার ও রাজপরিবারবর্গের সুখ দুঃখে হাসিতেন ও কাঁদিতেন। কত পৌরজন পাণ্ডবদিগের সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন। কত পৌরজন রামের সহিত বনবাসে উদ্যত হইয়াছিলেন। রাম তাহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য কত কৌশল করিয়াছিলেন। রামকে দেখিবার জন্য রাজনগরের শত গবাক্ষ নয়নোন্মীলন করিয়াছিল। ইংরাজরাজ যে এত বিচ্ছিন্ন, তথাপি আমাদিগের হৃদয়দ্বার তাহাদিগের জন্য সমান উন্মুক্ত রহিয়াছে। সে দিনও আমরা কত আহ্লাদের সহিত যুবরাজকে ভারতে আহ্বান করিয়াছি, তাঁহাকে রাজোপহার প্রদান করিয়াছি, রাজভক্তি উৎসর্গ দিয়াছি, তাঁহাকে দেখিবার জন্য নগরের সহস্র নয়ন একেবারে উন্মীলন করিয়াছি। রামরাজ্যের পৌরজনগণ যেরূপ রাজভক্তিতে গদগদ থাকিতেন; আমরাও আজিও ইংরাজ

রাজকে সেইরূপ ভক্তি সহকারে হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি। দুঃখ এই,ইংরাজরাজ কেন আমাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। কেন তাঁহারা আমাদিগের এতদূর রাজভক্তির বিষয় হইয়া বিচ্ছিন্ন থাকিতে চাহেন! কেন তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়রাজ্য হইতে দূরে যাইতে চাহেন!

যাহা হউক, ইংরাজগণ যখন আমাদিগের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ এত দুর্ব্বল ও ক্ষণভঙ্গুর করিয়া রাখিয়াছেন, তখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? আমরা প্রার্থনা করি, ইংরাজগণের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হউক। কিন্তু তাঁহারা কই সে সম্বন্ধ চিরস্থায়ী করিতে চাহেন? তাঁহারা কই ভারতে বসবাস ও উপনিবেশ স্থাপন করিলেন? বরং তাঁহারা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাকে, তাহাদিগের রাজনৈতিক কৌশল বলিয়া পরিগণিত করেন। করুন, তৎসম্বন্ধে আমরা কোন বাক্যব্যয় করিলে তাঁহারা সেই কৌশলে আরও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া যাইবেন। কিন্তু ইংরাজগণ যখন এদেশের সহিত চির সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে চাহেন না, তখন আমরা কি করিব? আমাদিগের উপায় কি? আমাদিগের তখন কি অভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে? মনে করুন (যদিও আমরা এরূপ প্রার্থনা করি না) ইংরাজগণের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইল; মনে করুন, তাঁহারা ভারত পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইলেন; মনে করুন স্বদেশের কোন প্রয়োজন বশতঃ ইংরাজগণ ভারতের সম্বন্ধ ছেদন করিলেন। তখন আমাদের কি দুর্দ্দশা? এক কালে রোম রাজ্যের অধীনে পূর্ব্বতন ব্রিটনের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, আমরাও তখন কি সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হইব না? দেশ মধ্যে তখন কি আবার অরাজকতা আসিয়া উপস্থিত হইবে না? আমরা কি শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের শিকারস্থানীয় হইব না? আমাদিগের তখন এমত বল থাকিবে না যে, আমরা তাহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি, এমত বল থাকিবে না যে, শত্রু বলের প্রতিরোধ করি। তখন বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। রাজার সহিত রাজার, এবং প্রজার সহিত প্রজার ঘোর বিবাদ ও বিসম্বাদ ঘটিয়া উঠিবে। তখন আবার হয় ত কোথা হইতে এক জন রাজা আসিয়া আমাদিগকে অধীনস্থ করিবে। আমাদিগের কিছুতেই নিস্তার নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি এরূপ সময় ভারতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা কি তজ্জন্য কিছু প্রস্তুত হইতেছি? তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে? তদ্রূপ সময় কি ঘটিবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়? আমরা প্রার্থনা করি না যে, সে রূপ সময় ঘটুক। কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ রাজ্য চিরস্থায়ী হইয়াছে? এখানে যখন মুসলমানেরা

রাজত্ব করিতেন, তখন কে জানিত যে, ইংরাজগণ সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া এখানে তাঁহাদিগের রাজত্ব উচ্ছেদ করিবেন? মুসলমানেরা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু দেখুন, কোথা হইতে কি রূপ ঘটিয়া উঠিল। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, কে বলিতে পারে? আমাদিগের ইচ্ছা ও প্রার্থনা যে, ইংরাজরাজত্ব চিরস্থায়ী হউক। জগৎ কি আমাদিগের ইচ্ছায় চালিত হইবে? পৃথিবীর অবস্থা তাহার বর্ত্তমান বলসমূহের ফল মাত্র। যখন মুসলমানেরা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, আর এক বল প্রবল হইয়া সেই বলকে পরাজয় করিল।

কিন্তু মনে করুন আমাদিগেরই ইচ্ছানুযায়ী ইংরাজগণ চিরকাল সমপ্রবল রহিলেন। বরং ক্রমশঃ তাঁহাদিগের বলবৃদ্ধি ঘটিল। তাহা হইলেও কে বলিতে পারে, পার্থিব অন্য বৈদেশিক বল এতদপেক্ষাও প্রবলতর হইবে না? যদি অন্য বল ইংরাজবল অপেক্ষা কখন প্রবলতর হয়, তখন কি আমাদিগের আর এক বিকল্প আসিয়া উপস্থিত হইতেছে না? তখন কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে, আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় ইংরাজবলকে আরও বর্দ্ধিত করি? ইংরাজগণকে সাহায্য করিয়া বিপক্ষ বলকে পরাভূত করি? ইংরাজ রাজত্ব আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অন্য রাজত্বে যে আমরা এতদপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব, তাহা অসম্ভব। বরং অন্য রাজত্বে আমাদিগকে অনেক কষ্টে পড়িতে হইবে। অতএব ইংরাজ রাজত্ব যাহাতে সুরক্ষিত হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেরূপ সাহায্য দানের জন্য আমরা কি প্রস্তুত আছি? আমরা কি সামাজিক ইষ্টের জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি? আমাদিগের শরীরে কি কোন সারবান গুণ আছে? না আমরা পূর্ব্বেও যেমন অসার ছিলাম, আজি ও তেমনি অসার হইয়া রহিয়াছি?

এই ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবিতে গেলে, আমরা আর একটী রাজনৈতিক অভাব দেখিতে পাই। সে অভাব এই যে, আমাদিগের শরীরে এমত কোন উচ্চতর গুণ নাই, যে গুণবলে আমরা নিজে নিজে দাঁড়াইতে পারি। তেজ আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম নহে। কিন্তু আমাদিগের কি চিরকাল তেজোহীন থাকা উচিত? দৃঢ়তা, উদ্যোগিতা, ও সাহস প্রভৃতি উচ্চতর গুণসকল আমাদিগের শরীরে নাই। সে সকল গুণের যাহাতে সমাবেশ হয়, আমরা কি কখন এমত চেষ্টা করিয়া থাকি? ইংরাজ-চরিত্রে আমরা যে উচ্চতর গুণ সমূহের সমাবেশ দেখি, সে সমস্ত গুণার্জ্জন করিতে কি আমাদিগের চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে? আমরা কি স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভর শিক্ষা করিয়াছি? যে অসমসাহসিকতা, উদ্যোগিতা এবং চরিত্রবলের জন্য

ইংরাজগণ জগদ্বিখ্যাত, তাহার কণা-মাত্র কি আমাদিগের শরীরে প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমাদিগের কি কিছু চরিত্রবল আছে? চরিত্রবল না থাকা আমাদিগের একটী জাতীয় অভাব। এই অভাব জন্য ইংরাজগণ আমাদিগকে উচ্চকার্য্যে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যখন আমরা চরিত্রবলে বলীয়ান হইব, এবং আমাদিগের রাজভক্তি এক্ষণকার মত সমপ্রবল থাকিবে, (বরং তাহা বর্দ্ধিত হইবারই সম্ভাবনা) তখন কি উদার ইংরাজরাজ আমাদিগকে উচ্চ কার্য্যভার অর্পণ করিবেন না? যে সমস্ত কার্য্যে এখনও আমরা অধিকার পাই নাই, যে সমস্ত কার্য্যের জন্য আমরা উপযুক্ত হইলে যে,উদার ইংরাজ-গণ তাহা আমাদিগকে দিবেন এমত আশা, আমরা তাহাদিগের পূর্ব্বকার্য্য-প্রণালী দেখিয়া মনে মনে ধারণা করিতে পারি। অতএব, যাহাতে আমরা জাতীয় চরিত্রবল অর্জন করিতে পারি, তজ্জন্য এক্ষণে আমাদিগের চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। জাতীয় চরিত্রবলের অভাব এক্ষণে আমাদিগের একটী প্রধান রাজনৈতিক অভাব।

আমি আপনাদিগের নিকট এক্ষণে তিনটী মাত্র রাজনৈতিক অভাব প্রদর্শন করিয়াছি। অন্যান্য অভাব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু আমার জ্ঞানে এই তিনটী প্রধান অভাব অথবা প্রয়োজন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথম, ইংরাজ-রাজত্বের অত্যাচার নিবারণ করা, দ্বিতীয়, ইংরাজ-রাজত্বে সুখের ভাগ প্রবর্দ্ধিত করা, তৃতীয়, জাতীয় চরিত্রবল অর্জন করা।

আপনাদিগের নিকট শুদ্ধ এই কয়েকটী অভাব নিবেদন করিয়াই আমার ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই অভাব-মোচনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহারও পর্য্যালোচনা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি বলি না, আমি যে উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব, তাহাই সদুপায়। আমি উপায় নির্দ্ধারণে ভ্রান্ত হইতে পারি, প্রকৃত সৎপথ প্রদর্শনে অক্ষম হইতে পারি; কিন্তু তাহা হইলেও সদুপায় এবং সৎপথ নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতে পাই, ইংলণ্ডে যে রাজশাসন স্থাপিত আছে, তাহা প্রতি-নিধিতন্ত্র। সেখানে যখন এক রাজ-মন্ত্রী দল প্রবল থাকে, তাহার প্রতিবাদী আর একদল তাহাদিগের রাজ-শাসন প্রণালীর দোষাদোষ বিচার করিতে থাকে। দেশময় বড় বড় সম্বাদ পত্র ও সাময়িক পত্রে পরিপূর্ণ। এই সম্বাদ পত্রে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতিষ্ঠিত রাজমন্ত্রী দলের কার্য্যাদির পর্য্যালোচনা হয়। তাহাদিগের কার্য্যাদির দোষ গুণের বিচার হইতে থাকে। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় রাজস্ব সম্পর্কীয় সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইলেই,রাজকার্য্যাদির পুঙ্খানু-

পুঙ্খ বিচার হইয়া থাকে। চারিদিকে প্রতিবাদ, বিচার ও তর্ক। সাধারণ লোকের প্রতিবাদধ্বনি এই সভায় বাগ্মীর বাক্যস্রোতে উত্থিত হয়। দেশশুদ্ধ রাতদিন রাজকীয় বিষয় লইয়াই পর্য্যালোচনা করিতেছেন। এমত কি এই রাজকীয় দলাদলিতে মহা যুদ্ধ ঘটিয়া যায়। কখন কখন এই বিবাদ এত প্রবল হইয়া পড়ে যে, ইহার জন্য অনেক গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। রাজমন্ত্রীর বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত ভগ্ন হয়। লোকে উন্মত্ত হইয়া পড়ে। এই উন্মত্ততার কারণ, প্রতিবাদী দলের জ্ঞান-ধ্বনির প্রবলতা।

অতএব, আমরা দেখিতে পাই, ইংরাজজাতি, সাধারণ লোকের জ্ঞান-ধ্বনিতে প্রচালিত হয়েন। তাঁহাদিগের দেশে দুই প্রকার প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত আছে। এক পার্লেমেণ্ট মহাসভার প্রতিনিধিত্ব, আর এক দেশীয় সম্বাদ ও সাময়িক পত্রের প্রতিনিধিত্ব। প্রথম প্রতিনিধিত্বের ধ্বনি সময়ে সময়ে প্রবলবেগে উত্থিত হয়, দ্বিতীয় প্রতিনিধিত্বের ধ্বনি প্রতিদিন ও প্রতি সপ্তাহে উত্থিত হইতেছে। দ্বিতীয় প্রতিনিধিত্ব পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াই পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রবলরূপে প্রকটিত হয়। কখন কখন ইহার বল দুর্নিবার হইয়া পড়ে। অতএব, মূল ধরিতে গেলে এই সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিত্বই সর্ব্ব প্রধান। সমস্ত ইংলণ্ডের জ্ঞানধ্বনি এই প্রকার প্রতিনিধিত্বে প্রথম উত্থিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই প্রতিনিধিত্বের ধ্বনি হয় ত প্রবল হইতে থাকে। তৎপরে মহাসভার অধিবেশনে ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হইয়া থাকে।

ইংরাজগণের জাতীয় প্রবণতা এই প্রতিনিধিত্বের দিকে। তাঁহারা সাধারণজনগণের জ্ঞানধ্বনিকে অত্যন্ত সমাদর করেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, এই জ্ঞানধ্বনিতে তাঁহাদিগের সমস্ত রাজসম্পর্কীয় বিষয়ের দোষগুণ বাহির হইয়া পড়ে। সম্বাদপত্র ও সাময়িকপত্র তাঁহাদিগের রাজশাসন-প্রণালীর একটী মহাযন্ত্র। এই মহাযন্ত্র দ্বারা তাঁহারা অনেক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। ইংরাজগণ ইহা ব্যতীত থাকিতে পারেন না। ইহা দ্বারা তাঁহারা জীবিত আছেন। তাঁহারা ভারতে রাজত্ব স্থাপন করিয়াই এখানে সম্বাদ পত্র স্থাপন করিয়াছেন। আমরা যেমন শুদ্ধ পৃথিবীর সম্বাদ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া সম্বাদপত্র পড়ি, তাঁহারা শুদ্ধ সেরূপ কৌতূহল নিবারণের জন্য সম্বাদ পত্র পড়েন না। তাঁহারা সম্বাদ পত্র দ্বারা দ্বিবিধ রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেন। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা তাঁহারা রাজ্যের সমুদয় ঘটনাবলির সমাচার বিদিত হয়েন। দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা তাঁহারা রাজকার্য্যাদিরও পর্য্যালোচনা করেন। কোন জ্ঞানবান ইংরাজকে তুমি সম্বাদ ও সাময়িক পত্র বিহীন দেখিতে পাইবে

না। ইহা তাঁহার জ্ঞান-ক্ষুধার অন্ন স্বরূপ; তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রাণস্বরূপ। আমরা ভারতেও এই চিত্র দেখিতে পাই। এখানে যে রাজ-শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে এই সম্বাদ পত্রের জ্ঞানধ্বনি তত প্রবল নহে বটে, কিন্তু একেবারেও বলহীন নহে। ইহা দ্বারা যে কিছুই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না এমত নহে।

ইংলণ্ডে যেমন সম্বাদ পত্র রাজ্যের অন্যতর প্রধান বলস্বরূপ, ভারতে এই বল তত প্রবল না হউক, ইহা দ্বারা আমাদিগের একটী প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। ইহা আমাদিগের রাজকর্ম্মচারিগণকে অনেক দূর শাসনে রাখে। ইংলণ্ডে এই সম্বাদ পত্র যতদূর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, এখানে ততদূর না করুক, তাহার কিয়ৎপরিমাণও করিয়া থাকে। এখানেও আমরা ইহাতে রাজকার্য্যাদির পর্য্যালোচনা করি। এই পর্য্যালোচনার যথেপ্সিত ফল না হউক, তাহার কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চয় ফল দর্শে। কিন্তু বাস্তবিক কি ইংরাজ-রাজ্যের প্রধান বল—সম্বাদ পত্র এবং পার্লেমেণ্টের মহা প্রতিনিধি-সভা? এই পট উত্তোলন করিয়া আমরা কি দৃশ্য দেখিতে পাই? এই সম্বাদ পত্র এবং পার্লেমেণ্টের মহাসভার ভিতরে কাহারা বসিয়া আছেন? কোন্ লোক-মণ্ডলীর জ্ঞানধ্বনি এই মহাসভায় ও সম্বাদ পত্রে উত্থিত হয়? যাঁহাদিগের জ্ঞানধ্বনি ইহাতে উত্থিত হয় তাঁহারাই কি বাস্তবিক ইংরাজ-রাজ্যের বল নহেন। এই আবরণদ্বয় ভেদ করিয়া আমরা দেখি, একটী বৃহৎ লোকমণ্ডলী, দুর্দান্তভাবে মহা রাজ-নৈতিক জীবনে বিচরণ করিয়া বেড়াই-তেছেন। ইঁহারা রাজ্যের মধ্যম শ্রেণীস্থ লোক। ইঁহারাই রাজ্যের প্রধান জ্ঞান-জীবন, বল ও যন্ত্রস্বরূপ। শুধু ইংলণ্ডে কেন, এই মধ্যম শ্রেণী ইয়োরোপীয় সকল সভ্য সমাজেরই প্রধান লোক-মণ্ডলী। তাঁহারাই রাজ্যের সমস্ত শাসন-রজ্জু ধরিয়া আছেন। তাঁহারা জ্ঞানে, বুদ্ধি-বলে, কার্য্যদক্ষতায়, এবং বহু সংখ্যায় রাজ্যের প্রধান বলস্বরূপ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বিপক্ষে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? নিজে রাজারও তাহা সাধ্য নাই। এই মধ্যম শ্রেণীই ইয়োরোপীয় রাজ্য সমূহের দুর্নিবার বল ও দুর্গস্বরূপ। ইয়োরোপের যে এত উন্নতি, সেই উন্নতির প্রধান কারণ, এই মধ্যম শ্রেণীস্থ লোকের জ্ঞান ও প্রভাব। তাঁহারাই ইয়ো-রোপীয় সভ্যতার জন্মদাতা। ইয়োরো-পীয় সমাজের সহিত পৃথিবীর অপরাপর ভূখণ্ডের সামাজিক প্রভিন্নতা এই শ্রেণী লইয়াই ঘটিয়াছে। এসিয়ার সমস্ত প্রাচ্য রাজ্যে এই শ্রেণীর অভাব হেতু, এসিয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতার সহিত সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নহিলে এসিয়াস্থ রাজ্যাদি এত প্রাচীন কাল হইতে অবস্থান করিতেছে যে, উহাদিগের উন্নতি অবশ্য

ইয়োরোপীয় উন্নতি হইতে আজি অনেক গুণে অধিক হইত। কিন্তু আজি ইয়োরোপীয় উন্নতির কাছে এসিয়া দাঁড়াইতে পারে না। বরং এসিয়া উন্নতি ও সভ্যতায় ক্রমশঃ হীনতর হইয়া আসিতেছে। ইহার বিশেষ কারণ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, এই মধ্যম-শ্রেণীর অভাবই এসিয়ার অবনতির নিদানভূত। এসিয়াতে মধ্যবিত্ত লোক আছে, কিন্তু আমি ইয়োরোপীয় সমাজের যে মধ্যশ্রেণীর কথা বলিলাম, এসিয়ার মধ্যবিত্ত লোকের সহিত তাঁহাদিগের কোন সাদৃশ্য নাই। এই দুই লোক-বিভাগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহাদিগের প্রকৃতি ও গুণের কিছুই সাদৃশ্য নাই।

এই মধ্য শ্রেণী কাহাকে বলে, বোধ হয়, আপনারা অনেকেই অবগত আছেন। তবু আমি একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহি। প্রধান প্রধান ইয়োরোপীয় সমাজ পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা প্রায় সকল সমাজকে তিন শ্রেণীস্থ লোকে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীস্থ জনগণ ঐশ্বর্য্যে, মান-মর্য্যাদায়, প্রভুত্বে এবং ধনবলে উচ্চ শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ জনগণ জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে, স্বাধীনতা-প্রিয়তায়, স্বদেশানুরাগে, স্বজাতিপ্রেমে, কার্য্যশীলতায়, উদ্যোগিতায়, এবং বহুবিধ জাতীয় গুণে, উপরস্থ এবং তন্নিম্নস্থ লোক মণ্ডলী হইতে প্রভিন্ন হইয়া মধ্য-শ্রেণী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তৃতীয় শ্রেণী মধ্যে অপরাপর সামান্য জনগণ অবস্থিত; ইহাদিগকে সামান্য লোক-মণ্ডল কহে; ইহারা মূর্খতায়, এবং সৎ গুণের অভাবে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই মধ্য শ্রেণীস্থ জনগণ সর্ব্বদাই পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন। কেহ কেহ কার্য্যগুণে ও ঐশ্বর্য্যবলে মধ্যশ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উত্থিত হইতেছেন। আবার উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণ সেই শ্রেণীর ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা ও ধর্ম্মাদির অভাব বশতঃ মধ্যশ্রেণী মধ্যে নামিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু এই মধ্যশ্রেণী সর্ব্বদাই সামান্য লোক-মণ্ডল হইতে, ইহার লোক-সংখ্যা আহরণ করিতেছেন। সামান্য জনগণ মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানে ও গুণাদিতে মধ্য শ্রেণীর উপযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিতেছেন। আবার জ্ঞানের ও গুণের অভাব বশতঃ অনেক মধ্যশ্রেণীস্থ লোক পতিত হইয়া সামান্য লোক-মণ্ডল মধ্যে মিশিয়া যাইতেছেন। এই মধ্য-শ্রেণীস্থ জনগণ সর্ব্বদাই উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণের সহিত প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সেই উচ্চ শ্রেণীকে আপনাদের পুরস্কার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তল্লাভ-প্রত্যাশায় অহরহঃ নিযুক্ত আছেন। দেশ মধ্যে এই উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণের কিছু প্রভুতা আছে বলিয়া, মধ্য শ্রেণীস্থ জনগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের প্রভুতার বিপক্ষে নিজপক্ষ কক্ষীকৃত করিতেছেন। এই

নিজপক্ষ সমর্থন কালে তাঁহারা সাধারণ লোকের স্বত্ব ও অধিকার এবং স্বাধীনতার ভাব, স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতিপ্রেমিকের উৎসাহবলে স্থাপন করিতেছেন। এই যুদ্ধে তাঁহারা সর্ব্বদাই অগ্নিময় হইয়া আছেন। এই যুদ্ধে তাঁহারা সমাজের স্বার্থ, স্বদেশের ইষ্ট, তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেছেন। বাস্তবিক এই যুদ্ধে তাঁহারা রাজ্যের সমস্ত কার্য্য ও বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধিবল, তাঁহাদিগের স্বদেশানুরাগের বিলক্ষণ পরিচয় হয়। তাঁহারা অতি দুর্দমনীয় সাহসে এই ব্যাপার, এই মহাসামাজিক যুদ্ধ, সমাধা করেন। স্বদেশের মঙ্গলের নাম ধরিয়া তাঁহারা কাহাকেও তৃণজ্ঞান করেন না। তাঁহাদিগের বাক্য ও কার্য্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। তখন তাঁহাদিগকে রাজ্যের এক দুর্দমনীয় বল বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে—যে বলের শাসন, উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণ;—যাহার সমর্থনকারী সামান্য লোকমণ্ডল।

এই মধ্য শ্রেণীস্থ জনগণ ইয়োরোপীয় সমাজের গৌরব-স্বরূপ। তাঁহারাই বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত আছেন; বড় বড় অধ্যাপক তাঁহাদিগের মধ্য হইতে উৎপন্ন হয়। তাঁহারাই দেশ দেশান্তরে বড় বড় অবদান-পরম্পরায় নিযুক্ত আছেন; তাঁহারাই বাণিজ্যার্থ দেশ দেশান্তরে বিনির্গত হইতেছেন। তাঁহারাই দেশ দেশান্তরে নানাবিধ আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারাই দেশ দেশান্তরে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারাই সৈনিক ও রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়া দেশ দেশান্তরে স্বদেশের নাম গৌরবিত করিতেছেন। ইয়োরোপের যত ভুবনবিখ্যাত মহাজনগণ, সকলই প্রায় এই মধ্যম শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা এক এক জন কার্য্যগুণে আজি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহারা এক এক জন এক এক অগ্নিরাশি,—যেখানে সে অগ্নিরাশি পড়ে, সে স্থান উত্তপ্ত হইয়া যায়। তাঁহারাই ইংলণ্ডে ম্যাগনাচার্টা ও পার্লেমেণ্টের সৃষ্টিকারী এবং আমেরিকার উপনিবেশ ও ভারতরাজ্যের স্থাপয়িতা।

ইংরাজ জাতির রাজনৈতিক প্রবণতা কিরূপ, তাঁহারা কোন্ বলের শাসনে স্বদেশ মধ্যে চালিত হয়েন, এবং তাঁহাদিগের রাজনৈতিক জীবনের সারত্ব কোথায়,এই সমস্ত বিষয়,বোধ হয়,এক্ষণে অনেক দূর প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সমস্ত বিষয় যতই পর্য্যালোচনা করিবেন, ততই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমাদিগের রাজনৈতিক কৌশল কিরূপ হওয়া উচিত। এই কৌশল পাতিবার অগ্রে আমাদিগের ইংরাজজাতির সভ্যতা পর্য্যালোচনা করা উচিত, এবং ইংরাজজাতির রুচি ও প্রবণতা বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখা উচিত। এরূপ না বুঝিয়া

যদি আমরা কার্য্য-কৌশল অবধারণ করি, তাহা হইলে আমাদিগের পদে পদে বিফল হইবার অনেক সম্ভাবনা।

ইংরাজ জাতি কতদূর সম্বাদপত্র-প্রিয়, তাঁহারা সাধারণ জ্ঞানধ্বনির (Public Opinion) কতদূর সমাদর করেন, সেই জ্ঞানধ্বনির শাসনে কতদূর চালিত হয়েন, তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। আমাদিগের এই সম্বাদ পত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগের সম্বাদপত্রের সমাদর আরও বৃদ্ধি করা উচিত। এই সমস্ত পত্র যাহাতে রীতিমত চলে, তদ্বিষয়ের বন্দোবস্ত করা উচিত। ইহাদিগের রাজনৈতিক মূল্য যত অধিক, এক্ষণে আমরা তত অধিক মূল্য বুঝিতে পারি নাই। এদেশীয় সম্বাদপত্রকে যতদূর উৎসাহ দান করা উচিত, আজিও আমরা ততদূর উৎসাহদান করি না। এই সম্বাদপত্র হইতে আমাদিগের আর একটী আনুষঙ্গিক উপকার লাভ হইতে পারে। আমাদের বিচ্ছিন্ন সমাজকে ইহা এক সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারে। একতা-স্থাপন-পক্ষেও ইহা একটী মহৎ উপায় হইতে পারে। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ইহা বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ। ইংলণ্ডে সম্বাদপত্র-সম্পাদক রাজার মন্ত্রী, প্রজার বন্ধু, এবং সমাজের শিক্ষক। এই গুরুতর কার্য্যভার আমরা কাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত আছি? ভারতে দেশীয় লোক দ্বারা চালিত ইংরাজী সম্বাদপত্র কয়খানি আছে? তন্মধ্যে কয়খানিই বা উপযুক্ত লোক দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে? আমাদিগের দেশীয় ভাষালিখিত সম্বাদপত্রের অবস্থা কিরূপ? ভারতের প্রধান প্রধান সর্ব্বস্থানে কি সুচালিত সম্বাদপত্র আছে? এক্ষণে আমাদিগের এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত প্রশ্নের রাজনৈতিক মূল্য এক্ষণে অনেক অধিক দাঁড়াইয়াছে।

আমাদিগের প্রথম রাজনৈতিক অভাব বলিয়া আমি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, সম্বাদপত্র দ্বারা সেই অভাব-মোচন যে, অনেক দূর সম্ভবিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এদেশে এখনিই যে কতিপয় সম্বাদপত্র প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা এক্ষণে এই অভাব অনেকদূর মোচন হইতেছে। কিন্তু সেই সম্বাদপত্রের সংখ্যা অতি অল্প। তন্মধ্যে অনেক সম্বাদপত্র উপযুক্ত হস্ত দ্বারা সম্পাদিত হয় না। কোন কোন পত্র দল-বিশেষের স্বার্থ-সমর্থনার্থ নিযুক্ত। কোন কোন সম্বাদপত্র কেবল নীচতা-ব্যঞ্জক গালি দিতেই পটু; তাহাতে সারগর্ভ কথা অল্পই থাকে। এই সম্বাদপত্রের সংখ্যা ও যোগ্যতার বৃদ্ধি করা উচিত। আমাদিগের সম্বাদপত্রের উৎসাহ নাই। তাহাদিগের গ্রাহক-সংখ্যা অতি অল্প। সম্বাদপত্রের আয় এত অধিক হওয়া উচিত, যদ্দ্বারা সম্পাদক কেবল তাহাতেই আবদ্ধ

থাকিতে পারেন। তাঁহার কার্য্য যেরূপ গুরুতর, তাঁহার কার্য্যে যেরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন, যেরূপ বিদ্যালোচনার প্রয়োজন, যেরূপ বহুদর্শিতা, বিজ্ঞতা, বুদ্ধিচালনা ও চিন্তার প্রয়োজন, অন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে, এ সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে। এদেশীয় কয় খানি সম্বাদপত্রের আয় এত অধিক যে, তাহাতে সম্পাদকগণ অন্য ব্যবসায়ে নিরপেক্ষ হইয়া চালাইতে পারেন? সুতরাং এদেশীয় অনেক সম্বাদপত্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। অকর্ম্মণ্য বলিয়া তাহাদিগের সমাদরও নাই।

শুধু সম্বাদপত্র নহে, এদেশে সাময়িক পত্রেরও বিলক্ষণ অভাব। কয় খানি ম্যাগেজিন, রিভিউ প্রভৃতি উচ্চদরের রাজকার্য্য-সমালোচন-পত্র দৃষ্ট হয়? আজি কালি বাঙ্গালাতে যে কয়েক খানি সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে রাজ-সম্পর্কীয় প্রস্তাব কি কখন লিখিত হয়? তাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ের গন্ধমাত্রও থাকে না। তাহাদিগের সম্পাদকগণ কেবলই সাধারণ সাহিত্য, কবিতা, ও উপন্যাস লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু এই সকল কাগজে কি রাজকার্য্যের সমালোচন, রাজনৈতিক কৌশলের পর্য্যালোচনা প্রভৃতি উচ্চদরের প্রস্তাব সকল এবং সাময়িক ঘটনা সকলের উপর পরিণত ও বিজ্ঞতম অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে? এদেশে যে সমস্ত সাময়িক পত্র প্রচলিত আছে, তাহাদিগের রাজনৈতিক মূল্য কিছুই নাই বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। তদ্দ্বারা যে একটী মাত্র দূরবর্ত্তী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা আমি পরে বলিব। অনেকে বলেন, আমাদিগের রাজনৈতিক বিষয় গ্রহণ করা, এবং তৎসম্বন্ধে কোন উক্তি করা অরণ্যে রোদন করা মাত্র। কিন্তু এ কথা প্রকৃতপক্ষে খাটে না। আমাদিগের সকল কথাই কি অরণ্যে রোদন হয়? সে দিনকার মুদ্রাযন্ত্রের নববিধান কেন উঠিয়া গেল? আর আমাদিগের সকল কথাই যে সারবান্, তাহা কে বলিল? আর মনে করুন, যদিই আমাদিগের কথা গ্রাহ্য না হয়, কিন্তু রাজকার্য্য বিষয় সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিলে যে, ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারিগণের পীড়ন ও ভ্রম অনেক দূর নিবারণ হইতে পারে, এবং তাহাদিগের রাজকার্য্যের উপর শাসন থাকে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

আমাদিগের প্রথম রাজনৈতিক অভাবমোচন জন্য আমি এই একটী মাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহা যে প্রধান উপায়, তাহা বোধ হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য উপায়ও অনেকের মনে উদ্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু আমি আর অন্যান্য উপায় ভাবিবার সময় পাই নাই।

আমাদিগের দ্বিতীয় রাজনৈতিক অভাব,—ইংরাজরাজত্বে সুখভোগের বৃদ্ধি

করা। যে রাজত্বে থাকিতেই হইবে, সে রাজত্বে সুখে থাকিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। আমরা স্বীকার করি, প্রজামণ্ডলীর সুখবৃদ্ধি জন্য ইংরাজগণ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাহাদিগের অনেক ব্যবস্থা সামাজিক সুখের জন্য বিধানিত হইয়াছে। তাহাদিগের রাজশাসন শুদ্ধ সামাজিক উপদ্রব ও পাপাচার নিবারণার্থেই নিয়োজিত নহে, সেই শাসনে যাহাতে সকলে সুখে থাকিতে পারে, এমত বিধানসকলও বিধিবদ্ধ এবং উপায় সকল অবলম্বিত হয়। তাহাদিগের পূর্ত্তবিভাগ, ও পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, নিয়ত দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর আছে। আমরা স্বীকার করি, ইংরাজরাজত্বের শাসনাধীন হইয়া আমরা যে প্রকার শান্তি ও সুখভোগ করিতেছি, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কখন সে প্রকার শান্তি ও সুখভোগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যাহা রাজপুরুষেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং দয়াপূর্ব্বক করেন, তাহাই সুখের শেষ নহে। যাহাতে শুদ্ধ আমাদিগের মঙ্গল, যাহাতে আমাদিগেরই সুখবৃদ্ধি হইবে, সে কার্য্যে আমাদিগের যতদূর প্রয়াসী হওয়া উচিত, পরের মুখাপেক্ষায় না থাকিয়া; আপনারাই সচেষ্ট হইয়া তাহার অনুষ্ঠানে ব্রতী হওয়া যতদূর আমাদিগেরই উচিত, পরের ততদূর ঔচিত্য হইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের এত দূর নিশ্চেষ্ট ভাব, যেন সে কার্য্যভার কিছুই আমাদিগের নহে। আমরা পরের উপর সে ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। আমরা যদিও কোন বিষয় আপনা হইতে চেষ্টা করি, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত সুসম্পন্ন করিতে পারি না। যাহা আপনাদের প্রয়াসে সুসম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহাতেও আমরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সমাধা করিতে পারি না। কোন বিষয় স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে এখনও আমাদিগের ক্ষমতা হয় নাই। কিন্তু স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শিক্ষাদাত্রী। স্বাধীনভাবে, আত্মনির্ভর না করিয়া কার্য্য করিলে, কার্য্যবিষয়ক স্বাধীনতা কখনই লাভ করা যাইবে না। এমত অনেক কায আছে, যাহা সামাজিক সুখের জন্য, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য আমরা নিজেই করিতে পারি; সে সমস্ত কার্য্য আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করা ও রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহা গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না, যাহার জন্য নূতন নূতন রাজনৈতিক বিধানের আবশ্যক, তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে লাভ করিবার জন্য সতত আমাদিগের চেষ্টা নিয়োজিত থাকা আবশ্যক। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, আমাদিগের এই কয়েকটী অভাব আসিয়া উপস্থিত হয়।

১। গবর্ণমেণ্টকে আপনাদিগের অভাব জানাইবার জন্য প্রতিনিধিত্বের আবশ্যক।

২। গবর্ণমেণ্টের রাজ-বিধান-কার্য্যে

আমাদিগের কিয়ৎপরিমাণে অধিকার লাভ করা আবশ্যক।

৩। গবর্ণমেণ্টের সাধারণ-হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে আমাদিগের যথাসাধ্য সাহায্য-দান ও তাহার অনেক দূর আপনাদিগের হস্তে লওয়া আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে প্রতিনিধিত্ব দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। দেশীয় সাময়িক ও সম্বাদপত্র, এবং পার্লেমেণ্টের মহাসভা এই প্রতিনিধিত্ব-কার্য্যে ব্রতী আছেন। দেশীয় সম্বাদ-পত্রের প্রতিনিধিত্ব প্রজাগণের ইচ্ছাকৃত; পার্লেমেণ্টের প্রতিনিধিত্ব গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। সাময়িক ও সম্বাদ-পত্রের প্রতিনিধিত্ব বলিতে গেলে, প্রজাগণ জোর করিয়া গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্ট নিজে ইহা চাহেন নাই; কিন্তু যখন ইহা আছে, তখন গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখাইতে পারেন না। অনিচ্ছা থাকিলেও, এ প্রতিনিধিত্ব কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে। অতএব রাজ্যমধ্যে সাময়িক ও সম্বাদপত্রের প্রতিনিধিত্বের যে কোন ফলোপধায়িতা ও উপকারিতা নাই, একথা কখনই বলা যাইতে পারে না। প্রতিনিধিত্ব-কার্য্য সাময়িক ও সম্বাদপত্র দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাময়িক ও সম্বাদপত্রের সম্পাদন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, তদ্দ্বারা ত্রিবিধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাহারা রাজ্যের একটী শাসন-যন্ত্র এবং অত্যাচার-নিবারণের প্রধান উপায়, তাহারা প্রজামণ্ডলীর মুখস্বরূপ ও প্রতিনিধি, এবং সাধারণ জনগণের শিক্ষাগুরু ও উন্নতির পথপ্রদর্শক। ভারতবর্ষে এক্ষণে এইরূপ ত্রিবিধ-উদ্দেশ্য-সাধনের নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা সাময়িক ও সম্বাদপত্রকে এই উদ্দেশ্য-সাধনে বরণ করিব। এই পত্র আমাদিগের প্রথমোক্ত অভাব-মোচনে কত দূর সক্ষম, তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমি বুঝাইতে চাহি যে, প্রজামণ্ডলীর মুখস্বরূপ ও প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া ইহা আমাদিগের দ্বিতীয় রাজনৈতিক অভাব-মোচনেও অনেকদূর সমর্থ। বিশেষতঃ যখন ভারতরাজ্যে ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান নাই, যখন কোন প্রতিনিধি সভা দ্বারা আমাদিগের রাজকার্য্যের মন্ত্রণা ও বিচার হয় না, যখন এরূপ সভার প্রত্যাশা বহুদূর, তখন আমরা যতদূর পারি, সাময়িক ও সম্বাদপত্রকে আমাদিগের প্রতিনিধিত্ব-কার্য্যে নিযুক্ত করিব। রাজা ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদিগের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব ও মন্ত্রণা গ্রহণ না করেন, আমরা আস্তে আস্তে ও অজ্ঞাতসারে তাহাকে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করিব। অতএব ভারতবর্ষে এক্ষণে সাময়িক ও সম্বাদপত্রের মূল্য অত্যন্ত অধিক। ব্রিটিশরাজ্য অপেক্ষা এখানে ইহার মূল্য দ্বিগুণতর। আমরা যে এত যত্ন পূর্ব্বক ইংরাজী

শিক্ষা করিতেছি,তাহা কি বৃথা হইবে? তদ্দ্বারা কি একটীও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব না? সেই বিদ্যাকে কি শুদ্ধ আমরা অর্থকরী বিদ্যা করিয়া রাখিব? আমাদিগের ইংরাজী বিদ্যা এই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব কার্য্য-পক্ষে কত দূর উপকারে আসিতে পারে, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতবাসী দ্বারা যে দুই এক খানি ইংরাজী সম্বাদ-পত্রিকা সম্পাদিত ও চালিত হইয়া থাকে, তাহাতেই আমার কথার যাথার্থ্য অনেকদূর প্রতিপন্ন করিতেছে; তাহাতেই আমরা ইহার রাজনৈতিক মূল্য কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে, তদ্দ্বারা আমাদিগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। সকলের যোগ্যতা ততদূর নাই। কোন কোন পত্র দল অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষপাতী। অনেক অকর্ম্মণ্য কাগজকেও আমরা আশ্রয় দিই। কোন সাময়িক পত্র আমাদিগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। আমাদিগের সাময়িক পত্রাবলিকেও এই উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত করা উচিত। দেশীয় ভাষায় যে সমস্ত সাময়িক ও সম্বাদ-পত্র চালিত হয়,তাহার অভিপ্রায়-অনুবাদে কোন ইংরাজী কাগজ নিয়োজিত নাই। এরূপ অভিপ্রায় অনুবাদের রাজনৈতিক মূল্য আমাদিগের ইংরাজী কাগজের সম্পাদকগণ হয় বুঝেন না, না হয়, তাঁহারা তাঁহাদিগের পত্রে তজ্জন্য স্বতন্ত্র স্থান দিতে পারেন না। অথবা সে কার্য্য-সম্পাদনের জন্য, যে স্বতন্ত্র পরিশ্রম ও সহায়তার আবশ্যক, হয় সে পরিশ্রম-স্বীকারে তাঁহারা কাতর, না হয়, তজ্জন্য সহায়তা প্রাপ্ত হন না। কিন্তু কথা এই, এরূপ অনুবাদের কি রাজনৈতিক প্রয়োজন নাই? গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক কি আমাদিগের সমুদায় প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন? তিনি শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেই নিয়োজিত। তাঁহা দ্বারা আমাদিগের বৃহৎ প্রয়োজন কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং এ জন্য আমাদিগের স্বতন্ত্র উপায়ের আবশ্যক, এজন্য আমাদিগের স্বতন্ত্র পত্র স্থাপন ও প্রচালন করা আবশ্যক। যদি নিজ আয়ে সে পত্র না চলে, তাহার ব্যয়, সমুদায় সমাজের দেওয়া আবশ্যক।

যাহাতে রাজ্যের ও প্রজাগণের সুখবৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে আমাদিগের ইংরাজরাজ অত্যন্ত অনুকূল। সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রস্তাবে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন তাঁহাদের হস্তাবলম্ব প্রসারিত করিতে প্রস্তুত, এমত অন্য কার্য্যে নহে। তাঁহারা এজন্য সাহায্য দিতে কখনই বিমুখ নহেন। অনেক স্থানের মিউনিসিপাল গবর্ণমেণ্ট প্রজা-

হস্তে অনেকদূর সমর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা এই গবর্ণমেণ্ট কেমন সম্পাদন করি, তদুপরি এই কার্য্যভার-সমর্পণের বিমুখ্যকারিতা নির্ভর করিতেছে। কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জেলার মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য কি এদেশীয়গণ তত পারগতার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন? আমরা এই কার্য্যে যত যোগ্যতা দেখাইব, ইহাতে যত মনোযোগ দিব, তত আমাদিগেরই লাভ। এই যোগ্যতার উপর আমাদিগের আর একটী ভবিষ্য রাজনৈতিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে, আমরা ক্রমশঃ অন্যান্য রাজকার্য্যে ও রাজমন্ত্রণায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিব। কিন্তু ইহাতে যদি আমরা যশ না পাই, আমরা কি মুখে অন্য অধিকারের প্রার্থী হইতে পারি? ইংরাজগণই বা কেন অন্য গুরুতর কার্য্যভার আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন?

আর এক স্থলে আমাদিগের যোগ্যতা দেখাইবার আবশ্যকতা হইয়াছে। এক্ষণে ইংরাজরাজ প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের রাজসভায় দেশীয় সদস্য গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ-হিতকর প্রস্তাবে তাহাদিগের মন্ত্রণা গ্রহণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ উদ্দেশ্য কি আমাদিগের সদস্যগণ সুসম্পন্ন করিতেছেন? তাঁহাদিগের সংখ্যার ন্যূনতা কি কার্য্যদক্ষতায় সম্পূরণ হয়? সংখ্যা-ন্যূনতার ছল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাঁহাদিগের উচিত নহে। তাঁহাদিগের কথায় যদি সুযুক্তি থাকে, তাঁহাদিগের মন্ত্রণায় যদি সদ্ভাব থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন? সুযুক্তি ও সুমন্ত্রণা যে স্থান হইতে আসুক না কেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা কখনই উপেক্ষা করেন না, করিতেও পারেন না। সংখ্যায় ন্যূন বলিয়া আমাদিগের চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে। আমরা যত দূর পারিব, আপনাদিগের স্বার্থের জন্য, রাজ্যের সুখের জন্য উদ্যোগী হইয়া মন্ত্রণা দিতে চেষ্টা করিব। এক বার বিফল হই, তাহাতে ক্ষতি নাই। সময়ে সময়ে আমাদিগের গবর্ণর বদলি হইতেছেন। যাহা ক্যাম্বেলের কাছে সুব্যবস্থা বলিয়া নির্ণীত না হইতে পারে, তাহা হয় ত ইডেনের কাছে সুব্যবস্থা বলিয়া গণনীয় হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ পরিবর্ত্তন আমাদিগেরই সুবিধার কারণ। সময় ও লোক বুঝিয়া কেবল প্রস্তাব করা আবশ্যক। লিটনের সময়ে যে মুদ্রাযন্ত্রের নববিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, রিপনের কৃপায় তাহা উঠিয়া গেল। আমাদিগের সমুদায় গবর্ণমেণ্টই সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কি স্থানীয় গবর্ণর, কি গবর্ণর-জেনরল, কি

সেক্রেটরি অব ষ্টেট সকলই মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের রাজশাসনপ্রণালী এবং কৌশলেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমাদিগের বেণ্টিক ও মেকলে যে উচ্চশিক্ষার বিধান করিয়া গিয়াছেন, ক্যাম্বেলের মত লোক তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এক বার যাহা প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া সুসাধ্য নহে। তাহাতে অনেক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়।

অতএব এই রাজ-পরিবর্ত্তন হেতু আমাদিগের মন্ত্রণা-দানের অনেক সুবিধা ঘটিতে পারে। ইহাকে আমাদিগের সুবিধা-সাধনোপযোগী করিয়া লইব। লোক ও সময় বুঝিয়া সকল বিষয়ের প্রস্তাব করিব। তাহা হইলে আমাদিগের অনেক দূর কৃতকার্য্যতা লাভ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ কৃতকার্য্যতা আমাদিগের রাজসভার দেশীয় সভ্যগণের যোগ্যতা, উদ্যোগ, কৌশল ও কার্য্যশীলতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা যত উদ্যোগী, কৌশলী ও কার্য্যশীল হইবেন, আমরা রাজকার্য্যের মন্ত্রণা-সম্বন্ধে, এবং নূতন নূতন সাধারণ হিতকর ব্যবস্থা-স্থাপন-সম্বন্ধে ততই কৃতকার্য্যতা লাভ করিব।

এক্ষণে আমাদিগের রাজনৈতিক অভাবের তৃতীয় সর্গে উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের তৃতীয় অভাব জাতীয় চরিত্র-বল। এই চরিত্র-বল কিরূপে সৃজন হইতে পারে, তাহাই আমার এক্ষণে বিবেচ্য বিষয়। এক্ষণে আমাদিগের জাতীয় চরিত্র-বল কিছুই নাই বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। বহুকালের অধীনতায় আমাদিগের প্রকৃতি এত মৃদু, নিস্তেজ ও কোমল হইয়া গিয়াছে যে, আমাদিগের সমস্ত জাতিকে একটী বৃহৎ স্ত্রীজাতি বলিলে অযথা কথা বলা হয় না। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বেও ভারতে অধীনতা যত নিম্ন স্তরে গিয়াছিল, এবং এই অধীনতার প্রভাবে যত দূর জাতীয় দুর্ব্বলতা সংসাধিত হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয়, আর কোন থানে হয় নাই। এখানে অধীনতা এক প্রকার ছিল না; এখানে অধীনতা নানা আকারে জাতীয় তেজ হ্রাস করিয়াছিল। অবশেষে মুসলমানগণের রাজনৈতিক অধীনতায় যাহা ছিল, একেবারে তাহার সমুদায় তেজ হরণ করিল। জাতীয় অধঃপতন সম্পূর্ণ হইল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে আমরা যেরূপ অধস্তরে নিমজ্জিত ছিলাম, তখন কোন বিজাতীয় সাহায্য নহিলে আমাদিগের উঠিবার যো ছিল না। বাস্তবিক অধীনতাই প্রাচ্য সভ্যতার প্রধান ধর্ম্ম। ইয়োরোপীয় সভ্যতার সহিত প্রাচ্য সভ্যতার তুলনা করিলে, এই বিভিন্নতা স্পষ্টাক্ষরে প্রতীত হইতে থাকে। ভারতে কেন—কি চীন, কি তাতার, কি পারস্য, সর্ব্ব প্রাচ্য দেশেই

অধীনতাই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ। "মানবজাতি যখন অসভ্য অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তখন তাহাদিগকে শাসনাধীনে আনিয়া বশীভূত রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, যতদিন এই বশ্যতা ও অধীনতা নিতান্ত দাসত্বে পরিণত না হয়, ততদিন জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু রাজকীয় অধীনতা যখন ঘোর দাসত্বে পরিণত হয়, তখন হইতে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। রাজ্যতন্ত্র এরূপ হওয়া চাই, যে বর্ত্তমান শাসন ও ব্যবস্থাবলি ভবিষ্য উন্নতির পথ রুদ্ধ না করে। যে স্থলে এরূপ ভবিষ্য-উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে, সে স্থলে ক্রমশঃ ঘোর রাজকীয় অধীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। এই মর্ম্মভেদী ঘটনা ইতিহাসের অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারত ও মিশরের পুরোহিত জাতির প্রভুত্ব, চীনরাজ্যের জনকের আধিপত্য আদৌ সেই সেই রাজ্যকে অনেকদূর সভ্যতামার্গে উন্নীত করিয়াছিল। এই উপায়ে প্রথমে সেই সেই রাজ্যের অনেক সুশৃঙ্খলা ও উন্নতিসাধন হইয়াছিল। কিন্তু এই উপায়ে সেই সেই রাজ্য, যে উন্নতি-সীমায় উত্থিত হইয়াছিল, এবং যে সীমা অতিক্রম করিলে, সেই দুই প্রভুত্বের বিনাশ হইত, সমস্ত রাজকীয় ব্যবস্থার গণ্ডগোল ও মহা বিশৃঙ্খলা ঘটিত, সেই সীমায় উন্নত হইয়া একদা চিরদিনের জন্য সেই সেই রাজ্য দণ্ডায়মান ছিল। এই উন্নতি-সীমায় আসিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে পারে নাই।" এই সীমায় উপনীত হইয়া ভারতে ব্রাহ্মণগণের বল বিক্রম প্রভূত হইয়া উঠিল। ভারতের অধীনতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শনৈঃ শনৈঃ সেই অধীনতার বৃদ্ধি হওয়াতে, ভারত একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ভারতের জাতীয় পতন সম্পূর্ণ হইল। ভারত পতনের সমস্ত কারণ অন্যান্য প্রাচ্য দেশে বিদ্যমান নাই বলিয়া, তাহারা আজিও দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহারা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদিগের উন্নতির আর বৃদ্ধি নাই, তাহাদিগের সভ্যতার আর উন্নতি নাই। তাহাদিগের সভ্যতা যে যে পথে উঠিয়াছিল, কিয়দ্দূর উঠিয়াই দণ্ডায়মান আছে। সমস্ত প্রাচ্য রাজ্যের সভ্যতার পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, সকলেতেই জাতীয় অধীনতা বিদ্যমান আছে।

আমি পূর্ব্বে আরও বলিয়াছি যে, প্রাচ্যরাজ্যের সহিত প্রধান প্রধান ইয়োরোপীয় রাজ্য সমুদায়ের তুলনা করিলে, পরিদৃষ্ট হইবে যে, ইয়োরোপীয় রাজ্য সমুদায় মধ্যে একটী মধ্য শ্রেণীর প্রকাণ্ড লোক-বিভাগ অত্যন্ত বলবীর্য্যশীল হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ মধ্য-শ্রেণী প্রাচ্যরাজ্য-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি উপরে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে এইরূপই ঘটিবার সম্ভাবনা। যেখানে ঘোর অধীনতা, সেখানে কেবল

দুই দল বর্ত্তমান থাকিতে পারে; এক দল প্রভুত্ব করিবে, অন্য দল তাহাদিগের অধীনতার বশবর্ত্তী থাকিবে। যাহারা প্রভুত্ব করে, তাহারা অধীনস্থ দলকে বাড়িতে দেয় না,—তাহাদিগকে সর্ব্বথা দাবিয়া রাখে। সমস্ত প্রাচ্য রাজ্যের এই সামাজিক অবস্থা। এখানে তিন দল লোকের বিদ্যমানতা সম্ভবে না। যে সমাজে স্বাধীনতা আছে, সেই সমাজেই কেবল তিন দল লোকের অবস্থান সম্ভবে। এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি হেতু যে সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়, সেই উন্নতির নেতৃ-স্বরূপ যাঁহারা সেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য সমাজের মধ্যে প্রধান ও বৃহৎ দল হইবেন। বলিতে গেলে, তাঁহারাই সমাজের জীবন-স্বরূপ। কিন্তু এই দলের মত্ততা, তাঁহাদিগের প্রবলতার আধিক্য, তাঁহাদিগের বীর্য্যের দমন জন্য, এবং সামাজিক শৃঙ্খলা-স্থাপন জন্য, একটী উচ্চ-শ্রেণীস্থ লোকেরও আবশ্যকতা হইয়া উঠে। আবার যাহারা সেই দল হইতে বিচ্যুত হয়, অথবা ক্ষমতাহীনতা, ও অজ্ঞতা হেতু সেই দলে উঠিতে না পারে, তাহারা অবশ্য সমাজ-মধ্যে নিম্নতর একটী তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইয়োরোপীয় মধ্যশ্রেণীর উৎপত্তি এইরূপ সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত হইয়া থাকে।

অধীনতা মানব-প্রকৃতিকে নিস্তেজ ও মৃদু করিয়া ফেলে। স্বাধীনতা মানব-প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি-সাধন করে। অধীনতা হইতে মৃদুতা সঞ্জাত হয়, স্বাধীনতা হইতে উৎসাহ, সাহস, বল ও বীর্য্য উদয় হইতে থাকে। অধীনতা মানবকে দুর্ব্বল করে, স্বাধীনতা মানবকে সবল করে। যাহা এক জন মানবের পক্ষে সত্য, তাহা সমগ্র জাতির পক্ষেও সত্য। কারণ, একটী সমগ্র জাতি প্রতি ব্যক্তির সমষ্টি-মাত্র। এই জন্য, আমরা অধীন-জাতি-মধ্যে যত মৃদু ধর্ম্ম দেখিতে পাই; আর স্বাধীন-জাতি-মধ্যে যত উগ্র ধর্ম্মের প্রাবল্য দেখি। ভারতবর্ষীয়গণ নিতান্ত মৃদু ও মেষপালের ন্যায় নিরীহ, কিন্তু ব্রিটিশ জাতি উদ্যোগী, সাহসী ও বীর্য্যবান্। ভারতবর্ষীয়গণের চরিত্র-বল কিছুই নাই, ব্রিটিশ জাতির চরিত্র-বল অতি দুর্দমনীয়।

ভারতবাসিগণের চরিত্র-বল সৃজন করিতে হইলে, তাহাদিগকে ইয়োরোপীয় সমাজের স্বাধীনতাকে অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজকে এই স্বাধীনতার ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইবে। স্বাধীনতার ভাব প্রতি জনের মনে বাগ্মীর অগ্নি-পরীত বাক্যে সঞ্জাত করিয়া দিতে হইবে। আমরা এক্ষণে যেমন সর্ব্ব বিষয়ে অধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া আছি, সে অধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা কি পরিবার-মণ্ডলে, কি সমাজ-মধ্যে, সর্ব্ব-স্থলেই

ঘোর অধীনতায় বাস করিতেছি, এই অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, স্বাধীনতার ভাবে সম্পূর্ণরূপে অনুবিদ্ধ করিতে হইবে। স্বাধীনতাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক করিতে হইবে।*

এক্ষণে বোধ হয়, আপনাদিগের প্রতীত হইতেছে যে, ইয়োরোপীয় সমাজের মধ্যশ্রেণীর মত ভারতে একটী মধ্যশ্রেণী সৃজন করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। এই মধ্যশ্রেণী সৃষ্ট না হইলে, জাতীয় চরিত্র-বল সৃষ্ট হইবে না। ইয়োরোপীয় মধ্য-শ্রেণীর জাতীয় ধর্ম্ম কি কি, তাহা আমাদিগের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত। কি কি কারণে ও প্রভাবে সেই গুণাবলির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ পর্য্যালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, শুদ্ধ স্বাধীনতানুরাগই ইয়োরোপীয়গণের মধ্যশ্রেণীর জাতীয় চরিত্রোৎপত্তির এক-মাত্র কারণ নহে, সাধারণ উচ্চশিক্ষাও অন্যতর কারণ। শুদ্ধ ইয়োরোপ-সমাজে আমরা সাধারণ উচ্চশিক্ষার রীতি প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাই। সেখানে সাধারণ সকল লোকেরই নিকট উচ্চশিক্ষার দ্বার বিমুক্ত রহিয়াছে। সাধারণ সর্ব্বজনেই উচ্চশিক্ষাকে আদরণীয় জ্ঞান করেন। স্বাধীনতার সহিত বিদ্যাদেবীর সম্মিলনের এই ফল। প্রাচ্যরাজ্যে এরূপ ফল দর্শে নাই; কারণ, সেখানে বিদ্যার সহিত স্বাধীনতার মিলন হয় নাই। প্রাচ্য সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ-জনগণ প্রায় মূর্খতায় সমাচ্ছন্ন। ভারতে এই মূর্খতা কত প্রবল ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নিম্নশ্রেণী মধ্যে বিদ্যালোচনা প্রবর্ত্তিত ছিল না। সমস্ত বিদ্যা ব্রাহ্মণজাতি-মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইয়োরোপীয় সভ্যতা—বিদ্যালোচনার অধিকার সর্ব্বসাধারণকে প্রদান করিয়া, এত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। সেই সভ্যতার দিন দিন উন্নতি-সাধন হইতেছে। বিদ্যা ও জ্ঞান-রাজ্যের সীমা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। জ্ঞানের সহিত জাতীয় বলের বৃদ্ধি হইতেছে। কারণ, মানবজাতির জ্ঞানই প্রধান বল। ইয়োরোপীয়গণ বুদ্ধিবলে ক্রমশই বলবান্ হইয়া উঠিতেছেন। "জ্ঞানাৎ পরতরং ন হি" এ কথা কেবল ইয়োরোপীয় সমাজেই প্রামাণ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষে সেই জ্ঞান ও বুদ্ধি কেবল ব্রাহ্মণ-চাতুরীর অস্ত্র-স্বরূপ হইয়াছিল। কু-বিষয়ে প্রযুক্ত হওয়াতে, তাহাতে কেবল কু-ফলই উৎপন্ন করিয়াছিল। ইয়োরোপে স্বাধীনতার সহিত জ্ঞান ও বুদ্ধির যোগ হওয়াতে, তাহাদিগের ক্রমশই স্ফূর্ত্তি ও বল-বৃদ্ধি হইতেছে। জ্ঞান ও বিদ্যা সর্ব্বসাধারণ জন-গণ-মধ্যে বিস্তারিত

* আমার "সমাজ-চিন্তা" নামক গ্রন্থেও এই মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

হইয়াছে; সমগ্র জাতির উন্নতি সাধন করিতেছে। সর্ব্বজাতীয় প্রকৃতিকে উন্নত ও বলবতী করিতেছে। অতএব আমাদিগেরও জাতীয় বল সৃজন করিতে হইলে,এই উচ্চ শিক্ষার আবশ্যক। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি,আমাদিগের জাতীয়-বল-সৃজন-পক্ষে এই দুইটী বিষয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদিগের সর্ব্বসাধারণ জন-গণ-মধ্যে স্বাধীনতার ভাব উদ্রেক করিয়া দেওয়া উচিত, এবং যত দূর সাধ্য উচ্চশিক্ষার বিস্তার করা আবশ্যক। স্বাধীনতা-শব্দে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতার কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য, এবং উচ্চশিক্ষা শব্দ ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

জাতীয় উন্নতি ও চরিত্র-সৃষ্টির পক্ষে এক্ষণে এই দুইটী উপায় প্রশস্ত বোধ হইতেছে। আমি বলি—অগ্রে জ্ঞান, তৎপরে কার্য্য। জ্ঞান ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। অগ্রে সমস্ত-জাতি-মধ্যে যাহাতে স্বাধীনতার ভাব সুপ্রচারিত হয়, অগ্রে বিদ্যালোচনায় যাহাতে সমস্ত-জাতি-মধ্যে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে পারে এবং যাহাতে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত। প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে, চরিত্র-বল ক্রমশ স্বতই সঞ্জাত হইবে। যাহাতে স্বাধীনতার ভাব দেশ-মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, যাহাতে এই জ্ঞান-বিস্তার সাধিত হইতে পারে, তজ্জন্য আমি এই কয়টী উপায় স্থির করিয়াছি।

১। বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষার উন্নতির পথ আরও বিস্তারিত করা উচিত।

২। সাময়িক এবং সম্বাদপত্রের সংখ্যা ও যোগ্যতা-বৃদ্ধির প্রয়োজন।

৩। দেশীয় ভাষায় উচ্চবিদ্যার জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন।

৪। প্রকাশ্য লাইব্রেরী, ও সভায় সর্ব্বদাই জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন।

৫। দেশীয় ভাষায় বাগ্মিতার প্রয়োজন।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহা যথেষ্ট নহে। এই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আরও অধিক বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত, এবং যাহাতে উচ্চশিক্ষা সাধারণ-জনগণের অল্পব্যয়েও অল্পবেতনে সম্পন্ন হয়, এমত উপায় সকল অবলম্বন করাও উচিত। স্কলারসিপ অথবা ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য ফণ্ড ও অর্থানুকূল্য করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে সাময়িক ও সম্বাদ-পত্রের দ্বিবিধ প্রয়োজনের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছি। সমাজ মধ্যে ইহাদিগের আর একটী প্রয়োজন আছে। ইহাদিগ দ্বারা আমরা সাধারণ-জ্ঞান-রাজ্য বিস্তার করিতে পারি। ইহারা সমাজের শুধু শাসন নহে, শুধু প্রতিনিধি নহে, ইহারা সমাজের শিক্ষক ও গুরু। ইংলণ্ডে সাময়িক পত্রাবলি এক্ষণে

জ্ঞানালোচনার প্রধান উপায়। ছাত্রেরা স্কুলে জ্ঞানালোচনা করে, বৃদ্ধ লোক ও অধ্যাপকেরা সাময়িক এবং সম্বাদ-পত্রে জ্ঞানালোচনা করেন। এ দেশে স্কুল ছাড়িবার পরেই লোকের জ্ঞানালোচনার পথ এক রকম রুদ্ধ হইয়া যায়। তাহাদিগের পক্ষে সাময়িক ও সম্বাদ-পত্র পরম উপকারী। কি লেখক, কি পাঠক, উভয়েরই ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদিগের অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল পুস্তকে প্রকাশ করা উচিত। সভায় তাহার বিচার করা উচিত। সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশে দেশ-মধ্যে সভা-সংস্থাপনের এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন। সামাজিক-উন্নতি-চিন্তায় পাঁচ জনে একত্রিত হইয়া পরামর্শ স্থির করা এক্ষণে যত আবশ্যক হইয়াছে, দুঃখের বিষয় এই, তদুপযোগী সমাজ সকল স্থাপিত হয় নাই। এইরূপ সভা বাগ্মিতা অভ্যাসের এবং পরিচয়েরও প্রশস্ত ক্ষেত্র। পব্‌লিক্ লাইব্রেরী-রূপ প্রকাশ্য স্থলে বিদ্বজ্জন-গণের একত্র সমাগমের কি শুভ ফল হয়, তাহা এডিসনের সম্বন্ধে প্রকাশিত আছে। সর্ব্বশেষে এক্ষণে আমাদিগের সমাজ-মধ্যে বাগ্মীর যত আবশ্যক, এমত আর কিছুই নহে। ভারত এখন অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাগ্মীর উত্তেজন-বাক্য ও উদ্বোধনায় তাহাকে জাগরিত করিতে হইবে। সাধারণ-জনগণকে উদ্বোধিত করিতে হইলে, দেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করা উচিত। যাহাতে হৃদয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠে, যাহাতে লোকের মনে স্বাধীনতার ভাব জাগরিত হয়, যাহাতে সাধারণ-জন-গণ স্বদেশানুরাগে পূর্ণ হয়েন, যাহাতে লোকে উত্তেজিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ বাগ্মিতার এক্ষণে যে কত প্রয়োজন, তাহা বর্ণনাতীত।

আমাদিগের এই সমস্ত অভাব যে পরিমাণে পূরণ হইবে, সেই পরিমাণে আমাদিগের সমাজে মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হইতে থাকিবে। এই মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি না হইলে, আমাদিগের জাতীয় চরিত্র-বল সৃষ্ট হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত অভাবের যতই সম্পূরণ হইতে থাকিবে, আমরা ততই দেখিতে পাইব, ভারতবর্ষে একটী নূতন জাতি নব-বলে বলীয়ান হইয়া উত্থিত হইতেছে। এই জাতির সৃষ্টি হইবার এখনই প্রারম্ভ হইয়াছে। যে সকল বীজে এই জাতি সৃষ্ট হইবে, তাহা রোপিত হইয়াছে। এই বীজ যাহাতে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, আমাদিগের এক্ষণে সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা উচিত; সেই সকল উপকরণ আনিয়া দেওয়া উচিত। আমাদিগের অভাব-মোচনের সূত্রপাত-মাত্র হইয়াছে। যে দিবসের আলোকে আমরা প্রভাসিত হইব, তাহার প্রভাত-রশ্মি দেখা দিয়াছে। আমার সম্মুখেই সেই আলোক দেদীপ্যমান। আমার সম্মুখেই সেই নব-জাতির

পূর্ব্বপুরুষগণ বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই জাতির অভ্যুদয় শীঘ্র অথবা বিলম্বে হওয়া আপনাদিগেরই হস্তে। এই গুরু-ভার যাঁহাদিগের উপর অর্পিত, তাঁহারা কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আপনাদিগের আশাপূর্ণ, উল্লাসিত ও উৎসাহের মুখ-বিকাশ দেখিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, আপনারা নিশ্চিন্ত নহেন। আপনাদিগের প্রসন্ন মুখ-বিকাশ ও প্রখর-নয়ন-জ্যোতিঃ দেখিয়া আমার আশা হইতেছে, সেই নবজাতির অভ্যুত্থানের অধিক কাল বিলম্ব নাই। আপনাদিগেরই মুখ-বিকাশে ও নয়ন-জ্যোতিতে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। এই কল্পনা-দৃশ্য যেন সত্য হয়, এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

অভিমন্যু-বধ ও রঙ্গভূমি।

অভিমন্যু-বধ—শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোস প্রণীত।

ন্যাশান্যাল্ থিয়েটারে অভিনীত।

আর্য্য-বালক—শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত।

উভয় পুস্তকই মহাভারতীয় অভিমন্যু-বধ আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। নগেন্দ্র বাবুকে আমরা চিনি না। সাহিত্য-সংসারে তাঁহার নাম নাই। তাঁহার পুস্তক খানির আকৃতি দেখিয়াই প্রথমে ঘৃণার উদ্রেক হয়। বটতলা-শোভিনী দুষ্টা সরস্বতী যে পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বাহির হন, ইহার পুস্তক খানি সেই বেশে সাধারণ-সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। গিরীশ বাবু সংবৎসরে উপর্য্যুপরি পাঁচ ছয় খানি পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি ন্যাশান্যাল্ থিয়েটারের অধ্যক্ষ, এবং তাঁহার প্রণীত নাটকগুলি মুদ্রাঙ্কিত হইবা-মাত্রেই উক্ত রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। শত শত লোক অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং পুস্তক-সমূহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেশের প্রধান প্রধান অনেক সংবাদ-পত্রে তাঁহার রচিত পুস্তক-সমূহের সুখ্যাতি-পূর্ণ সমালোচনা দেখিতে পাই। সেই সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাঁহার অভিমন্যু-বধ পাঠ করিয়াছি। কিন্তু পাঠ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

পুস্তকখানি কাব্য; সুতরাং কবিতাপূর্ণ হইবার কথা। কবিতার প্রধান উপাদান—মনোহর ভাব ও ছন্দ। ছন্দ কবিতার ভিত্তি-ভূমি। ছন্দ—সূত্র; রসাত্মক-ভাব—কুসুম। এই মনোহর জগতে উভয়ই প্রচুর পরিমাণে বিকীর্ণ আছে। সকলে তাহা জানে না; কিন্তু কবি দিব্য-চক্ষে সর্ব্বদাই তাহা দেখিতে পান; এবং মনোমত কুসুম আহরণ করিয়া বিচিত্র কৌশলে কবিতাহার গ্রন্থিত করেন।

আজি কালি এরূপ গাঁথনদারের অভাব নাই। নানা প্রকারের চিকণ গাঁথনি সর্ব্বদাই বাজারে দেখা যায়। কিন্তু যিনি বিনাসূত্রে হার গাঁথিতে পারেন, তাঁহার কৌশল বিস্ময়-জনক। আমরা এ পর্য্যন্ত বিনাসূতার কবিতাহার দেখি নাই, শুনিও নাই। আজি গিরীশ বাবুর অনুগ্রহে আমরা তাহা দেখিলাম। তিনি অভিমন্যু-বধের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "তোল তান গ্রন্থিহীন গান।" গ্রন্থিহীন গানই বটে। ছন্দ, যতি, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি কোন কূটগ্রন্থি তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলিকে বিকৃত করিতে পারে নাই। তবে "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" যদি তাঁহার রচিত পুস্তক-সমূহে ছন্দ-প্রভৃতির গন্ধ থাকে, তাহা ব্যতিক্রম মাত্র। শিশু কালি,কলম হাতে পাইলেই হিজিবিজি লেখে। তাহার ভিতর যদি ইংরাজি কি ফার্সীর দুই একটা অক্ষর দেখা দেয়, তাহা হইলে, কি শিশুর হিজি বিজি লেখা ব্যর্থ হয়? কখনই না।

আমরা আর অধিক কথা বলিয়া পাঠক-বর্গের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। গিরীশ বাবুর অদ্ভুত কাব্য হইতে দুই একটী রত্ন উদ্ধার করিয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিই। ইচ্ছা আছে, তৎসঙ্গে রত্নগুলির কিছু কিছু পরিচয় দিব। বোধ হয়, গিরীশবাবু ইহাতে কাতর হইবেন না। কেন না, তাঁহার পুস্তক-গুলি এক এক খানি রত্নাকর-বিশেষ।

৯ পৃ। "এ সমরে তুমি অধিকারী"

বালক কারা? কুরুক্ষেত্রের বীরগণ নাকি?

"শুনুন সমাগত বীর-গণে,
নিষ্পাণ্ডবা সমর সঙ্কল্প প্রাতে,
"লভহ বিরাম ক্ষণে।"—

বীরগণে কি পদ? দ্বিতীয় ছত্র পূর্ণ চতুষ্পদ; সুতরাং, ব্যাকরণের সহিত উহার সম্পর্ক নাই। "ক্ষণে" শব্দের অর্থ কি? "ক্ষণে শব্দ কি "এক্ষণে" শব্দের পরিবর্ত্তে না "ক্ষণকালের জন্য" এই অর্থে ব্যবহৃত হয়?

১১ পৃ। "বিস্তার সরসী।"

"বিস্তার" শব্দ এখানে কি পদ? এই পদটী কি হামাগুড়ি দিয়া ছত্রের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে?

"জিনিব পাণ্ডবগণে অর্জ্জুন বিহনে"

ইহার ভাব কি? যদি অর্জ্জুন বিরহিত পাণ্ডবগণ বলা উদ্দেশ্য ছিল, সে ভাব কি এই পদে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে? না, পদটী দ্বিভাব হইয়া গিয়াছে?

৩৮ পৃ।—"উত্তরা। যাও নাথ বধিয়া আমায়।"

অভি।—"প্রিয়ে, সকলই ভাল সহ্য মত।"

উত্তরা এ উত্তর কিরূপে সহ্য করিলেন, জানি না; কিন্তু পাঠকবর্গের কি এ উত্তর সহ্য হয়?

৪২ পৃ। "কুলমান দায় ছেদিনু প্রেমের ছুরি!" এ টপ্পা, না কাব্য?

৪৩ পৃ। "অভি।—যাই দ্রুত,
পারি যদি কুলাইতে সমরের ব্যয়।"

এই দুই ছত্রে যে কি অপূর্ব্ব ভাব নিহিত আছে, তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধির অগোচর।

৫১ পৃ। "যুধি। না পালাও, না
পালাও সেনাগণে,"

"গণে" কেন? অথবা যে "সৈন্যগণে," যুদ্ধ ছাড়িয়া পালায় তাহাদের কর্ম্মপদ দেওয়াই উচিত। ব্যাকরণ না দিউক, কবি দিয়াছেন।

৭০ পৃ। দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপে,
"এক-কালে পরাজিল দুরন্ত বালকে।"

এখানে কে কাহাকে "পরাজিল।" "কৃপেদিগর "বালকে পরাজিল" না "বালকে" "কৃপের" দলকে পরাজিল?

৮০ পৃ। "আরে আরে কুলাঙ্গারগণে,
"অচেতন শত বার লুটায়েছে শির,
"সম্মুখে আমার তোমা সবাকারে
রণে।"

"একার কি একচেটে করে'বই খানি লেখা হইয়াছিল; না, "এ"কার না দিলে, কবিতাপদ সমাপ্ত হয় না?

৮১ পৃ। "দর্পে যবে সপ্তরথী চালাইলা হয়,
শিশু বরাবরি রণে।"

আমরা উড়িয়াদিগের মুখে "হেঁইয়া বরাবরি" শুনিয়াছি, "শিশু বরাবরি" এই শুনিলাম।

৮৪ পৃ। "কভু দেখি, কভু লুকি,
"দেবের নির্ম্মিত যান।"

"লুকি" এই পদটী কি নূতন ছাঁচে ঢালাই করা? ইহার অর্থ কি?

পাঠক মহাশয়েরা আর দেখিতে চাহেন? প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রায় প্রতি ছত্রে এইরূপ রত্নরাজি শোভা পাইতেছে।

এখন কবির ভাব ও রুচির কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করুন।

৪১ পৃ। অভিমন্যু বৃদ্ধ গণককে বলিয়া দিলেন।

"ক'য়ো উত্তরারে—
"নাহি ভয় পুনঃ আসি করিব চুম্বন।"

সে ভারটা গণকের উপর দিলে, আরও ভাল হ'তো না?

৭৭ পৃ। রণ-গুরু দ্রোণাচার্য্য কহিতেছেন—

"হের মহারাজ
"সজারু সমান অঙ্গ বাণে,
"দাঁড়া'য়ে রহে'ছি মাত্র শরাসন-
ভরে।"

একটী কথা মনে পড়িল। "শরচ্চন্দ্র-মরীচিবৎ" এক জন ইহার এই ব্যাখ্যা করিয়াছিল—শরতের চন্দ্র কেমন গোল? না মরীচটির মতন। অমিততেজা দ্রোণা-

চার্ব্বা বাণ খেয়ে খেয়ে যেন সজারুটি হয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন। কি চমৎকার উপমা!

৯১ পৃ। অভিমন্যু মৃত্যুর পূর্ব্বেই দুই পাত বক্তৃতা করিলেন। তাহার ভিতর এইরূপ ভাবের বুক্‌নি।

"প্রাণ যায়, ফিরে চায়।
"মোহে দু নয়নে বহে বারি।"

আমরা ইহার (Parallel passage) সদৃশ পদ জানি।

"প্রাণ যায় যায়, চায় ফিরে,
"সজল নয়নে,
"ফিরাও তাহারে সখি"
নিধুর টপ্‌পা।

১০৫ পৃ। অভিমন্যু রণে পতিত হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলে সভায় আছেন; এমন সময়ে উত্তরা কহিলেন—

"কহ তাত, কহ বাসুদেব
"কেন হর অর্ঘ্য নাহি নিল
* * *
"নিশ্বাসে হইল ভস্ম প্রাণনাথ মম,
"কিন্তু, হে মধুসূদন!
"খেদ নাহি তায় মম,
"বল মোরে কেন ভাণ্ডাইল
ভূতনাথ?

মাইকেলের অনুকরণে যে ভবিষ্যতে অনেক কবি "ভাণ্ডাইল ভূতনাথ"-রূপ পদ-রচনা করিবেন, এইরূপ অনুমান করিয়াই রামদাস "ভারতোদ্ধার" লিখিয়াছেন।

অমন স্বামী মরিল, উত্তরার বয়ে গেল; কিন্তু হর যে অর্ঘ্য লয়েন নাই, এই বড় দুঃখ। সেই দুঃখে ভাগ্নেবধূ মামাশ্বশুরের উপর একপালা ছেড়ে গাইলেন। কহিলেন,

"মাতা'লে গোপিনী-প্রাণ
"বাজা'য়ে বাঁশরী"।

শ্রীকৃষ্ণ যে সকলকে কেবল কাঁদাইয়া বেড়ান, গোবিন্দ অধিকারীর সেই পুরাতন গীতটী এইরূপে রূপান্তরিত হলো। পাঠক! সুরুচির পরিচয় আর চাই? বোধ হয়, যথেষ্ট পাইয়াছেন। এই বার কল্পনার দৌড় দেখুন।

৩১ পৃষ্ঠায় স্বপ্ন ও তাঁহার সঙ্গিনীর সঙ্গে কথা বার্ত্তা আছে। এখানে কবির কল্পনা একেবারে লাগাম ছিঁড়িয়াছে। গীতের একটী কলি এই—

"চাঁদে কাঁদে, তারা বাঁধে
দেখ দেখ কত আনাগোনা
কেবা আসে, কেবা হাসে,
কে ভাষে গগনে, মানা নাহি মানে,
রবি নিভিল,
জোনাকী টিম্ টিম্ টিম্ লো।"

পাঠক মহাশয় ইহার কিছু অর্থ করিতে পারিলেন কি? আমরা ত পারি নাই। কিন্তু "ভারতী" ইহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন। হয় ত স্বপ্নের কথা বলিয়া ইহার অর্থ নাই; nature বজায় হইয়াছে। সাবাস!!! তা স্বপ্নের ত nature বজায় হইল। দেখা যাউক, কবি প্রধান ব্যক্তিগণের nature কত দূর বজায় রাখিয়াছেন। পুস্তক-খানি ক্ষুদ্র, কিন্তু গর্ভাঙ্ক ২৮টী

২৮ বার পট-পরিবর্ত্তন; আর মাঝে মাঝে পুতলোর নাচ। কেবল কুরু-পাণ্ডবে কুলায় নাই। কবি-কল্পনা পিশাচ, পিশাচী, ঋষি, গণৎকার প্রভৃতি কত কি আনিয়া জুটাইয়াছেন! রক্ষা এই যে, চন্দ্রের ২৭টী ইনীর মধ্যে শুদ্ধ রোহিণী দেখা দিয়াছেন। পুরা ২৭টী নামিয়া আসিলে বোধ হয়, সপ্তরথির প্রয়োজন হইত না। বাস্তবিক নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনেরও স্বভাব সুচিত্রিত হয় নাই। প্রকৃত নাটকত্ব পুস্তকখানিতে অতি বিরল। অধিক কথা কি, আমরা গিরীশবাবুর রচিত অভিমন্যু-বধ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, তাহার অভিনয়ও দেখিয়াছি; কিন্তু, এতাদৃশ শোকপূর্ণ আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া বা অভিনীত দেখিয়া আমাদের পোড়া চক্ষে একবিন্দুও জল আসে নাই। অনেকবার ভাবিয়াছি যে, হয় ত আমরা নিতান্ত হৃদয়হীন; তাই হৃদয়ের ছন্দ বুঝিতে পারিলাম না। হয় ত আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ততদূর উন্নত নয় বলিয়া এতাদৃশ উচ্চদরের কবিত্ব বুঝিতে পারিলাম না। আহা, যেন তাহাই হয়! আমাদেরই ভ্রম সাব্যস্ত হয়। নহিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের যে শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মনে করিলেও কষ্ট বোধ হয়। যে দিন পবিত্র সাবিত্রী-উপাখ্যান "আদর্শ সতীর" আকারে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া অনেকের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই দিনই নব্যবুঙ্গের অপূর্ব্ব রুচির পরিচয় পাইয়াছিলাম। ক্রমে "দ্রৌপদী-হরণে" মহাবীর ভীমসেন খেম্‌টা তালে নৃত্য করিলেন। এক্ষণে সেই প্রণালীর লেখা, সেই অদ্ভুত রুচি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। গিরীশবাবুর পুস্তক গুলি সেই নববৃক্ষের সুপক্ক ফল। আমাদের স্বাদহীন জিহ্বায় এই মনোরম ফলটি তিক্ত লাগিল। আমরা তাহাকে অভক্ষ্য মাখাল-ফল-বোধে ত্যাগ করিলাম। এক্ষণে "আর্য্যবালক" নামক অপর গ্রন্থখানির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর্য্য-বালক যে এক খানি ভাল নাটক, আমরা এ কথা বলি না; কিন্তু সেই পুস্তক সমালোচনের কারণ এই যে, আমরা দেখাইতে চাহি, যে গিরীশবাবু অপেক্ষা একজন নবীন ও সামান্য লেখক ও একই বিষয় লিখিতে কত উৎকৃষ্টতর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

আর্য্যবালকের অবতারণা অতীব মনোহারিণী। প্রথম অঙ্কে শাপভ্রষ্ট চন্দ্রদেবের জন্য কিন্নর ও কিন্নরী দ্বারা চন্দ্রধামের তাৎকালিক দুরবস্থা-বর্ণন, এবং তাঁহাকে অচিরে পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে উল্লাস-প্রকাশ সাতিশয় মনোহর। দ্বিতীয় অঙ্কে কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণকে কৌরবাধিপতি দুর্য্যোধনের উৎসাহ-বাক্য এবং তাহাদের প্রত্যুত্তর অতীব ধীর ও গম্ভীর। তৎপরে পাণ্ডব-শিবিরে যখন সমাগত বীরগণ চক্রব্যূহ

ভেদ করার উপায়-উদ্ভাবনে অক্ষম হইলেন, তখন অভিমন্যু অতি বিনীত-ভাবে অথচ বীরোচিত বাক্যে আপনি সেই দুরূহ কার্য্যের ভারগ্রহণ করিলেন। অভিমন্যুর মাতার নিকট বিদায়-গ্রহণ বড়ই সুন্দর। সন্তানের বিপদ-আশঙ্কা মায়ের মনে সহজেই উদয় হয়। সুভদ্রাও সেই স্ত্রীজন-সুলভ আশঙ্কা-বশে স্বীয় পুত্রকে রণে যাইতে বিস্তর নিষেধ করিলেন। কিন্তু বীরমাতা সুভদ্রা যখন দেখিলেন, অভিমন্যু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উদ্যমশীল, তখন আর বাধা দিলেন না। তখন বীরজননী বীরপুত্রকে বলিয়া দিলেন, দেখ বাছা যেন কুলগৌরব রক্ষা হয়। তোমার ভুবনবিজয়ী পিতা কখন রণে ভঙ্গ দেন নাই। দেখ; যেন এ পবিত্রকুলে সে কলঙ্ক স্পর্শ না করে। স্মরণ রেখ যে, ক্ষত্রিয় বীর অকাতরে প্রাণত্যাগ করে; তথাপি বিপক্ষকে পৃষ্ঠ লক্ষ্য করতে দেয় না। এই ত ক্ষত্রিয়রমণীর উপযুক্ত বাক্য। গিরীশবাবু এই বিদায়-গ্রহণ-স্থলে অভিমন্যুকে একটী আকাট গোঁয়ার সাজাইছেন। আর বীরপত্নী সুভদ্রাকে রণগামী সন্তানের মঙ্গল-কামনায় ইষ্টদেবের পূজা ছাড়াইয়া গণৎকারের শরণাপন্ন করিয়াছেন। বোধ হয়, কেবল যাত্রার সং বাড়াইয়া ছেলে ভুলাইবার জন্যই এরূপ করিয়া থাকিবেন। ব্যূহমুখ হইতে জয়দ্রথের নিকট ভীমের সদৈন্যে প্রত্যাখ্যান-বর্ণনা বড়ই দুরূহ কার্য্য। যিনিই এ চিত্র আঁকিতে গেছেন, তিনিই ভীমের মুখে কতকটা কালি নিক্ষেপ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর হস্তে কেবল ভীমসেন সেইস্থলে উজ্জ্বলতর বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। যখন ঘোরতর-যুদ্ধে নিমগ্ন ভীম দেবাদিদেবকে জয়দ্রথের পৃষ্ঠরক্ষক দেখিলেন, তখনই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। জয়দ্রথও ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া বৈরীভাব বিস্মৃত হইয়া ভীমের সহিত যোগ দিলেন। প্রজ্বলিত দাবানল যেন ধারাসম্পাতে সহসা নির্ব্বাপিত হইল। শান্তরসে রণস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। ভীমের তখনকার মর্ম্মভেদী বচনে চক্ষে জল আসে না, এরূপ পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তি বোধ হয় কেহই নাই। যখন ভীম দেখিলেন, আর উপায় নাই, পৌরুষে জয়লাভ হইবে না; বিনয়বচনে আশুতোষকে তুষ্ট করিতে পারিবেন না; তখন রোষে, ক্ষোভে ভীমোচিত বাক্যে বলিলেন, "দেব! আপনার ঐ জগৎ-সংহারকারী অমোঘ ত্রিশূল দিয়ে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করুন্। ভীমের যশ ও প্রাণ এক সঙ্গেই পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হোক্।" কি মহান্ ভাব! কি স্বভাবোচিত বাক্য! যখন রণস্থলে সপ্তরথী এক সঙ্গে বেষ্টন করিল, তখন অভিমন্যু অকাতরে, ধীর গম্ভীরভাবে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ, জয়দ্রথ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি পরাস্ত হইল; কিন্তু যখন পিতৃগুরু দ্রোণাচার্য্যকে

আপনার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে দেখিলেন, তখন অভিমন্যু ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া বাক্যবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বীর-করুণ বচনাবলিতে পাষাণও ভেদ হয়। তিল মাত্রও স্বভাবের ব্যতিক্রম নাই। একটী কথাও কাণে খট্ করিয়া উঠে না; একেবারে হৃদয়ের মর্ম্ম স্থানে গিয়া আঘাত করে।

আর্য্যবালকে অভিমন্যুর মৃত্যুর পরে দ্রোণাচার্য্যের খেদ মেঘনাদ-বধে বিভীষণের খেদের অনুকরণ। অনুকরণ বলিয়া, ইহার রচনা উৎকৃষ্ট হইলেও, আমরা ততদূর প্রশংসা করিতে পারিলাম না। গ্রন্থ খানির দ্বিতীয় অঙ্ককেও আমরা সম্যক প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এই অঙ্কটী অত্যন্ত হাস্যকর হইয়া পড়িয়াছে। এই দৃশ্যে কবি এক দিকে অতি গম্ভীর-ভাবে কৌরব-শিবিরস্থ ব্যূহ এবং কৌরব-দলস্থ যোদ্ধ্‌বর্গের স্পর্দ্ধা বর্ণনা করিলেন—এরূপ দেখাইলেন, যেন তাঁহারা ভুবন-বিজয়ে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু তৎপরেই যখন নিরীহ যুধিষ্ঠির তথায় একাকী উপস্থিত হইলেন, তখন এক বার কেবল দ্রোণাচার্য্যের সহিত তাঁহার একটু গুঁতোগুঁতি হইল, অমনি জন কতক লোক আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন পূর্ব্বক হল্লা করিতে করিতে, স্বচ্ছন্দে সেই রণস্থল হইতে লইয়া গেল; সকলে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল; যেন মেষপালের মধ্যে মহিষ আসিয়া অনায়াসে চলিয়া গেল। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কেবল দৃশ্য-যোজনার দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে। প্রথম অঙ্কে কিন্নরীর প্রথম গীতটী পড়িয়া আমাদিগের আর কিন্নরীর গীত বলিয়া মনে হইল না। ইহাতে একটী ইতর গীতের অনেক পদ দৃষ্ট হইল, এবং তাহার সুরও ইহাতে যোজিত হওয়াতে, এই গীতটী অত্যন্ত ইতর হইয়া গিয়াছে।

আর্য্যবালকের দুই এক স্থলে নাট্যোলিখিত ব্যক্তির প্রবেশ অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। দ্রোণাচার্য্য ব্যূহ সাজাইয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "আমি আজ দেবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও যুধিষ্ঠিরের শিরোদেশ আপনার ঐ রাজপদে লুণ্ঠিত করবো।" এই কথা বলিবামাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ তথায় যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত। আবার জয়দ্রথ যখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি আজ ভীমসেনকে জয় করিয়া কাম্যবনের অপমানের প্রতিশোধ লইব, তখন অমনি, ভীমসেনও তৎ-সমক্ষে উপস্থিত। আমরা আর দৃষ্টান্ত বাড়াইতে চাহি না। অনেক স্থলের এইরূপ নিষ্প্রয়োজন প্রবেশ দেখিয়া আমাদিগের পুতলো-বাজি মনে পড়ে।

আমরা আর দুই একটী কথা বলিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। আমরা গিরীশবাবু-প্রণীত পুস্তকাদিতে দেখিতে পাই, তিনি কিছু অদ্ভুত ও অলৌকিক কল্পনা ভালবাসেন। ম্যাক্‌বেথে যেমন

ডাইনেরা আছে, তিনি সেইরূপ কল্পনা ভালবাসেন, তিনি সকল গ্রন্থেই ডাইন, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, রাক্ষস, রাক্ষসী ভূত, প্রেত, দৈত্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাদিতে কবিত্ব ও নাটকত্ব যত না থাকে, কেবল অদ্ভুত দৃশ্যে পরিপূর্ণ। তিনি সং সাজাইতে ও অভিনয়ে সং আনিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। তিনি এইরূপ ব্যক্তিগণের অবতারণার জন্য গ্রন্থ মধ্যে স্থান খুঁজিয়া লয়েন, অবসর করিয়া লয়েন। এক্ষণকার রঙ্গভূমি যেমন স্কুলের ছাত্রে পরিপূর্ণ; গিরীশবাবুও তেমনি তাহা বুঝিয়া নাটক লেখেন। নাটক-মধ্যে কেবল সং দেন, সুতরাং বাহবা ও হাত-তালীর ধুম্ পড়িয়া যায়। প্রাচীন-পক্ষীয়গণ যদি কেহ অভিনয় দেখিতে যান, তাঁহারা হাসিয়া উঠিয়া আসেন; মনে মনে কহেন, যেমন শ্রোতা, তেমনি কবি জুটিয়াছে। সে দিন দেখা গেল, সীতার বিবাহ-উপলক্ষে বরণ-ডালা আসিল, হুলাহুলি পড়িল, এবং বিবাহ কার্য্যের সমুদায় অভিনয় হইয়া গেল; খুব হাততালী পড়িয়া গেল। আমরা কি এই কার্য্য দেখিতে রঙ্গভূমিতে যাই? গৃহে কি ইহা দেখি নাই? কই ইংরাজী রঙ্গভূমিতে ত এরূপ দৃশ্যের অভিনয় হয় না। ইহা কি অভিনয়ের বিষয়? এই জন্য এক্ষণে আমাদিগের রঙ্গভূমি এত অশ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছে। নাটকগুলি ছেলে ভুলান বহি, অদ্ভুতরসে পরিপূরিত হইয়া কল্পনাকে আকৃষ্ট করে, অভিনয় ছেলে ভুলান কীর্ত্তন-মাত্র। শ্রীআঃ—

নাস্তিকতা।

(প্রস্তাবনা)

মহর্ষি কপিল যে ত্রিবিধ জ্ঞানপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরাও দেখাইয়াছি, নাস্তিকতা সেই ত্রিবিধ জ্ঞানমূলীয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ;—কপিলের মতে এই ত্রিবিধ জ্ঞানপথ। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যে কি প্রকার অনুমানমূলীয়, তাহা আমরা প্রদর্শন, করিয়াছি। যে সাক্ষাজ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, কপিল তাহাকে শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়াছি, তাহাকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাহি।

অনেকে বলিবেন, মানুষের প্রত্যক্ষজ্ঞান ভ্রমাত্মক। আমরা আকাশে যে ধনুক-আকার রামধনু দেখি, তাহা কি বাস্তবিক

ধনু? তাহা বাস্তবিক ধনু না হইলেও আমাদিগের দৃষ্টিতে তাহা ধনু বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? এ কথার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, যদিও প্রথম দৃষ্টির প্রত্যক্ষজ্ঞান ভ্রমাত্মক হইতে পারে, সেই প্রত্যক্ষের ভ্রম তৎপরের প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং চিন্তা দ্বারা দূরীকৃত হয়। বিজ্ঞান এই রামধনুর প্রকৃত তত্ত্ব কিরূপে আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমাদিগের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। প্রথম দিন যখন আমরা রামধনু দেখিলাম, তখন আমরা ইহাকে দেবতাদের ধনু ভিন্ন আর কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না। তার পর দেখিলাম, সেই ধনু শুদ্ধ বৃষ্টির প্রাক্‌কালে সূর্য্যের বিপরীত দিকে উদিত হয়। বৃষ্টি ধরিয়া গেলে, তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়। বারম্বার এইরূপ প্রত্যক্ষ করাতে বৃষ্টি ও সূর্য্যের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ স্থির করিতে হইল। বাল্যকালের জল-ফুৎকারে অতি ক্ষুদ্রাকারে রামধনুর ন্যায় ধনু দেখিয়াছি—তৎপরে আমাদিগের স্মরণ হইল। সুতরাং রামধনু কিরূপে জন্মে; তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম। এখানে কি প্রতীত হইতেছে না যে, ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও চিন্তা প্রথমকার জ্ঞানের ভ্রম নিরসন করিয়া দিল? এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানই প্রামাণ্য; এবং এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের কথাই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শব্দ অথবা সাক্ষ্যজ্ঞান আর কিছুই নহে, ইহা সমুদায় মানব-জাতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান মাত্র। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা হইতে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতেছে, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সেই জ্ঞানেরই সাক্ষ্য দিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন মানবের জ্ঞান জন্মিবার পথ আর দ্বিতীয় নাই। মানব কোন জ্ঞান লইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই। আমাদিগের যে সমস্ত জ্ঞান অথবা সংস্কার আপাততঃ সহজাত বলিয়া উপলব্ধি হইতে থাকে, একটু ভলিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, সে সমস্ত সংস্কারের প্রকৃতি এরূপ নহে যে, তাহারা জন্মিবার পর অর্জ্জিত হইতে পারে না। কোন্ সময়ে ও কিরূপে তাহারা আমাদিগের মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে না পারি, কিন্তু তা বলিয়া তাহাদিগকে সহজাত বলা যাইতে পারে না। এই পৃথিবী-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভিন্ন, অন্য জ্ঞান অথবা সংস্কার মানব-মনে নিহিত দেখি না। কিন্তু জ্ঞান যদি সহজাত হইত, তাহা হইলে কি এরূপ ঘটিত? পার্থিব জ্ঞান পৃথিবী-দর্শনেই উৎপন্ন হয়। যাহা সাধারণ লোকের নিকট সহজ জ্ঞান বলিয়া ভ্রম জন্মে, সে সমস্ত জ্ঞান ও সংস্কার, মানব জন্মিবার পর অর্জ্জন করিয়াছে। তাহারা

মানব-মনের জ্ঞানোদ্রেক ও স্ফূর্ত্তির সহিত অর্জ্জিত হইতে থাকে। তাহাদিগের উৎপত্তিকাল শৈশবের মধ্যে নিহিত থাকে। কখন ও কিরূপে তাহারা জন্মিয়াছে, পরে তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং ভবিষ্যতে তাহারা সহজ জ্ঞান রূপে প্রতীত হইতে থাকে। পূর্ব্বে আমরা যাহাদিগকে মূল বিশ্বাস বলিয়াছি, তাহারা একদা জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়ই; তাহারা মানব-মনের জ্ঞানোদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জাত ও অর্জ্জিত হয়। তাহারা প্রথমে অতি সরলভাবে এবং বিনা আয়াসে মানব-মনে সঞ্জাত হয়; তৎপরে এতদূর বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, বিশ্বাসরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। এজন্য ইহাদিগকে সামান্য জ্ঞানও বলে। ইহাদের প্রকৃতি আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যাহা মনোবিদ্যার বিষয়, তাহা আমরা অধিক বলিতে চাহি না। কিন্তু নাস্তিকতা যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর স্থাপিত, তাহার প্রকৃতি একটু বিশদ করিবার জন্য আমরা এতদূর বাক্যব্যয় করিলাম। আমরা যে বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলিয়াছি, তাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। যাহাদিগের নিকট প্রত্যক্ষজ্ঞানও অপ্রামাণ্য, তাঁহারা কোন্ জ্ঞানকে প্রামাণ্য বলিবেন, তাহা স্থির করুন। তাঁহারা প্রমাণ কাহাকে বলেন? প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই সকল মানব-জ্ঞানের মূল ও প্রমাণ। তদ্ব্যতীত মানব-মনে অন্য জ্ঞান নাই। যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপ্রামাণ্য হয়, তবে যে অপ্রত্যক্ষ বিষয় অধিকতর অপ্রামাণ্য, তাহার আর সন্দেহ কি?

বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ প্রমাণে ভ্রান্তির সম্ভাবনা অত্যল্প। বহুদর্শন এবং চিন্তা এই প্রত্যক্ষের প্রধান সহায়। প্রকৃত কার্য্য-কারণ-নির্ণায়ক পদ্ধতি-অনুসারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান চালিত হইলে, তাহাতে ভ্রান্তি জন্মিবার অতি অল্পই সম্ভাবনা। যে স্থলে প্রকৃত কার্য্য-কারণ-নির্ণায়ক পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই, সেই খানে ভ্রমের উৎপত্তি। গগনদেশের জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণে যখন আমরা প্রকৃত কার্য্য-কারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, তখন আমরা খগোল-বিদ্যায় (Astronomy) উপনীত হইয়াছি; কিন্তু যখন সেই পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া বৃথা অনুমান-পথে ভ্রমণ করিয়াছি, তখনই ভ্রমাত্মক জ্যোতিষ শাস্ত্রের (Astrology) সৃষ্টি করিয়াছি। তদ্রূপ প্রকৃত কার্য্য-কারণ-নির্ণায়ক পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, আমরা নাস্তিকতায় উপনীত হই; এবং তৎপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া নানাবিধ প্রচলিত ধর্ম্মে আসিয়া পড়িয়াছি। তত্ত্ব-বিদ্যা চিরকাল ঠিক রহিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম নানাবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। প্রচলিত যত ধর্ম্ম আছে, তাহা তত্ত্ব-বিদ্যার ফল নহে। ধর্ম্মে নানাবিধ ভ্রম থাকিতে পারে; কিন্তু তত্ত্ববিদ্যায় তাহা সম্ভবে না। কারণ, তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্মের

বিজ্ঞান-শাস্ত্র। ধর্ম্মের বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম এ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। যেমন খগোল-বিদ্যা নক্ষত্রমণ্ডলের বিজ্ঞান, তেমনি ধর্ম্মের বিজ্ঞান তত্ত্ববিদ্যা। এই তত্ত্ব-বিদ্যায় যেখানে লইয়া যায়, তাহাকে আমরা নাস্তিকতা বলিয়াছি। সুতরাং আমাদিগের নাস্তিকতা ও ধর্ম্মের বিজ্ঞান-ফল একই কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কথায় হয় ত আস্তিকেরা চটিয়া উঠিবেন। তাঁহারা বলিবেন—কেন, তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনায় কি নাস্তিকতার উৎপত্তি? তাহাতে কি আস্তিকতায় লইয়া যায় না? তবে কি আস্তিকতা বিজ্ঞান-সাপেক্ষ নহে? তাহারা বলিবেন, তত্ত্ব-বিদ্যা অনুসরণ করিলে যে, নাস্তিকতার উৎপত্তি হয়, আস্তিকতা আইসে না,—এ কথা তোমরা কেমন করিয়া জানিলে?

আমরা বলি, পৃথিবীতে আজি পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই প্রায় আস্তিকতায় পরিপূর্ণ। আমরা সকল ধর্ম্মেরই মূলে কতকগুলি মূল ধর্ম্ম-বিশ্বাস দেখিতে পাই। সেই মূল ধর্ম্ম-বিশ্বাস হইতে ধর্ম্মের নানাবিধ মতামত সৃষ্ট ও অনুমিত হইয়াছে। প্রতি ধর্ম্ম পরীক্ষা করিলে পরিদৃষ্ট হইবে যে, তাহা নানাবিধ মতামত-পরিপূর্ণ। এই মতামত সমুদায় প্রতি ধর্ম্মের মূল বিশ্বাসের প্রকৃতির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, সেই মতামত সমুদায় সেই বিশ্বাস হইতেই অনুমিত হইয়াছে। যাহার মূলবিশ্বাস সমুদায় যে প্রকার, তাহার মতামত সমুদায় ঠিক তদ্রূপ। বৈষ্ণবের মতামত বিষ্ণুর কল্পনার উপর নির্ভর করে, শাক্তের মতামত শক্তির কল্পনার উপর নির্ভর করে। তদ্রূপ খৃষ্টান ধর্ম্মের ঈশ্বর ও দেব-কল্পনা যেরূপ, তাহার মতামতও সেই কল্পনানুযায়ী নির্ণীত হইয়াছে। মোসেস, মহম্মদ, জিসস, জোরোয়াষ্টর, কনফুচি, বুদ্ধ, যিনি যেরূপ আদি কল্পনা লইয়া ধর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্ম-মতামত তদনুসারে শেষ হইয়াছে। সকলেই আদিতে কতকগুলি বিষয় ধরিয়া লইয়াছেন। সেই বিষয় সকল কেহ স্থাপন করিতে যান নাই। সেই কতিপয় মূল বিষয় ধরিয়া লইয়া তার পর তাহাদিগের ধর্ম্ম-মতামত স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত বিশ্বাস-ভূমি-কল্পনার আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র। এই ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়াই পৃথিবীতে নানা গোল-যোগ, বাক্‌বিতণ্ডা, মারামারি, কাটাকাটি, বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়াছে। আমরা পৃথিবীতে আজি যে সমস্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্ক, বিতর্ক ও বিচার দেখিতে পাই, তাহার সমুদায় এই ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয় লইয়া আন্দোলিত হয়। পৃথিবীতে এই প্রকার ধর্ম্ম চলিত, এই ধর্ম্মের বিচারাদিকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলে। যাঁহারা এই ধর্ম্মশাস্ত্রকে তত্ত্ববিদ্যা কহেন, তাঁহা-দিগের তত্ত্ববিদ্যা সুতরাং কতিপয় মূল-বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। সে বিদ্যা

সেই বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তাহা নানাবিধ মূলবিশ্বাস ও অনুমান-মধ্যে পরিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা যে বিজ্ঞান-মূলক তত্ত্ববিদ্যার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা প্রচলিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র মূলক তত্ত্ববিদ্যা নহে। কারণ, এই শেষোক্ত তত্ত্ববিদ্যা মূলেই দূষিত। পৃথিবীতে আজি এই দূষিত তত্ত্ববিদ্যা চলিত আছে। সর্ব্বসাধারণে ইহাকেই তত্ত্ববিদ্যা বলে। কিন্তু ইহা কি প্রকৃত পক্ষে তৎপদ-বাচ্য? যে বিদ্যার মূল অপরীক্ষিত ও দূষিত, যে বিদ্যার বিচার নির্দ্দিষ্ট সীমা ব্যতীত বিস্তৃত হইতে পারে না, তাহা কখন বিজ্ঞান-সিদ্ধ নহে। কারণ, বৈজ্ঞানিক রীতি এরূপ নহে। বিজ্ঞান, মূল হইতেই বিচার ও পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে। বিজ্ঞান দেখে, মূলে কোন দোষ আছে কি না; কারণ, যদি মূল দূষিত হয়, তবে শেষও অবশ্য দূষিত হইবে। যাহা আস্তিকতায় আরব্ধ হইয়াছে, তাহা যে আস্তিকতায় শেষ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

যে আস্তিকতায় প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রাদির প্রারম্ভ, তাহার কি কোন কালে পরীক্ষা হইয়াছে? না কোন ধর্ম্ম তাহার মূল বিশ্বাস সকল স্থাপন করিয়া তবে তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছে? যে ভিত্তির উপর প্রচলিত ধর্ম্ম সকল স্থাপিত, সে ভিত্তি কি কোন ধর্ম্মে প্রথমে সংগঠিত হইয়া তৎপরে তাহার উপর সমুদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্থাপিত করা হইয়াছে? না, ভিত্তি সিকতাময় নহে, এইরূপ ধরিয়া লইয়াই তৎপরে তাহার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে? কোন ধর্ম্মই তাহার ভিত্তিমূল পরীক্ষা অথবা স্থাপন করিতে যায় নাই।

অনেক কাল হইতে পৃথিবীতে ধর্ম্মের বিচার চলিতেছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম-বিচার নহে। ধর্ম্মের মূলের বিচার হয় নাই, তাহার শাখা-প্রশাখার বিচার চলিতেছে মাত্র। প্রতি ধর্ম্মে আদিতে কতকগুলি মূল কল্পনা ও বিশ্বাস ধরিয়া লইয়াছে, তৎপরে সেই কল্পনানুযায়ী যে বিশাল ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছে, সেই ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়াই যত বিচার ও বিসম্বাদ। এই প্রকার বিচার চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এই বিচারের পরিণাম কেবল গণ্ডগোল ও সিদ্ধান্তের অস্থিরতা। তাহার কারণ এই, যাহার মূল গণ্ডগোলপূর্ণ এবং অপরিষ্কার, তাহার শেষ কি প্রকারে পরিষ্কার ও স্থির হইবে? যে ধর্ম্মের মূল কল্পনা সকল যে প্রকার, সে ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সকলও সেই প্রকার হয়। যে যে ধর্ম্মের মূল কল্পনায় যে প্রকার বিভিন্নতা আছে, তাহাদের সিদ্ধান্তে এবং মতামতেও সেই প্রকার বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্মবিচার ও বাক্‌বিতণ্ডার আর শেষ হয় না। বলিতে গেলে, এই বাক্‌-বিতণ্ডার গোল ধর্ম্মের বিচারে নহে, সে গোল সেই মূল কল্পনায়। যাঁহারা

পৃথিবীর ধর্ম্ম বিচারের গোল মিটাইতে চাহেন, তাঁহারা এক বার নানাবিধ প্রচলিত ধর্ম্মের মূল কল্পনা সকল বিশ্লেষণ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন, এই সমস্ত মূল কল্পনাই কত বিভিন্ন প্রকার। এক ঈশ্বরের কল্পনা কত ধর্ম্মে কত রকম। পরলোকের কল্পনা কত ধর্ম্মে কত রকম। ঈশ্বরের কল্পনা কিছু একটী মাত্র কল্পনা নহে; ইহা সহস্র কল্পনা ও ভাবে পরিপূর্ণ। পরলোকের কল্পনাও কিছু একটী কল্পনা নহে; তাহাও হাজার কল্পনায় পরিপূর্ণ। ঈশ্বর শব্দের অর্থ একটী ভাব নহে। ঈশ্বর শব্দে অসংখ্যভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সমস্ত ভাবের সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি নাই। তাহারা এক একটী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত-মাত্র। এই সমস্ত ভাব কি সকল ধর্ম্মে সমান আছে? যখন এই মূল বিশ্বাস সকল বিসদৃশ, তখন যে তাহাদিগের সিদ্ধান্ত সকল বিসদৃশ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে ধর্ম্ম যে সকল মূল বিশ্বাস লইয়া তাহার ভিত্তি করিয়াছে, সে ধর্ম্ম কি সেই সমস্ত মূল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে? প্রত্যুত আমরা দেখিতে পাই, কোন ধর্ম্মই তাহার মূল বিশ্বাস সকল স্থাপন করে নাই। যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেন করে নাই? সেই গম্ভীর প্রশ্নের একমাত্র উত্তর আইসে যে, সে সকল মূল বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব। কিছুতেই তাহা স্থাপন করা যাইতে পারে না। পৃথিবীর আস্তিকগণ হারি মানিয়া শেষে বলিয়াছেন, কেহ বিচার করিয়া ঈশ্বরকে স্থাপন করিতে পারিবেন না। বিচারে ও বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে জানা যাইতে পারে না; বিচারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

এক্ষণে বোধ হয়, প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সকল ধর্ম্মের মূলদেশ পরীক্ষা করিতে গেলে, নাস্তিকতা আসিয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ববিদ্যায় আস্তিকতা আসে না। আস্তিকতা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র। তাহা প্রমাণিত হয় না। কোন ধর্ম্মই আস্তিকতার প্রমাণ করিয়া তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করে নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, সকল ধর্ম্মেরই মূলে (আস্তিকতার পরিবর্ত্তে) নাস্তিকতা রহিয়াছে। কিন্তু সকল ধর্ম্মই তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সকল ধর্ম্মই এই মূলদেশ ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বাসের ভূমিতে আসিয়া আস্তিকতা স্থাপিত করিয়াছে। অতএব এক্ষণকার প্রচলিত সকল ধর্ম্মই যে ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে, সে ভূমি পরীক্ষাসহ নহে; বিজ্ঞান সে খানে দাঁড়াইতে পারে না। এখন কথা এই, যে ভূমি সকল ধর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই ভূমি পরিত্যজ্য, না আস্তিকতা পরিত্যজ্য? আমরা বলি, আস্তিকতা পরিত্যজ্য এবং নাস্তিকতা গ্রহণীয়। যে যে কারণে

আস্তিকতা পরিত্যজ্য হইয়াছে, তাহা আমরা একে একে বলিতেছি :—

১। আস্তিকতা পৃথিবীকে মিথ্যাভাব ও কল্পনায় পরিপূর্ণ করিয়াছে। যাহা প্রকৃতির আদি শক্তি, তৎ-সম্বন্ধে আস্তিকতা নানাবিধ কল্পনা ও মিথ্যাজ্ঞান প্রদান করিয়াছে। যাহা মানব-জ্ঞানের অতীত, তাঁহাকে মানবীয় ভাবে পূর্ণ করিয়া এক কাল্পনিক পুরুষ ঈশ্বর রূপে সৃষ্টি করিয়াছে। এখন আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নহে, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তা মানব। মানব কতকগুলি কল্পনা সাজাইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর নাম দিয়া প্রচার করিয়াছে; যে কল্পনা-সমুদায় পরস্পর-সমঞ্জসীভূত নহে, যাহা সমগ্র প্রকৃতির আদি শক্তির গুণ কখনই হইতে পারে না, যে গুণাদি প্রকৃতির আদি শক্তিতে অর্পণ করিলে, তাহা আর আদি শক্তি থাকে না, তাহা একটী বৃহৎ-মানব-রূপে পুরুষাকারে প্রতীয়মান হইতে থাকে, তাহা সেই আদি শক্তি ভিন্ন আর সকলই হইতে পারে। এই আদি শক্তির মিথ্যা কল্পনা, সকল ধর্ম্মে সমান নহে। বাস্তবিক যাহা জ্ঞাতব্য নহে, তাঁহাকে মানবের জ্ঞানাধীন করিয়া সৃষ্টি করিতে গেলে, মানবজাতীয় প্রতি লোকে আপন আপন জ্ঞানানুসারে তাঁহাকে কল্পনা করিয়া লইবে। ইহা অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনিবার্য্য। আমার যেরূপ জ্ঞান, আমি ঐশ্বরিক শক্তির সেইরূপ কল্পনা করিব। পরের জ্ঞান ও কল্পনা আমার পক্ষে কিছুই নহে। আমার জ্ঞানের পরিমাণ-অনুসারে আমি ঈশ্বরকে পরিমিত করিব। আমার জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা ও বিস্তৃতি-অনুসারে আমি ঈশ্বরকে সঙ্কীর্ণ অথবা উদার-স্বভাব ভাবিব। পৃথিবীতে এইরূপই চলিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বর ও দেবতার কল্পনা লইয়া ধর্ম্ম-সকলে বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু কোন ধর্ম্মেই প্রকৃতির আদি শক্তির প্রকৃত তত্ত্ব দেয় নাই। সকল ধর্ম্মই নানাবিধ মিথ্যাজ্ঞান ও কল্পনা প্রচার করিয়াছে মাত্র।

শুধু ঈশ্বর-সম্বন্ধে নহে, সেই কাল্পনিক ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ লইয়াও সকল ধর্ম্মই নানা মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যা বিশ্বাস প্রচার করিয়াছে। ঈশ্বর-কল্পনানুসারে মানব-প্রকৃতির ভাব এবং তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ-কল্পনাও নানাবিধ হইয়াছে। এই মানব প্রকৃতির অলীক ভাব ও সম্বন্ধ-নির্ণয় বজায় রাখিবার জন্য একটী পরকালের অনন্ত রাজ্য সৃষ্ট করিতে হইয়াছে। সেই পরকালকে নানাবিধ কাল্পনিক ভাবে পরিপূর্ণ করিতে হইয়াছে। এই সকল কল্পনার কিছুই মিল নাই। কেবল মানবের চিত্ত আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ-নির্ণয়, মানব-প্রকৃতির কল্পনা, এবং পরকালের কল্পনা সকল ধর্ম্মেই বিভিন্ন-প্রকার। এ সম্বন্ধে কোন ধর্ম্মের সহিত কোন ধর্ম্মের মিল নাই। কিন্তু সকল ধর্ম্মেই

যে, মানব-প্রকৃতিকে অতি হেয় ও অপকৃষ্ট জ্ঞান করিয়াছে, মানব-প্রকৃতির উদারতা ও স্বাধীনতা দেয় নাই, মানব-প্রকৃতির উচ্চতা ও সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষমতা দেয় নাই, তাহা স্থির নিশ্চয়। এই ঈশ্বরের অলীক কল্পনা, মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ, এবং পরকালের কল্পনা লইয়া একটী স্বতন্ত্র পুরোহিত-জাতি অথবা ধর্ম্ম-যাজক-মণ্ডল পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল ভ্রম-প্রমাদ জগন্ময় প্রচার ও মানব-মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের এক-মাত্র কার্য্য। শুদ্ধ কার্য্য নহে, তাহাই তাঁহাদিগের উপজীবিকা, এই সকল মতামত-প্রচারের উপর তাঁহাদিগের স্বার্থ নির্ভর করে। তাঁহারা তোমাকে পরকালে বরাত দিয়া তোমার ইহকালের ধন-সম্পত্তি কৌশল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বসিয়া বসিয়া সুখ ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের কার্য্য কেবল পৃথিবীতে মিথ্যা-ধর্ম্ম-প্রচার ও কৌশল পূর্ব্বক অর্থগ্রহণ। ধর্ম্মের ভার তাঁহাদিগের হস্তে। পার্থিব মান ও মর্য্যাদা তাঁহারা প্রভূত পরিমাণে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা যদি গুটি কত মিথ্যা কথা বলিয়া এত সুখের ভাগী হইতে পারেন, এত মান-মর্য্যাদার অধিকারী হইতে পারেন, তবে কেন তাঁহারা এ সুখ-ভোগ, এ অধিকার, এ রাজত্ব ছাড়িবেন? সুতরাং পৃথিবীতে ধর্ম্ম কেবল মিথ্যাজ্ঞান ও চাতুরীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আস্তিকায় পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হয় নাই; এই ধর্ম্মযাজকগণের রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে;—যে রাজ্যে সকলই অলীক কল্পনা ও মিথ্যাজ্ঞান, সকলই চাতুরী, কৌশল ও পীড়ন, সকলই অজ্ঞানতা, অন্ধ বিশ্বাস এবং পরের কথায় সায় দেওয়া-মাত্র।

২। আস্তিকতা পৃথিবীতে নানাবিধ বিসংবাদী মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়া পৃথিবীর সামাজিক শান্তি-ভঙ্গ করিয়াছে; পৃথিবীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করিয়াছে; জাতির সহিত জাতির এবং মানবের সহিত মানবের একতা ও সদ্ভাব বিনষ্ট করিয়াছে। পৃথিবীর নিগ্রহ, পীড়ন ও কষ্টের সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে। এই জন্য মানব, মানবের শত্রু হইয়াছে এবং এক জাতি অপর জাতির শিকার-স্থানীয় হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিবৃত্তে যত মহা যুদ্ধ ঘটিয়াছে, সমুদায়ই এই ধর্ম্ম লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ইতিবৃত্ত আমাদিগের কথা প্রমাণিত করিয়া দেয়।*

৩। আস্তিকতা পৃথিবীতে নানাবিধ মনোহর কল্পনা ও অলীক বিশ্বাস প্রচার করিয়া মানব-জাতিকে ইহকাল হইতে পরকালের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট করে। ইহার অনিষ্ট এই, ইহা দ্বারা পৃথিবীর প্রতি ঔদাসীন্য জন্মে। লোকে পার্থিব

* আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত "পরলোক ও সমাজ" নামক প্রবন্ধে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখ।

মঙ্গল পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। এই বিষময় অনিষ্টাপাতে ভারত উৎসন্ন গিয়াছে। মধ্যযুগে ইয়োরোপও উৎসন্ন যাইতেছিল। অন্য কারণে ইয়োরোপ পৃথিবীর সুখে আকৃষ্ট হইল বলিয়া, ইয়োরোপ রক্ষা পাইল।*

৪। ঈশ্বর অথবা দেবতাগণের কল্পনায় মানব-জাতির কতকগুলি অলীক কর্ত্তব্যাবধারণে সমাজের লাভালাভ কি? মানব-সমাজ কি এই সকল কর্ত্তব্য ও বিধানে চালিত হয়? না, মানব-সমাজ যে শক্তিতে চালিত হয়, তাহা স্বতন্ত্র শক্তি? মানবের সহিত মানবের যে সকল সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য পৃথিবীর প্রাচীন কাল হইতে নির্ণীত হইয়াছে, এবং যাহাকে এক্ষণে ধর্ম্মনীতি বলিয়া অন্যায় অভিহিত করা হয়, সেই সমস্ত ধর্ম্মনীতি দ্বারা কি মানব-সমাজ প্রচালিত হয় না? আমরা পরিবার-মণ্ডলে যে সমস্ত কর্ত্তব্য-সাধন করি, তাহা কি ধর্ম্ম দ্বারা নিয়োজিত হইয়া করি? না স্বাভাবিক স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি মানসিক শক্তিতে উত্তেজিত হইয়া করি? আমাদিগের পরিবার-মণ্ডল একটী ক্ষুদ্র সমাজ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা পারিবারিক সমাজে যেমন কতিপয় স্বাভাবিক-শক্তি-প্রভাবে আপন আপন কর্ত্তব্য-সাধন করিয়া থাকি, তৎ-বহির্দ্দেশীয় বৃহৎ-মনুষ্য-সমাজেও তদ্রূপ কতকগুলি স্বাভাবিক ও সামাজিক-শক্তি-প্রভাবে প্রচলিত হইয়া, সমাজের প্রতি আপন আপন কর্ত্তব্য-সাধন করিয়া থাকি। ধর্ম্ম-প্রভাবে বরং এই সমস্ত শক্তি-প্রভাব কমিয়া যায়। ধর্ম্ম না রাজশাসন দ্বারা সমাজ-সংস্থিতি হয়? আজ রাজশাসন তুলিয়া লও, সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। যে সকল সামাজিক নিয়ম ধর্ম্মনীতি বলিয়া প্রচারিত আছে, তাহা কি আমরা ধর্ম্ম হইতে পাইয়াছি, না প্রাচীন সমাজ দ্বারা তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? ঈশ্বর কি সেই কতিপয় নিয়ম কাগজে লিখিয়া পৃথিবীতে ফেলিয়া দিয়াছেন—না, মানব-সমাজ তাহা ক্রমে ক্রমে অবধারণ করিয়াছে? সেই কতিপয় নিয়মের কি কিছু পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে;—না, তাহারা চিরকাল একই আছে? পৃথিবীর নীতি-শাস্ত্রের কি কখন কিছু উন্নতি-সাধন হইয়াছে? না, তাহা চিরকাল একই আছে? সেই ধর্ম্মনীতি-গুলিকে মূল-সামাজিক-নিয়ম বলিলে, কি স্বরূপ কথা বলা হয় না? তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতি বলা হইল কেন? ধর্ম্ম কি এই নীতি-গুলিকে স্থাপন করিয়াছে? না, এই নীতি-গুলি ধর্ম্মকে স্থাপন করিয়াছে? কে কাহার বন্ধনী? ধর্ম্মের বন্ধনী নীতি—না, নীতির বন্ধনী ধর্ম্ম? কাহার জোর কোথা হইতে আইসে? নীতি ধর্ম্মের জন্য জোর পায়? না,—ধর্ম্ম নীতি হইতে জোর পায়? ধর্ম্ম—নীতির

* আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত "পরলোক ও সমাজ" নামক প্রবন্ধে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখ।

উপর স্থাপিত ? না,—নীতি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত ? নীতি কি সমাজ এবং ধর্ম্ম উভয়েরই স্থাপয়িতা নহে ? পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত রাজ-শাসন স্থাপিত আছে, তাহার অনেক ব্যবস্থা কি এই নীতি-সূত্র হইতে উঠে নাই ? সমাজ কি এই নৈতিক ব্যবস্থার উপর স্থাপিত নহে ? প্রচলিত ধর্ম্মও কি এই নীতির উপর স্থাপিত নহে ? তাহাই যদি সত্য হয়, এবং নীতির জোর যদি ধর্ম্ম-প্রভাবে কমিয়া যায়, তবে সেই অলীক আস্তিকতার ধর্ম্ম লইয়া আমরা কি করিব ? তাহা কোন্ কাযে আইসে ? তাহা কেবল একটী অলীক ঈশ্বর এবং কতকগুলি দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে, এবং তাহাদিগের প্রতি কতকগুলি অলীক কর্ত্তব্য নিয়োগ করিয়া দেয় মাত্র। তদ্দ্বারা মানব-সমাজের উপকার কি ? মানব-সমাজের অধিকাংশ লোকেই কি ঈশ্বরের প্রতি, দেবতাগণের প্রতি উদাসীন হইয়া, এবং পরলোকের প্রতি অন্ধ হইয়া চালিত হয় না ? আমরা "পরলোক ও সমাজ" নামক প্রস্তাবে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। ধর্ম্মের প্রভাব যদি পৃথিবীর পক্ষে অমঙ্গলকর ব্যতীত মঙ্গল-কর নহে, তবে সে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকা কি উচিত বোধ হয় ? পৃথিবীতে এত কাল ধরিয়া আস্তিকতা-ধর্ম্মের পরীক্ষা হইতেছে। এত কালের পরীক্ষায় আমরা কি ফল-লাভ করিলাম ? ইহা দ্বারা কি পৃথিবীর উন্নতি-সাধন হইয়াছে ? না, বরং অবনতিই হইয়াছে ? ইয়োরোপের সামাজিক উন্নতি কি ধর্ম্ম হইতে হইয়াছে—না, তাহা অন্য কারণ হইতে হইয়াছে ? বরং যত দিন ইয়োরোপ ধর্ম্ম-প্রভাবে চালিত হইয়াছিল, তত দিন ক্রমশই অধস্তলে নিমজ্জিত হইতেছিল। ধর্ম্মের সহিত সমাজের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্মে বরং সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট সাধন করে নাই।

ভ্রম ও প্রমাদ প্রচারিত হইলে, পৃথিবী ও সমাজের যে প্রকার অনিষ্টা-পাত হয়, আস্তিকতার ধর্ম্ম-মত সকল প্রচারিত থাকাতে, পৃথিবীতে বহু কাল ধরিয়া তদ্রূপ অনিষ্টাপাত হইতেছে। অন্যান্য-বিষয়ে ভ্রম-সংশোধনে লোকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে ভ্রান্তি-সংশোধন করিতে গেলেই ধর্ম্ম-যাজক-মণ্ডল চীৎকার করিয়া গালাগালি দিয়া উঠেন। সামান্য-লোক-মণ্ডলও সেই গালাগালিতে সায় দেয়। কারণ, বুদ্ধির দুর্ব্বলতা এবং মূর্খতা হেতু তাহারা কিছুই বুঝে না। সুতরাং তাহারা পরের কথায় সায় দিয়া উঠে। এই যাজক-মণ্ডল সামান্য-জনগণের মনকে এমত ভুলাইয়া ও অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা ভিতরের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহারা তাঁহাদিগেরই কথায় ভ্রান্ত ও প্রতারিত হইয়া রহিয়াছে। আস্তিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ অনুমান-মূলীয় ; তৎ-সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত নাই ; সুতরাং অনিশ্চিত বিষয়ে সাধারণ মতে মত

দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনায় সর্ব্বজনেই এক বৃহৎ-ভ্রান্তি-তন্ত্রকে ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সার কথা এই যে, যাহা অনিশ্চিত ও অসিদ্ধ, এবং যাহাতে কোন উপকার নাই, তাহা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? কেবল কি যাজক-মণ্ডলীর অন্ন যোগাইবার জন্য? কেবল কি পৃথিবীতে ভ্রান্তি ও আলস্যের বৃদ্ধি করিবার জন্য? ইহা যদি সত্য হয়, তবে কি আস্তিক ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে পাপ নাই? আলস্যের বৃদ্ধি করাতে যদি প্রত্যবায় হয়, ভ্রমের প্রচার করা যদি অনিষ্টকর হয়, মিথ্যা ঈশ্বরকে পৃথিবীর আদি বলিয়া পূজা করাতে যদি পৌত্তলিকতা হয়, পৃথিবীর প্রতি উদাসীন হইয়া কাল্পনিক পরলোকের প্রতি স্বার্থ-স্থাপন করা যদি অন্যায় হয়, এবং এই সমস্ত দুষ্কৃতিতে যদি পাপ থাকে, দুষ্কৃতিই যদি পাপ-নামে অভিহিত হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, আস্তিক ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে ঘোর পাপ। নাস্তিকতা অবলম্বন করা এ পাপের এক মাত্র প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্ত আমরা নিম্ন-লিখিত কতিপয় কারণ জন্য গ্রহণ করিতে বলি। আস্তিকতা যদি পরিত্যজ্য হয়, তবে নাস্তিকতা অবশ্য অবলম্বনীয়।

১। পৃথিবীতে আস্তিকতার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তদ্দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি হয় নাই,—মানবের উন্নতি হয় নাই। মানব, যে ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হইয়াছে, সে ঈশ্বরকে প্রকৃত-পক্ষে বুঝিতে পারে নাই—তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারে নাই। প্রত্যুত, পৃথিবীময় কেবল তৎসম্বন্ধে কল্পনা ও অলীক বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়াছে। এই কল্পনা ও অলীক বিশ্বাস দ্বারা পৃথিবীর অমঙ্গল-সাধন হইয়াছে। মানব প্রকৃত-ঈশ্বর-নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া অলীক-ঈশ্বর-কল্পনায় সন্তৃপ্ত হয় নাই। যিনি মানব-জ্ঞানের অগোচর, তাঁহাকে সেই জ্ঞানের গোচর করিতে গিয়া কেবল অসংখ্য কল্পনারই সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। প্রকৃত-ঈশ্বর-তত্ত্ব কিছুই নির্ণীত হয় নাই। এত কাল ধরিয়া যাহার পরীক্ষায় কিছুই ফল দর্শে নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক বার নাস্তিকতার পরীক্ষা করা উচিত। যখন সমাজের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই; এক জন কাল্পনিক ঈশ্বর থাকাতে, আর না থাকাতে, সমাজের যখন কোন হানি হয় না, তখন এক বার নাস্তিকতার পরীক্ষা করা উচিত। নিদান এক বার দেখা উচিত—নাস্তিকতা-অবলম্বনে সমাজের উন্নতি না অবনতি হয়, এবং মানবের ঐশ্বরিক-জ্ঞান-ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয় কি না? আজি পর্য্যন্ত নাস্তিকতার সম্পূর্ণ পর্য্যালোচনা হয় নাই; সুতরাং নাস্তিকতা এক্ষণে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ আছে। ক্রমশ ইহা যতই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, ততই ইহার মানবীয়-জ্ঞান-ক্ষুধার সন্তৃপ্তিকরী শক্তির বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। এত দিন অসম্পূর্ণ অবস্থায় ইহা মানবের অসন্তোষ-কর হইয়াছিল বলিয়া যে, চির দিন ইহা

তদ্রূপই থাকিবে, এমত সম্ভাবনা নাই। উত্তরোত্তর ইহার পুষ্টি-সাধন হইলে, ইহা যে মানব-মনের উপযোগী হইবে, এবং মানব-সমাজের অবলম্বনীয় হইয়া আসিবে, এমত আশা করা যাইতে পারে। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ইহা যে মানব-সমাজের একেবারে উপযোগী নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে। সম্পূর্ণ অবস্থায় নাস্তিকতা মানব-মণ্ডলীর কত দূর উপযোগী হইতে পারে, মানব-জাতিকে কতদূর সন্তুপ্ত করিতে পারে, এবং মানব-সমাজের কত উন্নতি-সাধন করিতে পারে, তাহা এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

২। নাস্তিকতা পৃথিবীর সমুদায় মানব কুলকে এক-ধর্ম্মী ও এক ছত্র করিবে। আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, মানবের সহিত মানবের বিচ্ছেদ-সাধন করা আস্তিক ধর্ম্মের প্রবণতা। আস্তিক ধর্ম্মে আমরা দেখিতে পাই, যত লোক তত স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস। প্রতি লোকের যেমন জ্ঞান ও উন্নতি, তদনুরূপ তাহার ধর্ম্মভাব ও বিশ্বাস। যে সমস্ত সাধারণ মত অথবা বিশ্বাস থাকে, তাহা সমুদায় অপরিষ্কার। আস্তিক-ধর্ম্মাবলম্বী দুই ব্যক্তিকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, তুমি ঈশ্বর কাহাকে বল, পরলোক-সম্বন্ধে তোমার মত ও বিশ্বাস কি, ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি, পাপ পুণ্য কি? সেই দুই ব্যক্তি কখন এক উত্তর দিবে না। তাহাদিগের সাধারণ মত ও বিশ্বাস সকলই অপরিষ্কার। একের মতের সহিত অন্যের মতের ঐক্য নাই। হয় ত দুই জনে ঠিক বিপরীত কথা কহিবে। এক-ধর্ম্মাবলম্বী দুই জনের যখন এইরূপ মত-বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, তখন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জনগণের মতের একতা কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। নাস্তিকতা এই সমুদায় পার্থক্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মানব-কুলকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিবে। সমস্ত-মানব-জাতিকে এক ধর্ম্মাবলম্বী করা যদি সম্ভব হয়, তবে নাস্তিকতাই তাহার এক মাত্র উপায়।

৩। নাস্তিকতা মানব-সমাজে প্রচলিত হইলে, মানব-জাতি পৃথিবী এবং সমাজের উন্নতি-সাধন-পক্ষে অধিকতর যত্নশীল এবং উদ্যোগী হইবে। কারণ, তখন মানব-মন হইতে বৈরাগ্য একেবারে চলিয়া যাইবে। মানবের যখন কাল্পনিক পারলৌকিক স্বর্গরাজ্য তিরোহিত হইল, তখন মানব পৃথিবীকেই স্বর্গতুল্য করিতে উদ্যত হইবে। ইহলোক লইয়াই তাহার সকল সুখ ও আমোদ। এ অবস্থায় মানব যদি ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, তবে এই পৃথিবীর সুখের জন্যই তিনি অন্য-বিষয়ে উদাসীন হইবেন, সামাজিক সুখ তাহার ইষ্ট দেবতা হইবে, স্বদেশের মঙ্গল তাহার পরম কামনীয় পদার্থ হইবে। এখন তিনি পারলৌকিক সুখের জন্য যে অর্থ বিসর্জ্জন দিতেছেন ও যে আত্মত্যাগ-স্বীকার করিতেছেন, পরলোকের বিশ্বাস ধ্বংস হইলে, তিনি সেই অর্থ ব্যয় ও আত্মত্যাগ পার্থিব সুখের

জন্য করিবেন। সৎকার্য্যে উত্তেজিত করিতে তাহার আর বাহ্য ও কাল্পনিক উত্তেজনার আবশ্যক হইবে না।*

৪। নাস্তিকতা ধর্ম্মতত্ত্বকে অন্য তত্ত্ব হইতে পৃথক করিয়া দেয়। যাহা শারীর-বিজ্ঞানের বিষয়, যাহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়, যাহা ভূ-তত্ত্বের বিষয়, যাহা খগোল-বিদ্যার বিষয়, যাহা সমাজ-তত্ত্বের বিষয়, সে সমুদায়কে প্রকৃত-তত্ত্ব-বিদ্যার বিষয় হইতে পৃথক করিয়া নাস্তিকতা ধর্ম্ম-বিজ্ঞানকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। মানবের জ্ঞান-বিভাগ অসংখ্য, এবং যদিও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাহাদের পার্থক্য এত অধিক যে, তজ্জন্যই তাহারা স্বতন্ত্র বিভাগ হইয়া পড়িয়াছে। এত কাল আস্তিকতা সকল বিদ্যাকে আপনার বিষয়ীভূত করিয়াছিল, মানবের সর্ব্ববিধ-জ্ঞান-বিভাগকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল। আস্তিকতার ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সমস্ত মতামত বিবৃত আছে, যে সমস্ত মূল বিশ্বাস ও কল্পনা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে বিচার-সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক নানাবিধ তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। আস্তিকতা সে সমুদায়কে পৃথক করিয়া দিতে পারে না। কারণ, সেই সমুদায় লইয়াই তাহার ধর্ম্ম-তন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দিলে, আস্তিকতা দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া পড়ে। এ জন্য আস্তিক ধর্ম্ম চিরকাল বিজ্ঞানের বিরোধী হইয়াছে। যে অজ্ঞতা ও জ্ঞানান্ধকারে আস্তিকতার জন্ম, তাহা হইতে আস্তিকতা মুক্ত হইতে চাহে না। বৈজ্ঞানিক বিভায় আস্তিকতা ভয় পায়। যে মূর্খতা ইহার পৃষ্ঠ-পূরক, সে মূর্খতাকে ইহা শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে চায় না। মানব-জ্ঞান যত পরিস্ফুট হয়, আস্তিকতার বন্ধন সকল ততই শিথিল হইতে থাকে। ইয়োরোপে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের সহিত আস্তিকতার কত বার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কত গেলিলিও কারাবদ্ধ হইয়াছেন। কতবার যাজক মণ্ডল বিজ্ঞান-চর্চ্চার ঘোর বিরোধী হইয়াছেন। কত কৌশলে এবং কত কূট তর্কে খৃষ্টান ধর্ম্মের মতামত সকল বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের সহিত সমঞ্জসী-ভূত করা হইয়াছে। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ধর্ম্ম-বিরোধী মতামত সকল প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উপর রাশি রাশি গালি বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান তাহা শুনিবে কেন? যে যে বিজ্ঞানের যাহা বিষয়ীভূত, সে সে বিজ্ঞান তাহা অবশ্য আলোচনা করিবে।

পৃথিবীতে যত আস্তিক-ধর্ম্ম চলিত আছে, সেই সমস্ত আস্তিক-ধর্ম্ম যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তৎ-কালে যেমন মানব-সমাজের জ্ঞানোন্নতি ছিল, মানব-সমাজ মধ্যে যে সমস্ত ভ্রম ও মতামত প্রচলিত ছিল, আস্তিক ধর্ম্ম তাহা স্পষ্টই প্রদর্শন করে। কারণ, আস্তিক ধর্ম্ম

---

* গত জ্যৈষ্ঠ মাসের আর্য্যদর্শনে "মানবজাতির পরলোক" নামক প্রস্তাব দেখ।

মধ্যে তৎসমুদায় মতামত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেই সমস্ত মতামত আস্তিক ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহার ধর্ম্মতন্ত্র সেই সকল মতামতের সহিত ঐক্য করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। অনেক ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মোপদেশ সেই সমস্ত প্রচলিত মতামতের উপরই হয় ত স্থাপিত আছে। বিজ্ঞান-চর্চ্চার পূর্ব্বে মানবজাতি ভৌতিক তত্বের বিষয়ে যখন নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল, তখন তাঁহারা কোন প্রাকৃতিক ঘটনারই রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিতেন না। তখন সকল প্রাকৃতিক ঘটনাতেই আশ্চর্য্য হইতেন। সকল প্রাকৃতিক ঘটনাই তাঁহাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিত। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, জলস্তম্ভ, জোয়ার, ভাঁটা, গ্রহণ, সৃষ্টি, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সকল ঘটনাই মানবের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইত। মানব ইহাদের রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিত না। যাঁহারা ঈশ্বর ও ধর্ম্মসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রতিপত্তি পাইতেন, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে দেবানুগৃহীত ও দেবতুল্য লোক বলিয়া ভক্তি করিত। এই ভক্তি-বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহারাও ভৌতিক ঘটনার অভৌতিক কারণ নির্ণয় করিয়া দিয়া সাধারণ লোকের জ্ঞান-তৃষ্ণা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতেন। তাঁহারা এই প্রাকৃতিক ঘটনার রহস্যোদ্ভেদ করিতে গিয়া নানাবিধ কাল্পনিক কারণ নির্দ্দেশ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের ঐশ্বরিক কল্পনা আরও লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। ইহা দ্বারাই তাহারা নিজ নিজ ধর্ম্মোপদেশের বল প্রাপ্ত হইতেন, এবং নিজ নিজ মত সকল সমর্থন করিতেন। এজন্য দৃষ্ট হয়, আস্তিক ধর্ম্ম এই ভৌতিক ঘটনার অভৌতিক কারণ নির্ণয়ের উপর অধিকাংশ নির্ভর করে। ধর্ম্ম এইরূপ প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। প্রচলিত আস্তিক ধর্ম্ম এইরূপ প্রাকৃতিক ঘটনা-বিষয়ক মতামতের উপর স্থাপিত। শুদ্ধ এই সমস্ত মতামত আস্তিক ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, এমত নহে; মানবসমাজের সর্ব্ববিষয়ক মতামত, প্রচলিত ধর্ম্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। এই সমস্ত উপদেশ, বিশ্বাস, এবং মতামত পরস্পর এত সংশ্লিষ্ট, তাহাদিগের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ট যে, তাহারা পরস্পরের প্রাণস্বরূপ হইয়াছে। সুতরাং একের বিনাশের সহিত অপরের বিনাশসাধন হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য ধর্ম্ম চিরকাল জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানোন্নতির বিরোধী হইয়াছে। পৃথিবীর যে অবস্থায় যে আস্তিক ধর্ম্মের জন্ম, সে অবস্থার উন্নতিপক্ষে সে আস্তিক ধর্ম্ম কখনই অনুকূল হইবে না। কারণ, এক অবস্থায় যাহা উৎপন্ন, অন্য অবস্থায় তাঁহা প্রযুক্ত হইলে কখনই দাঁড়াইতে পারে না। আস্তিক ধর্ম্ম কখনই আপনার বিনাশসাধনে উদ্যত হইতে পারে না। আস্তিক ধর্ম্ম এই জন্য চিরকাল

জ্ঞানোন্নতির বিরোধী হইয়াছে। যে অন্ধকারে ইহার জন্ম, সেই অন্ধকারে থাকিতেই ইহা ভালবাসে। মানবের যেমন জ্ঞান-চর্চা হয়, যেমন তাহার উন্নতি বা অবনতি হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে আস্তিক-ধর্ম্মও নানাবিধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সাম্প্রদায়িক মতামত লইয়া নানা বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া উঠে।

নাস্তিকতায় এরূপ ঘটে না। নাস্তিকতা জ্ঞানজগতের নিকষমণি। নাস্তিকতা সর্ব্ববিধ বিজ্ঞানকে আপন আপন অধিকার ছাড়িয়া দেয়। যাহা যে বিজ্ঞানের বিষয়, তাহা সেই বিজ্ঞানকে সাব্যস্ত করিতে বলে;—তাহা তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে গ্রহণ করে না। নাস্তিকতা মানব-জ্ঞানকে পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করিয়া পরস্পরের পার্থক্য দেখাইয়া দেয়। ইহা ভ্রম, কল্পনা, অসিদ্ধ বিশ্বাস প্রভৃতির প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করে। কোন্‌টী সিদ্ধ, কোন্‌টী অসিদ্ধ, তাহা তর্ক করিয়া বিচার করে। যাহা তত্ত্ববিদ্যার বিষয় নহে, তাহাকে পৃথক করিয়া যে বিদ্যার বিষয়, সেই বিদ্যারই আলোচ্য করিয়া দেয়। মানবের সংস্কার ও জ্ঞান সকলের পার্থক্য তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেয়। যে জ্ঞান যে রূপে অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখে। ভ্রান্তিকে কোন মতে গ্রহণ করে না। যে নীতি-শাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানে উত্থিত হইয়াছে, সে নীতিশাস্ত্রকে ধর্ম্মমধ্যে গ্রহণ করে না। যাহা অপর বিজ্ঞানের বিষয়, তাহা তত্ত্ববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করে না। সুতরাং নাস্তিকতা দ্বারা কোন ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের পোষকতা হইতে পারে না। নাস্তিকতা সকল বিদ্যার সম্বন্ধ ঠিক করিয়া দেয়; এবং তত্ত্ববিদ্যার নির্ম্মলতা সাধন করে। ইহা মানবীয় সংস্কার ও জ্ঞানের সহিত ঐশ্বরিক সংস্কার ও জ্ঞানের পৃথকত্ব এবং তাহাদের অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয়।

৫। নাস্তিকতা প্রচারিত হইলে পৃথিবীতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক ভ্রমের নিরসন হইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধে নাস্তিকতা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ করিতে চাহে। এতকাল ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন পরীক্ষাই হয় নাই। ধর্ম্ম যেমন চিরকাল কল্পনা ও বিশ্বাস লইয়াই ব্যস্ত আছে, ধর্ম্মতত্ত্ববিৎগণ সেই কল্পনা ও বিশ্বাস সমর্থনার্থ এত কাল এক স্বতন্ত্র তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আছেন। সেই তর্কপ্রণালী সম্পূর্ণ অনুমান-মূলক। এই অনুমান তর্কে যে সকল সিদ্ধান্ত হয়, তাহাদিগের সম্ভাবনীয়তা মাত্র (Probability) প্রতিপাদন করা সেই তর্ক প্রণালীর উদ্দেশ্য। সেই তর্ক-প্রণালী দ্বারা কেবল এক সম্ভাবনা হইতে অন্য সম্ভাবনা-মাত্রে উঠা যায়। এই জন্য এই তর্ক-প্রণালীকে সম্ভাবনা-মূলীয় তর্কপ্রণালী (Probable Reasoning)

কহে।* এই তর্কে কেবল কতকগুলি অনুমান মাত্র সিদ্ধান্ত করা যায়। কারণ, যাহা অনুমানে আরব্ধ, তাহা অনুমানে শেষ। যাঁহারা আস্তিক ধর্ম্মের স্থাপয়িতা, তাঁহারা দেখিলেন, সেই ধর্ম্মতন্ত্র যেরূপ কল্পনা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ, তাহাতে প্রতিপাদক তর্কপদ্ধতি (Demonstrative Reasoning) প্রয়োগ করিলে তাহার সমুদায় ধ্বংস হইয়া যায়। এজন্য তাঁহারা সেই ধর্ম্মতন্ত্রের জন্য এক স্বতন্ত্র তর্ক-প্রণালীর সৃষ্টি করিলেন। সর্ব্ববিধ ভ্রান্তমত এই তর্ক-পদ্ধতিতে সমর্থিত হইতে পারে। কারণ, অনুমান এ তর্ক-প্রণালীর মূল, এবং সদৃশ দৃষ্টান্ত ইহার প্রমাণ। এ জগতে সদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং সদৃশ দৃষ্টান্ত যে সমস্ত ভ্রম ও কল্পনার সমর্থনকারী, সেই সমস্ত ভ্রম ও কল্পনার প্রমাণেরও অভাব নাই। কিন্তু কথা এই, আদৌ এরূপ প্রমাণ গ্রহণ-যোগ্য কি না, এবং প্রত্যক্ষীভূত সদৃশ দৃষ্টান্তের এরূপ প্রমাণ দ্বারা যে অপ্রত্যক্ষের পক্ষ সমর্থিত হয়, সে পক্ষ সিদ্ধ ও গ্রহণীয় কি না? ভাল করিয়া তলিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, আনুমানিক তর্ক-পদ্ধতি অনেক স্থলে এরূপ সদৃশ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে, যে স্থলে সেরূপ সদৃশ দৃষ্টান্ত একেবারেই খাটে না। যেমন মানবীয় কার্য্যের কর্ত্তা দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তার অনুমান। এস্থলে তলিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপ মানবীয় কার্য্যের সদৃশ দৃষ্টান্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, মানবকে আমরা সকল কার্য্যের কর্ত্তারূপে দেখিয়াছি; কিন্তু ঈশ্বরকে তাহা দেখি নাই; এবং মানবীয় কার্য্য ও ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এই দুই স্বতন্ত্র পদার্থ; ইহাদিগের সাদৃশ্য কিছুই নাই। কিন্তু যেখানে কোন সাদৃশ্য নাই, সেই খানে সাদৃশ্য খাটাইয়া আস্তিকেরা সৃষ্টিকর্ত্তা-রূপ এক স্বতন্ত্র পুরুষের বিদ্যমানতা অনুমান করিয়া লইলেন। আস্তিকদিগের তর্ক-পদ্ধতিতে এইরূপ অযৌক্তিক দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে, আমরা একটী মাত্র উল্লেখ করিলাম। নাস্তিকতা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র তর্ক-প্রণালী খাটাইতে চাহে। অনুমান-তর্ক-প্রণালীকে নাস্তিকতা একেবারে পরিত্যাগ করিতে চাহে; এবং তৎ-পরিবর্ত্তে প্রতিপাদক-তর্ক-প্রণালী (Demonstrative Reasoning) প্রবর্ত্তিত করিতে চাহে। কারণ, ইহা দেখিয়াছে, মানব ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুমান-তর্ক-প্রণালী অবলম্বন করিয়া কেবল অসংখ্য অনুমানে আসিয়া পড়িয়াছে। এক অনুমান ও এক বিশ্বাস হইতে নানা অনুমান ও নানা বিশ্বাস আসিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবী কেবল অসংখ্য কাল্পনিক বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই অনুমান-তর্কে লোকে কেবল সাদৃশ্য (Analogy) দেখে। সাদৃশ্য যে তর্কের মূল, সেই সাংদৃষ্টিক

* Vide Introduction to Butler's Analogy of Religion on Probable Evidence.

ন্যায়ে (Reasoning from Analogy) বৃথা অনুমান ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধান্ত করিবার যো নাই। অতএব এই তর্ক-প্রণালী পরিহার্য্য।

কার্য্য-কারণ-নির্ণয়ে ভ্রমবশতঃ ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও অনেক ভ্রান্ত মত আসিয়া পড়িয়াছে। যাহার সহিত যাহার নিত্য সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত তাহার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ঘটাইয়াও ধর্ম্মশাস্ত্র অনেক ভ্রান্তি প্রচার করিয়াছে। যে ঈশ্বরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের কোন নিত্য-সম্বন্ধ নাই, সেই ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ-রূপে নির্ণীত করা হইয়াছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, একটী কাল্পনিক ঈশ্বর সৃষ্ট হইয়াছে। তদ্রূপ যে পরকালের সহিত মানবাত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ স্থির করা হইয়াছে *। এবং যে ধর্ম্মনীতির সহিত পরকালের কোন সম্বন্ধ নাই, সেই দূরবর্ত্তী পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার, নরক ও স্বর্গভোগ, নীতি লঙ্ঘন এবং অনুবর্ত্তনের ফল-স্বরূপ করিয়া দিয়া নৈতিক শাসনের বল কমাইয়া দিয়াছে। তজ্জন্য ধর্ম্ম মধ্যে অসংখ্য কাল্পনিক মত আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অন্যান্য অনেক বিষয়ে অন্যায় কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে। পদার্থ-তত্ত্বে আমরা যেরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিয়া কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ অবধারণ করি, ধর্ম্মসম্বন্ধে সেরূপ করি নাই বলিয়া, ধর্ম্মরাজ্য কেবল ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এ রাজ্যে কেবল কণ্টক বৃক্ষই জন্মিয়াছে। এই সকল ভ্রান্তি ও কণ্টক বৃক্ষ ছেদন করিয়া একবার ভূমি পরিষ্কার করা আবশ্যক হইয়াছে। নাস্তিকতা সেইরূপ মানবের ধর্ম্মভূমি পরিষ্কার করিতে চাহে। পরিষ্কার করিয়া তাহাতে নিজ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমুৎপাদিত বীজ ও সরস ফলের বৃক্ষাদি রোপণ করিতে চাহে। এক্ষণকার ধর্ম্ম-রাজ্যের সমুদায় ভ্রম নিরাকৃত হইলে, এবং পৃথিবীতে নাস্তিকতা-সমুৎপাদিত সত্য সকল স্থাপিত হইলে, পৃথিবীর যে কতদূর লাভ ও উন্নতি হইবে, তাহা এক্ষণে অনুমান করা যায় না। তবে অন্য বিষয়ে আমরা দেখিয়াছি যে, ভ্রান্তি স্থলে সত্যমত স্থাপিত হইলে পৃথিবীর নানাবিধ উপকার ও উন্নতি-সাধন হয়। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেই বা না হইবে কেন?

৬। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাপিত করা নাস্তিকতার উদ্দেশ্য। নাস্তিকতা নিজে স্বাধীনতার উপর স্থাপিত। ধর্ম্ম-জগতে সেই স্বাধীনতার রাজ্য বিস্তৃত করা নাস্তিকতার কার্য্য। পৃথিবীতে মানব-সমাজ-মধ্যে স্বাধীনতা সর্ব্ববিষয়েই প্রবেশ-লাভ করিয়াছে, কেবল ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সমর্থ হয় নাই; নাস্তিকতা স্বাধীনতাকে ধর্ম্ম জগতেও প্রবিষ্ট করাইতে চান। "সত্যের জয়

* আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত "শরীর ও মন" এবং "সমাজ ও পরলোক" নামক প্রবন্ধ দেখ।

হউক'' নাস্তিকতা এই মহাবাক্য ধর্ম্ম-জগতেও ঘোষণা করিতে চান। ধর্ম্ম-জগতে এতকাল মহাজনের পন্থাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া স্থিরীকৃত আছে। সেই মহাজনের পন্থা কোন কালে পরীক্ষিত হয় নাই। ধর্ম্ম-জগতে চিরকাল মহা-জনগণ ও গুরুর উপদেশ সকল অলঙ্ঘ্য ও অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সে সমস্ত উপদেশ ও বাক্যের অসত্যতা কেহ সন্দেহ করিতেও সাহসী নহে। নাস্তিকতা এই সকল অলঙ্ঘ্য শাসনের বিরুদ্ধে সত্যকে অস্ত্রধারী হইতে বলেন। নাস্তিকতা কহে, যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহা মহাজনের উপ-দেশের সহিত মিলুক, আর নাই মিলুক, সেই সত্য অবশ্য গ্রহণীয় হইবে। শাস্ত্র-শাসন যেন সত্যের পথ অবরুদ্ধ না করে। সত্যের বল যেন স্বাধীনতা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। স্বাধীনতা যেন সত্যকে ভুবন-বিজয়ী করে। ধর্ম্মশাসনের পরাক্রম যেন সত্যের নিকট পরাজিত হয়। যে ইয়োরোপ সর্ব্ববিষয়ক স্বাধীনতার জন্য ভুবনবিখ্যাত, সে ইয়োরোপেও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। একদা যখন পোপ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বাধীনতা তখন পোপের ক্ষমতাকে রাজকীয় ক্ষমতার অধীন করিয়াই নিবৃত্ত হইল; এবং কোন কোন স্থানে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমাত্র সৃষ্টি করিয়া-ছিল। কিন্তু সেই অবধি স্বাধীনতা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অশক্ত হইয়া আছে। এখন ধর্ম্ম-রাজ্য রাজকীয় বলের অধীন হইয়াছে, এবং ধর্ম্মশাসন রাজকীয় শাসনের অন্ত-র্ভুক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আর কাঁহারই স্বাধীনতা নাই। বিশপ কোলেন্সো সে দিন অপদস্থ হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠাপিত ধর্ম্ম-মতের বিরুদ্ধে এখন কাহারও যাইবার যো নাই। সেই ধর্ম্মমতের অনুমোদন করিয়া সকলকে চলিতে হইবে।

পৃথিবীতে ধর্ম্ম এখন অনেক প্রাচীর-বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম এখন কেবল নির্দ্দিষ্ট সীমা ও রেখা মধ্যে বিচরণ করিতে পারে। সেই সীমা পর্য্যন্ত তাহার স্বাধীনতা। নানা ধর্ম্মে এই সকল সীমা নানা আকারে স্থাপিত হইয়াছে। শাস্ত্র, সম্প্রদায়, চর্চ্চ, সমাজ প্রভৃতি ইহার নাম। ধর্ম্ম এতদ্দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যেখানে আমরা চর্চ্চের নাম শুনি, সমাজের নাম শুনি, সম্প্রদায়ের নাম শুনি, সেই খানেই এক এক ধর্ম্ম-মতের অলঙ্ঘ্য সীমা দেখিতে পাই। যিনি সে সীমা অতিক্রম করিলেন, তিনি এক সম্প্রদায় হইতে অন্য সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন মাত্র। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াও সেখানে সেই পূর্ব্বাবস্থা ঘটিল। তাহার ধর্ম্মমত এই নূতন সম্প্রদায়ের সীমা মধ্যে আবদ্ধ রহিল। সেই সীমা মধ্যে তাহার স্বাধীনতা। সে সীমা অতিক্রম করিলেই তিনি আর এক সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবেন।

কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি কিছুতেই পাইবেন না। তাহার কারণ এই, আস্তিকতা-ধর্ম্ম অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ সমস্ত সীমা ছেদন করিবার একমাত্র উপায় নাস্তিকতা।

নাস্তিকতার পথ অনুসরণ না করিলে, মানব স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা ও অনুশীলন করিতে পারে না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে গেলেই মানব নাস্তিকতায় আসিয়া পড়ে। কারণ, সর্ব্ব ধর্ম্মের গোড়ায় নাস্তিকতা রহিয়াছে। সর্ব্ব ধর্ম্মের মূলে নাস্তিকতা কিরূপে রহিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। এই জন্য, সর্ব্ব ধর্ম্মেই মানবকে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে চাহে না। সর্ব্ব ধর্ম্ম যেমন নাস্তিকতাকে ভয় করে, তেমনি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় স্বাধীনতাকেও ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম স্বাধীনতার পথ কতকাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে? মানব অবশ্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবে, আলোচনা করিবে ও কার্য্য করিবে। ইহা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাব। মানব-প্রকৃতির স্বাধীন স্ফূর্ত্তিকে চিরকাল দমন ও শাসন করিয়া রাখা যাইবে না। মানব প্রকৃতির স্বাধীন-স্ফূর্ত্তিতে যে কখন অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এমত প্রমাণিত হয় নাই। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেই বা কেন অনিষ্ট ঘটিবে? মানবজাতির পক্ষে যে ধর্ম্ম স্বাভাবিক, তাহা মানব-প্রকৃতির স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতেই প্রকাশিত হইবে। যাহা মানব-প্রকৃতির স্বাধীন স্ফূর্ত্তির ফল, তাহাই মানব-প্রকৃতির উপযোগী। এতকাল ধর্ম্ম মানব-প্রকৃতির স্বাধীন স্ফূর্ত্তির ফল হয় নাই বলিয়া তাহা মানব সমাজের সম্যক্ উপযোগী হয় নাই। তাহার উপদেশ সকল মানব-প্রকৃতি-সঙ্গত নহে। সে সকল উপদেশ দেবতা-রাজ্যে এক দিন সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু মানবের পক্ষে তাহা খাটে না বলিয়া কেহ সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইতে পারেন না। কিন্তু যে ধর্ম্ম মানব-প্রকৃতির স্বাধীন ফল-স্বরূপ হইবে, তাহা মানব-সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে। মানব-সমাজে তাহার সার্থকতা হইবে। মানবজাতির সেই স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম আবিষ্কার ও স্থাপন করা নাস্তিকতার কার্য্য। এ কার্য্যে সুতরাং স্বাধীনতার সম্পূর্ণ আবশ্যক।

৭। নাস্তিকতা মানবোপযোগী প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম্মতন্ত্র স্থাপন করিবে। এতকাল পৃথিবীতে ধর্ম্ম যে সকল কঠোর নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছে, পবিত্রতা এবং উৎকর্ষের যে চরম আদর্শ দিয়াছে, নরকের যেরূপ ভয়ঙ্কর সন্ত্রাশ দেখাইয়াছে, এবং স্বর্গ-সুখের যেরূপ প্রলোভন দিয়াছে, তদ্দ্বারা কি মানব-সমাজ নিয়মিত হইয়াছে? অনেকে বলিবেন, যদি না নিয়মিত হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্মের দোষ নহে, মনুষ্যের দোষ। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমুদায় মানবজাতি কি দূষিত, না মানব-প্রকৃতি দূষিত? ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানবকে লইয়া;

কিন্তু যখন মনুষ্যজাতি ধর্ম্ম-দ্বারা পরিশুদ্ধ হইল না, সেই ধর্ম্মের কল্পনানুযায়ী উন্নত হইল না, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, সে ধর্ম্ম ও কল্পনা মনুষ্য-সমাজের জন্য নহে। যেহেতু মনুষ্য-সমাজে তাহার কার্য্যকারিতা নাই। মনুষ্য হইতে কোন উচ্চতর লোকের পক্ষে তাহা উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে মনুষ্যোপযোগী নহে, তাহা নিশ্চয়। কি জন্য তাহা মনুষ্যোপযোগী নহে, অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে যে, সে ধর্ম্ম-প্রণালী মানব-প্রকৃতি-সঙ্গত নহে। তাহার উৎকর্ষের কল্পনা দেবোপম হইতে পারে, কিন্তু তাহা মানব-প্রকৃতির সহিত সঙ্গত নহে। যাহা মনুষ্যের জন্য নহে, মনুষ্য-সমাজে যাহার ফলোপধায়িতা কিছুই নাই, তাহা আমরা লইয়া কি করিব? সুতরাং অবশ্য বলিতে হইবে, মানব দূষিত নহে, ধর্ম্মেরই দোষ। এই দোষ যে, ইহা মানব প্রকৃতির উপযোগী নহে। এই দোষ যে, ইহা মানব-প্রকৃতির স্বাধীন স্ফূর্ত্তি দমিত করিয়া এবং সেই প্রকৃতিকে নিতান্ত নিপীড়িত ও অনুশাসিত করিয়া যে স্থানে লইয়া যাইতে চাহে, সে স্থানে যাওয়া, অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। শম এবং দমের কঠিন অনুশাসনে থাকিয়া মানব-প্রকৃতি কখন একেবারে নিষ্পাপ হইতে পারে না—দেবোপম সম্পূর্ণ পবিত্রতায় উঠিতে পারে না। একেবারে নিষ্পাপ হওয়া মানব-প্রকৃতির গৌরব নহে, কিন্তু যতবার পতিত হইবে, ততবার উত্থিত হওয়াই মানব প্রকৃতির গৌরব। এই ঈশ্বরোপম পবিত্রতা-লাভের জন্য ধর্ম্ম কি উপায় স্থির করিয়াছে? বহু-দূরবর্ত্তী কাল্পনিক পরলোকের শাস্তি-ভয় এবং পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া ইহা মানবকে সম্পূর্ণ পবিত্র করিতে গিয়াছে। এই উপায় কতদূর ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর ইতিবৃত্তে প্রতীত করে। বর্ত্তমান ও পার্থিব মঙ্গল এবং সুখোদ্দেশে মানব-প্রকৃতি যত চালিত হয়, বহুদূরবর্ত্তী, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সুখোদ্দেশে মানব-জাতি কখন তত চালিত হইতে পারে না। দুই এক জন লোক আপন প্রকৃতিকে নিপীড়ন করিয়া এই পবিত্রতা ধর্ম্ম-লাভে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু সমুদায় মানবজাতি সেরূপ করিবে না। বাস্তবিক কার্য্য-ক্ষেত্রে এইরূপই ঘটিতেছে। প্রচলিত আস্তিক ধর্ম্মাদির উদ্দেশ্য যদি মানবজাতির কাছে ব্যর্থ হয়, তবে মানব প্রকৃতির জন্য এক স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-প্রণালীর আবশ্যক। প্রচলিত আস্তিক ধর্ম্মাদি মানব-প্রকৃতির অভাব মোচন করিতে পারে নাই। এই ধর্ম্মাদি মানবের ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান-তৃষ্ণাও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। মানব এই বিশ্বব্যাপারের কারণানুসন্ধানে যে এত লালায়িত হইয়াছে, সেই কৌতূহল নিবারণ জন্য আস্তিকতা ঈশ্বররূপ একটী মিথ্যা কারণ দিয়াছে। মানব অনুসন্ধানে দেখিলেন, সে কারণ ব্রহ্মাণ্ডের

প্রকৃত আদি কারণ হইতে পারে না। সেই ঈশ্বররূপ কল্পনা এতদূর অলীক যে, তাহার সত্ত্বা কখন সম্ভবে না। তবে আস্তিকতা কি দিয়াছে? আস্তিকতা মানব-প্রকৃতির কোন অভাব সম্পূরণ করিতে পারে নাই। এই বিশ্ব-ব্যাপারের আদি কিরূপ হইতে পারে, নাস্তিকতা বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তাহা স্থির করিতেছে। ঈশ্বর-রূপ একটী পুরুষ যে ব্রহ্মাণ্ডের আদি হইতে পারে না, নাস্তিকতা তাহা স্পষ্ট প্রদর্শন করে। এই আদির প্রকৃতি কিরূপ হইতে পারে, নাস্তিকতা তাহা দেখাইয়া দেয়। নাস্তিকতা যে ধর্ম্ম-প্রণালী উদ্ভাবিত করে, তাহা যে শুদ্ধ মানবের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণ করে, এমত নহে। তাহা মানবের প্রকৃতিকেও নিয়মিত করিতে চাহে। তাহা দেখাইয়া দেয়, মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ যে কার্য্যপথ, তাহাই ধর্ম্ম হইতে পারে; এবং তদ্বিপরীত অধর্ম্ম ও দুষ্কৃতি। আস্তিকতার মত দেব-কল্পনা ও দেব-প্রকৃতির উপর ধর্ম্মকে স্থাপিত করিয়া তাহা মানব-প্রকৃতির সহিত সঙ্গত করিতে যায় নাই, কিন্তু নাস্তিকতা ধর্ম্মকে মানব-প্রকৃতির উপর স্থাপিত করিতে চাহে—যে ধর্ম্ম মানব অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পারে,—যে ধর্ম্মের অনুযায়ী মানব, আস্তিকতা সত্বেও, চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। আস্তিকতা যে দেবোপম ধর্ম্মপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, মানবজাতি প্রকৃত-পক্ষে বাস্তবিক কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহা ঠেলিয়া রাখিয়াছে, এবং যাহা প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহাই অবলম্বন করিয়াছে। নাস্তিকতা মানবকে দেবতা করিতে চাহে না; কিন্তু মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা দেখাইতে চাহে। যেখানে যাওয়া অসম্ভব, নাস্তিকতা মানবকে সেই স্থানে উত্তোলিত করিতে চাহে না, কিন্তু যে সুপথে যাওয়া সম্ভব, সেই সুপথে মানবকে লইয়া যাইতে চাহে। নাস্তিকতা অঘটন ঘটাইতে চাহে না, কিন্তু মানব-প্রকৃতিকে উন্নত, বিশুদ্ধ ও পরিণত করিতে চাহে। নাস্তিকতা মানব-প্রকৃতির পরম তত্ত্ব প্রদর্শন করে, এবং তাহার চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে চাহে। নাস্তিকতা বিপথে মানবকে বৃথা ভ্রান্ত করিতে চাহে না, কিন্তু মানব যে সুপথে অনায়াসে বিচরণ করিয়া, আপনার উন্নতি সাধন করিতে পারে, সেই সুপথ দেখাইয়া দেয়। আস্তিকতা দেবতার ধর্ম্ম, নাস্তিকতা মানব-জাতির ধর্ম্ম।—কপিঞ্জল।

ভারত-ভ্রমণ
বা
প্রলাপীর বিলাপ।

"My Native Land Good night!"—
LORD BYRON.

প্রথম সর্গ।

১

এস লো কল্পনে!—মিলিয়া দু' জনে,
ভ্রমিয়া বেড়া'ব ভারত-শ্মশানে!—
লহ স্মৃতি সাথে,—সে বিনা কেমনে
শ্মশানের মাঝে কি দেখিব হায়?—
রাবণের চিতা জলি'ছে নিয়ত
সপ্ত শত বর্ষ নির্ব্বাণ না হয়!
অনল-লহরী খেলি'ছে সমীরে,
হু হু স্বনে ঘন গর্জ্জি'ছে গম্ভীরে!—

২

শুনে'ছি দ্বাপরে, কুরু-কুল-মণি,
তোষিতে অনলে, সুরথী ফাল্গুনি,
দেবদত্ত-নাদে বিমুখি' অমরে
জ্বালিলা খাণ্ডবে প্রচণ্ড অনল!
অভ্র-দল ভেদি' ভৈরব হুঙ্কারে
কাঁপা'য়ে ত্রিলোক, হইল প্রবল!
অজস্র বর্ষণে নিবা'তে আপনি
নারিলা, তাহারে দেব-সুরমণি!—

৩

কলিতে খাণ্ডব বিপুল ভারত
বিংশ কোটী জীব তাহা ভস্মীভূত!
ভূতলে ভৈরবে, পলকে পলকে
ব্রহ্মাস্ত্র পড়িয়া করি'ছে গর্জ্জন!—
চৌদিক ঘেরিয়া বিপুল গর্জ্জিয়া,
ভ্রমিতেছে রোষে অস্ত্র সুদর্শন!—
পলাইলে জীব ছেদি' সুদর্শনে
আহুতি অনলে করি'ছে অর্পণ।

৪

অই স্মৃতি শুধু তোমার নিশান
অচল অটল,—তবু দৃশ্যমান।
না পোড়ে অনলে—না ডুবে সলিলে
আপন গুমারে দুলি'ছে হেলায়।
এস স্মৃতি এস!—তব কৃপা বিনা
শ্মশান-মাঝারে কি দেখিব হায়?—
এই কলিকাতা—রহ দেখি এরে—
সোণার মুকুট বঙ্গমাতা-শিরে।—

৫

এই কলিকাতা—বিজন বিপিন
বহু দিন নহে—ছিল এক দিন!—
অন্ধ বঙ্গবাসী—কি শিক্ষার স্থল
এই কলিকাতা!—কালি ঘোর বন—
আজি ইন্দ্রপুরী!—তবে কি বাঙ্গালী
দাসত্বেতে শুধু যাপিবে জীবন?
নিশি পোহাইলে ঊষা দেখা দিবে।—
ভানুর উদয়ে জগত হাসিবে।

৬

হুড়ুম হুড়ুম—গরজে গভীরে
বৈতালিক তোপ গড়ের ভিতরে।
দূর-দুর্গ-চূড়ে ধীরে ধীরে উড়ে
মহাদর্প-ভরে বৃটিশ পতাকা!
সমীরে সাঁতারে মনের গুমারে
সিংহ-চিহ্ন অঙ্কে রহিয়াছে আঁকা!
হিমাদ্রি সহিত দক্ষিণ সাগর
আতঙ্কে সকলে কাঁপে থর থর!

৭

অদূরে দুর্গের শ্যামল-প্রান্তরে
সৈনিকের দল গর্ব্ব-ভরে ফিরে
—স্কন্ধেতে বন্দুক আকীর্ণ সঙ্গিনে
শূর-করে অই করে ঝলমল।
স্ফীত বক্ষঃদেশ ঊর্দ্ধেতে নয়ন
পদ-ভরে ক্ষিতি করে টল মল!
বৃটিশ ইণ্ডিয়া সব মৃয়মাণ!
দেব-জ্ঞানে করে পাদ্য-অর্ঘ্য-দান!—

৮

ইডেন্-গার্ডনে বাজি'ছে বাজনা!
চলে'ছে ইংরাজ-বামে বরাননা!
কেহ বা ফেটিংয়ে কেহ পদব্রজে—
যা'র যা'তে সাধ হ'য়ে কুতুহলী।—
"হট্ যাও" স্বরে হাঁকায় প্রহরী,
ভাগে আর্য্যসুত ক'রে ঠেলাঠেলি;—
সভয়ে, প্রহরী দারুণ-প্রহারে
চলে উভরড়ে পিছু নাহি ফিরে!

৯

আর্য্যসুত!—না না!—তা' বলিব কেন
সিংহের ঔরসে জন্মে না কখন
অধম শৃগাল!—আর্য্য কেশরিণী
প্রসবিল নাহি গ্রাম সিংহ-দলে!
ক্ষীণ যষ্টি করে স্থূল লম্বোদর
এদেরি কি হায়! আর্য্যসুত বলে?
তা' যদি হইবে তবে আজি কেন
দুরাচার দৈত্য নন্দন-কাননে?—

১০

বিজয়ি-বিলাস ইডেন্-কানন
আনন্দে বিজয়ী করি'ছে ভ্রমণ!
কুকুরের দল! তো'দের শিরায়
ঘৃণা লাজ নাহি কদাচিত খেলে
অম্লান-বদনে নতুবা কেমনে
স্থির আঁখে ইহা দেখ অবহেলে?—
নন্দন-কাননে ভ্রমে দৈত্যগণ—
স্থির নেত্রে দেবে করে কি দর্শন?

১১

আর ত পারিনে হেরিতে কল্পনে!
আন ব্রাণ্ডি তবে।—পারিনে তা' বিনে!
এক পাত্র—দুই—পূর্ণ কর তিন—
আর্য্য-স্মৃতি আজি ডুবাইব তবে!
আর আর্য্য কেন সুরার সাগরে
নিমজ্জিত আর্য্য-বীর্য্য-পৌর্য্য এবে!
'Another dose! dear কল্পনে!—
কাজ নাহি আর ইডেন্-কাননে!

১২

দোতালা চৌতালা সৌধ সারি সারি!
একি এ কল্পনে!—একি ইন্দ্রপুরী?
চৌরঙ্গি এ—তাই!—তাই হোক্ তবে
বঙ্গ-কবি কেন তোমার সহায়ে,
বিচিত্রে আয়াসে অমরের পুরী?
আকাশ-কুসুম কি কাজ ভাবিয়ে?—

সাকারে না ভজি' নিরাকারে ভজা
যাহা বল ভাই ! তা'তে নাই মজা।—

১৩

নবীন নথর স্থ-Joy বল্লরী
মুঞ্জ মঞ্জুরিত অলিন্দ-উপরি
গুঞ্জরি'ছে তাহে মুগ্ধ মধুকর !
—Another dose ! dear করনে !
দেবী কি মানবী বিরাজে গঞ্জিয়া
মঞ্জু-কুঞ্জ-শোভা ?—কহ বরাননে !
বিবি বরাননি !—বুঝে'ছি এখন।
Good health !—Good health !—
পরেতে তখন !

১৪

প্রসর, ইষ্টক-পাষাণ-রচিত
অলিন্দের নীচে রম্য রাজ-পথ !
ভীম-নাদে ধরা বিকম্পিত করি'
চলি'ছে ফেটিং মৃদুল ঘোর্ঘরে।।
ফুল-পরিমল কুঞ্জে চুরী করি'
সায়াহ্ন-পবন বহে ধীরে ধীরে।
বাম-ভাগে বিবি গাউনে গা' দিয়ে'—
উপবনে ফিরে বিভোর হইয়ে !—

১৫

বঙ্গীয় পাঠক দুঃখেরি সকলি !
মোদের কি ভাল গাউন্ ঠেলাঠেলি !
বাঙ্গালার কবি বিহীনসম্বল,—
পদ-ব্রজে চল আর কি উপায় ?
কুকুরের জাতি—কুকুরের মত
যা'ব তাহে ক্ষতি বল কিবা হয় ?
জীবন মরণ সমান মোদের !
আর্য্য-স্থানে রাজ্য এবে ইংরাজের !

১৬

বঙ্গীয় পাঠক ! দারিদ্র্য-দহনে
জ্বলি অবিরত আমাদের মনে,
লাগে কি হে ভাল শিল্পের মহিমা ?
তুচ্ছ শ্বেতদ্বীপ না হয় তুলনা !—
কবির মধুর চিত্র নিরখিলা
তোমার কল্পনা !—উন্মাদ কল্পনা !!—

* * * *
* * * *

১৭

পশু পক্ষী কথা গাছে বাঁধি' নীড়ে
ইংরাজের বাস সামান্য কুটীরে !—
সিংহ লজ্বি' মৃগ তৃণ হরি' খায় !
মূল মন্ত্র তারি "সু-অধ্যবসায় !"—
ফাটে বুক ভাই !—দাঁড়াও দাঁড়াও—
Make it then, empty now !—
And this is but the last !—
Weak Nigger ! Then thou must
not.

১৮

মোক্ষ-প্রদায়িনী—হরের জটায় !—
ম্লেচ্ছ-করে কেন শৃঙ্খল গলায় ?
ধন্য ইংরাজ !—আতর্স সলিলে,
অদ্ভুত ঘটায় !—কলে গাড়ী চলে !
বৈদ্যুতিক শক্তি আজ্ঞাবহ তা'র—
দূত-বেশে পদে করে নমস্কার !—
তুচ্ছ অণুকীট !—দেবতা তাঁহারা !—
বৃথা গর্ব্ব তব—"আর্য্যসুত মোরা !"

১৯

তরঙ্গের শিরে পদাঘাত করি'
দাঁড়ায় অটল 'বয়া' সারি সারি !—

জাহ্নবীর হৃদে পদাঘাত দিয়ে
আর্য্য-সুতে যেন স্তম্ভিত করিয়ে—
ইংলণ্ডের শিল্প স-গরবে যেন
আপন মাহাত্ম্য করে বিজ্ঞাপন!—
বিরস ভারত ঠনক দেখিয়া!—
লজ্জিতা তা' সহ সমস্ত "আসিয়া"!

২০

এই ভাগীরথী পূর্ণ সিন্ধু-যানে!
ভেদি' শূন্য-দেশ মিশি'ছে বিমানে
ধূম রাশি রাশি— কাদম্বিনী হেন
উঠি'ছে আকাশে পদাঘাতি' যেন
অধোদেশ!—শাল-সম দীর্ঘ-চূড়ে
ইংরাজের কেতু ধীরে ধীরে উড়ে!—
সিংহ-চিহ্ন আঁকা!——অনল-অক্ষরে
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি ভারত-ভিতরে!—

২১

ভাগীরথী-তটে মনোহর dock!—
পাই না ত তাহা ভাষায় পাঠক!—
অই কথা থাক—নাই যা' মোদের!—
ভিক্ষায় কি লজ্জা আছে আমাদের?
Hat, coat নিতে কই লজ্জা নাই।
বাণীরে তোষিতে হ'বে কি রে ভাই?—
তা'তে কায নাই!—বৃথা অভিমানে!—
—তা শিখে'ছ খুব বাঙ্গালিনী-সনে!—

২২

ভাগীরথী-তটে মনোহর জেটি!
অর্দ্ধ-মগ্ন নীরে, ঘাট কোটী কোটী!—
তরঙ্গের 'পরে অলিন্দ সুন্দর!
বিলাসীর বালা শোভে মনোহর!
সভ্যতায় সর্ব্ব ভারত জিনিয়া
য়ুরোপ-ক্যাসনে ভারত গঞ্জিয়া,
অঙ্গ খোলা সাজে!!—কি লজ্জার কথা!
সে পূর্ব্ব-গৌরব আর এবে কোথা'?—

২৩

তীরে উপবন—ক্ষুদ্র-পরিসর—
"বাবু" বসিয়াছে অই স্থূলোদর!
মৃত্তিকার ঢিবি!—জীবন্ত কুণপ!—
এরা কি রে না কি ভারতের আশা?
সরস্বতী-সহ বিদ্যালয়ে দেখা!
ফুরা'য়েছে কবে তা'র ভালবাসা!
বাঙ্গালী প্রেমিক!—মিছে কথা ভাই!
বঙ্গ-অভিধানে "প্রেম" শব্দ নাই!—

২৪

শৌর্য্য, বীর্য্য, বল,—বাঙ্গালীর যাহা
"ভারত-উদ্ধারে"—'রামদাস' ভায়া
বলে'ছেন তাহা!—উন্নতির পথে
প্রদর্শক এরা!—কপালের দশা!—
জীবনের লক্ষ্য গিন্নীর গহনা
তা' হ'লেই মিটে গেল, সব আশা!—
মাগীর প্রহার মাটী হ'য়ে সয়!
ভাতের কাঠিটী সুধু নাহি সয়?—

২৫

বিদেশী শাসন;—'মেকলের' গালি
তা'তে মাথা কোটা—কেন মিছে বলি!—
কর্ণ মহারথী, ভৃগুরামে পূজি'
ভৃত্য-ভাবে লভি'—জিতিল অবনী!—
দেবপুত্র কচ শুক্রে পূজি' পদ
তারিলা আমারে!—তবে কেন শুনি
বৃথা অভিমান?—শিখহ যতনে
নিজ ইষ্ট যাহা—শরীর-পতনে!—

২৬

বাঙ্গালীর এই লজ্জাকর কথা
কহিতে পাঠক! বড় পাই ব্যথা!—

য়ুরোপ-বিজয়ী "আসিয়া" উপরে—
মূল মন্ত্র তা'র 'বিজ্ঞান' কেবল!
এই এক কালে মূল-মন্ত্র-বলে
য়ুরোপের পাঁয়ে দি'ছিল শিকল!—
কা'র ভাগ্যে রবি কবে কিবা ফলে!—
করী বদ্ধ হয় মানবের বলে!—

২৭

'মেকলের' গালি যথেষ্ট র'য়েছে!
তা'তেই বাঙ্গালী সতত জ্বলিছে!
তবে আর কেন?—ভাই রে চট না!
এতেও কি তবু চৈতন্য হ'বে না?
লেখক পাঠক উভয়ে বাঙ্গালী—
ভাই বলে' ভাই দুই কথা বলি!—
চল ভাই! চল যাই ইষ্ট সনে
দেখাইব আজি ভারত-শ্মশানে!—
(অবতরণিকা-নাম প্রথম সর্গ সমাপ্ত।)

শ্রীঃ—

বীরবর ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

(১২৮৭ মাঘ, ৪৪৪ পৃষ্ঠার পর।)

বিগারের যুদ্ধ।

রজনীযোগে ছদ্মবেশে এড্‌ওয়ার্ডের শিবির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ওয়ালেস্ রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিলেন; প্রত্যূষে সমস্ত জাতীয় সেনা এড্‌ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভিযানোদ্যত হইল। ওয়ালেস্ স্বয়ং বই্ ও অচিংলেক সমভিব্যাহারে অশ্বসেনার দিকে অগ্রসর হইলেন। জন্ গ্রেহাম্, আডাম্ ও সমর্ভিল্ সমভিব্যাহারে মধ্যদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সার্ ওয়াল্টর ও তদীয় পুত্র ডেভিড্ এবং সার্ জন্ টিন্টো তিন জনে অশ্বসেনার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন, অশ্বসেনার এই তিন স্তম্ভের পশ্চাতে ওয়ালেস্ পদাতিক সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন এবং তাহাদিগকে আদেশ দিলেন—তাহারা যেন সহজে রণে প্রবৃত্ত না হয়। কারণ, তাহাদিগের ভাল অস্ত্র শস্ত্র নাই, ও রণে পরাজিত হইলে, পলাইবার জন্য সুসজ্জিত অশ্ব নাই। তাহার পর তিনি সৈন্যগণকে একত্রে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন যে, যত ক্ষণ রণে বিজয়-লক্ষ্মী করতলস্থ না হয়, তত ক্ষণ যেন সৈন্যেরা সর্ব্বতোভাবে লুণ্ঠন-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত থাকে।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া এক-মনে ও এক-বাক্যে ধীর ও স্থির পদ-বিক্ষেপে ইংরাজ-শিবিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে টম্ হ্যালিডে দুই পুত্র সহ এবং জার্ডেন্ কার্কপ্যাট্রিক্

তিন শত সৈনিক সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের এই অভাবনীয় আবির্ভাবে স্কটিশ্ সেনার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

ওয়ালেস্ ইংরাজ-শিবির তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং যথায় ইংলণ্ডেশ্বর বা তদীয় প্রতিনিধি অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি নিজ সেনা ইংরাজ-শিবিরের সেই প্রদেশে চালিত করিলেন। যেন নীরব গিরি-গহ্বরে সহসা প্রচণ্ড জল-প্রপাত আসিয়া পড়িল। ইংরাজ-সেনা এরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না; সুতরাং তাহারা প্রথমে অতি বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইংরাজ-ধৈর্য্য-গুণে অচির-কাল-মধ্যেই ইংরাজ-শিবিরে সুশৃঙ্খলা পুনঃ-স্থাপিত হইল। প্রথম সংঘর্ষ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। ইংরাজ-সেনা-নায়ক আরল্ অব্ কেণ্ট পাঁচ শত সেনা লইয়া রজনীতে বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তিনি ত্বরিত-গতিতে আসিয়া শিবির-রক্ষার্থ প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে গ্রেহাম্ প্রভৃতি স্কটিশ্ সেনা-নায়কেরা ওয়ালেসের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

অতি-প্রচণ্ড-বেগে স্কটিশ্ অশ্ব ও পদাতিক-সেনা আরল্ অব্ কেণ্টের অভিমুখে ধাবিত হইল। উক্ত আরল্ অদ্ভুত বীরত্বের সহিত রাজাধিষ্ঠিত চন্দ্রাতপ রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ওয়ালেসের অব্যর্থ খড়্গ অচির-কাল-মধ্যে তাঁহার দেহ-যষ্টিকে দ্বিধা বিখণ্ডিত করিল। সেনা-নায়কের পতনে সমস্ত ইংরাজ-সেনা রণে ভঙ্গ দিল। রণক্ষেত্রে চতুঃ-সহস্র ও পলায়ন-কালে সপ্ত সহস্র ইংরাজ-সেনা নিহত হইল। বিংশ সহস্র ইংরাজ-সেনা সমবেত হইয়া পলায়ন করিল। স্কটেরা কলটির হোপ্ পর্য্যন্ত তাহাদিগের অনুসরণ করিল। কিন্তু সেনা-নায়ক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল।

এ দিকে দিনমণি গগন-শিখরে আরোহণ করিয়া রশ্মিজালে জগৎ রজতময় করিয়া তুলিলেন। স্কটেরা অনুসরণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শত্রু-শিবিরে প্রস্তুত বিবিধ আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিয়া ও সংগৃহীত বিবিধ পানীয় দ্রব্য পান করিয়া বিজয়োৎসব সম্পাদন করিলেন। স্কট-সেনা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া শত্রু-শিবিরের যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী, অর্থ-জাত ও বহুমূল্য মণি-মুক্তাদি বিলুণ্ঠন করিল। ওয়ালেস্ এরূপ সমতল ক্ষেত্রে-দ্বিতীয় বার ইংরাজ-সেনার সম্মুখীন হইতে ভীত হইয়া, এবং ইংরাজ সেনার প্রত্যাক্রমণ আশঙ্কা করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রী ও মণি-মুক্তাদি 'রোপিশ্ বগ' নামক স্থানে প্রোথিত করিয়া 'ডেভিস্ সা' নামক স্থানাভিমুখে সেনা চালিত করিলেন। এবং তথায়

লুক্কায়িত ভাবে সমস্ত দিবস যাপিত করিলেন।

স্কটেরা 'কল্‌টর হোপ' হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ইংরাজ-সেনাপতি তাঁহার ভগ্ন সেনা মিলিত করিয়া 'জন গ্রীন' নামক স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। হত অসংখ্য সৈনিকের শোকে তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। রাজভ্রাতা রাজভাগিনেয়-দ্বয় ও আরল্‌ অব্‌ কেণ্ট হত-বীরবৃন্দের মধ্যে বিশেষ-উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজসেনা এইরূপ শোকাকুল অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় বিগারের শিবির হইতে দুই জন ইংরাজ পাচক আসিয়া সংবাদ দিল যে,স্কট্‌ সেনা বিগার-শিবিরের মদ্যাদি পান করিয়া মদ-বিহ্বল হইয়া পড়িয়া আছে—তাহারা এক্ষণে ইংরাজসেনার সহজ-বধ্য। সেনাপতি এ কথায় তত বিশ্বাস করিলেন না, কারণ, তিনি জানিতেন যে, ওয়ালেসের ন্যায় বিচক্ষণ সেনাপতি কখনই স্কট্‌ সেনাকে এরূপ অতর্কিত-ভাবে আক্রান্ত হইতে দিবেন না। তথাপি তিনি পরীক্ষার জন্য লঙ্কাসেনের ডিউককে দশসহস্র সৈন্য লইয়া বিগার যাত্রা করিতে অনুমতি দিলেন। ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড ও পিকার্ডির জমিদারদ্বয়ও প্রত্যেকে এক-সহস্র করিয়া অশ্ব লইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করিলেন। রক্‌সবগ, বার্‌উইক, সার্‌ রাল্‌ফ গ্রে, আয়মের ডি ভ্যালেন্স প্রভৃতিও আপন আপন সৈন্য লইয়া, ডিউকের অনুবর্ত্তন করিলেন। এই সমবেত ইংরাজ-সেনা বিগার-রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ইংরাজ-সৈন্যগণের মৃত-দেহ-মাত্র দেখিতে পাইল; একটী মাত্রও স্কট্‌ দেখিতে পাইল না। কিন্তু ত্বরায় স্কট্‌ সেনার অজ্ঞাতবাস তাহারা জানিতে পারিল। ইংরাজ-সেনার আগমন-বার্ত্তা শুনিবা-মাত্র ওয়ালেস্‌ সমস্ত জাতীয় সেনাকে বন হইতে রোপিস নামক জলার ধারে আনীত করিলেন। তাঁহার অশ্বসেনা অশ্ব সকল পশ্চাতে রাখিয়া পদাতিকদিগের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জলার ধারে দাঁড়াইল। ইংরাজ-অশ্ব ও পদাতিক সেনা জলার অপর পারে ছিল। ইংরাজ-সেনাপতির আদেশে ইংরাজ-অশ্বসেনা অগ্রে জলায় নামিল। যেমন নামিল, অমনি অশ্বের পা কাদায় এমনি বসিয়া গেল যে, আর এক পা উঠাইতে পারিল না। স্কট সেনা আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এখন প্রচণ্ড-সিংহের ন্যায় লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কর্দ্দম-নিহিত শত্রুগণের উপর আসিয়া পড়িল। একে একে সমস্ত ইংরাজ-অশ্বসেনা স্কট-বীরবৃন্দের শাণিত-খড়্গাঘাতে ধরাশায়ী হইল। পিকার্ডীর অধীশ্বর সারজন্‌ গ্রেহামের হস্তে এবং ডিউক অব্‌ ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড ওয়ালেসের হস্তে ধরাশায়ী হইলেন। সেনাপতি-দ্বয়ের পতনে হতাবশিষ্ট ইংরাজ-সৈন্য চতুর্দ্দিক দিয়া বিশৃঙ্খল-ভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের মুখে এই দ্বিতীয় ভীষণ পরাজয়ের কথা

শুনিয়া ইংরাজ-সেনাপতি অতিশয় কাতর হইলেন। এবং শোকদুর্ভর পদবিক্ষেপে সল্‌ওয়ে পার হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিজয়লক্ষ্মী এইরূপে ওয়ালেসের কর-তল-শায়িনী হইলে, তিনি কার্কারণ্যে একটী মহতী জাতীয় সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় তিনি এক-বাক্যে জাতীয় অভিভাবক মনোনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই ওয়ালেস্ দক্ষিণ স্কট্‌লণ্ডে যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি ইংরাজ কাপ্তেন ও সেরিফগণকে পদচ্যুত করিয়া তৎতৎ স্থানে স্কচ্ কাপ্তেন ও সেরিফগণকে নিয়োজিত করিলেন। বিগাবের অদ্ভুত বিজয় ব্যতীত এরূপ পরিবর্ত্তন কখনই অবাধে অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না।

এই বিজয়ের পর স্কট্‌লণ্ডের গিরিদুর্গ সকল একে একে সমস্তই ওয়ালেসের হস্তগত হইতে লাগিল। ক্রী নদীর তীরে একটী প্রকাণ্ড-প্রস্তর-স্তূপের উপরে ক্রগল্‌টন কাসল্ নামক একটী দুর্গ অবস্থিত ছিল। ক্রী নদীর সহিত সাগরের সঙ্গম-জনিত ত্রিকোণ-ভূমিতে এই দুর্গ অবস্থিত। এই দুর্গ-রক্ষার জন্য ষাট জন ইংরাজ-প্রহরী নিযুক্ত ছিল। এই দুর্গে প্রবেশ করার, একটী মাত্র পথ ছিল। ওয়ালেস্ সমস্ত সৈন্য নিম্নে রাখিয়া দুই জন মাত্র লোক সঙ্গে করিয়া দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রহরী এরূপ অতর্কিত আক্রমণ আশঙ্কা করে নাই। সুতরাং শত্রুর এরূপ আকস্মিক আবির্ভাবে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ওয়ালেসের প্রচণ্ড-পদাঘাতে দুর্গদ্বার নিরর্গল হইয়া পড়িল। ওয়ালেসের সমস্ত সৈন্য পিল্ পিল্ করিয়া দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিল। দ্বারী, প্রহরী ক্রমে ক্রমে সকলেই স্কট্ বীরবৃন্দের শাণিত করবালের বিষয়ীভূত হইল। সর্ব্বশুদ্ধ ষাট জন ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। সংবাদ জন্য কেবল এক জন বৃদ্ধ পুরোহিত ও দুই জন স্ত্রীলোক রহিল। যত দিন দুর্গ-মধ্যে ইংরাজ সংগৃহীত খাদ্য দ্রব্য ছিল, তত দিন ওয়ালেস্ সসৈন্য তথায় অবস্থিতি করিলেন। খাদ্য সামগ্রী ফুরাইলে, তিনি দুর্গকে নিরাবরণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর,তাঁহারা ক্যারিক্ দুর্গাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ তখন দুর্গে ছিলেন না। স্কটেরা দুর্গদ্বারে অগ্নি প্রদান করিল। দুর্গাভ্যন্তরে কেবল এক জন পুরোহিত ও কতিপয় স্ত্রীলোক ছিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ ওয়ালেসের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিল। ওয়ালেস্ দুর্গের দ্রব্য সামগ্রী লুঠ করিয়া পর দিন প্রাতে কমনক্ যাত্রা করিলেন। কমনক্ হইতে লানার্কে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, দুষ্কর্ম্ম-কারিগণের দণ্ড বিধান করিলেন। তাঁহার

সহোদরকে পৈতৃক-সম্পত্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ওয়ালেস্ ব্ল্যাকক্রাগ দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি সসৈন্য তিন মাস কাল দুর্গে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এই সময় সমস্ত দক্ষিণ স্কট্‌ল্যাণ্ড ও গ্যালোওয়ে ওয়ালেসের শাসনাধীনে আসিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসনাধীনে পার্সী আয়ারে, আমের ডি ভ্যালেন্স বথ্‌ওয়েলে এবং আচার্য্য বেক্ গ্লাসগোয়ে এখনও আধিপত্য করিতেছিলেন বটে, কিন্তু ইউরোপে এড্‌ওয়ার্ডের সংস্থান অতিশয় বিপদ্-সঙ্কুল হওয়ায়, তাঁহাকে অগত্যা ওয়ালেসের নিকটে সাময়িক-শান্তি-প্রার্থী হইতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী আরল্ অব্ ষ্টাফোর্ড রাজপ্রতিনিধি হইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ডে আসিলেন। সার্ আমের ডি ভ্যালেন্স তাঁহাকে ওয়ালেসের নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন। স্কট্‌ল্যাণ্ডের শত্রু বলিয়া ওয়ালেস্ তাঁহাকে অভিবাদন করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং বিনা শিষ্টাচারে একেবারেই তাঁহার আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রিবর উত্তর করিলেন—ইংলণ্ডেশ্বর সম্প্রতি সাময়িক-শান্তি-কামনায় আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার কি অভিপ্রায়?

ওয়ালেসের ইংরাজদিগের উপর বড় বিশ্বাস ছিল না; তথাপি তিনি অগত্যা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধি হইল যে, এক বৎসর কাল যাবৎ ইংলণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডে কোন বিবাদ রহিবে না। সন্ধির দিনে যাহার দখলে যাহা আছে, তাহা তাহারই দখলে থাকিবে। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই সন্ধি-পত্র লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির পর, ওয়ালেস্ কমনক্ দুর্গে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইংরাজগণের কথায় ও কার্য্যে তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল না, এই জন্য তিনি নিতান্ত অরক্ষিত-ভাবে অবস্থিতি করিতে সাহস করিলেন না।

১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ওয়ালেসের নাম ইতিহাসে উঠে নাই। স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া নিরন্তর ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায়, এবং প্রতি-পদে বিজয়-লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কাগত হওয়ায়, অচির-কাল-মধ্যে তাঁহার নাম সমস্ত স্কট্‌লণ্ডে ঘোষিত হইল। বিগারের যুদ্ধে জয়লাভ করায়, তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের রক্ষক মনোনীত হইলেন। ইংলণ্ডেশ্বর নৃপ এড্‌ওয়ার্ডকেও তাঁহার নিকটে সন্ধি-ভিখারী হইতে হইল। কিন্তু এ সকল আংশিক-জয়-লাভে তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইবার নহে। তিনি, স্কট্‌ল্যাণ্ডের পূর্ণ-মুক্তি-প্রয়াসী ছিলেন, সুতরাং একটী ইংরাজ-চরণ স্কট্‌ল্যাণ্ড-বক্ষে থাকিতে, তাঁহার বিশ্রাম-সুখ-লাভের সম্ভাবনা কোথায়?

আমার জীবনের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

নরক-কুণ্ড।

বিনোদ আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল ও তাহার দক্ষিণ বাহু আমার গলদেশে সংলগ্ন করিয়া ঈষৎ আমার গায় ঢলিয়া পড়িল। তাহার মৃণালোপম সেই সুকোমল বাহুর সুকোমল স্পর্শ তৎকালে যেন জলন্ত অঙ্গারের সমান লাগিল! আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম—আমার বোধ হইল, যেন এক মনোহর-কুসুমাস্তরণের মধ্যে দংশনোন্মুখিনী কাল সর্পিনী লুকায়িত রহিয়াছে। বিনোদ বলিল—'বলি এই কি তোমার ধর্ম্ম? আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লেম, আর তুমি অনায়াসে আমাকে একলাটী ফেলে রেখে এখানে এসে রয়েছ?'

ভুবন।—'কেন বাছা ওঁর দোষ কি, তুমি ঘুমিয়ে পড়্‌লে কেন?'

বিনোদ।—'ঐ দেখ, মাসীর এক একটা কথা শুন্‌লে হাসি পায়। ঘুম পেলে না ঘুমিয়ে কে থাকতে পারে বাপু? চল দিদি, আমরা এখান থেকে যাই; এখানে আর বসা হবে না।'

এই বলিয়া বিনোদ আমাকে টানিতে লাগিল। আমি একটু অনিচ্ছা-প্রকাশ করিলাম, কিন্তু বিনোদের জিদ্ বড় সহজ ব্যাপার নহে। অগত্যা আমাকে তাহার কথায় সম্মত হইতে হইল।

তখন বেলা অবসান হইয়া আসিতেছে। সূর্য্য-কিরণ ভূতল পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিত-ভাবে ক্রমশ প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিতেছে; ও শীত ক্রমশ পৃথিবীর উত্তাপ হরণ করিতেছে। বিনোদ আমার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে তাহার ঘরের দিকে যাইতে লাগিল। যাইবার পথ আর দুই তিনটা ঘরের সম্মুখ দিয়া, সুতরাং সেই সকল ঘরের মধ্যে যাহারা যাহারা ছিল, তাহাদের দিকে স্বতই আমার দৃষ্টি পতিত হইল। আমি যাহাকে যাহাকে দেখিতে পাইলাম, সকলেই একই কার্য্যে অতি মনোযোগের সহিত রহিয়াছে। সম্মুখে এক এক খানি করিয়া দর্পণ ও তাহার চারি দিকে বেশভূষার নানাবিধ সামগ্রী সজ্জিত। তাহারা কখন বা সেই সকল সামগ্রী এক এক বার নাড়িতেছে; কখন বা বহু ক্ষণ ধরিয়া স্থির-দৃষ্টিতে দর্পণের দিকে চাহিতেছে।—কি দেখিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না, যেন আপনাদের রূপে আপনারাই মোহিত! আমি এই ব্যাপার দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। আমি অনেক রকমের

অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু ইহারা কে? বাড়ীতে পুরুষের সংসর্গ নাই, কেবল কতগুলা স্ত্রীলোক। ইহরা না সধবা, না বিধবা; অথচ অনুষ্ঠানের ক্রটি নাই। ব্যাপার কি?'

এই সময়ে মাতু ও তাহার ভগ্নী আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদের মা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'বেলা গেল যে বিনোদ। যা না, তোর দিদিকে সঙ্গে করে চুল টুল বাঁধ্‌গে না' মাতু এক বার আমার দিকে চাহিল। কিন্তু আমি কোন উত্তর দিলাম না দেখিয়া সে তাহার ভগ্নীর সহিত সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং বিনোদ আমার হাত ধরিয়া তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

ঘরে পা দিবা মাত্র আমার গার ভিতরে কেমন করিয়া উঠিল। সেই তুষার-ধবল শয্যা, সেই নানাবিধ সামগ্রী ও তাহাদের পারিপাট্য—এই সকল দেখিয়া আমার মন পুনরায় সন্দেহে অভিভূত হইতে লাগিল। কিন্তু সে সময়ে যদি মনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, 'কি ভয় করিতেছ?' তাহা হইলে, সে কি উত্তর দিত, বলিতে পারি না। সকলই বুঝিতেছি, অথচ যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মনে এমন সাহসও হইল না যে, এক বার স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখি—ভাবিয়া দেখি যে, কি করিলাম, কোথায় আসিলাম। বিনোদ বোধ হয়, তৎকালে আমার মনের ভাব কিছু-মাত্র বুঝিতে পারে নাই। সে ঘরে ঢুকিয়া আপন মনে তাহার দেরাজ বাক্স প্রভৃতি খুলিতে লাগিল। আমি অবাক্ হইয়া তাহাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।—সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুম—দেখিলে প্রাণ যুড়াইয়া যায়—চক্ষু শীতল হয়—হায়! তাহার ভিতরে কেমন করিয়া কীট প্রবেশ করিল!

বিনোদ বেশ-ভূষার উপযোগী নানাবিধ সামগ্রী বাহির করিল এবং মেজেতে এক খানি সুন্দর ছোট গালিচা পাতিয়া সেই সকল সামগ্রী তাহার উপরে রাখিল পরে সে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'দিদি আর বেলা নাই, এস তোমার চুল্‌টো বেঁধে দিই, বড় বিশ্রী হ'য়ে রয়েছে।' 'না ভাই আমার ওসবে প্রয়োজন নেই, তোমার নিজের চুল বাঁধ।' কিন্তু বিনোদ আমার কথা না শুনিয়া বারংবার জিদ করিতে লাগিল। আমি একবারে অস্বীকার করিলাম, তথাপি সে শুনিল না। তখন আমি দেখিলাম যে, সেখানে থাকিলে, পার পাওয়া সুকঠিন; সুতরাং সে স্থান পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু বিনোদ আমার মনোগত ভাব বুঝিয়া দৃঢ়-মুষ্টিতে আমার অঞ্চল ধরিয়া রহিল। আমি বারংবার ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তখন অগত্যা আমাকে তাহার পার্শ্বে বসিতে হইল।

আমাকে ব'সতে দেখিয়া বিনোদ পুনরায় তাহার অভিসন্ধি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। আমি পুনরায় পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম ও পুনরায় সে আমার অঞ্চল ধরিয়া রহিল। এবার আমি একটু বল প্রয়োগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিনোদ পূর্ব্ববৎ আমার অঞ্চল ধরিয়া রহিল, ও বারংবার আমাকে ঘরের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে মাতু ও তাহার ভগ্নী আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিনোদের মা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—'ও বিনোদ ও কি হচ্ছে?'

'দেখ দেখি মা সেই অবধি দিদিকে বল্‌ছি যে, এস চুল্‌টো বেঁধে দিই, তা কোন মতেই আমার কথা শুন্‌বে না।'

'কেন মা তার দোষ কি?'

আমি একটু উদ্ধত-স্বরে বলিলাম 'না'। কিন্তু বিনোদ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, আমাকে ঘরের ভিতরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মাতু এ পর্য্যন্ত কোন কথাই কহে নাই, কিন্তু ক্রমশ অমাকে কুপিত হইতে দেখিয়া সে বিনোদকে চক্ষু ঠারিয়া ইঙ্গিত করিল। বিনোদ তাহা শুনিল না, দেখিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বলিল, 'আচ্ছা চুল বাঁধা না হয় একটু পরেই হবে, তার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? এ দিকে আয় মা, একটা কথা বলি শোন্' এই বলিয়া সে বিনোদকে একটু দূরে লইয়া গেল; এবং আমি কাহারও দিকে না চাহিয়া আমার ঘরে, অর্থাৎ গত রাত্রিতে আসিয়া অবধি যে ঘরে আমি বাস করিতেছিলাম, তন্মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

সেখানে রাগের ভরে কিয়ৎকাল এক-মনে বসিয়া রহিলাম। 'চুল বাঁধিব! কোন্ মুখে! মাতুই ইহার গোড়া। সেই বিনোদকে শিখাইয়া দিয়াছে, আর কেহ নহে। আসুক তাহাকে ভাল করিয়া শিখাইতেছি। আমি যা ভালবাসি না, সে কেন তা করিবার চেষ্টা পায়? আমার সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, সে কি ভুলিয়া গিয়াছে?' ক্রমশ রাগ পড়িয়া মনে একটু লজ্জা হইতে লাগিল। 'বড় অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে। বিনোদের সহিত এরূপ ব্যবহার করা ভাল হয় নাই। সে যত্ন করিয়া আমার চুল্ বাঁধিয়া দিতে আসিল, আর আমি তাহার উপরে একেবারে খড়্গহস্ত হইলাম। কাজ্‌টা ভাল হয় নাই।' এক বার ইচ্ছা হইল, বিনোদের কাছে গিয়া আপনার দোষ স্বীকার করি, কিন্তু ঘরের বাহিরে যাইতে কেমন লজ্জা হইতে লাগিল।

তখন কি করি, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, ঘরের ভিতরে আস্তে আস্তে এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমশ তাহাতেও বিরক্তি বোধ হওয়ায় বিছানার উপরে আসিয়া বসিলাম। কিয়ৎকাল এই অবস্থায় থাকিয়া বড় শীত বোধ হইতে লাগিল। সে দিনের

শীত কি ভয়ানক! যত বেলা যাইতে লাগিল, পরিহিত বস্ত্র যেন জলের মত বোধ হইতে লাগিল, ও হাত পা শীতে ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় একাকী এক অপরিচিত স্থানে বসিয়া থাকা কি কষ্টকর! কিন্তু তথাপি ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না! ক্রমশ এত শীত বোধ হইতে লাগিল যে, গায় কাপড় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না বিছানার উপরে এক খানি শীত-বস্ত্র ছিল। তাহাতে ভাল করিয়া শরীর আচ্ছাদিত করিয়া অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় শয়ন করিয়া রহিলাম। অবিলম্বে ঈষৎ নিদ্রা-কর্ষণ হইয়াছে, এমন সময়ে বোধ হইল—কে যেন অতি সাবধানে পদ-বিক্ষেপ করিতে করিতে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি একটু চমকিত হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইলাম; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পইয়া আবার পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়া রহিলাম। ক্রমশ পুনরায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, চক্ষু মুদিয়া আসিল, ও কিয়ৎ-কালের জন্য অভাগিনীর দুঃখ-রাশি নিদ্রা-জনিত অচৈতন্যে বিলীন হইয়া গেল।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম—সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি হইয়াছে। ঘরের ভিতরে কে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, এবং সেই আলোকে ঘরটি ঈষৎ আলোকিত হইয়াছিল। আমি অনেক ক্ষণ এক-মনে সেই প্রদীপের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ক্রমশ বিনোদের কথা মনে পড়িল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার সহিত যে ঘটনা হইয়াছিল, তজ্জন্য মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সেই অবধি বিনোদ আমার সহিত আর দেখা করে নাই। আমি ভাবিলাম, সে অবশ্যই আমার উপরে রাগ করিয়াছে। না করিবে বা কেন? তাহার দোষ কি? সে কোন অপরাধই করে নাই, অথচ আমি তাহাকে কেবল প্রহার ও গালি বর্ষণ করিতে বাকি রাখিয়াছি! দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমি যদি কথা না কহি, তবে কেন সে যাচিয়া কথা কহিবে? এই ভাবিয়া আমি বিছানা হইতে উঠিলাম, এবং বিনোদের কাছে যাইবার জন্য ঘরের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

চারি দিক তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং সকল ঘরেরই দ্বার ও জানালা বন্ধ থাকায় তাহাদের ভিতর দিয়া যৎ-সামান্য মাত্র আলোক আসিয়া বাহিরে পড়িয়াছিল। সেই অন্ধকারে আমি অলক্ষিত-ভাবে বিনোদের ঘরের দিকে যাইতে লাগিলাম। দুই চারি পদ যাইয়াই কিন্তু আমার মনে কিছু সন্দেহ হইল। আমি তখন আর না যাইয়া সেই খানেই একটু দাঁড়াইলাম। আমার বোধ হইল, দুই তিন জন মানুষ সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিতেছে। খুব জোরে জুতার শব্দ হওয়ায়, তাহাদিগকে

পুরুষ মানুষ বলিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল, এবং সেই সন্দেহ-নির্ণয়ের জন্যই সেখানে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। কিন্তু অবিলম্বে সিঁড়ির উপরি-ভাগে দীপালোক আলোকিত হওয়ায়, আমি নিঃশব্দে অথচ দ্রুত-পদ-বিক্ষেপে আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম, ও দ্বারটি ঈষৎ খুলিয়া রাখিয়া তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিলাম। এই সময়ে বিনোদের মাতার কণ্ঠধ্বনি সিঁড়ির ভিতর হইতে শুনিতে পাইলাম—'বিনোদ বিনোদ কোথায় গেলি? কারা এসেছেন, দেখ্ সে শীঘ্র বেরিয়ে আয়।' বিনোদ ঘরের ভিতরে কি করিতেছিল, বলিতে পারি না। সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল; ও পর-ক্ষণেই সিঁড়ির ভিতর হইতে প্রথমে তাহার মাতা একটী প্রদীপ হস্তে করিয়া এবং তাহার পশ্চাতে দুইটী পুরুষ মানুষ উপরে আসিয়া উঠিল। এই দুই ব্যক্তিকে ভাল করিয়া আমার দেখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ইহারা উপরে না উঠিতে উঠিতে যে ব্যাপার ঘটিল, তাহাতে সর্ব্বশরীরের রক্ত শুকাইয়া গেল। ইহাদের মধ্যে এক জন বিনোদকে দেখিয়া স্খলিত স্বরে তাহাকে সম্ভাষণ করিল এবং টলিতে টলিতে কিঞ্চিৎ বেগে তাহার দিকে ধাবমান হইল। বিনোদও তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া তাহার নিকট-বর্ত্তিনী হইল। তাহার মাতা এই সময়ে সেখান হইতে একটু তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল; এবং তাহার হস্তের প্রদীপ হঠাৎ নিবিয়া যাওয়ায় বিশেষ আর কিছু লক্ষিত হইল না। সেই অন্ধকারে বিনোদ ও পুরুষ দুইটীকে ছায়ার মত মাত্র দেখিতে পাইলাম। তাহারা অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিনোদের ঘরে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের বিকট-হাস্য ও চীৎকারে ঘর ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। যেমন মেঘাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে কোন হতভাগ্য পথিক বিপদসঙ্কুল-স্থানে পতিত হইলে, প্রথমত চতুর্দ্দিকে কেবল স্তূপে স্তূপে অন্ধকার-মাত্র দেখিতে পায়, এবং পরে হঠাৎ বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইলে, নানাবিধ বিভীষিকা তাহার ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, তদ্রূপ উপস্থিত ঘটনাবলি-দর্শনে অকস্মাৎ আমার অন্তরে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া পূর্ব্বে যে সকল বিষয় সন্দেহ-পরিপূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহাদিগকে নূতন আলোকে আলোকিত করিল। আমি স্তম্ভের মত অসাড় হইয়া, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম, এবং পূর্ব্ব পশ্চাৎ যে দিকে মনশ্চক্ষু ফিরাইলাম, সর্ব্বনাশ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই মহা-বিপদে সহায় কেহ নাই, আপনার বলিবার কেহ নাই, পবন-তাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় কোথায় উড়িয়া আসিয়াছি, তাহার কোন ঠিক নাই। এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমার মস্তকের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল,

এবং সেই ভয়ানক শীত স্বত্বেও মৃদু মৃদু ঘর্ম্মবারি বিগলিত হইতে লাগিল। আমি এত ক্ষণে বুঝিলাম বিনোদ কে, নিস্তার কে, আর সেই হতভাগিনী কে—যাহার উপরে ভরসা করিয়া অকূল-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। ক্রমশঃ হৃদয়ে ব্যাকুলতা এত বাড়িতে লাগিল যে, একাকিনী সেখানে দাঁড়িয়া থাকা অসহ্য হইয়া উঠিল। এই সময়ে তৈলাভাবে প্রদীপটি নিবিয়া গেল, এবং ঘরের ভিতর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। ইহাতে হৃদয়ের আশঙ্কা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। সেই গাঢ় অন্ধকারে আমার বোধ হইল, যেন কতকগুলা বিকটাকার মুখ-ব্যাদন করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। এই মহাশঙ্কটে ভুবনের প্রশান্ত মূর্ত্তিটী আমার মনে পড়িল, এবং তাহার শরণাপন্ন হইবার জন্য অন্য কোন দিকে না চাহিয়া উন্মত্তের মত তাহার কাছে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

ভুবন আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'হয়েছে কি? অমন করিতেছ কেন?'

আমি অতি ব্যাকুল-ভাবে উত্তর করিলাম, 'আমাকে রক্ষা কর। তুমি বৈ আমার আর কেহ নাই। আমি বড় দুঃখিনী—বড় হতভাগিনী, 'আমাকে—'

'হয়েছে কি, বল না।'

'তা আমি জানিনে। তুমি আমাকে বাচাও; বল আমাকে তুমি রক্ষা করবে—বল—বল' এই বলিয়া আমি তাহার চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করিলাম। ভুবন একটু সরিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই আমার হাত ধরিয়া আমাকে বসাইয়া বলিল 'এখানে বসো; একটু স্থির হও।'

আমি কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা প্রকাশ না করিয়া বসিয়া পড়িলাম। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, ও থাকিয়া থাকিয়া বুকের ভিতরে গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। এই সময়ে ভুবন আমার কত যে শুশ্রূষা করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। তাহার স্নেহ-পূর্ণ মুখ-খানি দেখিয়া আমার মনে কথঞ্চিৎ সাহস ও ভরসার সঞ্চার হইল। তখন আমি তাহাকে পুনরায় বলিলাম, 'আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমার গায় হাত দিয়া বল, কোন কথা লুকাইবে না।'

'কি বলিবে বল না।'

'আমার গায় হাত দিয়া বল, কোন কথা লুকাইবে না।'

'তুমি পাগল নাকি? কি বলিবে বল না।'

'আমার মনে বড়ই ত্রাস হইয়াছে। আমি বেস্ বুঝিতেছি, মহা-শঙ্কটে পড়িয়াছি। আমার মন যেন আমাকে বলিতেছে, এ বিপদে তুমিই আমার

একমাত্র ভরসা। অনুনয় করিতেছি, সত্য করিয়া বল আমি কোথায় আসিয়াছি।'

'কেন মানুষের কাছে আসিয়াছ, তাতে ভয় কি?'

'মানুষের কাছে আসিয়াছি সত্য, কিন্তু আমার মনে বড় সন্দেহ হইয়াছে। আমি এখানে আসিয়া অবধি যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার চক্ষু-স্থির হইয়া গিয়াছে। আমি সব বুঝিয়াছি, কেন তুমি কথা লুকাইতেছ?'

'যদি সব বুঝিয়া থাক, তবে বৃথা জিজ্ঞাসা করার ফল কি?'

'আমার নিজের কথায় মনে প্রত্যয় জন্মিতেছে না। আমি বেস্ বুঝিয়াছি, আমাকে ভয়ানক ফাঁদে আনিয়া ফেলিয়াছে। তুমি আমার সহোদরা; আমি তোমার ছোট ভগ্নী। এই ফাঁদ হইতে উদ্ধার পাইবার যদি এখনও কোন উপায় থাকে, ত আমাকে বলিয়া দাও। আমি বড় হতভাগিনী; আমি তোমার পায় ধরিতেছি, স্পষ্ট করিয়া বল, আমাকে কোথায় আনিয়াছে।'

'পোড়ার মুখ তোমায় বলিব কি? দেখিতেছ না এ কেমন স্থান? ভয়ানক নরক-কুণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছ। এখানে যাহাদিগকে তোমার মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, তাহাদের এক জনও মানুষ নহে; সব নরকের কীট, এবং যাহাকে এক্ষণে তোমার সম্মুখে দেখিতেছ, তাহাকে কীটাধম কীট বলিয়া জানিও। যদি এখনও বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, ত শীঘ্র পলায়ন কর—অন্য উপায় আর নাই।'

ভুবনের কথার শেষ না হইতে হইতে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে বলিল—'চুপ, চুপ, এত গোল করিও না। যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে খুব সাবধান হইয়া চল।'

'আমি কি করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। চারি দিক কেবল অন্ধকার-ময় দেখিতেছি। এ বিপদে মুখের দিকে চাহিবার আমার কেহ নাই। তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

'পলায়ন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। যত শীঘ্র পার পলায়ন কর।'

আমি আবার কাঁদিতে লাগিলাম। 'কোথায় যাইলে নিস্তার পাইব, তুমি আমাকে বলিয়া দাও। আমি যে কখন ঘরের বাহির হই নাই।'

'যেখানে পার পলায়ন কর। সাপের মুখে হয়, বাঘের মুখে হয়, যেখানে পার পলায়ন কর। হতভাগিনী কে তোমাকে এমন পরামর্শ দিল? কোন্ সুহৃদের কথায় ভুলিয়া এমন ভয়ানক কর্ম্ম করিলে? জন্মের মত অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছ, দেখিতেছ না?'

এই বলিতে বলিতে ভুবনের বিস্ফারিত চক্ষু দুটী জলে প্লাবিত হইল। তখনই কিন্তু সে তাহার চক্ষু দুটী অঞ্চল দিয়া মুছিয়া ফেলিল, এবং একটু মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল—'ভয় কি?

উপায় থাকিতে হতাশ হইবে কেন? কারুকে কিন্তু কোন কথা বলিও না। মনে মনে চেষ্টায় থাক, ফাঁক পাইলেই, আপনার পথ দেখিয়া লইবে।'

ভুবন যে উপায় দেখাইয়াছিল, তাহাতে আমার মনে কোন ভরসাই হয় নাই। কিন্তু তাহার সেই মুখ-খানিতে সেই মৃদু-মধুর হাসি-টুকু দেখিয়া ও তাহার আশ্বাস-পূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া আমার দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইল। আমাকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত দেখিয়া, সে আবার পাঁচ কথা আনিয়া ফেলিল। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইলে, মাতু আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আমার হৃদয়াবেগ কিয়ৎ পরিমাণে উপশমিত হওয়ায়, সে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না।

শ্যাম।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

প্রথম প্রস্তাব—নব-জ্বর।

প্রাচীন ভারতের প্রধান উন্নতির সাক্ষ্য আর্য্য-আয়ুর্বিজ্ঞান। প্রাচীন-তত্ত্বান্বেষী পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরাই প্রমাণ করিয়াছেন, ভারত হইতেই প্রথমে আয়ুর্বিজ্ঞান অন্যত্র বিস্তার হয়, আয়ুর্বিজ্ঞান মনুষ্য-মাত্রেরই উপকারী। যে দিন আর্য্য-গৌরব হ্রাস হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ভারত অবনত। যখন আর্য্য-জাতি জাতীয় জীবন হারাইলেন, চির দিনের স্বাধীনতা হারাইলেন, সেই দিন উন্নতির সাক্ষ্য আয়ুর্বিজ্ঞানেরও হ্রাস হইতে লাগিল। প্রথম শস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে আর্য্য-চিকিৎসা-লোলুপ সুশ্রুত ভগবান্ ধন্বন্তরির নিকট বলিয়াছিলেন, "অস্মাকং সর্ব্বেষা-মেব শল্য-জ্ঞানমূলং কৃত্বোপদিশতু ভগ-বানিতি" হে ভগবন্ শল্য-জ্ঞান-মূল (শস্ত্র-চিকিৎসা-প্রধান) চিকিৎসা-তত্ত্ব আমাদিগকে উপদেশ দিন।" সেই আর্য্য-চিকিৎসক শবচ্ছেদ করিতে ঘৃণা আরম্ভ করিল। যে আর্য্য-দেবতা ভগবান্ ভবানী-পতি অস্থি-মালায় স্বীয় শরীর বিভূষিত করিতেন, সেই আর্য্য-সন্তানেরাই অস্থিকে অস্পর্শনীয় স্থির করিলেন। আজ ভারতবাসী অনেক সন্দিগ্ধ-অন্তঃ-করণ, আর্য্য-আয়ুর্বিজ্ঞানে শস্ত্র-চিকিৎসার অস্তিত্বের বিষয় সন্দেহ করেন।

শস্ত্র-চিকিৎসা-লোপের প্রধান কারণ, ভারতে বিজাতীয় যবনের রাজত্ব। শস্ত্র-চিকিৎসায় যে প্রকার সৈন্য-সমূহের প্রয়োজন, সেরূপ আর কিছুতেই নহে। সেই সৈন্য-ব্যূহের নেতা যবন; সুতরাং যাব-নিক চিকিৎসা ক্রমশই উন্নতিলাভ করিয়া আর্য্য-চিকিৎসা-শাস্ত্রের সৌন্দর্য্য অপ-হরণ করিতে লাগিল। দিন দিন 'হকিমী'

চিকিৎসার গৌরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সুতরাং আর্য্য-চিকিৎসক শস্ত্র-চিকিৎসায় আর গৌরব না পাইয়া সেই আর্য্য আয়ুর্বিজ্ঞানের অভ্যুন্নতির পরিচায়ক শস্ত্র-চিকিৎসাকে ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আর্য্য-চিকিৎসা-শাস্ত্রের ন্যায় ভৈষজ্য-তত্ত্ব কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাই। আর্য্য-চিকিৎসক প্রাণান্তেও ঔষধ-প্রক্রিয়া অন্যকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত নহে। সেই কু বা সু-সংস্কারের ফলে আজও ভারতে আর্য্য-আয়ুর্বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীর নিতান্ত অসদ্ভাব নাই, আজও সেই হিন্দুর রাজত্ব হইতে বংশ-পরম্পরা-গত আর্য্য-চিকিৎসক দেখা যাইতেছে। হিন্দুদ্বেষী যবন ভারতের রাজত্বে বঞ্চিত হইল, ভিন্ন-দ্বীপ-বাসী শ্বেতকায় ম্লেচ্ছ আসিয়া ভারত অধিকার করিল, সময়ের পরিবর্ত্তন-শীলতায় ক্রমশই সভ্যতার উচ্চ সীমার তাহারা অধিকার পাইল, আর্য্য-জাতির যে গৌরব ক্রমশ হীন-জ্যোতি হইতেছিল, তাহা ক্রমশই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে আর্য্য-চিকিৎসারও গৌরব গেল!

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" সুখ-দুঃখের গতি চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ভারতের যে সুখসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, তাহার দীর্ঘকালেও উদয় হইবার চিহ্ন দেখা গেল না, মহাজন বাক্যের বুঝি বা অনর্থকতা হয়, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সুখ-সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বভাব উপস্থিত। যেন পূর্ব্বদিক ঈষৎ আরক্ত হইয়াছে। যে আর্য্য-গৌরব পুস্তক সকল কীটে ভক্ষিত হইতেছিল, যাহা নিরন্ন, কষ্ট-লিপ্ত, শীর্ণকায় আর্য্য-সন্তানের শোণিতের ন্যায় যত্নে কতক রক্ষিত হইতেছিল, আজ আবার তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। হতভাগ্য আর্য্য-সন্তানেরা চেষ্টা না করিলেও, ভিন্ন-দেশীয় ভিন্নধর্ম্মী মহানুভবেরা তাহার সত্যের আলোকে মোহিত হইয়া অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইতেছেন। অনুকরণ-প্রিয় হতভাগ্য বঙ্গবাসী প্রত্নতত্ত্ব-লোলুপ হইয়া ভারতের পূর্ব্ব-গৌরবের চিহ্ন সকল চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতেছেন। যে উন্নত আর্য্য আয়ুর্বিজ্ঞানের অবনতি-স্রোত অনিবার্য্য বহিতেছিল, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন না করুক, হীনবেগ হইয়াছে। আজ বঙ্গবাসী কৃতবিদ্যেরাও বলিতেছেন, প্রাচীন পীড়ায় আর্য্য-আয়ুর্বিজ্ঞান যেরূপ চিকিৎসার উপদেশ দিয়াছে, তাহা আর কোন চিকিৎসায় নাই। কিন্তু নূতন পীড়ায় আশু-ফলপ্রদ ইংরাজি চিকিৎসায় সকলেই মুগ্ধ। ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবিতে ভারতবাসী ভুলিয়াছেন— সুতরাং আর্য্য আয়ুর্বিজ্ঞানে তাঁহাদের হতাদর; কিন্তু আর্য্য-চিকিৎসা-বহুল ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল, আর আজ কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, যদি তুলনার সহিত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সে সংস্কার ভ্রান্তি-সঙ্কুল বলিয়া নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইবে।

পুরাতন বাত্রিক পীড়ায় যে আর্য্য আয়ু-

বিজ্ঞানের ঔষধ-সমূহ সকল চিকিৎসা-পেক্ষা ফলদায়ী, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। অনেক মহদন্তঃকরণ ইংরাজি চিকিৎসকও তাহা বলিয়া থাকেন,কিন্তু নূতন পীড়ায় তাহা কতদূর ফলপ্রদ, অনেকেই অবগত নহেন, তজ্জন্য প্রথমে আমাদের নূতন পীড়ায় আর্য্য-আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের ফলোপধায়কতার আন্দোলনের চেষ্টায় যে চিকিৎসা যান্ত্রিক দৃষ্টির অদ্বিতীয় ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা যে নূতন পীড়ার চিকিৎসায় অজ্ঞ ছিল, ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করার ন্যায় ভারতের অবনতির চিহ্ন আর কি আছে ?

আয়ুর্বিজ্ঞান নবজ্বরকে প্রথমত আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, (১) আয়ুর্বিজ্ঞানের মতে বায়ু,পিত্ত ও কফের অন্যতম বিকৃতিই সকল রোগের নিদান (২)। সেই বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রত্যেকের প্রাধান্যে তিন প্রকার। দ্বন্দ্বকোপে ও সমস্ত মিলনের কোপে অর্থাৎ সান্নিপাতিক এক প্রকার—এই সাত প্রকার জ্বর। তদ্ব্যতীত আগন্তুজ অর্থাৎ আঘাত প্রভৃতিতে আর এক প্রকার জ্বর হয়। এ জ্বর যদিও বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার কোপ ব্যতীত হয় না, তথাপি ইহা আঘাত প্রভৃতি কারণে হঠাৎ অন্যভাবে জন্মে বলিয়া,ভিন্ন গণনা। আবার সান্নিপাতিক একের, দুইয়ের বা তিনেরই ন্যূনাতিরেকে ত্রয়োদশ প্রকার গণিত হয়। নূতন জ্বর যত নবীন আকার ও নবীন বিজাতীয় নাম ধারণ করুকই না কেন, তাহা এই ২০ কুড়ি প্রকার জ্বরেরই অন্তর্গত। আর্য্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইহার চিকিৎসায় কত চমৎকার চমৎকার ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন, যিনি কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে আমরা ডেঙ্গুর চিকিৎসা আর্য্য আয়ুর্বিজ্ঞান কখন শুনে নাই বলিয়া হাসিয়া উঠি, আর এখনও এক শতাব্দী অতীত হয় নাই, যখন "মগাই" জ্বর ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, তখন 'আরগ্বধাদি পাঁচনই' তাহার অতুলনীয় ঔষধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আমি শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্য-আয়ুর্বিজ্ঞান-ব্যবসায়ী মহানুভব প্রাচীন গুরুর নিকট শুনিয়াছি, সে সময়ে সেই পাঁচন-সেবনে কেহই আর তাহার পর অসুখ উপলব্ধি করে নাই। তখন আর্য্য-আয়ুর্বিজ্ঞানই মুখ্য অবলম্বন ছিল, সকলের তাহাতে অতুলনীয় শ্রদ্ধাও ছিল। চিকিৎসক মহোদয়েরাও তাহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব অন্বেষণ করিতেন। আজ আর সে কাল নাই। আর্য্যগণ মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া দেশীয় প্রকৃতিতে পরীক্ষা করিয়া যে ঔদ্ভিজ্জ তত্ত্বের মহীয়সী ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন,যাহাতে বিশ্বনিয়ন্তার অচিন্তনীয় করুণার বিকাশ পাইয়াছে, সেই

---

(১) "জ্বরোঽষ্টধা পৃথক্ দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ।

(২) সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।

ঔদ্ভিজ্জ সংঘাতজ পাঁচনের ব্যবস্থা করিলে পর, উনবিংশ শতাব্দীর সভা, পাশ্চাত্য আলোকে দীপ্ত ভারতবাসী ঘৃণা করিবেন, আর তাহার রূপান্তর "টিঞ্চর জিঞ্জার" বলিলে, যত্নপূর্ব্বক সমধিক শ্রদ্ধা করিবেন, ইহা কি সাধারণ দুঃখের বিষয়? বিকার-জ্বরে আমাদের আর্য্য-আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে যে সকল পাঁচনের ব্যবস্থা আছে, তাহার ন্যায় বল-রক্ষক, স্বাস্থ্য-সম্পাদক এবং জ্বর নাশক কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসায় হয় নাই!*

শ্রীগিরীন্দ্রকুমার রায় কবিরাজ।

শ্রীরামপুর।

সমর-শেখর।

দ্বিতীয় কাণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ।

"Steer to that shore!"—They sail. "Do this"—'tis done!

—*Corsair.*

খৃষ্টীয় ১৫১৫ শকের মার্চ্চ মাসের প্রাকালে একদা প্রদোষ সময়ে কতকগুলি লোক কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকারোহণে বিশাল আরব সাগরের উপরিভাগে মৎস্য ধরিতেছিল। এক এক খানি তরণীতে তিন জন করিয়া আরোহী ছিল। তন্মধ্যে এক জনের হস্তে লম্বমান সূত্র। কঠিন সূত্র একটী বৃহৎ সুতীক্ষ্ণ বঁড়সিতে আবদ্ধ; বঁড়সি নিজ ভীষণ বক্রবদনে পশু-মাংস ধারণ করিয়া জলজন্তু-সকলকে প্রলোভন দেখাইয়া অতল-সাগর-গর্ভে নৃত্য করিতেছিল। নৌকাস্থ অপর দুই জন লোকের হস্তে সুদীর্ঘ শেল ও বর্শা। ইহাঁরা সকলেই আপনাপন হস্তস্থিত যন্ত্রসমুদায় দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া সতর্ক-ভাবে জলভাগে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সূর্য্যদেব ক্রমশ আস্তে আস্তে সাগর-জলে নামিতে লাগিলেন—যতই নিম্নগামী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব চঞ্চল-পয়োধিজলে বিস্তৃতরূপে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তরঙ্গ সকল হেম-মুকুটে মস্তক সজ্জিত করিয়া যেন দিন-নাথের আগমন-বার্ত্তা সাহ্লাদ-চিত্তে জলপতিকে জ্ঞাপিত করিতে চলিল। পবনদেব পরিশ্রান্ত দিবাকরকে ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল। সাগর বিশালনীলাম্বুময়—অনন্ত লীলাশালী, সুদূরে অনন্ত-ধূম্ররাশিতে বিলীন। যে দিকে নিরীক্ষণ করা যায়, সেই দিকেই বোধ হয়, যেন দুর্ভেদ্য-কুজ্ঝটিকা-জালে এই সুনীল প্রদেশ আবৃত। ধীবরগণ

---

* সকল মতের সহিত আমাদের ঐকমত্য নাই। এতৎ-সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, সময়ান্তরে আলোচিত হইবে। সং।

সন্ধ্যার আগমন দেখিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে আপনাপন রজ্জু সকল সবলে আকর্ষণ করিয়া নৌকার উপরিভাগে একত্রীভূত করিতে লাগিল। অদ্য বোধ হয়, সকলের যাত্রা নিষ্ফল হইল। সুদীর্ঘ অপরাহ্ণ-কাল অতীত হইল, তথাপি কেহ একটী-মাত্রও মৎস্য ধরিতে পারিল না। সকলেই তাড়াতাড়ি দড়ি গুটাইতে লাগিল। হঠাৎ এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ওরে! ওরে! উঠিবার সময় বোধ হয়, কুটিবার মাছ পাইলাম; জাহাজে গিয়া বেশি দরে বেচিতে পারিব।" এই বলিয়া সকলে রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল। অবশিষ্ট সকলে আপনাপন তরণী তাহার চতুর্দ্দিকে গোলাকারে স্থাপিত করিয়া সুতীক্ষ্ণ যন্ত্র সমুদায় দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া শিকারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মীনরাজের প্রচণ্ড-পুচ্ছ-তাড়িত জলভাগ শত শত বৃহৎ চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। কখন বা তাহা জলের উপরিভাগে উদ্গত হইয়া নৌকা সকলকে বিপর্য্যস্ত করিবার মানসে তদুপরি আঘাত করিতে উদ্যম করিল। নৌকারোহিগণ অমনি সতর্কে নৌকাকে সরাইয়া লইল। এইরূপে প্রায় এক দণ্ডকাল ধরিয়া মৎস্য ধীবরগণের বশানুগত হইল না। যখন তাহার বিশাল পুচ্ছ বা পৃষ্ঠদেশ সুনীল জলের উপরি ভাগে পরিদৃশ্যমান হইল, তখনই তাহারা আপনাপন হস্তস্থ অস্ত্র দ্বারা তাহাকে ঘন ঘন বিদ্ধ করিতে লাগিল। অজস্র শোণিত ধারায় সাগরাম্বু রঞ্জিত হইয়া যাইল। মৎস্য কিছুতেই বশানুগত হইল না। এদিকে সন্ধ্যার তমোময় ছায়া নীলজলে পতিত হইয়া আরও গাঢ়তর হইতে লাগিল। সকলেই অতিশয় বিব্রত হইল। যাহার যত দূর ক্ষমতা—আপন অস্ত্র দ্বারা মৎস্যকে দারুণ আঘাত করিতে লাগিল। অনর্গল-রক্ত-ক্ষরণে মীনরাজ ক্রমশ ক্লান্তদেহ হইয়া পড়িল। মৎস্যধরগণ এই বার আশ্বস্ত হইয়া এক জনের হস্তে রজ্জু প্রদান করিয়া অবশিষ্ট সকলে এক এক খানি সুবিস্তৃত জাল লইয়া তাহাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। মৎস্যের এই বার অন্তিমকাল উপস্থিত। সে বুঝিতে পারিল যে,এই বার তাহাকে মানবের উদরে পরিপক্ক হইতে হইবে। ক্ষণকাল শান্তভাবে থাকিয়া নিজ বল সংগ্রহ ও ক্লান্তি দূর করিয়া এক বার শেষ উদ্যম করিল। সবলে উল্লম্ফন করিয়া সাগর-জলকে আলোড়িত করিল এবং ভীম-বলে আকর্ষণ করিয়া হতভাগ্য সূত্রধারী ধীবরের সহিত গভীরজলে প্রবেশ করিল। সকলের বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত। শিকার হস্তগত হওয়া দূরে থাকুক, আপনাদের এক জন বন্ধুকে বিসর্জ্জন দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল। এই সময়ে একটী উচ্চ শৃঙ্গনাদ সমুত্থিত হইয়া সান্ধ্য-গগনের নিস্তব্ধতাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল! সকলে চমকিত হইয়া নৌকার গতিরোধ করিয়া

ধীরে ধীরে শব্দ-নির্দ্দিষ্ট দিকে তাহা বাহিত করিতে লাগিল। এ কাহার শৃঙ্গনাদ, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাদের দলপতি অদ্য দিবা দ্বিতীয় প্রহরকালে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কোন দূরদেশে গমন করিয়াছিল। সন্ধ্যাকালেই তাঁহার প্রত্যাগমনের কথা ছিল। তজ্জন্যই ইহারা আপনাপন নৌকা লইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমনাশায় এত দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা বর্ত্তমান বিপদে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া তদ্বিষয় একবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। এক্ষণে এ শৃঙ্গধ্বনিতে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। সকলে বিষণ্ণভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এক জন বন্ধুনাশে সকলেরই হৃদয় বিষাদময়। প্রভু যে কার্য্যে গিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের কি হইল,—তাহা জানিবার জন্যও সকলেরই কৌতূহল জন্মিল; কিন্তু তাহার ক্ষীণ আভা তাহাদের হৃদয়াগারস্থ গাঢ়তম বিষাদান্ধকার-রাশিকে অপসৃত করিয়া নিজ জ্যোতি প্রকাশ করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে একখানি তরণী সন্ধ্যার অনতিগভীর অন্ধকার-রাশি ভেদ করিয়া তাহাদের নিকটস্থ হইল। সকলে দেখিল—তাহাদের প্রভু যোগবল নিজ নৌকার উপরিভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যোগবল তাহাদের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি আমার বিলম্ব দেখিয়া প্রস্থান করিতেছিলে?" বিপদের সময় বন্ধু কিংবা প্রিয়জনকে নিকটে দেখিলে শোকোচ্ছ্বাসে হৃদয় আরও বিহ্বল হইয়া পড়ে। সকলে আপনাদের প্রভুকে নিকটে দেখিয়া সবিষাদে বলিল "প্রভু সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমাদের ইয়াদকে হাঙ্গরে খাইয়া ফেলিয়াছে।" পাছে যোগবল প্রকৃত ঘটনা শুনিলে, তাহাদের অসাবধানতার জন্য তিরস্কার করেন, সেই জন্য ধীবরগণ তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা বলিল। এ বিষয় তাহারা যোগবলের শৃঙ্গধ্বনি-শ্রবণমাত্রই স্থিরীকৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

যোগবল কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! ইয়াদ্‌কে কি প্রকারে হাঙ্গরে খাইল?"

এইবার সকলেই নিস্তব্ধ। হঠাৎ কাহারও মুখে উত্তর আসিল না।

তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সমধিক বুদ্ধিমান্ ছিল; সে অনতিবিলম্বেই উত্তর করিল, "প্রভু! ইয়াদ দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটা বড় হাঙ্গর লাফাইয়া আসিয়া তাহাকে নৌকা হইতে লইয়া গেল।"

যোগবল চতুর ভৃত্যের উত্তরে মৃদুহাস্য গোপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কপট-দুঃখে কহিলেন—"যাহা অদৃষ্টে ছিল—হইল, তজ্জন্য আর বৃথা খেদ করিয়া কি হইবে? চল, আমরা তীরে যাই।"

যোগবল যে কি জন্য কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক কিঞ্চিৎ পরে বুঝিতে পারিবেন। তিনি খলের ন্যায় পরের সর্ব্বনাশ-জনিত আমোদকে

অন্তরে লুকায়িত রাখিয়া মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মৌখিক দুঃখের নিগূঢ় কারণ ছিল। সকলে কিয়দ্দূর গমন করিলে, দলস্থ এক ব্যক্তি যোগবলকে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল—“হাঁ হাঁ, ভাল কথা ভুলিয়াছিলাম। প্রভু, আপনি যে কার্য্যে গিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?”

যোগবল। “তাহা একপ্রকার শেষ করিয়া আসিয়াছি। পর্ত্তুগিজগণ অদ্য রাত্রিকালে ভগ্নদ্বীপের কিঞ্চিৎ উত্তরে জাহাজ লঙ্গর করিবে। আজ রাত্রে তাহাদের জাহাজে একটী মহৎ ভোজ হইবে।”

অনুচর শ্রবণ করিয়া ঈষৎ আহ্লাদিত হইয়া কহিল “তবে ত ভালই হইয়াছে; আমাদের খুব সুবিধা হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সেই স্বল্প-আনন্দময় স্বর পরিত্যাগ করিয়া বিষাদে কহিল, “আমরা কি লইয়াই বা তাহাদের সম্মুখে যাইব ? যে একটা মাছ পাইয়াছিলাম, তাহাও আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া পালাইয়া যাইল।”

যোগবল তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন “তজ্জন্য চিন্তিত হইও না, তীরে যাইয়া অনেক মুরগি ও ছাগল লইয়া আসিতে পারিব। আর যদি পারি, একটী মাছও সংগ্রহ করিব।” সকলে কিছু ক্ষণের জন্য সবলে স্ব স্ব নৌকা বাহিত করিয়া গুর্জ্জর-উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগবলের কোন অনুচরই তাঁহার নৌকার দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই; করিলে, তন্মধ্যে একটী আহ্লাদের সামগ্রী দেখিতে পাইত, তদ্দ্বারা তাহাদের হৃদয়ের বর্ত্তমান গাঢ় তিমিররাশি অন্তরিত হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

“————a brave vessel,
Who had no doubt
Some noble creatures in her
Dashed all to pieces.”—*Tempest.*

সন্ধ্যাকাল অতীত। চন্দ্রদেব তারকা-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া বিশাল-বারিধি-দর্পণে আপনার মুখ দেখিতেছেন। তরঙ্গ সকল চন্দ্রের প্রতিবিম্বকে কম্পিত করিয়া দ্রুত বেগে গমন করিতেছে, অনন্ত সাগরের অনন্ত পথে অবিরামে গমন করিতেছে। এই সময়ে এক খানি বৃহৎ অর্ণবপোত, ভীমদর্শন গরুত্মান্ জলবিহারী রাক্ষসের ন্যায় নিজ প্রচণ্ড গুণবস্ত্র বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে সন্তরণ করিতে করিতে ভগ্ন-দ্বীপের উত্তর দিকে উপস্থিত হইল। যে ভগ্নদ্বীপের কথা আমরা বলিতেছি, তাহা অধুনা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। শত বর্ষ হইল, তাহা জলধির অন্ধকারময়-গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। আমরা যে সময়ের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তৎকালে তাহা গুর্জ্জরের পশ্চিম অন্তরীপ হইতে প্রায় অশীতি ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। তাহা একটী মরুময় ক্ষুদ্র দ্বীপ। তৎকালে তথায় মানবের বাসস্থান ছিল না।

তবে পোতমগ্ন অসহায় নাবিকগণ সাগরতরঙ্গে ভাসমান হইয়া সময়ে সময়ে তাহাতে যাইয়া পতিত হইত। উদ্ভিজ্জের মধ্যে দ্বীপটীতে বহুল পরিমাণে নারিকেল বৃক্ষ ছিল। পোত, ভগ্নের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র নাবিকগণ ক্ষিপ্র-হস্তে গুণবস্ত্র সমুদায় নামাইয়া লইয়া লঙ্গর করিল; ক্ষণমধ্যে নৈশ ঘোর নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত এবং বারিধি-বারি কম্পিত করিয়া অর্ণবযান হইতে পরে পরে কয়েকটী কামান ধ্বনিত হইল। গম্ভীর শব্দ প্রতিধ্বনিতে বিলীন হইতে না হইতে, আবার কয়েকটী কামানের শব্দ গোয়া নগরী হইতে তাহাদের প্রত্যুত্তর দিল। উভয় দিকের শব্দ একত্র মিলিত হইয়া সমগ্র প্রকৃতিকে কম্পিত করিয়া দূরে প্রতিধ্বনিতে বিলীন হইল। সে শব্দ কালিকুট নগর পর্য্যন্ত শ্রুত হইয়াছিল। জাহাজের দৃঢ় অবস্থিতি-বিষয়ে সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন হইলে, সেনাপতি একবার সামরিক-ঐকতান-বাদনে বাদক-গণের প্রতি অনুমতি করিলেন। বাদ্য আরব্ধ হইল। সুমধুর বাদ্যের সুশ্রাব্য প্রতিধ্বনি অনন্ত সাগরকে নিদ্রান্বিত করিয়া অনন্ত গগনপথে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। নৈশ পবন তাহার সহিত নৃত্য করিতে করিতে, তাহাকে লইয়া সুদূরে বহমান হইল। এ দিকে উৎসবের উপযোগী বিষয় সমুদায় যথা-বিহিত রূপে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অদ্য লোপদোরেজ তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ কতিপয় সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীকে আপনার নবাভিষেকের জন্য সমাদর সহকারে ভোজন করাইবেন। তাঁহারা তৎসমভি-ব্যাহারে নব-রাজ্য ভারতবর্ষ-দর্শনে আসিয়াছেন। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অনু-ষ্ঠান হইতে লাগিল। ও দিকে ঐকতান বাদন বাজিতেছে, এ দিকে অনুচরগণ আহার্য্য বিষয় সমুদায়ের আয়োজন করিতে লাগিল। জাহাজের একটা বিস্তৃত কক্ষ মধ্যে সুদীর্ঘ টেবিলের চতু-র্দ্দিকে কাষ্ঠাসন-নিচয় সজ্জিত হইতে লাগিল। কক্ষটী দীর্ঘে বিংশতি হস্ত ও প্রস্থে পঞ্চাদশ হস্ত এবং উচ্চেও প্রায় নয় হস্ত হইবে। কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একটী সুগোল, বিচিত্র কারুকার্য্য রচিত দারুময় স্তম্ভ স্থাপিত; ইহার উন্নত শীর্ষদেশ কক্ষের ছাদ ভেদ করিয়া তদুপরিস্থ আর একটী দ্বিতীয় কক্ষের ছাদে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। দ্বিতল কক্ষটী নিম্নস্থ কক্ষ অপেক্ষা আয়তনে ছোট। এটী এক প্রকার রক্ষক-শালা বলিতে হইবে। ইহার চতুষ্পার্শ্ব অনাবৃত; উপরিভাগে একখানি স্থূল কাম্বিষ চন্দ্রাতপ বিস্তৃত। পোতাধ্যক্ষ তন্মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া পোতের চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করেন।

পরিচারক-গণ সুদৃশ্য কক্ষটীকে আরও নানা প্রকার শোভায় সজ্জিত করিতে লাগিল। সুদৃশ্য চিত্র, ঝাড়, লণ্ঠন যেখানে যেটীকে সংস্থাপন করিলে, গৃহের সৌন্দর্য্য-রাগ বর্দ্ধিত হয়, ভৃত্যগণ তদ্বিষয়ে অণু-মাত্র ত্রুটি করিল না। সুচিক্কণ সাটিন-

বসনাবৃত সুদীর্ঘ টেবিলের উপরে ক্রমশ আহার্য্য ও পেয় দ্রব্য সমুদায় সুশৃঙ্খলরূপে সজ্জিত হইতে লাগিল। প্রধান কর্ম্মচারী প্রকোষ্ঠের বহির্দ্দেশে আসিয়া উচ্চ ঘণ্টা ধ্বনি করিয়া আহারার্থে সকলকে অভ্যর্থনা করিল। নব-শাসনকর্ত্তা সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া আপন বান্ধব-সকলকে বিহিত-সম্মান-পুরঃসর-বচনে গাত্রোত্থান করিতে অনুরোধ করিলেন; সকলে উত্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে লইয়া সুসজ্জিত-কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন,—এবং একে একে সকলকে যথাস্থানে উপবেশিত করিয়া অবশেষে স্বয়ং আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি উত্থিত হইয়া একটী স্বচ্ছ-পানপাত্রে সুগন্ধসার সুরা ঢালিয়া পানার্থী সকলকেই এক এক পাত্র করিয়া প্রদান করিলেন। তাঁহারা সকলেই সবিনয়ে গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার স্বাস্থ্য-বর্দ্ধনের জন্য সাহ্লাদ-চিত্তে পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে স্ফটিক পান-পাত্র টেবেলের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া আসিল। তখন তিনি সকলের অনুরোধে স্বয়ং এক পাত্র পান করিলেন। এই বার সকলে নানাবিধ সুস্বাদু আহার্য্য সামগ্রীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। আজ এই কক্ষের এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইল। প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে দ্বাদশ-শাখা-বিশিষ্ট একটী বৃহৎ ঝাড় দ্বাদশ হস্তে প্রোজ্জ্বল বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া গৃহকে আলোকিত করিতেছে। চতুষ্পার্শ্বে আরও অনেক প্রকার আলোক জ্বলিতেছে। তাহাদের প্রতিবিম্ব নির্ম্মল স্বচ্ছ-স্ফাটিক-পাত্রসমূহে পতিত হইয়া সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইতেছে; আর প্রশস্ত টেবেলের চতুর্দ্দিকে শ্বেতপুরুষগণ হস্ত ও মুখ নাড়িয়া আহার করিতেছে। বোধ হইতেছে, যেন চন্দ্রকর-প্রতিভাত, কুমুদ্বতী-সরসীর বিমল-সলিলে গাত্র মগ্ন করিয়া রাজহংসগণ কুমুদ-মৃণাল ভক্ষণ করিতেছে। নৈশ পবন, তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত শীতল-সলিল-কণা বহন করিয়া পোতস্থ নাবিকগণের কর্ণের নিকট ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতেছে, কখন বা কোন স্থানে কোন রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া বেণুবিনিন্দিত স্বরে গর্জ্জন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে মুক্ত-বাতায়নস্থ কাচবিনির্ম্মিত কপাট সকল তৎকর্ত্তৃক প্রতাড়িত হইয়া বিকট-শব্দে প্রকোষ্ঠ-গাত্রে প্রতিহত হইতেছে। কুক্কুরগণ সেই শব্দে চীৎকার করিয়া এক এক বার বাহিরে যাইতেছে—আবার গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শ্বেতপুরুষ-রঞ্জিত-দশন-চর্ব্বিত, অপক্ক, মাংসলিপ্ত অস্থি সকল চর্ব্বণ করিতেছে। এ দিকে আমোদভোজী সকলের মধ্যে নানাপ্রকার গল্প চলিতেছে। কোথায় বা দুই জন একত্রে কোথায় বা ছয় জন ও তদধিক একত্রে নানাবিষয়ে গল্প করিতেছে। সোরেজ মধ্যে মধ্যে মস্তক নাড়িয়া সকলেরই বাক্যে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতেছেন। এক জন এক খণ্ড মাংস মুখে

পূরিয়া অব্যক্ত গম্ভীর-স্বরে কি জিজ্ঞাসা করিল।

কিন্তু কেহই তাহার প্রশ্ন বুঝিতে পারিল না। কেবল তাহার চর্ব্বণ-জনিত মুখব্যাদান ও দীর্ঘ-দন্ত-পঙক্তির নীলাভ দীপ্তি প্রকাশ পাইল, এবং অস্পষ্ট "আম্—আম্" শব্দ শ্রুত হইল। সকলেই সবিস্ময়ে তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল, ভাবিল—হয় ত তাহার কণ্ঠদেশে পশু-অস্থি বিদ্ধ হইয়াছে।

ক্ষণ-পরেই সে সেই মাংস-খণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া, স্পষ্টস্বরে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, ভারতীয়েরা কি খায়? তাহারা কেবল মুক্তা-ফল খাইয়া থাকে,—নয়?"

এরূপ অসম্ভব সংস্কারের অন্যতর কারণ আর কিছুই নাই। তাঁহার আশৈশব এই জ্ঞান ছিল যে, ভারতবর্ষ পার্থিব স্বর্গবিশেষ। তিনি স্বদেশ-প্রচলিত নানাপ্রকার পুরাবৃত্ত ও ইতিহাসে পাঠ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভারতভূমি স্বর্ণময়, এখানকার উদ্ভিজ্জ-সমূহ সুবর্ণ-কণার উপর সঞ্জাত হইয়া মুক্তাফল প্রসব করে এবং তরঙ্গিণী-নিচয় হীরকচূর্ণ বহন করিয়া থাকে। এই প্রকার অভাবনীয় সংস্কার বশত অদ্য আহার করিতে করিতে ভারতীয়দের আহার্য্য বিষয় তাঁহার মনে পড়িল এবং সংশয় অপনোদন করিবার জন্য এই হাস্যোদ্দীপক প্রশ্ন করিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকালে এক জন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন পর্ত্তুগিজের অন্তঃকরণে যে,ভারতবর্ষ-বিষয়ে এরূপ অসম্ভব ভ্রম থাকিবে, তাহা বড় বিচিত্র নয়। অদ্য এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে অনেকানেক য়ুরোপীয়ের মনে এখনও এ ভ্রম বিরাজ করিতেছে। নতুবা ভারতের সামান্য ভূমিখণ্ডের আজ এত অধিক রাজকর নিরূপিত হইবে কেন? ভারতের এই পরিবাদই ভারতের পক্ষে কাল-স্বরূপ হইয়াছে।

এই প্রশ্নের উত্তর-শ্রবণে উপস্থিত অনেকেরই অন্তঃকরণে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক হইল। সকলেই অবহিত-চিত্তে সোরেজের মুখ প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল। সোরেজ ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন,"এ প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক নয়, আমারও ইতিপূর্ব্বে এইরূপ সংস্কার ছিল; আর প্রথম বার যখন আমি ভারতোপকূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, ভারতীয় বণিকগণ মহামূল্য মুক্তা ও রত্ন-বিনিময়ে আমাদের নিকট হইতে সামান্য মাটির খেলানা সকল ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু, তখন আমার দুর্ভাগ্য বশত আমি ভারতবর্ষের অন্যান্য বিষয় বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই নাই।" নানোহা,যিনি প্রথম বার প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আবার সোরেজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"মহাশয়! আপনি ভারতবাসীদিগকে দেখিয়াছেন,—তাহাদের পরিচ্ছদ কি প্রকার?"—"তাহাদের পরিচ্ছদ ও আকৃতি দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম,

বোধ হয়, আমরা কোন্ মায়াদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছি; কিন্তু যখন তাহারা নৌকারোহণে আমাদের জাহাজে আসিতে লাগিল, তখন আমার সে ভ্রম দূরীকৃত হইল। কারণ, মায়াবী হইলে, তাহারা অবশ্যই জলের উপর দিয়া চলিয়া আসিত।" পরে তিনি বিস্ময় ও প্রশংসার সহিত নিজ মস্তক ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া কহিলেন," কিন্তু তাহাদের আকার প্রকার নিতান্ত চমৎকার।" সোরেজের এ প্রকার বিশ্বাস ছিল যে, মায়াময় স্থান সমুদ্র-মধ্যে থাকিলেই, তাহা অবশ্য দ্বীপ হইবে এবং তন্মধ্যে মায়াবী অমরাত্মারা বাস করিবে। সোরেজের বাক্যের শেষাংশ সম্পূর্ণ হইবা-মাত্র জাহাজের অনতিদূরে সমুদ্রোপরে ঘন ঘন উচ্চ পর্ত্তুগিজ্-রাজের জয়ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। তিনি অমনি পোতাধ্যক্ষের প্রতি তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে অনুমতি প্রচার করিলেন।

পোতাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া শব্দ-নির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন, দুই খানি বৃহৎ নৌকায় কতকগুলি সুপরিচ্ছন্ন লোক অজস্র পর্ত্তুগিজ-রাজের জয় ঘোষণা করিতেছে। তিনি বুঝিলেন, ঐ সমুদায় লোক গোয়া নগরী হইতে তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমনাশায় জাহাজের নিকটে আসিয়াছে, সুতরাং অর্ণব-পোতের সোপান-পঙ্ক্তির তলে তাহাদের নৌকা দুই খানি সংলগ্ন করিতে কহিলেন। তরণীদ্বয় ঠিক্ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকারোহিগণ নাবিকদিগকে নৌকায় গুণরজ্জু পোত-প্রলম্বিত স্থূল ও কঠিন রজ্জুতে বন্ধন করিতে আদেশ করিয়া, আপনারা পর্ত্তুগিজ-নাথের জয়নাদে পোতাধ্যক্ষ-নির্দ্দিষ্ট-সোপান-পঙ্ক্তি আরোহণ করিয়া পোত-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

সোরেজ্ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। পরে সকলে উপবিষ্ট হইলে, তিনি বিনম্র-স্বরে তাঁহাদের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক জন পর্ত্তুগিজ-বেশ-ধারী। আর সকলেরই মহার্হ রত্নমণ্ডিত মারহাট্টি বেশ।

সোরেজ্ তাঁহারই সহিত মাতৃ-ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন; এক্ষণে আমরা তাহার মর্ম্ম বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতেছি।

সোরেজ্ বিনম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের নাম কি?"

পর্ত্তুগিজ-বেশধারী ব্যক্তি ভদ্রশীলতা-সহকারে উত্তর করিলেন—"ফকসউট।"

সোরেজ। "গোয়াধ্যক্ষ আপনাকে কি অভিপ্রায়ে পাঠাইয়াছেন?"

ফক্স। "আপনার সুবিহিত অভ্যর্থনার জন্য অদ্য এই কয়েকটী গোয়াবাসী বলবান্ মারহাট্টী আপনার ভোজ-বিবরণ অবগত হইয়া আপনার জন্য সুমিষ্ট আহার্য্য ও পেয় সামগ্রী সমুদায় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। অনুমতি হইলে,

আপনার করে সমর্পণ করিয়া আপ্যায়িত হয়েন।"

পোতস্থ সকলেই নিবিষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল। এক্ষণে সোরেজের সহিত সকলেরই হাস্যোৎফুল্ল বদন, অভ্যাগত মারওয়ারিদিগের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইল। সোরেজ সাহ্লাদচিত্তে তৎসমুদায়-দ্রব্য-গ্রহণার্থে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলেন। তাঁহারাও সম্মানসহকারে মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহার হস্তে তৎসমুদায় অর্পণ করিলেন। সোরেজ্ একে একে সকলের হস্ত হইতে দ্রব্য সমুদায় গ্রহণ করিয়া পার্শ্বস্থ টেবেলের উপরে স্থাপন করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে পাচকগণ আসিয়া পেত্র হইতে আহার্য্য সামগ্রী সকল বিভিন্ন করিয়া ধীরে ধীরে আহারপাত্র-সমুদায়ে রক্ষা করিতে লাগিল। ভক্ষ্য-দ্রব্য-সমূহের ঘ্রাণতৃপ্তিকর সৌরভে সমস্ত পোত আমোদিত হইল। পর্ত্তুগিজ সকলেই একস্বরে দ্রব্য-সমুদায়ের প্রশংসা করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে টেবেল্ পুনর্ব্বার নব-সজ্জায় সজ্জিত হইল। সোরেজ্ বিনয়-নম্র-বচনে অভ্যাগত ব্যক্তি-সমুদায়কে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ফক্স তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তাহারা বিধর্ম্মীর সহিত কখনও একাসনে বসিয়া আহার করে না।

সোরেজ্ ঈষৎ লজ্জিত হইলেন; তিনি জানিতেন না যে, ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে এরূপ জাতি ও ধর্ম্মভেদ প্রচলিত আছে। তিনি তৎপরে ফক্সকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

ফক্স বিনীত-ভাবে উত্তর করিলেন, "মহাশয়! এ দাসের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; শরীরের সামান্য-অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন এ দাস আজ সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া আছে।" ক্ষণপরে আবার সম্মানসহকারে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদ্যপি প্রভুর অনুমতি হয়, তাহা হইলে এ দাস স্বহস্তে আপনাদিগকে পরিবেশন করে—"

সোরেজ্ এবং অন্যান্য সকলেই আহ্লাদিত-চিত্তে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সকলকেই যথাবিধি ক্রমে পরিবেশন হইতে লাগিল। সকলেই সাগ্রহে ভারতবর্ষীয় ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য সেবন করিতে লাগিল। নানোহ ও তাঁহার অন্যান্য সহচরগণ এক এক বার ভারতীয়দের দেবমূর্ত্তি বর্ণন করিতে লাগিল এবং নিম্ন স্বরে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ইহারা কি তবে মুক্তাফল চূর্ণ করিয়া খাদ্য-দ্রব্যের সঙ্গে পাক করিয়াছে? অল্পে অল্পে পর্ত্তুগিজ সকলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ক্রমশ শিথিল হইয়া মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহারা আপনাপন শয্যায় যাইয়া শয়ন করিতে লাগিল। কেহ বা আমোদ-ভরে নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিয়া দিল।

ফক্স এই বার সোরেজের নিকট বিদায় লইতে যাইলেন। সোরেজ্ তখন ঈষৎ-মত্ততাবেশে অন্য-মনে এক প্রকার সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, যেন স্বর্গীয় বিদ্যাধরীগণ তাঁহার সহিত সখ্যতা করিতে আসিয়া, তাঁহাকে বিকলচিত্ত দেখিয়া প্রস্থান করিতেছে; অমনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জড়িত-বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি সে কি, আপনারা যাইতেছেন কেন—আমি কি দোষ করিলাম যে, আপনারা আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন?"

ফক্স তদীয় সহচরদিগকে কানে কানে কি বলিলেন। অমনি তাহারা সকলে জাহাজ হইতে দ্রুতপদে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদের নৌকায় আসিল। ফক্স বিকলচিত্ত সোরেজকে দৃঢ়ভাবে রজ্জুবদ্ধ করিয়া তুলিয়া লইয়া নৌকায় নামিয়া আসিলেন। তিনি নৌকায় আসিলে, তাঁহার সহচরগণ নৌকাদ্বয়কে বন্ধনমুক্ত করিয়া উত্তরাভিমুখে বাহিয়া চলিয়া গেল। দুর্ভাগ্য সোরেজ 'শৃগালবুদ্ধির' চাতুর্য্য-জালে দৃঢ়-বদ্ধ হইলেন।

পর দিন প্রত্যূষে অর্ণব-পোতের চিহ্ন-মাত্রও লক্ষিত হইল না, কেবল তাহার শ্রেষ্ঠ গুণবৃক্ষটীর শীর্ষদেশ এক হস্ত পরিমাণ সাগর-জল হইতে উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে কাঁপিতেছিল!

আগম-যোগ।

সমাধি-অবস্থার কার্য্য।

অন্তঃপূর্ণং বহিঃপূর্ণং
মধ্য-পূর্ণং যদাত্মকং।
ত্রিপূর্ণং পরমাত্মানং
সমাধিস্থস্য চিন্তনং ॥ ১।
এবং সম্পূর্ণং খং পশ্যেৎ
স যোগী ব্রহ্মবিৎ সুধীঃ।
যাবৎ পশ্যেৎ খমাকারং
তাবৎ কালং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২।
খ-মধ্যে কুরু চাত্মানং
আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং কৃত্বা
ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৩ ॥

উত্তরগীতা।

যাঁহার আত্মা ত্রিপূর্ণ অর্থাৎ অন্তর্বাহ্য-মধ্যে পরিপূর্ণ, এমন যোগীই সমাধি-সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ যোগী। এতদ্ভিন্ন যে যোগী আত্মাকে খ-স্বরূপ অর্থাৎ শূন্যময় দেখিয়া থাকে, তিনি যাবৎ ত্রিপূর্ণ না দেখিবেন, তাবৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবেন। অতএব আকাশের মধ্যে কেবল আত্ম-

জ্যোতি ও আত্মা-মধ্যে আকাশ অর্থাৎ জগৎকে শূন্যময়, ও শূন্যকে আত্মময় দেখিলে, আর চিন্তার প্রয়োজন থাকে না। তখন সকলই আত্মময় দৃষ্ট হইবে। ইহাই সমাধি-অবস্থার কার্য্য। সমাধিতে যাহা চিন্তা করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। ইহার অন্যার্থ এই—অন্তর-পরিপূর্ণ, বাহ্য-পরিপূর্ণ, এতদুভয়ের মধ্য-ভাগও পরিপূর্ণ। এই ত্রিপূর্ণ যাঁহার আত্মা, তিনিই প্রকৃত-সমাধি-ভাবাপন্ন যোগী। তিনিই যথার্থ-অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী। যে যোগী ধ্যানস্থ হইয়া আত্মাকে শূন্যময় দেখেন, তাঁহার চিন্তার অবসান হয় না। অতএব আকাশকে আত্মময় ও আত্মাকে আকাশময় ভাব এবং সেই আত্মাকে আকাশময় স্থিরতর-রূপে সন্দর্শন করিতে পারিলে, আর বাহ্য জগৎ জ্ঞান থাকিবে না। অতএব যে সাধক পুনঃ পুনঃ এইরূপ ধ্যানস্রোতে নিমগ্ন হন, তিনি সকল চিন্তা হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া, পরম মুক্তি লাভ করেন। মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব যেমন জল-সমুদ্রে প্লাবিত হয়, সেই রূপ নিখিল সংসার আত্মাতে পরিপূর্ণ জ্ঞান হইলে, আর সংসার-চিন্তা থাকে না।

আত্মনা পূরিতং বিশ্বং
মহাকল্পেঽম্বুনা যথা॥

আগম-কল্প-লতিকা।

সমাধিস্থ যোগীর এ অবস্থায় আত্মা বৈ অন্য কিছুরই জ্ঞান থাকে না। ইহাকেই অদ্বৈতজ্ঞানী যোগী বলে। এরূপ জ্ঞান লাভ হওয়া যোগ-সাধনার চরম ফল।

এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উত্তর-গীতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে :—

মনসো হ্যুন্মনীভাবাৎ
দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে।
যদা যাত্যুন্মনী-ভাবং
তদা তৎ পরমং পদং॥ ৪।

উত্তরগীতায় বলা হইয়াছে যে, মনের উন্মনীভাব অর্থাৎ সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত ভাব হইলে, দ্বৈত জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। সেই উন্মনীভাব হইলে, পরম-পদ আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মনের উন্মনী ভাব লাভ করিতে হইলে, যোগ-সাধনা অপেক্ষা করে। সেই যোগ যম-নিয়মাদিতে অষ্ট প্রকার। যম-নিয়মাদি যে অষ্টাঙ্গ যোগ আছে, তাহার স্বরূপার্থ এই :—মানব, সুষুপ্তি-অবস্থায় যে ভাবাপন্ন হয়, যম-নিয়মাদি দ্বারা মানবের মন সেই রূপ সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হয়। সুষুপ্তি-অবস্থায় নিদ্রাদেবীর প্রভাবে মন অল্পক্ষণ সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত হয় বটে। যম-নিয়মাদি যোগ দ্বারা যত ক্ষণ কুম্ভক ও যোনি-মুদ্রা-বন্ধন করিয়া যোগী অবস্থান করিবেন, তত ক্ষণ মনের সঙ্কল্প বা বিকল্প কিছুই থাকিবে না। এ সময়ে সুষুপ্তি-অবস্থায় যাহা ঘটে, তাহাই হয়। মূর্চ্ছাতে আর সুষুপ্তিতে অল্প বৈলক্ষণ্য। মূর্চ্ছাতে কেবল চিন্তিত বিষয়টী মনে উদয় হইতে থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয় মনে স্থান পায় না।

যোগীরা তুরীয়-অবস্থায় যত ক্ষণ অধিরোহণ করিতে না পারেন, তত ক্ষণ যোগারাধনা করিতে থাকেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির অতিরিক্ত যে একটী অবস্থা আছে, সেই অবস্থাকে তুরীয়াবস্থা বলা যায়। এই অবস্থা আত্ম-সাক্ষাৎকারের হেতু ও দ্বার-স্বরূপ। যাঁহারা তুরীয়াবস্থার যোগী, তাঁহাদিগকে তুরীয়ভাবাবলম্বী বলা যায়। যোগ-সাধনায় সকল ভাবেই আবশ্যক হয়। যিনি যেমন প্রকৃতির যোগী, তাঁহাকে নিজ-প্রকৃতি-অনুসারে তদ্রূপ ভাবুক হইতে হয়। ভাব সপ্তবিধ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, প্রেম, মধুর, তুরীয় ও শক্র।

এই সপ্ত-ভাবের অন্তর্গত যে তুরীয় ভাব আছে, রাজ-যোগাভ্যাস-কারক যোগীরা সেই তুরীয়-ভাবের ভাবুক হইয়া যোগ-সাধনা করিয়া থাকেন। এই তুরীয় ভাব চারি প্রকার। যথা কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস।

যে যোগী শম, দম, উপরতি আর তিতিক্ষায় সিদ্ধ হইয়া নিরন্তর কুম্ভক দ্বারা ষট্ চক্র চিন্তা এবং শাস্ত্র-বিহিত নিষ্কাম কর্ম্ম করেন, তাঁহাকে কুটীচক যোগী বলে। ইঁহারাই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রকৃত পাত্র। এই কুটীচক যোগী নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করত ইহামুত্রার্থ-ফলভোগে নিস্পৃহ ও যম-নিয়মাদিতে পরিপক্ক হইয়া আনন্দভোগে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া কেবল ব্রহ্মানন্দ পান করিতে থাকিলে, তাদৃশ যোগীকে বহূদক যোগী বলা যায়। ইহাদিগেরও ষট্চক্র-চিন্তা-মাত্র। এই ষট্চক্রভেদ করার নাম ব্রহ্মানন্দ ভোগ করা। এই ব্রহ্মানন্দও অবস্থাভেদে চারি প্রকার। যথা—বিষয়ানন্দ, যোগানন্দ, আত্মানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ। পূর্ব্বোল্লিখিত-রূপ ব্রহ্মানন্দ-জ্ঞান জন্মিলে, ঐহিক ও পারত্রিকের অজ্ঞানান্ধকার বিলয় পায়। তাহাতেই যোগী পরমানন্দ-রূপ সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করেন।

যে সকল বহূদক যোগী, যোগানন্দ-লাভার্থ যোগ-সাধনা করেন, তাঁহাদিগকে হংস বলা যায়। ইঁহারা কেবল প্রণব-চিন্তা করেন, এই মাত্র। প্রণবার্থ প্রণব-প্রতিপাদ্য বিষয়। হংসাখ্য যোগি-সকল প্রথমে বহূদকের ক্রিয়া-কলাপ করিয়া ঘট-শোধন করত ষট্চক্র-ভেদ করিতে করিতে, যখন আপনাকে, গুরুদেব ও ইষ্টদেবতাকে কেবল এক প্রণবময় দেখিবেন, তখনই তাঁহার পরমহংসাশ্রমে প্রবেশের সময় হইয়াছে জানিতে পারিয়া, পরমহংস ধামে যাইবেন। পরমহংস-পদে উপস্থিত হইলে, যোগীর বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইবে।

তখন "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং" এই সংস্কার হইবে। আপনি আপনাকে বিস্মৃত হইবেন। এই অবস্থাকে নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা বলে। পরমহংস হইলে, দ্বৈত জ্ঞান থাকে না। ইহা যোগীদিগের শেষাবস্থা। শুকদেব প্রভৃতি কতিপয় যোগি-মাত্র প্রকৃত পরমহংস ছিলেন।

ইহাঁদিগের বৈধাবৈধ কোন ক্রিয়া ছিল না। ইহাঁরা দিবারাত্রি কেবল রস-স্বরূপ পরব্রহ্মানন্দ সুখ সম্ভোগ করেন। ইহাঁরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রাদিতে কাতর হন না। ইহাঁরা সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ; নির্জনস্থান ইহাদিগের বাসোপযোগী। বিষ, অমৃত স্বর্গ নরক বিষ্ঠা চন্দন সমজ্ঞান সর্ব্বদা প্রসন্নভাব ক্রোধের সহিত সম্বন্ধ নাই। শত্রু মিত্র উভয় তুল্য; কামিনীতে নপুংসকে তুল্য দৃষ্টি। ইহাঁরা মনে করিলে, নবীন জগৎ সৃজন, পালন, সংহার করিতে পারেন। পরমহংসে আর নারায়ণে প্রভেদ নাই। ইহাকেই তুরীয় অবস্থা বলে।

এ সম্বন্ধে শঙ্কর-ভাষ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে।

"তস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীতি এত দেব মানা এব সর্ব্ববিষয়ঃ সর্ব্বাণি চেতরাণি প্রমাণানি নহ্যহেয়ানুপাদেয়া দ্বৈতাত্মাব-গতৌ নির্ব্বিষয়ণ্যা প্রমাণানি চ ভবিতু মর্হন্তীতি শাঙ্করীভাষ্যং।" যে পর্য্যন্ত আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানের উদয় নিজ অন্তঃকরণে যথার্থরূপে না জন্মে, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ সকল অর্থবান্ থাকে; অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান পরিপাকের জন্য সকল বিধি ও নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু হেয়োপাদেয়-রহিত জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-রূপ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইলে পর, বিধি ও নিষেধ সকল নির্ব্বিষয়-রূপে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানপরিপাকের জন্য ধার্ম্মিক যোগীদিগের সকল বিধি ও নিষেধ মানিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা উচিত।

কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস ব্যতীত বৈখানস, বায়ুপায়ী, মরীচিপায়ী যে সকল যোগীর কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তাঁহারাও তুরীয়াশ্রমের যোগী। ইহাঁরা মহাযোগিপদ বাচ্য। দেবতারাও ইহাঁদিগকে শঙ্কা করেন। ইহাদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত স্থানান্তরে প্রকাশিত করা যাইবে।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

কুসুমারিন্দম।*

আজকাল বঙ্গভাষায় রাশি রাশি নাটক ও উপন্যাস প্রসূত হইতেছে। দেশীয় প্রকাশ্য রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাপনাবধি বঙ্গীয় নাট্য-সমাজের এক অপূর্ব্ব উৎপাদিকা শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; সে শক্তির প্রভাবে মৎকুণরাশির ন্যায় নিশাকালের মধ্যে আজি অসংখ্য অংসখ্য নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিতেছেন! যিনি

* স্বকপোল-কল্পিত উপন্যাস। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ পাল-প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

দুইটী বাক্য একত্র সংযোজন করিয়া অথবা ইংরাজি নাটকাবলির দুই একটী চরিত্র চুরি করিয়া একত্র সন্নিবেশ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, অমনি তিনিই এক জন নাটককার।—যাঁহারা একটী সামান্য দৃশ্য সাজাইতে জানেন না, তাঁহারা এক খানি সমগ্র নাটক লিখিতে উদ্যত।—বলিতে লজ্জায় বাঙ্ নিষ্পত্তি হয় না—আজ কাল এইরূপ নাটককারই সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। আজি বঙ্গভূমি এইরূপ অসংখ্য নাট্যকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে! নাট্যালঙ্কারে বা নাট্যশাস্ত্রের কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, বঙ্গ-সাহিত্যের যদি অল্প-মাত্রও উপকার হইতে পারিত, তাহা হইলে আমরা এক প্রকারে প্রবোধ পাইতে পারিতাম; কিন্তু তাহা নহে। এই সমস্ত নিশা সম্ভূত অদ্ভুত নাট্যকারদিগ দ্বারা বঙ্গসমাজে যে দুর্নীতি-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধ করা এখন নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বঙ্গভাষার উপন্যাস-সম্বন্ধে ওরূপ অভিমত প্রকাশ করা যাইতে পারে না। উচ্চ-ইংরাজি-শিক্ষার প্রভূত-প্রচলনে অধিকাংশ বঙ্গবাসী, ইংলণ্ডীয় ঔপন্যাসিক-সাহিত্যোদ্যানে সানন্দে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ কেহ তন্মধ্যস্থ প্রস্ফুটিত-প্রসূন-রাশির সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া সুখী হইবে বলিয়া, সাহিত্য [illegible] ও সুরুচি-কুসুম-নিচয় চয়ন করিয়া স্ব স্ব যত্নোন্নত এক এক গাছি মালা [illegible] পূর্ব্বক বঙ্গ-বাসীর কণ্ঠে অর্পণ করিয়া থাকেন। * কেহ বা সেই উদ্যানে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, বঙ্গবাসীর কণ্ঠ হইতে গ্রথিত মালার দুই একটী কুসুম অপহরণ করিয়া অলক্ষ্যে প্রশংসা ও খ্যাতি লাভ করিতেছেন। এই সময় উপন্যাস-রচনায় বঙ্গ-সাহিত্যের সম্যক উন্নতি সাধিত না হইলেও, বাঙ্গালির পূর্ব্ব হীন-রুচির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সে পরিবর্ত্তন-প্রভাবে বাঙ্গালির জড় ও নির্জ্জীব ভাব বিদূরিত হইয়া ধীরে ধীরে এক নব-জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইতেছে। এই ঔপন্যাসিক স্রোত যতই প্রবর্দ্ধমান হইবে, ততই আমাদের সেই মহতী শক্তি প্রবলতর হইতে থাকিবে, ততই আমরা হীন ও অসার ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত-কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে শিক্ষা করিব; মানবজীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব; এবং বধূগণের বসনাঞ্চল ছাড়িয়া অসংখ্য বিপদ ও বিঘ্নপরম্পরার মধ্যে অম্লানবদনে প্রবেশ করিতে শিখিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সেরূপ উপন্যাস বঙ্গভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাতে হৃদয় ধীরে ধীরে উজ্জীবিত ও উৎসাহিত হইতে থাকে, চিত্ত অলক্ষ্যে উৎসাহিনী বীরবৃত্তির অনুশীলন হইয়া পড়ে, চিত্ত অকস্মাৎ স্বাধীন ভাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠে—এরূপ উপন্যাস বঙ্গভাষায় অল-

খানি রচিত হইয়াছে? যাহাতে রোলাণ্ডোর বীরোন্মাদে উন্মাদিত হইয়া উঠি, ম্যাট্‌সিনির মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে শিক্ষা করি, স্বদেশের জন্য—স্বজাতির জন্য ভীষণ মরুপ্রান্তরে—গিরিগহনে—তুঙ্গ-শৃঙ্গ-শিখরে অথবা উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল বিশাল-সাগর-বক্ষে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া স্বকার্য্য-সাধনের জন্য জলন্ত উল্কাপিণ্ড ও বজ্রানল লইয়া খেলা করিতে পারি, এরূপ মহা-শিক্ষাপূর্ণ উপন্যাস বঙ্গভাষায় কোথায়? হায়! হতভাগ্য বঙ্গজাতির পক্ষে তাহা এখনও সুদূর-পরাহত! যে জাতি—পরাধীনতার কঠোর-মর্ম্মবেদনায় নিপীড়িত, তাহাদিগ হইতে এরূপ অদ্ভুত-শক্তির বিস্ফূরণ এক প্রকার অসম্ভব বটে, কিন্তু যে দেশে পৃথ্বীরাজ, হাইদার আলি, প্রতাপ, গুরুগোবিন্দ ও শিবজী জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশে সেই সমস্ত মহাপুরুষগণের মহাশক্তির স্বল্পমাত্র তেজোরাশি কি এক বার আশাতেও ধারণা করা যাইতে পারে না?—বলিতে পারি না। যে দেশে ভূরি ভূরি অসার নাটক ও নভেল্ প্রকাশিত হইতেছে—যে অসার-জঞ্জাল-রাশির মধ্য হইতে কচিৎ একত্রে দশ খানি উপযুক্ত-গ্রন্থের সংগ্রহ করা যাইতে পারে—সে দেশে যে নির্জ্জীব বাঙ্গালি-হৃদয় হইতে সেরূপ জীবন্ত বীরচরিত সৃষ্ট হইবে, তাহার সম্ভাসম্ভা ভবিষ্যতের নিবিড়তিমিরপূর্ণ-গভীর-গহ্বরে গাঢ়রূপে প্রোথিত!

সত্য, ঔপন্যাসিক-স্রোত বঙ্গরাজ্যে যতই প্রবর্দ্ধিত হয়, দেশের ততই মঙ্গলের সম্ভাবনা; কিন্তু বল দেখি; এই যে রাশীকৃত উপন্যাস-নামধেয় গ্রন্থ প্রতি বঙ্গবাসীর গৃহ হইতে প্রকাশিত হইতেছে, দুই চারি খানি ভিন্ন তাহাদের মধ্যে আর কয়খানি উপন্যাস-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে! এই রাশীকৃত-উপন্যাসাবলির মধ্যে সমালোচ্য গ্রন্থ-খানি অন্যতম। গ্রন্থের নাম-দর্শনে আমাদের মনে অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছিল। "কুসুমারিন্দম,—অর্থাৎ স্ব-কপোল-কল্পিত উপন্যাস"। মনে করি-লাম, গ্রন্থকার বোধ হয়, কোন নূতন-কল্পনার সাহায্যে একটী তেজস্বী ও জীবন্ত চরিত্রের চিত্র জড়হৃদয়-বাঙ্গালির সম্মুখে ধারণ করিলেন। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন "আশা করি, সেই ভীষণ বহ্নি নরনারীর হৃদয় হইতে অপনীত হইবে। যদি জগতের মধ্যে এক জনও আমার এই পুস্তক পাঠ করিয়া, সেই জলন্ত বহ্নির বিরুদ্ধে ক্ষণ-কালের জন্যও উত্থিত হন, * * * আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। আমি ভাবিব, ভারতে এক অপূর্ব্ব নয়নস্নিগ্ধকর আলোক প্রবেশ করিয়াছে; সে আলোক প্রত্যেক-হৃদয়ে প্রভাসিত হইবার বড় বিলম্ব নাই; নব্য ভারত হইবার বিলম্ব নাই, সুখরাজ আসিয়াছে, প্রজাগণকে সুখে রাখিবে।" আশা হৃদয়ে-পুঞ্জীভূত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নব

নব আশার সঞ্চার হইতে লাগিল; ভাবিলাম, গ্রন্থকার সম্পূর্ণ নূতন চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার "সেই ভীষণ বহ্নির" অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমরা এই অর্থ বাহির করিবার জন্য, এবং গ্রন্থকার কি আলোক দেখিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য সাগ্রহে গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই সে আশা বিচ্ছুরিত হইয়া অবশেষে নৈরাশ্য ও নিরানন্দে পরিণত হইয়া পড়িল। দেখিলাম, সেই পুরাণ কাহিনী, বাঙ্গালির প্রেমের সেই চিরন্তন ব্যবসা! তিনি যে কি অপূর্ব চিত্র জগতের নয়ন-সমক্ষে ধারণ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। গ্রন্থের ত্রিংশ পরিচ্ছেদে মোহন্তের চরিত্রে তিনি যে এক প্রকার ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সুন্দর ও নীতিপ্রদ বটে, কিন্তু অপূর্ব্ব বা অভিনব নহে; এরূপ ভাব তাঁহার পূর্ব্বে অনেক মহাত্মা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মোহন্ত এবিডিকন্টেনিয়ুস্ বা চন্দ্রশেখরের ন্যায় অদ্ভুত-যোগশীল বা জ্ঞানদেব হইতে পারেন, কিন্তু যে প্রণালীতে তিনি ভ্রান্ত ও হতাশ প্রেমিক-নিকুঞ্জের তেজস্বিনী চিত্তবৃত্তি ফিরাইয়া দিলেন, তাহা হৃদয়গ্রাহিণী হইল না। তবে সন্ন্যাসীর বুঝাইবার প্রক্রিয়াটী নভেলে এই প্রথম যোজিত দেখিতেছি। ইহাই ইহার গুরুত্ব। ইহা পাঠকের হৃদয়ে তেমন গভীর রেখা রাখিয়া যাইতে পারে নাই। নিকুঞ্জ যামিনীর প্রেমে অন্ধ—তাহার জন্য উন্মত্ত, সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিয়া তাহার প্রণয়-লাভের নিমিত্ত উন্মত্ত। নিকুঞ্জ সচ্চরিত্র, বিদ্বান্ ধনবান্—তাহাতে আবার অবিবাহিত। যামিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বে কোন রমণীই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই; কিন্তু যামিনীকে এক বার দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে নব ভাবের উদয় হইল; তাহা যামিনীময় হইয়া যাইল; তখন তিনি ভাবিলেন, যামিনী তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব, তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ, তাঁহার হতাশান্ধকারের আশা-প্রদীপ—জীবন-মরুভূমের শান্ত স্নিগ্ধ ওয়েসিস্। নিকুঞ্জ যামিনীর প্রেম-লাভের নিমিত্ত উন্মত্ত হইলেন, দাস দাসী, ধন রত্ন, বিভব বৃত্তি, সমস্তই যামিনীর চরণে উৎসর্গ করিয়া, তাহার প্রণয় ক্রয় করিতে চাহিলেন। যামিনী সম্মত হইল না। যামিনীর হৃদয় অবিভাজ্য, তাহার প্রণয়ও সুতরাং অবিভাজ্য। সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য-বিনিময়ে যে হৃদয়, যে প্রণয় কেহই ক্রয় করিতে পায় নাই, তাহা যাহাতে এক বার লীন হইয়াছে, আর তাহা হইতে কেহই ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। সুতরাং নিকুঞ্জের সমস্ত প্ররোচনা ব্যর্থ হইল; সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত অনুনয় বিনয় শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তথাপি নিকুঞ্জ যামিনীর আশা ছাড়িতে পারিলেন না। যামিনী তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, অজ্ঞাতে পলা-

ইয়া আসিল। তিনি তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। এই খানেই তাঁহার প্রণয়ের গভীর ভাব ও পূর্ণতা পরিলক্ষিত হইল; এই সময় হইতে তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ের প্রণয়-বেগ অতি-প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে নির্ব্বাণোন্মুখ-দীপ-শিখার ন্যায় প্রচণ্ড-বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু যাহা নিভিবার নহে, যাহা এক আঘাতে চূর্ণীকৃত হইবার নহে, তাহা এইখানে নিকুঞ্জের চরিত্রে হইল। নিকুঞ্জের যে প্রচণ্ড-প্রণয়-স্রোত সন্ন্যাসীর কয়েকটী নীতিবাক্যের বালুকাবন্ধনে একবারে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রতিহত হইয়া পড়িল! ইহা অস্বাভাবিক! এই খানে নিকুঞ্জের চরিত্রের দোষ ঘটিয়াছে। গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তি ভাল, কিন্তু তাহার পরিস্ফুটনে তিনি তত পটু নহেন। এই দোষ নিবন্ধন তাঁহার উপন্যাসের কয়েকটী চরিত্র কতক অপরিস্ফুট ও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার অরিন্দম ও প্রভাত, কুসুম ও যামিনী, বরেন্দ্র ও মোহন্ত তাঁহার শ্রেষ্ঠ কল্পনা-সৌন্দর্য্যের সুপরিচয় প্রদান করিতেছে, কিন্তু তাহার চিত্রণে তাদৃশ অভ্যাস না থাকায় অত্যুৎকৃষ্ট ও প্রস্ফুটিত হয় নাই। এ সকল মনোজ্ঞ চরিত্রকোন চিত্রণ-সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকাক্ষেপণাতে কিয়দংশে মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিত।

পূর্ব্বোক্ত সকল দোষ থাকিলেও, গ্রন্থকার ঔপন্যাসিক-চরিত্র-চিত্রণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার যামিনীর চিত্র অতি মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী। যামিনী বিষাদ-প্রতিমা; বরেন্দ্রকে ভাল বাসিয়া তাহাকে আজন্ম কাঁদিতে হইয়াছে। যামিনী বালবিধবা, বালিকা—সরলপ্রকৃতি—হিতাহিত-বিবেক-বিহীনা। বরেন্দ্র দুষ্ট, ক্রূরাত্মা, লম্পট ও পিশাচমতি; দেশ শুদ্ধ লোক বরেন্দ্রের নিন্দা করিলেও, সকলের পক্ষে শমন সমান হইলেও, যামিনীর পক্ষে সে দেবতাতুল্য—নির্দ্দোষ অপ্রতিম নরদেব! যামিনী সুকুমারমতি কোমল বালিকা,—হিতাহিত চিন্তা না করিয়া কুটিল-মতি, বিষহৃদয় বরেন্দ্রকে সহসা ভালবাসিয়া ফেলিল। তাহার পবিত্র প্রণয়স্রোত স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হইয়া বরেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিল; কিন্তু তাহাকে নিমজ্জিত করিতে পারিল না; বরং তাহার পদতলে লীন হইয়া যাইল! বরেন্দ্র তাহাকে ভালবাসুক, আর নাই বাসুক—যামিনী তাহা মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিল না, সে আপনি ভালবাসিয়াই পরিতৃপ্ত; সে প্রেমপাত্রের নিকট হইতে ভালবাসার আর কিছুই প্রতিদান চায় না; কিন্তু তাহাতে সরলা যামিনীর স্বর্গীয় প্রেমের কিছুই ব্যাঘাত ঘটে নাই। দুর্ম্মতি বরেন্দ্র সরল-হৃদয়ার সেই পবিত্র প্রণয় কলঙ্কিত করিল; কিন্তু সে কলঙ্ক যামিনীর নহে, তাহা সেই

দুরাচার লম্পটেরই চরিত্রে সংশ্লিষ্ট হইল; ললিত-ললনা যামিনী তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিত না; বরেন্দ্রই তাহার প্রাণপতি, তাহার হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য দেবতা। বরেন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহ কখন তাহার হৃদয়-নিলয়ে স্থান পায় নাই। দুষ্ট সেই স্বর্গীয়া সুকুমারীকে লইয়া যথাকাম আপনার পাপ-বিলাস-লালসা পরিতৃপ্ত করিয়া অবশেষে তাহাকেই বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিল। তখনও যামিনীর সেই ভাব—সেই পবিত্র প্রণয়চ্ছবি—সেই অকপট প্রেমোচ্ছ্বাস! এই সময় হইতে যামিনীর চরিত্র পরিস্ফুট ও পূর্ণ হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে কত বিপদে পড়িল, কত প্রলোভন অতিক্রম করিল—তথাপি তাহার অমল-চরিত্রে বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। পরিশেষে সেই শেষ দিন—উভয়ের জীবনের সমাধি-স্থলে পতিপ্রাণা প্রণয়োন্মাদিনী যামিনী বরেন্দ্রের বধ্যভূমিতে সহসা যাইয়া যখন উপস্থিত হইল,—যখন অনেক দিনের পর—অনেক বিপদের পর প্রাণেশ্বরের শৃঙ্খলাবদ্ধ-চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, তখন বরেন্দ্রের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, তখনই হতভাগ্য—দুর্ভাগ্য কামিনীকে চিনিতে পারিল। কামিনীর অমূল্য-পবিত্র-প্রণয়ের স্বর্গীয় সুধা পান করিতে অক্ষম হইল, অনুতাপের নরক-যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিল; অশ্রুপ্লাবিত-বদনে উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে যামিনীর সমক্ষে অন্ধের মত কাঁদিয়া রহিল। সে ক্রন্দনে পবিত্র সুবিমল সুখ। এ সুখ অতি দুর্লভ! এই খানে উভয়ের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। যামিনী রমণীকুলের শিরোমণি স্বর্গীয় প্রণয়ের অমল-প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রন্থকার ইহার তাদৃশ পরিস্ফুটন করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ের প্রধান অন্তরায়—তাঁহার ভাষায় পূর্ণ অধিকার না থাকা। এই দোষেই তাঁহার গ্রন্থ কিয়দংশে দূষিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষায় লালিত্য, মাধুর্য্য বা ঔপন্যাসিক সৌন্দর্য্য অধিক নাই। বিশেষতঃ তৎপ্রকটিত কবিতাগুলি কতক সরস বটে, কিন্তু সুকবিত্ব ও সুরুচির পরিচায়ক নহে; গ্রন্থের যাহা কিছু মধুরতা আছে, তাহা এই নীরস-কবিতাগুলিতে কথঞ্চিৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থে আদর্শ-বাক্য-গুলির (Mottos) সঙ্কলনে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। গ্রন্থ-মধ্যে পল্লীগ্রাম-বর্ণনাও ভাল বটে।

শ্রীযোগীশ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রাবণ-বধ (নাটক) শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, কর প্রেস্, ৷৷৹ আনা।

ইউরোপ ও আমেরিকার অভিনেতৃ-বৃন্দ সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত-রুচি। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার গ্রন্থকারও আছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টান্তে আমাদের রঙ্গভূমি পরিচালিত হইলে, অল্প-দিনেই বঙ্গদেশের ভাগ্য ফিরিয়া যায়।

এই পুস্তকর প্রণেতা "বঙ্গ-রঙ্গভূমির" এক অতি উৎকৃষ্ট অভিনেতা। পুস্তক-রচনাতে তাঁহার প্রবৃত্তি ও অনুরাগ দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। এই নাটকের গুণ ও দোষ-ভাগের যথার্থ সমালোচন করা আবশ্যক বিবেচনায়, কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম;—তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে হনুমান কর্ত্তৃক ছদ্মবেশে দুর্দান্ত রাবণের মৃত্যুবাণ-আনয়ন-সমকালে মন্দোদরী, শূর্পনখা প্রভৃতির পরস্পর কথোপকথন যার পর নাই কেবল অরুচিকর নহে, কিন্তু তাহাতে বর্ত্তমান-কালের কুরুচির ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দের ছটা ও বিলক্ষণ এবং স্থল-বিশেষ ছন্দঃ-পতনও হইয়াছে। ভরসা করি, আগামী সংস্করণে এ গুলি সংশোধিত হইবে। "রাবণ-বধের" কল্পনা এবং দৃশ্য-সংযোজন প্রীতিকর। সু-অভিনেতার রচিত পুস্তক যে অভিনয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, বলিবার প্রয়োজন নাই।

কুসুম-কোরক—ময়মনসিংহ, সেরপুর, চারুযন্ত্র, মূল্য ৷৷৵৹ আনা। পুস্তকে প্রণেতার নাম বা ভূমিকা কি বিজ্ঞাপন নাই। পুস্তকের নামটী অতি পুরাতন ধরণের হইয়াছে, নামের আকর্ষণী-শক্তি নাই। রচনা দৃষ্টে বোধ হয়, গ্রন্থকারের পুস্তকাকারে কবিতা-প্রচারের এই প্রথম চেষ্টা। উদ্যান, শরৎ, অধীন-ভারত শিরস্ক পদ্যময় প্রবন্ধ গুলি মন্দ হয় নাই। ইহাদের মধ্যে দুই এক স্থলে যতিভঙ্গ না থাকিলে, কবিতা কয়েকটীর সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি পাইত। পরিপাটী কাগজ ও ছাপাসত্ত্বেও বর্ণাশুদ্ধি কুসুমকোরকের কতক সুষমা বিনষ্ট করিয়াছে। 'মাতৃভূমি সেরপুরের প্রতি'ও 'শ্মশানে প্রভাত' পদ্য দুইটী হৃদয়-ভাবে পূর্ণ সুতরাং তাহাতে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি আছে। জন্মভূমির দুঃখে ও পিতৃ-বিয়োগে যিনি বিচলিত, তিনি কবিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। মোটের উপর রচনা গুলিন হৃদয়গ্রাহিণী বটে। নব লেখক বিধান্ মাত্রেরই উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

সেরপুরস্থ বিদ্যোৎসাহী খ্যাত ভূম্যধি-কারী বাবু হরচন্দ্র চৌধুরীকে কুসুম-

কোরক উপহার দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া, প্রীতি লাভ করিলাম।

বামাবোধিনী পত্রিকা—বসুপ্রেস্। স্ত্রীজাতির সংস্কার, উন্নতি ও স্বাধীনতার জন্য বঙ্গদেশে যত প্রবন্ধ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকা বাহির হইয়াছে, বামাবোধিনী তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়সী। বামাবোধিনীর পর "অবলা-বান্ধব" "বঙ্গ মহিলা" ও "পরিচারিকা" প্রচারিত হয়। 'অবলা-বান্ধব' সর্ব্বপ্রথমে সাময়িক-পত্রের আকারে বাহির হইত। দ্বিতীয়-প্রচারণ-কালে সাময়িক পত্র হইয়াছিল, একণে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। 'বঙ্গমহিলাও' চোরবাগান হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; বঙ্গমহিলায় স্ত্রীজাতির অভাবোপযোগী বিস্তর সন্দর্ভ দৃষ্ট হইত। একণে তাহারাও বিলোপ হইয়াছে। 'পরিচারিকা' কিছু দিন হইতে যথা নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে গ্রাহক-গণের পীড়নে বামাবোধিনীর অনিয়মিত প্রকাশন ঘটিয়াছিল; সম্প্রতি ডিমাই আকার হইতে রয়াল আকার হইয়াছে। ইহাতে অতি সহজ-ভাষায় উদ্দেশ্যানুকূল প্রস্তাব সকল লিখিত হইতেছে। যাঁহারা প্রাচীনের মর্ম্ম ও গুণ বুঝেন, "বামাবোধিনী পত্রিকা" তাঁহাদের আদরের ধন।

সাহিত্য-সংগ্রহস্য ব্যাখ্যা—শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। বেদান্তবাগীশের ন্যায় ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে হস্ত প্রসারণ করিবেন, তাহারই ঔন্নত্য বর্দ্ধিত হইবে। প্রবেশিকা-পরীক্ষার ব্যাখ্যা-পুস্তক এত কাল শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়েরই একচেটিয়া ছিল, কিন্তু এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা হইতে বিদ্যাসাগরের ঋজুপাঠ ৩য় ভাগ উঠিয়া গিয়া, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন সঙ্কলিত 'সংস্কৃত পাঠ ২য় ভাগ' ১৮৮২ সালের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে, হরিশ বাবু নিজেই এক ব্যাখ্যা-পুস্তক প্রস্তুত করেন। "মেট্রোপলিটান্ ইনষ্টিটিউশনের" সংস্কৃতের শিক্ষাদাতা নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নও এই সময়ে উক্ত সংস্কৃত পাঠের এক ব্যাখ্যা পুস্তক লিখেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে "ফাষ্ট আর্ট্স্" পরীক্ষার টীকা লিখিয়াছিলেন। আগামী ইং ১৮৮৩ সালের সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাখ্যাপুস্তক সর্ব্বাদৌ এই বেদান্তবাগীশ কর্তৃক প্রকটিত হয়। একণে আমরা নবীনচন্দ্র ও বরদাকান্ত বিদ্যারত্নেরও এক এক পুস্তক দেখিতেছি। তিনের মধ্যে সমালোচ্য গ্রন্থের গুণ ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। "দ্বীপ" শব্দের ব্যাখ্যা এতকাল দ্বয়োঃ যস্য সঃ দ্বীপঃ আপঃ এইরূপ ব্যাখ্যান হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু পণ্ডিত বেদান্তবাগীশ বর্ত্তমান ভূগোল-বেত্তাগণের মত বজায় রাখিয়া, ব্যাকরণের নিয়মলঙ্ঘন না করিয়া সুন্দর এমন ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাহাতে "চারিদিকে জল বিশিষ্ট স্থল 'দ্বীপ' বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ "আরোদ" শব্দেরও সুন্দর নূতন ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতিবাদ

অভিধান পর্য্যন্ত ও অদ্যাপি "আরোহ" শব্দের ব্যুৎপত্তিকরণে অশক্ত ছিলেন। সাহিত্য-সংগ্রহের সঙ্কলনকারী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত "তর" স্থলে তম, "তম" স্থলে তর প্রভৃতি যে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ইনি তৎসমস্ত সংশোধন করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি কারণে এই ব্যাখ্যা পুস্তক আমাদের মনোনীত হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণ এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় এবং ব্যাখ্যা ভাবান্তর উত্তম হইয়াছে।

পাগলিনী নাটক, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত, ১৲ টাকা।

প্রমদা নামে কোন রাজকুমারী ফণিভূষণ নামক মাণ্ডব্য ঋষির পোষ্যপুত্রের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হওয়ায় নানা ক্লেশ ভোগ করেন। প্রমদার পিতা চন্দ্রকান্তের অভিপ্রায় নহে যে, তাঁহারি কন্যা ফণিভূষণের সহধর্ম্মিণী হয়। অবশেষে কিন্তু ফণীরই সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদিত হয়। এই বিবাহ-সময়ে আশ্চর্য্য-রূপে প্রকাশিত হইল, ফণিভূষণ এক জন রাজপুত্র।

রাজ-দরবারে যখন ফণিভূষণ ধৃত হইয়া আইসে, তখন তাহার মুখ দিয়া ভাবী শ্বশুর চন্দ্রকান্তের সম্মুখে যে যে কথা বাহির হইয়াছে, তৎসমস্ত অসঙ্গত ও অনৈসর্গিক। তাহা বাদে গ্রন্থের অন্যত্র কুত্রাপি বড় ত্রুটি দেখা যায় না। প্রকাশক বিজ্ঞাপনে জানাইতেছেন, ইহা ঐতিহাসিক নাটক নহে। অথচ চন্দ্রকান্ত কোকনদের রাজা, অমর-নগরীপুরের রাজা, ইত্যাদি কল্পিত ও প্রকৃত দেশ ও ব্যক্তির নাম একত্র সমাবিষ্ট হওয়ায়, নাটকের দোষ ঘটিয়াছে ও বর্ণিত বিষয়েরও জটিলতা হইয়াছে। ফলে সচরাচর যেরূপ অপাঠ্য নাটক জন্মিতেছে, ইহা কোন মতেই সে জাতীয় নহে। করুণ ও হাস্যাদি রস গ্রন্থের অঙ্গীরস এবং স্থায়ী ভাব প্রণয়।

প্রমদা বিমল-প্রেমোন্মত্ততায় অনেকাংশে "পাগলিনীই" বটে। তাহার বালবিধবা সখী মনোরমা মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা এবং দয়া। নায়ক ফণিভূষণও একজন বীর-ভাবের ভাবুক।

আদি ও মধ্য-যুগের ন্যায় স্বয়ংবরা বা পতিংবরার ভাব আজ কাল প্রায়ই প্রত্যেক নাটক ও নবেলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই স্বয়ম্বরা বা পতিম্বরার প্রকৃতি সহিত কোর্টশিপের (Courtship) বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। বঙ্গে অতি সত্বরেই যে মধ্যযুগের গান্ধর্ব্বাদি বৈবাহিকী ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার বলবৎ প্রমাণ এই সকল গ্রন্থের বর্ণিত প্রণয় প্রবণতা। প্রণয়ের প্রকৃতিই এই যে, তাহা জাতি, বা কিছু নিরপেক্ষ হইয়া এই রূপে উদ্দাম গতি ও দুর্দ্দম ভাবে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় দিক বিদিক না মানিয়া কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া প্রেমের অভিমুখীন হয়। প্রণয় ক্রমেই বৃদ্ধ পাকে।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত * ১মকাণ্ড।

মহোদয় টড্ সাহেব বিপুল অর্থব্যয়, দুঃসহ পরিশ্রম এবং অনবরত চেষ্টা করিয়া রাজস্থানের ঘটনাবলি ও বীরাখ্যায়িকা প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম ও অনুসন্ধিৎসার বিষয় মনে করিলেও, আশ্চর্য্য হইতে হয়। যখন আবার ভাবি, তিনি এই উদ্যোগ, অর্থব্যয় ও চেষ্টা কোন বিদূর বিদেশের জন্য করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে এক জন মহালোক বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। তিনি এই রাজস্থানের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলন-মানসে কি রণভূমি, কি রাজপ্রাসাদ, কি হিংস্রজন্তুপূর্ণ ভীষণ অরণ্যানী, কি বিস্তারিত মরুভূমি, আবশ্যকমতে সর্ব্বস্থানেই বিচরণ করিয়া অতীত-আর্য্যবীরগণের কীর্ত্তিকলাপ সমুদ্ধার করিয়াছেন। এজন্য কত স্থানে কত বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এক এক সময়ে সমস্ত দিন অনাহারে, অনিদ্রায় ও কঠোর পরিশ্রমে পীড়িত হইয়াও, মুহূর্ত্তের জন্য কর্ত্তব্য-কার্য্যে বিমুখ হন নাই। তিনি ইহার জন্য শরীরপাত করিয়াছিলেন। সেই উদ্যোগের ফল—রাজস্থানের ইতিবৃত্ত। ইহা আমাদিগেরই দেশের বিবরণ। যাহা আমাদিগের করা উচিত ছিল, তাহা এক জন বিদেশীয় করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এত দূর অপদার্থ যে, তাঁহার সেই কার্য্যের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাতও করি না। নিজের সামর্থ্য ও যত্ন নাই, অথচ অন্যের যত্ন ও সামর্থ্যপ্রসূত আত্মদ্রব্যের প্রতি চাহিয়াও দেখি না। এই রাজস্থানের ইতিবৃত্ত যাহাতে আমাদের মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহা কি এক্ষণে একান্ত প্রার্থনীয় নহে? আমাদিগের স্বদেশীয় একটী বীরজাতির বিবরণ যাহাতে আমরা সবিশেষ জানিতে পারি, তাহা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে? যদি বিদেশীয় বীরজাতির ইতিবৃত্ত-পাঠে কোন ফল থাকে, তবে সেই ফল যে স্বদেশীয় বীরজাতির ইতিবৃত্ত-পাঠে দ্বিগুণতর হইবে, তাহার আর সংশয় কি? সাধারণ-জনগণ-মধ্যে রাজস্থানের ইতিবৃত্ত প্রচার করিতে হইলে, টড্-প্রণীত রাজস্থানের বিবরণের পরিপাটী অনুবাদ প্রকাশ করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কর্ত্তব্যানুরোধে, পূর্ব্বে দুই এক বার উদ্যোগও হইয়াছিল, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, সে সকল উদ্যোগ বিফল হইয়াছে।

এতদিনের পর রাজস্থানের ইতিবৃত্তের এক খানি সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বঙ্গানুবাদ হইতেছে দেখিয়া, যারপর নাই প্রীত হইলাম। ইহার যতটুকু বিশেষ অভিনিবেশ ও সতর্কতার সহিত অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহাতে আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, যথাকালে ও যথানিয়মে যদি ইহা সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমাদের একটী মহান্ অভাব বিদূরিত হইবে।

* মহাত্মা কর্ণেল টড্-প্রণীত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলিত। কলিকাতা, শোভাবাজার ৯৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট্ শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয় হইতে শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইহাতে যে—কেন আমাদের এত আশার উদয় হইতেছে, তাহার যাথার্থ্য নিম্নলিখিত দুইটী কারণ দেখিলেই, সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে :—

প্রথমত—শোভাবাজারের বিখ্যাত বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র ইহার প্রকাশক। বরদা বাবুর নাম শ্রবণ করিলেই, স্বর্গীয় মহাত্মা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের প্রসিদ্ধ মহাকোষ শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় সংস্করণ মনে পড়ে। রাধাকান্ত দেবের বহুবিধ চেষ্টার ফল ও পরম যত্নের রত্ন এই মহামূল্য অভিধান ক্রমে ক্রমে লয় পাইবার উপক্রম হইতেছিল, কিন্তু বরদা বাবু বিস্তর অর্থব্যয় এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া জগতের উপকার সাধন করিয়াছেন, বলিতে পারা যায়। যাঁহা দ্বারা সেরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, রাজস্থানের ইতিবৃত্ত তাঁহার উদ্যমে সম্পূর্ণাবয়ব হইয়া যে প্রচারিত হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই। তিনি ইহার বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন—"রাজস্থানের প্রথম-সংস্করণের লভ্যাংশ সাধারণের কোন বিশেষ-উপকার-সাধনার্থ ব্যয়িত হইবে।" ইহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতেছে; কিন্তু তিনি যদি তাঁহার হিতৈষণার বিষয় স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বলিতেন, তাহা হইলে বড় ভাল হইত। যাহা হউক, সত্য হইলে, তিনি যে এ মহদুদ্দেশ্য সাধন করিবেন, তাহা আমরা একান্ত আশা করিতেছি। দেশের একটী অনন্ত কীর্ত্তি রহিয়া যায়, অথচ স্বজাতির কোন না কোন মহোপকার সাধিত হয়, ইহাতে আনুকূল্য দান করিতে বোধ হয়, কোন স্বদেশহিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তিই উদাসীন থাকিবেন না।

দ্বিতীয়ত—ইহার সঙ্কলনে সঙ্কলয়িতার অনেক পাণ্ডিত্য ও প্রচুর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি টড্ প্রণীত রাজস্থানের কেবল অনুবাদ করিতেছেন না। টড্ সাহেব যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসা-সহকারে রাজপুতজাতির উৎপত্তি-নির্ণয় করিয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রধান প্রধান জাতির সহিত তাঁহাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, সংস্কৃত-শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার না থাকাতে, অনেক স্থলে তাহা অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে পুরাণোক্ত ঘটনাবলির সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য ও নানা-ভ্রম-প্রমাদাদিও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সমালোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা সে সকল ভ্রম সংশোধন এবং অসম্পূর্ণতা নিরাকরণ করিয়া, গ্রন্থকে সম্পূর্ণরূপে বিশদ করিয়া দিতেছেন। প্রমাণস্বরূপ প্রসিদ্ধ পুরাণাবলি হইতে প্রায়ই সংস্কৃত শ্লোক টীকায় প্রকটিত হইতেছে। এই সকল মহামূল্য টীকা দ্বারা টডের "রাজপুত-জাতির ইতিবৃত্তে" নব জীবন প্রদত্ত হইতেছে। এবং রাজস্থানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আর এক

নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার রচনা সাধারণত প্রাঞ্জল ও তেজস্বিনী। যেরূপ প্রকরণে গুরুতর বিষয় সকল লিখিতে হয়, তদনুসারেই লিখিত হইতেছে। তাঁহারা উভয়ে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যেন অক্ষত-শরীর থাকিয়া সুচারুরূপে তাহার উদ্‌যাপন করিতে সক্ষম হন। পরিশেষে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় এই পবিত্র 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' প্রতি গৃহে এক এক খানি রক্ষা করেন।

আচার্য্য (মাসিক-প্রবন্ধ-পত্র) ১ম খণ্ড—১ হইতে ৮ সংখ্যা। পত্রিকার নাম-করণ আমাদের মতে প্রগল্‌ভতা-পরিচায়ক। 'পরিচয়ে' আচার্য্য শব্দের যে ব্যাখ্যান দেওয়া হউক, আচার্য্য শব্দের সাধারণ অর্থ শিক্ষক। পত্রের নামকরণ সেই জন্যই আমাদের বিবেচনায় সমীচীন হয় নাই। "মনুসংহিতা ও তৎসমালোচনা" "জাতি-পরিণাম ও ডার্ব্বিন (ডারউইন্) সাহেব" "বৌদ্ধদর্শন" প্রভৃতি প্রস্তাবগুলি কোন না কোন উচ্চ শ্রেণীর বঙ্গীয়-সাময়িক-পত্রিকায় ভঙ্গী-বিশেষে বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু আচার্য্যের লেখকগণ স্বাধীন-ভাবে ও নিজ-চেষ্টায় তাহাতে নূতনত্ব দেখাইতেছেন। 'শব্দ-রহস্য' সন্দর্ভটী সাধারণত ভালই হইতেছে। 'দ্বিরেফ' শব্দের বুৎপত্তি ঠিক্ হয় নাই। ভ্রমরের নাম দ্বিরেফ কেন? না, ভ্রমর শব্দে দুইটী 'র'কার আছে। 'দ্বিরেফ'-পদে কবিত্বের চক্ষে দেখিবার কিছুই নাই, প্রত্যুত তাহাতে নৈয়ায়িকের দৃষ্টি জাজ্বল্যমান।

মনুসংহিতা ও তৎ-সমালোচনের প্রারম্ভ বিলক্ষণ আড়ম্বর-ময়। অপরিপক্ক কয়েকটী মতও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। যথা—(১) আর্য্যগণের ইতিহাসের সত্তা। —(২) মনুসংহিতায় বেদের অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল মত দৃষ্ট হয় না।—(৩) নাট্যালয়-সম্বন্ধে উগ্র মত;—ইত্যাদি।

অনেক ভারতীয়, অন্ধ-দেশহিতৈষিতায় মুগ্ধ হইয়া প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন—আর্য্যগণের ইতিহাস ছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার "On the Study of Indian History" নামক প্রস্তাবে ঐ মত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার মত ও তাঁহার বর্ণিত ঘটনা সত্য নহে। তিনি বলেন, ইতিহাস পূর্ব্বকালে রাজগণের কর্তৃত্বাধীনে থাকিত এবং দুর্গোপরি "নীলপীঠ" নামক গুপ্ত-স্থানে রক্ষিত হইত। রাজগণ কোন-যুদ্ধে অন্য রাজা কর্তৃক পরাজিত হইলে, ধন-সম্পত্তির সঙ্গে উক্ত গ্রন্থও লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হইত। বর্ণনাটী শুনিতে প্রীতিকর বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সুরেন্দ্র বাবু কোথায় এই ঘটনা পাইলেন? এ সম্বন্ধে "সহচর"-সম্পাদক এক সার কথা বলিয়াছিলেন যে,—অপকৃষ্ট 'গোপালচম্পূ' প্রভৃতি গ্রন্থ সাগ্রহে রক্ষিত হইয়াছে, আর কেবল

ইতিহাসগুলিই নির্ব্বাচন করিয়া নষ্ট করা হইয়াছে? ভাল, স্বতন্ত্র রাজা না হয়, বৈরিতা-সাধনার্থে ইতিহাস নষ্ট করিতেন। কাপিল সূত্র যখন আস্তিক-সমাজে কুঠারাঘাত করিতে লাগিল, তখন ত আস্তিকেরা মনে করিলেই, তাহার ধ্বংস করিতে পারিতেন। যখন অন্তর্বিচ্ছেদে তাৎকালিক-সমাজে নাস্তিক গ্রন্থ অচল ও অটল-ভাবে যত্নে রক্ষিত হইয়াছে, তখন যাহা দেশের ভক্তি ও আদরের বস্তু, যাহা দেশের মুখোজ্জ্বল পদার্থ, তাহা সমূলে দেশ হইতে কিরূপে উৎপাটিত হইতে পারে?

ঋগ্বেদের ১ম ও ৯ম মণ্ডলে বর্ণিত ক্ষত্রিয়বর্ণ কাক্ষীবৎ রাজা যজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। মনু কিন্তু ইহার বিপরীত ব্যবস্থা দেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের উক্ত ক্রিয়ায় অধিকার দেন নাই। মনু বেদবিরোধী কি না, এতৎসম্বন্ধে আর্য্যদর্শন ১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যায় "বেদের ইতিবৃত্ত ও প্রকৃতি" প্রস্তাব দেখিলেই, ভ্রান্তি অপনোদিত হইবে।

রঙ্গভূমি-সম্বন্ধে স্বতন্ত্র-ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কেন না, রঙ্গভূমির ভদ্রাভদ্র-অবস্থার উপরে দেশের ভদ্রাভদ্র অবস্থা নির্ভর করিতেছে; সুতরাং বিষয়টী যার পর নাই গুরুতম।

মফঃস্বলের মুদ্রাঙ্কণ কেবল সংবাদ-পত্রের পক্ষে মার্জ্জনীয়। সংবাদ-পত্রের মধ্যে 'সোমপ্রকাশ' 'সাধারণী' 'এডুকেশন্ গেজেট' 'ভারতমিহির' ও 'চারুবার্ত্তা' এবং সাময়িক-পত্রের মধ্যে 'বান্ধবের' মুদ্রাকার্য্য সুন্দর। মুদ্রণের উন্নতি করিলে, 'আচার্য্য' ভদ্র-সমাজের আদরণীয় হইবে। আমরা নাতি-তীব্র ও নাতি-মৃদু সমালোচন করিয়াও দেখিতেছি—'আচার্য্যে' স্বাধীন-মত-প্রসূত, সারগর্ভ অনেক বিষয় প্রকটিত হইতেছে। মফঃস্বলে এরূপ পত্র স্থায়ী হইলেই, সুখের বিষয়।

স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী।

'স্বায়ত্ত শাসন' এই কথা শুনিলে, বোধ হয়, অনেকের মনেই এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উদিত হইবে। আজ এক শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল, আমরা ইংরাজ-জাতির অধীনে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মশাসনে বঞ্চিত হইয়াছি। অনেকের সংস্কার আছে যে, আমরা মুসলমান রাজত্বের কাল হইতে আত্মশাসনাধিকার-চ্যুত হইয়াছি; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। মুসলমানের রাজত্ব ভারতের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয় নাই। দিল্লীতে মুসলমান সম্রাট্ ছিলেন সত্য, নানা প্রদেশে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের তাদৃশী কেন্দ্রীকরণী শক্তি বা কেন্দ্রীকরণের তাদৃশ ইচ্ছাই ছিল না। যাহাকে ইংরাজীতে সেণ্ট্রালিজেশন বলে, তাহাকেই আমরা বাঙ্গালায় কেন্দ্রীকরণ বলিলাম। যাহাতে সমস্ত শাসনরজ্জু মধ্যস্থ এক পুরুষের হস্তে রক্ষিত হয়, তাহাকেই আমরা কেন্দ্রীকরণী শাসন-প্রণালী বলি। ভারতের এখনকার এই মধ্যস্থ পুরুষ ষ্টেট্ সেক্রেটারী। ইনি বিলাতে থাকিয়াও এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-রজ্জু-সকল স্ব-করে সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না বটে, কিন্তু প্রণালীগত পরিবর্ত্তন ও যুদ্ধবিগ্রহাদি সমস্তই তাঁহার অনুমতি-সাপেক্ষ। ভারতের গবর্ণর-জেনেরেল ভারতের মঙ্গলের জন্য কোন কর স্থাপনা করিতে গেলেন, তাহাতে ম্যান্‌চেষ্টারের ক্ষতি হয় দেখিয়া ষ্টেট্ সেক্রেটারী অমনি তাহাতে ভিটো দিয়া বসিলেন। যেখানেই ইংলণ্ডের স্বার্থের সহিত ভারতের স্বার্থসংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই খানেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া ইংলিশ-স্বার্থরক্ষা করেন। ভারতের আভ্যন্তরীণ সকল-বিষয়ের প্রভুশক্তির কেন্দ্র ভারতের গবর্ণর-জেনেরেল। তিনি একা সব কাজ করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া গবর্ণর, লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, কমিশনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি দ্বারা সেই সমস্ত কাজ করাইয়া লন। কিন্তু সেই সকল কার্য্যের দোষ-গুণাদি-বিচার ও প্রণালীগত পরিবর্ত্তনাদি রূপ প্রকৃত শাসনসূত্র নিজের হস্তে রাখেন। এই কেন্দ্রীকরণী শক্তি ইংরাজদিগের হস্তে যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছে, আর কোন জাতির হস্তে সেরূপ হয় নাই।

মুসলমানদিগের সময়ে প্রত্যেক জমিদার এক একটী ক্ষুদ্র করদ রাজা ছিলেন। তাঁহার দেয় কর দিয়া তিনি অন্যান্য

আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়েই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। নিজ প্রজাগণের উপরে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। তিনি তাহাদিগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দিবার তাঁহার অধিকার ছিল। ইংরেজদিগের রাজত্বকালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, নাটোর, পুঁটিয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের এই অধিকার ছিল। এক এক জনের অধীনে দুই একটী করিয়া জেলা ছিল। সেই সমস্ত প্রদেশের দাওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। নবাব এই সকল কর আদায় করিয়া দিল্লীর দরবারে পাঠাইতেন মাত্র। জমিদারেরা শুদ্ধ কর দিতেন, এরূপ নহে; প্রয়োজন হইলে, নবাব ও সম্রাট্‌কে সৈন্য দিয়াও সাহায্য করিতেন। এই প্রণালীর সহিত ইউরোপীয় অতীত সামন্ত-তান্ত্রিক প্রণালীর (Feudal System) অনেক সাদৃশ্য আছে। সামন্ত-তন্ত্রে যেমন সামন্তেরা (Barons) দুর্গ নির্ম্মাণ ও স্থায়ী সেনা রাখিতে পারিতেন, জমিদারগণও সেইরূপ পারিতেন। প্রাচীন জমিদারগণের পরিখা-প্রাকার-পরিবেষ্টিত পুরী সকল আজও কিয়ৎ পরিমাণে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই সময়ে শুদ্ধ যে জমিদারগণই আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে স্বাধীন ছিলেন এরূপ নহে। প্রজারাও আপন আপন গ্রামে আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। পঞ্চায়ত প্রণালী তাহার নিদর্শন। গ্রামের পঞ্চায়তগণ গ্রামের দাওয়ানী ও ফৌজদারী সমস্ত মকদ্দমাই নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। কেবল যে সকল সাঙিন্ ফৌজদারী মকদ্দমায় তাঁহাদিগের অধিকার নাই, তাহাই রাজদরবারে যাইত গ্রামের চৌকিদার পুলিসের কাজ করিত, এবং সতত পঞ্চায়তের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিত। চৌকিদারের বেতন রাজাকে চৌকিদারী আইন জারী করিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিতে হইত না। প্রজারা পঞ্চায়তের হুকুমে আপন হইতে তাহা প্রদান করিত। রাজাকে গ্রামের রাস্তাঘাট ও বিদ্যালয়াদির জন্য পথকর ও শিক্ষাকর প্রভৃতি নির্দ্ধারিত করিয়া রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও বিদ্যালয়াদি সংস্থাপন করিতে হইত না। গ্রামের লোকেই আপনা হইতে আপন আপন অবস্থানুসারে এই সকল কার্য্যের জন্য কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিতেন। তাহাতেই এই সকল বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটী পল্লীসমাজ এক একটী ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র-স্বরূপ ছিল। এক্ষণে লর্ড রিপণ যে যে বিষয় স্থানীয় বোর্ডের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, পল্লীসমাজ তাহা অপেক্ষাও অনেক বিষয় আপনাদিগের আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন। সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সমস্ত মুসলমান সাম্রাজ্যকালে অতি অল্প

সংখ্যক দায়াধিকার-বিষয়ক মকদ্দমাই মুসলমান দাওয়ানী আদালতে রুজু হইয়াছিল। তাহার একমাত্র কারণ এই পল্লীসমাজ।

এই পল্লীসমাজ বিকেন্দ্রীকরণ-প্রণালীর চরম নিদর্শন। যাহাকে ইংরাজীতে ডিসেণ্ট্রালিজেশন বলে, তাঁহাকেই আমরা বিকেন্দ্রীকরণ-প্রণালী বলিলাম। রাজ্যের অংশ সকলকে কেন্দ্রস্থ প্রভু-শক্তির অধীনতা হইতে বিচ্যুত করাকে বিকেন্দ্রীকরণ-প্রণালী কহে। ভারতের প্রতি পল্লী কেন্দ্র-চ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল।

ভারতীয়-পল্লী-সমাজের সহিত রুসীয় নাগরিক সমাজের উৎকৃষ্ট তুলনা হইতে পারে। রুসিয়ার প্রত্যেক মিউনিসি-পালিটীকে এক একটী নাগরিক সমাজ বলিয়া উল্লেখ করিলাম। প্রত্যেক রুসীয় মিউনিসিপালিটী আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়েই সম্রাট হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সম্রাট্ দুর্দ্দান্ত হউন, সাধু হউন্, মিউনিসিপালিটীর তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। মিউনিসিপালিটীর সঙ্গে সম্রাটের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই তাঁহারা আপন আপন কর ধার্য্য ও আপন আপন আইন প্রস্তুত করিয়া আপন আপন রাজত্ব চালাইয়া থাকেন। এই জনাই রুসীয় সম্রাটগণের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে না। এই জনাই ভারতে মুসলমান-সাম্রাজ্যকালে দুর্ব্বিষহ অত্যাচার সত্ত্বেও প্রজাবিপ্লব ঘটে নাই। অধীনতার মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা সহ্য করে নাই বলিয়াই, প্রজারা প্রশান্তভাবে ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে পল্লীস্বাতন্ত্র্য কোথায়? প্রচণ্ড ইংরাজ কেন্দ্রীকরণ শক্তির নিকটে সে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে পঞ্চায়ত নাই, সে পল্লীসমাজ নাই। মুসলমান রাজত্বের ছয় সাত শতাব্দীতে যাহা অটুট ছিল, ইংরাজ রাজত্বের এক শত বৎসরে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এখন নূতন পঞ্চায়ত গঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু সে বিড়ম্বনা-মাত্র। ভাঙ্গা যত সহজ, গড়া তত সহজ নহে। যে প্রাচীন সুন্দর স্বায়ত্তশাসনপ্রণালীসৌধ ভাঙ্গিয়া ইংরাজ চুরমার করিয়াছেন, আজ তিনি তাহা গড়িতে বসিয়াছেন। মনুর সময়ের পূর্ব্ব হইতেও যে ভারতে স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, আজ কোন কোন ইংরাজ সেই ভারতের অধিবাসিবৃন্দকে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালীর সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ইহার কারণ, তাঁহাদিগের ভারতের পুরাবৃত্তে পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে কোন প্রভুশক্তি ভারতে সর্ব্বাঙ্গীন আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। হিন্দু-রাজত্বকালেও কোন হিন্দু সম্রাট ভারতের সর্ব্বত্র চিরস্থায়িনী প্রভুতা সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার লক্ষ্যও তাহা ছিল না। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বীয় বলবীর্য্যে ভারতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী

নাই—সকল ক্ষুদ্র রাজার মুখ দিয়া এই কথা বাহির করিয়া লইবার জন্যই তিনি দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন; পরাজিত রাজা সকলে চিরস্থায়িনী প্রভুতা সংস্থাপন করিবার জন্য নহে। যে যে ক্ষুদ্র রাজা বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সেই সেই রাজাকে স্ব স্ব স্থানে অবিচলিত রাখিতেন। যাঁহারা প্রতিকূলাচরণ করিতেন, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের সিংহাসনে অপর লোককে বসাইতেন। সে রাজ্য অটুট থাকিত, রাজা পরিবর্ত্তিত হইতেন মাত্র। অনেক সময় সম্রাট্ অশ্বমেধীয় ঘোটক পাঠাইয়াই, নিজের প্রতাপ পরীক্ষা করিতেন। সেই ঘোটকের কপালে জয়-পতাকা বাঁধা থাকিত। যদি কেহ সেই ঘোটক ধরিত,তাহা হইলেই তাহার সহিত যুদ্ধ হইত। ঘোটকের ললাটে এই স্পর্দ্ধার কথা লেখা থাকিত যে, অমুক সম্রাট্ এই দিগ্বিজয়ী ঘোটক ছাড়িয়া দিয়াছেন। যদি পৃথিবীতে কেহ সংগ্রামে তাঁহার সমকক্ষ থাকেন, ত এই অশ্ব ধরুন। যদি কেহ সাহস করিয়া সেই ঘোটক না ধরিত, তাহা হইলেই তিনি সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। যদি কেহ ধরিতেন, সংগ্রামে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই, তিনি সম্রাট্ বলিয়া অভিহিত হইতেন। এইরূপে কত শত সম্রাট্ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে কত কত রাজ্যের রাজা পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, তথাপি পল্লীসমাজের স্বাতন্ত্র্যের কোন ব্যাঘাত সংঘটিত হয় নাই। সে সকল ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রগুলি নিবিষ্ট-চিত্তে আপন আপন আভ্যন্তরীণ-উন্নতিসাধনে নিমগ্ন থাকিত। মাথার উপর দিয়া কত মেঘ চলিয়া গিয়াছে, অথচ সে গুলির গাত্র স্পর্শ করে নাই। যে পল্লীসমাজ-রূপ স্তম্ভ-শ্রেণীর উপরে ভারত-সম্রাজ্যের ছাদ সংন্যস্ত ছিল, হিন্দু মুসলমান উভয়-রাজত্ব-কালেই সে স্তম্ভ-শ্রেণীর উপরে হাত পড়ে নাই। সে পাকা গাঁথনী ভাঙ্গিবার কাহারও সাধও হয় নাই। এই জন্যে এত বার ছাদ পরিবর্ত্তিত হওয়াতেও, ভারত-সাম্রাজ্য-সৌধের দৃঢ়তা বা সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয় নাই। পরিবর্ত্তনে প্রজাবৃন্দের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, পালবংশ, পাঠানবংশ, মোগলবংশ প্রভৃতি কত রাজবংশ অভ্যুদিত হইয়া কালে অস্তমিত হইয়াছে। এইরূপে ভারত-সাম্রাজ্য-সৌধের কত বার ছাদ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সে সৌধের পল্লীসমাজ-রূপ স্তম্ভ-শ্রেণী বরাবর একই ভাবে চলিয়া আসিতে-ছিল; এমন সময়ে সে প্রকাণ্ড সৌধ ইংরাজের হাতে পড়িল। প্রতাপান্বিত ইংরাজের চক্ষে পল্লীসমাজ শূল-স্বরূপ হইয়া উঠিল। তিনি সে সুন্দর ও সুদৃঢ় স্তম্ভরাজি একটী একটী করিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং পাছে সে প্রকাণ্ড ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই ভয়ে

চাড়া দিয়া তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন। আজ এক শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক ভারত-সাম্রাজ্য-সৌধের প্রকাণ্ড ছাদ এই চাড়ার উপরে রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে,ইংরাজ সাভিস্ই সেই চাড়া। একশত বৎসরের পর, আজ বিজ্ঞ রিপণ বুঝিয়াছেন—এরূপ ক্ষীণ চাড়ার উপরে এরূপ প্রকাণ্ড ছাদ বেশী দিন থাকিতে পারে না। তাই আজ তিনি ভারতবাসী-দিগকে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী দিতে উদ্যত হইয়াছেন। যে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ স্বাধীনতা ইংরাজজাতি ভারতবাসীর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, আজ মহামতি লর্ড রিপণ তাহার কিয়দংশ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাই আজ তিনি প্রতি জেলায় এক একটী প্রাদেশিক সমিতি নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু এই নগর-সমাজ-গুলিকে পল্লীসমাজের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করা আপাততঃ লর্ড রিপণের অভিপ্রায় নয়। পল্লীসমাজের যেমন সকল-বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য ছিল, এই নগর-সমাজ-গুলির সেরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। আপাততঃ এই নগর-সমাজের হস্তে অতি সামান্য ভারই অর্পিত হইতেছে। রথ্যাকর, পূর্ত্তকর লইয়া ইঁহারা রাস্তা ঘাট ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইতে পারিবেন, এবং ডিস্পেন্সেরী, হাঁসপাতাল ও বিদ্যালয়াদির পরিদর্শন ও আয়-ব্যয়াদির সংরক্ষণ করিতে পারিবেন। পল্লীসমাজ যে সকল অধিকার ভোগ করিয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় ইহা যৎসামান্য মাত্র। অথাপি অনেক ইংরাজ বলিতেছেন, দেশীয়েরা অধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, যখন লর্ড রিপণ সে সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া প্রাদেশিক সমাজ সকল সংস্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন কি উপায়ে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে হইবে।

এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রধান উপায় উপযুক্ত সভ্য নির্ব্বাচন। ইহা অতি দুরূহ ব্যাপার। পল্লীসমাজ যখন পূর্ণাবয়ব ছিল, তখন সভ্য-নির্ব্বাচন করা তত দুরূহ ব্যাপার ছিল না। তখন প্রতি গ্রামে গ্রামে আত্ম-ভার-বহন-ক্ষম অনেক লোক পাওয়া যাইত। তখন নিজের খাওয়া দাওয়া ও পরিবার প্রতিপালন করা ভিন্ন মানুষের জীবনের মহত্তর লক্ষ্য আছে, ইহা ভাবিবার লোক প্রতি গ্রামেই পাওয়া যাইত। তখন গ্রামের মণ্ডলেরা নিজ নিজ পারিবারিক ও বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন করিয়া, দিবসের কিয়দংশ গ্রাম্য-বিষয়ে অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তখন পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ লোক খুঁজিলে, প্রতি গ্রামেই দুই একটী করিয়া পাওয়া যাইত। তখন নিজস্বার্থ পরস্বার্থের জন্য বলি দিতে পারেন, এরূপ লোক ভারতে অলীক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু সে সৌভাগ্যের দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। ভারতের সুখসূর্য্যের সঙ্গে

সে সকল শুভকমল নিমীলিত হইয়াছে। যাহা গিয়াছে, তাহার আন্দোলন ভাল, কিন্তু তাহার অনুশোচনা বৃথা। সুতরাং যাহা গিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া কি হইতে পারে, আমরা তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ইংরাজেরা আপনাদিগের ভুল বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটী বা নাগরিক সমাজ ও আধুনিক গ্রাম্য পঞ্চায়ত তাহার নিদর্শন; কিন্তু এই দুইটাই পুরা-প্রচলিত স্বায়ত্ত শাসন-প্রণালীর ছায়ামাত্র। নাগরিক বিষয় ভিন্ন প্রাদেশিক-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার মিউনিসিপালিটীর নাই। তাহার উপরে আবার অতি অল্প-স্থানেই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা জাতি-গত অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার প্রাচীন পঞ্চায়ত-স্থলে অধুনা যে নব পঞ্চায়ত প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এ অভাব পূরণ হইতে পারে না। প্রতি গ্রামে যে পঞ্চায়ত নব প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা গ্রামের মণ্ডল-বহুল নহে। যাঁহাদিগকে গ্রামের সকলেই প্রধান বলিয়া জানে, তাহাদের হাতে নির্ব্বাচন না থাকায়, সে সকল লোক ইহাতে বড় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। পুলিশ সর্ব্বেসর্ব্বা। নির্ব্বাচন কার্য্য প্রায় পুলিশ দ্বারাই হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল অভিসন্ধি-বিশিষ্ট লোক স্বার্থ-সাধনের জন্য পুলিশের সঙ্গে হৃদ্যতা রাখে, তাহারাই প্রায় নির্ব্বাচিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান পঞ্চায়ত—প্রধানত্বের পরিচায়ক নহে। কোন কোন স্থানে এরূপও ঘটে যে, সম্ভ্রান্ত লোকের উপরে এই কাজের ভার দিতে চাহিলেও তাঁহারা লইতে চান না। ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, ইহাঁদিগের উপরে যে কার্য্যভার ন্যস্ত হয়, তাহা অতি সামান্য, ও সামান্যলোকের সাধ্য; সুতরাং এ কাজে অর্থের আশাও নাই, মান সম্ভ্রমেরও আশা নাই। সুতরাং সম্ভ্রান্ত লোকে কিসের আশায় ইহাতে স্বীকৃত হইবে? তদ্ভিন্ন আর একটী প্রধান অসুবিধা এই যে, চৌকিদারেরা কথায় কথায় তাঁহাদিগকে আদালতে হাজির করিয়া থাকে। ইহা মানী লোকে অতিশয় অবমান মনে করিয়া থাকেন। এই জন্য ইঁহারা নিজে ইহাতে কিছুতেই প্রবিষ্ট হইতে চাহেন না। ঘটনাক্রমে যদি দুই একজন প্রবিষ্ট হন, তাঁহারা বাহির হইবার জন্য আকুলিত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান পঞ্চায়ত-গুলিকে আমরা অধুনা-প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালীর ভিত্তি-স্বরূপ করিয়া লইতে পারি না। এক্ষণে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমাদের মতামত নিম্নে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

সেন্‌সস্ সেডিউল বা লোক-গণনা বহি দেখিলে জানা যাইবে, কোন্ গ্রামে কত

লোকের বসতি। লোক-সংখ্যা অনুসারে প্রতি গ্রামের নির্ব্বাচকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। গ্রামের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, লিখন-পঠন-সমর্থ অধিবাসীকেই এই নির্ব্বাচক মনোনীত করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। প্রতিগ্রামে এক একটা ফুটো বাক্স চাবী দিয়া চৌকিদার হস্তে প্রেরণ করিতে হইবে। চৌকিদার ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা করিবে যে অমুক ২ দিনের মধ্যে গ্রামের প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক ও লিখন-পঠন-সমর্থ অধিবাসীকে তাঁহার নাম ও তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি নির্ব্বাচকের নাম লিখিয়া সেই বাক্সে ফেলিয়া দিতে হইবে। সেই সময়ের মধ্যে যাঁহারা নাম লিখিয়া না দিবেন, তাঁহারা সেবারকার মত নির্ব্বাচক মনোনীত করণের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবেন। এইরূপে সংগৃহীত টিকিটের অধিকাংশে যাঁহার নাম পরিদৃষ্ট হইবে, তিনিই সেই গ্রামের নির্ব্বাচক বলিয়া গৃহীত হইবেন। যে গ্রামে অধিক লোকের বসতি, সে গ্রামের চৌকিদারের সংখ্যানুসারে নির্ব্বাচকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিলেও চলিবে। ভোটের সংখ্যানুসারে পর পর ধরিয়া অতিরিক্ত নির্ব্বাচক মনোনীত করিলেই ঠিক হইবে। অথবা যদি পল্লী বিভাগ স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রতি পল্লীর লোক সংখ্যানুসারে এক এক বা ততোধিক ব্যক্তি নির্ব্বাচক মনোনীত হইতে পারেন। নির্ব্বাচক-মনোনীত-করণে সম্পত্তির প্রভুতা থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে যোগ্যতার অবমাননা করা হয়। কারণ, গ্রামে এমন লোক থাকিতে পারেন, যিনি সম্পত্তিশালী নহেন, অথচ গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য বলিয়া মনে করেন। এরূপ লোক বাদ পড়িলে, ইষ্ট-নাশের বিশেষ সম্ভাবনা।

আপাতত প্রতি জেলার রাজধানীতে একটী করিয়া সাময়িক শাসন-সমিতি নিযুক্ত করিতে হইবে। এই সাময়িক-শাসন সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের ভার, ম্যাজিষ্ট্রেট বা মিউনিসিপাল কমিশনরগণের হস্তে দিলে চলিবে। এই সাময়িক সমিতি স্থির করিবেন, কোন্ কোন্ থানা হইতে স্থানীয় শাসন-সমিতিতে কত গুলি করিয়া সভ্য লওয়া হইবে। প্রত্যেক গ্রামে কয় জন করিয়া নির্ব্বাচক মনোনীত হইবে, ইহাও এই সমিতি স্থির করিয়া দিবেন।

প্রতি থানার এলাকার গ্রাম্য-নির্ব্বাচকগণের নামের একটী করিয়া তালিকা থাকিবে। থানার সব্ ইন্স্পেক্টর পত্র দ্বারা সেই নির্ব্বাচকগণকে জানাইবেন যে, তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে স্ব স্ব নাম ও তাঁহারা যাঁহাকে বিভাগীয় শাসন-সমিতির সভ্য মনোনীত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া দেন। এইরূপে

সংগৃহীত কাগজে যাঁহাদিগের অনুকূলে অধিক ভোট উঠিবে, তাঁহারাই বিভাগীয় শাসন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। নাগরিক-নির্ব্বাচন-প্রণালীটীও গ্রাম্য নির্ব্বাচন-প্রণালীর ন্যায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমস্ত নগরবাসী যে সকল নাগরিক নির্ব্বাচক নিযুক্ত করিবেন, তাঁহারাই আবার বিভাগীয় শাসন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। হাকিম, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, মিউনিসিপাল কমিশনর ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলকেই মনোনীত করার অধিকার নাগরিক নির্ব্বাচকদিগের হস্তে অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে থাকিবে। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সমস্ত সভ্য-সংখ্যার এক চতুর্থাংশ মাত্র সভ্য বিভাগীয় শাসন-সমিতিতে যাইতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট দেশীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে সেই সকল প্রতিনিধি সভ্য মনোনীত করিবেন। এইরূপে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সভাগণ মিলিত হইয়া বিভাগীয় শাসনসমিতির কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি সমস্তই তাঁহারা নির্ব্বাচিত করিবেন। তাঁহারা সাধারণত আপনাদিগের মধ্য হইতেই সভাপতি প্রভৃতি মনোনীত করিবেন, কিন্তু ইচ্ছা হইলে, বাহির হইতেও উচ্চদরের লোক বাছিয়া লইতে পারিবেন। যখন ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়ার শক্তি সভাগণের হস্তে রহিল, তখন ষ্টিফেন, ওয়্যার, ক্বীন্ প্রভৃতির ন্যায় উচ্চমনা দুই এক জন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতির পদে অভিষিক্ত করায়, কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই, বরং বলোপচয়ের সম্ভাবনা। দেশের লোকের সহিত ইহাঁদিগের যেরূপ সহানুভূতি, তাহাতে যে ইহাঁরা প্রাণপণে ও একাগ্রচিত্তে দেশের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইহাঁরা তাঁহাদিগের ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন, তাঁহাদিগের আনুপূর্ব্বিক চরিত্র দেখিয়া এরূপ অনুমান হয় না। ইহাঁরা এক এক জেলায় এইরূপে স্থানীয় শাসন-সমিতি সংগঠিত করিয়া, তাহার কার্য্য সুচারুরূপে আরব্ধ করিয়া দিয়া আবার অন্য জেলায় গিয়া সেই কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, রাজসাহী, মুরশিদাবাদ, ঢাকা—এই সাতটী অগ্র-গত জেলায় এইরূপ বৈদেশিক সভাপতি মনোনীত করার আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য পশ্চাদ্বর্ত্তী জেলা সকলে এরূপ লোকপ্রিয় ও লোকহিতৈষী ইউরোপীয় সভাপতি মনোনীত হইলে, ইহারা অগ্রগত জেলা গুলির সহিত শীঘ্রই সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবে। ইহাঁদিগের হস্তাবলম্বে স্থানীয় শাসন-সমিতি সকল অচিরকাল-মধ্যে কার্য্যকরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। পশ্চাদ্বর্ত্তী

জেলা সকলে আজও জাতিগত ভাব তত পরিপুষ্ট হয় নাই। আজ সেই সকল স্থানের অধিবাসীরা যাহা অতি কষ্টে ও নিতান্ত অনিচ্ছায় করিবে, ক্রমে অভ্যাস বশতঃ দুই এক বৎসরের মধ্যে তাহা তাহারা আপনা হইতে ও মনের স্ফূর্ত্তিতে করিতে শিখিবে। সেই অভ্যাসটী বদ্ধমূল হওয়া পর্য্যন্ত এক জন মজবুৎ চালক চাই। ইংরাজের মত মজবুৎ চালক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় চালক হইলে, কাজ হইবে না, একথা আমরা বলি না। তবে দেশীয় চালক হইলে, ফল কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হইবে মাত্র। কারণ, আমাদের দেশ এখনও সর্ব্বত্র দেশীয় শাসনকর্ত্তাকে সম্পূর্ণ মানিতে শিখে নাই। আমরা দুঃখের সহিত প্রত্যক্ষ জীবনে ইহা পদে পদে দেখিতেছি। যে পদে ইংরাজ অভিষিক্ত হইলে আমরা যেরূপ সম্মান করি, সেই পদে এক জন দেশীয় লোক অভিষিক্ত হইলে,আমরা আজও সেরূপ সম্মান দিতে শিখি নাই। বৈদেশিক শাসনকর্ত্তার হুকুম তামিল করিতে আমরা যেরূপ অগ্রপদ হই, দেশীয় শাসনকর্ত্তার হুকুম তামিল করিতে সেই পরিমাণ লজ্জা বোধ করি। এই স্বভাব পতিত জাতির প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ। যত আমাদের অধীনতার ঘৃণা জন্মিবে, ততই এই ভাব সারিতে থাকিবে এবং দিন দিন কিছু কিছু সারিতেছে, তাহাও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী অনেক জেলা আছে, যেখানে এ ঘৃণা এখনও অঙ্কুরিত হয় নাই। সেই সেই জেলায় আপাতত বৈদেশিক নেতার আবশ্যকতা আছে। সেই সেই জেলায় বৈদেশিক হস্তাবলম্ব ব্যতীত লোকে শীঘ্র উঠিতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ সাহায্য যে বেশী দিন প্রয়োজন হইবে না, তাহা অখণ্ডনীয় সত্য। কিন্তু আপাতত বৈদেশিক নেতার আবশ্যকতা আছে বলিয়া,আমরা সেরূপ নেতা চাহি না। যিনি প্রভু-শক্তি পাইয়া তাহার অযথা ব্যবহার করিবেন, যিনি নিজের ইচ্ছাই বিধি বলিয়া প্রচার করিবেন; যিনি প্রতিবাদ সহিতে নিতান্ত অক্ষম; অথবা যিনি প্রতিবাদ করিলে, প্রতিবাদীর সর্ব্বনাশ করিতে কৃত-সঙ্কল্প, না! আমরা মরিব সেও ভাল, তথাপি এরূপ নেতার অধীনে থাকিতে চাই না। যিনি অহর্নিশি মাথায় অঙ্কুশ মারিবেন, আমরা এমন মাহুত চাহি না। যিনি লোকের হৃদয়ে কেবল পদাঘাত করিবেন, আমরা এমন কর্ত্তা চাই না। দেশীয়গণের প্রতি যাঁহারা নিরন্তর পাশব ব্যবহার করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা চাই না। দেশীয় রক্তে পরিপোষিত হইয়াও দেশীয় কল্যাণ ভাবিবেন না, এমন শাসনকর্ত্তা চাই না। যাহাদিগের শোণিতে পরিবর্দ্ধিত,যাঁহারা তাহাদিগের দুঃখে অশ্রুপাত করিতে জানেন না, আমরা তাঁহাদিগকে চাই না। যাহাদিগকে শাসন করিতে আসিয়াছেন, যাঁহারা তাহাদিগের সহিত মিশিতে বা

তাঁহাদিগের সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন, আমরা তাঁহাদিগকে চাই না। যাঁহারা বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া, প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান, আমরা তাঁহাদিগেকে চাই না। যাঁহারা দেশীয়গণকে অসভ্য, নিগ্রো বা সেবাদাস বলিয়া ঘৃণা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে চাই না। আমরা সহস্র যুগ পড়িয়া থাকিব, বুকে হামাগুড়ি দিয়া সহস্র বৎসরে উঠিব, তবু এরূপ শাসনকর্ত্তা চাই না। কিন্তু যাঁহারা আমাদিগের হিতের জন্য স্বজাতিকে চটাইতেও ভীত নহেন, ও স্বজাতি-স্বার্থ বলি দিতেও পরাঙ্মুখ নহেন, যদি আমরা সেই বিশ্বপ্রেমিকগণের নিকটে মস্তক অবনত না করি, তাহা হইলে আমরা পামর ও কৃতঘ্ন। ইংলণ্ড রাজনীতি-বিষয়ে জগতের শিক্ষক। ইংলণ্ডের নিকটে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী সমস্ত ইউরোপ শিখিয়াছেন। ইংলণ্ড রাজনীতি-বিষয়ে এক দিন অগ্রগামিনী আমেরিকারও দীক্ষাগুরু ছিলেন। সেই জগদ্গুরু ইংলণ্ডের নিকটে রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা লইব, তাহাতে আমাদের লজ্জা কি? আমরা যে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর আজ আন্দোলন করিতেছি—ইংলণ্ডীয় সাহিত্যই আমাদিগকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছে। যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে দিন দিন অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতেছে, সে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও ইংরাজী ইতিহাস আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছে। সমস্ত ভারতের সমীকরণের ভাবও আমরা ইংরাজি সাহিত্য ও ইংরাজি শাসন-প্রণালী হইতে শিখিয়াছি। ভারত বহুদিনের নেতৃত্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজ আসিয়া সেই ভারতকে জাগাইয়াছেন; জাগাইয়া সেই নিদ্রাভিভূতিকালে জগৎ যে যে বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ভারতকে শিখাইতেছেন। নিদ্রার গভীরতায় ভারত পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানরাশি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতিমাত্র অপবিস্ফুট ভাবে তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। ইংরাজ তাঁহাকে সে অপরিমিত জ্ঞানরাশির কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যে সঞ্জীবন ঔষধে ইংরাজ নিজে এত বড় হইয়াছেন, সেই সঞ্জীবন ঔষধ আমাদিগের প্রতিও প্রযুক্ত করিয়া আমাদের অন্তরে আজ প্রকাণ্ড জাতীয় জীবনের ভাব অঙ্কুরিত করিয়াছেন। নিদ্রিত ভারত আজ একটী প্রকাণ্ড-জাতিরূপে পরিণত হইতে চলিল। রিপণ-প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী সেই ভবিষ্য জাতীয় সৌধের ভিত্তিমাত্র। যে ইংরাজের কাছে এত শিখিয়াছি, এত উপকার পাইয়াছি—সে ইংরাজের কাছে আরও কিছু উপকার লইতে ও যাহা কিছু বাকি আছে, তাহা শিখিতে কেন লজ্জা বোধ করিব?

এই পর্য্যন্ত লেখার পর, নব লেফটেনেণ্ট

গবর্ণরের স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী-সম্বন্ধে মন্তব্য আমাদের হাতে পড়িল। সেই মন্তব্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ না করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা অনুচিত বিবেচনায় তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মাননীয় রিভার্স টম্সন্ নির্ব্বাচক ও সভ্য-নির্ব্বাচন-বিষয়ে সম্পত্তিকেই এক মাত্র নিয়ামক করিয়াছেন। আমরা যেমন প্রাপ্তবয়স্ক ও লিখনক্ষম ব্যক্তিমাত্রকেই নির্ব্বাচক মনোনীত করিবার অধিকার দিতে চাহি, তিনি সেরূপ না করিয়া যাঁহারা ১০৲ টাকা বা ততোধিক রোড্সেস, অথবা ১০৲ টাকা বা ততোধিক লাইসেন্স ট্যাক্স দেন, অথবা যাঁহাদিগের আয় ৫০০৲ টাকার ন্যূন নহে, তাঁহাদিগকেই নির্ব্বাচক বলিয়া ধরিয়া লইতে চাহিতেছেন। নির্ব্বাচক মনোনীত করণে জাতিসাধারণের অধিকার স্বীকার করিতেছেন না। ইহাতে তিনি যে জাতি-সাধারণের হৃদয়ে আঘাত করিতেছেন ও সম্পত্তির আদর করিয়া বিদ্যার ও বংশমর্য্যাদার অবমাননা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন কার্য্যত তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কারণ, সহরে যাহা হউক, পল্লীগ্রামে অতি অল্পলোকেরই ৫০০৲ টাকা বা ততোধিক আয় আছে। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে ৫০০৲ টাকা বা ততোধিক আয়ের লোকের পূর্ণ অভাব বিদ্যমানই। সুতরাং স্থানীয় সমিতির সভ্য মনোনীত করণে সে সকল গ্রামের মোটেই ভোট থাকিবে না। এইরূপে নির্ব্বাচকের সংখ্যা এত কম হইবে যে, তাঁহাদিগের দ্বারা সভ্য-নির্ব্বাচক কার্য্য সমীচীন রূপে সম্পন্ন হইবে না। দ্বিতীয়ত, তিনি স্থানীয় সভ্য মনোনীত হওয়ার যে নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে সভ্য পাওয়াই কঠিন হইবে। তাঁহার মতে যিনি ২৫৲ টাকা বা ততোধিক রোড্সেস্, অথবা ২০ টাকা লাইসেন্স ট্যাক্স দেন, অথবা যাঁহার আয় ১০০০৲ টাকার ন্যূন নহে, তিনিই স্থানীয় বোর্ডের সভ্য হইবার উপযুক্ত। আমরা পল্লীগ্রামবাসী; সুতরাং ভূয়োদর্শন-বলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, অনেক পল্লীগ্রামেই ১০০৲ টাকা বা ততোধিক আয়ের লোক নাই। গড়পড়তা এরূপ আয়ের লোক দুই চারি জন পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু গণ্ডগ্রামের সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং স্থানীয় সমিতিতে অধিকাংশ গ্রামেরই ভোট থাকিবে না। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর লোকের অভাব হইবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই জন্যই বলিয়াছেন যে, সম্পত্তির পরিমাণানুসারে এক এক ব্যক্তিকে ছয় গুণ পর্য্যন্ত ভোট দেওয়া যাইবে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ইহা সাধারণ লোকের নির্ব্বাচিত সমিতি নহে, নির্দ্দিষ্ট আয়ের ধনিগণের বা জমিদারগণের সমিতি-মাত্র।

বলা বাহুল্য যে, এরূপ নির্ব্বাচনপ্রণালী ও এইরূপে নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কখন জাতিসাধারণের সহানুভূতি পাইবে না। সুতরাং লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইবে। জাতি-সাধারণকে আত্ম-শাসন শিখানই লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য। দশ জন জমিদার বা মহাজন তাহা শিখিলে, কি হইবে? ইহা অখণ্ডনীয় সত্য যে,সম্পত্তি নির্ব্বাচন-নিয়ামক হইলে অনেক বিদ্বান, উপযুক্ত ও দেশহিতৈষী লোক বাদ পড়িয়া যাইবেন। কারণ, পল্লীগ্রামস্থ অনেক গৃহস্থের আয় ৫০০ টাকার ন্যূন হইবে, অথচ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক যোগ্য লোক আছেন। এক জন জমিদার বা এক জন দোকান-দারের আয় হয় ত বেশী হইতে পারে, কিন্তু অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে বিদ্যা-বুদ্ধি শূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। আপন আপন কার্য্য-নির্ব্বাহোপযোগী বুদ্ধি তাঁহাদিগের নাই, এ কথা বলি না। কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, শাসনপ্রণালী প্রভৃতির জটিল প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের সাধারণত নাই—ইহাই আমার বক্তব্য। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থের আয় হয় ত ৫০০ টাকার কম হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধি সাধারণত অতি সূক্ষ্ম। ইহাঁদের মধ্য হইতেই সাধারণত জমিদার ও ব্যবসাদারগণের গোমাস্তা, মুহুরী, নায়েব, দাওয়ান প্রভৃতি মনোনীত হইয়া থাকেন। ইহাঁদের হয় ত সম্পত্তি নাই, এবং বেতন হয় ত ১০০০ বা ৫০০ টাকার ন্যূন, কিন্তু বুদ্ধিবিদ্যায় ইহাঁরা মনিবদের প্রভু। মনিবগণ ইহাঁদিগের হস্তে কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় নৃত্য করেন মাত্র। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনপ্রণালীতে এ সকল লোকের অধিকাংশই বাদ পড়িবে। এতদ্ভিন্ন পল্লীগ্রামে এমন উচ্চবংশোদ্ভব বৃত্তিভোগী যজনোপজীবী বা দীক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ সকল আছেন, যাঁহারা আজও কাহারও দাস্য স্বীকার করেন না, এবং তাঁহা-দিগের আয়ও বেশী নহে, অথচ সমাজে তাঁহাদিগের অসীম প্রতিপত্তি। তাঁহা-দিগের এক কথায় যে কাজ হইবে, লক্ষপতি তেলি তামলী প্রভৃতির লক্ষ কথাতে সে কাজ হইবে না। বণিক রাজা এ কথার যাথার্থ্য হয় ত বুঝিতে পারিবেন না। কারণ, তাঁহাদের দেশে অর্থেরই গৌরব অধিক। এদেশে তাঁহা-দিগের অনুকরণে অর্থের গৌরব বাড়ি-তেছে বটে, কিন্তু এখনও বিদ্যা-বুদ্ধির ও বংশমর্য্যাদার গৌরব লোপ হইতে অনেক দিন লাগিবে।

এখনও সমাজিক শাসনদণ্ড ব্রাহ্মণ কায়স্থের হস্তে রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহা-দিগকে দরিদ্র বলিয়া বাদ দিলে, লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। প্রস্তাবিত প্রণালীতে নির্ব্বাচিত স্থানীয় সমিতি, জমিদার ও বণিক্-বহুল হইবে; সুতরাং সেখানে প্রজাসাধারণের স্বার্থ সম্বর্দ্ধিত হইবার কোন আশা থাকিবে

না। সুতরাং এরূপ আংশিক স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীতে দেশের অনিষ্ট বই ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।

অনেক গ্রামে দেখা যায়, গ্রামের বিদ্যালয়ের পণ্ডিত বা মাষ্টার বুদ্ধি-বিদ্যায় গ্রামের মধ্যে প্রধান। অনেক বিষয়েই লোকে তাঁহার সহিত পরামর্শ করে, এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে কাজ করে। কিন্তু তাঁহাদিগের সাধারণত যেরূপ আয়, তাহাতে তাঁহারা যে কখন নির্ব্বাচক-শ্রেণীভুক্তও হইতে পারিবেন, তাহারও কোন আশা নাই। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা গ্রাম্য পণ্ডিত, মাষ্টার বাদ দিলে, গ্রামে মানুষের মধ্যে থাকে কে? সুতরাং আমাদের মতে সম্পত্তি নির্ব্বাচন-নিয়ামক হওয়া কোনমতেই উচিত নহে। যদি নিতান্তই গবর্ণমেণ্টের তাহা ভাল লাগে, তাহা হইলে সম্পত্তির পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নির্ব্বাচকের পক্ষে ২০০৲ টাকা ও সভ্যের পক্ষে ৫০০৲ টাকা আয় হইলেই, যথেষ্ট হইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার গৌরবও রক্ষা চাই। মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি-পরিক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাচক, এবং গ্রাজুয়েট, অণ্ডার গ্রাজুয়েট ও সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে সভ্য মনোনীত হওয়ার অধিকার দিলেই, বিদ্যার গৌরব রক্ষা হইবে।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর প্রতি সব্ডিভিশন বা উপবিভাগকে এক একটী শাসনকেন্দ্র করিতে চাহিতেছেন, এবং লোকবহুল স্থানে থানাকেও শাসনকেন্দ্র করিতে প্রস্তুত আছেন। এই প্রণালী প্রাচীন পল্লীসমাজের কাছাকাছি যাইতেছে। কিন্তু এরূপ বিকেন্দ্রীকরণপ্রথা ভারতের সমীকরণের প্রতিকূল। ইহা প্রাদেশিক বিদ্বেষ ভাব উদ্দীপিত করার একটী প্রধান উপকরণ হইবে। ইহা বিশ্বজনীন সহানুভূতির উৎপত্তির প্রধান অন্তরায় হইবে। যদি রেল, টেলিগ্রাফ ও ভাল রাস্তা ঘাট না থাকিত, তাহা হইলে জেলাকে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগে বিভক্ত করার আবশ্যকতা হইত। কিন্তু এখন তাহার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। এক সময়ে যখন এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়ার পথ অতি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল ছিল, তখন পল্লীসমাজেরও আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু এখন চতুর্দ্দিকে রেল ও চতুর্দ্দিকে পথ। এখন কিঞ্চিৎ পাথেয় পাইলে, সভ্যমাত্রই অনায়াসে নগরে আসিয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। শাসনবৃত্ত যতই সঙ্কীর্ণ হইবে, ততই লোকের মন সঙ্কীর্ণ হইবে। প্রাদেশিক বিদ্বেষ ভাব অধিকতর পরিপুষ্ট হইবে ও বিশ্বজনীন সহানুভূতির ভাব অধিকতর সঙ্কুচিত হইবে। এই জন্য আমরা জেলার নগরকে শাসনকেন্দ্র করিতে চাই। যেমন গ্রহমণ্ডলী আপন আপন মেরুদণ্ডের উপরে দিন-রাত্রিতে এক বার করিয়া পরিভ্রমণ করিয়া, বৎসরে আপন

বৃত্তে এক বার সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ এই নগর রূপ গ্রহমণ্ডলী আপন আপন প্রদেশে প্রতিদিন ঘুরিয়া, বৎসরে এক বার ভারতের রাজধানীকে প্রদক্ষিণ করিবে। এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে—এবং সে দিন বহুদূরবর্ত্তী নয়—যখন এই স্থানীয় সমিতি সকল হইতে দুই জন করিয়া প্রতিনিধি যাইয়া অন্তত বৎসরে এক বার করিয়া রাজধানীতে অধিবেশন করিবে। এক জন সরস্বতীর, অন্যতর লক্ষ্মীর প্রতিনিধি। এই সামঞ্জস্য-রক্ষাতেই রাজ্যের স্থায়িত্ব। এই স্থানীয় সমিতি সেই ভবিষ্য মহতী জাতীয় সমিতির ভিত্তিভূমি ও অগ্রদূতী। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আমরা জেলার নগরকেই শাসনকেন্দ্র করিতে চাই। শাসনবৃত্ত ইহা অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ করিতে চাহি না। ইহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে না, অথচ জাতীয় শক্তি ক্রমেই ঘনীভূত হইবে।* কারণ যখন প্রতি থানা হইতে প্রতিনিধি সভ্য প্রেরিত হইবে, তখন প্রত্যেক থানার নির্ব্বাচকগণ আপন আপন গ্রামের স্বার্থ সেই সকল প্রতিনিধি সভ্য দ্বারা অনায়াসেই জেলার শাসন-সমিতিতে ব্যক্ত করিতে পারিবেন। সুতরাং, থানা শাসনকেন্দ্র হইলে যে ফল, তাহা তাঁহারা পাইতেছেন; অথচ জেলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

---

* এমন দিন হয়ত এক সময় আসিবে, যখন এই জাতীয় ভাবও অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। এখন যেমন প্রাদেশিক ভাব জাতীয় ভাবে বিলীন হইতেছে, তখন আবার জাতীয় ভাব বিশ্ব-ভাবে বিলীন হইবে। তখন সমস্ত পৃথিবী এক প্রকাণ্ড-সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবে। তখন প্রত্যেক রাজ্য বা সম্রাজ্য সেই সৌর-জগতের এক একটী গ্রহ-স্বরূপ ইহার মাধ্যমিক কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিবে। তখন নদীয়া যশোহর প্রভৃতি জেলা বিলুপ্ত হইয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি জেলায় পরিণত হইবে। তখন বৈদ্যুতিক লৌহবর্ত্ম ও ব্যোমযান প্রভৃতির পর্য্যাপ্ত ব্যবহারে প্রাদেশিক দূরত্ব একবারে কমিয়া যাইবে। শাসনবৃত্তকে এইরূপে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে অতি প্রকাণ্ডে পরিণত করাই সভ্যতার চরম ফল। ইউরোপে এক্ষণে যে বড় বড় রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া মধ্যে মধ্যে এক একটী কঙ্গ্রেস বসে, ইহা সেই প্রকাণ্ড বিশ্ব-সম্মিলনের সূত্রপাত-মাত্র। বিশ্ব-সম্মিলনের আবশ্যকতা এখন সভ্যজাতি-মাত্রেই ক্রমে অনুভব করিতেছেন। সুতরাং, ইহা যে এক দিন ঘটিবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। তখন জাতিগত বিদ্বেষ বিলুপ্ত হইয়া বিশ্বপ্রেমের রাজ্য আবির্ভূত হইবে। তখন আর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা মানুষে মানুষের রক্ত মাংস খাইবে না। তখন বীর বলিলে, নরহন্তা বুঝাইবে না। তখন দয়াবীর, ভক্তিবীর, প্রেমবীরে জগৎ প্লাবিত হইবে। সকলেই ভাই ভাই, সকলেই ভাই বোন্। কাহাকে দেখিলে, কাহারও হৃদয় বিদ্বেষ কিংবা প্রতিহিংসানলে উদ্দীপিত হইবে না। সকলেই পরস্পর প্রেমে বিভোর। জগৎ তখন অনন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে। ইহাই বৈকুণ্ঠ, ইহাই স্বর্গ। মা বিশ্বজননি! বলিয়া দেও, সে দিন কবে আসিবে?

খণ্ড খণ্ড করিয়া সহানুভূতির বেগ কমাইতে হইতেছে না। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

সভাপতি-নির্ব্বাচনের ভার আমাদিগের মতে সর্ব্বত্রই সভ্যগণের হস্তে থাকা উচিত। শাসন-সমিতির গঠন-কার্য্য সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত সভাপতি কার্য্য করিতে পারেন; কিন্তু গঠন-কার্য্য সমাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাকে অবসৃত হইতে হইবে। হয়ত তিনিই সভ্যগণ কর্ত্তৃক সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সভ্যগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি ইংরাজ হউন্, তাহাতেও আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাকে মনোনীত করার পর তিনি প্রতিকূলাচরণ বা শক্তির অপব্যবহার করিলে, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করার শক্তি সভার হস্তে থাকা চাই।

গবর্ণমেণ্ট, বোর্ড অব্ কনট্রোল্ নামক একটী স্বতন্ত্র শাসন-কেন্দ্র করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইহা যে সভার কার্য্যকারিতা নষ্ট করিবেনা,কে বলিল? মাজিষ্ট্রেট সভাপতি হইলে, যে পরিমাণ অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল,বোর্ডের অবিরাম হস্তক্ষেপে তাহা অপেক্ষাও যে অধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা রহিল না,কে বলিল? পলিটিকেল এজেন্টগণ যেরূপ স্বাধীন-রাজগণের বিশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছেন, বোর্ড যে স্থানীয় শাসন-সমিতির সেইরূপ যন্ত্রণার কারণ হইবেন না, কে বলিল? মাজিষ্ট্রেটের নানা কাজ; সুতরাং তাঁহার হয়ত সর্ব্বদা খোঁচাখুঁচি করার অবসর হইত না। বিশেষত তিনি সভাপতি হইয়া সভার বিরুদ্ধে বাহিরে কিছু বলিতে পারিতেন না, ভিতরে সভ্যগণের সঙ্গে যে কিছু সংঘর্ষ উপস্থিত হউক না কেন, সভ্যগণের বা সভার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট কিছু লিখিতে পারিতেন না। কারণ, প্রকারান্তরে তাহাতে তাঁহার নিজেরই অপটুতা প্রকাশ হইত। কিন্তু বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের আর কিছু কাজ থাকিবে না সুতরাং সভার ছিদ্রান্বেষণ করাই তাঁহার একমাত্র ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপে দুই বোর্ডের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। যে সকল ভদ্রলোক দেশের হিতের জন্য 'ঘরে খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে' আসিবেন, তাঁহারা গতিক দেখিয়া ক্রমেই সরিয়া পড়িবেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় লোককে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, স্বাতন্ত্র্য না দিতে পারেন। কিন্তু যদি কথঞ্চিৎ উপযুক্ত বোধ করিয়া থাকেন ত উৎপত্তির সময়েই যেন এরূপ মৃত্যুর পথ করিয়া না রাখেন। যেন অগ্রসর হইতে দিয়া পশ্চাৎ দিক্ হইতে এরূপ চুল ধরিয়া টানিবার ব্যবস্থা না করিয়া রাখেন।

প্রথম অবস্থায় একটু আধ টুকু বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের এরূপ ধরিয়া রাখা উচিত। কোন গুরুতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে জানিতে পারিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সে বিষয় গবর্ণমেণ্টে লিখিতে পারিবেন। এবং সেই রিপোর্ট অনুসারে কমিশনর আসিয়া সে বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবেন। ইঁহার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল্ রাখিবার আবশ্যকতা দেখি না।

সভাপতির বেতন ও সভ্যগণের পাথেয় এই দুইটীই প্রার্থনীয় বিষয়। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সভার আয়ের উপরে নির্ভর করিতেছে। যাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী, তাঁহারা সভার ক্ষমতানুসারে যৎকিঞ্চিৎ লইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন; তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে একটা সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

মিউনিসিপাল আইনের ১৭ ধারায় নির্ব্বাচন-প্রণালী সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে যে, করদাতৃগণের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ আবেদন না করিলে, গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন-প্রণালী মঞ্জুর করিবেন না; ইহা বোধ হয়, পল্লীগ্রামস্থ অনেকেই অবগত নহেন। গবর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই বিষয় সকলকে বিদিত করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। আমাদের সকলেই এ বিষয়ে প্রাণপণে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহায়তা করা উচিত। অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে প্রচারক পাঠাইয়া এই বিষয়ের আন্দোলন করিতে হইবে। প্রচারকগণের পাথেয় ও অন্যান্য খরচ পত্রের জন্য আমাদের সকলেরই কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। এই প্রচারকেরা প্রতি গ্রামে গিয়া গ্রামবাসিগণের জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিবেন। যাহাতে সকলেই এই স্বায়ত্ত শাসন-প্রণালী ভাল করিয়া বুঝিতে পারে ও বুঝিয়া তদনুষ্ঠানে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তদ্বিষয়ে ঐকান্তিকতার সহিত যত্নবান্ হইবেন, এবং নির্ব্বাচন শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে তাহাতে তাঁহাদিগের স্বাক্ষর করাইয়া আনিবেন। এ সকল কাজ আপনা হইতে হইবে না, প্রচারকের একান্ত আবশ্যকতা। আজ কাল সর্ব্বত্র এরূপ প্রচারক মিলিবে, কেবল তাঁহাদিগকে পাথেয় ও কিঞ্চিৎ খরচপত্র দিতে হইবে মাত্র। ভ্রাতাগণ! আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নয়। মহামতি লর্ড রীপন্ ভারতের অধীনতা শৃঙ্খল কিয়ৎ পরিমাণে শিথিলিত করিবার নিমিত্ত ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আসুন আমরা আজ প্রাণ ভাবিয়া তাঁহার সহায়তা করি। তিনি বিশ্ব-প্রেমিক, ভারতবন্ধু। আকবরের পর আর এরূপ নরপতি ভারত সিংহাসন অধিকার করেন নাই। তাই আজ ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্ব্বোচ্চ আসনে দেশীয় প্রাড্‌বিবাক সমাসীন।

আজ যদি ইহার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজ আবার তোদরমল্ল মানসিংহ,বীরবল প্রভৃতিকে দেখিতে পাইতাম। আকবর যেমন নিজ-জাতিসাধারণ হইতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভিন্নমতাবলম্বী হওয়ায়, স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিয়াছিলেন,—ইনিও সেইরূপ নিজ-জাতি-সাধারণ হইতে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায়, জাতিতে পক্ষপাতিত্বের শৃঙ্খল ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, রিপণ যেন দীর্ঘকাল ভারত-সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকেন। তিনি অন্তত দশ বৎসর কাল ভারতে থাকিলেও, ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী বদ্ধমূল হইবে। ইংরাজ বিধি-গ্রন্থ হইতে ইংরাজ-শাসনের কলঙ্ক-স্বরূপ অস্ত্রবিধি প্রক্ষালিত হইবে; ফৌজদারী কার্য্যবিধির সপ্তম অধ্যায়ে শ্বেত-কৃষ্ণের বিচার-পার্থক্য করায়, ইংরাজের নির্ম্মল আইনে যে কালিমা পতিত হইয়াছে, তাহা বিধৌত হইবে। তিনি যাহাতে অল্প-কালস্থায়ি-রাজত্বেই অনেক কাজ করিয়া উঠিতে পারেন, আসুন,আমরা সমস্ত ভারতবাসী মিলিয়া আজ তাহার বিধান করি। আসুন, আমরা সকলে এক বাক্যে তাঁহার প্রতি ও তাঁহার কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি। আসুন, আমরা আজ সমস্বরে তাঁহার যশোগান করি। হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিয়া গাই—জয় রিপণের জয়। জয় ভারতের জয়! মিলি সবে গাই ভারতের জয়! রিপণের জয়!!! শুনুক্ জগৎ, স্তব্ধ হ'ক চরাচর!!

বাঙ্গালীর বাহুবল।

অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, বাঙ্গালীর বাহুবল নহিলে কিছুই হইবে না। বাহুবল শব্দ তাঁহারা শারীরিক-বলের প্রতি প্রয়োগ করেন। সুতরাং তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা অপনীত না হইলে তাঁহারা প্রকৃত উন্নতিপথে উঠিতে পারিবেন না। এজন্য তাঁহারা বাঙ্গালী জাতিকে একটী পালওয়ান্ জাতি করিতে চাহেন। তজ্জন্য বালকগণকে ব্যায়াম-চর্চ্চায় উপদেশ দেন, কুস্তি করিতে বলেন,এবং এক এক জনকে ভীমের বলধারণ করিতে বলেন। আমরা বালকগণের ব্যায়াম-চর্চ্চার বিরোধী নহি; বরং আমরা বলি,যাহাতে শরীরের বলাধান ও প্রকৃত পুষ্টিসাধন হয়,তাহা করা একান্ত আবশ্যক। কারণ,

যাহা গোড়া হইতেই সতেজ হইয়া উঠে, তাহা অনেক দিন স্থায়ী হয়; যে লোকের বল অধিক, তাহার ব্যারাম পীড়ার অল্পই সম্ভাবনা; এবং ব্যারাম পীড়া হইলেও, সে শরীরকে শীঘ্র কাবু করিতে পারে না। আমরা আর ত জানি, শারীরিক বল থাকিলে অনেক শক্ত কাজও করা যাইতে পারে এবং আত্ম-রক্ষায় অধিকতর সমর্থ হওয়া যায়।

এ সকলই আমরা জানি। কিন্তু আমরা এমত কথা বলি না যে, শারীরিক বলই জাতীয় বলের নিদান-স্বরূপ। শারীরিক বল প্রতি ব্যক্তির থাকা আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহা শুদ্ধ শরীরেরই মঙ্গলার্থ আবশ্যক। তদ্দ্বারা যে সাধারণ কোন উপকার-সাধন হয়, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। কারণ:—

১। যে জাতির শারীরিক গঠন যেরূপই হউক না, তন্মধ্যে অনেক লোক বলবান্ আছেন এবং অনেকেই আবার দুর্ব্বল আছেন। যাঁহারা বলবান্, তাঁহারা শুদ্ধ বল দ্বারা দেশের কি হিতসাধন করেন? যাঁহারা দুর্ব্বল, তাঁহাদিগের সেই শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন কোন্ মহৎ-কার্য্য-সাধনে ব্যাঘাত ঘটে? কি বিষয়ী লোক, কি সৈন্যদল উভয় পক্ষেই এ কথা খাটে। তুমি একটী সমুদায় সৈন্যদল পরীক্ষা করিয়া দেখ, তন্মধ্যে কি সকলকে সমান বলবান্ দেখিতে পাইবে? না, যাঁহারা অধিক বলবান্, তাঁহারাই ভাল যোদ্ধা? সৈন্যদল হইতে যাঁহারা ক্রমশ প্রতিপত্তি পাইয়া সৈনিক কর্ম্মচারীর পদে উন্নত হয়েন, তাঁহারা কি সকলে বলবান্ লোক? না, তাঁহারা অন্য-গুণে পদোন্নত হয়েন? একটী সেনা-মণ্ডলে যাহা খাটে, বিষয়ি-লোক-সম্বন্ধেও তাহা খাটে।

২। একটী সমগ্র-দেশ-মধ্যে স্থানের গুণে কোন কোন স্থানের লোক অধিকতর বলবান্ হইয়া থাকে। এই ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করুন। এক ভারতবর্ষ কত অসংখ্য-জাতির আবাস-ভূমি। এই সমস্ত-জাতি-মধ্যে শারীরিক গঠন ও বলবীর্য্যের অনেক তারতম্য দেখা যায়। দেশ-বিশেষে এক এক জাতি এক এক প্রকার জন্মিয়াছে। কিন্তু এক জাতির বলবীর্য্য কি অন্য জাতির বলবীর্য্যের সহিত সমান? এমন কি, পার্ব্বতীয়-দেশোৎপন্ন জাতি-সমুদায়ও সমান বলবান্ নহে। পঞ্জাবী, গুরখা ও মহারাষ্ট্রী সকলেই পার্ব্বতীয় দেশের অধিবাসী; কিন্তু ইহারা শারীরিক গঠন ও বলবীর্য্যে সমান নহে। নিম্নতম-অধিবাসিগণ-মধ্যেও এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। যে নিয়ম আমরা প্রথমে একটী ক্ষুদ্র-জাতি-মধ্যে দেখাইয়াছি, সেই নিয়ম একটী সমগ্র-দেশ-মধ্যস্থ বিভিন্ন-জাতি-মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুদ্ধ শারীরিক-বলবীর্য্যে কি উপকার? এক কালে মহারাষ্ট্রীয়েরা পঞ্জাবীদের অপেক্ষাও পরাক্রান্ত হইয়া

উঠিয়াছিল। গুরখারা আজিও এক রকম স্বাধীন রহিয়াছে। পঞ্জাবীদের অধিকতর বল-সত্ত্বেও,তাহারা অনেক বার বিদেশী শত্রুর নিকটে পরাজিত হইয়াছে। গ্রীক, মুসলমান ও ইংরাজি সকলেই তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছে। শুদ্ধ শারীরিক-বল-প্রভাবে কিছুই রক্ষিত হয় নাই। ভারতবর্ষে অনেক বলবান্ জাতি থাকাতেও, ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে। ব্রিটীশ জাতির সৈন্যবল কি সকলেই হাইল্যাণ্ডার দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে? তাহাদিগের অধিকাংশ সৈন্যবল কি অপরজাতীয় লোক দ্বারা পরিপুষ্ট হয় নাই? হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্টই কি ভাল যোদ্ধা? তবে প্রভেদ এই, হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্ট দেখিতে ভাল। পঞ্জাবী রেজিমেণ্টও দেখিতে ভাল। কিন্তু যুদ্ধকার্য্যে যাহা প্রয়োজনীয়,তাহা শারীরিক বল দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

৩। শুদ্ধ শারীরিক বল দ্বারা পৃথিবীর ইতিবৃত্ত-মধ্যে কয়টী যুদ্ধের জয়সাধন হইয়াছে? পৃথিবীর অতি-প্রাচীন-কালের ইতিহাস প্রকাশিত নাই; কিন্তু আধুনিক ইতিহাস যাহা লোকগোচর আছে, তন্মধ্যে কোন যুদ্ধেই শারীরিক বল জয়লাভ করে নাই। ভারতের পূর্ব্বকার অসুরেরা বার বার দেবোপম-আর্য্য-জাতির নিকটে পরাজিত হইয়াছে। এক এক বার আমরা শুনিতে পাই, অসুরের জয় হইল বটে, কিন্তু তৎপরেই আবার তাহাদিগের পরাজয় হইয়াছিল। এমত কি; অবশেষে ভারতবর্ষে অসুর-জাতির একেবারে প্রায় উচ্ছেদ-সাধন হইয়াছিল। মহাভারতীয় বৃহৎ কাব্যের উপদেশ কি? মহাভারতের মধ্যে এক দিকে নারায়ণ, অন্য দিকে নারায়ণী সেনা। সমুদায় নারায়ণী সেনা—বল, একা নারায়ণ—কৌশল। কিন্তু এই বল ও কৌশলের যুদ্ধে কাহার জয় হইয়াছিল? পুরাণ ছাড়িয়া দিয়া, প্রকৃত মানুষী ইতিহাস দেখ। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় কি বল দ্বারা সাধিত হইয়াছিল? প্রাচীন পারস্যের সৈন্যবল আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবল অপেক্ষা কত শত গুণে অধিক। তথাপি পারস্যে অগণ্য সৈন্য আলেকজাণ্ডারের অল্প কত সৈন্যবলের তেজে পিপীলিকার মত পলায়ন করিয়াছিল। আধুনিক ইতিবৃত্তেও এইরূপ ঘটিয়াছে। আধুনিক-ইতিবৃত্তের কোন যুদ্ধেই শুদ্ধ আসুরিক ও শারীরিক বল জয়-লাভ করে নাই।

অতএব শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু কোন জাতি দুর্ব্বল হয় না। বাস্তবিক মানবজাতির বল শরীরে নহে। মানবজাতির বল মনে ও বুদ্ধিতে। মানবজাতির বল মানসিক তেজ ও বীর্য্য। পৃথিবীর ইতিবৃত্ত ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতীত করে। বাঙ্গালী জাতির গৌরব শুদ্ধ শারীরিক বল দ্বারা সাধিত হইবে না। শারীরিক বলবীর্য্যের সহিত তাহার মানসিক বলবীর্য্যের স্ফূর্ত্তির একান্ত আবশ্যক। এক

দিন শারীরিক বল না থাকিলে চলে, কিন্তু আন্তরিক বলবীর্য্য না থাকিলে, চলে না। কারণ, আন্তরিক বলবীর্য্যই গৌরবের নিদানভূত।

রত্ন-রহস্য।

হীরক।

আমরা "রত্ন-রহস্য" নামক দীর্ঘ প্রস্তাব আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ বিবিধ-রত্নের গুণ, দোষ ও পরীক্ষাদি বর্ণন করিয়াছি; কিন্তু রত্নরাজ হীরকের উপরে কোন কথাই বলি নাই। অদ্য সেই ত্রুটি-পরিহারার্থ রত্নরাজ হীরকের বিষয় যথাসাধ্য বর্ণন করিব।

প্রাচীন-রত্নশাস্ত্র বেত্তারা এই রত্নকে যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; এবং অধুনাতন-কালেও ইহার সমধিক মান্যের কিছু-মাত্র ত্রুটি হয় নাই। পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন আছে, হীরক অপেক্ষা মূল্যবান্ রত্ন আর নাই। হীরক কি পদার্থ, তাহার দোষ গুণ কিরূপ? পরীক্ষা কিরূপ? পূর্ব্বকালে কোথায় জন্মিত এবং এখনই বা ইহা কোথায় জন্মে? এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করাই হীরকপ্রস্তাবের প্রধান অভিধেয়।

হীরক বহুমূল্য। ইহার বর্ণ শুভ্র ও ভাস্বর। প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে ইহার অন্যান্য বর্ণের কথা থাকিলেও, সে সকল বর্ণের হীরকের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে; এবং সে সকল হীরকের খনিতে একত্র জন্মে বলিয়া, সেই সেই নানা বর্ণের প্রস্তরকেও হীরক বলা হইয়া থাকে।

হীরকের অনেক নাম আছে। তন্মধ্যে হীর, হীরক, সূচীমুখ, বরারক, রত্নমুখ্য, অভেদ্য, অশির, রত্ন, দৃঢ়, ভার্গবক, ষটকোণ, বহুধার ও শতকোটী এই ১৩টী নাম এবং বজ্রের যত নাম আছে, সে সমস্তই হীরকের নাম। হীরকের বজ্র ও কুলিশ প্রভৃতি নাম সকল নানা-শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

হীরক কি পদার্থ, এবং কি কারণে ও কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, ইহা জানিবার জন্য পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা নানা প্রকার অনুসন্ধান করিয়াও, কিছুই বিশেষ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।

অতি-আদিম-কালের লোকেরা বলিত, যে হীরক ও তজ্জাতীয় অন্যান্য রত্ন সকল বলাসুরের হাড়; অর্থাৎ বল নামে এক অসুর ছিল, ইন্দ্র তাহাকে বজ্রাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ করিলে, তাহার সেই খণ্ড বিখণ্ড অঙ্গারময় অস্থি সকল পৃথিবীর যে যে স্থানে পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থানে সেই সেই বলাস্থি-সংস্পৃষ্ট মৃত্তিকা হইতে কোন

এক প্রকার অজ্ঞাত কারণে হীরক প্রভৃতি রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীতে হীরক উৎপন্ন হইত না। তাহার পর হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এ কথা গরুড়পুরাণ প্রভৃতি মহাপুরাণ ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি জ্যোতিঃসংহিতা-গ্রন্থে বিস্পষ্টরূপে উক্ত আছে। যথা—

"রশ্মিপরীক্ষাং রত্নানাং
বলো নামাসুরোহভবৎ।
ইন্দ্রাদ্যা নির্জ্জিতাস্তেন
নির্জ্জেতুং তৈ র্ন শকাতে।

ইহার কিয়দ্দূর পরে—

"তস্যাস্থিলেশো নিপপাত যেষু
ভুবঃ প্রদেশেষু কথঞ্চিদেব
বজ্রাণি বজ্রায়ুধনির্জ্জিগীষো-
র্ভবন্তি নানাকৃতিমন্তি তেষু।"

[ইত্যাদি গরুড়পুরাণ দেখ।

কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা দধীচি মুনির অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিলে, তদবশিষ্ট অস্থিখণ্ড সকল মৃত্তিকায় পতিত থাকিয়া কালক্রমে হীরক উৎপাদন করিয়াছিল।* আবার কোন ঋষি বলেন, তাহা নহে। উহা মৃত্তিকার শক্তি-বিশেষ দ্বারাই উৎপন্ন হয়। বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থে তিন মতেরই উল্লেখ আছে। যথা—

"রত্নানি বলাৎ দৈত্যাৎ
দধীচিতোহন্যে বদন্তি জাতানি।
কেচিদ্ভুবঃ স্বভাবাৎ
বৈচিত্র্যং প্রাহুরুপলানাম্।"

[বৃহৎসংহিতা দেখ।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে হীরকের আকর অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান ছিল, এক্ষণে আর তাহার সকল স্থানে হীরক উৎপন্ন হয় না। না হউক, ভারতবর্ষে যে সময়ে রত্নের বিশেষ আদর ও অনুসন্ধান হইয়াছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষে যতগুলি আকর ছিল, তাহা নিম্ন-শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

"হৈম-মাতঙ্গ-সৌরাষ্ট্রাঃ
পৌণ্ড্র-কালিঙ্গ-কোশলাঃ।
বেন্বাতটাঃ স-সৌবীরাঃ
বজ্রস্যাষ্টৌ বিধাকরাঃ।"

হৈম=হিমালয়স্থ আকর। মাতঙ্গ—মতঙ্গ-দেশস্থিত আকর। (মতঙ্গ মুনির আশ্রম-চিহ্নিত দেশ। পূর্ব্বে ইহা কিরাত জাতির আবাস ছিল, এক্ষণে ইহার নাম কি? তাহা ঠিক্ জানা যায় না।) পৌণ্ড্র দেশ। কালিঙ্গ দেশ। কোশল দেশ।

* শরীরতত্ত্ববিৎ ঋষিগণ বলেন যে, অস্থিতে অনেক পরিমাণ চূণ আছে। দগ্ধঅস্থি বা কেবল অস্থি ও ভূমি-বিশেষের সহিত হীরকের কোন কার্য্য-কারণ-ভাব-ঘটিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ বলেন যে, হীরক ক্ষার-বিশেষ হইতেই জন্মে। প্রাচীনঋষিদিগের বলিবার ধরণ এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক অংশে বিভিন্ন, অনেক অভিপ্রায়ই রূপকাচ্ছন্ন; সুতরাং দগ্ধাস্থি ও মৃত্তিকা এই-উভয়-সংযোগে যে হীরক জন্মিয়াছিল, এ কথা নিতান্ত হেয় না হইতে পারে।

অর্থাৎ অযোধ্যা প্রদেশ। বেন্বা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ। সৌবীর দেশ; ইহা সিন্ধুনদ-নিকটবর্ত্তী।

বর্ণ।

গরুড়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও উশনা-কৃত নীতি-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হীরা সকল বর্ণেরই হয়; কিন্তু শুভ্রবর্ণের হীরাই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্। যথা—

"আতাম্রা হিমশৈলজাশ্চ শশিভা
বেন্বাতটীয়াঃ স্মৃতাঃ,
সৌবীরে ভূষিতাঞ্জ-মেঘসদৃশা-
স্তাম্রাশ্চ সৌরাষ্ট্রজাঃ।
কালিঙ্গাঃ কনকাবদাতার চিরাঃ পীত-
প্রভাঃ কোশলে।
শ্যামাঃ পুণ্ড্রভবামতঙ্গ-বিষয়ে
নাত্যল্পপীতপ্রভাঃ।"
[গরুড় পুরাণ

" বেন্বাতটে বিশুদ্ধং শিরীষ-কুসুমো-
পমং কৌশলম্।
সৌরাষ্ট্রকমাতাম্রং কৃষ্ণং সৌর্পারকং
বজ্রম্।
ঈষত্তাম্রং হিমবতি মতঙ্গজং বল্ল-
পুষ্পসঙ্কাশম্।
আপীতঞ্চ কলিঙ্গে শ্যামং পৌণ্ড্রেষু
সম্ভূতম্।"
[বৃহৎসংহিতা।

হিমালয়সম্ভূত হীরক ঈষৎ তাম্র বর্ণ হয়, ইহা গরুড় পুরাণ ও বৃহৎসংহিতা উভয় গ্রন্থেই লিখিত আছে। বেন্বাতট-জাত হীরক—চন্দ্র-কিরণ-তুল্য বিশুদ্ধ, শুভ্র বর্ণ, ইহাও উভয়-গ্রন্থে লিখিত আছে। সৌবীর-দেশজাত হীরক—কৃষ্ণ-জপা কিংবা মেঘের বর্ণ হইয়া থাকে। বৃহৎসংহিতোক্ত বচনে যে "কৃষ্ণং সৌর্পারকং" লিখিত আছে, তাহা গরুড়-পুরাণের সহিত তুল্যার্থ বুঝিতে হইবেক। সৌরাষ্ট্র-দেশ-সম্ভূত হীরক তাম্র বর্ণ। কলিঙ্গদেশীয় হীরকে স্বর্ণের রঙ্ হয়। বৃহৎ-সংহিতাও "আপীতঞ্চ কলিঙ্গে" বলিয়াছেন। কোশল-দেশীয় হীরকের বর্ণ পীত হয়। বৃহৎসংহিতোক্ত "শিরীষ-কুসুমোপমঞ্চ" উক্তি, ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। পুণ্ড্র-দেশোদ্ভব হীরক শ্যাম বর্ণ হয়, এ বিষয়েও উভয়-গ্রন্থের ঐক্য দেখা যায়। মতঙ্গদেশস্থ হীরকের বর্ণ অল্প পীত। বৃহৎসংহিতোক্ত বল্ল-পুষ্পের বর্ণও তরল পীত।

খনিতে যে যে স্বাভাবিক আকারের (গঠনের) হীরা পাওয়া যায়, বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থে তাহার একটী নির্ণয় আছে। যথা-

"ঐন্দ্রং ষড়স্রি শুক্লং যাম্যং সর্পাস্যরূপ-
মসিতঞ্চ।
কদলীকাণ্ডনিকাশং বৈষ্ণবমিতি
সর্ব্বসংস্থানম্।
বারুণমবলাগুহ্যোপমং ভবেৎ কর্ণিকার-
পুষ্পনিভম্।
শৃঙ্গাটকসংস্থানং ব্যাঘ্রাক্ষিনিভং
হৌতভুজম্।
বায়ব্যঞ্চ যবোপমং অশোককুসুমপ্রভং
সমুদ্দিষ্টম্।"

ষড়স্রি অর্থাৎ ষট্‌কোণ। সংস্থানে ষট্‌কোণ ও শুভ্রবর্ণের হীরকের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতা ইন্দ্র। সর্পাস্য অর্থাৎ ফণি-ফণার ন্যায় গঠন ও কৃষ্ণ বর্ণ হইলে, তাহার দেবতা যম। কদলীকাণ্ডের ন্যায় শুভ্র বর্ণ এবং গঠনে গোল, এরূপ হীরকের দেবতা বিষ্ণু। গঠনে অবলা-গুহ্যাকার হীরকের দেবতা বরুণ। শৃঙ্গাটক অর্থাৎ চতুষ্পথবৎ সংস্থানযুক্ত হীরকের দেবতা অগ্নি। যব কি ধান্য-তুল্য গঠনের হীরকের দেবতা বায়ু।

পূর্ব্বে হীরক কি অন্যান্য মহারত্ন সকল কর্ত্তিত করিত না। আকরজাত আকারটী বজায় রাখিয়া কেবল ধমন-কার্য্য দ্বারা পরিস্কৃত করিয়াই ধারণ করিত। কাটিবার প্রথা না থাকায়, হীরকের কর্ত্তন-প্রক্রিয়া কোনও রত্নশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপে লিখিত নাই; কিন্তু সামান্য-রূপে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ধার্য্য ও অধার্য্য ব্যবস্থা।

রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, রত্নের গুণদোষ-পরীক্ষা করিয়া ধারণ করিবে। যে সে ব্যক্তি যে সে রত্ন ধারণ করিলে, তাহা তাহাদের অনিষ্ট আনয়ন করিয়া থাকে। হীরক-ধারণের পক্ষে আরও বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। কিরূপ হীরক কোন ব্যক্তির ধারণ করিতে হয়, তাহা বৃহৎসংহিতা, গরুড়পুরাণ ও শুক্রনীতি গ্রন্থে আছে। যথা—

"রক্তং পীতঞ্চ শুভং রাজন্যানাং
সিতং দ্বিজাতীনাম্।
শৈরীষং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং শস্যতে-
ঽসিনিভম্॥"

[বৃহৎসংহিতা।

রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে শুভদায়ক। ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ। বৈশ্যের পক্ষে শিরীষ পুষ্পবর্ণ, শূদ্রের পক্ষে খড়্গা অর্থাৎ পরিস্কৃত লৌহ বর্ণ।

গরুড়পুরাণেও ঠিক এই রূপ উক্ত হইয়াছে। যথা।—

"বিপ্রস্য শঙ্খকুমুদস্ফটিকাবদাতঃ
স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য শশবভ্রুবিলোচনাভঃ।
বৈশ্যস্য কাণ্ডকদলীদলসন্নিকাশঃ
শূদ্রস্য ধৌতকরবালসমানদীপ্তিঃ॥"

গরুড়পুরাণ।

বৃহৎসংহিতা বলেন যে, সকল হীরক শুভদায়ক নহে। মানব যদি দুষ্ট-লক্ষণা-ক্রান্ত হীরক ধারণ করে, তবে তাহার বন্ধু বান্ধব নাশ ও শরীর ক্ষয়, ধন ক্ষয় হয় এবং যদি শুভ-লক্ষণাক্রান্ত হীরক ধারণ করে, তবে তাহার বিদ্যুৎ বা বজ্র-ভয় থাকে না, বিষ ভয়ও থাকে না, শুভ হয় ও নানা প্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ হয় এবং শত্রুভয়ও থাকে না, যথা—

"স্বজনবিভবজীবিতক্ষয়ং
জনয়তি বজ্রমনিষ্টলক্ষণম্।
অশনিবিষভয়ারিনাশনং
শুভমুরুভোগকরঞ্চ ভূভৃতাম্॥"

গরুড়পুরাণেও এই রূপ লিখিত আছে। যথা—

ব্যালবহ্নিবিষব্যাঘ্রতস্করাম্বুভয়ানি চ
দূরাত্তস্য নিবর্ত্তন্তে কর্ম্মণ্যাথর্ব্বণানি চ

মনুষ্য যদি নির্দ্দোষ হীরক ধারণ করে,

তাহা হইলে তাহার সর্পভয়, বহ্নিভয়, বিষভয়, ব্যাঘ্রভয়, চৌরভয়, জলভয়, থাকে না এবং অথর্ব্বশাস্ত্রোক্ত অভিচার-জন্য ভয়ও থাকে না।

গরুড়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও নীতিসার গ্রন্থে যাহা ধারণের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা একত্র করিয়া লিখিত হইল, পাঠকগণ প্রভেদ করিয়া পাঠ করিবেন।

"অত্যর্থং লঘুবর্ণতশ্চ গুণবৎ পার্শ্বেষু
সম্যক্ সমং
রেখাবিন্দুকলঙ্ককাকপদকত্রাসাদিভ-
বর্জ্জিতম্।
লোকেঽস্মিন্ পরমাণুমাত্রমপি যং বজ্রং
ক্বচিদ্দৃশ্যতে
তস্মিন্ দেবসমাশ্রয়োঽচিরতথ-
তীক্ষ্ণাগ্রধারং যদি।" (১)

" বজ্রেষু বর্ণযুক্তো দেবানামপি পরিগ্রহঃ
প্রোক্তঃ।
বর্ণেভ্যশ্চ বিভাগঃ কার্য্যো বর্ণাশ্রয়া-
দেব।" (২)

" হরিতসিতপীতপিঙ্গশ্যামাতাম্রাঃ
স্বভাবতো রুচিরাঃ।
হরিবরুণশক্রহুতবহপিতৃপতি-
মরুতাং স্বকা বর্ণাঃ।" (৩)

"যৌ বজ্রবর্ণৌপৃথিবীপতীনাং
সদ্ভিঃ প্রদিষ্টৌ ন তু সার্ব্বজন্যৌ।
যঃ স্যাজ্জবাবিদ্রুমভঙ্গশোণো
যো বা হরিদ্রারসসন্নিকাশঃ।" (৪)

"ঈশত্বাৎ সর্ব্ববর্ণানাং গুণবৎ সার্ব্ব-
বর্ণিকম্।
কামতো ধারয়েদ্রাজা নত্বন্যোঽন্যাৎ
কথঞ্চন।" (৫)

"অধরোত্তরবৃত্ত্যা হি যাদৃক্ স্যাৎ
বর্ণসঙ্করঃ।
ততঃ কষ্টতরো বজ্রে বর্ণানাং
সঙ্করো মতঃ।" (৬)

"ন চ মার্গবিভাগমাত্রবৃত্ত্যা
বিদুষা বজ্রপরিগ্রহো বিধেয়ঃ।
গুণবৎ গুণসম্পদাং বিভূতিঃ
বিপরীতো ব্যসনোদয়স্য হেতুঃ॥" (৭)

"একমপি যস্য শৃঙ্গং বিদলিত-
মবলোক্যতে বিশীর্ণং বা।
গুণবদপি তন্ন ধার্য্যং
বজ্রং শ্রেয়োঽর্থিভির্ভবনে।" (৮)

"স্ফুটিতাগ্নিবিশীর্ণশৃঙ্গদেশং
মলবর্ণৈ পৃষতৈরুপেতমধ্যম্।
নহি বজ্রভৃতোঽপি বজ্রমাশু
শ্রিয়মন্যাশ্রয়লালসাং ন কুর্য্যাৎ॥" (৯)

"যস্যৈকদেশঃ ক্ষতজাবভাসঃ
যদ্বা ভবেল্লোহিতবর্ণচিত্রম্।
ন তন্ন কুর্য্যাৎ ম্রিয়মাণমাশু
স্বচ্ছন্দমৃত্যোরপি জীবিতাস্তম্॥" (১০)

"তীক্ষ্ণাগ্রং বিমলমপেতসর্ব্বদোষং
ধত্তে যঃ প্রযততনুঃ সদৈব বজ্রম্।
বৃদ্ধিস্তং প্রতিদিনমেতি যাবদায়ুঃ
শ্রীসম্পাৎসুতধনধান্যগো-
পশূনাম্॥" (১১)

অর্থ এই যে, অত্যন্ত লঘু অর্থাৎ ওজনে হালকা, নির্দোষ বর্ণ, গুণযুক্ত, পার্শ্বদেশ সমান, রেখা, বিন্দু, শ্যামিকা

বা কলঙ্ক, কাকপদ, তীক্ষ্ণধার ও ত্রাস প্রভৃতি দোষশূন্য, এরূপ হীরক পরমাণু-পরিমাণ হইলেও, তাহাতে নিশ্চিত দেবতার অধিষ্ঠান থাকে অর্থাৎ উক্তরূপ গুণশালী অতি সূক্ষ্ম হীরকও ধারণ করিবে।(১)

দেবতা হইলেও, বর্ণ-অনুসারে ধারণ করা কর্ত্তব্য এবং বর্ণ-অনুসারেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ধারণ করা উচিত। (২)

হরিত অর্থাৎ সবুজ, সিত অর্থাৎ শুভ্র, পীত, পিঙ্গ অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণ, শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ, আতাম্র অর্থাৎ অনল্প-লোহিত-বর্ণ নৈসর্গিক সুন্দর, এই সকল বর্ণের হীরক সকল যথাক্রমে হরি, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বায়ু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ সেই সেই বর্ণের হীরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (৩)

জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ কিংবা বিক্রমাভ্যন্তরের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ কোকনদ বর্ণের হীরক কেবল রাজারাই ধারণ করিবেন। এই দুই প্রকার হীরক সাধারণের ধার্য্য নহে, ইহা সাধুগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। (৪)

রাজা সকল বর্ণের প্রভু। এ নিমিত্ত কেবল রাজাই ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কোন বর্ণের গুণযুক্ত হীরক ধারণ করিতে পারেন, অন্য কোন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ইচ্ছানুরূপ বর্ণের হীরক ধারণ করিতে পারেন না। তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থানুসারেই ধারণ করিবেন। (৫)

উত্তম ও অধম পরস্পর পরস্পরের বুদ্ধি গ্রহণ করিলে, যেমন বর্ণ-সঙ্কর হয়, সেইরূপ সঙ্কর হীরকও কষ্টপ্রদ হয়। (৬)

জ্ঞানী ব্যক্তি, কেবল বর্ণবিভাগ-অনুসারে হীরক ধারণ করেন না। গুণযুক্ত হীরক ধারণ করিলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়, আর বিপরীত-গুণের হীরক ধারণ করিলে বিপরীত ফলের কারণ হয়। (৭)

যে হীরকের একটী মাত্র শৃঙ্গ থাকে, তাহা যদি দলিত কি শীর্ণ বিশীর্ণ হয়, তবে তাহা গুণযুক্ত হইলেও, ধারণ করিতে নাই। (৮)

স্ফুটিত ও অগ্নি-জর্জ্জরিত-শৃঙ্গ হীরক যদি মলিন বর্ণ হয়, আর যদি তাহাতে বিন্দু থাকে, তবে তাহার লালসা করিবেক না। (৯)

যাহার এক প্রান্তে রক্তাভা প্রকাশ পায়, কিম্বা রক্তযুক্ত চিত্রবর্ণ স্ফুরিত হইতে থাকে, সে হীরক ধারণ করা দূরে থাকুক, গৃহে রাখিলেও, ইচ্ছা-মৃত্যু ব্যক্তিরও মরণ হয়। (১০)

যে ব্যক্তি শুচি ও শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া সর্ব্বদা তীক্ষ্ণাগ্র, নির্ম্মল ও সর্ব্ব-প্রকার-দোষ-বর্জ্জিত হীরক ধারণ করে, দিন দিন তাহার শ্রী, সম্পত্তি, পুত্র, ধন, ধান্য, গো, ও অন্যান্য পশু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (১১)

ভারতবর্ষীয় রত্নশাস্ত্রে ও জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে এই এই রূপ অনেক কথা আছে। রত্ন-ধারণের সঙ্গে শরীরের উল্লিখিত দোষ-গুণের সহিত যে কি সম্পর্ক আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহাই হউক, শাস্ত্রের লেখাগুলি মাত্র বলিলাম।

গরুড় পুরাণে লিখিত আছে যে, স্ত্রীলোকেরা সকল রত্নই ধারণ করিবেক; কিন্তু যে নারীর সন্তান কামনা থাকিবেক, তিনি যেন হীরক ধারণ না করেন। যদি করেন, তবে দীর্ঘ, চিপিট, ক্ষুদ্র ও গুণহীন হীরক ধারণ করিবেন। প্রশস্ত হীরক ধারণ করিলে, তাঁহার সন্তানের ব্যাঘাত হইবেক। যথা—

নার্য্যা বজ্রমধার্য্যং গুণ-
বদপি সুতপ্রসূতিমিচ্ছন্ত্যা।
অন্যত্র দীর্ঘচিপিট-
দ্ব্যস্রাৎ গুণৈর্বিমুক্তাচ্চ।"

বৃহৎসংহিতাতেও এই কথা আছে। যথা—

"বজ্রং ন কিঞ্চিদপি ধারয়িতব্যমেকে
পুত্রার্থিনীভিরবলাভি রূশন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
শৃঙ্গাটকচিপুটধান্যবদ্‌স্থিতং যৎ
শ্রোণিনিভঞ্চ শুভদং তনয়ার্থিনীনাম্।"

শুক্রাচার্য্যের রত্নপ্রচারণেও উক্ত আছে যে, "ন ধারয়েৎ পুত্রকামা নারী বজ্রং কদাচন।" পুত্রোৎপত্তির সঙ্গে হীরক-ধারণের যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা বুঝি না।

গুণ ও দোষ।

হীরকের গুণ ও দোষ অনুসারে মূল্যের অল্পতা ও আধিক্য হইয়া থাকে এবং ধারণের যোগ্যাযোগ্য নির্ণয় হইয়া থাকে; সুতরাং গুণ ও দোষ বলা আবশ্যক। গরুড়পুরাণে প্রথমতঃ আকরিক-গুণের, পরে অন্যান্য গুণের উল্লেখ আছে। যথা—

"কোট্যঃ পার্শ্বানি ধারাশ্চ ষড়ষ্টৌ
দ্বাদশেতি চ।
উত্তুঙ্গসমতীক্ষ্ণাগ্রা বজ্রাস্যাকরজা গুণাঃ।"

কোটী অর্থাৎ প্রান্ত বা কোণ, পার্শ্ব, ৬, ৮ কিংবা ১২ প্রকার ধার, উত্তুঙ্গ অর্থাৎ চ্যাপটা নহে, সম, অগ্র সকল তীক্ষ্ণ। এই গুলি হীরকের আকরিক গুণ অর্থাৎ আকর-বিশেষে এ সকল নৈসর্গিক গুণ হইয়া থাকে, পশ্চাৎ ঘষন, পরিকর্ম্ম (পলিশ্) ও অস্ত্রীকরণ (কট্) দ্বারা গুণান্তর আহিত হয়।

"ষট্‌কোটীশুদ্ধমমলং স্ফুটতীক্ষ্ণধারং
বর্ণান্বিতং লঘুসুপার্শ্বমপেত দোষম্
ইন্দ্রায়ুধাংশুবিসৃতিচ্ছুরিতান্তরীক্ষং
এবংবিধং ভুবি ভবেৎ সুলভং ন বজ্রম্।"

ছয় প্রকার কোটীযুক্ত, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, সুপার্শ্ব, সুব্যক্ত ও তীক্ষ্ণধার-যুক্ত, সুন্দর বর্ণ, লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্‌কা, পাশ্-গুলি সুন্দর, দোষবর্জ্জিত, রামধনুর ন্যায় কিরণ বাহির হইতে থাকে, এরূপ হীরক পৃথিবীতে সুলভ নহে অর্থাৎ কখন কখন পাওয়া যায়।

"অত্যর্থং লঘু বর্ণতশ্চ গুণবৎ পার্শ্বেষু
সম্যক্ স্থিতম্।
রেখাবিন্দুকলঙ্ককাকপাদকত্রাসা-
দির্জ্জিবর্জ্জিতম্।"

অত্যন্ত লঘু, বর্ণ ভাল, পার্শ্বদেশ উত্তম রেখা-শূন্য, বিন্দুবর্জ্জিত, নিষ্কলঙ্ক, কাক-পদ ও ত্রাস নামক দোষ না থাকা, এই সকল হীরকের গুণ এবং ইহার বিপরীত হইলেই দোষ।

বৃহৎসংহিতাকার বলেন, হীরক ভিন্ন অন্য অন্য পদার্থ দ্বারা অভেদ্য, লঘু, জলে ভাসে, চন্দ্ররশ্মির ন্যায় স্নিগ্ধ, বিদ্যুৎ, অগ্নি বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রভা বিস্তার করে, এরূপ হীরক অতি উত্তম। আর যাহা কাকপদ নামক দোষ-দুষ্ট, মক্ষিকা ও কেশযুক্ত (ইহাও এক প্রকার দোষ-লক্ষণ) ধাতুযুক্ত, কর্কর বিদ্ধ (কাঁকরের চিহ্ন) চতুকোণ, দিগ্ধ অর্থাৎ লেপযুক্ত, মলাযুক্ত, ত্রাস-দোষে দূষিত, বিশীর্ণ (ভাঙ্গার দাগ), এই সকল দোষ যাহাতে থাকে, তাহা ভাল নহে। এবং যাহা বুদ্বুদের ন্যায়, দলিতের ন্যায় (অগ্রভাগ ভোঁতা), চ্যাপটা, বাসা ফলের ন্যায় লম্বা, এরূপ হীরকও ভাল নহে। যথা—

"সর্ব্বদ্রব্যাভেদ্যং লঘ্বম্ভসি তরতি
রশ্মিবৎ স্নিগ্ধম্।
তড়িদনলশক্রচাপোপমঞ্চ বজ্রং
হিতায়োক্তম্।"

"কাকপদমক্ষিকাকেশধাতুযুক্তানি
শর্করাবিদ্ধম্।
দ্বিগুণাশ্রিদিগ্ধকলুষত্রস্তবিশীর্ণানি
ন শুভানি।"

"যানি চ বুদ্বুদদলিতাগ্রচিপিটি-
বাসোফলপ্রদীর্ঘানি।"
[বৃহৎসংহিতা দেখ।

যদ্যপি বিশীর্ণকোটিঃ
সবিন্দুরেখান্বিতো বিবর্ণো বা।
তদপি ধনধান্যপুত্রান্
করোতি সেন্দ্রাযুধো বজ্রঃ॥

সৌদামিনীবিস্ফুরিতাভিরামং
রাজা যথোক্তং কুলিশং দধানঃ।
পরাক্রমাক্রান্তপরপ্রতাপঃ
সমস্তসামন্তভুবং ভুনক্তি॥
গরুড়পুরাণ।

অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত হীরক দোষান্বিত হইলেও, তাহা ধারণ-কর্ত্তার ধন, ধান্য ও পুত্র বৃদ্ধি করে। সৌদামিনীর ন্যায় স্ফুরণ-গুণবিশিষ্ট ও মনোহর পূর্ব্বোক্ত প্রকারের গুণসম্পন্ন হীরক ধারণ করিলে, রাজা পরাক্রম দ্বারা পরের পরাক্রম ধ্বংস করিয়া রাজ্য ভোগ করিতে পারেন। এই সকল গুণ ভিন্ন হীরকের রাসায়নিক গুণ যাহা রাজ-নির্ঘণ্ট প্রভৃতি বৈদ্যক-গ্রন্থে আছে, তাহার কতিপয় গুণের উল্লেখ করিতেছি।

"হীরক ষড়্‌রসযুক্ত, সর্ব্ব-রোগ-নাশক, সর্ব্বানিষ্ট-নিবারক, সুখ-জনক, দেহ-দৃঢ়কারক, রসায়ন, সারক, শীতল, কষায়, স্বাদু, বমন-কারক ও চক্ষুর হিতকারী।"
[রাজবল্লভ ও রাজনির্ঘণ্ট দেখ।

পরীক্ষা।

হীরক অতি মূল্যবান্ পদার্থ এবং উহা শিল্পকুশল ধূর্ত্ত ব্যক্তিরা কৃত্রিম করিয়া থাকে। সেই জন্য ইহার পরীক্ষা জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। গরুড়-পুরাণোক্ত রত্নপরীক্ষায় লিখিত আছে যে,—

"অয়সা পুষ্পরাগেণ তথা গোমেদ-
কেন চ।

"বৈদূর্য্যস্ফটিকাভ্যাঞ্চ কাচৈশ্চাপি
পৃথগ্বিধৈঃ।
প্রতিরূপাণি কুর্ব্বন্তি বজ্রস্য কুশলা
জনাঃ।
পরীক্ষা তেষু কর্ত্তব্যা বিদ্বদ্ভিঃ
স্বপরীক্ষকৈঃ॥"

অয়ঃ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নির্ম্মল লৌহ, পুষ্পরাগ নামক মণি, গোমেদমণি, বৈদূর্য্য মণি, স্ফটিক, কাচ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্ষার দ্বারা দক্ষ মানবেরা হীরকের প্রতিরূপ অর্থাৎ দৃশ্যে অবিকল এরূপ হীরক প্রস্তুত করিয়া থাকে. এজন্য বিচক্ষণ পরীক্ষক দ্বারা তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। পরীক্ষার প্রণালী এইরূপঃ—

"ক্ষারোল্লেখনশালাভিস্তেষাং
কার্য্যং পরীক্ষণম্।"

ক্ষার, উল্লেখন (চাঁচ) ও শালা-কার্য্য, এই তিন প্রকার ক্রিয়া দ্বারা হীরকের পরীক্ষা হইয়া থাকে। ('শালাভিঃ' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'তোলেশ্চ' পাঠ দেখা যায়।)

"পৃথিব্যাং যানি রত্নানি যে চান্যে
লোহধাতবঃ।
সর্ব্বাণি বিলিখেৎ বজ্রং তচ্চ তৈ র্ন
বিলিখ্যতে।"

পৃথিবীতে যে কিছু রত্ন ও তৈজস ধাতু আছে, হীরক দ্বারা সমস্তেরই উল্লেখিত (উল্লেখন অর্থাৎ চাঁচা দাগ লাগান) হয়, কিন্তু হীরক তাহাদিগের দ্বারা উল্লিখিত হয় না।

"গুরুতা সর্ব্বরত্নানাং গৌরবাধার-
কারণম্।
বজ্রে তান্ বৈপরীত্যেন সূরিয়ঃ
পরিচক্ষতে।"

গুরুত্ব অর্থাৎ ওজনে ভারি হওয়া সকল রত্নেরই গৌরবের হেতু; কিন্তু হীরকে তাহার বিপরীত অর্থাৎ রত্ন-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্কা হওয়াই হীরকের গৌরবের কারণ।

জাতিরজাতিং বিলিখন্তি বজ্রকুরু-
বিন্দাঃ।
বজ্রৈর্বজ্রং বিলিখতি নান্যেন
লিখ্যতে বজ্রম্।"

জাত্যমণি দ্বারা অজাতিমণির এবং হীরক ও কুরুবিন্দ দ্বারা জাত্যমণি ও হীরক দ্বারা হীরকের উল্লেখন করা যায়। অন্য কোন পদার্থ দ্বারা হীরকের উল্লেখন করা যায় না।

"বজ্রাণি মুক্তামণয়ো যে চ কেচন
জাতয়ঃ
ন তেষাং প্রতিবদ্ধানাং ভা
ভবেত্ত্বার্দ্ধগামিনী।
তির্য্যক্ ক্ষতত্বাৎ কেষাঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ
যদি দৃশ্যতে।
তির্য্যগালিখ্যমানানাং সাপার্শ্বেঽপি
হন্যতে।"

হীরক, মুক্তা, এবং অন্য কোন মণি যদি জাত্য হয় অর্থাৎ ঠিক জাতীয় হয়, আর তাহারা আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই সকল বদ্ধ মণির দীপ্তি বা তেজঃ

কিংবা শিখা উর্দ্ধগামিনী থাকে না। তীর্য্যক্ উল্লেখিত (পার্শ্বে বাঁকা করিয়া কাটা) কোন কোন মণির বক্র-কর্ত্তনতা হেতুক যদিও প্রভা বহির্গত হয়, কিন্তু সে প্রভা পার্শ্বদেশেই আহত হয়।

বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে হীরকের পরীক্ষা-সম্বন্ধে এই মাত্র উক্তি আছে। যথা—

"সর্ব্বদ্রব্যাভেদ্যং লঘ্বম্ভসি
তরতি রশ্মিবৎ স্নিগ্ধম্।"

অর্থাৎ হীরক ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দ্বারা হীরক উল্লেখিত হইবেক না। হীরক লঘু ও জলে ভাসে, রশ্মি-যুক্ত অথচ স্নিগ্ধ।

নীতিসার-গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় প্রকরণে হীরকের পরীক্ষা ও প্রশংসা-সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে। যথা—

"রত্নশ্রেষ্ঠতরং বজ্রং নীচে
গোমেদবিদ্রুমে।"

তাবৎ শ্রেষ্ঠ রত্নের মধ্যে হীরকই শ্রেষ্ঠ এবং অধমের মধ্যে গোমেদ মণি ও বিদ্রুমই অধম।

"নায়সোল্লিখ্যতে রত্নং
বিনা মৌক্তিক-বিদ্রুমাৎ।
পাষাণে নাপিচ প্রায়
ইতি রত্নবিদো জগুঃ।"
ন জরাং যান্তি রত্নানি
বিদ্রুমং মৌক্তিকং বিনা।"

মুক্তা ও প্রবাল ভিন্ন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ রত্ন তীক্ষ্ণ লৌহ দ্বারা চাঁচা যায় না এবং প্রায় অর্থাৎ সাধারণতঃ অনেক প্রকার পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া ক্ষয় করাও যায় না।

মূল্য।

হীরকের মূল্য-সম্বন্ধে রত্ন-শাস্ত্রে নানা কথা আছে। তাহার কতিপয় প্রমাণের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যাউক। গরুড় পুরাণ ও কল্পদ্রুম-ধৃত যুক্তি কল্পতরু-গ্রন্থে মূল্য-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"যদি বজ্রমপেতসর্ব্বদোষং
বিভৃয়াৎ তণ্ডুলবিংশতিং গুরুত্বে।
মণিশাস্ত্রবিদো বদন্তি তস্য
দ্বিগুণং রূপক-লক্ষং মূল্যম্।"

সর্ব্বপ্রকার-দোষ-বর্জ্জিত হীরক যদি ২০ বিংশতি তণ্ডুল পরিমাণে গুরু হয়, তবে মণিশাস্ত্রবেত্তারা তাহার দ্বিগুণিত রূপক অর্থাৎ দুই লক্ষ রৌপ্যমূল্য বলিয়া অবধারিত করেন। এই শ্লোকের তণ্ডুল শব্দের অর্থ পারিভাষিক। মণি-শাস্ত্রে হীরকাদি-রত্নের গুরুত্ব-নির্ণায়ক পরিমাণ-বোধক তণ্ডুল শব্দের অর্থ এইরূপ।

"অষ্টাভিঃ সর্ষপৈর্গৌরৈঃ
তণ্ডুলং পরিকল্পয়েৎ।"

৮ আটটী শ্বেত সর্ষপ ওজন করিলে যে পরিমাণ হয়, সেই পরিমাণের নাম "তণ্ডুল"। বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"সিতসর্ষপাষ্টকং তণ্ডুলো
ভবেত্তণ্ডুলৈস্তু বিংশত্যা।
তুলিতস্য দ্বে লক্ষে
মূল্যং দ্বিদ্বানিতে চৈতৎ।"

৮ শ্বেত সর্ষপে এক তণ্ডুল হয়, ওজনে তাদৃশ বিংশতি তণ্ডুল পরিমাণ হইলে, তাহার মূল্য দুই লক্ষ। এই নির্দ্ধারিত-মূল্যের ও ওজনের ক্রমে দুই দুই ভাগ হীন হইলে, এক এক ভাগ অবশিষ্ট থাকা (এক লক্ষ) বুঝিতে হইবেক। গরুড়-পুরাণেও সেইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

"যত্তণ্ডুলৈর্দ্বাদশভিঃ কৃতস্য
বজ্রস্য মূল্যং প্রথমং প্রদিষ্টম্।
দ্বাভ্যাং ক্রমাৎ হানিমুপাগতস্য
স্বৈকাবসানস্য বিনিশ্চয়োঽয়ম॥"

"ত্রিভাগ-হীনার্দ্ধ-তদর্দ্ধ-শেষং
ত্রয়োদশং ত্রিংশদতোর্দ্ধভাগা
অশীতিভাগোঽথশতাংশভাগঃ
সহস্রভাগোঽপি সমানযোগঃ।"

ত্রিভাগহীনে অর্দ্ধহীন, ত্রিংশৎ হীনে ত্রয়োদশ, অশীত হীনে শতাংশ, এবং সহস্র ভাগে তদপেক্ষা অল্প। এই রীতিতে, প্রথম-নির্দ্দিষ্ট প্রমাণের যেমন যেমন হীন বা অল্পতা হইবে, সেই সেই ক্রমে; মূল্যেরও অল্পতা হইবে।

"অনেনাপি হি দোষেণ
গুরুত্যাল্লক্ষেণ দূষিতম্
স্বমূল্যাৎ দশমং ভাগং
মূল্যং লভতি মানবঃ।"

উচিত ওজনের হীরা যদি পূর্ব্বোক্ত দোষে দূষিত হয়, তবে বিক্রেতা মানব, তাহার মূল্য, নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা দশ ভাগের এক ভাগমাত্র পাইবেন।

"প্রকটানেকদোষস্য
স্বল্পস্য মহতোঽপি বা।
স্বমূল্যাচ্ছতশো ভাগো
বজ্রস্য ন বিধীয়তে।"

"স্পষ্টদোষমলঙ্কারে
বজ্রং যদ্যপি দৃশ্যতে।
রত্নানাং পরিকর্ম্মার্থং
মূল্যং তস্য ভবেল্লঘু।"

হীরক স্বল্প হউক, আর বৃহৎ হউক, যদি তাহাতে অনেক দোষের প্রকাশ থাকে, তবে তাহার মূল্য প্রকৃত মূল্যের শত ভাগের এক ভাগ বিধান করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি অলঙ্কারে দোষযুক্ত হীরক থাকে, তবে তাহার মূল্য অল্প এবং হীরক কি অন্যান্য রত্ন যদি পরিকর্ম্মীকৃত (পালিশ) না হয়, তাহা হইলে সেই অপরিকর্ম্মীকৃত রত্নের মূল্যও অল্প হয়। এতদ্ভিন্ন বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে, যে সকল হীরকে কাকপদ, মক্ষিকা, কেশ, ধাতুযুক্ততা, শর্করাবিদ্ধ, লিপ্ত, কলুষিত, ত্রস্ত, বিশীর্ণ, বুদ্বুদ, দলিতাগ্র, চিপিটা, বাসাফলবৎ দীর্ঘতা প্রভৃতি দোষ থাকে, তবে সে সকল হীরকের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা আট ভাগ হানি করিবেক।

"সর্ব্বেষাং চৈতেষাং মূল্যাৎ
ভাগোঽষ্টমো হানিঃ।"

[ইত্যাদি বৃহৎসংহিতা দেখ।

অপিচ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য স্বকৃত নীতি-গ্রন্থের রত্ন-প্রকরণে বলিয়াছেন যে, রাজাদিগের দোষ-গুণেই রত্ন-সকলের

মূল্যের অল্পতা ও আধিক্য হইয়া থাকে। যথা—

"—রাজদৌষ্ট্যাচ্চ রত্নানাং
মূল্যং হীনাধিকং ভবেৎ।"

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাই সঙ্গত কথা বলিয়া বোধ হয়। কাল, দেশ ও পাত্র অনুসারে কেবল রত্ন নহে, সকল দ্রব্যেরই মূল্যের তারতম্য ঘটনা হয়।

শুক্রাচার্য্য-কৃত রত্নাধ্যায়ে, হীরকের একটী সাধারণ নিয়ম আছে। হীরক সকল প্রায় সেই নিয়ম-অনুসারেই ক্রীত বিক্রীত হইয়া থাকে। নিয়মটী এই যে,—

"একস্যৈব হি বজ্রস্য-
মেকরক্তিমিতস্য চ।
সুবিস্তৃতদলস্যৈব
মূল্যং পঞ্চ-সুবর্ণকম্।"
"রক্তিকাদলবিস্তারা
বৃষ্টং পঞ্চগুণং যদি।
যথা যথা ভবেন্ন্যূনং
হীনমৌল্যং তথা তথা।"

এক রক্তি ওজনের এক খানি নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট হীরকের মূল্য ৫ পাঁচ সুবর্ণ (৮০ রতি অর্থাৎ ৮/১০ আনা ওজনের স্বর্ণ মুদ্রার নাম সুবর্ণ।) ইহাই হীরকের মূল্যের উচ্চসীমা বা মূল্যকেন্দ্র। ইহা অপেক্ষা যত রক্তি ওজনে অধিক, বিস্তারে অধিক ও উৎকৃষ্ট হইবে, ততই তাহার মূল্য প্রত্যেক রক্তি অনুসারে ৫ পাঁচ গুণ অধিক হইতে থাকিবেক, এবং যেমন যেমন হীন হইবেক, তেমনি তেমনি মূল্যও হীন হইবেক। এই নিয়মটী এদেশে বহুকাল হইতে প্রচারিত আছে এবং অধুনাতন-কালেও প্রায় এই নিয়মেই হীরকের ক্রয় বিক্রয় সাধিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত গ্রন্থে এই সাধারণ-নিয়মের অতিরিক্ত কএকটী বিশেষ নিয়ম আছে। এস্থলে তাহাও উল্লিখিত করিতেছি। যথা :—

"যথা গুরুতরং বজ্রং
তন্মূল্যং রক্তিবর্গতঃ
তৃতীয়াংশবিহীনন্তু
চিপীটস্য প্রকীর্ত্তিতম্।"
"তদর্দ্ধং শর্করাক্তস্য
চোত্তমং মূল্যমীরিতম্।"
রক্তিকায়াশ্চ যে বজ্রে
তদর্দ্ধং মূল্যমর্হতঃ।"
"তদর্দ্ধং বহবোঽর্হন্তি
মধ্যাহীনা যথা গুণৈঃ।"
"উত্তমার্দ্ধং তদর্দ্ধং বা
হীরকা গুণহীনতঃ।
বর্গরক্তিষু সংধার্য্য
কণানাং নরকং পৃথক্।"
তস্মাংশপঞ্চকং পূর্ব্বং
ত্রিংশদ্ভিস্তদ্ভজেৎ ততঃ।"

রক্তি অনুসারে হীরকের মূল্য যাহা বলা হইল, চিপীট (চেপ্টা) হীরক হইলে, তাহার তৃতীয়াংশ হীন হইবে। শর্করাক্ত নামক দোষ থাকিলে, তাহার অর্দ্ধ মূল্য হইবেক। শ্লোক গুলিতে, ক্রমে উক্ত রূপ নিয়মের অনুগত মূল্যের

অবধারণ করা হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

উপসংহার।

ভারতবর্ষ ও চীনদেশে হীরক, উত্তমরূপ কাটিয়া তাহার দীপ্তি প্রকাশ করিতে রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অবগত ছিলেন। পূর্ব্বে ইউরোপ মহাদেশে হীরক খনি হইতে প্রাপ্ত হইলে, তাহা পরিষ্কৃত করিয়া অলঙ্কারে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু তাহা কাটিয়া ঔজ্জ্বল্য-প্রকাশের নিয়ম পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দিতে লুই ভ্যানবর্গেন্ দ্বারা প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের গলকণ্ডার হীরক অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ। বোর্ণিও ও মলকায় যে হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচুর-পরিমাণে ব্রেজিলে হীরক প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহা ভিন্ন অধুনা ইউরেল পর্ব্বত, উত্তর আমেরিকার কোন কোন অংশ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় হীরক পাওয়া গিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত যত হীরক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় হীরক উত্তম, সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ ও বহুমূল্য। কথিত আছে, কোহিনুর নামক হীরক পাণ্ডবদিগের মুকুটে শোভা বিস্তার করিয়াছিল। ইহার প্রাচীন ইতিবৃত্ত আর বিশেষ কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। ইহা কোন এক অজ্ঞাত-ঘটনায় আলাউদ্দীনের হস্তগত হয়। পরে, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান বাবর ইহা বহুযত্নে অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। ফরাসীস ভ্রমণকারী টাবর্নিয়ার্ অরঙ্গজীবের নিকটে কোহিনুর দর্শন করিয়াছিলেন। এ সময় হরটন্ সিও বর্জ্জিয়া ইহা কাটিয়া সুদৃশ্য করিতে গিয়া, তাহার দীপ্তির হানি করিয়াছিল, এজন্য নৃপতি আরঙ্গজীব তাঁহাকে অপমানিত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। দীল্লি হইতে নাদির সাহা ইহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান, তৎপরে তাঁহার বংশধরের নিকট হইতে আহম্মদ সাহ প্রাপ্ত হইলে, তৎপুত্র সা সুজার নিকট হইতে উহা মহারাজ রণজীৎ সিংহ গ্রহণ করিয়া স্ব-বাহুতে ধারণ করেন। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের পঞ্জাব জয়ের পরে কোহিনুর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকটে প্রেরিত হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডীয়-মহাপ্রদর্শনে উহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সে সময়ে আমষ্টারডম্ নগরবাসী কাষ্টার নামক এক জন প্রসিদ্ধ রত্নব্যবসায়ী দ্বারা উহার উত্তমরূপ অঙ্গীকরণ ও পরিকর্ম্ম সাধিত হইয়াছিল। ভূমণ্ডলের রাজভাণ্ডারে যত হীরক আছে, তাহার মধ্যে কোহিনুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহা এক্ষণে মহারাজ্ঞী এম্প্রেস্ ভিক্টোরিয়ার মুকুটে পরিশোভিত রহিয়াছে।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আর এক খানি বহুমূল্য হীরক আছে, তাহার নাম কম্বারল্যাণ্ড হীরক। উহা ডিউক্ অব্ কম্বারল্যাণ্ডের অধিকারে ছিল।

রুষিয়ার সম্রাটের ত্রিকটে যে অর্লফ্ হীরক আছে, সেখানি অতিবহুমূল্য ও ভারতবর্ষীয় হীরক। উহা নাদির সাহার ময়ূর-সিংহাসন হইতে এক জন ফরাসী অপহরণ করিয়া আর্মেনিয়ায় এক বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। উক্ত বণিক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার এম্প্রেস দ্বিতীয় কাথারিনের নিকটে উক্ত হীরক বিক্রয় করিয়াছিলেন। রুসিয়ার সম্রাটের আর দুই খানি বহুমূল্য হীরক আছে, তাহার এক খানির নাম পোলার ষ্টার, অপর খানির নাম সা।

সা হীরক খানি আব্বাস্ মির্জার পুত্র খসরু, সম্রাটকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। তাহাতে পারস্য-ভাষায় নাম খোদিত আছে। তৃতীয় নেপোলিয়ান্ ভূপতির যে সকল বহুমূল্য হীরক ছিল, তাহার মধ্যে "পিট" ও "ইউজিনি" হীরক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রথমোক্ত মণিখণ্ড গলকণ্ডার খনি হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

রুসিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ৮ আট লক্ষ টাকা মূল্যে "স্যান্‌সি" হীরক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই হীরক খণ্ড ইউরোপে প্রথম অঙ্গীকৃত হইয়াছিল।

শ্রীরামদাস সেন।

মঙ্গল-গীত।*

একি একি আজ মলিন ভারতে
কেন গো প্রমোদ লহরী ছুটে,
প্রবীণ, তরুণ, বালক, সবারি
আননে হরষ ফুটিয়া উঠে?
নিরাশা তামসী চির ঘোর অমা
বহু দিন হ'তে ভারত-মুখ
ঢেকে'ছে, তবুও কেন বঙ্গবাসী
হাসিতেছে আজি ভুলিয়া দুখ?
ওহে বঙ্গবাসী! এখনো শরৎ
আসেনি ত দেশে—বিলম্ব আছে,
এখন ও দুর্গতি- হারিণী শারদা,
নিশ্চিন্তে নিবাসে শিবের কাছে।

এ মলিন বঙ্গে সে তিন দিবস
হাসে বঙ্গবাসী বাহিরে হাসি,
অন্তরে যা থাক্ ভস্ম বা অঙ্গার
মুখে ফুটে তবু কিরণ-রাশি।
নহেক শরৎ, নাহক শারদা,
ভারত আঁধারে আলোক-রেখা
ভারত-শাসন- আসনে রিপুণ
(প্রধান-বিচার-আসনে রমেশ)
আশা'র আলোকে দিয়েছে দেখা।
এতই উল্লাস, এ মধুর হাস
তাই মুখ-আশ ভারত-হৃদে;
আনন্দ-জোয়ার তাই ত ছুটে'ছে
ভেঙে' চুরে' চির দুঃখের বাঁধে।

---

* অনারেবল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্রের হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি হওয়া উপলক্ষে কোন ভদ্র-মহিলা-রচিত এই গীতিটী সাদরে প্রকাশিত হইল। স।

কেন কেন ইহা নহে ত নূতন
শেত-প্রতিনিধি কতই আসে।
বঙ্গবাসী তাহে, নহে এত সুখী,
কই তাহে এত হরষ না দেখি,
মলিন ভারত নাহিক হাসে।
কেনই হাসিবে ?
শুধু বাহ্য শোভা, শুধু আড়ম্বর
যদি গো হরষ-কারণ হত,
ধূমকেতু, বজ্র উদিলে অম্বরে,
ফুটিত কমল কুমুদ কত।
নয় ধূমকেতু নহেক অশনি
অনন্ত আঁধারে আলোক-রেখা
সত্য-পরায়ণ ধার্ম্মিক রিপণ,
ভারত-শাসনে দিয়েছে দেখা।
গাও সবে জয় ভারতের জয়
'রিপণের জয়' আবার তুলি'।
জয় জগদীশ, 'রমেশের জয়'
বঙ্গে গাও জয় বেদনা ভুলি'।
বীণ, পাখোয়াজ, বাজাও এস্রাজ,
হার্ম্মোনী পিয়ানো মধুর বুলী
বাজা'য়ে তান্পুরা, ধর উচ্চে তান
মিলা'য়ে পঞ্চমে কর যশোগান
"ধন্য বিচারক রিপণ ধীমান্"
গাও সমস্বরে সকলে মিলি'
গাও চিরদুঃখ-বেদনা ভুলি'।
বিহিত বিধান, যদিও রিপণ
করে'ছেন তবু বঙ্গবাসিগণ!
গাও হে হইয়া হরষে মগন
ভুলি' ভূতপূর্ব্ব বেদনাগুলি।
গাও দেশময় ভারতের জয়
রিপণের জয় সবাই মিলি'।

আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা।

দারিদ্র্য মাহাত্ম্য।

জগতে অবিমিশ্র সুখ দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখের সঙ্গে দুঃখ, দুঃখের সঙ্গে সুখ নিরন্তর মিশাইয়া আছে। দরিদ্রের কুটীরে ও রাজার অট্টালিকায় খুঁজিলে এই দুইই মিলিবে। তবে অবস্থাভেদে বেশী কম মাত্র। অনেকের সংস্কার আছে, দারিদ্র্য-দুঃখ অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর বিষয় আর নাই। কিন্তু তাহা ভ্রম। চিন্তাশীলতা, পরদুঃখানুভাবকতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, মমতা প্রভৃতি যে সকল গুণে মানব-মন ও মানব-হৃদয় স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে, তাহা রাজার অট্টালিকা অপেক্ষা দরিদ্রের কুটীরেই অধিকতর বিকাশ-মান। যে নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদ লইয়াই সতত ব্যস্ত, তাহার ভাবিবার অবকাশ কই? যে অভাব কাহাকে বলে, কখন অনুভব করে নাই, সে পরের দুঃখে কাতর কিরূপে হইবে? মনে উদিত হইবামাত্র যাহার ইচ্ছা পূরণ হইয়াছে, সহ্যগুণ তাহার পরিপুষ্ট হইবে কিরূপে? দয়ার আভিধানে

যাহার হৃদয় কখন বিধৌত হয় নাই, সে দয়া প্রকাশ করিতে জানিবে কিরূপে? যে নিরন্তর তোষামোদকারিগণে পরিবেষ্টিত, সে স্নেহ মমতা কখন পায় নাই, সুতরাং স্নেহ মমতা দেখাইবে কিরূপে?

স্বায়ত্ত সুখের প্রাধান্য।

যাহাদিগের সুখ দুঃখ বাহ্য বস্তুর উপরে নির্ভর করে, তাহারা কখনই প্রকৃত সুখী নহে। রাজসিংহাসনে বসিয়াও, রাজমুকুট পরিয়াও তাহাদিগের হৃদয় সতত কম্পমান। এই জন্যই ভারতীয় নীতি বাহ্য বস্তুতে অনাস্থা শিক্ষা দিয়াছিল *। এই জন্যই গ্রীক্-নীতি-প্রবর্ত্তয়িতা সক্রেটিস্ উপদেশ দিয়াছিলেন 'যে যে পরিমাণে অভাব সঙ্কোচ করিতে পারিবে, সে সেই পরিমাণে ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে।'

প্রকৃতির উপরে জয়লাভ করাই প্রকৃত রাজত্ব। সে রাজত্ব রাজার অদৃষ্টে ঘটে না। কারণ, রাজার অভাব অনন্ত। যে মহাত্মা অভাব সঙ্কোচ করিয়া প্রকৃতির দাসত্ব হইতে উন্মুক্ত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। এ রাজত্বের গৌরব ভারতীয় আর্য্যেরাই বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। এই জন্যই আর্য্য তাপসেরা সংসার ছাড়িয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে গিয়া যোগসাধনা করিতেন। তাঁহাদিগের আত্মসংযমে মুগ্ধ হইয়া অনেক নরপতি তাঁহাদিগের চরণে লুণ্ঠিত-শির হইতেন।

আমরা বলিয়াছি, মানুষের সকল অবস্থাই সুখদুঃখমিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষের অদৃষ্টে নাই। সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখও মানুষকে ভোগ করিতে হয় না। যাঁহারা অভাবের প্রসর সঙ্কোচ না করিয়া বরং বাড়াইয়া থাকেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করেন, একথা আমরা বলি না। অভাবের প্রসরবৃদ্ধিই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি। প্রাকৃতিক অভাব-মোচনের চেষ্টাতেই শিল্প বিজ্ঞানের আবির্ভাব। বিজ্ঞানবলে মানুষ প্রকৃতির উপরে অন্য প্রকার প্রভুতা লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক পরিমাণে ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন করে। ভারতীয় আর্য্যেরা প্রকৃতির আধিপত্য সহিতে না পারিয়া ক্রোধে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ দমিত বা নির্ম্মূল করিয়াছিলেন; আধুনিক ইউরোপীয়েরা প্রকৃতিকে দমিত না করিয়া তাহাকে আজ্ঞাধীন দাসী করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্যেরা প্রকৃতিকে তাঁহাদিগের উন্নতি-পথে কোন অভাব-কণ্টক রোপিত করিতে দিতেন না; আধুনিক ইউরোপীয় তাহাতে আপত্তি না করিয়া প্রকৃতি দ্বারাই সেই কণ্টক উত্তোলিত করিয়া লইতেছেন। দুই অবস্থাতেই সুখ আছে বটে; কিন্তু একে সুখ নিজায়ত্ত—অপরে সুখ প্রকৃতি-সাপেক্ষ। যে সুখ নিজসাপেক্ষ, তাহাই

---

* "অনাস্থা বাহ্যবস্তুষু।"—কুমারসম্ভব।

অমূল্য; তাহাই অধিকতর প্রার্থনীয়। সে সুখে ধনীরা সাধারণতঃ বঞ্চিত।

দরিদ্র স্বভাব-সন্ন্যাসী।

সৌভাগ্যে মানুষের অন্তর এত শিথিলিত হয়, যে তাহা কঠোর ধর্ম্ম-পালনে অক্ষম হইয়া পড়ে। একটু সংযম অভ্যাস হইলেই, সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির যশ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু দরিদ্রের সাধনা অতি কঠোর। দরিদ্রের পদে পদে বিপদ, সুতরাং দরিদ্রের অবিচলিত সহিষ্ণুতা প্রয়োজনীয়। দরিদ্রের সকল বিষয়েই অভাব, সুতরাং অনিবার্য্য অভাবে উপেক্ষা একান্ত শিক্ষণীয়। দরিদ্র নিজের অভাব বুঝে, সুতরাং পরের দুঃখে তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। দরিদ্র জগতে ভালবাসা পায় না, ভালবাসার অভাবের মর্ম্মন্তুদ যাতনা সে বুঝে, এই জন্য পরকে ভাল বাসিতে শিখে। দরিদ্রকে লোকে ঘৃণা করে, ঘৃণার মর্ম্মন্তুদ প্রহারে তাহার অস্থি চর্ম্ম জর্জ্জরিত; তাই তাহার হৃদয় দুঃখী দেখিলেই কাঁদিয়া উঠে, সহানুভূতির বেগে তাহার অশ্রু মুছাইতে যায়, নিজের অশ্রুজলে তাহার হৃদয়ের যাতনা ক্ষালিত করিতে চেষ্টা করে।

দরিদ্রে ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ অল্প। পর্ণকুটীর বা তরুতল উভয়েরই আবাসস্থল। কৌপীন বা জীর্ণ বসন উভয়েরই পরিধান। স্বল্প-বনজাত শাকাদিই উভয়ের ভক্ষ্য। অনাচ্ছাদিত ভূমিতলই উভয়ের শয্যা। ধূলি বা ভস্ম উভয়ের অঙ্গাভরণ। তবে প্রভেদ এই যে, সন্ন্যাসীর এই অবস্থা স্বেচ্ছাকৃত, দরিদ্রের অবস্থা দৈবনির্দ্দিষ্ট। সন্ন্যাসী ভোগ্য বস্তুর অসারতা ও অনিত্যতা দেখিয়া ভোগাসক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া অতি কঠোর দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দরিদ্রের দারিদ্র্যব্রতে দীক্ষা স্বেচ্ছাধীন নহে। দীক্ষা স্বেচ্ছাকৃত হউক বা না হউক, ব্রতপালনের ফল উভয়েতেই একইরূপ। সহিষ্ণুতা, সংযম, আত্মত্যাগ ও পরদুঃখানুভাবকতা প্রভৃতি যে সকল গুণে মানুষ দেবতা হয়—এই ব্রতপরিপালনে সেই সকল গুণ স্বতঃই দরিদ্রের অভ্যস্ত হয়। সুতরাং দরিদ্র সঙ্কল্প বিনা ও সন্ন্যাসী দীক্ষা ব্যতীতও যোগী। যে দরিদ্র সাধনায় সিদ্ধ, অন্তরের মাহাত্ম্যে সে জগতের পূজনীয়।

দারিদ্র্যে ঘৃণা জাতীয় পতনের মূল।

যে জাতি দরিদ্র দেখিলেই ঘৃণা করে, ধনী দেখিলেই তাহার নিকটে নতশির হয়, সে জাতির অধঃপতন নিশ্চয় আরম্ভ হইয়াছে। যখন রোমের বিজয়দর্পে জগৎ কাঁপিয়াছিল, তখন রোমের ডিক্‌টেটরগণ রাজমুকুট, রাজপরিচ্ছদ তুচ্ছ করিয়া সামান্য কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যত দিন রোম সংযমী ছিল, যত দিন রোম নিজের দারিদ্র্যে কুণ্ঠিত হইত না, প্রত্যুত গরিমা প্রকাশ করিত, তত দিন রোমের বীরত্বে,

রোমের মাহাত্ম্য জগৎ বিজয়ী! কিন্তু যে অবধি রোম পরের সুবর্ণে মণ্ডিত হইলেন, দাসত্বে লজ্জা বোধ করিলেন, সেই অবধি রোমের বীরত্ব, রোমের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইল। অমনি রোম দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন।

আবার বিংশতি পুরুষ-পরম্পরায় দাসত্বে যখন ইতালী জর্জ্জরিত হইল, তখন জাতীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গ্যারিবল্ডি,ম্যাটসিনি-প্রমুখ ঋষিপ্রবরগণ দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিলেন। নিজ নিজ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। ছদ্মবেশে, গুপ্তবেশে, অনাহারে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া এই সন্ন্যাসীর দল জাতীয় উদ্ধারের উপকরণসামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। জননীর অশ্রুজল, প্রিয়তমার কাতরবচন, শিশুগণের ক্রন্দনও ইহাদিগের স্থিরসঙ্কল্প চিত্তকে জাতীয় ব্রত হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। যাঁহারা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়া, বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া, স্বদেশের দুঃখ ভাবিবার অবসর পান নাই; এবং যাঁহারা স্বদেশের উদ্ধারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'কপর্দ্দকশূন্য' 'উন্মাদগ্রস্ত' বলিয়া পরিহাস করিতেন, ইতালীর উদ্ধার তাঁহাদিগ দ্বারা সংসাধিত হয় নাই। যাঁহারা বেতনের লোভে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আত্মবিক্রীত হইয়াছিলেন এবং প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত স্বদেশের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, স্বদেশী আশ্রিত বৈপ্লবিক স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের রুধিরেও প্রভুর চরণ বিধৌত করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই, সেই জাতিকলঙ্ক কুলাঙ্গারগণ দ্বারা ইতালীর অনিষ্ট বই আর ইষ্ট হয় নাই। তাহাদিগ দ্বারা বরং ইতালীর সৌভাগ্যের দিন, স্বাধীনতার দিন দূরবিক্ষিপ্ত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু যে চীরধর কপর্দ্দকশূন্য মনীষিগণ স্বজাতির উদ্ধারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অর্দ্ধ শতাব্দীর নিরন্তর যত্নে—অজস্র রক্ত-মোক্ষণে অভাবনীয় ইতালীর স্বাধীনতা, বৈপ্লবিকগণের স্বপ্নরাজ্য হইতে প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইল।

মহর্ষি গ্যারিবল্ডি ইতালীর বৈপ্লবিক সেনার অধিনায়ক হইয়া অষ্ট্রিয়গণকে ইতালী ক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিয়া রাজর্ষি ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া আপনি নিজ আবাসে গিয়া আবার স্বহস্তে হলচালন আরম্ভ করিলেন। ইচ্ছা হইলে,যিনি স্বয়ং সম্রাট হইতেও পারিতেন, তিনি জাতীয় পেন্‌শন্ পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই মহর্ষিপ্রবর এখন ক্যাপ্রেরা দ্বীপের কুটীরাবাসে স্বহস্তকৃষ্ট কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।* বোধ হয়, কেন

* এ প্রস্তাবের এ অংশটুকু অনেক দিন পূর্ব্বে লেখা হয়। তখন গ্যারিবল্ডি জীবিত ছিলেন।

বিধাতা ইতালীর রক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি সেই দ্বীপস্থ কুটীরাবাসে থাকিয়াও ইতালীর চিন্তায় নিরন্তর নিমগ্ন। একদিন ইতালীর সৌভাগ্য-সূর্য্যের মধ্যোদয় কালে—ইতালীর ডিক্‌টেটরগণও এইরূপ মাহাত্ম্য ও আত্মত্যাগ দেখাইয়াছিলেন। দারিদ্র্য-ব্রত উদ্‌যাপনেই ইতালী তিন বার জগতে রাজত্ব করিলেন।

ভারতে দারিদ্র্য-ব্রত-গ্রহণের আবশ্যকতা।

যদি কোন দেশে এখন দারিদ্র্যব্রত-গ্রহণের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা এই ভারতে। ভারতের সৌভাগ্য-দিনে পারলৌকিক সন্ন্যাসিগণের প্রোজ্জ্বল চরিত্রগৌরবে ভারত উদ্ভাসিত হইয়াছিল; তাঁহাদিগের আত্মত্যাগের মোহিনী শক্তি-বলে ভারতীয় রাজকুল ও আত্মস্বার্থ জাতীয়স্বার্থে বলি দিতে শিখিতেন। বলা বাহুল্য যে, তখনকার ব্রাহ্মণেরা অনেকেই এই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন। কৃষকেরা ধান কাটিয়া লইয়া যাইবার সময়ে যে সকল পক্ক ধান্য ক্ষেত্র হইতে ভূতলে খসিয়া পড়িত, তাঁহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া সেই সকল ধান্য আহরণ করিতেন। গৃহপালিত হরিণদিগকে খাওয়াইয়া সেই ধান্যের যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই সিদ্ধ করিয়া তাঁহারা উদর পূরণ করিতেন। ইহারই নাম উঞ্ছবৃত্তি। অরণ্য-বনজাত ফলমূল ও শাকাদিও তাঁহাদিগের খাদ্যের উপকরণ-সামগ্রী ছিল। তাঁহাদিগের প্রেম সর্ব্বজীবে পরিব্যাপ্ত ছিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুরাও সেই প্রেমে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিত। তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ বিশ্ব-প্রেমের মোহিনী শক্তিবলে তাহারা আপন আপন হিংস্র প্রকৃতি ভুলিয়া যাইত। ঋষিগণের আশ্রমে ব্যাঘ্র হরিণে, ও ভেক সর্পে একত্র জলপান করিত। এ গল্প নয়, কবিকল্পনা নয়, প্রকৃত ইতিহাস। চরিত্রগৌরবে ও আত্মত্যাগের মোহিনী শক্তিবলে জগৎ করতলস্থ করা যাইতে পারে। যে যোগী এ সাধনায় সিদ্ধ, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। ঋষিগণ এই সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন বলিয়াই, প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণও তাঁহাদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠদেব মহারাজ রামচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন, "মহারাজ আপনি নূতন সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন। আপনাকে একটী উপদেশ দিই, সেই উপদেশের অনুবর্ত্তন করিলেই আপনি আদর্শ রাজা হইতে পারিবেন। 'আপনি কদাচ প্রজাদিগের মতের বিরুদ্ধ আচরণ করিবেন না'।" রাম মহর্ষির এই গভীর উপদেশ ভক্তিভাবে শিরোধার্য্য করিলেন। এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মহর্ষির এই উপদেশ-পালনে যদি আমাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা সীতাকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, আমি তাহাকেও

পরাঙ্মুখ হইব না। অনতিবিলম্বেই দুর্ম্মুখ আসিয়া সংবাদ দিল—'লোকে রাবণগৃহে বসতি জন্য সীতাদেবীর চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দিহান; লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষা তাহারা বিশ্বাস করে না।' এই সংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র প্রথমে বিদ্যুৎ-পৃষ্টের ন্যায় হতচেতন হইয়া পড়িলেন। অচিরকাল মধ্যে সেই রাজ সন্ন্যাসীর সুদৃঢ় চিত্ত প্রাকৃতিক বল ধারণ করিল। তিনি এই মাত্র ঋষি-বাক্যের উত্তরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রজাগণের মনস্তুষ্টি বিধানানলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা সীতাকেও আহুতি দিবেন। সে প্রতিজ্ঞা ও সে ঋষিবাক্য কখনই লঙ্ঘন করা হইবে না। ইহাতে হৃৎপিণ্ড দেহ হইতে উৎপাটিত হয় হউক, রামের প্রাণ বিয়োগ হয় হউক—তাহাতেও রাম বিচলিত হইবার নহেন। কর্ত্তব্য স্থির হইল। অমনি লক্ষ্মণকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, 'পূর্ণগর্ভা সীতাদেবীকে গঙ্গাতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস।' মনীষীর সে সুদৃঢ় তীব্র আদেশ লঙ্ঘন করিতে লক্ষ্মণেরও সাহস হইল না। সেই ভীষণ ও লোমহর্ষণ আদেশ তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠিত হইল। ঋষির উপদেশ প্রতিপালিত হইল। উপদেশক ও উপদিষ্টের মহিমা জগতে উদ্ঘোষিত হইল। এরূপ উপদেশ ও এরূপ প্রজাস্বার্থে রাজস্বার্থের বলির উদাহরণ আর কোথায়?

দারিদ্র্যব্রত বা সন্ন্যাসের মহিমা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি বিশ্বামিত্র রাজসিংহাসন ও রাজকীয় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যিনি উপদেষ্টা হইতে চান, যিনি মানবজাতির পরিচালক হইতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে নিজস্বার্থ পরস্বার্থে বলি দিতে হইবে। নিজের ঐশ্বর্য্য পরহিতে ব্যয়িত করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। তাই তিনি নিজের রাজ্য ও রাজসিংহাসন জাতি-হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি ঋষিব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘোরতর তপস্যায় তিনি জগৎ কাঁপাইয়াছিলেন। তপোবলে তিনি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজা বিশ্বামিত্রকে কে চিনিত? কিন্তু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র জগতে বিদিত, জগতে পূজিত।

দারিদ্র্যব্রত বা সন্ন্যাসের মহিমা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই মহর্ষি শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী প্রেমময়ী ভার্য্যা ও শশাঙ্কপ্রতিম পুত্রের দিকে না তাকাইয়া জগতের দুঃখ মোচনার্থ তিনি গ্রহীতব্রত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সুখভোগ করিতে হইলে, তাহার অনুরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। দুঃখ বাদ দিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করা কাহারই ভাগ্যে ঘটে নাই, এবং প্রকৃতির শৃঙ্খলানুসারে কখন কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। জন্মের সঙ্গে মৃত্যু, উদয়ের সঙ্গে অস্ত, ভোগের সঙ্গে পীড়া, প্রণয়ের সঙ্গে

বিচ্ছেদ, মৎস্যের সঙ্গে কণ্টকের ন্যায় দুষ্পরিহার্য্যরূপে মিশাইয়া আছে। এই জন্য সেই ঘোরযোগী সঙ্কল্প করিলেন সুখ ও দুঃখ উভয়েরই হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। তাঁহার কঠোর সাধনায় মানবজাতি দুষ্পরিহার্য্য প্রাকৃতিক দুঃখ সকল হইতে মুক্তি লাভ করিল না বটে, কিন্তু কতকগুলি পরিহার্য্য আত্মকৃত দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। মৃত্যু জগৎ হইতে নিরাকৃত হইল না বটে, কিন্তু আত্মসংযম বলে বিদূরেবিক্ষিপ্ত হইল। জগৎ হইতে অকাল মৃত্যু উঠিয়া গেল। বৌদ্ধজগতে সকলেই ভাই ভাই, সুতরাং বিষাক্ত শ্রেণী-বিভাগ-জনিত দুঃখ জগৎ হইতে উঠিয়া গেল। কেহ কাহাকে ঘৃণা করে না, কেহ কাহারও বিদ্বেষী নয়, সুতরাং বৌদ্ধজগৎ হইতে বিবাদ বিসংবাদ বিগ্রহাদি উঠিয়া যাইতে লাগিল। শাক্যসিংহের বিশাল হৃদয়-ক্ষেত্রের পবিত্র ছবি সমস্ত বৌদ্ধজগতে প্রতিবিম্বিত হইল। তাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র আশ্রমী সংসার ছাড়িয়া আত্মসুখ পরদুঃখে বলি দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকপদে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদিগের পবিত্র চরিত্রের দৃষ্টান্তে ও প্রচারে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। সেই কপর্দ্দকশূন্য সন্ন্যাসীর দল জগতে মৃত দেহে নবজীবন সঞ্চারিত করিলেন। সে দারিদ্র্য ও বৈরাগ্যে জগৎ মুগ্ধ হইল। এখন বৌদ্ধ-প্রচারকগণের সে দারিদ্র্যব্রত ও সন্ন্যাসের অভাব হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রভাবও কমিতে আরম্ভ হইয়াছে।

আবার চল, খ্রীষ্ট-ভূমিতে যাই। এস, দেখিগে কি মোহমন্ত্রে সেই যোগিবর ইউরোপ ভূমি ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। যখন রোম সাম্রাজ্য তদাপরিজ্ঞাত জগৎকে বৈষম্য দুষ্ট করিয়াছিলেন, যখন রাজা প্রজায়, ধনী দরিদ্রে, সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্তে, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকে, ঘোরতর বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেই তমসাচ্ছন্ন গগনে সহসা দৈববাণী উঠিল, 'তোমরা সবে ভাই ভাই'। জগৎ হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল 'তোমরা সবে ভাই ভাই।' ঋষিপ্রবর যীশু গাইলেন, 'আমরা সবে ভাই ভাই'। সে মধুর সঙ্গীতে জগৎ মুগ্ধ হইল। ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্যে শাক্যসিংহ গাইয়াছিলেন, 'আমরা সবে ভাই ভাই' আজ যীশু প্রতীচ্যে গাইলেন, 'আমরা সবে ভাই ভাই'। জগৎ ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনি উঠিল 'আমরা সবে ভাই ভাই'। সেই মধুর সঙ্গীতে রাজার মস্তক হইতে মুকুট খসিয়া পড়িল, দাসের পা হইতে শৃঙ্খল খুলিয়া গেল। সেই যোগিবর নিজস্বার্থ পরস্বার্থে বলি দিয়া সেই প্রকাণ্ড সত্যের প্রচারে বহির্গত হইলেন। জগৎ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখে শুনিল, 'আমরা সব এক পিতার সন্তান, আমরা সবে ভাই বোন্'। তিনি বলিলেন, 'বরং নিজ সম্পত্তি দীনদুঃখীকে

দান করিয়া নিজে ফকীর হইতে পার, যদি কাল কি খাইব, এ ভাবনায় আকুল না হও, তবে আমার সঙ্গে আইস। এইরূপে তিনি পূর্ণ আত্মত্যাগ প্রচারকের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের আদিম প্রচারকগণে এই পূর্ণ আত্মত্যাগ ছিল বলিয়াই, খ্রীষ্টধর্ম্ম অসংখ্য বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া জগতে সাম্যের বিজয়দুন্দুভি উদ্ঘোষিত করিতে পারিয়াছিল। সেই আত্মত্যাগের বলে আজও খ্রীষ্টধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক ইউরোপকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে আজও ইউরোপে কত কত অতিমানুষ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে! কত কত ভাই ভগিনী আত্মসুখ পরসুখে আহুতি দিয়া কখন রণক্ষেত্রে আহত সৈনিকের পার্শ্বে শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেছেন, কখন খ্রীষ্টধর্ম্মের অমূল্য সত্য প্রচারের জন্য সাহারার অনন্ত বালুকাময় ক্ষেত্রে অনাহারে প্রাণ হারাইতেছেন। ভারত এই খ্রীষ্ট প্রচারকগণের নিকটে অনেক ঋণী। ভারতবাসিগণ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এই প্রচারকগণ জন্মভূমি ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া এই ভারতক্ষেত্রে পরহিতব্রতে সমস্ত জীবন আহুতি দিয়াছেন। প্রত্যাখ্যাত ও পদে পদে অপমানিত হইয়াও এই সন্ন্যাসীর দল ভারতের হিত-চিন্তায় নিরন্তর নিমগ্ন। যখন ভারতগগন অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, তখন ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথমে ভারতে জ্ঞানজ্যোতি বিকীরণ করেন। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্ট মিসনরিগণই বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় প্রথমে সংবাদপত্র প্রচার করেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথমে হস্তক্ষেপ করেন। ক্রমে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের পথের অনুসরণ করিয়াছেন। এই সকল মিসনরি খ্রীষ্টের আত্মত্যাগের, খ্রীষ্টের সন্ন্যাসের কণামাত্র পাইয়াও ভারতের কত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। যদি ইহাঁরা খ্রীষ্টধর্ম্মের আদিগুরু ও আদি-প্রচারকগণের ন্যায় পূর্ণ যোগী হইতে পারিতেন, যদি ইহাঁরা আত্মস্বার্থে পূর্ণ আহুতি দিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতীয় ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। ভারতে আজ খ্রীষ্টধর্ম্ম একচ্ছত্রী হইত। ভারতবাসিগণ আজ এক ধর্ম্মসূত্রে ইউরোপের সহিত গ্রথিত হইত। ভারতের অভ্যুত্থানের প্রধান অন্তরায় ভারতীয় জাতি-নিচয়ের পরস্পর বিদ্বেষ উঠিয়া গিয়া ভারত আজ একটী প্রকাণ্ড ও অনন্তশক্তি-সম্পন্ন রাজনৈতিক জাতিরূপে পরিণত হইত। তাহা হইলে আজ আমাদিগকে ভারতের জাতি-সমন্বয় ও ধর্ম্মসমন্বয়রূপ দুর্ভেদ্য সমস্যার মীমাংসায় পলিতকেশ হইতে হইত না।

ভারতের এই দুর্ভেদ্য সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা আধুনিক সময়ে আর এক যোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আত্মত্যাগ বলে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ঐ যে শিশুজাতি দেখিতেছ—রণে অজেয়,

দৃঢ়তায় অবিচলিত, ভ্রাতৃপ্রেমে বিগলিত, কৃতজ্ঞতাধর্ম্মে বিস্ফুটপ্রাণ—ঐ ভারত-গৌরব, ভারতপ্রাণ শিখজাতি সেই যোগিবরের আত্মত্যাগের ও স্বদেশানুরাগের জীবন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। চিলেনওয়ালা সমরক্ষেত্রে ইংরাজবীর্য্যবহ্নি যে শিখ-জাতির অমিততেজে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, সিপাহি-বিদ্রোহে যে শিখ-জাতির অপ্রমেয় বীরত্ববলে ইংরাজজাতি কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, আফ্‌গানযুদ্ধে যে শিখজাতির অদ্ভুত রণনৈপুণ্যে ব্রিটনজাতির মানরক্ষা হইয়াছিল, সেই প্রকাণ্ড অজেয় শিখ-সেনা, শিখগুরু গুরুগোবিন্দের গভীর সাধনার ফল। যখন যবন-অত্যাচারে ভারতবক্ষ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, সেই সময়ে গুরুগোবিন্দের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, এই হিন্দু যবন বিদ্বেষ প্রশমিত না হইলে, উভয় জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। সে চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিল। সেই ঋষিবর সমাধিবলে দেখিলেন, এই অবশ্যম্ভাবী অনিষ্ট নিবারণের একমাত্র উপায় উভয় জাতির মধ্যে অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন-সংস্থাপন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি শিখধর্ম্মকে এক নূতন আকার দিলেন। নানকের শিখধর্ম্ম একেশ্বর-বাদ ও পরকাল লইয়াই থাকিত, ইহ-লোকের সহিত তাহার বড় সংস্রব ছিল না। কিন্তু গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিখধর্ম্মকে ঐহিক ইষ্টসাধনেই অধিকতর নিয়োজিত করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, এ ধর্ম্মে হিন্দু যবন, ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ নাই। এ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবা-মাত্র সকলেই ভাই ভাই হইবে, সকলেই এক পরিবার হইবে। গুরুগোবিন্দ এই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে দীক্ষিত হইলেন। দলে দলে হিন্দু যবন তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইতে লাগিল। তিনি দীক্ষিতগণকে আলিঙ্গন করিয়া ভ্রাতৃ-প্রেমে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নবদীক্ষিতের অন্ন সকলকেই গ্রহণ করিতে হইত। তাহাতে পাছে কাহারও কোন প্রকার অশ্রদ্ধা হয়, এই জন্য তিনি দীক্ষা-দিনে প্রত্যেক নবদীক্ষিতকে অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া তাঁহাকে দিতে বলিতেন। শিষ্য ভক্তিভাবে গুরুকে অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দিত। গুরু তাহা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভোজন করিতেন। সুতরাং তাহার অন্নজলগ্রহণে আর কাহারও কোন আপত্তি থাকিত না। শিখ-জাতির উন্নতি, শিখজাতির সুখ ভিন্ন গুরুগোবিন্দের আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি স্বয়ং নিষ্কাম যোগী ছিলেন। নিজের সুখ, নিজের সম্পত্তি, নিজের সৌভাগ্য কখন তাঁহার চিন্তাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত না। তিনি শিখজাতির হিতানলে আত্মহিতের পূর্ণ আহুতি দিয়াছিলেন। এই জন্যই শিখজাতি তাঁহার নামে আজও মন্ত্রমুগ্ধ। এইজন্যই তাঁহার শিষ্যেরা কোন বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় কি, জানিতে পারিলেই

তৎসাধনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইত। রণস্থলে গুরুগোবিন্দের নামোচ্চারণে তাহাদিগের ধমনীতে সহস্রগুণ বলোপচয় হইত। গুরু-গোবিন্দের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও অপূর্ব্ব ভ্রাতৃ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অসংখ্য হিন্দু যবন চিরবিদ্বেষ ভুলিয়া এক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে লাগিল। যে হিন্দু যবন পরস্পরকে পরস্পর দেখিলেই খড়্গহস্ত হইত, আজ তাহারা স্পর্শমণির স্পর্শে ভ্রাতৃ-প্রেমে গদ গদ হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, আজ তাঁহাদিগের প্রেমপূর্ণ ভাই ভাই গানে জগৎ মুগ্ধ, আজ সেই সমবেত সেনার বিজয়দর্পে দিল্লীর সিংহাসন টলটলায়মান। আজ এই সমবেত নারায়ণী সেনার নিকটে যবনসেনা প্রতিপদে পরাজিত; ভারতে যবন সাম্রাজ্য যায় যায়, এমন সময় এক ঘাতক হস্তে সেই পরমযোগীর মৃত্যু হইল। গুরুগোবিন্দের সমস্ত সঙ্কল্প বৃথা হইল। ভারতে এতদিনে হিন্দু যবন মিলিয়া একটী অরিদুর্দ্দম বিশাল জাতির উৎপত্তি হইত। ভারতের অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিল বলিয়াই, অসময়ে গুরুগোবিন্দের মৃত্যু হইল। গুরুগোবিন্দ! আর একবার ভারতে আসিয়া তোমার অনন্ত প্রেমস্রোতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ও হিন্দু-যবন ভেদ ভাসাইয়া দেও। প্রত্যেক ভারতবাসীর শিরায় শিরায় তোমার প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম সঞ্চারিত কর। দেব! আর একবার স্বর্গ ছাড়িয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সোণার ভারতকে নরক হইতে স্বর্গে লইয়া যাও; আর একবার তোমার আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে মরণোন্মুখ ভারতকে সঞ্জীবিত কর। বীর সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে আর একবার ধরায় অবতীর্ণ হইয়া বীরত্ব ও সন্ন্যাস ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার কর। সব যায়, রসাতলে যায়, একবার দেখা দেও। তোমার অতি-মানুষ শব সাধনার ফল-স্বরূপ সেই নারায়ণী সেনা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তুমি যে ভ্রাতৃপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের ভাব সংক্রামিত করিয়াছিলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে তাহা চলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে যে বীরত্ব সংক্রামিত করিয়া গিয়াছ, সে বীরত্ব এখনও অটুট রহিয়াছে, কিন্তু সে সন্ন্যাস ও সে আত্মত্যাগ তোমার তিরোধানে বিলুপ্ত হইয়াছে! তাই আজ তাহারা দাস; এবং সেই দাসত্ব নিবন্ধনই তাহারা আজ সমস্ত ভারতবাসীর ঘৃণার পাত্র। যে হৃদয় এক দিন ভ্রাতৃপ্রেমে স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল, সে হৃদয় আজ ভ্রাতৃ-রুধিরে কলঙ্ককালিমা ধারণ করিয়াছে। যে দিগ্বিজয়িনী সেনা এক দিন স্বদেশহিতব্রতে জীবন আহুতি দিয়াছিল, আজ কিঞ্চিৎ অর্থলোভে স্বদেশের উচ্ছেদ-সাধনেও সে সেনার আপত্তি নাই। আত্মত্যাগ ও সন্ন্যাসের কি অদ্ভুত মহিমা! এক জন সন্ন্যাসীর আত্মত্যাগে লক্ষ লক্ষ লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকে এক এক জন সন্ন্যাসী

হইয়াছিল। সে পবিত্র আলোকে এক দিন প্রত্যেক শিখ এক একটী ক্ষুদ্র গুরুগোবিন্দসিংহ হইয়াছিল। কিন্তু আজ সে আলোকের প্রতিফলন অভাবে সে সকল গ্রহ উপগ্রহ অনন্ত তিমিরে বিলীন হইয়া গিয়াছে !! আমরা আর এক জন সন্ন্যাসীর নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। সে পবিত্র নাম এখনও বঙ্গের প্রতি নগরে সঙ্কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভীষণ বৈষম্য ভাবে যখন জগৎ দগ্ধ হইতেছিল, যখন নীচ জাতি সকল কুকুর বা ব্রাহ্মণদিগের পরিত্যাজ্য হইয়াছিল, যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন স্খলিতপদ রমণীরা বাতাহতা নিরাশ্রয়া লতার ন্যায় ভূমিবিলুণ্ঠিত ও পদদলিত হইতেছিল, যখন শুষ্ক তার্কিকতায় স্নেহ, প্রেম ও ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় চৈতন্য দেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য নীরস ও হৃদয়ের পরিপুষ্টি-বিরহিত ছিল না। স্বদেশের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, ব্যক্তিগত অস্তিত্ব মানব জাতিগত অস্তিত্বানলে পূর্ণ আহুতি না দিলে, দেশের মঙ্গল নাই। তিনি দেখিলেন, সেই লক্ষ্য সাধনের একমাত্র উপায় সন্ন্যাস ও আত্মত্যাগ। আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য ভাবিতে শিখাইতে হইলে, স্বয়ং আত্মবিস্মৃত হইতে হয়। আপনার সুখ আপনার সম্পত্তি জাতীয় সুখ ও জাতীয় সম্পত্তিতে বিলীন করিতে হয়। চৈতন্যের যে চিন্তা, সেই কার্য্য। তিনি মানব সাধারণের সুখ-পুঞ্জ পরিবর্দ্ধনার্থ পারিবারিক আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিলেন। লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাথিনীর অশ্রুজল মুছাইবার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে কাঁদাইলেন। বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাতাইবার জন্য স্বয়ং মাতৃপ্রেম-সুধায় বঞ্চিত হইলেন। সেই সন্ন্যাসীর প্রেম-সংকীর্ত্তনে জগৎ মুগ্ধ হইল। নিদাঘের রবিকিরণ-প্রতপ্ত মৃত্তিকায় যেন বারিধারা পতিত হইল। তিনি গাইয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আমরা সব ভ ই ভাই, আমরা সব ভাই বোন্। সেই আহ্বানে সেই প্রেম-সংকীর্ত্তনে হিন্দু মুসলমান ও ব্রাহ্মণ শূদ্র একই সাম্য ক্ষেত্রে আসিয়া একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য হইতে লাগিলেন। খোল করতালের ঝঙ্কারে সমস্ত ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সংকীর্ত্তিত হইতে লাগিল, আমরা সব এক পিতার সন্তান, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন্। প্রেম ও ভক্তিস্রোতে ভারত প্লাবিত হইল। সেই পরম যোগীর অদ্ভুত আত্মত্যাগের মহিমায় অসংখ্য বৈষ্ণব বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন। প্রচারকের দলে ক্রমে ভারত ভরিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য!

আজ যে কোন বিষয়ের প্রচারের জন্য দশ জন লোক জুটায়, কাহার সাধ্য? কিন্তু সেই সময়ে চৈতন্যের চরিত্র-মহিমায় সহস্র সহস্র লোক সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনা হইতে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইতে লাগিলেন। আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের কি অদ্ভুত মহিমা! চৈতন্যের প্রেম আজও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সংকীর্ত্তিত হইতেছে। আজও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচারকের সংখ্যায় অপ্রতুল নাই বটে, কিন্তু তাহারা চৈতন্যের মহৎ লক্ষ্য হারাইয়া এখন কেবল প্রচারকের পরিচ্ছদ পরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। তাহারা এখনও মহৎ ভাব-ব্যঞ্জক প্রেমগান সকল গাইয়া বেড়াইতেছে বটে, কিন্তু তাহা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য, বিশ্ব-প্রেমের প্রচারের জন্য নহে। এখনও তাহারা প্রেমগান গাইতে গাইতে নৃত্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা অনিবার্য্য হৃদয়োচ্ছ্বাসে নহে, দানের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের অভিনয়ে। চৈতন্যের বৈরাগ্য আত্মসুখে ও আত্মস্বার্থে বলি দিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণবপ্রচারকগণের বৈরাগ্য আত্মসুখ ও আত্মস্বার্থ সিদ্ধির অদ্বিতীয় সাধনস্বরূপ হইয়াছে। সেই জন্যই পূর্ব্বে বৈরাগীর এত সম্মান ছিল এবং সেই জন্যই বৈরাগীর নাম শুনিলে, আজ লোকে ঘৃণা করিয়া থাকে।

চল, আমরা এক বার সমাধি-বলে সেই আদি আর্য্য-মহত্বকালে গমন করি। একবার ধ্যানে সেই আদর্শ যোগী বিরূপাক্ষ দেবাদিদেব মহাদেবকে দেখি। এক বার প্রাণ ভরিয়া সেই জটাজুটধারী ত্রিশূলী মূর্ত্তি দেখি। এক বার সেই বাঘছাল-পরিধান, করধৃত-কমণ্ডলু, শিব শম্ভুকে হৃদয়কমলে চিত্রিত করিয়া দেখি। যে জগন্মনোমোহন রূপে ও যে অলৌকিক গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া পর্ব্বতরাজ-তনয়া গৌরী তাঁহার কামনায় অদ্ভুত তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, একবার সেই জগন্মনোমোহন রূপ ও সেই অলৌকিক গুণাবলী কল্পনায় আনিয়া দেখি। যে গুণে মুগ্ধ হইয়া নারদাদি ঋষিবৃন্দ বীণাবাদন পূর্ব্বক জগতে তাঁহার গুণগান করিয়া বেড়াইতেন, একবার সেই গুণগুলি ভাবিয়া দেখি। যে গুণে মুগ্ধ হইয়া দেব-যক্ষ-রাক্ষস-মানবে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, একবার পারি ত তাহার বর্ণনা করিব। এ আদর্শ মূর্ত্তি, ও এ আদর্শ-চরিত্রের কাছে যাই, এমন সাধ্য কই! তথাপি একবার চেষ্টা করিব।

এই আদর্শ সন্ন্যাসী কবিকল্পনা বিজৃম্ভিত নহেন। ইঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিরাজি সংস্কৃত সাহিত্যে আজও বর্ত্তমান। যখন জগতে নরদেহতত্ত্ব সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল, তখন ইনি ইহার আবিষ্কার করেন। তিনি শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া নরকঙ্কাল সকল সংগ্রহ করিতেন। তিনি অস্থিমালাকে রত্নমালা অপেক্ষা

লক্ষগুণে অধিক আদর করিতেন। নরদেহ তাঁহার যোগাসন ও নরদেহভস্ম তাঁহার অঙ্গাভরণ ছিল। তিনি একাকী শ্মশানে বসিয়া শবচ্ছেদ করিতেন। তন্ন তন্ন করিয়া নরদেহের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি নির্ণয় করিতেন, নির্ণয় করিয়া সেই সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের নামকরণ করিতেন। শৃগাল কুক্কুরের ভীষণ রব, গলিত শবের পুতিগন্ধ, শ্মশানের ভীষণমূর্ত্তি, কিছুতেই তাঁহার সমাধিভঙ্গ করিতে পারিত না। লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া পরিহাস করিত। কিন্তু তাঁহার চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। কিসে জগতের অকাল-মৃত্যু নিবারণ করিব, কিসে বিশ্বব্যাপী রোগের উপশমন করিব—তাঁহার রাত্রি দিবা কেবল এই চিন্তা। নিজের সুখ, নিজের সম্পত্তির দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই। তিনি বনের বাঘ মারিয়া তাহার ছাল পরিধান করিতেন, ভিক্ষালব্ধ অন্নে কথঞ্চিৎ উদর-পূর্ত্তি করিতেন। যিনি জগতের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্যাগী, লোকে তাঁহাকে শ্মশানবাসী ভিখারী বলিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু তিনি নররূপী দেবতা। তাঁহার তাহাতে চিত্তবিকৃতি জন্মিত না। নরদেহতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন, এরূপ নহে। তিনি বনে জঙ্গলে রোগনিবারক গাছগাছড়া খুঁজিয়া বেড়াইতেন। হলাহলের শক্তি বুঝিবার জন্য তিনি স্বয়ং হলাহল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি বিষাক্ত ঔষধের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের শরীর সর্পদষ্ট করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতেন। এইরূপে বিষঘ্ন ঔষধে সিদ্ধবিদ্য হইয়া তিনি ফণীর ফণাকে পরিহাস করিবার জন্য স্বয়ং ফণিভূষণ হইয়াছিলেন। হানিমান্ এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করাতে এখন জগতের পূজিত হইয়াছেন, কিন্তু সেই আদি যোগী এই জন্য সেই আদি কালে জগতের পরিহাসস্থল হইয়াছিলেন।

এস এক বার সেই বিরূপাক্ষকে বীরমূর্ত্তিতে দেখি। যেখানে অত্যাচার, সেই খানেই সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধায়ী ত্রিশূলী মূর্ত্তি উপস্থিত। অত্যাচারীর মস্তক বিদীর্ণ করিবার জন্য তিনি হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিতেন। সেই হস্তে অমিতবল ছিল। সেই অমিতবল বাহুতে তিনি যখন ত্রিশূল ধারণ করিতেন, তখন সেই বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিভুবন বিকম্পিত হইত। দেবতারা যখন অসুরগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেন, তখন ত্রিশূলীর শরণাপন্ন হইতেন। অত্যাচার-প্রপীড়িত দেবমানবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তাই তিনি তদ্দণ্ডে অত্যাচারীর দণ্ড বিধান করিতেন। শারীরিক বলে ও অস্ত্রবিদ্যায় জগতে তৎকালে তাঁহার দ্বিতীয় ছিল না। হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া, রামের বীরত্ব জগতে ঘোষিত হইয়াছিল। বড় বড় বীর সে ধনুক নাড়িতেও পারেন নাই।

দুইবার দুইজন বীর—অর্জ্জুন ও লক্ষণ, তাঁহার সহিত অস্ত্রযুদ্ধে সাহসী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা জগতে বীরচূড়ামণি বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। রুদ্রাক্ষকে পরাজয় করিতে পারে, এমন লোক তৎকালে পৃথিবীতে জন্মে নাই। দশানন তাঁহার পদাশ্রয়ে জগদ্বিজয়ী হইয়াছিলেন।

দশানন যাঁহার পদাশ্রিত, দেব মানব যাঁহার শরণাগত, সেই অদ্ভুত বীর সন্ন্যাসী মনে করিলে, জগতের সাম্রাজ্য করতলস্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আধুনিক বীরসন্ন্যাসী গ্যারিবল্ডীর ন্যায় বিজয়ের ফলে স্বেচ্ছাবঞ্চিত। রাজ্য করিব, সুখসম্ভোগ করিব—এ সকল তাঁহার সেই পবিত্র জীবনের লক্ষ্য ছিল না। মানবজাতির মঙ্গল সাধনেই তাঁহার সুখ, মানবজাতিকে উচ্চতম আদর্শে লইয়া যাওয়ায় তাঁহার প্রকৃত রাজত্ব। ইহা অপেক্ষা উচ্চ সুখ ও উচ্চ রাজত্ব আর কি হইতে পারে?

তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও আশ্রমী ছিলেন। বিশ্ব-প্রেমের সহিত তিনি পারিবারিক প্রেমের সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেন। তাঁহার বিশাল হৃদয়-সাগর সমীপবর্ত্তিনী আশ্রিতা তরঙ্গিণীকে প্রেমবারিতে ভরিয়া বিশ্বক্ষেত্রকে প্লাবিত করিতে পারিত। এই জন্যই সেই আদর্শ-সতী সতী জন্মান্তরেও তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার কামনায় পার্ব্বতীরূপে তাদৃশ ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি সেই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণবটুর শিবনিন্দাতে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। সেই ঢুলু ঢুলু নয়নে প্রেম ও চিন্তাশীলতা যেন মিশিয়া ছিল। সেই আজানুলম্বিতবাহু যেন অত্যাচারের প্রশমনের নিমিত্ত সতত বদ্ধপরিকর ছিল। সেই নধর, ঢলঢলায়মান দেহ যেন প্রেমভরে জগৎকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকিত। এরূপ রূপ, এরূপ গুণ একাধারে আর কখন সন্নিবেশিত হয় নাই। এরূপ গুণময়ী মূর্ত্তি ভারত-অদৃষ্ট-গগনে যদি আর একবার উদিত হয়, তবেই ভারত আর একবার জাগরূক বলিয়া পূজিত হইবে। কে বলিতে পারে, আর উদিত হইবে না?

ওয়ালেস্।

চল আর একবার ইউরোপখণ্ডে যাই। সেখানে অনেকগুলি সন্ন্যাসীকে ফেলিয়া আসিয়াছি। একবার সেই পবিত্র-মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া আসি। কল্পনাবলে চল, একবার ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্কটলণ্ডে যাই। ঐ দেখ, দ্বাদশ জন রাজা স্কট্লণ্ডের মুকুট লইয়া পরস্পর আত্মঘাতী হইতেছেন। ইংলণ্ডের তৃতীয় এডওয়ার্ড মীমাংসকরূপে আহূত হইয়া তথায় কৌশলে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিতেছেন। ঐ দেখ, ওয়ালেস্ প্রভৃতি কতিপয় যুবক ইংলণ্ডের আধিপত্যের

প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেই বীরমণ্ডলী মহান্ ভাবে উদ্দীপিত হইয়া আপনাদিগের ধনসম্পত্তি ও পদমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনাহারে, অনিদ্রায় দিন, মাস, বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি সে তেজ দমিত হইল না, সে প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইল না। প্রতিজ্ঞা— যে হয় স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবেন, নয় সে যজ্ঞে আত্মবলি প্রদান করিবেন। ওয়ালেস্, বর্মীড্, গ্রেহাম, কার্লাইল প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের অদ্ভুত আত্মত্যাগে ও অলৌকিক স্বদেশানুরাগে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে অসংখ্য স্কট্ ওয়ালেসের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। এ দিকে ইংরাজ-সেনার অত্যাচারে স্কটলণ্ড-বক্ষ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। লুণ্ঠন ও সতীত্বনাশের সংবাদে চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিল। দুর্ব্বৃত্ত সৈনিকগণের নামে নালিশ করিতে গেলে, সেনাপতি বাদীকে ফাঁসি কাষ্ঠে লট্‌কাইয়া দেন। সুতরাং কেহ নালিশ করে না, সরমে মরিয়া সমস্ত সহ্য করে। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, অকারণহত পতি-বিয়োগ-বিধুরা নব-বিধবার ক্রন্দন, অপহৃত-সতীত্ব সতীর আর্ত্তনাদ, লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব কৃষকের দীর্ঘশ্বাসে স্কটলণ্ডের আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কৃষকে আর চাষ করিতে চায় না, কারণ তাহার বিশ্বাস নাই যে তাহার পরিপক্ক শস্য ইংরাজ সৈনিক বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে না। গৃহিণীরা আর কাটনা কাটে না, কারণ তাহারা জানিত যে তাহাদিগের যত্নে কাটা সুতা ইংরাজ লুটেরারা আসিয়া লইয়া যাইবে। স্কট্‌লণ্ডের প্রশস্ত, গভীর ও সুন্দর হ্রদে রজত মীন ধরিবার জন্য জেলেরা আর জাল ফেলিতে চাহিত না, কারণ তাহারা জানিত ইংরাজ দস্যু কোথায় লুকাইয়া আছে, শিকার হস্তগত হইবামাত্র তাহারা আসিয়া কাড়িয়া লইবে।

ভগবন্! স্কটলণ্ডের অদৃষ্টে এরূপ দুঃখ আর কতকাল রাখিবে? স্কটলণ্ডের সৌভাগ্যরবি চিরদিনের জন্য কি অস্তমিত হইল? আর কি ইহা কখন স্কটশগগনে উদিত হইবে না? স্কট্‌লণ্ডের উজ্জ্বল আশাতারা কি অনন্ত কালসাগরে চিরদিনের মত বিলীন হইল? স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীনতা কমলিনী মৃত কি নিদ্রিত? না মরেন নাই— ঐ দেখ তিনি নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা যাইতেছেন। আবার দেখ—নীল কমল দুটী সৌভাগ্যসূর্য্যের পুনরুদয়ে একটু একটু করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে। ঐ দেখ কমলিনী পূর্ণ প্রস্ফুটিত নেত্রে উঠিলেন। একি স্বপ্ন না মায়া? এত যে ইংরাজ সৈন্য ছিল কোথায় গেল? ঐ যে স্কটিশ বর্শাধারিগণের সম্মুখে বায়ুর সম্মুখে তুষের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে! স্কটিশ বীর সন্ন্যাসিগণ কল্পনা বলে ভাবী সময়ের এইরূপ উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাইলেন। প্রাতঃসূর্য্যের সুবর্ণময় কিরণ

বালার সমুদ্রাসিত আয়ার্ক নদীর তীরে চিন্তামগ্ন ভাবে পাদচার করিয়া বেড়াইতেছেন উনি কে? বিধাতা যাঁহাকে সুন্দর বুদ্ধিশালী পদ্মপত্রনিভ মুখকান্তি দিয়াছেন উনি কে? যাঁহার চক্ষু হইতে প্রতিভা ও অগ্নি বাহির হইতেছে উনি কে? ক্রোধে যাঁহার ওষ্ঠাধর পরস্পর সম্পেষিত হইতেছে উনি কে? ঐ আজানুলম্বিতবাহু বিশালবক্ষা, বৃষস্কন্ধ মহাপুরুষ কে? বিলম্বিনী অরাল কেশরাজি যাঁহার গ্রীবার উপর গৌরবে ক্রীড়া করিতেছে উনি কে? যাঁহার কটিবদ্ধ অসি ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিয়া বার বার ধরাতল চুম্বন করিতেছে ঐ বীরপুরুষ কে? যিনি সম্পত্তি থাকিতেও সর্ব্বত্যাগী, স্বদেশের উদ্ধার-সাধনরূপ এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত, ঐ বীর সন্ন্যাসী কে? পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন ইনিই সেই স্কট্‌লণ্ডের উদ্ধারকর্ত্তা ওয়ালেস্। যাঁহার প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে অসংখ্য ইংরাজ বীরপুরুষ শমনসদনে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই স্কট্‌লণ্ড-রবি ওয়ালেস্। যাঁহার উদ্দীপনা-পূর্ণ বাক্যে স্কটিশ সৈন্য উন্মাদিত হইয়া অসংখ্য অবদানপরম্পরা অনুষ্ঠিত করিয়াছিল, ইনিই সেই স্কট-সঞ্জীবন ওয়ালেস্। যাঁহার প্রতাপে ইংলণ্ডেশ্বর বৃদ্ধ এড্‌ওয়ার্ডও কম্পিত-কলেবর হইয়াছিলেন, ইনিই সেই স্কটিশ-সিংহ ওয়ালেস্। যাঁহার বিজয়িনী সেনা ইংলণ্ড-ভূমিকে অগ্নিময় করিয়া তুলিয়াছিল, ইনিই সেই স্কট্-বীরকেশরী ওয়ালেস্। যাঁহার চরণতলে পড়িয়া একদিন এড্‌ওয়ার্ড-মহিষী সন্ধি ভিক্ষা করিয়াছিলেন ইনিই সেই স্কটলণ্ড-গৌরব ওয়ালেস্। বলিয়া দিতে হইবে না যে, ইনি চিন্তামগ্ন মনে মাতৃভূমির বর্ত্তমান দুরবস্থা ও অতীত গৌরবের বিষয় ভাবিতেছিলেন। এই স্বাধীনতা-সমরে ওয়ালেস্ পিতা, মাতা, ভ্রাতা অবশেষে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা ভার্য্যা, একে একে সমস্ত হারাইলেন। তথাপি সে সন্ন্যাসীর অন্তরের আগুন না নিভিয়া বরং অধিকতর উদ্দীপিত হইল। ইংরাজ-দস্যুদিগকে বিদূরিত করিয়া স্কটলণ্ডকে স্বাধীন করিবেন—এই সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা তাঁহার একমাত্র সহচরী ছিল। শয়নে স্বপনে, অশনে উপবেশনে এ চিন্তা একবারও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না, তাঁহার কপর্দ্দক মাত্র সম্বল ছিল না, অথচ তিনি না ডাকিতে কত সহস্র লোক আসিয়া তাঁহার পতাকা-মূলে দাঁড়াইত। তিনি দৈবশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, এবং সেই শক্তি নিজ সৈন্যে সংক্রামিত করিতে পারিতেন। এইজন্য তাঁহার সৈন্যেরা বারবার দশগুণ ইংরাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিল। এইজন্যই অসংখ্য দুর্গ সহজেই তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল। ষ্টার্লিং সমরক্ষেত্র তাঁহার অতিমানুষ বীরত্বের পরিচয়-স্থল। এই যুদ্ধে তিনি দশসহস্র সৈন্য লইয়া

রণগুণ ইংরাজসৈন্যের সম্মুখীন হন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে চল্লিশ সহস্র ইংরাজ হত হন, এবং বিজয়লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে ওয়ালেসের করতলস্থ হয়। স্কটিশদুর্গে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ওয়ালেস সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া মত্তহস্তীর ন্যায় ইংলণ্ড আলোড়িত করিয়া বেড়ান। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী অধিকদিন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এড্ওয়ার্ড অগণ্য সৈন্যসহ অচিরকালমধ্যে স্কটলণ্ডের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এড্ওয়ার্ড জানিতেন, ওয়ালেসের সেনা রণে অজেয়। এইজন্য তিনি স্কটিশ শিবিরে ভেদ উৎপাদন করিয়া দিলেন। দলপতিগণের মধ্যে সৈনাপত্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। অন্তর্বিচ্ছেদের বিষময় ফল ফলিল। ফলকার্ক কুরুক্ষেত্রে স্কটিশ পৃথুরাজ ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হইলেন। স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা-সূর্য্য আবার অস্তমিত হইল। পামর ইংরাজ সেই দেবমূর্ত্ত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল। তাঁহার মস্তক লইয়া পিশাচেরা লণ্ডন সেতুর উপর বসাইয়া রাখিল। এইবার ওয়ালেস মাতৃভূমির চরণে পূর্ণ আত্ম-বলি দিলেন। যেমন যোগিবর খৃষ্ট মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজ দেহ বলি দিয়াছিলেন, সেইরূপ ওয়ালেস, স্কটিশ-জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজ দেহ উৎসর্গ করিলেন। অমনি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। অমনি দেব যক্ষ কিন্নর সমস্বরে গাইয়া উঠিলেন, 'ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য স্কটলণ্ড—ওয়ালেস্-জননী! জগতে প্রতিধ্বনি উঠিল—ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য স্কটলণ্ড—ওয়ালেস্-জননী!' সে রক্তে ইংলণ্ডের বক্ষ পুড়িয়া ছারখার হইল। এই বীরহত্যা মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ইংরাজকে ব্যান্ক-বরন্ সমরক্ষেত্রে করিতে হইল। সংবাদ দিতে সেই একলক্ষ সেনার অল্পই স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ! তুমি মরিয়াও স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিলে! তুমি অমর; তাহা না হইলে এতদিন পরে সুদূর অম্বুগাঙ্গ প্রদেশে আর্য্য-যুবক আজ তোমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে কেন? তাহা না হইলে আজ তোমার নাম মাত্র উচ্চারণে আর্য্যযুবকের শিরায় তাড়িতবেগে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় কেন? দেব! পতিত আর্য্যের হৃদয়-কন্দরে অধিষ্ঠান কর। একবার তাহাদিগকে তোমার অলৌকিক স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম শিখাও। একদিনের জন্যও তাহাদিগকে জননীর চরণে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে শিখাও। দেব! একবার দেখা দেও। একবার এ পতিত জাতিতে আবির্ভূত হও। আর কিছু চাহি না।*

* ওয়ালেসের বিস্তৃত জীবনী বাহির হইতেছে।

উইলিয়ম টেল।

যে সময়ে স্কটলণ্ডে ওয়ালেস, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় সুইজর্লণ্ডে আর একজন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী অষ্ট্রিয়ার সহিত স্বাধীনতা-সমরে নিযুক্ত হন। সকলেই জানেন ইঁহার নাম টেল্। ইঁহার অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহঁাকে বাস্তব মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না ; যেন কবির কল্পনাবিজৃম্ভিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু তিনি বাস্তবিকই মানব—অথবা মানব-রূপী দেবতা ছিলেন। বস্তুতঃ হৃদয়ের বিশালতা, ইচ্ছার অলঙ্ঘ্যতা, লক্ষ্যের অচঞ্চলতা, এবং স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের গভীরতায় তিনি দেবোপম ছিলেন। তিনি স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্য মৃত্যুতে—অথবা তদপেক্ষায় ভয়ানক যদি কিছু থাকে তাহাতেও—ঝাঁপ দিতে একবার ভাবিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে ভয় ছিল না। তিনি বিক্রমে কেশরী ছিলেন।

যখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, যখন চতুর্দ্দিকে অত্যাচার, যখন সমস্ত সুইজর্লণ্ড অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খলভরে বসিয়া পড়িতেছিল, সেই সময় এই রণবীর সুইসক্ষেত্রে জাতীয় অধিনায়ক-রূপে আবির্ভূত হন। তাহার দেহ হইতে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইত দেখিয়া লোকে মনে করিত যে, বিজয়-লক্ষ্মী তেজঃপুঞ্জ-চ্ছলে যেন তাঁহাকে কঙ্কুক-বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই রণবীর যদিও সামান্য কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আত্মা অতি মহান্ ছিল। তিনি শক্রহস্তে আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। একদিন এক কৃষক লাঙল চষিতে ছিল। অষ্ট্রিয়-রাজ-প্রতিনিধির ভৃত্য অকারণে আসিয়া সেই হলবাহী বলদদ্বয়কে খুলিয়া লইল, বলিল এ কাজের জন্য দুইজনী সুইস নিযুক্ত করিলে ভাল হয়, কারণ তাহারা ভারবহন করিবার জন্যই জন্মিয়াছে। কৃষকের ইহা দুর্ব্বিষহ হইল, সে তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত-স্থিত লগুড় দ্বারা তাহাকে ভূপাতিত করিল। মারিয়াই, সে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। ক্রোধোন্মত্ত অষ্ট্রিয়গণ তাহাকে না পাইয়া তাহার বৃদ্ধ পিতাকে গিয়া ধরিল। বৃদ্ধের যাহা কিছু ছিল সমস্ত রাজকোষভুক্ত করিয়া অবশেষে পিশাচেরা তাহার চক্ষু দুটী উৎপাটিত করিল। যষ্টি হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ভিন্ন অন্ধের আর কোন উপায় রহিল না। এই প্রকার অসহ্য অত্যাচারে সমস্ত সুইজর্লণ্ডবাসী ক্ষেপিয়া উঠিল। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া এক জায়গায় জমা হইতে লাগিলেন। সকলেই একবাক্যে বীরকেশরী উইলিয়ম্ টেল্‌কে জাতীয় সেনার অধিনায়ক

নিযুক্ত করিলেন। জাতীয় দলের অনেক-গুলি গুপ্ত অধিবেশন হইল। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-রক্ষা ও মন্ত্রগুপ্তির জন্য পরস্পরের সমীপে পরস্পর শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সাধারণ অভ্যুত্থানের জন্য একটী দিনস্থির হইল। সকলেই উৎসুক মনে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় একটী দুর্ঘটনায় সব উল্‌টাইয়া গেল। গবর্ণর আলটর্ফ নগরের বাজারে একটী গাছের উপর তাঁহার টুপি রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, সুইজর্লণ্ডের সমস্ত লোককে এই টুপির নিকট নতজানু ও অনাবৃত-মস্তক হইতে হইবে। গবর্ণরের প্রতি তাহারা যে সম্মান করিতে বাধ্য, তাহাদিগকে ঐ টুপির প্রতিও সেই সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। উইলিয়ম টেল এই আদেশ প্রতিপালনে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইলেন। অষ্ট্রিয় পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া গবর্ণরের নিকট লইয়া গেল। গবর্ণর স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার বশবর্ত্তী হইয়া আদেশ করিলেন যে, তাঁহাকে নিজ পুত্রের মস্তকে একটী আপল্ ফল রাখিয়া শরবিদ্ধ করিতে হইবে। ধনুর্বিদ্যায় টেলের সবিশেষ পারদর্শিতা ছিল, সুতরাং তিনি নির্ভয়ে শরসন্ধান করিলেন। আপিল্ বিদ্ধ হইল, কিন্তু পুত্রের মস্তকে বিন্দুমাত্রও আঘাত লাগিল না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিল। লোকে এই ঘটনার স্মরণার্থ যে স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত করে, অদ্যাপি তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

আপল্ বিদ্ধ হইলে টেল্ আর একটী শর লুকাইলেন। গবর্ণর তাহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জন্য ঐ দ্বিতীয় শর আনিয়াছিলে?" টেল্ উত্তর করিলেন যে, যদি প্রথম শর আপল ভেদ না করিয়া পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিত, তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় শরে তোমায় শমনসদনে প্রেরণ করিতাম। এই বাক্যে গবর্ণর ক্রোধে অধীর হইয়া টেল্‌কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নিজের নৌকায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, এবং নিজেও তাহাতে আরোহণ করিলেন। ইচ্ছা ছিল; কুচনাচ দুর্গের কারাগারে তাঁহাকে ফেলিয়া আসিবেন; কিন্তু তাহা ঘটিল না। জলপথে হঠাৎ ঝড় উঠিল। গবর্ণর জানিতেন, টেল্ নৌচালনে বিশেষ দক্ষ, এই জন্য তাঁহাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। টেল্ শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া অতিবেগে দাড় ফেলিয়া তরঙ্গমালা কাটিতে কাটিতে উপকূলাভিমুখে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতেই সেই বিরাটমূর্ত্তি এক লম্ফে তীরে পতিত হইলেন। গবর্ণর, তদীয় অষ্ট্রিয় অনুচরগণ সহ অতল জলে নিমগ্ন হইল। এদিকে সেই মহাপুরুষের পুনরাবির্ভাবে সমস্ত ক্যাণ্টন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অষ্ট্রিয় সেনা পরাস্ত হইল, এবং সুইস্ দুর্গোপরি আবার জাতীয় পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন

হইল। উইলিয়ম্ টেলের অদ্ভুত অবদানপরম্পরা জানে না বোধ হয় এমন ইতিহাস-পাঠক কেহ নাই। সুইজর্লণ্ডের প্রতি ক্যাণ্টনে উইলিয়ম্ টেলের কীর্ত্তিস্তম্ভ নিখাত আছে; এবং সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রতি অধিবাসীর হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি অদ্যাপি অতি যত্নে ও ভক্তিভাবে পরিরক্ষিত ও পরিপূজিত হইয়া থাকে। ধন্য বীর! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ!

এস একবার, দেহ দেখা দীনে।
নমে ভক্ত ভক্তিভাবে পদযুগে।
স্পর্শমণি-স্পর্শে দেহ প্রাণ দান।
উড়ুক প্রচণ্ড মেঘ দুঃখ দূর করি।

জন্ হ্যাম্‌ডেন্।

পাঠক, চল একবার শ্বেতদ্বীপে যাই। স্বাধীনতার আবাসভূমি ইংলণ্ডে কোন বীর সন্ন্যাসী জন্মিয়াছিলেন কি না, চল গিয়া সংবাদ লই। এই যে সম্মুখে এক পাষাণময়ী প্রতিমা রহিয়াছে, এ কোন্ দেবতার প্রতিকৃতি! কে যেন উত্তর দিল এ দেবমূর্ত্তি নয়, নররূপী দেবতা জন্ হ্যামডেনের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি। ঐ দেখ পাদপীঠ বক্ষে কি খোদিত রহিয়াছে! একবার পড়িয়া দেখি। ইহা তাঁহার জীবনের ইতিহাস। যাহা লিখিত আছে তাহার মর্ম্ম ও তৎ সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষ লণ্ডন নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন প্রথম চার্লসের দুর্ব্বিষহ অত্যাচারে গ্রেট ব্রিটন আলোড়িত হইতেছিল, যখন কেহই সাহস করিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই, সেই সময় এই রাজনৈতিক সন্ন্যাসী জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। চার্লস অবৈধরূপে সকলের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে লাগিলেন। সকলেই অবনত মস্তকে তাহা প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু হ্যাম্‌ডেন প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি প্রাণ থাকিতে টাকা ধার দিবেন না। ইনি তৎকালে হাউস্ অব কমন্সের একজন প্রতিভাশালী মেম্বর ছিলেন। তিনি চার্লসকে দেখাইয়া দিলেন যে, প্রজার নিকট ঐরূপে টাকা ধার করা, ম্যাগ্‌না চার্টার বিরুদ্ধ। চার্লসের রাগের আর সীমা রহিল না। এত বড় স্পর্দ্ধা যে, সামান্য প্রজা হইয়া রাজার কার্য্যের প্রতিবাদ করে! রাজার সম্মুখে ম্যাগ্‌না চার্টা আনিয়া তাঁহার গতি-রোধ করিতে চেষ্টা করে! এরূপ দুরাচারের তাদৃশ পাপের প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র স্থান কারাগার। এই বলিয়া তিনি হ্যাম্‌ডেনকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। হ্যামডেন কিছুকাল কারাগারে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায়, অগত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

স্বাধীনতা!—এ শব্দ হ্যাম্‌ডেনের শ্রবণে অতি মধুর। বহুমূল্য হীরক

অপেক্ষা ইহা তাঁহার নিকট অধিকতর মূল্যবান্। কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য তত ব্যাকুল ছিলেন না। জাতীয় স্বাধীনতা—ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি, সমাজ বিষয়ে জাতীয় মত স্বাতন্ত্র্য—ইহারই জন্য তাঁহার হৃদয়ের অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা। তিনি ইহারই রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে, এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

দুর্ভাগ্য চার্লস এ অন্তর্নিগূহিত বিশ্বব্যাপী জাতীয় ভাব বুঝিতে পারিলেন না। না বুঝিয়া অন্ধের ন্যায় সেই জাতীয় ভাবস্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন না যে, এক শতাব্দী পূর্ব্বে অষ্টম হেনরী যাহা করিতে পারিয়াছিলেন, এক শতাব্দী পরে এখন তিনি তাহা করিতে গেলে বিফলপ্রযত্ন হইবেন। ভাবিলেন না যে, রাজ্যসাগরে তরঙ্গ উঠিলে, রাজকীয় তরি তরঙ্গের প্রতিকূলে চালাইলে তাহা নিশ্চয় ডুবিবে। ভাবিলেন না যে, এ সময় কমন্সগণের সঙ্গে মিট্‌মা করিলে, তাঁহার আর রাজ্য-রক্ষার উপায়ান্তর নাই। এই সকল অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া চার্লস উন্মত্তের ন্যায় নিজ পথে চলিলেন। এই সময় তাঁহার সম্মুখীন হইয়া একথা বলে, হ্যাম্‌ডেন ভিন্ন, এমন বীরসন্ন্যাসী ইংলণ্ডে আর ছিল না। হ্যাম্‌ডেনের চক্ষু দিয়া যেন রক্ত বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার ললাট চিন্তায় আকুঞ্চিত হইল। তাঁহার অপ্রতিহত দৃষ্টি ভবিষ্যগগনে একখানি কাল মেঘ দেখিতে পাইল। তিনি দেখিলেন চার্লস উন্মত্ত-গতি হইতে যদি নিবৃত্ত না হন, প্রজার সহিত তাঁহার সংঘর্ষ অনিবার্য্য। দেখিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে চার্লসকে তাঁহার কার্য্যের দায়িত্ব বুঝাইয়া দিলেন, বলিলেন, তিনি যেরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহা ম্যাগ্‌নাচার্টার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। যদিও হ্যাম্‌ডেন্ জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজশরীরে অস্ত্র প্রহার করিতেও সঙ্কুচিত ছিলেন না, তথাপি সেই ভাবী অমঙ্গল ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। উভয়দিক যাহাতে রক্ষা হয় সেই জন্য সেই যোগী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন "ঈশ্বর! তুমি আমার জন্মভূমিকে রক্তপাত হইতে রক্ষা কর। আমাদের রাজাকে তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দেও, তাঁহার মন্ত্রিগণের হৃদয়কে সেই ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরাইয়া আন।" তাঁহার এই প্রার্থনা ঈশ্বর পূর্ণ করিলেন না। কিন্তু এই প্রার্থনায় তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা ও লক্ষ্যের নির্ম্মলতা সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইল। বস্তুতঃ রাজতান্ত্রিকদলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। বিনীত, সদানন্দ, সাহসী, একাগ্রচিত্ত, বাগ্মী, ও উদার-চরিত হ্যামডেন্ সকল দলেরই পূজিত ছিলেন।

রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে

হইবে ভাবিয়া, হ্যাম্‌ডেন্‌ নিরতিশয় কাতর হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলেন, ইহা অনিবার্য্য। তিনি দেখিলেন, জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষত রাখিতে হইলে, রাজবলি অপরিহার্য্য।

এদিকে রাজার টাকার একান্ত অভাব হইয়া পড়িল। ধনাগার শূন্য, অথচ পার্লেমেণ্ট টাকা দিতে অস্বীকৃত। ইহাতে রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বকালে যখন দিনেমারেরা ইংলণ্ডের উপকূলে আসিয়া লুটপাট করিয়া লইয়া যাইত, সেই সময় ইংলণ্ডেশ্বর উপকূল-বাসী প্রজাবৃন্দকে কয়েকখানি রণতরি সুসজ্জিত করিয়া দিতে বাধ্য করিতেন। তাহারা রণতরির বিনিময়ে কিছু কিছু করিয়া কর দিত। ইহাকে "সিপ্‌মনি" বা জাহাজ-কর বলিত। যতদিন দিনে-মারদিগের উৎপাত থাকিত, ততদিনই এই কর আদায় করা হইত। এ নৈমিত্তিক করে রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। তিনি পার্লেমেণ্টের অনুমতি না লইয়া এই কর স্থাপন করিতে পারিতেন, এবং আপন ইচ্ছামত সে টাকা ব্যয় করিতেন। তাঁহাকে এ টাকার জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইত না। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর লণ্ডনের অধিবাসিবৃন্দের উপর হঠাৎ রাজনামাঙ্কিত এক পরওয়ানা বাহির হইল যে, ১লা নবেম্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে সর্ব্বোপকরণ-সম্পন্ন সাত খানি রণতরি, লোকজনের ছয়মাসের বেতন সহ রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। নগরবাসিরা একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু কে সে প্রতিবাদ শুনে? রাজা বধিরের ন্যায় এই জাতীয় আপত্তি ও জাতীয় প্রতিবাদ কর্ণেও স্থান দিলেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ও টাকা তাঁহার চাই-ই। এই-রূপ পরওয়ানা উপকূলবাসী ও মধ্য-প্রদেশবাসী সকল প্রজাগণের উপরই জারি হইল। আদেশ প্রচলিত হইল যে, জাহাজের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে হইবে। প্রতি জাহাজের জন্য ৩,৩০০ পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে উপদেশ পাঠান হইল যে, যাহারা টাকা না দিবে, তাহাদের যেন সম্পত্তি ক্রোক্‌ হয়।

এই বিশ্বজনীন বিপত্তিকালে হ্যাম্‌ডেন করদানে অস্বীকৃত হইলেন। যে স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গলকামী, কারাগার তাহার সুখশয্যা, মৃত্যু তাহার স্বর্গদ্বার। হ্যাম্‌ডেন কারাগার ও মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া রাজাজ্ঞার প্রতি-বাদ করিলেন। ১০৲ টাকা মাত্র কর তাঁহার উপর ধার্য্য হইয়াছিল, ইহার জন্য তিনি দেহ, প্রাণ, সম্পত্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। কেন? হ্যাম্‌ডেনের বিপুলসম্পত্তি থাকিতে যে কারণে তিনি পূর্ব্বে রাজাকে টাকা ধার দিতে অস্বীকৃত হন, সেই একই কারণে আজ ১০৲ টাকা মাত্র সিপ্‌মনি কর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। এই টাকা ধার

চাওয়া, ও এই কর-সংগ্রহ তাঁহার জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি 'ম্যাগনা চার্টা'র প্রতিকূলে বলিয়াই তিনি বীরের ন্যায় তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি রাজার কার্য্যের অনুমোদন করিলে হয় ত ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার নিকট সে পদ তিনি তুচ্ছ মনে করিতেন। তিনি নিজ ব্যক্তি-গত মঙ্গল, জাতীয় মঙ্গলে পূর্ণ আহুতি দিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ সে প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না। তিনি জাতীয় স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা কারাগার সুখসেব্য মনে করিলেন। গ্রেট্ কিম্ব্ল প্রদেশের ত্রিশজন নিষ্কর-ভোগী তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিল। সন্ন্যাসীর দল বাড়িয়া গেল।

একসচেকর কোর্টে হ্যামডেনের বিরুদ্ধে রাজপক্ষ হইতে নালিশ রুজু হইল। বার জন জজে বার দিন বসিয়া বিচার করিলেন। যাহার অতুল সম্পত্তি সে বিশ সিলিঙ দিতে এত কাতর, ইহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জাকর আর কি হইতে পারে? হ্যাম্‌ডেনের উপর ২০ পাউণ্ড কর ধার্য্য করা উচিত ছিল—রাজার উকিল হ্যাম্‌ডেনের প্রতি ইত্যা-কার অনেক বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বীরের হৃদয় বিচলিত হইবার নহে। কারণ টাকার পরিমাণ লইয়া তাঁহার আপত্তি নহে—এরূপ কার্য্য ইংলণ্ডের মূলবিধির বিরুদ্ধ বলিয়াই তাঁহার আপত্তি। সে অলঙ্ঘ্য বিধির নিকট রাজারাও মস্তক অবনত হওয়া চাই—ইহাই হ্যাম্‌ডনের সঙ্কল্প। সে মস্তক যদি অবনত না হয়, ছিন্নমস্তক সে দেহ তথায় লুণ্ঠিত হইবে—ইহাই হ্যাম্‌ডেনের স্থির সিদ্ধান্ত।

জজেরা অধিকাংশই রাজার পক্ষ অব-লম্বন করিলেন। জষ্টিস ক্রাউলে বলিলেন "রাজা রাখিতে হইলেই তাঁহাকে আপন ইচ্ছামত কর-আদায়ের ক্ষমতা দিতে হইবে। এ প্রভুশক্তি-বর্জ্জিত রাজা হইতে পারে না, কারণ, তিনি সর্ব্বোপরি প্রভুশক্তি।" অন্যতর জজ জষ্টিস বার্কে বলিলেন যে "আইনে রাজাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। আইন রাজার চির-বিশ্বাসিনী দাসী। প্রজা-শাসন করিবার জন্য ইহা রাজার প্রধান শাসন-যন্ত্র। আইন রাজা—এ কথা আমি কখন শুনি নাই—কিন্তু রাজাজ্ঞাই আইন—এই কথাই বরাবর শুনিয়া আসিতেছি—এবং ইহাই সত্য।" জষ্টিস ফিনস বলিলেন "পার্লেমেণ্টীয় বিধি রাজার উপর খাটে না; যদিও প্রজার ধন প্রাণ ও দেহের উপর ইহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে।" এইরূপে বার জনের মধ্যে সাত জন জজ রাজার অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্বের স্বাপক্ষ্যে মত প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা বিচার স্বাধীনতা রাজপ্রসাদের নিকট বলি দিলেন। সামান্য চাকরির অনুরোধে তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিলেন।

পাঁচ জন হ্যামডেনের অনুকূল মত ব্যক্ত করিলেন। রাজা যে আইনের উপরি এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিলেন না। প্রজার ধন সম্পত্তির উপরি যে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা, এবং তাঁহার কার্য্যের ও ইচ্ছার নিয়ামক কিছুই নাই—এমত তাঁহারা অশ্রদ্ধের বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু হ্যামডেনের প্রতিকূলে সংখ্যার বহুলতা ছিল বলিয়া, তাঁহাকে হারিতে হইল। কিন্তু এ হার তাঁহার পক্ষে প্রকৃত বিজয়। এ পরাজয়ে তিনি স্বজাতির হৃদয়মন্দিরে অতি উচ্চ আসন পাইলেন।' সিপ্‌মনি ব্যাপারের পূর্ব্বে অতি অল্প লোকেই তাঁহার মাহাত্ম্য জানিত। কিন্তু আজ ব্রিটনের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার যশ প্রত্যেক ঘরে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রতি জিহ্বা তাঁহার আন্দোলনে ব্যাপৃত হইল। যাহারা জানিত না, তাহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এ মহাপুরুষ কে—যিনি এরূপ নিজের দায়িত্বে স্বজাতির স্বাধীনতা ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং এরূপ অমিত-সাহসে স্বদেশকে রাজার করাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এইরূপ প্রশ্ন ও প্রশ্নের উপরি উত্তর হইতে হইতে সকলেই হ্যাম্‌ডেনকে চিনিল। তখন ব্রিটনের আবাল বৃদ্ধ বনিতা উৎসুক নয়নে ইঁহারদিকে তাকাইয়া রহিল। স্বদেশের উদ্ধার-কর্ত্তা ভাবিয়া সকলেই ইঁহার উপরি আত্মসমর্পণ করিল।

পরীক্ষার দিন ক্রমে নিকট হইয়া আসিল। হ্যাম্‌ডেন্ প্রভৃতি পাঁচ জন হাউস্ অব্ কমন্‌সের সভাকে চার্লস ইম্পীচ করিলেন। কমন্‌স সভা বিচারের জন্য তাঁহাদিগকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। চার্লস প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সশস্ত্র পুরুষ দ্বারা তাঁহাদিগকে বল পূর্ব্বক হাউস্ অব্ কমন্‌স হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনাইবেন। তিনি স্বয়ং শতাধিক সশস্ত্র পুরুষ লইয়া হাউস্ অব্ কমন্‌সের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এ দিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা, তিনি আসিবার পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন। এই জন্য তিনি পার্লেমেণ্টে গিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। তিনি উপস্থিত সভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আমি দেখিতেছি, পিঞ্জরস্থ পক্ষিগণ উড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে আশা করি, পাখিগুলি ফিরিয়া আসিলে, আপনারা তাহাদিগকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিবেন।" পার্লেমেণ্ট সভা নীরবে রাজার এই উন্মত্ত প্রলাপ শুনিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহারা অন্তঃসন্ধুক্ষিত ক্রোধানল অতি কষ্টে সংযমিত করিলেন। কিন্তু যখন চার্লস গৃহ-বহির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের হৃদয় ভেদ করিয়া শব্দ উঠিল, 'অধিকারে হস্তক্ষেপ!— অধিকারে হস্তক্ষেপ!'

এই ঘটনার পরে তাঁহারা সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন। আর সে পুরাতন সভাগৃহে তাঁহারা বসিলেন না; এখন হইতে রাজধানীর অভ্যন্তরে একটী বাটীতে সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। চার্লস নিরস্ত হইবার নহেন। তিনি রাজধানীর ভিতর দিয়া সেই পঞ্চ সভ্যের গ্রেপ্তারের জন্য কমন্স সভার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথে প্রজারা সমস্বরে বলিতে লাগিল 'ধিক্ সে রাজার যে প্রজার স্বত্বে হস্তক্ষেপ করে।' দশ দিকে প্রতিধ্বনি উঠিল, 'ধিক্ সে রাজার যে প্রজার স্বত্বে হস্তক্ষেপ করে।' সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল—'ঘাতক-হস্তে কারাগারের ভারার্পণ, দুর্গের সুদৃঢ়ীকরণ, এ সকল দেখিয়া আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে।' রাজা প্রজাদিগের এই সকল ধিক্কারে ও ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, অভীষ্ট-প্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন। এই উপেক্ষায় প্রজাদিগের অন্তর্নিগূহিত বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নাবিক, দোকানদার, ভদ্রলোক— সমস্ত নগরবাসী রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল; সকলেই ঐ পঞ্চ সভাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই রাজার সম্মুখেই উচ্চৈঃস্বরে হ্যাম্‌ডেনের যশোগান করিতে লাগিল। ক্রোধে ও অভিমানে চার্লস ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি তাঁহার সাধ্যায়ত্ত না হয়, তাহা হইলে হাউস অব কমন্স সভাকে তিনি পদ-দলিত করিবেন। চার্লসের এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না। ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অবনত মস্তকে পঞ্চ সভ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়া লইতে হইল। এবং রাজবেশে তাঁহাকে আর লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতে হইল না। তিনি আর এক দিন লণ্ডনে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে রাজবেশে নহে, কারাবাসীর বেশে। কমন্স সভার সহিত রাজার বিবাদ শীঘ্র মিটিবার নহে, উভয় পক্ষ হইতে বৃথা বাক্যব্যয় পরিত্যক্ত হইল। উভয় পক্ষ বুঝিলেন যে, আর এক সঙ্গে রাজত্ব করা সম্ভব নহে। রাজা ও পার্লেমেণ্ট মিলিত হইয়া আর ইংলণ্ডের শাসন করিতে সক্ষম নহেন। এক্ষণে অন্যতরের কাহার রাজত্ব থাকিবে, প্রবলতরের শক্তি তাহার মীমাংসা করিবে।

কমন্স সভা সুতরাং সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। হ্যাম্‌ডেন্ সর্ব্বাগ্রে সৈনিক পদে ব্রতী হইলেন। তিনি পদাতিক সেনাদলের কর্ণেল পদে অভিষিক্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ২৫,০০০ টাকা প্রদান করিলেন। ধন্য হ্যাম্‌ডেন্! ধন্য তোমার আত্মত্যাগ! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ!

১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হ্যাম্‌ডেন্ এক দল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, যুবরাজ রুপার্টের অনুসরণে যাত্রা করিলেন। চ্যালগ্রোভ্ রণক্ষেত্রে, তিনি ...

কুমারের সম্মুখীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটী গুলি আসিয়া হ্যাম্‌ডেনকে আহত করিল। তাঁহার সেনা এই ঘটনায় ভগ্নহৃদয় হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কুমার তাহাদিগের অনুসরণে কিয়দ্দূর গিয়া বিফল-প্রযত্ন হইলেন এবং সেতু পার হইয়া অক্‌সফোর্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে বীরবর হ্যাম্‌ডেন্‌ অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। তাঁহার হাত অবশ হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

যে অট্টালিকায় তাঁহার শ্বশুর বাস করিতেন, যে অট্টালিকা হইতে তিনি প্রিয়তমা ভার্য্যা এলিজেবেথকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, অদূরে সেই অট্টালিকা দেখা যাইতেছিল। বড় সাধ, তথায় গিয়া জীবনের শেষ দিন অতি-বাহিত করেন, কিন্তু সে সাধ পূরিল না—শত্রুসৈন্য সেই পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি থেম্‌ অভিমুখে অশ্ব ফিরাইলেন, তথায় আসিয়া যখন পঁহুছিলেন—তখন তিনি যাতনায় প্রায় বাহ্যজ্ঞান-রহিত। দেশের উদ্ধারসাধন করিতে পারিলাম না ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আশা তাঁহাকে সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও পরিত্যাগ করে নাই। তিনি ভাবিলেন—"আমি মরিলাম, তাহাতে দুঃখ কি? সহস্র সহস্র হ্যাম্‌ডেন্‌ জীবিত রহিলেন—মায়ের কার্য্য তাঁহারাই উদ্ধার করিবেন।" এই আশায় প্রোৎসাহিত হইয়া হ্যাম্‌-ডেন্‌ সেই মৃত্যুশয্যায় পত্র লিখিয়া বৈপ্লবিক অধিনায়কদিগের নিকটে বিদায় চাহিলেন ও কিরূপে জাতীয় সমর চালাইতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিলেন। পত্র লেখা সমাপ্ত হইল—আর সেই হস্ত নিস্পন্দ হইল। সে দেহে আর চৈতন্য রহিল না। যেন জীবনের কার্য্য সমাপ্ত হওয়ায়, সেই চৈতন্য মূর্ত্তি এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে গগন বিদারিয়া হাহাকার ধ্বনি উঠিল। ইংলণ্ডের আবাল বৃদ্ধ বনিতা হ্যাম্‌ডেনের শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল।

ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ হ্যামডেন্‌কে বীরোচিত সমাধি প্রদান করিলেন। জাতীয় সৈন্য বেয়নেট্‌ অবনত করিয়া তাঁহার মৃতদেহ সমাধি-নিহিত করিল। প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ হ্যামডেনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত হইয়া প্রত্যেক হ্যামডেনের আত্মাকে সাক্ষী করিয়া মাতৃভূমির চরণে আত্মসমর্পণ করিল। তাহার পরে, তাহারা ঈশ্বরের মহিমা ও হ্যাম্‌ডেনের যশোগান কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধিস্থল হইতে ফিরিয়া আসিল। ধন্য বীর, ধন্য! তুমি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিলে। তুমি মরিলে

বটে, কিন্তু তোমার দৃষ্টান্তে ইংলণ্ডে সহস্র সহস্র হ্যাম্‌ডেন্ আবির্ভূত হইল। তুমি ভগ্নহৃদয়ে গমন করিলে বটে, কিন্তু তোমার আরব্ধ কার্য্য তোমার শিষ্যেরা সম্পন্ন করিল। তুমি এ যজ্ঞে আত্মবলি না দিলে, কখন এ যজ্ঞ সমাপ্ত হইত না। যে দুর্ম্মদ চার্লস তোমার কেশস্পর্শ করিতে গিয়াছিল, ঐ দেখ, তাহার কাটামুণ্ড ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। যে ইংলণ্ডের স্বাধীনতার জন্য তুমি প্রাণ দিয়াছিলে, ঐ দেখ সেই ইংলণ্ড আজ স্বাধীন; উন্মুক্ত উজ্জ্বল ও নববাসে বিভূষিত। আজ সাধারণ-তন্ত্রী ইংলণ্ডের প্রতাপে মেদিনী কম্পমান। যে মূর্খ, সেই বলে—মহাপুরুষের মৃত্যু হয়; না—মহাপুরুষের মৃত্যু নাই। তিনি অমর, তাঁহার কীর্ত্তি অনন্তকালস্থায়ী!

বিশ্বপ্রেমিক উইলয়ার ফোর্স, হাউয়ার্ড ও রমিলী।

যে দেশে স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়, সেখানে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বনাগরিকতার কার্য্য আরম্ভ হয়। উন্নতিশীল মন গতিপ্রবণ। সে কোন স্থানেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে এবং অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে কার্য্যপরিধি বাড়াইয়া লয়। আপনা হইতে পরিবার, পরিবার হইতে আত্মীয় স্বজন, আত্মীয় স্বজন হইতে স্বদেশ ও স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বজাতি হইতে সমস্ত পৃথিবী ও মানবজাতি, মানবজাতি হইতে প্রাণিজগৎ—হৃদয় ক্রমেই প্রশস্ত হইয়া এই ক্রম অবলম্বন করে। প্রাণিজগৎ পর্য্যন্ত কেবল শাক্যসিংহ প্রভৃতি কতিপয় আর্য্যঋষি উঠিয়াছিলেন—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি। সর্ব্বভূতেষু সমদর্শী"—ভারত ভিন্ন এ প্রকাণ্ড নীতি আর কোন দেশ শিক্ষা দিতে পারে নাই। কিন্তু মানবজাতির প্রতি প্রেম অনেক দেশ শিক্ষা দিয়াছে। মানবজাতির জন্য অধুনাতন সকল দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ড অধিক করিয়াছেন ও অধিক ভাবিয়াছেন। কারণ, ইংলণ্ডে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমের প্রধান প্রধান কার্য্য অনেক দিন পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাধীনতার পূর্ণতায় ইংলণ্ড জগতের আদর্শ। ইংলণ্ড—ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু। ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তথায় মানবপ্রেম ও জগদনুরাগের কি কি কার্য্য হইয়াছে, কোন্ কোন্ সন্ন্যাসী সেই মহৎ যজ্ঞে আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়াছেন—এই সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। আমরা তিন জন মাত্র সন্ন্যাসীর জীবনী গাইব। বিশ্বপ্রেমিকের জীবন অতি মহান্; বিশ্বপ্রেমিকের জীবনের ব্রত দেবতার অনুকরণীয়। যাহাকে সকলে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করে, তাহার জন্য ভাবিব; যে উৎপীড়িত বুক দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিব; যাহাকে-

সকলে নির্যাতন করিতেছে, তাহাকে আশ্রয় দিব ; যে কষ্ট পাইতেছে, তাহার কষ্ট নিবারণ করিব ; যে শোক পাইয়াছে, তাহাকে সান্ত্বনা দিব, তাহার অশ্রুজল মুছাইব ; যে অসহায়, তাহার সহায় হইব ; যে পড়িয়া যাইতেছে, তাহাকে ধরিয়া তুলিব ; যে দুর্ব্বল, তাহার বলবৃদ্ধি করিব ; যে জাতি পদদলিত, তাহার পক্ষ সমর্থন করিব—যে মহাপুরুষ দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রভেদ ভুলিয়া সকলের প্রতি সমভাবে এই সকল কার্য্য করিতে পারেন, তিনি দেবতার দেবতা। কারণ, স্বজাতি-প্রেমিক আমাদের উপাস্য দেবতা। বিশ্বপ্রেমিক সে দেবতারও দেবতা। যেমন পারিবারিক প্রেম স্বজাতিপ্রেমের একটী ক্ষুদ্র অংশমাত্র, সেইরূপ স্বজাতি-প্রেমও বিশ্বপ্রেমের একটী সামান্য ভগ্নাংশ-মাত্র। মানবহৃদয়ের উঠিবার এই তিনটী ক্রম। এক একটীতে সিদ্ধ না হইলে, অপরটীতে উঠিবার অধিকার জন্মে না। ইংলণ্ড স্বজাতিপ্রেমের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার সেই সর্ব্বোচ্চ ক্রমে যাইবার অধিকার জন্মিয়াছে। এই জন্যই ইংলণ্ডকে জগৎ শিক্ষাগুরু বলিয়া মনে করি। এই এই জন্যই ইংলণ্ডে অনেক বিশ্বপ্রেমি-কের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে কেবল তিন জনমাত্র বিশ্বপ্রেমিকের চরিত্র চিত্রণ করিব—উইলবার্ফোর্স, হাউয়ার্ড, ও রোমিলী।

উইল্‌বার্‌ফোর্স।

বহুকাল হইতে জগতে দাসত্বপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। সকল দেশেই কোন না কোন প্রকারে এই প্রথার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তুলিয়া দিবার চেষ্টা কেবল ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেই হইয়াছে। স্পার্টার হেলট, রোমের গ্লাডিএটর ও আধুনিক নিগ্রো দাসদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, পাষাণও বিগলিত হয়। মানুষ স্বার্থে অন্ধ হইলে, কি পৈশাচী মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, এই দাস-প্রভুগণ তাহার নিদর্শন।

১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌থনী গঞ্জালেজ্ নামক এক জন পর্টুগীজ কাপ্তেন্ আফ্রিকা উপকূলে বাণিজ্যার্থ যাইয়া সাহারা প্রবেশ-পথ হইতে কয়েক জন মুরকে ধরিয়া আনিয়া দাসরূপে পরি-ণত করেন, দুই বৎসর পরে যুবরাজ হেন্‌রী এই সংবাদ শুনিতে পান। তিনি পূর্ব্বোক্ত কাপ্তেনকে তৎক্ষণাৎ আদেশ করেন, উহাদিগকে যথাস্থানে রাখিয়া আইস। কাপ্তেন তাহাদিগকে ফিরিয়া লইয়া যাওয়ায় মুরেরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণচূর্ণ ও দশ জন নিগ্রো উপহার দেয়। তিনি তাহা-দিগকে লইয়া আসিয়া দাসরূপে পরিণত করেন। এইরূপে নিগ্রো দাসত্বের উৎপত্তি হয়।

যখন স্পেনীয়েরা প্রতীচ্য দ্বীপ দখল করে, তখন খনি খনন ও কৃষিকার্য্য করণাদির জন্য তাহাদিগের শ্রমজীবীর প্রয়োজন হইয়া উঠে। তাহারা দেখিল, আফ্রিকা উপকূল হইতে দাস আনিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও শস্তা। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্টুগীজেরা স্পেনীয় উপনিবেশ সকলে দাস বিক্রয় করিয়া আইসে। তৎপশ্চাৎ স্পেনীয় বণিকেরা অধিকতর লাভজনক দেখিয়া স্বয়ং এই দাস ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। স্বর্ণচূর্ণ আনিতে তাহারা পূর্ব্ব হইতেই গিনি উপকূলে যাইত, কিন্তু এক্ষণে স্বর্ণচূর্ণ ব্যবসায় তত দূর লাভজনক নহে দেখিয়া, তাহারা অধিকতর লাভকর দাস ব্যবসায় ধরিল। ক্রমে গবর্ণমেণ্টও আইন দ্বারা ইহার বৈধতা সম্পাদন করিলেন। অনবরত জাহাজে করিয়া বোঝাই হইয়া নিগ্রো দাস সকল আমে' রিকায় চালিত হইতে লাগিল। হতভাগ্য-গণের অশ্রুজলে আটলাণ্টিক-বক্ষ ভাসিয়া গেল। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম চার্লস এক জনকে বৎসরে বৎসরে ৪,০০০ করিয়া নিগ্রো হিস্পানিওয়ালা, কিউবা ও জামেকা, এবং পোর্টরিকোতে লইয়া যাইবার জন্য একচেটিয়া পাট্টা দিলেন। তাঁহাকে ইহার জন্য পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কিছু ফল ফলে নাই। বীজ-বপন করা যত সহজ, সেই বীজ অঙ্কুরোদ্গমিতমূল বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে তাহা ছেদন করা তত সহজ নহে। ফরাসিরাজ ত্রয়োদশ লুইও 'ঈশ্বরের মহিমা বিস্তার ও নিগ্রোদিগের মঙ্গলের জন্য!' দাসত্ব ব্যবসা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী এলিজেবেথের সময় ইংরাজেরা সর্ব্ব প্রথমে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। সার্ জন্ হাকিংস সর্ব্ব প্রথম দাসব্যবসায়ী। তিনি এলিজেবেথের নিকটে প্রতিশ্রুত হন, যেব্যক্তি নিগ্রো দাস হইতে আপত্তি করিবে, তিনি তাহার গাত্রস্পর্শ করিবেন না। কিন্তু তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। অচিরকাল-মধ্যে তিনি অসংখ্য নিগ্রোকে বলপূর্ব্বক জাহাজে চালান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য জাতি অর্থ দ্বারা রাজি করিয়া নিগ্রোকে দাস করিয়া লইয়া যাইত, কিন্তু ইংরাজেরাই সর্ব্ব প্রথমে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। বলপূর্ব্বক নিগ্রোদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবার প্রথায় তাঁহারাই পথদর্শক হইলেন। এই প্রথা ক্রমেই অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। ষ্টুয়ার্টবংশের রাজ্যকালে প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেক হাটে নিগ্রো দাস পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বিক্রীত হইত।

শুনিয়া পাঠকগণ বিস্মিত হইবেন যে, ১৭০০ হইতে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেন্ শুদ্ধ জামেকা দ্বীপে ৬,১০,০০০ দাস চালান করেন; ১৬৮০ হইতে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিটিস উপনিবেশ সকলে ২১,৩০,০৫৫ দাস

প্রেরিত হয়; ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই জঘন্য ব্যবসায় ইহার পরাকাষ্ঠা লাভ করে; সেই বৎসরেই ১৯২ খানি ইংরাজ বাণিজ্যতরি ৪৭,১৪৬ জন নিগ্রো দাস লইয়া আমেরিকায় গমন করে!! ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের তালিকা গ্রহণ করিয়া দেখিতে পাই, সমস্ত ইউরোপ বৎসরে ৭৪,০০০ হাজার করিয়া নিগ্রোকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন, তাহার মধ্যে একা ইংরাজ বাহাদুরই ৩৮,০০০ হাজার করিয়া আমদানি করিতেন। যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া আছে, যাঁহার কণামাত্র মনুষ্যত্ব আছে, এমন কোন্ ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া লজ্জায় মুখ না লুকাইবেন? এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যাঁহার এই কথা শুনিয়া আপনাকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে মাথা কাটা না পড়িবে? উপরে যে সংখ্যাবলী প্রদান করিলাম, তাহা কাহার কল্পনা নহে, সাম্যবাদিগণের অতিরঞ্জিত চিত্র নহে; দাস-প্রভুগণের প্রদত্ত তালিকা— মানবজাতির অক্ষালনীয় কলঙ্কের অনশ্বর কীর্ত্তিধ্বজা! ধিক্ মানব! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। ধিক্ ইউরোপ! শত ধিক তোমায় ইংলণ্ড!

ইংলণ্ডের পাপের ভরা পূর্ণ হইল দেখিয়া, কয়েক জন মনীষীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। শার্প, উইলবার ফোর্স, ক্লার্ক্সন, প্রভৃতি মনীষিগণ স্বদেশের ও স্বজাতির এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন প্রকারে ইংলণ্ড হইতে দাসত্ব ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া ইংলণ্ডকৃত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। উইল্‌বার্ ফোর্স এই মনীষিগণের অধিনায়ক মনোনীত হইলেন। এই কার্য্য সিদ্ধ করিতে এই মহাপুরুষ আপনার সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন। এই স্থানে আমরা সেই ঋষি-প্রবরের জীবনের গুটি কত ঘটনা উল্লেখ করিব।

এই মহাত্মা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে হল্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। দশম বৎসরে পদার্পণ না করিতেই তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃব্যের যত্নে লালিত ও পালিত হন। তিনি কালেজ ছাড়িয়াই একবিংশতি বৎসর বয়সের সময় হল্ নগরের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবিষ্ট হন। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে মন্ত্রিপ্রবর পিটের সহিত তাঁহার সখ্য সংস্থাপন হয়। পার্লেমেণ্ট কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহাদের সেই সখ্য দৃঢ়ীভূত হয়। উইলবর্‌ফোর্সের স্বাভাবিকী প্রতিভা নিরন্তর পরিমার্জ্জনে অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বাগ্মিক বলিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং হাউস্ অব্ কমন্সে তাঁহার প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি বৈধিক সংস্কারকার্য্যে মন্ত্রিবর পিটের প্রধান সহায়কারক হইয়াছিলেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দাসব্যবসায়-সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সন্ন্যাসী। নিজের সুখ ও দুঃখ, সৌভাগ্যে তিনি পূর্ণ উদাসীন। কি নিদ্রায়, কি জাগরণে, কি গৃহে, কি বাহিরে—তাঁহার মনে একই সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা—কেমন করিয়া ইংলণ্ডের অক্ষালনীয় কলঙ্কের অপনয়ন করিবেন, কেমন করিয়া দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবেন। তিনি দেখিলেন, দাস ব্যবসায় ইংলণ্ডের অমল ধবল বশে গভীর কলঙ্ক-রেখা। তিনি দেখিলেন, এই প্রথা থাকিতে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা-প্রিয়তা জগতের পরিহাসোদ্দীপক। অসংখ্য ধনপতি অগণ্য মুদ্রা দিয়া লক্ষ লক্ষ দাস ক্রয় করিয়াছেন, তাহাদের পরিশ্রমে অতুল সম্পত্তির ঈশ্বর হইয়াছেন—কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে এ লাভকর বাণিজ্য হইতে নিরস্ত করেন—ভাবিয়া ভাবিয়া, নিরন্তর ভাবিয়া তাঁহার তনু ক্ষীণ হইল। তথাপি তাঁহার একই সঙ্কল্প। কিরূপে সংসিদ্ধ করিবেন—তা জানেন না, অথচ এই লক্ষ্য সংসাধনে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেন। অবিচলিত, সুদৃঢ় ও একাগ্র চিত্তে তিনি এই কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। সেই বহুকাল-মধ্যে তপস্বীর তিনি যে ধৈর্য্য, দৃঢ়সঙ্কল্পিতা ও সৎসাহস প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংলণ্ড বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে পার্লেমেণ্টে এই প্রস্তাব অবতারণ করেন। প্রতিবার প্রস্তাব করিতেছেন, প্রতি বার তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। কিন্তু নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমিক কিছুতেই ভীত বা বিচলিত হইবার নহেন। প্রোত্তুঙ্গ হিমাচলের ন্যায় তিনি অটলভাবে আপত্তি-ঝটিকা সহিতে লাগিলেন। বৎসর বৎসর তাঁহার প্রস্তাব উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগিল। অথচ সে যোগীর বিরাম নাই। কিন্তু সাগরগামিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় অভিলষিত বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প মনের গতিকে কে রোধ করিতে পারে? এক এক করিয়া ক্রমে বিশ বৎসর অতীত হইল। এ ঘোর তপস্যা পার্লেমেণ্ট আর সহিতে পারিলেন না। এই তপস্যানলে ক্রমে পাষাণ গলিয়া জল হইল। যে নয়ন এত দিন শুষ্ক ছিল, আজ তাহা হইতে অবিরল বারি-ধারা পড়িতে লাগিল। উইল্‌বার্‌ফোর্স কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অবিরাম কাঁদিয়া শেষে পার্লেমেণ্টকে কাঁদাইলেন। এত দিনে পার্লেমেণ্টের চৈতন্য হইল, তাঁহারা কি কুকাজ করিয়া আসিয়াছেন। দাস-ব্যবসায়ের অনুমোদন করিয়া তাঁহারা কি দুরপনেয় কলঙ্কের অংশভাগী হইয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহাদের পাপ বুঝিলেন, বুঝিয়া তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যত দাস ছিল, পার্লেমেণ্ট দাসপ্রভুদিগের নিকটে সমস্ত কিনিয়া লইয়া, তাহাদিগকে পূর্ণ মুক্তি দিলেন। আর

ভবিষ্যতের জন্য বিধান করিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আর কেহ কখন দাস ক্রয় করিতে পারিবে না। যেমন পাপ, তেমনই প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তে জগৎ বিমুগ্ধ হইল। জাতীয় আত্মত্যাগের এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে আর কখন দেখা যায় নাই। এক উইল্‌বার্ ফোর্সের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে সমস্ত ইংলণ্ড আত্ম-বিসর্জ্জন শিখিল। এক জনের কঠোর তপস্যায় সমস্ত পার্লেমেণ্ট সভা সন্ন্যাসি-সমিতিতে পরিণত হইল। যে জাতি এক টাকা ছাড়িতে কাতর, সে জাতি আজ কোটী কোটী টাকা অকাতরে বিসর্জ্জন করিলেন; কোটী কোটী টাকা দিয়া দাস প্রভুগণের কাছে দাসগণের স্বাধীনতা ক্রয় করিলেন। যে জাতি এক দিন ঈশ্বরের মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি মানব-আকৃতি লইয়া বাণিজ্য-ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন, আজ এই মহাপুরুষের চরিত্র-গৌরবে সে জাতির রণতরি সকল পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠাইবার জন্য সপ্ত সমুদ্র আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছে। ধন্য উইলবার ফোর্স! ধন্য তোমার জীবন! কত দিন হইল তুমি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া * বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়াছ, কিন্তু তোমার জীবন্ত বিশ্বপ্রেম আজও প্রতি ইংরাজকে দেবতা করিয়া রাখিয়াছে!

* ২৭এ জুলাই ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

জন্ হাউয়ার্ড।

আর এক জন সন্ন্যাসীর জীবনী বলি। চল, এক বার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জেলের অভ্যন্তরে যাই। যথায় যম-সদৃশ জেলারেরা চাবুক হস্তে হতভাগা এবং হতভাগিনীর দলকে তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, কোন কাজ করিতে একটু বিলম্ব হইলে তৎক্ষণাৎ কশাঘাতে তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রম করাইয়া অনশনে বা অর্দ্ধাশনে তাহাদিগকে পশুপালের ন্যায় পবনদেবসম্পর্ক-বিরহিত ভীষণ অন্ধকারাগারে পূরিয়া চাবি দিতেছে। তথায় দাঁড়াইয়া হতভাগা ও হতভাগিনীদিগের দুঃখে যিনি নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, ঐ মহাপুরুষ কে! উনিই প্রাতঃস্মরণীয়চরিত জন্ হাউয়ার্ড। সেই অভাগা ও অভাগিনীগণের দুঃখকাহিনী ইনিই মুক্তকণ্ঠে জগতে প্রচার করেন। যখন সমস্ত পৃথিবী অপরাধী ও অপরাধিনীগণের দুঃখ-যন্ত্রণায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, সেই সময়ে তাহাদের অবস্থা ভাবিয়া হাউয়ার্ডের প্রাণ কাঁদিল। যাহাদিগকে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে, বিস্মৃতিস্রোতে বিসর্জ্জন দিয়াছে, সেই অভাগা ও অভাগিনীগণের প্রতি হাউয়ার্ডের হৃদয় প্রেমবিগলিত ভাব ধারণ করিল। কয়েদী দেখিলে লোকের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইত, কিন্তু তাহাদের দুঃখে,

তাঁহাদের হতাশাপীড়িত অবস্থায়, তাঁহার হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হইত। তিনি জেলে জেলে তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেন। শুদ্ধ ইংলণ্ড নয়, সমস্ত ইউরোপ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। তিনি ইউরোপের সমস্ত জেল পরিদর্শন করিয়া বিভিন্ন দেশের কয়েদীদের অবস্থা তুলনায় সমালোচনা করিতেন। কারাগারের প্রস্তরময় প্রাচীর ভেদ করিয়া যে দুঃখের কাহিনী বাহিরে যাইত না, হাউয়ার্ড আজ সেই দুঃখের কাহিনী জগতে গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনাহারে, কশাঘাতে, কত শত নর নারী জেলের অভ্যন্তরে সমাধি-নিহিত হইত, পৃথিবী তাহার সংবাদ রাখিত না; আজ হাউয়ার্ড সে সকল গুপ্তহত্যার সংবাদ জগতে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কারাগারের অন্ধকারময় নিভৃত নিবাসে কত লোক মলমূত্রে পচিয়া মরিয়া থাকিত, জগৎ তাহার সন্ধান রাখিত না, আজ হাউয়ার্ড সেই সকল শোচনীয় ঘটনা জগতে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কালে তাহার প্রচারের ফল সকল দেশেই ফলিতে লাগিল, ইউরোপের সকল কয়েদীই তাঁহার পরিশ্রমের উপকার কিছু কিছু পরিমাণে পাইতে লাগিল। এখন যে ইউরোপের সর্ব্বত্র বায়ু-সঞ্চালিত, সুপ্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত, সুসজ্জিত, বিলাসদ্রব্যপূর্ণ কারাগার সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই মহাপুরুষের কীর্ত্তির জলন্ত প্রমাণ।

আমরা এই উপলক্ষে সেই মহাপুরুষের জীবনের দুই চারি কথা আগামী বারে বলিব।

নাস্তিকতা।

প্রথম প্রস্তাব।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।"

কপিল।

"তদভাবাবেদক প্রমাণসত্ত্বাৎ।"

কুসুমাঞ্জলি।

আস্তিকেরা বলেন, ঈশ্বর আছেন। নাস্তিকেরা বলেন, ঈশ্বর নাই। এ বিবাদের মীমাংসা কে করিবে? কোন বস্তুর সত্তা এবং বিদ্যমানতা প্রমাণ করিতে হইলে, আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানোৎপাদিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই প্রামাণ্য বলি। হিমালয় আছে কি না, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে, হিমালয়ের চাক্ষুষ জ্ঞানকেই প্রামাণ্য বলিতে হইবে। হয় হিমালয়কে স্বচক্ষে দেখা আবশ্যক, না হয়, যে সকল লোক হিমালয়কে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাদিগের বাক্য প্রমাণ

গ্রাহ্য করা আবশ্যক। এ দুই একই কথা। আমরা নিজে না দেখি, অন্য লোকে দেখিয়াছে। এই দ্বিবিধ প্রমাণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কোন বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে হইলে, এই প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ, ইন্দ্রিয় ব্যতীত আর কিছুই নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ নহে। কারণ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেহ কখন ইন্দ্রিয়জ্ঞানে উপলব্ধি করে নাই। এই জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের দৃষ্টান্ত স্থলে কপিল বলিয়াছেন, ঈশ্বর অসিদ্ধ। তাঁহার অর্থ এই, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ প্রমাণে অসিদ্ধ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে প্রত্যক্ষ প্রমাণে অসিদ্ধ, একথা যাঁহারা স্বীকার না করেন, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষীভূত করান, তাঁহাদিগের আবশ্যক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রমাণিত না হইল, তবে অবশ্য অন্যবিধ প্রমাণের আবশ্যক। কাপিল দর্শন পর্য্যালোচনায় বিলক্ষণ প্রতীত হয়, তৎপূর্ব্বে ঈশ্বর-অস্তিত্বের আরও দ্বিবিধ প্রমাণ গ্রাহ্য হইত। একের নাম অনুমান, অন্যতরের নাম আপ্তবাক্য। কপিল প্রথমে অনুমানের প্রণালী কি প্রকার, তাহা দেখাইলেন। তৎপরে বলিলেন, এই অনুমান-তর্কেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসিদ্ধ। যদি এ প্রমাণে সিদ্ধ হয়, তবে সে সিদ্ধ-করার ভার আস্তিকদিগের উপরে রাখিয়া দিলেন। তিনি যেন এইরূপ তর্ক করিলেন, আস্তিকেরা দেখান, এ, প্রণালীমতে ঈশ্বর কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারেন। এই অনুমান-প্রণালী ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া ইয়োরোপে দুই রূপ ধারণ করিয়াছে। একের নাম (Deductive) অবনয়ন প্রণালী, অন্যতরের নাম (Inductive) উন্নয়ন প্রণালী। নৈয়ায়িকদিগের উপমান এই অনুমান অন্তর্ভূক্ত। এপর্য্যন্ত এই অনুমান-প্রণালীতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। কপিলের কথা আজিও বজায় আছে। এই অনুমান-প্রণালীতে ঈশ্বর-অস্তিত্ব কিরূপে অসিদ্ধ হয়, নাস্তিকেরা বরং তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। নাস্তিকদিগের তর্ক আজও পর্য্যন্ত খণ্ডিত হয় নাই। এই জনাই আমরা বলিয়াছি, কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, কোন প্রকার যুক্তিসিদ্ধ তর্ক-প্রণালী দ্বারা ঈশ্বর-অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়া ধর্ম্মপ্রণেতা আস্তিকেরা তাঁহাদিগের নিজ নিজ ধর্ম্মমত স্থাপন করেন নাই। শঙ্করস্বামী, উদয়নাচার্য্য, বট্‌লার, চ্যামার্স, প্রভৃতি যে পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বধর্ম্ম প্রচলিত হইলে, অনেক কাল পরে, তবে এ বিষয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ হস্তক্ষেপ করিয়াও কেহই ঈশ্বর-অস্তিত্ব স্থাপনে সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। অনুমান তর্কে ঈশ্বর-অস্তিত্ব যে সিদ্ধ হইতে পারে না, সে বিচার আমরা পরে প্রদর্শন করিব।

আস্তিকেরা বোধ হয়, মনে মনে জানিতেন যে, ঈশ্বর-অস্তিত্ব কোন প্রমাণে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই জন্য তাঁহারা একটী কৌশল খাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা এই দুই তর্কমূলীয় বিবাদ-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সে ভূমির নাম (Revelation) আপ্তবাক্য। এই ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, আমরা সকলে বিবাদ বিসংবাদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্ন হইলাম। এ ভূমিতে আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু নাস্তিকেরা তাঁহাদিগকে সেখানে গিয়াও আক্রমণ করিলেন। কপিল তাঁহার দর্শন-মধ্যে এই আপ্তবাক্যেরও বিশ্বাস-ভূমি পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শব্দপ্রমাণ মধ্যে ইহাকে নিবিষ্ট করিয়াছেন। তৎপরে তিনি দেখাইয়াছেন যে, এ ভূমিও সুদৃঢ় নহে। ইহা এরূপ বালুময় যে, তাহার উপরে ঈশ্বরের বৃহৎ মন্দির স্থাপিত হইতে পারে না। এক্ষণকার খৃষ্টানধর্ম্মের প্রতিবাদীগণও কপিলের কথা প্রমাণিত করিতেছেন।

কপিল যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব এই ত্রিবিধ প্রকারেই অসিদ্ধ বলিলেন, তখন আস্তিকেরা আর সে দিকে গেলেন না। তাঁহারা অপর একটী নূতন ভূমি আবিষ্কার করিলেন। এ ভূমির নাম (Intuiton) স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান। ভারতে পতঞ্জলি এই ভূমি প্রথম নির্দ্দেশ করিয়া যেন। পতঞ্জলি দেখিলেন, কপিল-আলোড়িত পূর্ব্ববিবৃত তিন প্রকার ভূমিই বিবাদে পরিপূর্ণ। এজন্য সে সকল ভূমিই পরিত্যাজ্য। ভারতে পতঞ্জলি যাহা বলিয়াছেন, ইউরোপে প্রথমে ডেকার্ট (Descarte) তৎপরে ক্যাণ্ট (Kant) ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, ঈশ্বর-অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ এবং অনুমান যুক্তির উপরে নির্ভর করে না। তাহা আপ্তবাক্যের বিশ্বাসের উপরেও নির্ভর করে না। তাহা কোন প্রকারই বাহ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে না। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবাক্য, এ তিন প্রকারই বাহ্যপ্রমাণ। ক্যাণ্ট দেখাইয়াছেন, কোন দার্শনিক প্রমাণে ঈশ্বর-অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। পতঞ্জলি ও ক্যাণ্ট উভয়েই বলিয়াছেন, ঈশ্বর-অস্তিত্ব আর এক নূতন প্রকৃতিক প্রমাণের উপরে নির্ভর করে। সে প্রমাণ বাহ্য নহে;—কিন্তু আভ্যন্তরিক। তাহাকে প্রমাণই বলা যাইতে পারে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান মাত্র। ঈশ্বর-অস্তিত্ব আভ্যন্তরিক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে। তজ্জন্য বাহ্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। পতঞ্জলি এই রূপে ঈশ্বর অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলিয়া ধরিয়া লইলেন। তাহার আর প্রমাণ দেখাইতে হইল না। তিনিও মনে করিলেন, আমিই যথার্থ নির্ব্বিরোধ-ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ঈশ্বর-

অস্তিত্ব যদি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানোপলব্ধ হয়, তবে আর প্রমাণের আবশ্যকতা কি? কিন্তু এই অস্তিত্বের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ কি না তিনি তাহা দেখাইতে ভুলিয়া গেলেন। এক্ষণকার নাস্তিকেরা পণ্ডগুলির ভ্রম নিরসন করিয়াছেন। কিরূপে সে কার্য্য সাধিত হইয়াছে, আমরা তাহা পরে বিবৃত করিব।

আস্তিকেরা যখন দেখিলেন যে, নাস্তিকেরা এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-ভূমির অসারতাও প্রতিপাদন করিলেন, তখন তাঁহারা অন্য একটী ভূমির উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। পণ্ডগুলি বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানে সিদ্ধ এবং সেই জ্ঞান হেতু আমাদিগের ঈশ্বর-অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মায়। নাস্তিকেরা দেখাইলেন, ঈশ্বর অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানে সিদ্ধ নহে, তখন আস্তিকেরা সে বিবাদভূমি ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ বিশ্বাস অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা এখন যে ভূমির উপরে দাঁড়াইলেন, সেই ভূমির নাম দিলেন ভক্তি। আস্তিকেরা একেবারে সকল প্রকার প্রমাণের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেন। 'প্রমাণ' এই শব্দ মুখেও আনেন না। নাস্তিকেরা এ ভূমির দিকেও চাহেন না। কারণ, এ ভূমি এত অসার যে, ইহা নাস্তিকদিগের স্পর্শমাত্রও সহ্য করিতে পারে না। তাঁহাদিগের ঈষৎ ফুৎকার-মাত্রে উড়িয়া যায়। তাহা মূলেই জ্ঞান-সহ নহে। অন্ধ বিশ্বাস, আর জ্ঞান এই ভূমির অন্তর প্রবেশ করিয়াছে। যাঁহারা অপর সকল ভূমি হইতে প্রতাড়িত হইয়া স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের পক্ষও সমর্থন করিতে পারিলেন না, সেই আস্তিক-দল তবু আপনাদিগের ঐশ্বরিক অস্তিত্ব বিশ্বাস ছাড়িবেন না, এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, এই ভক্তির ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা এই ভক্তিভূমি পরীক্ষা করিতে চাহি না। তদুপরি যে আস্তিকেরা দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা আমাদিগের নিতান্ত অনুকম্পাভাজন। তাঁহারা সকল যুক্তির পথ অতিক্রম করিয়া গিয়া এই নিভৃত দেশে আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধিহীন প্রাণীর মত শুদ্ধ অন্ধ বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যদি কোন প্রকার যুক্তিমূলীয় হইত, তবে তাঁহারা এ ভূমিতে না দাঁড়াইয়া অপর চতুর্ব্বিধ ভূমির মধ্যে অন্যতমে দাঁড়াইতেন। যাঁহাদিগের ঈশ্বর-ভক্তি শুদ্ধ অন্ধ বিশ্বাস-মূলীয়, যাঁহারা কোন প্রকার যুক্তি, অথবা চিন্তার ধার ধারেন না, আমরা শুদ্ধ সেই সকল আস্তিকগণকে এই ভক্তিভূমির উপরে অবস্থিত বলিয়া গণনা করিয়াছি। অন্ধ বিশ্বাসের সহিত আমাদিগের সম্পর্ক নাই, সুতরাং এই আস্তিক-দলের সম্বন্ধেও আমাদিগের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। কারণ, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিবেন না।

এ প্রকার অন্ধ বিশ্বাসসম্বন্ধে আর্য্যদিগের কোন কথা খাটে না। শুদ্ধ এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যুক্তিহীন কোন বিশ্বাসই বুদ্ধিশীল প্রাণীর অবলম্বন করা অকর্ত্তব্য। এরূপ বিশ্বাস—বুদ্ধিহীন জীবেরই শোভা পায়।

আমরা দেখাইলাম, ঈশ্বর-অস্তিত্ব যদি প্রমাণিত হয়, তাহা তিন প্রকারে প্রমাণিত হইতে পারেঃ—স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, অনুমান তর্ক, এবং আপ্তবাক্য। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ঈশ্বর-অস্তিত্ব প্রমাণে অসমর্থ। কারণ, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ নহেন বলিয়া, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য প্রমাণের আবশ্যক হইয়াছে। যদি তিনি প্রত্যক্ষীভূত হইতেন, তবে তাঁহার অস্তিত্ব-প্রমাণের জন্য তর্কের অবলম্বন করিতে হইত না। যেহেতু মানবের ইন্দ্রিয়সকলই প্রত্যক্ষের সাক্ষী।

যদি কেহ এ কথা বলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞানে প্রমাণিত নহে বটে, কিন্তু তিনি যে নাই, এ কথার প্রমাণ কি? এই প্রতিবাদ-বাক্য আপাততঃ একটি যুক্তি বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ইহা বাস্তবিক যুক্তি নহে। ভাব-পক্ষেরই (Positive) প্রমাণ আবশ্যক; অভাব-পক্ষের (Negative) প্রমাণ আবশ্যক নহে। অভাব-পক্ষ অপ্রমাণিত করিতে হইলে, দেখাইতে হইবে যে, ভাবপক্ষ প্রামাণ্য। ঈশ্বর আছেন—এ কথা বলিতে হইলে, তাহার প্রমাণ আবশ্যক। ঈশ্বর নাই, এ কথার প্রমাণ চাই না; তবে এ কথা অপ্রমাণিত করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে,—ঈশ্বর আছেন। আমরা যদি বলি, পৃথিবীতে পর্ব্বত নামধেয় এরূপ কোন পদার্থই নাই। এ স্থলে আমাদের বাক্য অপ্রমাণিত করিতে হইলে, দেখাইতে হইবে যে, পর্ব্বত-নামধারী বস্তু বাস্তবিক আছে। এই তর্কই যুক্তিসঙ্গত। অতএব, আমাদের প্রতিবাদীর বাক্য যুক্তিসঙ্গত নহে।

যদি এ কথা বলেন যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভ্রমাত্মক, এজন্য অবিশ্বাস্য; অবিশ্বাস্য প্রমাণের উপরে আমরা নির্ভর করিয়া বলিতে পারি না যে, ঈশ্বর নাই। প্রতিবাদীর এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। আমরা বলি, নিজে প্রত্যক্ষজ্ঞান ভ্রমাত্মক নহে, তবে তৎসম্বন্ধে মনুষ্য যে সকল অনুমান (Inference) করেন, সেই অনুমান-তর্কে যে কত প্রকার (Fallacy) হেত্বাভাস জন্মিতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ অবনয়ন এবং উন্নয়ন প্রণালীগত ন্যায়শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই হেত্বাভাসই নানাবিধ ভ্রমের কারণ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানসংক্রান্ত উন্নয়নগত হেত্বাভাস সকল অধিকাংশ (Non-observation) অদর্শন-জনিত এবং (Mal-observation) অপদর্শন-জনিত। অনেক অদর্শনই অসম্পূর্ণ

জ্ঞান জন্য উৎপন্ন হয়। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। পূর্ব্বে লোকে বিশ্বাস করিত যে, সূর্য্যদেব পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিমে যান। এখানে প্রত্যক্ষজ্ঞান অসত্য নহে। দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তুমি আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখ, সূর্য্যদেবকে দেখিতে পাইবে; প্রভেদ এই; তুমি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। এই পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সূর্য্যদেবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল। তুমি আকাশের এখানেই দেখ, আর সেখানেই দেখ, তাহাতে ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিভিন্ন হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তোমায় সূর্য্যদেবকে দেখাইয়া দিতেছে। দ্বিপ্রহরে যখন তুমি সূর্য্যদেবকে মস্তকোপরি দেখিলে, তখন তুমি স্মরণ করিলে যে, প্রাতে তাহাকে ত সে স্থানে দেখ নাই; এই তুলনায় সুতরাং অনুমান করিতে হইল যে, প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহরের মধ্যে সূর্য্যদেবের স্থান-পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। তৎপরে আর দুইটী অনুমান তোমার বিচার্য্য হইল। এই সূর্য্যদেবের স্থান-পরিবর্ত্তের কারণ তোমার নিজের গতি হইতে পারে, অথবা সূর্য্যদেবেরও গতি হইতে পারে। এই দুই অনুমানের মধ্যে তুমি একটী অনুমান সকল দিক বিচার না করিয়া গ্রহণ করিয়া বসিলে, সূর্য্যদেব নিজে পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে আসিয়াছেন। কিন্তু এই স্থানপরিবর্ত্তের কারণ যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি হেতু তোমার নিজের স্থান-পরিবর্ত্ত, এ কথা তুমি জানিতে না বলিয়াই বিচার স্থান দিয়া কর নাই। রেলের গাড়িতে যাইতে যাইতে, তুমি এমত অনুমান কর না যে, তোমার সম্মুখস্থ বৃক্ষ সকল চলিয়া যাইতেছে কারণ, সে স্থলে তুমি বিলক্ষণ জান যে তুমি নিজেই গতিবিশিষ্ট। এত দিন তুমি অনুমান করিয়াছিলে যে, সূর্য্যই গতিবিশিষ্ট এবং তুমি স্থির। এই রূপ অজ্ঞতা হেতু তোমার অনুমান ভ্রমাত্মক হইয়াছে; তার পর তুমি অনুমানের সহিত প্রত্যক্ষজ্ঞানের গোলোযোগ ঘটাইয়া একটী সামান্য ধোঁকাভাসে পড়িয়াছিলে। আমাদের পূর্ব্বোক্ত রামধনু সম্বন্ধেও এইরূপ একটী সামান্য ধোঁকাভাস-জনিত জনসাধারণের ভ্রমোৎপত্তি হয়। সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিলে, যে কয়েকটী আদিবর্ণ পাওয়া যায়, রামধনুতে তাহারা সেই কয়েকটী বর্ণই দেখে। এস্থলে প্রত্যক্ষজ্ঞান তাহাদিগকে ভ্রান্ত করে নাই। তাহাদের অনুমানই তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে। কিন্তু মানবের অনুমান দুষ্ট বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে দুষ্ট বলিতে পারি না। যাঁহারা জ্ঞান-সম্বন্ধে এইরূপ বিচার না করেন, তাঁহারাই নানাবিধ ভ্রমে পতিত হবেন। মানব-মন এত ভ্রান্তি-প্রবণ যে, কোন স্থলে একটু অসম্পূর্ণতা ঘটিলেই অমনি একটী ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিরাও এইরূপে অনেক

সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পড়েন। অতএব, বোধ হয়, প্রতিপন্ন হইল যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবিশ্বাস্য এবং অসত্য নহে। আমাদের অনুমানই সকল সময়ে বিশ্বাস্য এবং সত্য হইতে পারে না।—জগতের সাক্ষী প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাক্ষী জগৎ। কিন্তু অনুমানের সাক্ষী কোন স্থলে আছে, কোন স্থলে নাই। সত্য অনুমানের সাক্ষীস্বরূপ আমরা পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি সর্ব্ববিষয়েই উপলব্ধ করি। কিন্তু মিথ্যা অনুমানের স্বরূপ আমাদের উল্লিখিত দৃষ্টান্তমত সূর্য্যের দৈনিক গতি বিদ্যমান নাই।

যাহারা বলেন প্রত্যক্ষ প্রমাণে ঈশ্বর-সত্তা উপলব্ধ না হইবার কারণ এই যে, ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহার মূর্ত্তি নাই; নিরাকার পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। আমরা স্বীকার করি, নিরাকার পদার্থ বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ নহে। কিন্তু আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না, ঈশ্বর কি জন্য নিরাকার হইবেন। ঈশ্বরের স্বরূপ যে প্রকার নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আকার যে একেবারে অসম্ভব, এমত প্রতিপাদিত হয় না। ঈশ্বরের স্বরূপ পণ্ডিতগণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেনঃ—

(১) যিনি এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং নিয়ন্তা তিনিই ঈশ্বর।

(২) ঈশ্বর জগৎ অতীত এক স্বতন্ত্র পুরুষ।

(৩) তিনি এক বই দুই নহেন।

(৪) তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বমঙ্গলময়—অনন্ত পুরুষ।

ঈশ্বরের এই কতিপয় স্বরূপ লক্ষণে তাঁহার যে আকার একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে, এমত প্রতিপাদিত হয় না। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং নিয়ন্তা হইলে যে নিরাকার হইতেই হইবে এমত প্রমাণিত হয় না। জগৎ অতীত একজন স্বতন্ত্র পুরুষ যদি থাকেন, সে পুরুষকে নিরাকার হওয়া চাই কেন? "একমেবাদ্বিতীয়মের" নিরাকারত্ব অবশ্যম্ভবনীয় নহে। কিন্তু লোকে বলেন, প্রথম ত্রিবিধ লক্ষণের জন্য যে ঈশ্বর নিরাকার হইয়াছেন, এ কথা আমরা বলি না, আমরা বলি, তাঁহার চতুর্থ লক্ষণের জন্য ঈশ্বর নিরাকার হইয়াছেন। কারণ, ঐ চতুর্থ গুণাবলি মানসিক ধর্ম্ম, এবং যাহাতে মানসিক ধর্ম্ম বিদ্যমান, তাহা অবশ্য মানসিক পদার্থ হইবে; মানসিক পদার্থের আকার অসম্ভব। আমরা স্বীকার করি, মানসিক পদার্থের আকার অসম্ভব। কিন্তু আমরা স্বীকার করি না যে, মানসপদার্থ শরীর-অবলম্ব বিহীন হইবে। প্রত্যুত আমরা দেখি নাই যে, মানসিক পদার্থ কখন শরীর-আশ্রয় বিহীন হইয়া আছে। বাস্তবিক শরীরের সহিত মনঃপদার্থের এরূপ সম্বন্ধ যাহাতে এক দিন যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অনুমান করেন যে, শরীর হইতেই মনের উৎপত্তি এবং শরীর অতীত মন

স্বতন্ত্র অবস্থান করিতে পারে না, তাহার এ কথা অপ্রমাণিত করা অসম্ভব। মানসিক গুণ সকল অল্পই হউক, বা অধিকই হউক লোকের বুদ্ধি, জ্ঞান ও দয়া অল্পই হউক অথবা অধিকই হউক, তাহা সেই মনেরই ধর্ম্ম; এবং সঙ্কীর্ণ মন যেমন শরীর অবলম্বনে রহিয়াছে, প্রশস্ত মনও তদ্রূপ শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। গুণের আধিক্য হেতু শরীর-আশ্রয়ের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। মানসিক গুণ বেশি হইলে যে বৃহৎ শরীর চাই, এরূপ দৃষ্ট হয় না। শরীরের ইতর-বিশেষত্ব হেতু মনের তারতম্য ঘটে না। জ্ঞান অল্প মাত্রায় থাকিলেও তাহা শরীর অবলম্ব করিয়া থাকে, অধিক হইলেও তাহা সেই শরীর অবলম্বন করিয়া থাকে। একজন অসভ্য লোকের জ্ঞানের সহিত একজন সুসভ্য লোকের জ্ঞানের অনেক তারতম্য। কিন্তু উভয়েরই শরীর আছে। তবে এই জ্ঞান যদি অনন্ত হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান কি আর মনঃপদার্থের ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে না? যদি অনন্ত গুণ হেতু সেই গুণের আধারের পরিবর্ত্ত হওয়া সম্ভব হয়, তবে এক দিন বলিতে হইবে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়া এবং অনন্ত শক্তি মনঃপদার্থের গুণ নহে। সেই গুণের আধার স্বরূপ যে পদার্থ, তাহা মনঃপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদি এ কথা বলা অভিপ্রেত হয়, তবে সে পদার্থের অধিকতের ন্যায় জ্ঞান, শক্তি এবং দয়া বলা অন্যায়। যেহেতু এ সমস্ত গুণ মনঃপদার্থেরই ধর্ম্ম, এবং যাহা মনঃপদার্থের ধর্ম্ম, তাহা যে মন ব্যতীত অপর পদার্থে থাকিতে পারে, ইহার প্রমাণ কি? এরূপ অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নহে। গুণ অনন্ত হইলে যে একেবারে পদার্থের প্রকৃতি বদলাইয়া একটী স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া উঠিবে, এমত প্রমাণিত হয় না। আর শরীর থাকিলেই জ্ঞান, শক্তি ও দয়ার অনন্ত ভাবের যে কিরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা আমরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না। বরং আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, শরীর থাকাতে জ্ঞান এবং দয়া বৃদ্ধির কিছুই ব্যাঘাত ঘটে না। অত-এব অনন্তজ্ঞানী, অনন্তশক্তিশীল, এবং অনন্ত দয়াসম্পন্ন পুরুষ যে অবশ্য অশরীরী এবং নিরাকার হইবে এমত প্রমাণিত হয় না।

কিন্তু আস্তিকেরা আর একটী কথা বলেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি ঈশ্বরকে শরীরী বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের কার্য্য-শক্তির ব্যাঘাত হয়। শরীর কিরূপে জ্ঞান, শক্তি ও দয়াকার্য্যের বিরোধী হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। জ্ঞান, শক্তি ও দয়া মনুষ্যেরও অনেক পরিমাণে আছে, কিন্তু মনুষ্য দৃষ্টান্তে ত শরীর জনিত কোন বিরোধ দেখিতে পাই না। যদি সেই জ্ঞান, শক্তি ও দয়া অপর পুরুষের ধর্ম্ম হয়, তবে

তাঁহাকে অশরীরী হইতে হইবে কেন, তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। আস্তিকেরা যখন ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বময় বলেন, তখন তাঁহাদের কি ঈশ্বর কল্পনা এরূপ নয় যে, তিনি জ্ঞানে সর্ব্বময় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন? জ্ঞানকে সর্ব্বময় হইতে হইলে, শরীরকেও সর্ব্বময় হইতে হয়, কিন্তু শরীর সর্ব্বময় হইতে পারে না—এইরূপ যুক্তি করিয়া কি আস্তিকেরা নিজ কল্পিত ঈশ্বরের আকারের অস্তিত্ব অসম্ভবনীয় জ্ঞান করিয়াছেন? যদি তাহাই হয় তবে এ যুক্তি কিরূপে সঙ্গত, তাহা প্রদর্শন করা চাই।

আমরা এই মাত্র বলি যে,শরীর অবলম্বনে জ্ঞানের অবস্থান অসম্ভবনীয় নহে। সেই শরীর যে ঠিক মনুষ্যের শরীর হইবে একথা আমরা বলি না। আমরা দেখিতে পাই, শরীরী প্রাণী মাত্রেরই জ্ঞান আছে। অনন্ত জ্ঞানের শরীরঅবলম্ব যে ঠিক মনুষ্যাকার হওয়া আবশ্যক, এমত কথা আমরা বলি না। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, যেরূপই হউক, একরূপ উপযোগী শরীর অবলম্বনে জ্ঞানের অবস্থান অসম্ভবনীয় নহে। শরীর জ্ঞান-কার্য্যের বিরোধী নহে। আস্তিকেরা যেরূপ ঈশ্বর-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সেই ঈশ্বরকে যে একান্ত অশরীরী ও নিরাকার হইতেই হইবে, এমত সম্ভাবনা নাই।

আস্তিকেরা আরও একটী কথা বলেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি বাস্তবিক ঈশ্বরের শরীর থাকিত, তবে তিনি কখন না কখন মানবচক্ষের গোচর হইতেন। তিনি যে কখন মানবচক্ষে পড়েন নাই, এই কথাই স্থির। কিন্তু মানবচক্ষে যাহা কখন দৃশ্যমান হয় নাই, তাহা যে একান্ত অশরীরী হইতে হইবে এমত প্রমাণিত হয় না। তিনি প্রত্যক্ষীভূত হন নাই বলিয়া যে, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, এরূপ তর্ক করা যুক্তিবিরুদ্ধ। আর তিনি প্রত্যক্ষীভূত হন নাই বলিয়া যে কখন হইতেও পারেন না, এরূপ সম্ভাবনা কি? অতএব, এ তর্ককেও ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রমাণের পক্ষে কূট তর্ক বলিতে হইবে।

আমরা বলি, আস্তিকদিগের কল্পিত ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাঁহার যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে সেরূপ কল্পনাতে সেই ঈশ্বরের আকার অসম্ভবনীয় নহে। তাঁহাকে অন্যবিধ কল্পনা করিলে তাঁহার আকার সম্ভব কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা। পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক ঈশ্বর-স্বরূপ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বে যখন লোকে, যোব, জিহোভা প্রভৃতি দেবতাগণকে মানিত, তখন তাহারা সমস্ত ঈশ্বরের লক্ষণ শরীরী দেবতাতে অর্পণ করিয়াছিল এবং তখনকার পণ্ডিতগণ শরীরী দেবতার সংযোগে সেই সমস্ত ধর্ম্মের অবস্থান কোন মতে অসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। বেদাদিতে অনেক

তদীয় জ্ঞানচক্ষু দ্বারা যে সমগ্র বিশ্বচরাচর প্রত্যক্ষীভূত করিতেছেন আজিও হিন্দুগণ এই বিশ্বাসকে অসঙ্গত বিবেচনা করেন না।

আরও দেখ, যদি জগৎ-অতীত কোন অলৌকিক ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে বলা হইল যে, এই জগতের স্বয়ং-সম্ভব-শক্তি নাই, তাহা স্বয়ং সৃষ্ট হইতে পারে না। স্বয়ং সৃষ্ট হইতে পারে না বলিয়াই এক জন অলৌকিক সৃষ্টিকর্ত্তার অনুমান আবশ্যক হইয়াছে। আমরা এই বাহ্য জগতীয় সমস্ত সৃষ্টি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, আদিতে কেবল অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জ বিদ্যমান ছিল। কাপিল সাংখ্যে যাহাকে মূল-প্রকৃতি এবং অব্যক্ত প্রকৃতি বলিয়াছে, তাহা এই পরমাণুপুঞ্জ। প্রকৃতি যখন পরমাণুপুঞ্জ রূপে বিদ্যমান ছিল, তখন তাহা অব্যক্তভাবে অবস্থান করিত। যেহেতু পরমাণুসকল মানবের সামান্য দৃষ্টির গোচর নহে। যদি অলৌকিক সৃষ্টিকর্ত্তা একজন থাকেন, তবে অবশ্য স্বীকার করিয়াছ যে, এই পরমাণুপুঞ্জের এমত কোন ক্ষমতা নাই, যদ্দ্বারা তাহারা ঠিক পরিমাণ অনুসারে একত্র সমাবিষ্ট হইয়া পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে। তাহাদিগকে পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ করিতে দৈহিক শক্তির আবশ্যক। তদ্ভিন্ন আমরা দেখিতে পাই, জড় পদার্থ সকল একত্র সমাবিষ্ট হয় না। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ এবং শিল্পিগণ অহরহ এই বিষয় প্রমাণিত করিতেছেন। যদি বল সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা হইলেই তাহারা একত্র সমাবিষ্ট হইতে পারে, তাহাতে আমরা বলি, ইচ্ছা নিজে সক্রিয় নহে। ইচ্ছার পর যত্ন, যত্নের পর চেষ্টা এবং চেষ্টার পর কার্য্য। চেষ্টা ও কার্য্য শক্তি-সাপেক্ষ। যখন জড় পদার্থ সম্বন্ধে এই শক্তি প্রযুক্ত হয়, তখন এই শক্তি প্রয়োগার্থ দৈহিক শক্তির আবশ্যক। তুমি মনে মনে ইচ্ছা করিলেই জড় পদার্থ কার্য্য করিবে না। জড় পদার্থকে তোমার কার্য্যে আনিতে হইবে। নহিলে তুমি হাজার ইচ্ছা কর যে, জড় পদার্থ একত্র সংযুক্ত হউক, তথাপি যতক্ষণ না তাহাদিগকে তুমি ধরিয়া আনিয়া একত্র সংযুক্ত করিয়া দিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা সকলেই, স্ব স্ব স্থানে পড়িয়া থাকিবে। অতএব জড় পদার্থ সকল কখনই ইচ্ছাধীন নহে। তাহাদিগকে ইচ্ছাধীন করিতে হইলে দৈহিক বলের আবশ্যক।

আবার দেখ, সৃষ্টিকর্ত্তার শুদ্ধ শক্তি থাকিলে হইবে না। আমরা মনুষ্যের দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই, মনুষ্যের এমত শক্তি আছে, যদ্দ্বারা তিনি ইচ্ছা করিলে জড় পদার্থ সকলকে একত্র সমাবিষ্ট অথবা অসংযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মানব, সেই শক্তি আপন হস্তদ্বারাই হউক অথবা যন্ত্র ও অন্য কোন তদ্রূপ উপায় দ্বারা জড়পদার্থের উপর

সেই শক্তি প্রয়োগ করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন পদার্থ তাহার ইচ্ছানুসারে সংযুক্ত অথবা বিযুক্ত হইবে না। বহির্দেশীয় শক্তির সহিত জড়ের এই পর্য্যন্ত সম্পর্ক যে, সেই শক্তি শারীরিক বল দ্বারা নিয়োজিত হওয়া চাই। নহিলে শক্তি সত্ত্বেও তাহা স্বতঃই কার্য্যশীল হইবে না।

আবার দেখুন, আমরা কেবল শারীরিক জগতেই দেখিতে পাই যে, শরীরই কেবল ইচ্ছার অধীন। তুমি ইচ্ছা করিলে, তোমার হস্ত উত্তোলিত হইল; এবং সেই হস্ত তুলিয়া তুমি কোন জড় দ্রব্য গ্রহণ করিলে। অতএব, জড়-পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করিতে হইলে শুদ্ধ ইচ্ছাদ্বারা তাহা সম্পন্ন হয় না। ইচ্ছা প্রথমে শারীর পদার্থে কার্য্য করিবে; এবং শারীরিক পদার্থের কার্য্যোৎপন্ন বল দ্বারা জড় চালিত হইবে। শরীর ব্যতীত যে ইচ্ছা কার্য্যশীল হইতে পারে, এরূপ প্রমাণিত হয় না। জগৎ অতীত কোন স্বতন্ত্র পুরুষ দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইতে গেলে, সেই পুরুষের শরীর ব্যতীত যে, শুদ্ধ তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা কিছু কার্য্য হইতে পারে, এমত অনুমানও তুমি করিতে পার না। যদি কর, তাহা হইলে তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছাকে আর ইচ্ছা বলিতে পারিবে না, এবং জড়কে আর জড়বস্তু বলিতে পারিবে না। কিন্তু ইচ্ছার অভাবে সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান ও [illegible] সম্বন্ধ-সাধক হইতে পারে না। যদি বল, শরীর কি জড়পদার্থ নহে? আমরা বলি, শরীর যদি জড়পদার্থ হয়, তবে তাহাকে সেই শরীররূপ জড়ের পরিণাম বলিব। শরীর সামান্য জড় পদার্থ হইতে অনেক কারণে প্রভিন্ন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, ইহা জড়পদার্থের এক বিশেষ পরিণাম মাত্র—যে পরিণামে শরীর হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি, এবং যে পরিণামে চেতনার ইচ্ছা ইহাতে কার্য্যশীল হইতে পারে। শরীরকে কখনই সামান্য জড় পদার্থ বলা যাইতে পারে না।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, জড় জগৎ সৃষ্ট হইয়া অনেক যুগ অতীত হইলে তবে প্রাণীজগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল। বহুল প্রমাণে এই তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। পূর্ব্বে যদি জড়জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং সেই সৃষ্টির জন্য যদি আণবিক সংযোগ বিয়োগের আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং এইরূপ সংযোগ বিয়োগ যদি শারীরিক বল-প্রয়োগ ব্যতীত কখন সম্পন্ন না হয়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টিকর্ত্তার শরীর ব্যতীত তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টিব্যাপার সম্পন্ন হয় নাই। সৃষ্টিকর্ত্তাকে অশরীরী জ্ঞান করা যে কোন্ যুক্তি অনুসারে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

অতএব সপ্রমাণ হইল যে, যদি ইহ-জগতের কোন অলৌকিক সৃষ্টিকর্ত্তার সম্ভাবনা হয়, তবে সেই সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্য শরীরী। যদি তিনি শরীরী হন, তবে

তিনি অবশ্য প্রত্যক্ষের বিষয় । যদি তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হন, তবে আস্তিকেরা বলিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বর-অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হন,তবে যত দিন না তিনি প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন, ততদিন তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।

যদি বল, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও হইতে পারেন,তিনি শরীরী হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু তিনি শরীরী হইলেই যে প্রত্যক্ষীভূত হইবেন,এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, তাঁহার প্রত্যক্ষ না হইবার কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে সে কারণ যে তাঁহার অনন্ত দয়াগুণের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে,আমরাএমত বুঝিতে পারি না। যখন তাঁহার অস্তিত্ব লইয়া পৃথিবীতে ঘোর বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত, তজ্জন্য মারামারি, কাটাকাটি এবং রক্তারক্তির সীমা পরিসীমা নাই, তখন তিনি যে কি প্রকারে অনন্ত দয়াবান হইয়া অদৃশ্য ও নিরপেক্ষভাবে মানবের অশেষ যন্ত্রণা দেখিতেছেন,তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অতএব, যে ঈশ্বর আস্তিকেরা কল্পনা করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরসত্তা যদি বাস্তবিক থাকিত, এবং সেই ঈশ্বর যদি শরীরী হইতেন, তবে তিনি মানব প্রত্যক্ষের অতীত হইয়া কখনই থাকিতে পারিতেন না।

যদি বল, শরীর স্বষ্টপদার্থ, একথা বিনি সেই শরীরের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার তাহা সম্ভবিতে পারে না। একথা বলিলে আমরা বলিব, মনও ত সৃষ্ট পদার্থ; তবে তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার কিরূপে সম্ভবিতে পারে? জ্ঞান, দয়া, ও শক্তি যদি মনের ধর্ম্ম হয়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের মনও যে পদার্থ ঈশ্বরও সেই পদার্থ। গুণের অসীমতা হওয়াতে কিছু পদার্থভেদ হয় না। ঈশ্বর যদি মনঃপদার্থ হন, তবে ত তাঁহাতে সৃষ্ট পদার্থ সম্ভব হইতেছে। তবে শরীরও তাঁহাতে সম্ভব নহে কেন, আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর পদার্থ যদি মনঃপদার্থ হইতে স্বতন্ত্র হয়, তবে মনের ধর্ম্মাদি কোন্ যুক্তিতে ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল? যদি বল সৃষ্টিব্যাপারে জ্ঞান, দয়া ও শক্তির পরিচয় থাকাতে অনুমিত হইল যে, সে সমুদয় অবশ্য সৃষ্টিকর্ত্তার আছে। কিন্তু সৃষ্টিব্যাপারে ত ঐ সমস্ত গুণের বিপরীত গুণ সকলেরও পরিচয় আছে। তবে অন্য পক্ষে বল না কেন ঈশ্বর জ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর, ও অসমর্থ? মন-বিশিষ্ট মানব যখন জগৎ পর্য্যালোচনা করিবেন, তখন যে তিনি নিজ মনের ধর্ম্মানুসারে সেই জগতে জ্ঞান, দয়া, শক্তি, অজ্ঞানতা, নিষ্ঠুরতা এবং অসমর্থতার পরিচয় পাই-বেন, এ বড় বিচিত্র নহে। কারণ, মানব আপন চিন্তানুসারেই সকল গড়িয়া লয়েন। মানব যে কৌশল জগতে অনুমান করিতেছেন, জগৎ যে ঠিক সেই

কৌশল অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে, একথা কে প্রমাণ করিতে পারে? মানব সৃষ্টি-কর্ত্তা না হইলে এ বিষয়ের মীমাংসা হয় না। অতএব, আমরা যে জ্ঞান, দয়া, ও শক্তি ঈশ্বর-পদার্থে আরোপ করি, যদি সৃষ্টিকর্ত্তারূপ স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও পুরুষ থাকেন, তবে সেই সৃষ্টিকর্ত্তারও গুণ যে জ্ঞান,দয়া ও শক্তি, শুদ্ধ পদার্থ বিচার করিলে এমত প্রতীত হয় না। কারণ, জ্ঞান দয়া ও শক্তি মনঃপদার্থের গুণ; মনঃপদার্থ সৃষ্ট পদার্থ; সুতরাং সৃষ্ট পদার্থের গুণ সৃষ্টিকর্ত্তাতে সম্ভবিতে পারে না।

যদি বল, সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ কি, আমরা তাহা জানি না। তবে স্বীকার কর যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব শক্তিমান এবং সর্ব্ব মঙ্গলময় নহেন। একথা যদি স্বীকার কর, তবে তোমার ঈশ্বর শুদ্ধ সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগৎ-অতীত অলৌকিক পুরুষ হইলেন। তখন তাঁহার শুদ্ধ সৃষ্টি-শক্তি অনুমান করিয়া তুমি তাঁহাকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিতেছ। তুমি শুদ্ধ সৃষ্ট পদার্থের সহিত সৃষ্টিকর্ত্তার পদার্থ প্রভেদ করিবার জন্য বলিলে, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বতন্ত্র পদার্থ। এখন কথা এই, সৃষ্টিকর্ত্তার পদার্থ যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে সে পদার্থ কোথা হইতে আসিল? এ কথার মীমাংসা করিতে গেলে, হয় তোমাকে অনন্তসংখ্যক পদার্থের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়, না হয়, তোমাকে বলিতে হয় যে, জগতের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি স্বয়ং সম্ভূত। এই দ্বিবিধ অনুমানই দোষাশ্রিত। প্রথম অনুমান ছাড়িয়া দাও। দ্বিতীয় অনুমানে তোমাকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইল যে, যে পদার্থ জগৎকে সৃষ্ট করিতে পারে, তাহা আবার আপনাকেও সৃষ্ট করিতে পারে; নহিলে তাহা স্বয়ং সম্ভূত হইবে কি প্রকারে? অতএব তোমারই অনুমান অনুসারে নিজে সৃষ্টিকর্ত্তার পদার্থ আবার সৃষ্ট পদার্থ হইল। কিন্তু তুমিই না পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে,সৃষ্ট পদার্থ, ও সৃষ্টিকর্ত্তার পদার্থ, এ দুই স্বতন্ত্র জ্ঞান করি। অত-এব তোমরই অনুমান তোমার নিজ অনুমানের বিরোধী হইল।

আবার দেখ, যখন তুমি সৃষ্টিকর্ত্তার স্বয়ং-সম্ভব-শক্তি স্বীকার করিলে, তখন তোমাকে এমত এক পদার্থের বিদ্য-মানতা স্বীকার করিতে হইল, যাহা স্বয়ং সম্ভূত হইতে পারে। যে পদার্থে স্বয়ং-সম্ভবশক্তি নিহিত আছে, তাহাতেই সৃষ্টি-শক্তি নিহিত আছে। যখন এই বিশ্ব-ব্যাপারে সেই দ্বিবিধ শক্তি নিহিত দেখিতেছ,যখন তুমি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখিয়াছ যে, এই জগৎ, এই ব্রহ্মাণ্ড আদিতে কেবল পরমাণুপুঞ্জ হইতে পরিণত হইয়াছে, এই মহীতলে ক্রমে উদ্ভিদের উৎপত্তি, তৎপরে অগণ্য জৈবিক সৃষ্টি সমুদ্ভূত হইয়াছে, এখনও প্রাণী জগতে পরিণামের পর পরিণাম, সৃষ্টির পর সৃষ্টি স্বয়ং সম্ভূত হইতেছে; তখন তুমি এই প্রকৃতি অতীত অন্য এক স্বতন্ত্র, অলৌকিক সৃষ্টিকর্ত্তার বিদ্যমানতা

কিরূপে প্রমাণিত করিতে পার ? যে স্বয়ং-সম্ভূত-সৃষ্টি-শক্তি তুমি স্বতন্ত্র সৃষ্টি-কর্ত্তায় আরোপ করিতেছ, এই প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জে কি সেই শক্তি নিহিত নাই ? যে সৃষ্টিকরী শক্তির এক মাত্র গুণ এই যে, তাহা স্বয়ং সম্ভূত, সেই স্বয়ং-সম্ভব-শক্তি কি প্রকৃতিতে বিদ্যমান নাই ? এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি স্বয়ং সম্ভূত সৃষ্টিশক্তির প্রসার মাত্র নহে ? তবে তুমি কি জন্য বলিতে চাহ যে, এই প্রকৃতি-অতীত এক স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা আছে ? যদি থাকে, তবে ত সে পদার্থ এই প্রকৃতির মতই পদার্থ। তবে প্রকৃতি ভিন্ন অন্য এক ধাতুর সৃষ্টিকর্ত্তা রূপ পদার্থের বিদ্যমানতা কই প্রমাণিত হইল ? সুতরাং প্রকৃতির আর স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, এই রূপই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যদি বল, বিশ্ব-ব্যাপারে যে জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে, সে জ্ঞান কি প্রকৃতিতে আরোপ করা যায় ? কিন্তু তুমি কি স্বীকার কর নাই যে,যদি প্রকৃতি-অতীত কোন অলৌকিক সৃষ্টিকর্ত্তা থাকেন, তাঁহাতে জ্ঞান ও দয়া সম্ভবে না। তবে তুমি ধর না কেন যে, প্রকৃতিও জ্ঞানসম্পন্না এবং দয়াবতী নহেন। সৃষ্টিব্যাপারে যতদূর জ্ঞান ও দয়ার পরিচয় আছে, ততদূর অজ্ঞানতা ও দয়াহীনতারও পরিচয় আছে। অলৌকিক সৃষ্টিকর্ত্তা মানিলে তাঁহাকেই আবার সংহারকারী বলিয়া মানিতে হইবে। কারণ, ঈশ্বর এক বই দুই নহেন ; যাহাতে সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় এই ত্রিবিধ ক্ষমতাই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র ঈশ্বর পদার্থ নহে, তাহা এই দেদীপ্যমান মহান্ প্রকৃতি-পদার্থ। কপিল ইহাকেই মূল-প্রকৃতি বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মূল-প্রকৃতি এইরূপ ত্রিবিধ শক্তিসম্পন্না। সেই ত্রিবিধ শক্তির নাম তিনি সত্ত্ব,রজঃ ও তম বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কপিল বলিয়াছেন, বেদ-প্রকৃতিকেই জগতের কর্ত্রী বলিয়াছে। শাস্ত্রে যে ঈশ্বর কথার উল্লেখ আছে, তাহা যোগ-সিদ্ধ পুরুষ মাত্র। তাহা জন্য ঈশ্বর অর্থাৎ তাহা জন্মিয়াছে ; এবং শুদ্ধ পূজার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এই মত কপিল-আদিষ্ট বলিয়াই আমরা গ্রাহ্য করি না, কিন্তু ইহা তর্কেও স্থাপিত হয়। যাহা শুদ্ধ যুক্তিতে স্থাপিত হয়, আমরা তাহাই বলিয়াছি। এখন স্বীকার কর যে, প্রকৃতি-অতীত যে এক জন স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও ঈশ্বর-পদার্থ নাই, তাহার প্রমাণ আছে। সে প্রমাণ প্রত্যক্ষ ; কারণ, কোন পদার্থের বিদ্যমানতা স্থাপন করিতে হইলে প্রত্যক্ষই গ্রাহ্য।

প্রত্যক্ষ প্রমাণে যে ঈশ্বর-অস্তিত্ব অসিদ্ধ তাহা প্রতিপন্ন হইল। যাঁহারা বলেন, তাহার অস্তিত্ব অনুমানে সিদ্ধ, তাঁহাদিগের পক্ষ পরবারে পর্য্যালোচিত হইবে। ঈশ্বর নাই—এ বাক্য শুদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ হইল। ঈশ্বর অস্তিত্বের প্রমাণাভাব—অনুমান তর্কে সিদ্ধ হইবে। ঈশ্বরসত্তা সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের

আলোচনা আমরা শুদ্ধ কুসুমাঞ্জলিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তৎপ্রসঙ্গে উদয়নাচার্য্য তৃতীয় স্তবকে যে সংশয়ের নিরসন করিয়া ঈশ্বর স্থাপন করিয়াছেন, আমরা ঠিক সেই সংশয়-তর্কের উদ্ভাবন করি নাই। সুতরাং তদীয় খণ্ডন-তর্ক আমাদিগের পক্ষ নিরসন করিতেছে না। তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে উপলব্ধি হয় না বলিয়া যে কোন পদার্থ নাই, একথা প্রমাণিত হয় না। এ কথার বিপক্ষে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, উপলব্ধিজ্ঞান (Perception) ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র পদার্থসত্বার আর দ্বিতীয় প্রমাণ নাই। আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতীত অনুমান দ্বারা যাহার সত্তা উপলব্ধ করি, তাহা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ পদার্থের গুণ মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি ও সৌর জগতের গতিকে নির্দ্দেশ করিলাম। এস্থলে আমরা অনুমান তর্কে জড়পদার্থ অতীত একটী স্বতন্ত্র পদার্থ নির্ণয় করি নাই; কিন্তু জড়পদার্থের দুইটী গুণই নির্ণয় করিয়াছি। অদৃষ্ট হইতে উদয়ন যেরূপে অলৌকিক সত্বার প্রমাণ করিয়াছেন তাহা অতি দুর্ব্বল যুক্তি। আমরা বরং বলিয়াছি জড়পদার্থ ব্যতীত যদি অপর কোন পদার্থের সত্বা সম্ভাবিত হয়, তাহা শরীর ও চেতনা। শরীর প্রত্যক্ষমূলীয় উপলব্ধি গ্রাহ্য। কিন্তু চেতনা, যাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণাম মন, তাহা যে শরীর ব্যতীত স্বতন্ত্র অবস্থান করিতে পারে, এমত প্রমাণ নাই। সুতরাং মন যদি শরীর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ হয়, তবে যে পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, মন শরীরেরই উৎপন্ন পদার্থ এবং শরীরেরই সহিত তাহার লয় হয়, তাহাদিগের পক্ষ খণ্ডিত হয় না। আর যদি চেতনা এবং মনকে শরীরেরই ধর্ম্ম বল, তবে জড় ও শরীর অতীত অপর পদার্থের সত্বা নাই বলিতে হইবে। ঈশ্বর-অভাব-সাধক প্রমাণ আছে,—এই বিপ্রতিপত্তির খণ্ডন উদয়নাচার্য্য অনুমান এবং উপমান প্রমাণে সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহার শব্দ এবং আপ্তবাক্য বিষয়ক প্রমাণ সকল অত্যন্ত দুর্ব্বল। আপ্তবাক্য সম্ভাবিত কি না, তাহা এক স্বতন্ত্র প্রস্তাবের বিষয়। সুতরাং এ স্থলে তাহা উল্লেখ্য নহে। যাহা হউক, এক্ষণে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইল যে, ঈশ্বর রূপ কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, এমত প্রমাণ আছে। আমরা এ পক্ষ সমর্থনে যদি ভ্রান্ত হইয়া থাকি, আমাদের ভ্রম কেহ দেখাইয়া দিলে, আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ থাকিব। আমরা ঈশ্বর-অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলে, তাহা সাদরে গ্রহণ করিব। আমরা প্রমাণ পাই নাই বলিয়াই মনের একটী বহুকালপোষিত এবং শিক্ষিত সংস্কারকে ভ্রান্তি বলিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু এই সংস্কার যে ভ্রান্তি নহে, যদি এরূপ নিরাকৃত হয়, আমরা তৎক্ষণাৎ আবার পূর্ব্ব বিশ্বাস অবলম্বন করিব।

ক্রমশঃ।

সমর-শেখর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"I to the world am like a drop of water,
That in the ocean seeks another drop ;
Who, failing there to find his fellow forth,
Unseen, inquisitive confounds himself :
So I to find a father and a brother,
In quest of them, unhapyy, lose myself."

COMEDY OF ERRORS.

দেখিতে দেখিতে এক এক দিন—মাস—বর্ষ অতীত হইল ; গ্রহমণ্ডলীর বার্ষিক আবর্ত্তন শেষ হইয়া পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল ; তথাপি সমর তাঁহার শোকমগ্ন ভ্রাতা সতীশকে আর দেখা দিলেন না। যে দিন তিনি সেই বুদ্ধদেবের মন্দিরে সতীশের নিকটে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন, সেই দিন—সেই দুর্দ্দিন হইতে সতীশ আর আপনার পূজ্যতম অগ্রজকে দেখিতে পাইলেন না। সেই দিন তাঁহার হৃদয় বিমল কৌমুদীময় উচ্চ চন্দ্র-লোকে উঠিতে উঠিতে অকস্মাৎ আবার গভীর অন্ধকারময় অতল নিধীতে পতিত হইল। তাঁহার সমস্ত আশা ভরসা পুনর্ব্বার এককালে লোপ পাইল। কত ক্লেশ, কত যাতনা, কত চিন্তা প্রবল ঝটিকার ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। যদ্যপি তিনি চিরজীবনের মধ্যে সমরের পরিচয় না পাইতেন, তাহাতেও তাঁহার এত দূর কষ্ট বোধ হইত না। কিন্তু সেই মহানুভাব সমর, তাঁহার আশৈশব প্রতিপালক যে, তাঁহার চিরকৌতূহল নিবারণ করিয়া এরূপ নিষ্ঠুরের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন,—এ যন্ত্রণা নিতান্ত দুর্ব্বিষহ। তিনি সেই বিজন পর্ব্বতপ্রদেশস্থ বুদ্ধদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে হতাশচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া শূন্য মনে একদিকে চাহিয়া রহিলেন,—শূন্য হৃদয়ে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বাল্য-আবাস-স্থান বিন্ধ্যা-চলস্থ দস্যুভূমি মনে পড়িল। সমর তাঁহাকে সেই অসহায় অবস্থাতে যত যত্ন যত সতর্কতার সহিত লালন পালন করিয়াছেন, তাহা মনে পড়িল। যখন তিনি জগতের বিষয় কিছুই জানিতেন না, যখন মানব-জীবনের অসীম দুঃখ, অনন্ত যন্ত্রণার গভীর চিত্র তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় নাই, মনে সেই দুর্গম গিরি-প্রদেশ মধ্যে দস্যুবালকদিগের সহিত কত প্রকার খেলা করিতেন, কখন উচ্চ বৃক্ষ-শাখা অবলম্বন করিয়া শৈলশৃঙ্গে উঠিতেন ;

অন্যান্য সহচরগণ শৃঙ্গের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, কেহ বা সঙ্কীর্ণ বসন কটিদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া রাশি রাশি বন্য ফল ফুল চয়ন করিয়া তাহাতে বন্ধন করিত, কেহ বা ক্ষীণা নির্ঝরিণী নীরে অবগাহন করিয়া সানন্দে গান করিতে করিতে জলক্রীড়া করিত, কিন্তু তিনি সেই বয়সেই সেই উচ্চশৃঙ্গ শিরোদেশে একাকী উপবেশন করিয়া নিম্নে প্রশস্ত দাক্ষিণাত্য ক্ষেত্র নিবিষ্টান্তঃকরণে নিরীক্ষণ করিতেন।—কেন যে দেখিতেন, তাহা তিনি স্বয়ংই বুঝিতে পারিতেন না। ক্রমে ক্রমে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইত, অন্যান্য শিশুগণ একে একে পর্ব্বত হইতে নামিয়া যাইত; যাইবার সময়ে কেহই তাঁহাকে ডাকিয়া যাইত না। তিনি একাকী সেই উচ্চ শৈলশৃঙ্গে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার লালন পালনার্থে এক বৃদ্ধাকে সমর নিয়োজিত করিয়া ছিলেন; সে চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত,—কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। অবশেষে সমর আসিয়া তাঁহাকে সেই শিখর দেশ হইতে নামাইয়া লইয়া যাইতেন। কোন কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে যাইতে হইলে, সমর তাঁহাকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া যাইতেন—পর্ব্বতে উঠিতে নিবারণ করিয়া যাইতেন; কিন্তু তিনি সমরের সে নিবারণ ক্ষণপরেই ভুলিয়া যাইতেন। পর্ব্বতের নিকটে ইতস্ততঃ খেলা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অন্যমনে শৈলোপরি উঠিয়া যাইতেন, এবং সেই উচ্চ শিখরের শিরোদেশে আসীন হইয়া বিস্তৃত দাক্ষিণাত্য ভূমি দর্শন করিতেন। বৃদ্ধা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইত না, অবশেষে কেবল সকলের বাটীতে যাইয়া ক্রন্দন করিয়া বেড়াইত। সমর বাটীতে আসিয়াই অগ্রে তাঁহারই কথা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিরুদ্দেশ-বিষয় সমরকে বলিত। সমর অমনি মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম না করিয়া তাঁহাকে নামাইয়া আনিতেন, এবং স্বহস্তে তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। সমর প্রাণান্তেও কখন তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন না। এক দিন সমর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, তাঁহার বসন ভূষণ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি তাঁহার সম্মুখেই শয্যার উপরিভাগে পতিত রহিয়াছে; সতীশ বেড়াইতে বেড়াইতে সমরের এক খানি তরবার কোষোমুক্ত করিয়া আপন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহা আস্তে আস্তে ঘুরাইতে-ছিলেন; হঠাৎ তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া তীক্ষ্ণ তরবার সমরের স্কন্ধদেশে পতিত হইল। তরবারের তীক্ষ্ণ ফলকের কিয়দংশ তাঁহার গাত্রে লাগিয়া তাঁহার পৃষ্ঠের একখণ্ড মাংসের সহিত ভূমে পতিত হইল। দরদর বেগে শোণিত-ধারা উদ্গত হইয়া পরিধেয় বসন

আর্দ্র করিয়া শয্যায় গড়াইতে লাগিল। একে বিষম পরিশ্রান্ত—তাহাতে আবার এইরূপ দারুণ আঘাত; সহিষ্ণু সমর কিছুমাত্র বিরক্ত বা রুষ্ট হইলেন না। ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন "এখনও তোমার এ তরবার ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই।" এই সকল বৃত্তান্ত সতীশের মনে পড়িল। এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদ্যপি তিনি তখন তাঁহার স্নেহশীল অগ্রজকে দেখিতে পাইতেন, তাহাতেও তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। কিংবা সমরকে দর্শন করিয়া যদি পরক্ষণেই তাঁহাকে স্বহস্তে স্বমুণ্ডচ্ছেদন করিতে হইত, তাহাও তিনি হাস্যোৎফুল্ল মুখে করিতে পারিতেন, তথাপি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রাণ ভরিয়া আপন জ্যেষ্ঠাগ্রজকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতে পাইতেন। সতীশ আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। হতাশ-চিত্তে শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন। আবার তাঁহার শৈশবের ঘটনা সমূহ মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। দস্যুভূমি পরিত্যাগ করিয়া সমরের সহিত নিবিড় বনময় পর্ব্বত প্রদেশ পাণ্ডোয়ে আসিয়া বাস করিলে, তাঁহার আশৈশব-পালনকর্ত্রী সেই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধাকেই তিনি আপন জননী বলিয়া জানিতেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র। তিনি বৃদ্ধার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সমর সেই জন্য সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত দিবস তাঁহাকে নিকটে রাখিতেন, কোন কর্ম্মের প্রয়োজন থাকিলে, তিনি নিদ্রিত হইলে, রাত্রিযোগে যাইয়া তাহা সম্পাদন করিয়া আসিতেন। কিন্তু প্রাণান্তেও তাঁহাকে একাকী রাখিয়া কোথাও যাইতেন না। কখন বা সতীশকে সঙ্গে করিয়া অশ্বারোহণে নগর ও পল্লীগ্রাম সকল দেখাইয়া বেড়াইতেন—যেখানে যে দ্রব্যটি দেখিয়া সতীশের গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ক্রয় করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতেন, প্রভূত অর্থব্যয়েও কখন কুণ্ঠিত হইতেন না—সতীশের তাহাও মনে পড়িল। তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া বালকের ন্যায় অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন। যে সমর তাঁহাকে আজন্মকাল লালন পালন করিয়াছেন, শত শত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই সমরই যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, তাহা তিনি এক দিন কল্পনাতেও অনুমান করেন নাই। যাহাকে তিনি স্বজাতি-ধর্ম্মবিদ্বেষী নিষ্ঠুর দস্যুপতি বলিয়া সময়ে সময়ে ঘৃণা করিতেন, সেই সমরই যে তাঁহার একমাত্র হিতৈষী জ্যেষ্ঠ সহোদর রণেন্দ্র, তাহা তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সমরের প্রকৃত পরিচয় জানিলে, তিনি আজ তদবিরহে কখন এত দূর

কাতর হইতেন না। তিনি এত দিন আপন পিতাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত ছিলেন, তাঁহার দর্শন বিরহেই এত দিন কাতর ছিলেন,—তাঁহার অনুসন্ধানেই দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, কত স্থলে কত বিপদে পতিত হইয়াছেন, সমর যাইয়া তাঁহাকে সেই সমুদায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; অদ্য তাঁহার পিতৃদেবের দর্শন-মানসে সমরের বাক্যানুসারে এই দেবমন্দিরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে ভাব অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল, অকস্মাৎ আবার ভীষণতর নবীন বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণকে দারুণ আঘাতিত করিল। সে দুঃসহ দারুণ আঘাত তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না; চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন; পৃথিবীকে মায়াভূমি বলিয়া তাঁহার অনুমান হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়িল, আর উপবেশন করিতে না পারিয়া তিনি মন্দির-প্রাঙ্গণে শয়ন করিলেন, ক্রমশঃ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দুঃসহ শোক কিংবা পরিশ্রমের পরে মানব যদি বিরামদায়িনী নিদ্রার সাহায্য না পাইত, তাহা হইলে পৃথিবী নিশ্চয়ই একটী ঘোরদুঃখময় অন্ধকূপ হইত।

নিদ্রিতাবস্থায় সতীশ একটী স্বপ্ন দেখিলেন—যেন তিনি সমরের অনুসন্ধানে যাইতেছেন। নানা দেশ, নানা দুস্তর নদনদী অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে যাইয়া পড়িলেন। ক্রমাগতই সেই বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা হইতে নির্গমনের পথ দেখিতে পাইতেছেন না। সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল, তথাপি তিনি তাহা হইতে নির্গত হইতে পারিলেন না। সম্মুখে রাত্রি করালবেশে উপস্থিত। সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল ভয়ানক অরণ্য মধ্যে যে, কি প্রকারে সে রাত্রি যাপন করিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন; এমন সময়ে সেই ঘোর বনস্থলীর গম্ভীর শান্তি ভগ্ন করিয়া কাহার করুণ কণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইল। এ কণ্ঠস্বর তাঁহার পরিচিত; তাঁহার জীবন-সহচরী দুঃখিনী গিরিবালার হৃদয়বিদারক শোক-সঙ্গীত। অমনি সতীশের নিদ্রা অকস্মাৎ ভঙ্গ হইল। তিনি চকিতে মন্দির-প্রাঙ্গণ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। সহসা সম্মুখে কি দেখিলেন, অমনি অনিমিষ নয়নে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, এক নবীন তাপসকুমার তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নির্নিমেষ নয়নে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। সতীশ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইবেন, এমন সময় সেই সুকুমার-তাপস-বালক তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, “মহাশয়! কি করেন? আমি আপনার প্রণম্য নই। তাপসবেশ থাকিলে যে, তাহাকে প্রণাম করিতে হয়, তাহার কোন অর্থ নাই।”

সতীশ নিঃস্তব্ধ হইয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখ প্রতি চাহিলেন—দেখিলেন, তাঁহার সেই রুক্ষ-নিবিড়-কুন্তলজালাবৃত সুন্দর মুখ-মণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে!

মুনিবালক সতীশকে নিতান্ত ক্লান্ত দেখিয়া ঘন কেশগুচ্ছ মুখ হইতে অপসারিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহাশয়! আপনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিতেছি; আসুন,—আমার সঙ্গে যাইয়া আমাদের কুটীরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"Disastrous news!" dark Wycliffe said;
Assumed despondence bent his head,
While troubled joy was in his eye,
The well-feigned sorrow to belie."
—ROKEBY.

আজকাল গোয়া নগরীতে পর্ত্তুগিজদিগের আর ভাবনার সীমা নাই। নব শাসনকর্ত্তা লোপসোরেজের ভারতাগমন-কাল অনেক দিন অতীত হইয়াছে। তাহারা সোরেজের জাহাজ হইতে কামান-ধ্বনি শুনিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গোয়া হইতে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিল। উচ্চ ও নিম্ন পদবীস্থ সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য সসজ্জভাবে সাগর-কূলে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল না। সে রাত্রি অতীত হইল। পরে দিবস, ক্রমে সপ্তাহ—ক্রমে পক্ষ-কাল অতীত হইল, তথাপি সোরেজের জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল না। সকলে বিষম চিন্তিত হইল। তাঁহার অনুসন্ধানে দুই তিনি খানি সসজ্জীভূত রণতরী বহির্গত হইল। আরব সাগর হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান লইল, কোথাও পাইল না। যেখানে যত বন্দর আছে, সকল স্থানেই সন্ধান লইল। সকলেই বলিল, সোরেজের জাহাজ তাংতাভিমুখে গিয়াছে। অবশেষে হতাশ হইয়া গোয়া নগরীতে ফিরিয়া আসিল। পর্ত্তুগেলে সংবাদ যাইল, পর্ত্তুগেল-রাজ ইমানিয়েল্ তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। এ দিকে গোয়া-নগরীতে নানা প্রকার জনশ্রুতি হইতে লাগিল। কেহ বলিল, সোরেজের জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। কেহ বলিল, জাহাজ প্রবল ঝটিকা বেগে অন্য দিকে বাহিত হইয়াছে, কেহ বা অনুমান করিল, জাহাজ কোন মায়াদ্বীপে যাইয়া আবদ্ধ হইয়াছে। এই রূপে চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার কিংবদন্তী শ্রুত হইতে লাগিল। অবশেষে একটী পর্ত্তুগিজ আসিয়া বলিল, সোরেজের জাহাজ ভরদ্বীপের নিকটে জলমগ্ন হইয়াছে। সোরেজ ও অন্যান্য আরোহী ও নাবিকগণ তৎসঙ্গে সাগরগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। এ ব্যক্তির নাম নানোহা।

সেই উৎসবের রাত্রে নানোহা ঔৎসুক্যভাবেশে কক্ষের বাহিরে আসিয়া আপন মনে গান করিতে করিতে নাচিতেছিল, এমন সময়ে জাহাজ অকস্মাৎ জলমগ্ন হয়। কি প্রকারে যে তাহা হইল, বুঝিতে পারিল না। অথবা তাহার বুঝিবার তখন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু, সে এই মাত্র জানিতে পারিল যে জাহাজ জলমগ্ন হইল। অমনি পলাইবার উপক্রম করাতে অকস্মাৎ সাগরজলে পতিত হইল। তৎপরে তরঙ্গবেগে বহমান হইয়া জলদ্বীপে গিয়া উৎক্ষিপ্ত হয়। দুই তিন দিবস তথায় অজ্ঞানাবস্থায় অতিবাহিত হইলে,ক্রমে তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হয়। দুর্ভাগা নানোহা আপন দুরবস্থা দর্শন করিয়া হতভাগ্য বন্ধুদিগের জন্য অত্যন্ত শোক করিতে লাগিল। সেই বিজন দ্বীপে তাঁহাকে চারি দিবস অতি কষ্টে অবস্থান করিতে হইল। পঞ্চম দিবসে একখানি অর্ণবপোত সেই দিক দিয়া যাইতেছিল। নানোহা আপন অঙ্গরাখা—যাহা গাত্রে দৃঢ় সংলগ্ন থাকায় স্রোতোবেগে স্খলিত হয় নাই—সেই অঙ্গরাখার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া একটী প্রলম্ব যষ্টিতে সংলগ্ন করতঃ বারংবার আন্দোলন করিল। পোতাধ্যক্ষ তাহা দেখিতে পাইয়া দ্বীপে পোত সংলগ্ন করেন এবং নানোহাকে লইয়া গোয়াতে উপস্থিত হয়েন।

গোয়া নগরীতে বিবাদের আর সীমা রহিল না। যে সমস্ত আয়োজন গোরেজের অভ্যর্থনার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তৎসমুদায় দুর্ভাগোর এই শোচনীয় দুর্ঘটনে সমভাবেই রহিল। প্রশস্ত রাজপথ, আলোক, সুচিত্র বসন ও শোভনীয় নানা সজ্জায় সজ্জিত হইল। নব শাসনকর্ত্তা আসিলেন না। আজ আসিবেন, কাল আসিবেন, করিয়া কেহ তাহা আর স্পর্শ করিল না। রক্ষকগণ দৃঢ় সতর্কতার সহিত তৎসমুদায়কে রক্ষা করিতে লাগিল। এক এক বার অন্যমনে আরবসাগরের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত বিশাল পথ সমরেখায় উপর দিয়া গোয়া নগরীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে বিলীন হইবার পূর্ব্বে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—যাহারা দুর্গ পরিখার ন্যায় প্রাসাদকে বেষ্টন করিয়া অপর পার্শ্বে যাইয়া একত্রে মিলিত হইয়াছে; পশ্চিম দিকে অনন্ত নীলাম্বুময় সাগরের বাষ্পময় অনন্ত জলরাশি দেখাইয়া দিতেছে। রক্ষকগণ এক এক বার অন্যমনে সেই সাগরের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কিছুই দেখিতে পাইল না, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ দর্শকগণ নানাপ্রকার মতামত প্রকাশ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতেছে। একস্থলে কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া কথোপকথন করিতেছে। এক জন বলিল "কেন, আর মিছামিছি বিলম্ব করিতেছ, রাজা গত রাত্রে আসিয়াছেন।" আর এক জন তাঁহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ

করিয়া ঈষৎ পরুষ স্বরে বলিল, "হাঁ, আসিয়াছেন আসিয়াছেন," তোমার বিদ্যা ভারি; আসিলে তোপের শব্দ পাওয়া যাইত না?" পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরে পুনর্ব্বার কহিল, "হাঁ হে, তোমারও বিদ্যা ভারি; তুমি সেই জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিলে কি না! এতই যদি তোমার দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছ কেন?" তৎপরে সে অপর অপর সহচরদিগের দিকে রোষ-কষায়িত লোচন ফিরাইয়া প্রভুতাব্যঞ্জক-স্বরে কহিল, "যাহার এত বাই তাহার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করা উচিত।"

পরস্পরে এইরূপ নানা প্রকার বাক্‌বিতণ্ডা হইতেছে, এমন সময় এক জন অশ্বারোহী আপন বৃহৎ অশ্বকে তীব্রবেগে তাড়িত করিতে করিতে তাহাদের নিকটে আসিয়া অশ্বের গতি-রোধ করিল, এবং স্বীয় ঘর্ম্মসিক্ত গণ্ডস্থল দক্ষিণ তর্জ্জনি দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া শ্রমরুদ্ধ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন; "রাজবাটী কি এই দিকে যাইব?" আগন্তুকের পর্ত্তুগিজ বেশ, সুতরাং সকলে সসম্ভ্রমে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল "আজ্ঞা বরাবর সোজা পূর্ব্বমুখে যাউন;—সম্মুখে ঐ রাজবাটী দেখা যাইতেছে।"

আগন্তুক কৃতজ্ঞতার সহিত মস্তক অবনত করিয়া প্রাসাদাভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন। দর্শকগণ নানা প্রকার সন্দেহ করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া চলিল।

অশ্বারোহী প্রাসাদ-সিংহ-দ্বারে আসিয়া অশ্ব থামাইলেন। দ্বারপাল সম্মান সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! কাহাকে খুঁজিতেছেন?"

অশ্বারোহী। "লাট্ সাহেব আলবুকার্ককে।"

দ্বারপাল দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া আর একটী তদপেক্ষা স্বল্পায়তন দ্বার দেখাইয়া দিল। অশ্বারোহী নির্দ্দিষ্ট দ্বারসন্নিধানে যাইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং পার্শ্বস্থ একটী স্তম্ভে অশ্বকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া দ্বারাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

সম্মুখে একজন প্রহরী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাইবেন?"

আগন্তুক। "লাটসাহেবের নিকট।"

প্রহরী আগন্তুকের পর্ত্তুগিজ বেশ দেখিয়া নিঃসন্দেহে আপনি সঙ্গে লইয়া এক সোপানশ্রেণীতলে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং তথায় অপর একজন প্রহরীকে ডাকিয়া আগন্তুককে লাট সাহেবের গৃহে লইয়া যাইতে আদেশ করিল। আদিষ্ট প্রহরী তাঁহাকে লইয়া দীর্ঘ সোপান পংক্তি অতিক্রম করিয়া এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণে যাইয়া উপস্থিত হইল, এবং বামপার্শ্বে একটী দ্বার উন্মোচন করিয়া এক বিস্তৃত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই বিস্তৃত কক্ষের মধ্যস্থলে এক বীরস্বভাব বৃদ্ধ পুরুষ আসীন্ হইয়া কি পাঠ করিতেছেন। ইনিই আলফান্সো আলবুকার্ক।

দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ শ্রবণমাত্র আলবুর্কার্ক হস্তস্থ পাঠ্য বিষয় হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া ফিরিয়া দেখিলেন।

আগন্তুক মস্তকাবনত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। আলবুকার্ক সম্মান সহকারে শির সঞ্চালিত করিয়া তাঁহাকে সম্মুখস্থ আসন গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আগন্তুক বসিলেন; তৎপরে বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" তিনি আর একবার হস্তস্থ কাগজের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন।

আগন্তুক কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তাঁহার হস্তে একখণ্ড কাগজ প্রদান করিলেন।

আলবুকার্ক আপন হস্তস্থ কাগজকে তাড়াতাড়ি পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র প্রস্তর টেবেলে রাখিয়া আগন্তুকদত্ত পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে অপরিচ্ছন্নাক্ষরে এই কয়েকটী বাক্য লিখিত ছিল:—

"মহাশয়!

আমি দস্যুকারাগারে আবদ্ধ হইয়াছি; কোথায়ও কোন্ প্রদেশে তাহা বলিতে পারি না। সানুগ্রহে আমাকে শীঘ্র উদ্ধার করিবেন। এই পত্রবাহকের নিকটে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

লোপসোরেজ"

আলবুকার্ক শ্বেতশ্মশ্রুল মুখমণ্ডল আগন্তুকের দিকে ফিরাইয়া সদুঃখে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এ পত্র কি প্রকারে পাইলেন?"

আগন্তুক। "মহাশয়! সর্ব্বনাশের কথা বলিব কি? দস্যুরা তাঁহার সঙ্গে আমাকে শুদ্ধ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা যখন জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন তোমরা আমাদিগকে বন্দী করিলে?" দস্যুপতি উত্তর করিল "তোমরা বিদেশী, তোমরা বিধর্ম্মী, তোমরা কিজন্য আমাদের দেশের ধন সমুদায় অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ?"

আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ভারতবর্ষেত আরও অনেক বিদেশী, ও বিধর্ম্মী তোমাদের ধন সমুদায় অপহরণ করিতেছে?"

সে উত্তর করিল "হাঁ, ইহারা বিদেশী ও বিধর্ম্মী বটে, কিন্তু ইহারা যে সমুদায় ধন অপহরণ করিতেছে, তাহা ভারত হইতে অন্য কোথায় যাইতেছে না। ইহারা ভারতে থাকিয়া ভারতের ধন লইয়া ভারতকেই সাজাইতেছে। তোমরা বিদেশী, তোমরা ভারতের অঙ্গ শূন্য করিয়া সেই সমস্ত অলঙ্কারে তোমাদের নিজ-দেশের অঙ্গ সাজাইতেছ। ইহাতে ভারতের কি লাভ?—তোমরা ভারতে আসিয়া ভারতের সর্ব্বনাশসাধনে চেষ্টা করিতেছ,—ভারতের বাণিজ্যের ক্ষতি করিতেছ,—এখন তোমাদিগকে হাতে পাইয়াছি। সে সমুদায় ক্ষতিপূরণ না করিলে ছাড়িয়া দিব না।"

আল্‌বুকার্ক ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন;—রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিশাচেরা ক্ষতি পূরণের জন্য কি চায়?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন; আমি জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল—"আমাদের গোয়া আমাদের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দাও, অথবা দুই ক্রোর মুদ্রা দিয়া ভারতের সহিত সখ্যভাবে বাণিজ্য করিতে থাক; ভবিষ্যতে তোমাদের আর কোন বিপদ আশঙ্কা থাকিবে না, তোমরা দুই জনেই মুক্তি লাভ করিবে;—নতুবা তোমাদের সমূহ বিপদ—" আগন্তুক এ পর্য্যন্ত বাক্য শেষ করিয়া আল্‌বুর্কাকের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন বৃদ্ধ আলবুকার্কের নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, তিনি সরোষে অধর দংশন করিতেছেন।

ক্ষণ কাল পরে বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তা আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন "দুরাত্মারা তবে যে আপনাকে মুক্তি দিল?"

আগন্তুক। "আমার মুক্তির প্রতিভূস্বরূপ মহাত্মা সোরেজকে রাখিয়া আমাকে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিল। কি করিব, এ ভিন্ন ত আর অন্য উপায় দেখিলাম না—"

আলবুকার্ক এই বার সদুপায় নিশ্চয় করিয়া শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল—আপনি সে স্থান পুনর্ব্বার চিনিতে পারিবেন? সে স্থান এখান হইতে কত দূর?"

আগন্তুক। "আসিবার সময়ে সে স্থান বিশেষ করিয়া চিনিয়া আসিয়াছি; তাহা গুর্জ্জরের উপকূলে, এখান হইতে জলপথে যাইলে বিশেষ সুবিধা হইবে।" তিনি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আলবুকার্কের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! এক্ষণে কি সিদ্ধান্ত করিলেন?"

আল। "সিদ্ধান্ত আর কি? তাহারা কতকগুলা অসভ্য পার্ব্বতীয়; দস্যুতা করিয়া জীবন ধারণ করে, যুদ্ধকৌশলে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহাদিগের বাক্য আবার গ্রাহ্য করিব কি? দুই চারিটা আমাদের শব্দ শুনিলেই পর্ব্বত ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। আমি সেনাপতিকে সসৈন্যে সেই দেশে পাঠাইতেছি—জাহাজে করিয়া গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে। আপনি তাহাদের সকলের নেতা হইয়া সেইস্থানে লইয়া যাউন।"

আগ। "সে বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। কেবল আজ্ঞা পাইলে পর্ত্তুগিজগণ কোন বিষয়েই ভীত হয় না।"

চিত্রদর্শনে।

কে তুমি সুন্দরি! আজি ভাসিলে এ নয়নে
নিদ্রিত হৃদয়ে মোর,
জাগা'লে তরঙ্গ ঘোর;
সিঞ্চিলে অমৃত-বারি মরুময় জীবনে? (১)
জানি না ত কোথা' তুমি এজগত-মাঝারে
সৃষ্টির সে সুখধাম,
যথা' তুমি অধিষ্ঠান;
মধুময় দিবানিশি ও মাধুরি সঞ্চারে। (২)
বহু দিন ভ্রমিতেছি এ সংসার-ভিতরে
ছিন্ন, ভিন্ন তরু প্রাণ,
নাহি যেন সুখ-স্থান;
দিনেকের তরে ভুলি এ জীবন-সমরে। (৩)
নিরখি তোমার তাই সকরুণ মূর্ত্তি
আজি উচ্ছ্বাসিত মন,
প্রেমানন্দে নিমগন;
জন্মান্তরে পুনঃ যথা প্রিয়জন-সঙ্গতি। (৪)

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বিলাতি সতী, বা সতী এমিলী, প্রকাশক শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক, ক্যানিং প্রেস, ॥৹ আনা। রোজিনাল এই গ্রন্থের নায়ক; এমিলী নায়িকা। নায়কের প্রতি এমিলীর প্রণয় সাধ্বী-স্ত্রীজনোচিত। উহা অতি সহজে ও সুন্দর-রূপে চিত্রিত হইয়াছে। ভাষাও মন্দ নহে। উপন্যাস খানি ১ খণ্ডে সমাপ্ত না করায় পাঠের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া গিয়াছে। আশা করি, অচিরে ইহার অবশিষ্ট ভাগ প্রকাশিত হইবে। ইউ-রোপীয় কামিনীর এইরূপ ভর্ত্তৃভক্তি অদ্ভুত ও মনোরম।

সতীবাসনা, শ্রীঈশানচন্দ্র গুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত, বসুপ্রেস, মূল্য ।৹ আনা। ইহা স্ত্রীলোকের লিখিত। পুস্তক খানি ঈশান বাবু দ্বারা প্রকাশিত লেখা আছে, অথচ তাঁহাকেই আবার পুস্তক উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইহার কোন কোন মত ও ভাব অপরিণত হইলেও, কবিতা গুলি মোলাম। রচনার সৌকুমার্য্যে পড়িতে সুচারু বোধ হয়। "চিতোর সতী" "ছোট মেয়ে" পদ্যদুটী অতি সুন্দর।

বামাবোধ, শ্রীনন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ, প্রণীত; বসুপ্রেস, ।৵৹ আনা মাত্র। অতি সহজ ভাষায় গ্রন্থকর্ত্তা ইহাতে সাধারণ বৈজ্ঞানিকতত্ত্বঘটিত নাতি-দীর্ঘ প্রস্তাব গুলি প্রকটন করিয়াছেন; নীরস হওয়ার ভয়ে আমোদজনক,

জ্ঞানজনক, চিন্তাগর্ভ বিষয়ও সমাবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ইহা স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; তাহাতে তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। অপিচ, আমাদের সংস্কার— ইহার বিবৃত অনেক ঘটনা অনেক যুবকেরও অজ্ঞাত; সুতরাং তাঁহাদেরও উপকারে লাগিবে। নন্দকৃষ্ণ বাবুর হস্ত হইতে দুই একটী ঐতিহাসিক ভ্রান্তি নির্গত হইয়াছে দেখিয়া, ক্ষুব্ধ হইলাম। ভ্রম এই:—(১) বঙ্গদেশে "বর্ণ বিভাগে" ১০৫ পৃষ্ঠায় "আদিশূরের বংশ লোপ হইলে, বৌদ্ধমতাবলম্বী পালবংশ প্রবল হইয়া উঠে।" এখানে পালবংশ আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী না বলিয়া পরবর্ত্তী বলা হইয়াছে।

(২) দেবীবর "ঘটক" না হইয়া দেবীবর 'পণ্ডিত' কেন হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না।

(৩) ব্রাহ্মণগণের শ্রেণিবিভাগে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। মধ্যশ্রেণী, সপ্তশতী, উৎকল-শ্রেণী প্রভৃতি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের তালিকায় অন্তর্ভূত হয় নাই। প্রস্তাবের অল্পায়তনই বোধ হয়, তাহার কারণ। নন্দ বাবুর ন্যায় স্বাধীনচেতা উদারহৃদয় ব্যক্তি ভ্রমপ্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইবেন না। যে যাহা হউক, ঐ কয়টী ত্রুটি বাদে ইহাতে অল্পের মধ্যে এত নূতন নূতন সংবাদ ও প্রীতিকর বিষয় সন্নিবেশিত যে, পড়ে ইহা উত্তম অন্দেরই পুস্তক হইয়াছে। প্রতি মাসে ইহার দৃষ্টান্তে শতকরা ১০ খানি করিয়া পুস্তক বাহির হইলে, বাঙ্গালা দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী নন্দবাবুর দৃষ্টান্তে চালিত হইলে, বিস্তর চাকুরে ব্যক্তির উপকার হইবে এবং সেই সঙ্গে এ দেশের অবস্থাও উন্নত হইবে।

বিজ্ঞানদর্পণ, (মাসিক পত্র ও সমালোচন) ১—৪ সংখ্যা, শ্রীপ্রাণানন্দ কবিভূষণ সম্পাদিত, চিকিৎসা তত্ত্বপ্রেস্।

'বিজ্ঞান দর্পণ' একটী বিশেষ অভাব মোচন জন্য কৃতসঙ্কল্প। যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ভিন্ন আমাদের নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই, সেই বিজ্ঞানের প্রভূত পরিচালনার নিমিত্ত এই পত্রের আগ্রহ। বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অন্তর্মর্ম্ম যতই নিষ্কাশিত হইবে, ততই আমাদের শুভ দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। এই কারণেই এই পত্রিকা খানিকে বিশেষ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম।

যদিও কিছু দিন পূর্ব্বে "প্রকৃতি" ও অন্য এক খানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল বটে, কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহ-বিরহে উহাদের অস্তিত্ব অচিরেই বিলুপ্ত হয়। সে দোষ অনুষ্ঠাতৃবর্গের নহে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় লোকের উদ্যমের অভাবের জন্য ঐরূপ ঘটিয়াছিল। সেই জন্য 'প্রকৃতি' "কল্পলতার" সহিত মিলিত হইয়াছে। যাহাতে এই পত্র খানি স্থায়ী হইতে পারে, তদুদ্দেশে আমাদের প্রত্যেকেরই

যথাসাধ্য আয়াস স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ইহার অবতারণিকার ভাষা উৎকট এবং পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য কতক অস্পষ্ট। কেবল পূর্ব্বগৌরবের কাহিনীতে জাতীয় উদ্ধার সাধিত হইবে না। সে যাহা হউক, ইহার উপক্রমণিকা, সম-সংস্থান '(Statics)' জাতিতত্ত্ব, ফুলের কথা, মনোযোগ, চার্লাস্ রবার্ট ডারুইন্ প্রভৃতি প্রস্তাব গুলি চিন্তাগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ তত্ত্বে পূর্ণ। 'উপক্রমণিকার' বিজ্ঞান আবিষ্ক্রিয়ার নাতিবৃহৎ ইতিবৃত্তটী চিত্তাকর্ষক ও সমাজের উপকারক হইবে। 'ফুলের কথার' লেখক এমনই ভঙ্গীতে বিষয়টীর অবতারণা করিয়াছেন যে, পড়িতে আরম্ভ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যথার্থ ভাব বুঝা যায় না; কিন্তু তৎপরে ইহাতে এক নূতন ধরণে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত প্রবন্ধ বিবৃত হইয়াছে। "মনোযোগ" নামক প্রবন্ধের চিন্তা সকল অনেক স্থলে অসম্বদ্ধ লাগিল। ডারুইনের জীবনবৃত্ত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু ইহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। 'আর্য্যজাতির ব্যাকরণ শাস্ত্র', প্রস্তাবের "পাণিনির পর যত ব্যাকরণ শাস্ত্র হইয়াছে, কাহাতেই পাণিনির সূত্রের বিপরীত পদ নাই।" এ বাক্যটী কি সত্য?

(১) পূর্ব্বপদে ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, বা ঌ, যদি থাকে এবং পর পদে অসমান স্বর-বর্ণ থাকে, তবে ব্যাকরণাচার্য্য পাণিনি ও পাণিনির পরবর্ত্তী সংক্ষিপ্তসার, কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ প্রভৃতি শাব্দিকের মতে ক্রমান্বয়ে য, ব, র, ল হয়। কিন্তু ব্যাড়ি, গালব ও পদ্মনাভের মতে উহা হয় না। তাঁহাদেরই মতে 'ত্রিয়ম্বক' পদ সাধু ও শিষ্ট প্রয়োগ এবং 'ত্র্যম্বক' পদ তাঁহাদের সম্মত নহে।

(২) ভাগুরির মতে ধাতুর সহিত যোগ হইলে, 'অব' ও 'অপি' উপসর্গদ্বয়ের অকারের লোপ হয়। মুগ্ধবোধ মতে বিকল্পে লোপ হয়। কিন্তু পাণিনির মতে মোটেই লোপ হইবে না। মহাকবি কালিদাস ভাগুরির অনুসরণ করিয়া "—বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" কুমারসম্ভব কাব্যে "বগাহ্য পদ" প্রয়োগ করিয়াছেন।

(৩) পাণিনির মতে ঔঋড়ৎ পদের স্থানে মুগ্ধবোধে ঔড়জৎ পদ হয়।

(৪) মুগ্ধবোধের সহিত পাণিনির বিস্তর মতভেদ। তাহা দেখাইতে গেলে, এক সুদীর্ঘ স্বতন্ত্র প্রস্তাব হইয়া উঠে। সমাস, কারক, স্ত্রীতা, তদ্ধিত এবং এমন কি, শব্দ-প্রকরণেও বোপদেবের সহিত পাণিনির মত বৈলক্ষণ্য আছে।

সিদ্ধান্তকৌমুদীর অভাব-বিষয়ে লেখক যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশের অনুমোদন করি। তাঁহার সহিত বোপদেবেরও প্রশংসা করি; কিন্তু, তিনি যত দূর গিয়াছেন, তত দূর অগ্রসর হইতে পারি না। তবে বোপ-দেবের পূর্ব্বাচার্য্যগণের ত্রুটি উল্লেখে নির্ভীক সৎসাহস এবং বিস্ময়কর

মুষ্টিয়ানা সকলের শিক্ষার বিষয়। "প্রকৃতির" নামে ইহাতে বৈজ্ঞানিক সংবাদ সকল সমাচারপত্র হইতে মুদ্রিত হওয়ার ভালই হইতেছে।

যাহা হউক, বিজ্ঞানদর্পণ আপাততঃ যে সকল বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এখন সে সকল বিষয়ের আলোচনা অধিক চাই না। সাধারণ ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিবার প্রণালী যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, আমরা সেই সমস্ত বিজ্ঞানের চর্চ্চা অধিক পরিমাণে চাই। আমরা আশা করি, বিজ্ঞান-দর্পণ সেই দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিবেন।

ঊর্ম্মিলা কাব্য, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন-প্রণীত; ষ্টানহোপ প্রেস্, মূল্য ।০ আনা।

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাস-কালে ঊর্ম্মিলা স্বামি-বিরহে ছন্দোবন্ধে কাঁদনি সুরে বিনাইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী সীতাকে যে পত্র লিখিতেছেন, তাহাতে কবিত্বের বিলক্ষণ স্ফুরণ আছে। ঊর্ম্মিলার শোকসঙ্গীতের কল্পনা চিত্তচমৎ-কারিণী। সুকবিতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, এমন কাব্য এক্ষণে বঙ্গদেশে অতি অল্প পরিমাণেই জন্মি-তেছে। কিন্তু, ঊর্ম্মিলা সে শ্রেণীর সে দরের কাব্য নহে। ঊর্ম্মিলার পত্র পড়িতে গেলে, কবির সঙ্গে আমাদের কেমন এক মনের একতা—কেমন এক বিষাদময় সহানুভূতি জন্মে। আমাদের মতে কবির ভাবুকতাই তাহার কারণ। দেবেন্দ্র বাবু কালে আরো অতি উচ্চ ভাবের খেলা দেখাইতে পারিবেন।

প্রণয়পারিজাত বা মন্মথমনো-রমা, ঊষাহরণ প্রণেতৃপ্রণীত, ট্রেডস্ এসোসিয়েশন প্রেস্ ।০ আনা।

মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র— শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত, বসুপ্রেস্, মূল্য ।০ আনা।

'প্রণয়পারিজাত' সেক্ষপীয়রের Tempest নামক নাটকের ছায়া লইয়া রচিত। গ্রন্থের গুণ এই যে, ইহার গীতিকাগুলিন কোমল ভাবপূর্ণ এবং সরল ভাষা-গ্রথিত। সমগ্র পুস্তকের রচনা সাধারণতঃ হৃদয়গ্রাহিণী।

হরিশ্চন্দ্র অখ্যায়িকা সুপ্রাচীন হইলেও তাহার বর্ণনে রাধানাথ বাবু ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। রোহিতাশ্বের বচন-বিন্যাসে যথার্থ স্বাভাবিক ভাব দেখা যায়। গীত সকলও শ্রুতিসুখকর এবং পুস্তকের সর্ব্বত্রই সরলতা ও কোম-লতার ছবি আছে, এ জন্য ইহার গুণ ও গুরুত্ব বাড়িয়াছে। দেখিতে দেখিতে গ্রন্থকার অনেকগুলি ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকা লিখিয়া ফেলিলেন। গ্রন্থগুলির অবয়ব স্বল্প হউক, আভ্যন্তরিক গুণ কিছু সামান্য নহে, ইহাই প্রণেতার গৌরবের কথা।

সাহিত্য সংগ্রহস্য ব্যাখ্যা, ২য় খণ্ড, শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ ব্যাখ্যাত। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ১।০ টাকা।

"দ্বয়োঃ আপঃ যস্য মত্র বা স দ্বীপঃ"

যেখানে যাহার দুই দিক জল, তাহাকে সংস্কৃতে "দ্বীপ" বলিত। কিন্তু বেদান্ত বাগীশের দ্বৌ চ দ্বৌ—দ্বৌ (এক শেষ-দ্বন্দ্ব সমাস); তয়োঃ দ্বয়োঃ; দ্বয়োঃ আপঃ যস্য যত্রেতি বা ("দ্বীপ") ব্যাখ্যাগুণে চতুর্দ্দিকে জলবিশিষ্ট স্থল 'দ্বীপ'—বর্ত্তমান ভৌগোলিকদিগের এই মত বজায় রহিল এবং উহা ব্যাকরণের নিয়মেরও বিরোধী হইল না।

গতবারের আর্য্যদর্শনে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সমালোচনে মুদ্রাকর-প্রমাদ জন্য আমাদের এই অভিমতের সৌন্দর্য্য-হানি ঘটিয়াছিল। সে যাহাহউক, আমরা ঐরূপ উদ্ভাবনের ভূয়িষ্ঠ প্রসংসা না করিয়া, থাকিতে পারি না। কিন্তু ব্যাখ্যাকারকের নিকটে এই কথা জানিতে চাই যে, সংগ্রহকার শ্রীযুত রজনীকান্তের যে গ্রন্থের টীকা করা হইয়াছে, তাহার ব্যাকরণাশুদ্ধি, অসঙ্গতি, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা গুলি স্পষ্ট করিয়া কেন উল্লেখ করেন নাই? গুপ্তবাবুকেও জিজ্ঞাসা করি, "সাধিতুং" শুদ্ধ না 'সাধয়িতুং' শুদ্ধ? রজনী বাবু বালকদের জ্ঞানোন্মেষের জন্য সৌকর্য্য বিধান করিয়া বাহাদুরি দেখাইতে গিয়া অতি সামান্য ও সহজ বিষয়েও ভুল করিয়াছেন। যাহাদের অতি অপরিণত জ্ঞান, তাহারাই সাধ ধাতু তুম্ সাধিতুম্ লেখে। ণটে সাধয়তি হয় তাহারা এ কথার সংবাদ রাখে না। এতদ্ভিন্ন 'কতর' স্থানে 'কতম' কতম স্থলে কতর হইয়াছে। সেনেটের সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ বিদ্যাসাগরের ঋজুপাঠ ৩য় ভাগ উঠাইয়া এক্ষণে অতি উপাদেয় রত্নগর্ভ পুস্তকই পাঠ রূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন!!!

সাহিত্যসংগ্রহের ব্যাখ্যা পুস্তকের ইংরাজী ভাগ সংস্কৃত কালেজের বাবু ক্ষেত্রমোহন দাস এম, এ, কর্ত্তৃক ভাষান্তরীকৃত হইয়াছে। উভয় ইংরাজি ও বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাখ্যা উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

মহম্মদ মহসীনের জীবনচরিত, শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র প্রণীত, সাধারণী যন্ত্র, মূল্য ।০ আনা। এক্ষণে প্রমথনাথ মিত্র নামে তিন ব্যক্তি বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান। এক জন ন্যায়তত্ত্বের গ্রন্থকার। গড়পার-নিবাসী অন্য এক ব্যক্তি নাটককার এবং তৃতীয়, বর্ত্তমান গ্রন্থের রচক।

বর্ত্তমান হুগলী কলেজ হাজি মহম্মদ মহসীনের প্রদত্ত অর্থ হইতে স্থাপিত; সুতরাং মহসীন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউন, পরোক্ষে হুগলী কালেজের এক প্রকার স্থাপয়িতা। কারণ, তাঁহারই অর্থ হইতে উহার খরচ পত্র নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। মহসীন জাতিতে মুসলমান হইলেও, ধর্ম্মবিষয়ে গোঁড়ামি করিতেন না। অধিক কি, তিনি মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের প্রধান চিহ্ন শ্মশ্রু পর্য্যন্তও রক্ষা করেন নাই। ইহা ত হইল, বাহিক ভাবের কথা। আন্তরিক ভাব আরো সুন্দর; এবং তাহাতেই বুঝা যায়, তিনি এক বিশ্বপ্রেমিক উদার পুরুষ ছিলেন। হুগলী ও চুঁচুড়াঃ অধিবাসীরা

অদ্যাপিও তাঁহার দানের গুণোৎকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এবম্ভূত মহাপুরুষের জীবনকাহিনী যে গ্রন্থে বিবৃত, তাহা কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি ইহুদি, কি শিখ সকল জাতীয় লোকেরই পাঠ্য, এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। মুসলমানগণ যে ইহা পাঠ করিবেন, তাহার উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। বিগত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিলে হুগলী ইনষ্টিটিউটে হুগলীর জজ আদালতের সুযোগ্য উকিল শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্ ইংরাজীতে যে বক্তৃতা করেন, আমাদের সম্মুখবর্ত্তী সমালোচ্য বর্ত্তমান পুস্তিকা-খানি তাঁহারই ভাবাকর্ষণে লিখিত। প্রমথ বাবু নির্দ্দেশ করিয়া না দিলে, ইহা অনুবাদ বলিয়া প্রতীতি করা দুর্ঘট হইত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক মধ্যে হুগলীর পূর্ব্বতন অবস্থার সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত যোজিত আছে, তাহাতে অনেক অভিনব রহস্যের উদ্ভেদ হয়। তবে ইহার প্রধান দোষ, চরিত্রভাগের অপূর্ণতা এবং মহম্মদ মহসীনের জন্ম-সম্বন্ধে অনিশ্চিতি। এটী বক্তা বা অনুবাদকের দোষে হয় নাই—বাঙ্গালার ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছে। যে উদ্দেশ্যে এই জীবনচরিত খানি প্রচারিত হইয়াছে, প্রমথ বাবু তাহাতে পূর্ণকাম হইলে, আমাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না।

কায়স্থ-পুরাণ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) শ্রীশশিভূষণ নন্দী প্রণীত, ভবানীপুর।

পুরাণ বলিলেই বেদব্যাস বিরচিত পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট গ্রন্থকে বুঝায়। কিন্তু এ সে পুরাণ নয়। কায়স্থজাতির আদি অনুসন্ধান করা পুরাণকারের উদ্দেশ্য নহে,—কেবল সে উদ্দেশ্য হইলে, গ্রন্থখানি উপাদেয় সামগ্রী হইত। গ্রন্থকার কায়স্থ অপেক্ষা উন্নতজাতি সমূহকে অবনত করিয়া কায়স্থজাতির এক অপূর্ব্ব ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া প্রথম ভাগে ১৫৬ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় ভাগে ৩৩৪ পৃষ্ঠা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তদ্ব্যতীত উভয় ভাগের ভূমিকা, পরিশিষ্ট প্রভৃতিতেও এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক হয়। কেবল বিতণ্ডা উদ্দেশে এত বড় বড় দুই খণ্ড পুস্তক লেখায় গ্রন্থকারের অসাধারণ অনুরাগেরই পরাকাষ্ঠা বলিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ উপলক্ষে দীর্ঘ দীর্ঘ পুস্তক লিখিয়া বঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত এ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যের স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ।

কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক ও অভিন্ন; গ্রন্থকার তাহা প্রতিপন্ন করিবার পূর্ব্বেই কায়স্থ শব্দের অর্থ স্থলে বন্ধনী দ্বারা 'ক্ষত্রিয়' লেখা অসমীচীন হইয়াছে। দাস শব্দ যাহাদের গৌরবসূচক উপাধি, তাঁহাদের বংশীয়ের এ কথা বলা, নিতান্ত অযুক্তিসিদ্ধ।

স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের সম্বন্ধে

জাতিবন্ধনীর দাঢ্য ছিল,—তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন, এবং কায়স্থ দাস শব্দভাগী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল।—সুতরাং "পবিত্র" (পৈতা) গ্রহণ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, তাঁহারা আজও এরূপ আড়ম্বরে জাতিকে কলঙ্কিত করিতে চাহেন না।

তিনি অভীষ্ট সাধনোদ্দেশে তন্ত্রকে বেদ অপেক্ষা প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন। যে ভবিষ্যপুরাণের তিন খানি পুস্তকের ঐক্য নাই, তাহাই আশ্রয় করিয়াছেন,—এরূপ উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার সময়পাত না করিয়া যদি কোন ভাল উদ্দেশ্যে চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে আজ সাধারণের কত ধন্যবাদ পাইতেন!

কায়স্থ, শূদ্রাপেক্ষা উন্নত,—কায়স্থ পুরাণকার যদি তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইতেন, তবে সুফল লাভ হইত। যে জাতি উন্নত, তাঁহারাই চিরদিন শাস্ত্রীয় চর্চ্চা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বোন্নত ছিলেন বলিয়া, ব্রাহ্মণই সর্ব্বশাস্ত্রের কর্ত্তা, বৈদ্য তাহার নিম্নেই অদ্যাবধি আসন পাইয়া থাকে, তাঁহাদেরও জীবন শাস্ত্রচর্চ্চায় রহিয়াছে। আধুনিক কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় হইবে, তবে যখন হিন্দুধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল, তখন কায়স্থ জাতি শাস্ত্রচর্চ্চায় বিমুখ ছিলেন কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই কায়স্থ সংস্কৃত শাস্ত্রের আন্দোলন করিতে অধিকারী হইয়াছেন।

গ্রন্থকার, যাঁহারা দাস উপাধি স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে অসভ্য বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা—"বি এ" প্রভৃতি উপাধির ন্যায়; সুতরাং নিজের দাসত্ব স্বীকার করা উচিত হয় না। অথচ নিজে উপহার-স্থলে, 'প্রণত' লিখিয়াও স্থির থাকিতে পারেন নাই, শেষে—"দাস" লিখিয়াছেন। আর এক কথা,—তাঁহাদের যেন দাস উপাধি না হইল, কিন্তু কায়স্থ রমণীর দাসী প্রয়োগ কেন?

ক্ষত্রীয় রমণী কি দাসী লিখিয়া থাকে, বা ক্রিয়া কাণ্ডের সঙ্কল্পের সময়ে নিজের নামের শেষে দাসী যোগ করে? এ সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র সন্দর্ভ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

তাঁহার ভাষার বিশেষ দোষ নাই। তর্কেরও কতক শক্তি আছে। কিন্তু তাহা সুসিদ্ধান্ত-সম্মত সুতর্ক নহে।

লেখকের অনেক গবেষণারও পরিচয় পাওয়া যায়, অনেক নূতন তত্ত্বেরও উদ্ভাবন করিয়াছেন, যদি পুস্তক খানি সদ্ভাব ও সদুদ্দেশ্যে পূর্ণ হইত, তাহা হইলে ইহার এক এক খানি উত্তম পুস্তক বলিয়া গণ্য হইতে পারিত!

আত্মোৎসর্গ।

জন্ হাউয়ার্ড।

(পূর্ব্ববারের পর)

গত বারের নির্দ্দেশমতে আমরা মহাপুরুষ হাউয়ার্ডের জীবনের দুই চারিটী কথা বলিতেছি।

১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ হাউয়ার্ড হ্যাক্‌নে নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এক জন ব্যবসায়ী লোক ছিলেন এবং ব্যবসা দ্বারা যথেষ্ট সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকেও ব্যবসায় শিখাইবার জন্যএক কারখানায় শিক্ষানবীশ রাখিলেন। সেই সময়েই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তিনি উইল্ দ্বারা আপনার পুত্র ও কন্যাকে দিয়া গেলেন। কিন্তু বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন যে, পুত্রের ২৫ বৎসর বয়স না হইলে, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। পিতার মৃত্যুর পরে হাউয়ার্ড শিক্ষানবীশি ছাড়িয়া দিলেন। কারণ, ব্যবসায় তাঁহার ভাল লাগিল না। ছাড়িয়া দিয়া তিনি ষ্টোক নিউইংটনের ক্রাইষ্ট ষ্ট্রীটে একটী বাসা লইলেন। তাঁহার শরীর এ সময়ে বড় অসুস্থ ছিল। সারা লাডেন্ নামক এক প্রবীণা বিধবা রমণী সেই বাসাবাড়ীর মালেক ছিলেন। তিনি প্রাণপণে হাউয়ার্ডের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হাউয়ার্ড অচিরকাল মধ্যে নিরাময় হইয়া উঠিলেন। তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন। বিধবা রমণী তাঁহা অপেক্ষা প্রায় ২৪। ২৫ বৎসরের বড়। এই জন্য তিনি অনেক আপত্তি করিলেন। কিন্তু হাউয়ার্ড সে আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি অধিক দিন এই পতিপরায়ণা রমণীর শুশ্রূষা ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ, তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি বিপত্নীক হন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর চুয়ান্ন বৎসর-বয়সে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। তাঁহারা এই তিন বৎসর অতি সুখে কাটাইয়া ছিলেন। পত্নীর মৃত্যুতে হাউয়ার্ড অতিশয় শোকাকুল হইলেন।

পর বৎসরে (১৭৫৬ খৃঃ) তিনি এক খানি পর্টুগীজ জাহাজে করিয়া লিস্‌বনে যাইতেছিলেন। এক খান ফরাসি জাহাজ পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। ফরাসি কারাগারের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা নিজে অনুভব করিয়া তিনি কারাগার-সংস্কারে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুই দিন নিরম্বু উপবাসী অবস্থায় তাঁহারা ব্রেষ্ট নগরের

দুর্গে নীত হইলেন। সেখানে তিনি ছয় রাত্রি শুষ্ক খড়ের উপরে পড়িয়া রহিলেন। মর্টেকস, কার্টেক্স, ব্রেষ্ট, মার্লেক্স ও ডুইনান্ প্রভৃতি নগরের কারাগারে অনেক ইংরাজ বন্দী ছিল। তাহাদিগের সহিত তাঁহার লেখালিখি চলিতে লাগিল। তিনি বিবিধ প্রমাণ পাইলেন যে, ইংরাজ বন্দীদিগের প্রতি ফরাসীরা অতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকে। এই নৃশংস ব্যবহারে কত শত ইংরাজ বন্দী শমন-সদনে প্রেরিত হইয়াছে। পাঠক! এই বলিলেই মৃত্যু-সংখ্যা অনুমান করিতে পারিবেন যে, ডুইনানে একটী গর্ত্তে এক দিনে ছত্রিশ জন ইংরাজ বন্দীকে প্রোথিত করা হয়। হাউয়ার্ডের কোমল হৃদয় ইহাতে বিগলিত হইল। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া এই সকল কথা জানাইলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ফরাসি গবর্ণমেণ্টকে ভর্ৎসনা করিয়া চিঠি লিখিলেন। তাহাতে ফরাসি গবর্ণমেণ্ট লজ্জিত হইয়া ইংরাজ-বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

তাহার পরে তিনি ইতালীর জেল সকল পরিদর্শন করিতে ইতালী যাত্রা করিলেন। ইতালী হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আবার বিবাহ করিলেন। এই রমণী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন। সন্তানটীও কালে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইল। হাউয়ার্ড ভগ্ন মনে বেডফোর্ড নগরের অদূরবর্ত্তী স্বীয় জমিদারীতে গমন করিলেন। এই খানেই তাঁহার জীবনের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে প্রচারিত হয়।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেডফোর্ড কাউণ্টির সেরিফপদে অভিষিক্ত হন। বেড্ফোর্ডের কারাগার সকল ও কারাবাসিগণের অবস্থা তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করে। তাঁহার প্রথমে বোধ হইয়াছিল যে, বেড্ফোর্ডের জেল সকলের মত জঘন্য ও নৃশংস জেল বুঝি ব্রিটনে আর কুত্রাপি নাই। এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য তিনি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের জেল সকল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইলেন। যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই মর্ম্মভেদী ঘটনা সকল বিদিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, ব্রিটনের জেল সকল নির্লজ্জতার গহ্বর ও পাপের অগ্নিকুণ্ড। যাহারা জেলে যায়, শুদ্ধ তাহাদিগেরই শরীর ও নীতি কলুষিত হয়, এরূপ নহে; কিন্তু তাহারা বাহির হইয়া আসিয়া সমাজ-মধ্যে সেই শারীরিক ও নৈতিক পীড়া সংক্রামিত করে। হাউয়ার্ড পার্লেমেণ্টকে এই বিষয় বিদিত করিলেন। পার্লেমেণ্ট তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

এই সকল জেলে তৎকালে এক রকম সংক্রামক জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহাকে কারাজ্বর বলিত। ঘাতকের হস্তে যত কয়েদী না মরিত, এই জ্বরের হস্তে তাহা অপেক্ষাও অনেক

অধিক লোক মরিত। শুদ্ধ কয়েদী নয়—জজ, মাজিষ্ট্রেট, জুরী, সাক্ষী ও জেলদারোগা—যাঁহারা কারাগারিকে কয়েদীর নিকটবর্ত্তী হইতেন, এই সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতেন। তিনি আরও দেখিলেন—দাওয়ানী ও ফৌজদারী জেল একত্র মিশিয়া আছে। অপরাধী ও ঋণী এক প্রথর শাসনের অধীনে রহিয়াছে। দেখিলেন, যাহারা আপীলে খালাস পাইয়াছে, তাহারা ফিজ দিতে না পারায়, এখনও কারাগারে রহিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এই কারাগার সকল 'সংশোধনাগার' না হইয়া পাপাগার হইয়া পড়িয়াছে; এ সকল দ্বারা সমাজের যেরূপ ভীষণ অনিষ্ট হইতেছে, এমন আর কিছু দ্বারাই নয়; এক জন লোক কারাগারে যাইবার সময়ে যে পরিমিত পাপ লইয়া যায়, ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহার শতগুণ পাপ লইয়া আইসে। সুতরাং বর্ত্তমান জেল সকল দ্বারা সমাজের যে পরিমাণে ইষ্ট হইতেছে, তাহার শতগুণ অনিষ্ট হইতেছে।

এই হতভাগ্যদের দুঃখে হাউয়ার্ডের হৃদয় ফাটিয়া গেল। তাঁহার মানসিক শক্তি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এবং তাঁহার পদের সমস্ত প্রভাব, তিনি এই হতভাগ্যদিগের দুঃখাপনোদনে ব্যয়িত করিতে একান্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই—যোগী হাউয়ার্ড নিরন্তর এই কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহার উদ্দীপনায় গবর্ণমেণ্টও উত্তেজিত হইলেন। তাঁহার হস্তে গবর্ণমেণ্ট জেল-সংস্কারের ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট কিয়ৎপরিমাণে সুসিদ্ধ হইল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি কারাগার ভাঙ্গিয়া নূতন প্রণালীতে গঠিত হইল। অনেক গুলিতে কারাবাসিগণের আহারের সুব্যবস্থা করা হইল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র কুঠরীতে ঘাইবেল রাখা হইল। কারাবাসিগণের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিপুষ্ট করিবার জন্য প্রতি জেলে এক এক জন করিয়া ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত করা হইল।

দেশে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া উৎসাহিত হইয়া হাউয়ার্ড সমস্ত ইউরোপের জেল পরিদর্শন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশে হাউয়ার্ড ফ্রান্স, ফ্লাণ্ডার্স, হলাণ্ড, জার্ম্মণী, সুইজলণ্ড, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, ডেন্‌মার্ক, সুইডেন্, রুসিয়া, পোলাণ্ড, স্পেন ও পর্টুগেল ক্রমে প্রদক্ষিণ করিলেন। পূর্ব্বে ইতালী দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং এবার আর ইতালীতে গেলেন না। পাঠক! আজ কাল ইউরোপের চতুর্দ্দিকে যেরূপ লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে, ভাবিবেন না যে, তখনও সেইরূপ ছিল। ইউরোপের এ সকল উন্নতি বর্ত্তমান শতাব্দীতে ঘটিয়াছে মাত্র। সুতরাং সেই ঘোর যোগী হাউয়ার্ডকে পাদযানে বা নৌযানে এই প্রকাণ্ড ইউরোপ ভূমি প্রদক্ষিণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে

তিনি ধনে প্রাণে গিয়াছিলেন বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতির শোভা বৈচিত্র্য দর্শন বা রাজপ্রাসাদের প্রসাদ-ভোগ করিতে তিনি যান নাই যে, তাঁহার দেহ ও মন পুলকিত হইবে। কারাগারের পুতিগন্ধবিশিষ্ট দুষ্প্রবেশ্য স্থান সকল তাঁহার একমাত্র তীর্থস্থল ছিল। সেই সকল তীর্থস্থলে চোর, ডাকাত, বদমায়েস তাঁহার এক মাত্র সেব্য ছিল। তিনি তাহাদিগকে কখন অর্থ দিয়া, কখন উপদেশ দিয়া, কখন বা শুদ্ধ মিষ্ট কথা বলিয়া তাহা-দিগের কষ্ট কথঞ্চিৎ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। এই অনন্ত বিশ্ব সেই বিশ্ব-প্রেমিকের গৃহ ছিল। তিনি সকল স্থলেই আত্মনির্ব্বিশেষে সকলকে ভাল-বাসিতে পারিতেন। বিশেষতঃ যে সকল কারাবাসিগণের দুঃখ কেহ জানিত না, কেহ শুনিত না, তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে ভালবাসিতেন। তাঁহার সময় ও সম্পত্তি তিনি তাহাদিগের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অতুল সম্পত্তি এই কার্য্যে ব্যয় করিয়া তিনি ভিখারী হইয়াছিলেন, তথাপি এক দিনও স্খলিতব্রত হন নাই।

তাঁহার হৃদয় ইহাতেও পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি দেখিলেন, কারাবাসি-গণের ন্যায় গলিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সংবাদ পৃথিবী লয় না। তাহারা চিকিৎসালয়ের দূষিত বায়ুতে যে মর্ম্মবিনিহত হইতেছে, পৃথিবী সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। কিন্তু যাহাদিগের দিকে তাকাইবার কেহ নাই, যাহাদিগের দুঃখকাহিনী শুনি-বার কেহ নাই, হাউয়ার্ডের দৃষ্টি ও প্রবৃত্তি সেই দিকেই ধাবিত হইত। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি—অধিক কি সুদূর স্মার্ণা ও কনেষ্টাণ্টিনোপল—পর্য্যন্ত এই উদ্দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ ঔষধ সঙ্গে লইয়া নিজে রোগীদিগকে খাওয়াইতে লাগি-লেন; রোগীর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা করিতে লাগি-লেন। কুষ্ঠগৃহের দূষিত বায়ুর অবিরাম অনুসেবনে তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে সংক্রামক জ্বরাক্রান্ত হইলেন। এবার অতি কষ্টে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। তিনি অনেক দিন পরে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন যে, তাঁহার কারাগার-সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাব সকল প্রায়ই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া আপনার পরিদর্শনের ফল পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলেন। তাহা পাঠ করিয়া পষাণও বিগলিত হইল।

কুষ্ঠরোগের দূষিত বায়ুর অনুসেবনে এক বার প্রাণ হারাইতে হারাইতে রহিয়া গিয়াও হাউয়ার্ডের চৈতন্য হইল না। অথবা কেন হইবে? পরহিত-ব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কোন্ মহাপুরুষ কবে মৃত্যুভয়ে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন? হাউয়ার্ড ১৭৮৯

শ্রীতাকে আবার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্য দেশাভিমুখে গমন করিলেন। সন্ন্যাসী কৃষ্ণসাগর-তীরবর্ত্তী রুসীয় নগরী খার্সনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এবার তাঁহার জীবনের বন্ধন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। অর্দ্ধাশনে বা অনিয়মিতাশনে নিরন্তর পর্য্যটনে তাঁহার শরীর ভগ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং এখানকার কুষ্ঠগৃহ সকল পরিদর্শন করিতে করিতে তিনি সহসা জ্বরাক্রান্ত হইলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই দুরন্ত ব্যাধি তাঁহাকে এ পৃথিবী হইতে লইয়া গেল। তথায় এক জন ফরাসি ভদ্রলোক তাঁহার অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। হাউয়ার্ডের ইচ্ছানুসারে সেই ফরাসি ভদ্রলোকের উদ্যানে তাঁহার দেহ সমাধিনিহিত করা হইল। মর দেহ মাটীর জিনিষ; মাটীতে মিশিয়া গেল। কিন্তু কীর্ত্তি অমর, সুতরাং হাউয়ার্ডের কীর্ত্তি অনন্তকাল রহিয়া গেল। কে জানিত যে, আজ এই সুদূর অঙ্গরাজ প্রদেশের নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া এই ভারত-যুবক সেই মহাপুরুষের যশোগান করিবে? কে জানিত— আজ সেই দেব হাউয়ার্ডের প্রেতদেহের উদ্দেশে এই ভারত-যুবকের নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইবে? কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি? তথাপি কেন আজ আমি তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি? কে বলে, হাউয়ার্ড মরিয়াছেন? না— তিনি মরেন নাই। যিনি অসংখ্য প্রাণের রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বলি দেন, তিনি কখনই মরেন না।

সার্ সামুয়েল্ রোমিলী।

আমরা এখানে ইংলণ্ডের আর এক জন মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করিব। তাঁহার নাম সার্ সামুয়েল রোমিলী।

যে ইংরাজ জাতি আজ জগতের সভ্যতম জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগেরই দণ্ডবিধি এরূপ নৃশংস ছিল যে, তাঁহাদিগকে যে ভারতবাসীরা রাক্ষস বলিত, তাহা নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া প্রতীত হয় না। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের সেই রাক্ষসাচারের জলন্ত দৃষ্টান্ত মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁশি। তাৎকালিক ব্রিটিশ দণ্ডবিধির সার্দ্ধ শত ধারায় প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশুও এই ভীষণ দণ্ডবিধির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিত না। চঞ্চলমতি বালক কাহারও একটী ফুল ছিঁড়িলেও, কারাগারে প্রেরিত হইত। ফাঁশিকাষ্ঠ সর্ব্বদাই টাঙ্গান থাকিত। রবিবার ভিন্ন এমন বার ছিল না, যে বারে কোন না কোন লোকের ফাঁশি না হইত। তবে সোমবার অতি প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। কারণ, যাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইত, দয়া করিয়া তাহাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত এক দিন সময় দেওয়া হইত। শুক্রবারে

বিচার হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে, অভাগা শনি রবি দুই দিনের সময় পাইত। কারণ, রবিবার নিষিদ্ধ দিন। এই জন্য সাধারণতঃ শুক্রবার বিচার ও সোমবার ফাঁসি হইত।

ইংরাজ জজ কেবল ফাঁসিতেই সন্তুষ্ট হইতেন, এরূপ নহে। কখন কখন দণ্ডিতকে অশ্বপদে বাঁধিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিতে বলিতেন। অশ্ব ক্রমাগত দৌড়িতে থাকিত, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডিতের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। কখন কখন তাঁহার শিরশ্ছেদনের আদেশ হইত। কখন বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কাটিয়া দিবার, এবং কখন বা তাহাকে জীবিত দগ্ধ-করণের হুকুম জারি হইত। তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর শাস্তি ছিল—জীবিত মনুষ্যের পেট চিরিয়া নাড়ীভুঁড়ী বাহির করিয়া লওয়া হইত। কখন বা তাহাকে টিক্‌টিকিতে চড়াইয়া পাথর ছুড়িতে ছুড়িতে তাহার প্রাণ বাহির করিয়া ফেলা হইত। কখন বা তাহাকে বেত মারিতে মারিতে "নিউগেট" হইতে "টাইবরণে" লইয়া যাওয়া হইত, এবং "টাইবরণ" হইতে "নিউগেটে" ফিরাইয়া আনা হইত। ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছিটিয়া পড়িয়া সকলের গা ভাসিয়া যাইত, তথাপি বিচারকদিগের মনে দয়ার উদ্রেক হইত না। এই যাতায়াতেই অনেক দণ্ডিতের প্রাণবিয়োগ হইত। রাক্ষস রাজার রাক্ষস বিচারক, এবং রাক্ষস-বিচারকের রাক্ষসী শাস্তি!

ইংরাজ যে আজ কাল কথঞ্চিৎ সভ্য হইয়াছেন, সে সার সামুয়েল রোমিলীর প্রাণোৎসর্গে। পূর্ব্ব অসভ্যতার চিহ্ন-স্বরূপ ফাঁসি ও বেত্রাঘাত ইংরাজ দণ্ড-বিধিকে আজও দূষিত করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজ দণ্ডবিধির এই ঘোর নৃশংসতা-কলঙ্ক অপনোদন করিবার জন্যই যেন সার সামুয়েল্ রোমিলীর জন্ম হয়। তিনি তাঁহার অতি পরিমার্জ্জিত মন ও অত্যুদার হৃদয়কে এই মহৎ ব্রত সাধনে আজীবন নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। বাল্য-কাল হইতেই তাঁহার অন্তরে নিষ্ঠুরতার প্রতি বলবতী ঘৃণা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার নিজের কথায় আমরা তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিব। "নরহত্যা বা অন্য কোন নৃশংস কার্য্যের বিবরণ পাঠ করিলে, আমার হৃদয়ে ভয়ানক ভাবের আবির্ভাব হইত। নিউগেট্ জেলে যে সকল উৎসৃষ্টপ্রাণ (Martyrs) ব্যক্তি-গণকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত, তাঁহা-দিগের বিবরণ পাঠ করিয়া আমি কত রাত্রি ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারি নাই, নিদ্রা যাইলেও, স্বপ্ন তাহার ব্যাঘাত সম্পাদন করিত। স্বপ্নে সেই সকল অর্দ্ধদগ্ধ বিকট মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইত, অমনি নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত। কল্পনা আমার সম্মুখে সতত ফাঁসি, নরহত্যা ও শোণিতপাতের দৃশ্য অবতারিত করিত। আমি সেই সকল দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া শয্যায় দেহ লুকাইবার চেষ্টা করিতাম। রজনীর

গাঢ় অন্ধকারে আমি জাগিয়া থাকিতে ভয় করিতাম, কিন্তু ভীষণ স্বপ্নের উপদ্রবে নিদ্রা যাইতে পারিতাম না। এই জন্য আমি সান্ধ্য উপাসনার সময়ে প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতাম, যেন তিনি সে রাত্রি বিনা ভীষণ স্বপ্নদর্শনে আমাকে নিদ্রা যাইতে দেন।” নৃশংসতা-বিদ্বেষের কি অপূর্ব্ব চিত্র!

এই সুযোগে আমরা রোমলীর জীবন-চরিত-সম্বন্ধে কিছু বলিব।

রোমিলীর পিতা এক জন ফরাসি প্রোটেষ্টাণ্ট ছিলেন। তিনি ক্যাথলিক গবর্ণমেণ্টের নির্যাতনে দেশ ছাড়িয়া লণ্ডনে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। লণ্ডনবাসিনী একটী ফরাসি রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়া ছিল, কিন্তু তিনটী বই দীর্ঘজীবী হয় নাই। সামুয়েল্ তাহার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। এক জন সুশিক্ষিতা ফরাশি রমণী বাল্যে ইহার শিক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিও ক্যাথলিক নির্যাতনে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-প্রবৃত্তির তীক্ষ্ণতা ও সবিষাদ-ভাবুকতার মূল এই ধর্ম্মপরায়ণা বিদুষী ফরাসি রমণী।

রোমিলী কিছু বড় হইলে, তাঁহাকে একটী স্কুলে দেওয়া হয়। এই স্কুলের শিক্ষক পড়াইতে যত পারুন্ আর নাই পারুন্, বেত্রপ্রহারে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি নব নব শাস্তির উদ্ভাবন করিয়া বিদ্যার অভাব পরিপূরণ করিতেন। শিক্ষকের এই নিষ্ঠুরতায় তিনি নৃশংসতা-বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, এই শিক্ষকের কাছে কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া তিনি স্কুল ছাড়িলেন। তাঁহার পিতার জহরতের ব্যবসায় ছিল। তিনি স্কুল ছাড়িয়া সেই ব্যবসায়ের হিসাব পত্রাদি-বিষয়ে পিতার সাহায্য করিতে লাগিলেন। হিসাবপত্র রাখিয়া তিনি অনেক অবসর পাইতেন। সেই অবসরকালে তিনি আপন চেষ্টায় গ্রীক ও লাটিন শিখিলেন। এইরূপে দুই তিন বৎসর যায়, এমন সময়ে কোন আত্মীয় মৃত্যুকালে উইল দ্বারা তাঁহাদিগকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়া যান। এই অভাবনীয় ধনাগমে উৎসাহিত হইয়া রোমিলীর পিতা তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমিলী ‘গ্রেজ ইনে’ প্রবিষ্ট হন। এবং যথাসময়ে ব্যারিষ্টার হইয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন।

‘বারে’ প্রাধান্য লাভ করিতে রোমিলীর অনেক দিন লাগিল। দণ্ডবিধির সংস্কার-সাধনে তিনি যে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, এ কথা তিনি এক দিনও গোপন রাখেন নাই। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে আইনের দোহাই দিয়া প্রতি দিন যে সকল নীতিবিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, তিনি মুক্তকণ্ঠে সে সকলের প্রতিবাদ করিতে কখনই ভীত হইতেন না। যদিও ইহাতে আপাততঃ

তাঁহার পশারের কিছু হানি হইল—যদিও আপাততঃ বড় বড় জমিদার ও ধনী চটিয়া যাইতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতিভা কালে এত স্ফূর্ত্তি পাইল যে, সকল দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন সত্বেও তাঁহার পশার অতিশয় বাড়িয়া গেল। ক্রমে তাঁহার নাম দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠিল। এই উন্নতিমুখে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হার্টফোর্ট শায়ারের মিস্ গার্গেট্ নাম্নী এক যুবতীকে বিবাহ করিলেন।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমিলী সলিসিটর্ জেনারেলের পদে অভিষিক্ত হইলেন। সেই সময়েই তিনি 'কুইন্সবরার' প্রতিনিধি-রূপে হাউস্ অব্ কমন্সে প্রবিষ্ট হন, এবং সার্ সামুয়েল্ হন। এই সময় হইতেই তাঁহার জাতীয় জীবন আরম্ভ হয়। সাধারণ জীবনের শান্তি ও তরঙ্গের মধ্যেও তিনি আপনার জীবনের লক্ষ্য হারা হন নাই। পার্লেমেণ্টের প্রতি সেশনেই তিনি ফৌজদারী আইনের সংশোধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বাগ্মিকতা—সত্য, ন্যায় ও মনুষ্যত্বের সমর্থনেই সতত ব্যয়িত হইত। আত্মীয় স্বজনের আদরে সুখী, পতিপ্রাণা ভার্য্যার প্রেমে সুখী, সন্তান সন্ততিদিগের প্রতি বাৎসল্যে সুখী এবং সাধু ও মহৎ লোকের শ্রদ্ধাভক্তিতে সুখী হইয়াও সার সামুয়েল্ দুঃখীদিগকে ভুলেন নাই। নিজে সৌভাগ্য-সূর্য্যের আলোকে সমাসীন হইয়াও, দুর্ভাগ্যের অন্ধতমসে যাহারা বসিয়া আছে, তাহাদিগকে ভুলেন নাই। তিনি জানিতেন যে,তিনি যখন সুখে কাল কাটাইতেছেন, তখন কত শত লোক দুঃখে মরিয়া যাইতেছে। এই জন্য তাঁহার মনে সর্ব্বদাই হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইত। এই জন্য তিনি তাহাদিগের দুঃখমোচনে নিজের ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি নিজের জীবদ্দশায় তাঁহার অজস্র চেষ্টার বিশেষ ফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা নিষ্ফলা হয় নাই। তাঁহার সেই আশাময়ী বক্তৃতায় পাষাণও বিগলিত হইতে লাগিল। সেই বক্তৃতার মোহিনী-শক্তিবলে ইংরাজ জাতির অয়োময় হৃদয় বিচলিত হইল। ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টে এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল।

এই সময়ে (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে) সহসা তাঁহার প্রণয়িনীর সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। উভয়ের জীবন যে এক তারে কেমন গাঁথা ছিল, রোমীলীর দৈনন্দিন লিপি (ডায়ারী) হইতে এক ছত্র তুলিয়া পাঠককে উপহার দিতেছি। "৯ই অক্টোবর—আজ স্ত্রী একটু ভাল ছিলেন বলিয়া কত দিন পরে ঘুমাইয়া বাঁচিয়াছি।" কিন্তু অদৃষ্টে বিধাতা অধিক দিন ঘুম লিখেন নাই। তাঁহার স্ত্রীর পীড়া তাহার পরেই আবার বাড়িয়া উঠিল। ২০এ অক্টোবর তাঁহার স্ত্রী মানবলীলা সংবরণ করিলেন। লোকে

রোমিলী ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন। সে আঘাত তাঁহার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ধমনী-গুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। যে জীবন নিরন্তর মানবজাতির দুঃখাপনোদনে ব্যয়িত হইত, আজ সার্ সামুয়েল্ মনের অসহ্য বেদনায় নিজ হস্তে সেই জীবনের উপসংহার করিলেন। ধন্য বীর! ধন্য তোমার মানবপ্রেম! ধন্য তোমার পত্নীপ্রেম! পুরুষ হইয়া সহমরণে যায়, কে কোথায় শুনিয়াছে? আজ পুরুষজাতির সেই ঘোর কলঙ্ক তুমি অপনোদন করিলে। তুমি আজীবন যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলে, তাহার উদ্যাপনা করিয়া যাইতে পারিলে না, এই ক্ষোভ রহিয়া গেল। কিন্তু, তোমার তপস্যার ফলে আজ ইংরাজ-জাতি ঘোরতম পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত। তোমার পুণ্যবলে আজ ইংরাজজাতি সভ্যপদ-বাচ্য। তোমার মৃত্যুর পরে তোমার তপস্যার ফল ফলিল। দণ্ড-বিধির ১৫০ ধারায় প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। তোমার মৃত্যুর পরে সে ধারাগুলি দণ্ড-বিধি হইতে একে একে অপসারিত হইল। দুই একটী আজও আছে বটে, কিন্তু তোমার অদ্ভুত তপোমাহাত্ম্যে তাহাও এক দিন অপসারিত হইবে। তুমি যাহার জন্য ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলে, আসিয়া দেখ! এক বার দেখ, তাহা প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। আসিয়া আর এক বার পার্লেমেণ্টের আসনে আসীন হইয়া তোমার হৃদয়-তেজস্কারিণী বক্তৃতায় পাষাণ গলাইয়া ইংরাজ দণ্ডবিধির এখনও যে দুই একটী কলঙ্ক আছে, শীঘ্র তাহার ক্ষালন কর। দেব! এই শেষ মিনতি ও পদে।

গ্যারিবল্ডীর প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা।

পাঠক! ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় যাইব, মনে সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু এক বার ফিরিতে হইল। এক বার প্রাণোৎসর্গের জীবন্ত জলন্ত ক্ষেত্র ইতালীতে যাইতে হইল। এই তীর্থযাত্রা-প্রারম্ভে যে মহাপুরুষকে 'ইতালীর প্রহরী' বলিয়া উল্লেখ করিয়া আসিয়াছিলাম—যিনি সেই বৃদ্ধাবস্থায় ক্যাপ্রেরা দ্বীপে ইতালীর মঙ্গলার্থে শবসাধনা করিতেছিলেন—সেই মহাপুরুষ—সেই ইতালীর প্রাণের প্রাণ গ্যারিবল্ডী গত (১৮৮২ খৃঃ ৩রা জুন) মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। জগৎকে কাঁদাইয়া, ইতালীকে আঁধার করিয়া সেই ইতালীগতপ্রাণ মহাপ্রাণ বীর, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ইতালী স্তব্ধ ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। যে ইতালীকে তিনি এক দিন নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার বিরহে সেই ইতালি প্রাণহারা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে দেহের অমিত বলে এক দিন প্রকাণ্ড অগ্নির জাতি ধূলির ন্যায় ইতালীক্ষেত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই অমিতবল বীরদেহ ৩রা জুন ক্যাপ্রেরা

দ্বীপের মৃত্তিকায় সমাধিনিহিত হইয়াছে। এস, এক বার ইতালীর অধিবাসিবৃন্দের সহিত প্রাণ ভরিয়া কাঁদি। সমস্ত ভারতবাসী এস, এক বার ক্রন্দন-রোলে গগন বিদারিয়া সেই স্বজাতিপ্রেমিকের জন্য কাঁদি। ভারতের অশ্রুজল ইতালির অশ্রুজলে মিশিয়া অপূর্ব্ব শান্তিবারির সৃষ্টি করুক। সমস্ত ভারতবাসী সেই শান্তি-জলে উক্ষিত হইয়া নব জীবন প্রাপ্ত হউক।

ঐ যে অষ্ট কৃষ্ণ তুরঙ্গে পরিচালিত কৃষ্ণ বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত রথ খানি শোক-ভূর্ভর গতিতে ধীরে ধীরে 'পোটাডেল্ পোপোলো' হইতে ক্যাপিটলাভিমুখে যাত্রা করিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সৈনিক পুরুষ কৃষ্ণ পতাকা উড্ডীন করিয়া অবনত মস্তকে, ও অগণ্য ইতালীয় কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিয়া সাশ্রু লোচনে স্খলিত পদে চলিতেছে, ও কোন্ দেবতার রথ? দোকানদার দোকান ফেলিয়া, শিল্পী যন্ত্র ছাড়িয়া, লেখক কলম ফেলিয়া, রাজনৈতিক রাজচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, এবং রমণীরা বিলাস ত্যজিয়া যে রথযাত্রায় যোগ দিবার জন্য দ্রুতগতিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, ও কোন্ দেবতার রথ? ঐ যে রথ হইতে শ্বেত প্রস্তরময় অর্দ্ধ মূর্ত্তি ক্যাপিটলের চন্দ্রাতপের নিম্নে সংস্থাপিত করিল, উনি কোন্ দেবতা? আর ঐ যে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পূর্ণ শ্বেত-প্রস্তরময়ী দেবী দক্ষিণ হস্তে বিজয়-মুকুট লইয়া প্রথম দেবতার মস্তকে পরাইয়া দিতেছেন এবং বাম হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ইনিই বা কোন্ দেবতা? ঐ যে অর্দ্ধমূর্ত্তি দেখিতেছ, উহা ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা গ্যারিবল্ডী; আর ঐ যে দেবীমূর্ত্তি দেখিতেছ, উহা স্বয়ং ইতালী-দেবী। গত ১১ই জুন গ্যারিবল্ডীর স্মরণার্থ সমস্ত ইতালীবাসী মিলিয়া এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যেমন প্রাণোৎসর্গ, তেমনি প্রতিষ্ঠা! এই প্রাণোৎসর্গের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াই ভারতবাসীরা এক দিন চৌষট্টী কোটী দেবতার উপাসক হইয়াছিলেন। ঐ যে জগন্নাথদেবকে দেখিতেছ, যাঁহার রথের রজ্জু স্পর্শ করিতে পারিলে, ভারতবাসী আপনাকে স্বর্গের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করেন, যাঁহার রথচক্রে নিষ্পেষিত হইলেই, ভারতবাসী স্বশরীরে স্বর্গে যায়, সেই জগন্নাথদেব দেবতা নহেন—এক জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ প্রচারক। ঐ যে বৌদ্ধ মন্দিরে প্রশান্ত মুক্তিকামী শ্বেত প্রস্তরময় মূর্ত্তি দেখিতেছ, উনি দেবতা নন—কপিলবাস্তু নগরের অধীশ্বর জগদারাধ্য মহাপ্রাণ শাক্যসিংহ। যে নিরীশ্বর বৌদ্ধজগৎ স্বর্গ ভুলিয়াছে, ঈশ্বরও ভুলিতে পারিয়াছে, সে বৌদ্ধ জগৎও বুদ্ধের পূজা ভুলিতে পারে নাই। যে খ্রীষ্টমণ্ডলী দেবতা পূজা অতিশয় ঘৃণা করেন, তাঁহারাও বেথ্লহেমের সেই পরমযোগী দীনবন্ধু খ্রীষ্টের পূজা ভুলিতে পারেন নাই। যে মুখে যত বলুক,

যাহার হৃদয়ে ভক্তি, প্রেম ও কৃতজ্ঞতা আছে, সে পৌত্তলিক না হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার আদর্শ পুরুষ বা আদর্শ রমণীর নিকটে তাহাকে অবনত মস্তক হইতেই হইবে। যত কাল নিঃস্বার্থ প্রেম ও নিরভিসন্ধি ধর্ম্মের প্রতি মানুষের ভক্তি অচলা থাকিবে, তত দিন ঐ পূজা এ পৌত্তলিকতা নিবারণ করে, কাহার সাধ্য? এই মহাপ্রাণ পূজা কেবল কম্‌ট প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যেরাও এক দিন এই মহাপ্রাণ পূজা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা মানুষকে ঈশ্বরের অবতার কল্পনা না করিয়া, তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মানুষে অতিমানুষ গুণ দেখিলেই, তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আমাদের মতে ঈশ্বর মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করেন না, মানুষ যোগবলে ঈশ্বরত্ব লাভ করে। এই যোগ নিঃস্বার্থ প্রেম ও নিরভিসন্ধি ধর্ম্মের সাধনা। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি সেই সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই, লোকে তাঁহাদিগকে দেবতা বলে এবং তাঁহাদিগের পূজা করে। গ্যারিবল্ডীও সেই সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া, আজ ইতালিবাসীরা তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন,—তাই আজ তাঁহার পবিত্র প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পবিত্র রাজধানী রোমে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

ইতালী গ্যারিবল্ডীর কিরূপ উপাসক, তাহার আর একটী নিদর্শন না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। গত ৩রা জুন গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু হয়। এই সমাচার রজনীতে যখন ইতালীর রাজধানীতে পৌঁছিল, তখন নাট্যশালায় নৃত্য, গীত ও অভিনয়াদি হইতেছিল। এই সংবাদ-শ্রবণে বজ্রাহতের ন্যায় সকলে যে যেমন অবস্থায় ছিল, নির্ব্বাক্ হইয়া সেই অবস্থায় রহিল। রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ মাননীয় ডেলি অভিনয়াদি বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিতে গেলেন; কিন্তু বাক্য ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। মিউনিসিপাল সভার অধিবেশন হইতেছিল, এই সংবাদ আসিবা-মাত্র সভ্যেরা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদের পতাকাগুলি নিম্ন ও শিথিল করা হইল। গ্যারিবল্ডীর সৎকার্য্যের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ তৎক্ষণাৎ সাধারণ রাজস্ব হইতে পর্য্যাপ্ত অর্থ প্রেরণ করা হইল।

গ্যারিবল্ডীর জীবদ্দশায় তাঁহার জীবনী লিখিব না, সঙ্কল্প ছিল—এই জন্য প্রস্তাবের প্রারম্ভে তাহা লেখা হয় নাই। কিন্তু এখন গ্যারিবল্ডী অতীত ঘটনা, সুতরাং এখন আর সে আপত্তি হইতে পারে না। গ্যারিবল্ডীর বিস্তৃত জীবনী লিখিবার বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও, এখানে তাঁহার জীবনের গুটী কত স্থূল ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই স্থূল ঘটনাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্যারিবল্ডী।

গ্যারিবল্ডী ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জুলাই ইতালীর অন্তর্গত নাইস্ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যে সকল মহাত্মা ইতালীকে দুরন্ত অষ্ট্রীয় জাতির শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার জনক জননী অতি দরিদ্র ছিলেন, এই জন্য শৈশবে পুত্রের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি অতি অল্প বয়সেই সার্ডিনীয় নৌসেনার অন্তর্নিবিষ্ট হন এবং সেই অল্প বয়সেই সাহস ও ধৈর্য্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার মন সেই নবীন বয়স হইতেই উন্নতিশীল ছিল, সেই জন্য তিনি দেশের তাদৃশ দুর্গতি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই সময় ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে, একটী জাতীয় অভ্যুত্থান হয়। জেনোয়া নগরে বৈপ্লবিকদিগের যে ষড়যন্ত্র হয়, তিনি তাহাতে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া, নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। সেই সময়ে তিনি পলাইয়া ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সময়ে তাঁহার জীবন, উপন্যাসের নায়কের জীবনের ন্যায় অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রয়োজন মত নানা মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে অজ্ঞাতবাসে ছদ্মবেশে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া তিনি মার্সেলিসে একটী নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই মার্সেলিসেই ম্যাট্‌সিনির সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চবিংশতি মাত্র। তিনি ম্যাট্‌সিনির নিকটে মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। সেই সময় হইতেই তাঁহার জীবন ইতালীর উদ্ধার-সাধনে উৎসর্গীকৃত হয়। এই স্থানে তিনি দুই বৎসর কাল থাকিয়া গণিতবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া এক খানি মিসরদেশীয় জাহাজে কর্ম্ম লইয়া মার্সেলিস্ হইতে টিউনিস্ যাত্রা করিলেন। টিউনিসে যাইয়া তথাকার নৌসেনার অন্তর্নিবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যপ্রবণ মন যে কার্য্যক্ষেত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, সেখানে তাহার কোন আশা নাই দেখিয়া, তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই টিউনিস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাইও প্রস্থান করিলেন।

রাইও জেনিরো ডেল্ সল্ এই সময়ে সাধারণতন্ত্র-রূপে পরিণত হইয়াছিল। গ্যারিবল্ডী এই নবাধিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই সময়ে বুয়েনস্ এয়ারেস্ জাতির সহিত এই সাধারণতন্ত্রের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। উক্ত গবর্ণমেণ্ট গ্যারিবল্ডীকে অভিযানোদ্যত নৌসেনার অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন।

সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে এই ইউরোপীয় আগন্তুকের কৃতকার্য্যতার দিকে

লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তাঁহার পারগতা, তাঁহার বিচক্ষণতা, অধিক কি—তাঁহার সাহসিকতার বিষয়েও সন্দিহান লোকের অপ্রতুল ছিল না। এই রণবীর কি ধাতুর লোক, তাহার পরিচয় পাইতে লোকের অধিক দিন বিলম্ব সহিতে হয় নাই। তাঁহার অতিমানুষ অবদান-পরম্পরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। অনেকেই জল্পনা করিতে লাগিল—এ মানুষ নয়, নররূপী দৈত্য। রণস্থলে তিনি নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে লাগিলেন, অথচ তাঁহার শরীর একটীও ব্রণ-চিহ্ন ধারণ করিল না দেখিয়া, অনেকেই তাঁহাকে মন্ত্ররক্ষিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তিনি কতিপয়-মাত্র সহচর-সমভিব্যাহারে গভীরতম রণক্ষেত্রে তীব্রবেগে ছুটিয়া অক্ষতশরীরে এক মুহূর্ত্তে আপন সৈন্য-মধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হইতেন। জ্বলন্ত গোলা গুলি সকল ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহার গায়ের কাছ দিয়া ছুটিতেছে, অথচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না। দেখিলে আপাততঃ বোধ হয়, যেন সে গুলি লৌহপ্রাকারে ঠেকিয়া বেগে ফিরিয়া আসিতেছে। তিনি শৌর্য্যে ও বীর্য্যে যেমন লোকের বিস্ময়জনক হইয়াছিলেন, দয়ার্দ্রেও ঠিক সেইরূপ বিস্ময় উদ্দীপন করিয়াছিলেন। বিজয়ের পূর্ব্বে বা পরে কোন সময়েই অকারণে শত্রু-রক্তপাত করিয়া বীরধর্ম্ম কলঙ্কিত করিতেন না। তাঁহার বিচিত্র রণবেশ, তাঁহার অলৌকিক গুণগ্রামের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শোভায় তিনি জগন্মনোমোহন হইয়াছিলেন। তাঁহার সেনা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী হইত। রাইও জেনিরোর সাধারণতন্ত্র গ্যারিবল্ডীর নিকটে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন; এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, এখন হইতে সকল যুদ্ধেই গ্যারিবল্ডীর সেনা গৌরব-সূচক দক্ষিণ পার্শ্ব অধিকার করিবে। তদীয় সেনা যুদ্ধস্থলে থাকিতে জাতীয় সেনাও এ গৌরব পাইবেন না। অজ্ঞাত-কুলশীল আগন্তুক বৈদেশিকের পক্ষে এ সম্মান বড় উপেক্ষণীয় নহে।

এ দিকে গ্যারিবল্ডীর অদ্ভুত বিজয়-পরম্পরার সুবাদ স্বদেশে প্রসৃত হইল। সমস্ত ইটালী এই সমাচারে আনন্দে ও উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ফ্লরেন্স তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে এক খানি তরবারি উপঢৌকন দিবেন বলিয়া, প্রকাশ্যরূপে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু এ সম্মানসূচক উপহার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ইটালীর উদ্ধার-সাধনের জন্য তদীয় প্রবলতর ভুজবলের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান গ্যারিবল্ডীকে বহু দিনের নির্ব্বাসনের পরে স্বদেশে আনয়ন করিল। তিনি অবিলম্বেই দক্ষিণ টাইরলাভিমুখে

অষ্ট্রীয় সেনার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাঁহার রাইফল্ বন্দুক সকল অবিরাম অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া শত্রুসেনাকে ত্রস্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি পীডমণ্টরাজ চারল্স আলবার্টের নিকটে কার্য্য করিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই ভীরু নরপতি তাহাতে সহজে সম্মত হইলেন্ না। তিনি কেবল অনুগ্রহ করিয়া গ্যারিবল্ডীকে অস্থায়ী অবৈতনিক সেনাদলের (ভলাণ্টীয়ার) সৈন্য সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই আদেশ প্রচার হইবা-মাত্র দলে দলে স্বজাতি-প্রেমিক রণোন্মত্ত ইতালীয় যুবকদল তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। এই জাতীয় সেনা লইয়া তিনি অষ্ট্রীয়গণের উপরি ক্রমাগত কয়েকটী যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। তিনি যে অবশেষে পরাজিত হইলেন, সে তাঁহার দোষ নয়। জাতীয় বিশ্বাস-ঘাতকতা ও জাতীয় সাহায্যের অভাবই তাহার মূল।

তাঁহার ও তদীয় সেনার শৌর্য্য-বীর্য্য ও দয়াদাক্ষিণ্যে রণধীর অষ্ট্রীয় সেনা-নায়কেরাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিজয় লাভ করিয়াও, বিজিত গ্যারিবল্ডীর সৈনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া সৈন্য সকলকে বিদায় দিয়া বিষণ্ণ মনে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে যাত্রা করিলেন; তথায় বাণিজ্যোপজীবী হইয়া শুভ দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে পেরুদেশে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। পেরুর সৈনাপত্য তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। তাহাতে তাঁহার যশঃ-সৌরভ সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যপ্ত হইল।

পেরুদেশের যুদ্ধের অবসানে গ্যারিবল্ডী স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন; এবং পুত্র-গণ সহ ক্যাপ্রেরা দ্বীপে পাঁচ বৎসর কাল অজ্ঞাতবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকরী মানসিক বৃত্তি স্থির থাকিবার নহে। তিনি এই দ্বীপে বিস্তৃত কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেক পতিত জমির আবাদ আরম্ভ করিলেন, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাবাড়ী সকল প্রস্তুত করিলেন। অচিরকাল-মধ্যে তাঁহার গৃহ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কৃষিজাত পণ্য-সকল নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিবার জন্য এক খানি সমুদ্রযান প্রস্তুত করাইলেন। সময়ে সময়ে তাহাতে চড়িয়া তিনি স্বয়ং বাণিজ্যার্থ নাইস্ নগরে গমন করিতেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, তাঁহার প্রফুল্ল শ্রমপ্রবণতা, তাঁহার হৃদয়ের ও মনের রমণীয় গুণাবলী— অচিরকাল-মধ্যে তাঁহাকে পরিচিত ব্যক্তি-মাত্রেরই ভক্তি ও প্রীতির আধার করিয়া তুলিল। ভারতীয় যুবক! চাকরী হইল না বলিয়া, হতাশ হইও না! জননী ভারতভূমি রত্নগর্ভা। গ্যারিবল্ডীর ন্যায়, জননীর আরাধনা করিতে শিখ। তিনি বক্ষঃ চিরিয়া শরীরের রুধির দিয়া তোমাদিগকে খাওয়াইবেন।

ভারতীর সন্তান হইয়া, তোমাদিগকে পরের দাসত্ব করিতে হইবে না।

দাসত্বের মর্ম্মন্তুদ আঘাতে জর্জ্জরিত ইতালী আবার মাথা তুলিল। 'ইতালী দীর্ঘজীবী হউক!' 'ইতালীর জয়!' ইত্যাদি শব্দে আবার গগন উদ্ঘোষিত হইল। এই শেষ স্বাধীনতা-সমরে জাতীয় নয়ন আবার গ্যারিবল্ডীর দিকে পতিত হইল। সেই জাতীয় আহ্বানে গ্যারিবল্ডীর আসন টলিল। তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রধূমিত বীর্য্যবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। স্বজাতির উদ্ধার-সাধন-রূপ ব্রতের উদ্যাপনার দিন উপস্থিত দেখিয়া তিনি আর আপন আশ্রমে স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বদেশের স্বাধীনতা-মন্দিরে বলি দিতে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। ইতালীর স্বাধীনতা-উদ্ধারের জন্য তিনি নিজের প্রাণ—অধিক কি, প্রাণাধিক স্ত্রীপুত্র পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বৈপ্লবিক দস্যু ছিলেন না, বিপ্লবকালীন অরাজকতার সুবিধা লইয়া পরস্ব লুণ্ঠন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি লক্ষ্মীকামী সৈনিক পুরুষ ছিলেন না—আপনার অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া লোককে মুগ্ধ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করা তাঁহার লিপ্সা ছিল না। তিনি রঙ্গালয়ের নায়কের ন্যায় মৌখিক অভিনয় করিয়া স্বজাতিপ্রেমের পরা-কাষ্ঠা দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রকৃতির সন্তান ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে কপটতা ছিল না। তিনি প্রাণাপেক্ষা ইতালীকে ভালবাসিতেন, তাই ইতালীর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইতালীর উদ্ধারের জন্য প্রকৃতি তাঁহাকে জাতীয় অধিনেতা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাই আজ জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে সমস্ত ইতালী এক বাক্যে তাঁহাকে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। তিনি প্রাচীন রোমীয় ডিক্টে-টরের ন্যায় হলকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় অধিনেতৃত্বে অভিষিক্ত হইলেন। এ জাতীয় বিশ্বাসের অপব্যবহার তিনি কখনই করেন নাই। নেপোলিয়নের ন্যায় তিনি এই মহতী জাতীয় সেনা লইয়া ইতালীর সম্রাট্ হইতে পারিতেন। কিন্তু সেই স্বজাতিপ্রেমিকের হৃদয় নিজের পার্থিব উন্নতির জন্য ব্যাকুল ছিল না। শত্রুদিগকে ইতালী ক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিয়া তিনি ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে ইতালীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য ন্যস্ত করিয়া আবার দীনবেশে নিজ দ্বীপাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্টর ইমানুয়েলের তাঁহাকে অদেয় কিছুই ছিল না। উচ্চ পদ, পেন্‌সন ও জাইগির একে একে তিনি সমস্তই গ্যারিবল্ডীকে দিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি সমস্তই প্রত্যাখান করিলেন। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য অসি নিষ্কোষিত করিয়াছিলেন, আজ সে ব্রতের উদ্যাপনা হইল। অমনি অসি কোষসাৎ করিয়া সেই দীপস্থ পর্ণ

কুটীরে গমন করিলেন; আবার হল-চালনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানেই লোকে তাঁহার জয়ধ্বনি করিত দেখিয়া, তিনি ক্রমে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে বাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। জগতের ভাগ্যে এরূপ লোক সচরাচর ঘটে না! ভারতে এরূপ এক জন লোক জন্মিলে, ভারতের এ দুর্দ্দশা কয় দিন থাকে?

তিনি জাতীয় সেনার অধিনায়ক হইয়া লম্বার্ডীতে গিয়া লম্বার্ডগণকে উল্লেখ করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব অক্ষরে অক্ষরে লিখিত আছে। সে ঘোষণাপত্র এই—"লম্বার্ডগণ! আপনারা নব জীবন লাভের জন্য আহূত হইয়াছেন। আশা করি, পন্‌টিডীয়া ও লেগনানো সময়ে আপনাদিগের পিতৃপুরুষগণের সদৃশ আপনারাও এই যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন। এ বারও সেই শত্রু, সেই ভীষণ ঘাতক, নির্ম্মম ও লুণ্ঠনশীল অষ্ট্রীয়গণ! ইতালীর অন্যান্য প্রদেশস্থ তোদীয় ভ্রাতৃগণ একবাক্যে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যুদ্ধে হয় জয় লাভ করিবেন, নয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আসুন! আপনারাও সেই শপথে আবদ্ধ হউন। আমাদিগকে বিংশতি পুরুষব্যাপী দাসত্ব, অত্যাচার ও অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইতেছে। জাতীয় সাম্রাজ্যকে বৈদেশিক দাসত্বের কলঙ্ক হইতে বিধৌত করিয়া নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র অবস্থায় ভবিষ্য পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। সমস্ত ইতালীয় জাতি একবাক্যে যে ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে জাতীয় নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আমাকে আপনাদিগের নিকটে পাঠাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা আপনারা এই জাতীয় স্বাধীনতা-সমরের নিমিত্ত দলবদ্ধ ও বদ্ধ-পরিকর হউন। যে পবিত্র কার্য্যের ভার আমার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, আমি কায়মনোবাক্যে তাহার সিদ্ধি কামনা করিতেছি। আমি যে জাতীয় সৈনাপত্যে ব্রত হইয়াছি, তজ্জন্য আমি আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি। ভ্রাতৃগণ! আর কেন? অস্ত্র গ্রহণ করুন। ইতালীর স্বাধীনতা-সূর্য্য দাসত্ব মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আপনাদের বাহুবলে অস্ত্রে তাহা স্ববলে অপসারিত করুন। যে যে অস্ত্রগ্রহণক্ষম হইয়াও অস্ত্রগ্রহণে বিরত থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তি জাতীয় বিশ্বাসহন্তা বলিয়া দণ্ডিত হইবে। যে দিন ইতালীর বিচ্ছিন্ন পুত্র সৈন্যগণ একত্র মিলিত হইবে, যে দিন অধীনতার দুর্ভর শৃঙ্খল তাহাদিগের চরণ হইতে খলিত হইবে, সেই দিন ইতালী আবার পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে! ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের মধ্যে ইতালী এক দিন যে উচ্চতম আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন ইতালী সেই উচ্চতম আসন পুনরধিকার করিবে।"

এই রূপ উদ্দীপনা-বাক্যে কাহার হৃদয় না অগ্নিময় হইয়া উঠে! গ্যারিবল্ডীর এইরূপ উদ্দীপনা-বাক্যে ইতালীয় সমস্ত প্রদেশই অষ্ট্রিয়গণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। তাঁহার লোহিত কঞ্চুকি চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহানল সন্ধুক্ষিত করিতে লাগিল। দলে দলে ইতালীয় যুবকসম্প্রদায় গৃহের মায়ায়, প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার অনুষ্ঠানুসারী হইল। সমস্ত ইতালী যেন রণে মাতিয়া উঠিল! ঝড়ের সম্মুখে তুলারাশির ন্যায়, এই প্রচণ্ড জাতীয় বলের সম্মুখে অষ্ট্রিয় সেনা উড়িয়া গেল। ইতালীগগনে বহু দিনের পরে সৌভাগ্য-তপন পুনরায় উদিত হইল। ধন্য গ্যারিবল্ডী! ধন্য তোমার কীর্ত্তি! তুমি স্বদেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য—যাহা করিলে, ইতিহাসের প্রতি পত্রে স্বর্ণাক্ষরে তাহা লিখিত থাকিবে। তোমায় আদর্শ পুরুষ করিবার জন্য বিধাতা বীরোচিত দেহ, প্রশস্ত ললাট, প্রফুল্ল মুখকান্তি, স্বর্ণ বর্ণ, লোহিত ধূসর সুচিক্কণ আকুঞ্চিত কেশরাজি, উজ্জ্বল ঈষৎ ধূসর নয়নদ্বয়, সুপরিস্ফুট বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বর, অনিয়ন্ত্রিত বিনয়-নম্র গতি প্রভৃতি যে সকল বাহ্য সৌন্দর্য্যে তোমায় বিভূষিত করিয়াছেন, সেগুলি কালে সকলই লয় প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি অনন্ত কাল বিরাজমান থাকিবে।

—

ম্যাট্‌সিনি।*

পাঠক! ঐ যে নিভৃত প্রদেশে একটী সামান্য ও মলিন দেবমন্দির দেখিতেছ, উহার অভ্যন্তরে ইতালীর মহাপ্রাণ নিহিত আছেন। যাঁহার মন্ত্রবলে ইতালী-শ্মশানক্ষেত্রে শত শত গ্যারিবল্ডী সৃষ্ট হইয়াছিলেন; যাঁহার সঞ্জীবন ঔষধে ইতালী মৃতোত্থিতা হইয়াছেন; যাঁহার উদ্দীপনায় লক্ষ লক্ষ ইতালীয়ের রুদ্ধ রক্ত-স্রোত তাহাদিগের ধমনীতে বৈদ্যুতিক বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল; যাঁহার প্রদীপ্ত জীবনের অদ্ভুত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র ইতালীয় যুবক, জনক জননী ও দারা সুত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহার মন্ত্রের মোহিনী শক্তিবলে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত সামান্য পদাতিক সৈনাও স্বজাতিপ্রেমে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে শিখিয়াছিল; যাঁহার দীক্ষাবলে দীক্ষিত যুবক বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া বক্ষ পাতিয়া গুলী লইয়াছিলেন, তথাপি দীক্ষামন্ত্র ও দীক্ষিত ভ্রাতৃগণের নাম প্রকাশ করেন নাই; যাঁহার চরিত্র-গৌরবে মুগ্ধ হইয়া ইতালীয় যুবকগণ দলে দলে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় মার্সেলিস্থিত আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; শুদ্ধ ইতালীয়

* ইহার জীবনীর প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডও খণ্ডশ ও বিস্তৃতভাবে আর্য্যদর্শনে বাহির হইতেছে।

যুবক কেন, যাঁহার বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য পোলণ্ডীয়, রুষীয়, জর্ম্মাণীয়, সুইজর্লণ্ডীয় ও ফরাসীয় বৈপ্লবিকগণও দলে দলে আসিয়া তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন;—সেই জগদ্গুরু ইতালী-সঞ্জীবক মহাপ্রাণ ম্যাট্‌সিনি এই খানে মহানিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন—অকৃতজ্ঞ ইতালী এক বার সে দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে না। যিনি গ্যারিবল্ডীর দীক্ষাগুরু; যিনি গ্যারিবল্ডীর সহ-সমরি-গণেরও মন্ত্রগুরু; যিনি ইতালীর জন্য ইতালীর উদ্ধার-কামনায় আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি ইতালীর শোকে আশৈশব কৃষ্ণপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন; যিনি বিদ্যালয়ের কাষ্ঠ-মঞ্চকে বসিয়া করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বিষণ্ণ মনে ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া অশ্রুজল ফেলিয়াছিলেন ও ইতালীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন; যিনি ব্যবহারাজীবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও, ইতালীর উদ্ধার-কামনায় নিজের আর্থিক উন্নতির দিকেও তাকান নাই; যিনি পিতার অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও, ইতালীর উদ্ধার-কামনায় দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি সেই সুমহৎ ব্রতের উদ্‌যাপনায় জন্য কারাগারের কম্বল-শয্যাকে সুকোমল পুষ্পশয্যা এবং নির্ব্বাসনকে মুক্তির অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন; যিনি নির্ব্বাসন অবস্থায় ফরাশি গবর্ণমেণ্টের নির্যাতনে দিবসে বিল-মধ্যে লুক্কাইত থাকিয়া রজনীতে উঠিয়া নিজ মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া অপূর্ব্ব উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ সকল "নব্য ইতালী" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া অসংখ্য শিষ্যবর্গ দ্বারা পর দিনে সমস্ত ইতালীতে প্রচারিত করিতেন—যে পত্রিকাপ্রচার, দুর্দ্দান্ত অষ্ট্রিয়ার সমস্ত নিবারণ-চেষ্টা বিফল করিয়াছিল—ফ্রান্সের নির্যাতনও নিস্ফল করিয়াছিল; যাঁহার প্রদীপ্ত উদ্দীপনাপূর্ণ রচনা সকল ইতালীতে মত-বিপ্লব উপস্থিত না করিলে—ইতালীকে পূর্ব্ব হইতে অগ্নিময় করিয়া না রাখিলে, বোধ হয়, সহস্র গ্যারিবল্ডীর অস্ত্রে ইতালীর উদ্ধার সাধন হইত না; যিনি শয়নে স্বপ্নে, অশনে বসনে, নির্ব্বাসনে নির্যাতনে, ধ্যানে জ্ঞানে ইতালী বই জানিতেন না; যিনি বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বনাগরিক হইয়াও, ভবিষ্য বিশ্বজনীন-সাধারণতন্ত্রের নেতৃত্ব ও কেন্দ্রত্বে ইতালীকে অভিষিক্ত করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; সংক্ষেপতঃ যিনি ইতালীর জন্য পদে পদে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন;—প্রাণোৎসর্গের সেই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তস্থল, ইতালীয়র-জীবিত, মহাপ্রাণ ম্যাট্‌সিনি এখানে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন, অন্ধ ইতালী তাহা দেখে না। রাজতান্ত্রিক ইতালী—সেই পূর্ণ লোকতান্ত্রিক

ম্যাট্‌সিনির মাহাত্ম্য আজও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই,—তাই সেই বিশ্বপ্রাণ মহাপুরুষের পূজা করে না। অবোধ ইতালী! এক দিন তোমাকে ইহার জন্য গুরুতর অনুশোচনা করিতে হইবে, এক দিন তোমাকে এই ঘোরতর পাপের ঘোরতর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ম্যাট্‌সিনি তোমাকে যে উচ্চ আদর্শে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, তুমি আজ সেখানে যাইতে চাহিলে না; কিন্তু কাল হউক, পরশ্ব হউক, এক দিন তোমায় সে স্থানের অভিলাষিণী হইতেই হইবে, তখন তোমার বক্ষ আবার রুধির-কর্দ্দমিত হইবে। এবার প্রধানতঃ বৈদেশিকগণের রক্তে তোমার বক্ষ কর্দ্দমিত হইয়াছিল, সুতরাং তত মনোবেদনা পাও নাই। কিন্তু আগামী বারে উভয় পক্ষেই তোমার পুত্রগণ থাকিবে; সেই রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের বিবাদে তোমার বক্ষঃ ক্ষত বিক্ষত হইবে। যদি সাধারণতন্ত্রের জয় হয়, তখন তুমি ম্যাট্‌সিনির পূজা আরম্ভ করিবে। গ্যারিবল্ডিও প্রথমে সাধারণতন্ত্র-বাদী ছিলেন, কিন্তু ভিক্টর ইমানুএলের গুণে মুগ্ধ হইয়া পরে রাজতান্ত্রিক হইয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাট্‌সিনির চিত্তশলাকা চুম্বকশলাকার ন্যায় সকল অবস্থাতে সেই এক দিক্ লক্ষ্য করিয়াছিল। এই দিক্‌দর্শনের উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া বিপক্ষগামী হওয়ার ফল ইতালীকে ভোগ করিতেই হইবে।

ভগবন্! অকৃতজ্ঞ ইতালী তোমার পূজা না করুক, পবিত্র-জাহ্নবী-সলিল-বিধৌত ভারতে তোমার পূজা আরব্ধ হইয়াছে। তুমি যে স্বজাতিপ্রেমের মন্ত্রে ইতালীয় যুবকগণকে দীক্ষিত করিয়াছিলে, আজ সেই মন্ত্রে ভারত-যুবক অনুপ্রাণিত হইয়াছে। তোমার সঞ্জীবনৌষধে ভারতের শিরায় শিরায় জীবন সঞ্চার হইতে আরব্ধ হইয়াছে। মৃতোত্থিত ইতালীর ন্যায় সঞ্জীবিত ভারতেও ক্রমে ক্রমে দুই একটী জীবন-লক্ষণ স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইতেছে। যে শাক্য-সিংহের মহিমা ভারত বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া, তাঁহার অনাদর করিয়াছিলেন, সেই শাক্যসিংহই আজ জগতের এক-তৃতীয়াংশের ঈশ্বর। সেই রূপ, তুমি ইতালীতে অনাদৃত হইয়াও, ভারতে পূজিত। দেব! ঐ দেখ আজ ভারত-যুবক তোমার সমাধিমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত। চীন পরিব্রাজক যেমন বুদ্ধ গয়ায় আসিয়া তীর্থ-পর্য্যটনের চরম ফল লাভ করে, আজ ভারতযুবক তোমার সমাধি দর্শন করিয়া সেই ফল লাভ করিল। দেব! এক বার উঠিয়া পদধূলি দেও। এক বার দেখা দিয়া আশীর্ব্বাদ কর—"ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক"।

মানব-তত্ত্ব।

সভ্যতা।

উন্নতিই মানবের মানবত্ব; সুতরাং সভ্য হওয়া মানবের নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু, সভ্যতা কাহাকে বলে? সভ্যতার কোন লক্ষণ নাই; অথবা সভ্যতা-নির্ব্বাচক কোন গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি যাহাকে সভ্যতা বল, আমি তাহাকে অসভ্যতা বলি। হিন্দুরা যাহাকে সভ্যতা বলেন, ইয়ুরোপীয়েরা তাহাকে অসভ্যতা বলেন। এইরূপ, ধর্ম্মের ন্যায় সভ্যতা-সম্বন্ধেও নানা মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, প্রকৃত সভ্যতা কিরূপে নির্ণীত হইবে? সভ্যতার লক্ষণ কি?—বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার নাম অসভ্যতা; সুতরাং সভ্যতা অপ্রাকৃতিক। কেননা, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—যে সকল মনুষ্য প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করে অর্থাৎ যাহারা অনাবৃত স্থানে থাকে, ফল মূল ভক্ষণ করে, যথেচ্ছ বিচরণ করে, উলঙ্গ থাকে, ইচ্ছামত স্ত্রী গ্রহণ করে, কেবল প্রকৃতির পথানুবর্ত্তন করে বলিয়া তাহারা নিতান্ত অসভ্য। যাহারা প্রাকৃতিক শক্তির সহিত বিরোধ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসতি করে, কৃষি-জাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, বেশ বিন্যাস করিয়া কদর্য্য অঙ্গ আবৃত করে, ইন্দ্রিয় দমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিণীত স্ত্রী ভিন্ন অপর স্ত্রী গ্রহণ করে না, তাহারা সভ্য। দেখা যাইতেছে, যে জাতি প্রকৃতিকে যত অধিক পরিত্যাগ করিয়া চলে, সে জাতি তত সভ্য, এবং যে জাতি যত অধিক প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া চলে, সে জাতি তত অসভ্য। সুতরাং যাহারা অনাবৃত স্থানে বাস করে, তাহারা নিতান্ত অসভ্য। যাহারা পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, তাহারা আরও সভ্য। যাহারা উলঙ্গ থাকে, তাহারা অত্যন্ত অসভ্য, যাহারা বল্কল পরিধান করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা কটিদেশে মাত্র বস্ত্র পরিধান করে, তাহারা আরও সভ্য, যাহারা অষ্টাঙ্গে বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য। যাহারা বন্য ফল মূল ও মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা অসভ্য; যাহারা কৃষি-জাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য। যাহারা মিঠাই মণ্ডা প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারা আরও সভ্য। যাহারা ইচ্ছা হইলেই স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহারা অসভ্য, যাহারা মনের মিলন পর্য্যন্ত বিবাহ-বন্ধন ছেদন করে না,

তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য যাহারা যাবজ্জীবন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ থাকে, তাহারা আরও সভ্য, যাহারা নিজের মাত্র ভরণপোষণ করে, তাহারা অসভ্য; যাহারা স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য যাহারা সকলেরই ভরণপোষণ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা তদপেক্ষা সভ্য।

যাহারা কেবল আপন সুখের জন্য ব্যস্ত, তাহারা অসভ্য। যাহারা প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় দেখে, তাহারা তদপেক্ষা সভ্য, যাহারা সর্ব্বভূতকে আপনার ন্যায় দেখে, তাহারা আরও সভ্য। যাহারা প্রণয় জন্য ভালবাসে, তাহারা অসভ্য; যাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া ভালবাসে, তাহারা সভ্য। যাহারা দুঃখ হইলেই কাঁদে এবং সুখ পাইলেই হাসে, তাহারা অসভ্য এবং যাহারা সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করে,তাহারা সভ্য। যাহারা আত্মাভিমানী, তাহারা অসভ্য এবং যাহারা বিনয়ী, তাহারা সভ্য। যাহারা ক্রোধ হইলেই জলিয়া উঠে, তাহারা অসভ্য; যাহারা ক্রোধ নিবারণ করিতে পারে, তাহারা সভ্য। যাহারা ক্ষতি-কারকের ক্ষতি করে, তাহারা অসভ্য এবং যাহারা ক্ষমা করে, তাহারা সভ্য। এইরূপে প্রমাণিত হইবে যে, যে কার্য্য, প্রকৃতির যত অধীন, সে কার্য্য তত অসভ্য; এবং যে কার্য্য যত কৃত্রিম,তাহা তত সভ্য। যুক্তি অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও, উহা সত্য বলিয়া বোধ হয়। কেন না, যাহা কিছু প্রাকৃতিক, তাহা আপনা হইতে হয়, তাহার জন্য মানবের প্রয়াস পাইতে হয় না। যাহা কৃত্রিম, তাহা মানবের যত্ন দ্বারা সাধন করিতে হয়। যাহা আপনা হইতে হয়, তাহা যদি সভ্যতা হইত, তাহা হইলে বন্য মানব—ইতর পশু পক্ষীরাও সভ্য হইত। পরিধান জন্য যাহারা বল্কল ব্যবহার করে, তাহারা বিনা আয়াসে প্রকৃতিপ্রদত্ত পদার্থ লইয়া পরিধান করে। যাহারা বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহারা কত বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া তুলা, পশুলোম বা গুটী হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বয়ন করে। সেই বস্ত্রকে কত প্রকার বর্ণে রঞ্জিত করে, এবং স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি সংলগ্ন করিয়া কত সৌন্দর্য্যশালী করে। যে যত বুদ্ধি-কৌশল ও শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারে, সে তত উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে। ঐ সকলে বুদ্ধিচালনা, চিন্তা, চেষ্টা ও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়, এ জন্য সকলে তাহা পারে না; যাহারা যত পারে, তাহারা তত সভ্য—তাহাদিগের তত গৌরব। নচেৎ সভ্যতার এত গৌরব হইত না; সুতরাং অসভ্যতা প্রাকৃতিক এবং সভ্যতা অপ্রাকৃতিক। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রাকৃতিক-মাত্রেই সভ্যতা হইতে পারে না। মানবের আহার নিদ্রা প্রাকৃতিক। উপরি উক্ত নিয়মানুসারে যাহারা আহার করে বা নিদ্রা যায়,

তাহারা অসভ্য এবং যাহারা আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করে, তাহারা সভ্য। যাহারা স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহারা অসভ্য এবং স্ত্রী-ত্যাগী সন্ন্যাসীরা সভ্য। যাহারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে ভালবাসে, তাঁহারা অসভ্য, এবং যাহারা এক-কালে মমতা-শূন্য, তাহারা সভ্য। কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহা যদি না হইল, তবে অপ্রাকৃতিক মাত্রেই সভ্যতা নহে। তবে সভ্যতার লক্ষণ কি? একটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে। যাহা প্রাকৃতিক, তাহা আমাদিগের প্রয়োজনীয়; সুতরাং তাহার কোন একটী ত্যাগ করিলে, আমাদিগের সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। আবার পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ কখনও সম্ভবে না। তবে কি প্রকারে আমরা প্রাকৃতিকতা পরিত্যাগ করিব? এবং যদিও ত্যাগ করিতে পারি, তাহাতে কখনই আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না। যাহা অত্যাজ্য এবং যাহা ত্যাগ করিলে, আমাদের অহিত হয়, তাহা কখনও সভ্যতা নহে। তাহা হইলে সভ্যতাই অপ্রাকৃতিক হয়। প্রকৃতির মধ্যে কখনও কি অপ্রাকৃতিকতা থাকিতে পারে? কখনই না। তবে সভ্যতা কি? আমাদের বোধ হয়, সভ্যতার প্রকৃত অর্থ এই যে, যাহা হিতের জন্য প্রকৃতি-মধ্যে প্রকাশ্যভাবে নাই, অথচ গূঢ় ভাবে আছে, সেই হিতকর গূঢ় প্রকৃতির প্রকাশই সভ্যতা; অন্যথা, প্রকৃতির অবাধ্যতা বাস্তবিক সভ্যতা নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ— গৃহ, বস্ত্র, অন্ন, ব্যঞ্জন ইত্যাদি কৃত্রিম পদার্থ সকল প্রাকৃতিক না হইয়াও, প্রাকৃতিক। যেহেতু ঐ সকল প্রস্তুত করিবার উপকরণ প্রাকৃতিক। যোগ, আকর্ষণাদি শক্তি প্রাকৃতিক এবং ঐ সকল সংযোগ করিয়া প্রস্তুত করিবার শক্তি যাহা মানবের আছে, তাহাও প্রাকৃতিক। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে, মানব-নির্ম্মিত কোন পদার্থই কৃত্রিম নহে। যদি তাহা হইত, তবে বাবুইয়ের বাসা কৃত্রিম, উই ঢিবি কৃত্রিম এবং লাক্ষা, মধু প্রভৃতিও কৃত্রিম। কেন না, ঐ সকল মধুমক্ষিকা প্রভৃতি ইতর জন্তুপ্রণীত। ইতর জন্তু-প্রণীত পদার্থ যদি কৃত্রিম না হইল, তবে মানবপ্রণীত পদার্থ কৃত্রিম হইবে কেন? উহারাও ত ইতর জন্তুর ন্যায় ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমাদের সে বিষয় আলোচনার আবশ্যকতা নাই। আমরা মানব-প্রণীত পদার্থকে কৃত্রিম বলিতে প্রস্তুত। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, মানব যাহা প্রস্তুত করে, তাহা প্রাকৃতিক শক্তির বলে করিয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃতির বিরুদ্ধ কিছু করিবার মানবের সাধ্য নাই; তাহা করিতে হইলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আহার, নিদ্রা—জীবন-রক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বন্ধ করিলে, প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণ করা

হয়। সুতরাং তাহা মানুষের সাধ্যাতীত। তাহার চেষ্টা করিলে, নষ্ট হইতে হয়। গৃহ,পরিচ্ছদাদি—প্রকৃতির প্রতিকূল নয় বরং অনুকূল। কারণ, তাহা মানব প্রস্তুত করিতে পারে। যদিও প্রকৃতি গৃহ প্রদান করেন নাই, তথাপি পর্ব্বতগুহা, বৃক্ষতল প্রদান করিয়াছেন। মানব তাহা হইতে উত্তম গৃহ প্রস্তুত করিতে পারে, আবার প্রকৃতি যেমন ক্রোধ দিয়াছেন, তেমনি আবার ক্ষমাও দিয়াছেন। যেমন ভালবাসা দিয়াছেন, তেমনি বৈরাগ্যও দিয়াছেন। যেমন স্বার্থপরতা দিয়াছেন, তেমনি আবার সহানুভূতিও দিয়াছেন, যেমন সুখ দিয়াছেন, তেমনি দুঃখ দিয়াছেন। আবার ঐ সকল দমন ও বৃদ্ধি করিবার শক্তিও দিয়াছেন। ইহার একটী চরিতার্থ করিতে হইলে, অপরের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। সুতরাং মানব,হিতাভিলাষে ঐ সকলের সামঞ্জস্য করিতে পারে। অতএব ইহাই স্থির হইতেছে যে, মানব হিত-সাধন বা অহিত-নিবারণ জন্য প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাকৃতিক উপকরণ লইয়া যাহা প্রকাশ করে, তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। এই জন্যই সভ্যতা মানবের এত আকাঙ্ক্ষণীয়, এবং সভ্যজাতির এত আদরণীয়। যাহা আপনা হইতেই হয়, তাহার আবার প্রশংসা কি? তাহার যে প্রশংসা, সে কেবল প্রকৃতির, বা ঈশ্বরের। ঈশ্বর চুম্বককে লৌহাকর্ষণের শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে সে লৌহাকর্ষণ করে। তাহার নিজের চেষ্টায় সে কিছুই করে না। তাহাতে তাহার গৌরব কি? তবে তাহার গৌরব এই যে, সে বলিতে পারে—আমি মৃত্তিকা না হইয়া চুম্বক হইয়াছি, আমি বড় বংশে জন্মিয়াছি। ঐরূপ যে স্ত্রী, প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া কোন সুন্দর যুবককে ভালবাসে, তাহাতে তাহার প্রশংসা কি? সে ত যুবার রূপে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াই ভালবাসিতেছে, স্রোতে তাহাকে লইয়া যাইতেছে। আর যে নারী, পতি কুৎসিত, ভালবাসার যোগ্য নয় দেখিয়াও শুদ্ধ কর্ত্তব্যের অধীন হইয়া ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারা ভালবাসিতেছে, তাহারই ভালবাসার প্রশংসা। কেন না, প্রকৃতি তাহাকে ভালবাসিতে বলেন নাই, বরং ঘৃণা করিতে বলিয়াছেন,কিন্তু সে চেষ্টাবলে বৈরাগ্য দূরীকৃত করিয়া ভালবাসা আনিয়াছে, ঐ ভালবাসা জন্মাইতে তাহার অনেক আয়াস পাইয়াছে। যদি ঐ কার্য্য করায় তাহার বৃত্তি-সামঞ্জস্য করা হইয়া থাকে, অথবা তদ্দ্বারা মানুষের হিত করা হইয়া থাকে, তবে উহাকে সভ্য ব্যবহার বলিতে হইবে। ঐ কার্য্য নারীর প্রকৃত প্রশংসা-যোগ্য। যখন আমরা সভ্যতা বর্ণনা করিব, তখনই ঐ রমণীর প্রশংসা করিব। আর যখন স্বভাবের শোভা বর্ণনা করিতে করিতে ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য বর্ণন করিব, নীল আকাশে চন্দ্রিকা-জ্যোতির সুখ্যাতি করিব, এখন নির্ম্মল নদীর লহরী-লীলার শোভার

বিষয় বলিব, যখন ভ্রমরের মধু পান, ভানূদর্শনে কমলিনী-প্রকাশাদির বর্ণনা করিব, সেই সময়ে প্রথমোক্ত রূপমুগ্ধা যুবতীর প্রণয়ের প্রশংসা করিব। সৌন্দর্য্যে ঐ রমণীর প্রণয় শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু মানবীয় উচ্চ ভাব উহাতে কিছু নাই; সুতরাং মাহাত্ম্যহীন। এই জন্য ভারত-সতী সাবিত্রী ও মহাভারতীয় কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত ব্রাহ্মণ-পত্নীর সতীত্বের যত মাহাত্ম্য, অজ-রমণী ইন্দুমতী ও ভরত-মাতা শকুন্তলার তত মাহাত্ম্য নহে। কেন না, পতিপরায়ণা সাবিত্রী এক বৎসর পরে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে জানিয়াও, কর্ত্তব্য অনুরোধে সঙ্কল্পিত স্বামী সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করেন নাই এবং ঐ ভারতোক্ত পতিব্রতা রমণী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতির মনস্তুষ্টি জন্য কত দুরূহ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন। ইন্দুমতী ও শকুন্তলার প্রণয় অধিক বটে, ঐ প্রণয়ের মধুরতা অধিক বটে, কিন্তু তাহা তত শ্লাঘনীয় নহে। কেন না, তাঁহাদের প্রণয় প্রাকৃতিক আকর্ষণজাত।

সভ্যতার এত প্রশংসার কারণ এই যে—যাহা প্রাকৃতিক, তাহা হইতে যে উপকার পাওয়া যায়, তাহা ত আমরা পাইতেছি। তদ্ভিন্ন কৃত্রিম পদার্থ হইতে যে উপকার পাওয়া যায়, তাহা সভ্যতা না হইলে, পাওয়া যায় না; এবং প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে আমাদের যে অপকার হয়, তাহা প্রকৃতি হইতে নিবারণ করিবার যে উপায় আছে, কৃত্রিম পদার্থ হইতে তাহা অপেক্ষা অধিক। সুতরাং সভ্যদিগের সুখ-সম্পাদন ও দুঃখ-নিবারণ করিবার যত উপায় আছে, অসভ্যদিগের তাহা অপেক্ষা নিতান্ত অল্প। তুলনায় সভ্যেরা দেব এবং অসভ্যেরা পশু তুল্য হয়। যেখানে যত সভ্যতা, সেখানকার মানব তত উচ্চ-শক্তিবিশিষ্ট এবং যেখানে যত অসভ্যতা, তথাকার লোক তত পশু-শক্তি-সম্পন্ন। কিন্তু অগ্নি যেমন রন্ধন ও গৃহদাহ দুইই সম্পাদন করে, সভ্যতাও সেইরূপ হিত ও অহিত উভয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অসভ্যদিগের শারীরিক বল অধিক, মানসিক বল অল্প এবং সভ্যদিগের মানসিক বল অধিক, শারীরিক বল অনধিক। কারণ, অসভ্যেরা কেবল শরীর চালনা করায় তাহাদের শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। সভ্যগণ অধিক মানসিক চিন্তা করায়, তাহাদের শরীর দুর্ব্বল হয়। অসভ্যদিগের শরীর দৃঢ়, মন অটল, অভাব অল্প; সুতরাং তাহাদের সুখ চরিতার্থ না হওয়ার জন্য দুঃখ অল্প হয়। আহার-বিহারাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য গুলি সম্পাদন করিতে পারিলেই, তাহারা সুখী হয়। কিন্তু সভ্যগণের শরীর শক্তিহীন, মন চিন্তাযুক্ত এবং অভাব অনেক হওয়ায় তৎ-সমস্ত অসম্পাদিত হওয়ার কারণ দুঃখ অনেক এবং তাহাদের সুখের সংখ্যা স্বল্প। অসভ্যেরা সমস্ত কার্য্য

দৈহিক বল দ্বারা সম্পন্ন করে, সভ্যেরা অনেক কার্য্য যন্ত্রবলে সমাধা করে। সভ্যেরা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্র ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতে পারে; সুতরাং অসভ্য মল্লযুদ্ধে তাহারা অপারগ। বাষ্পীয় রথে তাহারা এক মাসের পথ একদিনে যায়, সুতরাং অসভ্য-দিগের পথ ভ্রমণে তাহারা অশক্ত। শীত-বাতাদি নিবারণোপযুক্ত যথেষ্ট দ্রব্য সভ্যদিগের আছে, সুতরাং তাহারা অসভ্যদিগের ন্যায় শীত বাতাদি সহ্য করিতে পারে না। এই প্রকারে সভ্য-দিগের কায়িক শক্তি মাত্রেরই অল্পতা হয়। কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে তাহাদের মানসিক শক্তি ও শ্রমের বৃদ্ধি হয়। সেই মানসিক শক্তি-প্রভাবে তাহারা নানা প্রকার আশ্চর্য্য বিজ্ঞান, দর্শন বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করে, নানা প্রকার উৎকৃষ্ট শিল্প-জাত দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং নানা প্রকার সুখকর পদার্থ ও সমাজ-স্থিতির সুশৃঙ্খলা প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল হওয়ায় নানা-প্রকার শারীরিক রোগ-যন্ত্রণা এবং পুনঃ পুনঃ অবস্থার বৈপরীত্য ঘটায় নানা প্রকার মানসিক কষ্ট পাইয়া থাকে। আবার মনের সরলতা প্রাকৃতিক, সুতরাং উহা অসভ্যদিগের ধর্ম্ম। কুটিলতা কৃত্রিম, উহা সভ্যদিগের ধর্ম্ম। প্রতিবেশীকে আত্মবৎ দেখা সভ্যতার কার্য্য সত্য বটে, কিন্তু যদি ঐ প্রতিবেশী কাহারও বিরোধী বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন সভ্য সে প্রতিবেশীদিগের সহিত কুটিলতারূপ অবস্থোচিত ব্যবহার করে। ঐ কুটিলতা হইতে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চাটুবাদ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এবং তাহা হইতেই ক্রমে নানা প্রকার বিবাদ বিসংবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অসভ্যেরা শক্তি অনুসারে মাননীয় হয়। যাহার যত অধিক বল, সে তত প্রধান। এমন কি, বলই রাজত্বের কারণ। যাহার যেমন বুদ্ধি, সে তত সম্মানিত হয়, এবং যে যত কার্য্য করিতে পারে, সে তত যশস্বী হয়। নির্গুণেরা সমাজে অপদস্থ থাকে। কিন্তু সভ্যসমাজে তদ্রূপ নহে। সভ্য-সমাজে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সাম্যভাব ঘোষিত হয়, অথবা কার্য্যে অসভ্যদিগের হইতেও বৈষম্য অধিক থাকে; এজন্য মানব মনোবেদনায় অস্থির হয়। তাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধের ন্যায়। তাহারা মনে মনে জানিতেছে যে, কার্য্য মাত্রেই তাহারা সমান অধিকারী; কিন্তু কার্য্যের অনুষ্ঠান-কালে তাহার বিপরীতাচরণ দেখিয়া মনঃক্লেশে চঞ্চল হয়। তাঁহারা কেবল মুখেই সর্ব্বস্ব দেখাইয়া অর্থাৎ ইতর, ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে মহাশয় বলিয়া ও মানাবর পাঠ লিখিয়া সাম্যের ফল প্রদান করেন। সভ্যসমাজে এই প্রকার ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, যদিও সভ্যসমাজ চাকচিক্যপূর্ণ, এবং সুখের নানাবিধ পদার্থে পরিব্যাপ্ত, তথাপি ইহা প্রকৃত পক্ষে অসভ্যদিগের ন্যায়

সুখী নহে। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, সভ্য-সমাজে যত রোগ, যত মারী-ভয়, যত কলহ, যত মনঃকষ্ট—অসভ্য সমাজে তাহার সংখ্যা অনেক কম। অসভ্য সমাজে সুখকর দ্রব্যের আধিক্য নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের দুঃখের ভাগ অল্প। কিন্তু মানুষ সুখী না হউক, যদি দুঃখ না পায়, সেই তাহার ভাল। অসভ্যদিগের সুখ অর্থাৎ বিলাসের দ্রব্য বেশী নাই; কাজেই তৃপ্তি-সুখ তাহার অল্প। অভাব পূরণ হইল না বলিয়া যে দুঃখ, তাহা তাহাদিগের অল্প। সভ্যেরা সুখ-জনক দ্রব্যের অনেক আস্বাদ পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের অনেক অভাব প্রযুক্ত সে সকল অধিকাংশই অপূর্ণ থাকায়, যথেষ্ট দুঃখ পাইয়া থাকেন। কষ্ট দুই প্রকার; দুঃখজনিত এবং অসুখজনিত। আবশ্যক পদার্থের অভাবে ক্লেশ জন্মে; অন্য দিকে সুখকর পদার্থের অসদ্ভাবেও অসুখ ঘটে। আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত আহার, পানীয় জল ও বায়ুর প্রয়োজন। তাহার অভাব হইলে, ক্ষুধা, পিপাসা ও শ্রীমে অস্থির হইতে হয়। গোলাপ পুষ্পের সুগন্ধি পাইলে আমরা আমোদিত হই, কিন্তু যদি তাহা না পাই, তাহা হইলে পুষ্পাঘ্রাণ-জনিত সুখ পাইলাম না বলিয়া আমার অসুখ হইল। ঐরূপ মিষ্টান্ন ভোজনে রসনার সুখ, সংগীত শ্রবণে কর্ণের সুখ, সুশোভন পদার্থ দর্শনে চক্ষুর সুখ, এবং সুকোমল পদার্থ স্পর্শনে অঙ্গের সুখোৎপত্তি হয়। যদি ঐ সকল সুখের অভাব হয় অর্থাৎ ঐ সকল সুখ ভোগ করিবার উপযুক্ত পদার্থ আমরা না পাই, তবে আমাদের ঐ সকল সুখের অভাব অর্থাৎ অসুখ হইল। যে সকল সুখের আস্বাদ্যে অভাব হয়, সেই সকল সুখ আমরা কখনও ভোগ না করিয়া থাকিলে তাহার অভাবে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। যদি সুখকর বস্তুর কচিৎ আস্বাদ পাইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহার অভাবে অল্প কষ্ট হয়। আর যদি উহা আমাদের অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার অপ্রাপ্তিতে আমাদের কষ্ট প্রায় দুঃখেরই ন্যায় হইয়া থাকে। অসভ্য কালে যখন মানবগণ উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্যে বাস, সুকোমল শয্যায় শয়ন, বিবিধ সুমিষ্ট ভক্ষ্য ভোজন, বিশুদ্ধ তান লয় সংযুক্ত সংগীত শ্রবণ, বহুবিধ ভোগ্য ও বিলাস দ্রব্য উপভোগ জনিত আনন্দের কিছুমাত্র আস্বাদন পায় নাই, তখন ঐ সকলের অভাবে তাহাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। অদ্যাপি অসভ্য ও সভ্যদেশবাসী পল্লীগ্রামস্থ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের ঐ সকলের অভাব হেতু মনে নিরানন্দ উদ্রিক্ত হয় না। যেহেতু তাহারা কখনও ঐ সকল সুখের রসগ্রহ করে নাই এবং তাহার প্রার্থীও হয় নাই। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও ভোগবিলাসের অশেষ কৃত্রিম পদার্থের সৃষ্টি হয়। যত অধিক

বস্তু প্রস্তুত হয়, মানবগণের সেই সকল পাইবার কারণ ততই অভিলাষ বর্দ্ধিত হয় এবং সেই অভিলাষ যত অপূর্ণ থাকে, ততই অসুখ বৃদ্ধি হয়। আমরা সভ্যসমাজে সুখকর দ্রব্য ভোগ করিতে করিতে এমত অভ্যস্ত হইয়া যাই যে, তদভাবে প্রাকৃতিক অভাবজনিত দুঃখের ন্যায় অসুখ ভোগ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থা সভ্য সমাজে নিয়ত ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইউরোপীয় সভ্যতা ঐরূপ কষ্টের একান্ত কারণ। ইউরোপীয় সভ্যতার সকলকেই স্বাধীন ও সমান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; সকলকেই সুখোপভোগে তুল্য অধিকারী বলিয়া উদ্ঘোষণ করিতেছেন। সুতরাং সকলেই সুখ লাভের জন্য লোলুপ, সকলেই বড় চাকুরি, বড় পদের নিমিত্ত লালায়িত, অথচ তাহা অতি অল্প লোকে পায়। অবশিষ্ট লোকে মনোদুঃখে ফিরিয়া আইসে, আবার কেহ কেহ কিছুদিনের জন্য পদমর্য্যাদা-সম্পন্ন হইয়া সুখ ও বিলাস ভোগে অভ্যস্ত হইয়া অপদস্থ হয়, তখন তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। তখন সে পদ নাই, সে অর্থ নাই। সে বিলাসের দ্রব্য কোথায় পাইবে? তখন তাঁহাকে অট্টালিকা ছাড়িয়া কুটীরে অধিবাস করিতে হয়। শকট-ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে বেড়াইতে হয়, পলায়, পিষ্টক সুমিষ্ট ভোজ্য বর্জ্জন করিয়া শাকান্ন আহার করিতে হয়, বহুমূল্য বেশবিন্যাস, পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পরিচ্ছদ পরিহিত হইতে হয়। ভৃত্যাভাবে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। এক্ষণে তাহার কষ্টের অবধি থাকে না। অসভ্য জাতিকে এ সকল কষ্ট কিছুই পাইতে হয় না। তাহাদিগের সুখের সামগ্রী অধিক নাই সুতরাং তাহা পাইবার হেতু তাহাদিগের লালসা জন্মে না—তাহা না পাওয়ায় কষ্ট হয় না। তাহাদিগের কেবল স্বাভাবিক নিত্যনৈমিত্তিক পদার্থের প্রয়োজন হয়, তল্লাভার্থে চেষ্টা করে, সেই চেষ্টা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রায়ই সফল হয়। আর সেই অভাব নিরাকরণ প্রযুক্ত দুঃখ শান্তি হয়। তাহাকেই তাহারা সুখ মনে করে, অবশিষ্ট সময় তাহারা বিশ্রাম ও মনোমত ক্রীড়া সুখে অতিবাহন করে। সভ্যগণের সুখের সামগ্রী অনেক এবং তাহা পাইবার কারণ বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। সেই হেতু তাহারা বাল্য হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত দিবা রাত্রি ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতেছে, তাহাতে শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ হইতেছে এবং যে আমোদদায়ক পদার্থ পাইবার জন্য এই কঠোর তপস্যা করিয়া দেহ ও মন নষ্ট করিল, তাহা না পাইয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতেছে; প্রকৃত সুখের আস্বাদন তাহাদের অদৃষ্টে আদৌ ঘটে না। শুদ্ধ রোগ, শোক, নৈরাশ্য প্রভৃতির নিমিত্ত কষ্ট ভোগ করিতে করিতেই জীবন

যাপিত হয়। সভ্য সমাজে এই সকল দুরবস্থা দেখিয়া অনেকে অসভ্যতাকে প্রকৃত সুখকর মনে করিয়াছেন। এই জন্য গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিত কৃষি-জীবনের প্রশংসা করিয়াছেন; শিহ্লণ মিশ্র প্রভৃতি আর্য্য পণ্ডিতগণ মানব অপেক্ষা পশু জীবনের প্রশংসা করিয়াছেন।

যদ্বক্ত্রং মুহুরীক্ষসে ন ধনিনাং ব্রূষে ন
চাটুং মৃষা
নৈষাং গর্ব্বগিরঃ শৃণোষি ন পুনঃ
প্রত্যাশয়া ধাবসি।
কালে বালতৃণানি খাদসি সুখং নিদ্রাসি
নিদ্রাগমে,
তন্মে ব্রূহি কুরঙ্গ! কুত্র ভবতা কিন্নাম তপ্তং
তপঃ॥ —শান্তিশতক।

কিন্তু তাহা বলিয়া মানব সভ্য না হইয়া অসভ্যই থাকিবে, একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। সভ্যত্বই মানবের মানবত্ব এবং অসভ্যতাই মানবের পশুত্ব। পশুতে ও মানবে প্রভেদ এই যে, পশুরা কেবল প্রকৃতির অনুসরণ করে। তাহারা চিরকালই প্রকৃতির নির্দ্দেশ মত আহার, নিদ্রা ও স্ত্রীসম্ভোগাদি করিয়া কালযাপন করে। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পশুরা যে প্রকারে বিচরণ করিত, এখনও ঠিক সেইরূপ; তাহার অণুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মানবের সহিত তুলনা করিয়া দেখ, তাহাতে কত প্রভেদ হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার বৃটেনীয়দের সহিত এক্ষণকার বৃটেনদিগের তুলনায় পশু ও দেবতায় প্রভেদ লক্ষিত হইবে। সভ্যতাই ইহার হেতু। যদি সভ্যতা না হইত, তাহা হইলে পশুদিগের মত ইহারাও চিরকাল প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া এক রূপই থাকিত। তাহা হইলে পশুতে আর মানবে বৈলক্ষণ্য কি থাকিত? তাহা হইলে মানব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হইতে পারিত না। ঈশ্বর মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত সভ্যতা মানবের স্বাভাবিক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী। মানব জন্মিলে যেমন প্রথমে বাল্যকাল, তৎপরে যৌবন আপনা হইতেই আইসে, সমাজেরও সেইরূপ অসভ্য কালের পরে সভ্যকাল আসিবে। সমাজের পক্ষে অসভ্যাবস্থা শৈশব কাল এবং সভ্যাবস্থা যৌবন কাল। বাল্যকাল যেরূপ স্বভাবতঃ ক্রীড়া সুখের কাল, অসভ্য কাল সমাজের সেইরূপ স্বভাবতঃ সুখের কাল। যৌবন কাল যেরূপ মানবের চিন্তাজটিল কার্য্যকাল, সভ্যকালও সমাজের সেইরূপ সুখ-দুঃখমিশ্রিত উন্নতির কাল, যৌবন কালে মানবগণ নানাবিধ সুখ দুঃখে ব্যাপৃত থাকে, নানাবিধ চিন্তাকার্য্যের ভার আসিয়া পড়ে বলিয়া যদি চিরবাল্যের প্রার্থনা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সভ্য কালের নানা প্রকার কষ্ট দেখিয়া চির অসভ্য কালের কামনা যুক্তিসিদ্ধ হইত; কিন্তু চিরকালই বাল্য-ক্রীড়ায় ও পিতা মাতার হস্তাবলম্বনে প্রতিপালিত হইয়াই

যদি কাটাইতে হইল, তবে মনুষ্যের মানুষত্ব কোথায় থাকে? অতএব অসভ্যাবস্থার কামনা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে—সভ্যতা কখনও বিনা কারণে কেবল যত্ন দ্বারা আনা যাইতে পারে না। উহা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী আপনিই আসিয়া পড়ে। উহাকে বাধা দিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে উহা কখনও আসিত না। মানবের যত্ন করিয়া সভ্যতা আনার কোন কারণ নাই। কারণ, অসভ্য কালেও মানব জন্মিত, মরিত। এই সভ্যকালেও মানব জন্মে ও মরে; বরং এক্ষণে অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। সেই অসভ্যকালে মরিলে মানুষের যে গতি হইত, এই সভ্যকালে মরিলেও সেই গতি হয়। অধিকন্তু তখন সুখ ছিল, এখন ঠিক তদ্বিপরীত। এরূপ অবস্থায় কখনও অনায়াসলভ্য ফল মূল পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণকার শ্রমার্জ্জিত খাদ্যের যত্ন করা মানবের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ফল সমান অথচ বৃথা কষ্ট বাড়াইবার কারণ কি? পূর্ব্বে লোকে সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া আহারাদি করিত, কেন এক্ষণে আহারচিন্তায় জর্জ্জরিত হয়? অসভ্য জগৎ হইতে সভ্য-জগতের ভিন্নতা কেবল চাকচিক্য। মানব কি কেবল এই চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়া কষ্টকর সভ্যতা আনিয়াছে? কখনই নহে। প্রাকৃতিক অভাবই সভ্যতা আনয়নের নিদান। ক্ষুধা অর্থাৎ আহার করিবার ইচ্ছা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আহার না করিলে মানবের অত্যন্ত যাতনা হয় ও পরিশেষে মৃত্যু হয়। আদিমকালে ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য ফল-মূলাদি প্রাকৃতিক পদার্থ সকল ছিল, পিপাসা নিবারণের জন্য নদী প্রভৃতিতে জল ছিল। রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণ করিতে গিরিগুহা ও বৃক্ষলতা ছিল। ক্রমে যখন মানবের সংখ্যা বহুল হইয়া পড়িল, ঐ সকল প্রাকৃতিক ফলে সকলের কুলাইল না, তখন মানবের কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হইল, যখন নদীতীরে বাসস্থান ও খাদ্য সামগ্রী কুলাইল না, তখন অগত্যা তাহাকে পুষ্করিণী খনন করিয়া অন্যত্র বাস করিতে হইল, যখন গিরিগুহা প্রভৃতি হইতে রৌদ্র বৃষ্টি আদি নিবারণের উপায় হইল না, তখন কাযেই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইল। অভাব হওয়াতেই তাহা নিরাকরণের ইচ্ছা ও চেষ্টা হইল। বুদ্ধি বলে তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইল। এইরূপে অভাব মোচনের নিমিত্ত মানব প্রথমে সভ্যতার সৃষ্টি করিল, ক্রমে ঐ সকল কৃত্রিম পদার্থের ও সুখদ দ্রব্যের আস্বাদ পাইয়া উহা উৎপাদন করিল এবং ক্রমে, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, চাকুরি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য আরব্ধ হইল। বিজ্ঞান, দর্শন জ্যোতিষাদির গ্রন্থ প্রণীত হইল। সমাজের পূর্ণ যৌবন কাল হইল,—তখন মানব নাম সার্থক হইল, কিন্তু যেমন যৌবনের পরে বার্দ্ধক্য

ও তদন্তে মৃত্যু হয়, সমাজেরও সেইরূপ সভ্যতার পরে শান্তি ও তদন্তে ধ্বংস হয়। মানবের ন্যায় সমাজও চিরকাল থাকিবে না। পূর্ণ সভ্যতার পরে কিছু কাল সমাজ সুস্থির থাকে, তদানীং সমাজের আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না। তৎপরে আর সে সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও থাকে না। বৃদ্ধের অন্তে তাহার পুত্র যেরূপ তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করে, তদ্রূপ ঐ বৃদ্ধ সমাজের পরে আবার নূতন সমাজ, সভ্য হইতে থাকে। এই জন্য প্রাচীন সভ্যজাতি মিসর আসিরিয়া প্রভৃতির লোপ হইয়াছে এবং নবীন সভ্যজাতি ইয়ুরোপীয়েরা তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া এক্ষণে পৃথিবীর শোভা বিস্তার করিতেছেন; ভারত এক্ষণে জীবিত মাত্র আছে। এই সকল দেখিয়া অনেকে ভাবিতে পারেন, যখন সভ্যতা মানবের অবশ্যম্ভাবী এবং উহাতে যখন মানবের কষ্ট বৃদ্ধি হয়, তখন সভ্যতা মানবের বিড়ম্বনা। তদুত্তরে বক্তব্য যে, যৌবন কাল যদি মানবের বিড়ম্বনা হয়, তবে সভ্যতাও বিড়ম্বনা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সভ্য জাতির যে এত কষ্ট হইয়াছে, সভ্যতা নির্ব্বাচনের দোষই তাহার প্রধান কারণ। সভ্যতার লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া এমত অহিতকর বিষয় সকল সভ্যতা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে যে, কেবল তদ্দ্বারাই সভ্য-সমাজের এত দুর্গতি। যদি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ সহকারে সভ্যতা নির্ব্বাচন করা যায়, তাহা হইলে কখনই এত কষ্ট হইত না, এবং তাহা হইলে সমাজের দীর্ঘ-জীবী হওয়াও সম্ভব হইত। তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা ভারতীয় সভ্যতার উল্লেখ করিতে পারি। ভারতীয় সভ্যতার দোষের ভাগ অত্যল্প ছিল বলিয়া এই প্রাচীন ভারত ৭।৮ শত বৎসর ক্রমাগত অপরাপর যুবা শত্রুদিগের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়াও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। এখনও ভারতের নব উন্নতির আশা আছে। এই প্রাচীন শরীরেও উন্নতি সাধন করা যায়। ইহা কেবল ভারতীয় সভ্যতার উৎকৃষ্টতার হেতু। কিন্তু এক্ষণে ইয়ুরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করিয়া ভারতকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে; কিন্তু ধন্য ভারতীয় সভ্যতা! এখনও ইহা ইয়ুরোপীয় সভ্যতাকে পরাজয় করিবে, বোধ হয়। আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রস্তাবে প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ, ভারতীয় সভ্যতার গুণ ও ইয়ুরোপীয় সভ্যতার দোষ দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। যে সমস্ত কার্য্যে সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

চক্রবাক।

(চক্রবাকীর প্রতি।)

প্রাণবিহঙ্গিনী রে প্রিয় চক্রবাকি !
জগৎ অন্ধকারময় ;　　অন্ধ এ নয়নদ্বয়,
শুনিতে, বুঝিতে হায়, বেদন আমার
আছে কে ? আমি কি অন্ধ ? অন্ধ কি সংসার ?
বিধি—বিধিবিড়ম্বনে,　　দুই পারে দুই জনে,
মাঝারে তটিনী বহে, অকূলা নিরখি ;
কূল আছে, কিন্তু নাই ! কি হইবে থাকি ? (১)

নিরখিতে সাধ রে প্রিয়-বিহঙ্গিনি !
হেরি মাত্র একবার,　　প্রাণ কাঁদে বারংবার,
তাহাও দুর্লভ ফল ? বুঝেছি জগৎ !
যা যাহার প্রয়োজন, তাহাই মহৎ।
নিশি কাঁদে কমলিনী,　　দিবা কাঁদে কুমুদিনী,
নয়নে নিরখি মাত্র হাসিবে হাসিনী ; (২)

নৈদাঘ-গগনে রে দগ্ধ-চাতকিনি !
বিন্দুমাত্র বারি পান,　　তাহাতেই প্রাণদান ;
বারিদে বারিদে, চাহে মনসি পূরিয়া,
কত অনোক্ষত কাঁদে কত দগ্ধ-হিয়া ;
নিশি কাঁদে কমলিনী,　　দিবা কাঁদে কুমুদিনী,
একবার হেরি মাত্র হবে প্রমোদিনী ; (৩)

তমসে বিলীনা রে জীবন তোষিণী,
দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকার　　প্রপূরিত তমিস্রার
গভীর ভীষণ ঘোরে মগ্ন, একাকিনী ;
আশা তৃষাকুল প্রাণ,　　হৃদয় কুসুম ম্লান,
জীবন ! জীবন ! বলি, সকাতর ধ্বনি ; (৪)

মানসে কল্পনা রে ভাসিছে নলিনী,
নাহি স্ফুরে, নাহি হাসে, নাহি কিছু ভালবাসে,
নয়নে শিশির-ধারা ঢালিছে যামিনী ;
"পাঠায়েছি উষাদূতী, এখনো না হেরি জ্যোতি,
স্পর্শিবে কোমল করে কবে দিনমণি ?" (৫)

শ্রুতি ভরি পিব রে অমিয় বর্ষণ,—
মোহন মধুর ভাষা, মনে মাত্র এই আশা ;
কি হইবে ? কি সম্বন্ধে তাহাতে বন্ধন ?
পরিতাপ দগ্ধচিত্ত, করে তরপণ ? (৬)

জীবন, শীতলে রে ? জীবনদায়িনি !
ইহার উত্তর দিবে, কে আছে এ মর্ত্ত্যে, দিবে ?
বিজ্ঞান,—অজ্ঞান, কিন্তু প্রকৃতি ভাবিনী,
অঙ্গুলি হেলায়ে হাসে জগৎ মোহিনী, (৭)

কহে সুগম্ভীরে রে অলঙ্ঘ্য বচন,
পার্থিব ! কি কর ধ্যান ? নিষিদ্ধ, তোমার জ্ঞান,
প্রত্যক্ষ সীমার পার্শ্বে করিতে গমন ;
অনন্ত, অনন্তধাম, অনন্ত দর্শন ! (৮)

অই যে চুম্বিছে রে মধুপ, কমলে,
পরশনে আশানল, করিতেছে সুশীতল ?
ধক্ ধক্ জলে অই ভয়াল-অনল,
সুখেতে ? না দুঃখে ভাসি ? কাঁদিয়া ? না যায় হাসি ?
উহাতে পুড়িছে কেন পতঙ্গের দল ? (৯)

জীবন-যামিনী রে হলে অবসান,
এত সুখ, এত আশা, সংসারের ভালবাসা,
প্রেম, স্নেহ, অনুরাগ, মানসী পিপাসা,
কামনা, বাসনা, আশা, মায়া-মরীচিকা-আশা,
দুর্ব্বিষহ দুঃখ, নভঃ-কুসুম-কল্পনা। (১০)

প্রাণ চক্রবাকি লো! তবে কেন আর
তুর্ণকা প্রগাঢ়তম   শূন্যগর্ভ ভীমতম
পরিপূর্ণ, নভোমধ্যে ভুবন, আবার
তব মম মনঃ প্রাণ   যেন তাড়িত সমান,
পরস্পরে যোগাযোগ হয় বারংবার! (১১)

তাই ভাবিধনি লো। সকলি আকাশ।
নভসে কল্পিত ভব   নভসে বিচিত্র সব,
নভোময় মনঃপটে সুচিত্র প্রকাশ;
শূন্যময় আশা-ফাঁদ,   শূন্যময় তুমি চাঁদ,
শূন্যময়-সুধামৃত পানে সদা আশ! (১২)

শ্রীনিঃ—

যোগ।

যোগ শব্দে কোন্ কোন্ বিষয়কে বুঝায়, তৎসমুদায় লেখা অতীব দুরূহ; তথাপি সহজলভ্য যে গুলি—তাহাই লেখা যাইতেছে। অমরকোষ, মেদিনী, হেমচন্দ্র, ত্রিকাণ্ডশেষ প্রভৃতি অভিধানের মতে যোগ শব্দে সন্নহন, উপায়, ধ্যান, সঙ্গতি, যুক্তি, অপূর্ব্বার্থ সম্প্রাপ্তি, বপুঃস্থৈর্য্য, প্রয়োগ, বিষ্কম্ভাদি; ভেষজ, বিস্রব্ধঘাতক, দ্রব্য. কার্ম্মণ, ধন, চার, সূত্র ইত্যাদি।

জ্যোতিষমতে বিষ্কম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের নাম এই:—বিষ্কম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্ম্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক, ব্যতীপাত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সিদ্ধ, সাধ্য, শুভ, শুক্ল. ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বৈধৃতি। এতদ্ব্যতীত জ্যোতিষমতে আরও বহুবিধ যোগ আছে। যথা অমৃতযোগ, সিদ্ধিযোগ, ত্রিযোগ, মৃত্যুযোগ, রাজসংযোগ যোগ, সিদ্ধি,দগ্ধ.পাপ, যম ঘণ্টযোগ,উৎপটাদি যোগ, করকচা যোগ, ইত্যাদি। বহ্নি পুরাণোক্ত ক্রিয়াযোগস্থলে মুনিগণ বলিতেছেন:—

দুঃখাম্বুমগ্নাঃ পুরুষাঃ
প্রাপ্য ব্রহ্ম মহালয়ং।
উত্তরেয়ুর্ভবাম্ভোধিং
তথাহনমুচিন্তয়॥
ইত্যুক্তঃ স তদা প্রাহ
ক্রিয়াযোগং মহাত্মনাং।
নরাণামুপকারায়
দুঃখবিচ্ছিত্তি কারকং॥

বহ্নিরুবাচ।

আরাধয়ধ্বং বিশ্বেশং
জগতাং কারণং পরং।
কেশবস্তুনিরাপেক্ষা
এবমুক্তং প্রবাসাৎ॥
ইষ্ট্যা পূজানমস্কারৈঃ
শুশ্রূষাভিরহর্নিশং।
ব্রতোপবাসৈর্বিবিধৈ-
র্ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণৈঃ॥
তৈস্তৈশ্চাশ্মচিতৈঃ কামৈ-
র্যেম্বচেতসি তুষ্টিদাঃ।
ভবেয়ুরপরিচ্ছেদা-
দারাধয়ত কেশবং॥
ভক্তিচ্ছান্তদগতধিয়-
স্তৎকর্ম্মাণস্তদাশ্রয়াঃ।
তদ্দৃষ্টয়স্তন্মনসঃ
সর্ব্বস্মিন্ স ইতি স্থিতঃ॥
সমস্তান্যথ কর্ম্মাণি
তত্র সর্ব্বাত্মনাত্মনি।
সংন্যস্যধ্বং ন বঃকর্ত্তা
সমস্তাবরণক্ষয়ঃ॥
পরঃ পরাণাং পরমঃসএকো
নরোত্তমা যস্য পদং নন্তিরং।
চরাচরং বিশ্বমিদং সমস্তা
দচিন্ত্যরূপস্বপরিগ্রহং যৎ॥
তমারাধ্য জগন্নাথং
ক্রিয়াযোগেন বাড়বাঃ।
অগ্নৌ মোক্ষং পরং জগ্মু-
স্তস্মাত্তন্মোক্ষকারণং॥
সংসারার্ণবমগ্নানাং
বিষয়াক্রান্তচেতসাং।
বিষ্ণু পোতং বিনা নান্যৎ
কিঞ্চিদস্তি পারায়ণং।
উত্তিষ্ঠংশ্চিন্তয় হরিং
ব্রজংশ্চিন্তয় কেশবং।
ভুঞ্জংশ্চিন্তয় গোবিন্দং
স্বপংশ্চিন্তয় মাধবং॥
যূয়মেকাগ্রচিত্তা হি
সংস্তুত্য মধুসূদনং।
জন্ম-মৃত্যু -জরা-গ্রাহং
সংসারং সন্তরিষ্যাথ॥
ক্রিয়াযোগপরাণীহ
মুক্তিকার্য্যান্যনেকশঃ।
সমারাধ্য জগন্নাথং
রাজানো মোক্ষমাপ্নুঃ॥

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

নাস্তিকতা।

*প্রথম প্রস্তাবের পুনরালোচনা।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি, অভাব পক্ষের প্রমাণ চাই না, ভাব-পক্ষেরই প্রমাণ আবশ্যক। এ কথা বলিয়া আবার আমাদিগের দশ পাত্তা

* আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত সকল মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি। ইহাতে সর্ব্ববিধ মতামতই প্রকাশিত হইতে পারে। মতামত প্রকাশ বিষয়ে আর্য্যদর্শন স্বাধীন ও অনুদার।

জল্পনা করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? ইহার আবশ্যকতা এই যে, আস্তিকেরা বলিতে পারেন যে, আমরা ত ঈশ্বর কি তাহা বলিয়াছি এবং সেই ঈশ্বরের সদ্ভাব পক্ষে প্রমাণ দিয়াছি, তবে আর কেন বল, যে ঈশ্বর নাই। যখন ভাবপক্ষ প্রমাণিত হইয়াছে, তখন অবশ্য অভাব-পক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে। এখন কথা এই. আস্তিকেরা যে ভাবপক্ষ দিয়াছেন, তাহা যদি প্রামাণ্য ও সত্য হয়, তবে অবশ্য অভাবপক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে; নহিলে নহে। সেই ভাবপক্ষের সম্পূর্ণ খণ্ডন সাধিত না হইলে, অভাবপক্ষ কখন দাঁড়াইতে পারে না। সেই ভাব-পক্ষ খণ্ডন করা আবশ্যক হওয়াতে, তাহার বিচার সূচিত হইয়াছে।

এ কথা আর একটু পরিষ্কার করিয়া দিই। মনে করুন, শ্যামের ঘরে রাম প্রবেশ করিয়া বলিলেন, এ ঘরে কি ছাতি আছে? শ্যাম বলিলেন, না। রাম তৎক্ষণে এক খানি বই দেখাইয়া বলিলেন, এই যে ছাতি, তবে তুমি ছাতি নাই বলিলে কেন? এস্থলে বইকে বই বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেওয়া কি শ্যামের আবশ্যক হইল না? সেই বই যে ছাতি নহে, রামকে এরূপ বুঝাইতে পারিলে, তবে শ্যামের কথা সত্য হইবে। তদ্রূপ আস্তিকেরা যাহাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তাহা যে বাস্তবিক ঈশ্বর নহেন এবং তাঁহাদিগের ঈশ্বররূপ স্বতন্ত্র পদার্থ সম্ভবিতে পারে না, এইরূপ প্রমাণ করা আপাততঃ নাস্তিকদিগের আবশ্যক হই-য়াছে। আস্তিকদিগের ভ্রান্তি নিরাকৃত না হইলে, নাস্তিকদের অভাবপক্ষ সম-র্থিত হইতে পারে না। নাস্তিকেরা দেখাইয়া দিবেন যে, আস্তিকেরা যাহা ঈশ্বর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা কতিপয় মানসিক ভাব মাত্র। সেই মানসিক ভাবাশ্রিত যে কোন অলৌ-কিক স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, এমত প্রমাণিত হয় না। আমরা দেখি,—রাম, শ্যাম ও গোপাল প্রভৃতির জ্ঞান ও দয়াদি মান-সিক গুণ আছে। যদি আস্তিকদিগের ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি ঐ রাম, শ্যাম ও গোপালেরই ন্যায় এক জন পুরুষ। সেই ঈশ্বর উহাদিগের অপেক্ষা অধিক-তর বুদ্ধিমান্. জ্ঞানবান্, অথবা দয়াবান্ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে মনুষ্য ব্যতীত অন্য স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন, তাহা স্থির। তিনি যদি মনুষ্যবৎ হইলেন, তবে তিনি আর এক জন অদ্ভুতক্ষমতা-শালী ব্যক্তি মাত্র। সুতরাং তিনি

ইহাতে লেখকগণের পরস্পরবিরোধী প্রস্তাব প্রকটিত হয় আমরা নাস্তিকতার সঙ্গে আস্তিগণের যোগক্রমও প্রকাশিত করিতেছি। আবার কেহ যদি আস্তিকতা আপন পক্ষে লেখেন, তাঁহার প্রস্তাবও সাদরে প্রকাশিত হইবে। আস্তিকতার বিরুদ্ধে কপিলগণ কত প্রকার পূর্বপক্ষ দেখাইতে পারেন, তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা নাস্তিকতার প্রস্তাব প্রকটিত করিতেছি। এই সমস্ত পূর্বপক্ষ খণ্ডিত হইলে আস্তিকতা আরও সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবে। সং।

প্রাকৃতিক পদার্থ, তিনি প্রকৃতি অতীত এক স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন। অতএব প্রকৃতি-অতীত তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এইরূপই প্রতীত হইল।

আস্তিকেরা বলেন যে, আমাদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান কতকগুলি মানসিক ভাব বটে, কিন্তু তাঁহার নিজ অস্তিত্ব সাধন জন্যই তিনি সেই সমস্ত ভাব মানব মনে প্রদান করিয়াছেন। সেই জন্য অবশ্য বলিতে হইবে, এই সমস্ত ভাব ঈশ্বরসত্তা প্রমাণিত করিতেছে। এ তর্কে যে যাহার সাধ্য, সেই তাহার সাধক। এই সমস্ত ভাব ঈশ্বরের সাধক, এবং ঈশ্বরও এই সমস্ত ভাবের সাধক। এরূপ তর্ক যুক্তির আভাস-মাত্র, প্রকৃত যুক্তি নহে। ইহা ন্যায়ের ফাকি। ঈশ্বর এই সমস্ত মানসিক ভাবের প্রমাণ, এবং এই সমস্ত মানসিক ভাবের প্রমাণ ঈশ্বর। গোপালের সাক্ষী যদি রাম হয় এবং রামের সাক্ষী যদি গোপাল হয়, সে স্থলে বিচারকর্ত্তা কি কিছু মীমাংসা করিতে পারেন?

আমরা প্রথম প্রস্তাবে কি জন্য যে আস্তিক-প্রথিত ভাবপক্ষের বিচার করিয়াছি, তাহা বোধ হয় প্রতিপন্ন হইল। আমরা সেই প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, ঈশ্বর-রূপ কোন অলৌকিক স্বতন্ত্র পদার্থ বিদ্যমান নাই। ঈশ্বররূপ যদি স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, ঈশ্বর নাই। এখন আস্তিকেরা দেখান যে, ঈশ্বররূপ স্বতন্ত্র পদার্থ আছে। তাহাদিগের পক্ষ এইরূপে খণ্ডিত হইয়াছে:—

(১) আমরা প্রথমে দেখাইয়াছি যে, যদি জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিই ঈশ্বরের গুণ হয়, তবে তিনি মনুষ্যবৎ প্রাকৃতিক পদার্থ, প্রকৃতি-অতীত স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন। সুতরাং এক অলৌকিক স্বতন্ত্র পুরুষসত্তা সম্ভাবিত নহে।

(২) আস্তিকেরা বলেন, সৃষ্টি-শক্তি থাকাতে, ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়াছেন। এ স্থলে প্রকৃতিতে সৃষ্টি-শক্তি আরোপ করিলে, যে ব্যাঘাত ঘটে, সেই ব্যাঘাত নিবারণ করিবার জন্য, সেই শক্তি এক জন প্রকৃতি-অতীত স্বতন্ত্র পুরুষে আরোপ করা হইয়াছে। আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, এরূপ করাতেও সে ব্যাঘাতের নিরাকরণ হয় না। যে অসঙ্গতিদোষ প্রকৃতিতে ঘটে, অলৌকিক ঈশ্বরেও সেই অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়া উঠে। তখন বিচার করিতে হইবে, এই সৃষ্টি-শক্তি প্রকৃতি কি অলৌকিক ঈশ্বরে, অধিকতর সম্ভবনীয়?

(ক) আমরা গুণ দেখিয়াই পদার্থের বিচার করিয়া থাকি। প্রকৃত-পদার্থতত্ত্ব মানবের জ্ঞানগোচর নহে। শুদ্ধ পদার্থের গুণ-সমস্তই মানবের উপলব্ধিতে আইসে। সুতরাং প্রকৃতির পদার্থ কি, তাহা আমরা জানি না। সেই প্রকৃতিপদার্থের কতিপয় গুণ মাত্র আমাদিগের জ্ঞানগ্রাহ্য হয়। যে সমস্ত গুণ অথবা শক্তি আমরা জানিতে পারিয়াছি, তদ্ব্যতীত সেই প্রকৃতি-পদার্থে যে, অন্য গুণ নাই, এমত নহে। তবে সে সমস্ত গুণ আমা-

ষের জানিবার শক্তি নাই। সৃষ্টি-শক্তি এমত এক গুণ, যাহা মানবের জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না। মানব-মন সৃষ্টি-শক্তির কিছুই জানিতে পারে না। যাহার সৃষ্টি-শক্তি আছে, কেবল সেই বুঝিতে পারে, সৃষ্টি-শক্তি কি প্রকার। অতএব কোন পদার্থে সৃষ্টি-শক্তি আছে কি না, তাহা জানিবার শক্তি মানুষের নাই। প্রকৃতি-পদার্থে যে সেই শক্তি নাই, মানব এমত কথা বলিতে পারেন না। বরং সেই শক্তি প্রকৃতিতে থাকিবারই অনেক সম্ভাবনা আছে। তাহার কারণ এই :—

(খ) আস্তিকেরা বলেন যে, সৃষ্টি-ব্যাপারে যে জ্ঞান, দয়া ও শক্তির পরিচয় হয়, ঈশ্বরে সেই সকল গুণ অবশ্য আছে। তবে আস্তিকদের যুক্তি এই, কার্য্য-পদার্থে যাহার পরিচয় আছে, কারণ-পদার্থে তাহা বিদ্যমান আছে। ভূতত্ত্ব-বিদ্যা প্রমাণিত করে যে, জড়জগতের পর শম্বুক মৎস্যাদির সৃষ্টি এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদ্ ও মনুষ্য-লোকের সমুদ্ভব হইয়াছে। এই জগৎ-নির্ম্মাণকেই সৃষ্টি-ব্যাপার বলে। এই জগতের আদিতে কেবল পরমাণুপুঞ্জই বিদ্যমান ছিল। যেহেতু, সেই পরমাণুপুঞ্জ হইতেই সমুদায় সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই পরমাণু-পুঞ্জ অনাদি। মানব তাহার আদি জানে না। এই জগতে যে সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় আছে, আস্তিকদিগের যুক্তি-অনুসারে সেই শক্তি এই অনাদি পরমাণু-পুঞ্জরূপ কারণে অবশ্য বিদ্যমান আছে, বলিতে হইবে। সেই শক্তি ঐ পদার্থে বিদ্যমান থাকিবার যত সম্ভাবনা, তদতীত পদার্থে থাকিবার সম্ভাবনা তত দূর নহে।

(গ) যখন বিজ্ঞান আলোচনা অধিক ছিল না, তখন মানব, জড়জগতের প্রকৃতি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে অশক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিল; এবং তদ্রূপ স্থির করিয়া তাহার নাম জড় রাখিয়াছিল। যখন ইহাকে অশক্ত বলিয়াছিল, তখন তাহাকে শক্ত করিবার জন্য কোন অলৌকিক শক্তি কল্পনার আবশ্যকতা হইয়াছিল। সুতরাং ঈশ্বর কল্পিত হইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, জড় বহুপ্রকার শক্তি পুঞ্জের আধার। এখন এই জড়কে অশক্ত বলা আর একটী ভাল কুকুরকে পাগল বলিয়া তাহাকে বধ করা সমান কথা। যদি বল, সৃষ্টি ব্যাপারে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কি জড়ে আছে? একথার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলি যে, যখন আমরা প্রমাণ পাইতেছি যে, পরমাণুপুঞ্জের পরিণাম জড়জগৎ, জড়জগতের পরিণাম চেতন জগৎ, এবং চেতন জগতের সর্ব্বশেষ পরিণাম মনবিশিষ্ট মানব-লোক,—তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, প্রকৃতিতে সেই চেতন-শক্তি থাকিবার যত দূর সম্ভাবনা অন্যত্র তত দূর নাই। প্রকৃতি তোমার জন্য অবশ্য অট্টালিকা, ঘট ও কল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবে না বটে, কিন্তু

প্রকৃতির যাহা প্রয়োজন, তৎসমুদায়ই প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে স্বয়ং সৃষ্টি করিতেছে। চেতন পদার্থ কি, তাহা আমরা জানি না বটে, কিন্তু প্রকৃতিতে সেই চেতনশক্তির বীজ নিহিত থাকিবার সম্ভাবনা যদি না থাকে, তবে অন্যত্র তাহার সম্ভাবনা কিছুই নাই। এপক্ষে যত দূর প্রমাণ আবশ্যক ততদূর নাই বটে, কিন্তু যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট; অন্য পক্ষে তত দূরও নাই।

(খ) প্রকৃতিতে যদি সৃষ্টিশক্তি ও জ্ঞান অধিকতর সম্ভনীয় হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, তদতীত কোন অলৌকিক সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পুরুষ-সত্তার কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। আস্তিকদের প্রতিজ্ঞা এই যে, যিনি এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর। শুদ্ধ এই প্রতিজ্ঞানুসারে প্রকৃতি-অতীত, অলৌকিক সৃষ্টিকর্ত্তার স্বতন্ত্র পদার্থসত্তা প্রমাণিত হয় না। কারণ, সেই সৃষ্টিশক্তি প্রকৃতিতে নিহিত থাকিতে পারে। সুতরাং শুদ্ধ পদার্থবিচার করিলে প্রতিপন্ন হয় যে :—

(অ) প্রকৃতির অতীত, স্বতন্ত্র অলৌকিক ঈশ্বর-পদার্থ নাই।

(আ) যখন স্বতন্ত্র ঈশ্বর পদার্থ নাই, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর নাই, এরূপ প্রমাণ আছে। "তদভাবা বেদকপ্রমাণসম্ভবাৎ" নাস্তিকগণের এই বিপ্রতিপত্তি খণ্ডিত হয় নাই। উদয়ন পদার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি শুদ্ধ উপলব্ধির তর্ক আনিয়া পদার্থ-বিচার হইতে নিষ্কৃতি লইয়াছেন, এবং ঈশ্বর-অস্তিত্ব-প্রমাণ অনুমানের উপরে প্রক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা অনুমান-তর্কে তাহার পক্ষ খণ্ডন করিব। এক্ষণে উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

১

প্রকৃতিপদার্থ বাস্তবিক বিদ্যমান আছে।
ঈশ্বর-পদার্থ বাস্তবিক বিদ্যমান নাই।

২

প্রকৃতির অনাদিত্ব জ্ঞাত।
ঈশ্বরের অনাদিত্ব কাল্পনিক।

৩

প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে।
ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি অযৌক্তিক।

এখন কথা এই, প্রকৃতি যখন প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ অনাদি পদার্থ এবং যখন সেই প্রকৃতি-নিহিত সৃষ্টিশক্তির সদ্ভাব অসম্ভাবিত নহে, তখন সেই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারি কই? যে প্রকৃতিকে, আমরা আদি-বিশিষ্ট বলিতে পারি না, সে প্রকৃতির আবার অতীত স্বতন্ত্র 'আদি' কিরূপে সম্ভাবিত? অতএব অবশ্য বলিতে হইবে :—

প্রকৃতি-অতীত স্বতন্ত্র ঈশ্বরসত্তা বিদ্যমান নাই।

কপিঞ্জল।

সামুয়েল্ হানিমানের জীবনী।*

এদেশীয়গণ আজি কালি ইতিহাস ও জীবনচরিতের মাহাত্ম্য ও উপকারিতা বুঝিতে পারিতেছেন। ইতিহাস-পাঠের কত সুফল—মহাত্মাগণের জীবন-চরিত পর্য্যালোচনায় কত দূর উপকার পাওয়া যায়, ইয়োরোপীয়গণ তাহা বিশেষরূপে বিদিত আছেন; সেই জন্যই ইতিহাসে তাঁহাদের এত যত্ন এবং জীবন-চরিত-রক্ষণে এত আগ্রহ। মানব-জাতির কিসে উন্নতি এবং কিসে অবনতি,—কিরূপ কার্য্যপ্রণালী দ্বারা সমাজ উন্নত, দৃঢ়, পুষ্ট ও সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হয়,—কিরূপে জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, কিরূপে তাহা রক্ষা করিতে পারা যায় এবং কিসের অভাবে তাহা অবসন্ন হইয়া পড়ে—ইতিহাস এবং জীবনচরিত যত বিশদরূপে বুঝাইয়া দেয়, আর কিছুতেই সেরূপ পারে না। ফলতঃ জাতিগত এবং ব্যক্তিগত অভ্যুত্থান কি প্রকারে লাভ করিতে পারা যায়, ইতিহাস এবং জীবন-চরিতই সে বিষয়ের একমাত্র শিক্ষাদাতা। ইয়োরোপীয়গণ তাহা জানেন বলিয়াই, ইহাদের এত অধিক আদর করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ গ্রন্থের বহুলতাই সেই আদর প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। আবার এক খানি পুস্তকের অবয়ব দেখিলেও, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইতিহাস গ্রন্থের বাহুল্য এবং বৃহত্ত্বই তাঁহাদের আদরের ও যত্নের শুধু প্রমাণ নহে; বাস্তবিকই ইতিহাসে তাঁহাদের আন্তরিক ভক্তি আছে।

কিন্তু ভারতবাসিগণের রুচি অন্য প্রকার। ইতিহাসে ইঁহাদের কিছুমাত্র আস্থা দেখা যায় না। ইংরাজগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশ-সম্বন্ধে শত শত সুবৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু দেশীয় ভাষায় এ পর্য্যন্ত এক খানিও রীতিমত ইতিহাস প্রচারিত হইতে দেখা গেল না। ইহার কারণ কি? হয় এতদ্দেশীয়গণ ইতিহাসের ফলোপধায়কতা সম্যক্ বুঝিতে পারেন না; নতুবা অর্থ ও যশোলাভ-পক্ষে সন্দেহ করেন, কিংবা অনাবশ্যক বোধে—অথবা কাহার কাহার মতে অন্য কোন গূঢ় কারণ বশতঃ—এরূপ গ্রন্থ-সংরচনে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু শ্রমবিমুখতা এবং অনুসন্ধিৎসার অভাবই ইহার প্রকৃত কারণ। বিদেশের ইতিহাস-গ্রহণে ভিন্নদেশীয়গণের যত ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা, দেশীয়গণের তত দূর

* হোমিওপ্যাথি-আবিষ্কর্ত্তা মহোপাধ্যায় সামুয়েল্ হানিমানের জীবনী ও তৎ-প্রণীত গ্রন্থাবলীর বিবরণ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত।

না হইবারই কথা; এই হেতু কোন দেশের ইতিহাস, তদ্দেশবাসী দ্বারা লিখিত হইলেই, ভাল হয়; এবং এই জন্যই বলি, ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতবাসী দ্বারা লিখিত হইলে, যত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অন্ততঃ এদেশীয়গণের নিকটে তাহা যত দূর শ্রদ্ধেয়, বিশ্বাসযোগ্য ও সাদরে গৃহীত হইবে, প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেশীয়ের লেখনীনিঃসৃত গ্রন্থে তত দূর হইবার অল্পই সম্ভাবনা। এইরূপ দেশীয় সাধারণের পরম সমাদরণীয় ও পরম প্রয়োজনীয় পদার্থ সঙ্কলনে যে কেহ যত্নবান্ হইবেন, তিনিই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন ও প্রশংসার যোগ্যপাত্র। পূর্ব্বতন ভারতবাসিগণের ইতিহাস গ্রন্থ না থাকাতে, কত আবশ্যক বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে আমাদিগকে শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িগণ বিশেষরূপ জানেন। সে সকল স্থলে তাঁহাদের ক্ষোভের সীমা থাকে না। কিন্তু বড় আহ্লাদের বিষয় যে, আজি কালি ইংরাজি-শিক্ষার বলে ইতিহাস ও জীবনচরিতের পথে ভ্রমণ করিতে এতদ্দেশবাসিগণের অনুরাগ ক্রমে ক্রমে সঞ্চাত হইতেছে। সেই অনুরাগের বলে আজি কালি দুই এক খানি ইতিহাস ও জীবনবৃত্ত বঙ্গভাষায় পরিদৃষ্ট হইতেছে; এবং তাহারই অন্যতম ফল—আজিকার এই সমালোচ্য গ্রন্থ খানি।

মহাত্মা হানিমান সদৃশ ব্যবস্থার প্রচার (হোমিওপ্যাথির) আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া জগতের যে মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য সহৃদয় মনুষ্যমাত্রেই তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। এইরূপ চিরস্মরণীয় ও মহোপকারকের সম্পূর্ণ জীবনী জানিতে অধিকাংশ লোকের কৌতূহল থাকিবার সম্ভাবনা; কিন্তু দেশীয় কিংবা ইংরাজি ভাষায় সেরূপ গ্রন্থ এক খানিও না থাকাতে, আমাদের সে কৌতূহল নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইত। আজি মহেন্দ্র বাবুর অনুরাগে সে আগ্রহ চরিতার্থ হইল। বঙ্গভাষাও আজি একটি নূতন ধনে ধনী হইল। বিশেষতঃ এরূপ ধন বঙ্গীয় সাহিত্যে অল্পই আছে। কেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইতিহাস ও জীবনচরিতের আমাদের অনেক অভাব।

যখন এতদ্দেশে প্রথমে হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসার কথা উত্থাপিত হয়, অনেকে ইহার প্রবর্ত্তয়িতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত ও মহেন্দ্রলাল সরকারকে বাতুল ভাবিয়াছিলেন। মৌলিক ঔষধকে শত বা দুই শত ডাইলুশান্ করিয়া তাহার বিন্দুমাত্রে সমূহ পীড়ায় কি উপকার দর্শিবে, তাহা ভাবিয়া তোলপ্রমাণ-ঔষধ-প্রযোক্তা ডাক্তারগণ আকুল হইয়াছিলেন। তাহা যে ঔষধস্বরূপে পরিগণিত হইতে পারে, ইহাও কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। পরে যখন সেইরূপ বিন্দুমাত্র ঔষধ বিসূচিকা-রাজ্যে অদ্ভুত বল প্রয়োগ

করিতে লাগিল, তখন ব্যাধিপ্রশমনে ইহার মোহিনী শক্তি দেখিয়া বহু মোহিত হইল; অবিশ্বাসী অন্তঃকরণে অল্পে অল্পে বিশ্বাস সঞ্চারিত হইতে লাগিল। ঔষধ-চিকিৎসাপ্রচারের যখন নাম-গন্ধও বিদ্যমান ছিল না, তখন মহাত্মা হানিমান্ তাহার আবিষ্কার করিয়া তৎপ্রচারে উদ্যত হওয়াতে, তাঁহাকে যে কত দূর বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। এখনও হোমিওপ্যাথির কৈশোরাবস্থা; বিশেষতঃ এতদ্দেশে এখনও ইহার বাল্যকাল। এই বাল্যকালেই বিসূচিকা, উদরাময়, স্ফোটক, পীড়কা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ, শিশুগণের পীড়া এবং কোন কোন পুরাতন রোগোপশমনে ইহার যেরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, জগতের কত দূর উপকার সাধনে যে সক্ষম হইবে, তাহা ভাবিলেও চিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

হানিমান্ যে সত্য জগৎকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। তাঁহার প্রখর মস্তিষ্ক ভিন্ন আর কেহ সে সত্য আবিষ্কার করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার প্রতিভা অলোক-সামান্য। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অল্প বয়সেই, "তাঁহার পিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া সাংসারিক ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থে, তাঁহাকে অর্থকরী বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিতে বাধ্য হইলেন," কিন্তু হানিমান্ তাহাতে বিদ্যাশিক্ষা হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। যখন বাটীর সকলে নিদ্রার সর্ব্বসন্তাপহারী ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিত, তখন তিনি উঠিয়া একাগ্রচিত্তে পাঠাভ্যাস করিতেন। পাছে কেহ জানিতে পারে, এই ভয়ে, বাটীর ব্যবহৃত দীপাধার না লইয়া স্বহস্তনির্ম্মিত মৃন্ময় প্রদীপাধারেই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এইরূপে রজনীতে পঠন-কার্য্য নির্ব্বাহার্থে হানিমান্ স্বীয় মাতার নিকট হইতে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তৈল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। মহেন্দ্র বাবু সত্যই লিখিয়াছেন "আহা, প্রগাঢ় অভিনিবেশের কি চমৎকার মহিমা! হানিমানের এই একাগ্রতায় কি এই প্রমাণিত হইতেছে না যে, ইচ্ছা থাকিলে, অনন্ত অন্তরায়ের মধ্য দিয়াও মানুষ অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারে? পিতার অনভিমতে ও অগোচরে অধ্যয়নে নিবিষ্টমনা থাকিতেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কদাচ পিতার অবাধ্য হন নাই। আত্মোন্নতি এবং গুরুজনের অনুজ্ঞাপালন, দুই-ই কর্ত্তব্য; দুয়েরই অকরণে প্রত্যবায়। উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, হানিমান্ বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।" *

সেই সময় হইতেই আর একটি মহাজনোচিত গুণ হানিমানের চিত্তে প্রবল

* সমালোচ্য পুস্তক ৩পৃষ্ঠা।

ভাবে বিরাজিত ছিল। তিনি যে কিছু খ্যাতি, মহত্ত্ব, চিরস্মরণীয়তাদি বিষয়ে খ্যাতি লাভ করেন, সেই সমস্তই তাঁহার সেই গুণের ফল। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যখন লিপ্‌জিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষার্থে গমন করেন, তখন হইতেই অনুসন্ধিৎসা তাঁহার মনে প্রবল হয়। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, এখানে "শিক্ষার উপদেশে আমি কেবল পাঠানুশীলন করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া নিবৃত্ত থাকিতাম না। প্রতি বিষয় সম্বন্ধে ও সাবধানতা সহকারে অনুসন্ধান করিতাম।"† উত্তর-কালে চিকিৎসা রাজ্যে তিনি যে এক যুগান্তর আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, পূর্ব্বজীবনের এইরূপ অধ্যয়ন, দৃঢ় উদ্যম, প্রবল কার্য্যানুরাগ ও অনুসন্ধিৎসাই তাহার প্রধান কারণ। যদি তিনি শুষ্ক জ্ঞান-জগতে আবদ্ধ থাকিয়াই, নিশ্চিন্ত হইতেন, যদি কার্য্যক্ষেত্রে স্বয়ং অগ্রসর না হইতেন, যদি প্রতি বিষয় সতর্কতা সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা না জন্মিত, তবে তাঁহার গৌরব-পতাকা আজ এমন সুখময় ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে উড্ডীয়মান হইত না; তবে তাঁহার মাহাত্ম্য আজ সর্ব্বদেশে সর্ব্বজন কর্ত্তৃক এমন আনন্দ-স্বরে কীর্ত্তিত হইত না। পৌনঃপুনিক বৈফল্যেও নিরস্ত না হইয়া ক্রমাগত রোগ এবং ঔষধের গুণ ও কার্য্যাদির পরীক্ষণে নিযুক্ত থাকিয়া, অবশেষে বুঝিলেন, "Similia Similibus Curentur" যে ঔষধে যে রোগের উৎপত্তি, সেই ঔষধেই সেই রোগের নিবৃত্তি। তিনি যেরূপ অক্লান্ত উদ্যমে ভর করিয়া কার্য্যজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। কথিত আছে, তিনি স্বীয় দেহেই শতাধিক ঔষধের গুণ ও কার্য্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যখন এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি মত প্রচার ও সেই প্রথা-মতে পীড়িত লোক সমূহকে আরোগ্য করিতে লাগিলেন, তখন কত এ্যালো-প্যাথি চিকিৎসা-প্রিয় ও এ্যালোপ্যাথি-মতানুবর্ত্তী ভ্রমান্ধ ব্যক্তি যে তাঁহার প্রবল শত্রু হইয়া উঠে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু হানিমান্ তাহাতে কিছু-মাত্রও ভীত হয়েন নাই। যাঁহার হৃদয় এক বার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সত্যের বিমলানন্দ যাঁহার চিত্তে নিরন্তর পুলক-মদিরা ঢালিয়াছে, সফলতার অতুল উৎসাহ যাঁহার অন্তরকে সতত উৎফুল্ল করিয়াছে, তিনি কেন মোহ-মাপাক্ষ হীনচেতা ব্যক্তিগণের বৈরিতাচরণে উদ্বেজিত হইয়া সে আনন্দ ও সে সুধারস পরিত্যাগ করিবেন? তিনি কেন আলোক পরিত্যাগ করিয়া পেচক ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন? চারি দিক হইতে অসংখ্য বিপক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি কেবল সত্যকে লক্ষ্য করিয়া জগতের এবং সেই সঙ্গে সেই বিপক্ষদলেরও মঙ্গলব্রত

† সমালোচ্য পুস্তক—১১ পৃষ্ঠা।

সাধনেই নিরন্তর রত রহিলেন। কিছুতেই তিনি হীনোদ্যম হইলেন না—কিছুতেই তাঁহাকে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাইতে পারিল না। তাঁহার তত দূর দৃঢ় যত্ন, ঐকান্তিক ইচ্ছা, প্রবল উৎসাহ ও প্রশংসনীয় কার্য্যদক্ষতা না থাকিলে, হোমিওপ্যাথি যে আজ কোথায় পড়িয়া থাকিত, তাহার স্থিরতা নাই। তাহা হইলে অসীম, অনন্ত, অতলস্পর্শ জ্ঞান-সাগরের কোন্ গভীরতায় যে আজ সদৃশব্যবস্থা প্রথা নাস্ত থাকিত, তাহা কে বলিতে পারে?

হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা না হইলেও, হানিমান্ যেরূপ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার যেরূপ উদার চরিত্র, উন্নত চিত্ত, কর্ত্তব্যসাধনে যেরূপ অধ্যবসায় এবং পরোপকারে যেরূপ আন্তরিক যত্ন—তাহাতেও তাঁহার জীবনী আমাদের একটী জ্ঞাতব্য বিষয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি সাধন এবং জগতের হিত-ব্রত পালনের জন্য তিনি যেরূপ কষ্ট ও বিপদ সমূহ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। আন্তরিক যত্ন থাকিলে, কিরূপে নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়, হানিমানের জীবন, তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

এই জন্যই "হানিমানের জীবনী" আমাদের একটি প্রিয় পদার্থ; বিশেষতঃ সদৃশ ব্যবস্থা প্রণালুবর্ত্তিগণের নিকটে ইহা যে পরম সমাদরে গৃহীত হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই। ইহা শুদ্ধ হানিমানের জীবনবৃত্ত মাত্রই নহে। হোমিওপ্যাথির উৎপত্তিও বড় পরিস্ফুট ভাবে ও প্রকৃষ্টরূপে ইহাতে অনুচিত্রিত এবং দুই চারিটী হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বও সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। জ্বরকালীন কুইনাইন্ সেবনে জ্বর ত্যাগ হয়,—কিন্তু সুস্থাবস্থায় সেই কুইনাইন-সেবনেই জ্বরে আক্রান্ত হইতে হয়; সহজাবস্থায় ধুস্তুর ভক্ষণে উন্মত্ততা আনয়ন করে,—কিন্তু উন্মত্তের প্রতি সেই ধুস্তুর প্রয়োগে তাহার ক্ষিপ্ততা বিদূরিত হয়, এইরূপ সত্যগুলি পাঠ করিতে সাধারণ পাঠকগণকে যথার্থই আমোদ প্রদান করিবে।

পুস্তক খানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে মহেন্দ্র বাবু যত্নের ত্রুটি করেন নাই এই জীবনবৃত্ত সঙ্কলন করিতে তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাও প্রশংসা জনক। পুস্তক খানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইহা সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনেক পুস্তকের বুঝা[illegible] অবগত হইতে হইয়াছে, বিস্তর সময় [illegible] অতিবাহিত হইয়াছে। কি[illegible] দুঃখের বিষয়, এত যত্ন ও পরিশ্রম করি[illegible] যাও মহেন্দ্র বাবু পুস্তকখানির সর্ব্বাঙ্গ[illegible] সুখপাঠ্য করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ প্রথমাংশের স্থানে স্থানে ভাব কতক[illegible] দুর্ব্বোধ এবং ভাষাও কিঞ্চিৎ জটিল হই[illegible] পড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দু[illegible] একটী উদ্ধৃত করা গেল:—

২ পৃষ্ঠা। "ব্যাধি প্রশমনের উপা

মত্র, তাঁহাদের হস্তস্থলনাস্ত থাকিয়া এই ভ্রমসঙ্কুল অসঙ্গতিকে দার্শনিক মতের দোহাই দিয়া কি ধারাবাহিক কাল নির্ব্বিবাদে বিরাজিত রাখিতে পারে? না, অনন্ত শক্তির প্রভুত্ব আকর্ষণে অধিকারী হয়?

৪ পৃ। "হিপোক্রেটিসের তুলনায়, হানিমানে অনুধাবন শক্তির বিদ্যমানতা পূর্ণভাবে বিকসিত।

৬ পৃ। "মানবের মহত্ত্ব, নিয়তি এবং উৎপত্তি-সম্বন্ধে তাঁহার মহোচ্চ মত এবং তাঁহার উদার স্বভাব, এই যুগ্ম বিষয়ে অণুমাত্র তাঁহার সন্দেহ ছিল না।

ঐ পৃ। "তাঁহা দ্বারা হানিমানের গঠনা কার্য্যে বিস্তর স্বাতন্ত্র্য ছিল।

১২ পৃ। "আয়ত্তীকৃত বহুবিধ গবেষণা।"

দুই এক স্থানে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক পদও প্রযুক্ত হইয়াছে:—যথা, (৬-৭ পৃ) "রেক্টর তাঁহাকে বিদ্যালয়ের অপরাপর বালকের গ্রীক ভাষার সহজ পাঠ বলিয়া দিবার শিক্ষাভার অর্পণ করেন।" এখানে "শিক্ষা" পদটি না দিলেও চলিত।

৭ পৃ। "পিতৃদেবের হিতশিক্ষার গুরুত্ব সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলাতে, তাঁহাকে বড় একটা বিপদেপতিত হইতে হয় না।"

কিন্তু তাই বলিয়া, ইহার সর্ব্বস্থানই দোষপরিপূর্ণ নহে, অবশিষ্ট স্থানে ইহাতে উপন্যাসের ন্যায় মধুর ভাষাও আছে।

যাহা হউক, পুস্তক খানির স্থান বিশেষে ভাষার জটিলতা না থাকিলে, ইহা যে এক খানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ এবং "জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল" ও "জোসেফ্ ম্যাটসিনির জীবনবৃত্তের" সমান আসন পাইবার যোগ্য হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভরসা করি, গ্রন্থকার দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণকালে ইহার ভাষা কিছু প্রাঞ্জল ও শ্রেষ্ঠতর করিবেন। ভাষা সরল হইলে, ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে পরিগণিত হইবারও সমধিক সম্ভাবনা ছিল। পুস্তকখানি না কি হিতশিক্ষা-পূর্ণ, সুতরাং প্রয়োজনীয়, এবং ইহার বিষয়টিও আমাদের বড় প্রিয়। সেই জন্যই ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে পাইতে বড় ইচ্ছা করে।

পুস্তকখানির উৎসর্গ করণেও তাঁহার সুরুচির নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রন্থকার মহেন্দ্রবাবু, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম, ডি, মহানুভবকে অর্পণ করায় সুখী হইলাম। পুস্তকখানির মূল্যও অতি অল্প। আর্য্যদর্শন প্রকাশিত ভাগ অপেক্ষা গ্রন্থের আকার চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য, জীবনচরিত-সংগ্রহে মহেন্দ্র বাবুর যেরূপ আন্তরিক যত্ন, উৎসাহ ও অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে, তিনি "হানিমানের জীবনী" ন্যায় স্বদেশীয় কোন কোন মহাত্মার সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া আমাদের আরও প্রশংসাভাজন হইবেন। শ্রীহরিচরণ রায়।

বোম্বায়ের পার্সী সম্প্রদায় *।

কিছু দিন পূর্ব্বে পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বোম্বাই পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতার "বীটন সভায়" বোম্বাইবাসী পারসিক সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ অভিব্যক্ত করেন। ঐ বিবরণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। আমরা ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ পাঠক মাত্রকেই ঐ উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা এই প্রস্তাবের স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের সারাংশ উদ্ধৃত ও তৎসঙ্গে উক্ত জাতির বৃত্তান্ত বিবৃত করিব।

হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পশ্চিমে কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণে যে পারসিকগণ বিস্তীর্ণ ও পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহারা আর্য্যবংশোদ্ভব। ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের সহিত ইহাঁদিগের ভাষা, ধর্ম্ম ও আচারগত সৌসাদৃশ্য বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। আসীরিয়া ও বাবিলোনিয়ার পতনের পরে পারস্য সাম্রাজ্য বিশেষ অভ্যুন্নত হয়; কিন্তু মহাবীর আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়-কালে ইহা গ্রীক সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তৎপরে সেলুকীয় ও পার্থীয়গণের পরাক্রম কালে ইহা তদধীনে থাকে। তদনন্তর খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগে পুনরায় ইহা স্বাধীনতা ও অভ্যুদয় লাভ করে এবং ক্রমাগত চারি শত বৎসর কাল ইহার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরবের মরুভূমিতে মহম্মদ যে সঞ্জীবন মন্ত্র প্রদান করেন, সেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া চীরধারী, মরুবাসী, পশুপালক পরিব্রাজক দল এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া দিগ্বিজয়ে নিষ্ক্রান্ত হন। সেই দিগ্বিজয়ী সেনার সম্মুখে দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য একে একে আনত হয়। খৃষ্টীয় ৬৪১ অব্দে খালিফ ওমারের তরবারি আঘাতে সুহবন্দ ক্ষেত্রে পারসিক রাজমুকুট মৃত্তিকাশায়ী এবং পারস্য দেশ মুসলমান-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমান অধীনে আসিলে, দেশ-মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বিজেতৃগণের দেয় কেবল দুই—কোরাণ, নচেৎ তরবারি। ইহাদের তৃতীয় বস্তু দেয় কিছু নাই—দয়া নাই, দাক্ষিণ্য নাই, ক্ষমা নাই। আর্য্যকুলসম্ভব, অগ্নি ও সূর্য্যোপাসক পারসিকগণ অধিকাংশই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল; আর যাহারা তাহাতে স্বীকৃত না হইল, তাহারা বিজেতৃগণের উৎপীড়নে

* The Parsis of Bombay,—A Lecture delivered on February 26, 1880, at a Meeting of the Bethune Society, Calcutta by, Dr. Rajendralala Mitra, C. I. E.

নগর হইতে জনপদে, জনপদ হইতে অরণ্যে, পর্ব্বতে ও মরুভূমিতে পলাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল; সেখানেও বিজেতার উৎপীড়ন তাহাদের অনুসরণ করিল। অবশেষে স্বধর্ম্ম, অনাথা স্বদেশ, পরিত্যাগ করা ভিন্ন তাহাদের আর উপায়ান্তর রহিল না। অগত্যা তাহারা শেষোক্ত উপায়ই অবলম্বন করিল। ইতিপূর্ব্বে নৌগঠন এবং সমুদ্রাভিযানে ইহাদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই অভিজ্ঞতা তাহাদের কার্য্যে আসিল। ইহারা আপনাদিগের পরিবার ও আত্মীয় স্বজন এবং গৃহদেবতাগণের সহিত পোতারোহণের স্বদেশের নিকটে চির বিদায় লইল এবং আশ্রয়ানুসন্ধানে সুদূর প্রাচ্যাভিমুখে চলিল।

বোম্বায়ের পারসী সম্প্রদায় এই প্রবাসী পারসিকদিগেরই সন্ততি। প্রথমতঃ কতগুলি লোক দেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আইসেন, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। প্রবাসিগণ সকলে একেবারেও আসেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়কগণের অধীনে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিমাত্র সময়ে সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অদ্যাপি পারস্য হইতে সময়ে সময়ে ব্যক্তিবর্গ আসিয়া পারসিকগণের দল পুষ্টি করেন।

প্রবাসিগণ প্রথমতঃ কাঠেবাড় উপদ্বীপের সম্মুখীন দিউ দ্বীপে আপন আবাস স্থাপন করিয়া প্রায় উনিশ বৎসর কাল অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে বোধ হয়, তাঁহাদের জনসংখ্যা অধিক হওয়াতে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে স্থান সঙ্কুলান হইয়া উঠে না, এবং দ্বীপবাসীরাও বোধ হয়, তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা অনুকূলাচরণ করিত না। এই সমস্ত কারণে তাঁহাদিগকে দিউ পরিত্যাগ করিয়া ভারতের শুষ্ক ভূমিতে আশ্রয়ানুসন্ধান করিতে হইল। অবশেষে পুরোহিতগণ গ্রহ-নক্ষত্রাদির সমাবেশ গণনা করিয়া শুভ দিন নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, ইহাঁরা গুজরাট উদ্দেশে যাত্রা করেন। খৃষ্টীয় ৭১৭ সনে এই অভিযান সম্পন্ন হয়।

যাত্রিদল সঞ্জন বন্দরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই স্থানটী দামানের ১২ক্রোশ দক্ষিণে একটী সঙ্কীর্ণ উপসাগরের উপর সংস্থিত। এই স্থান এক্ষণে একটী অপ্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম মাত্র, এখানে পারসীর সংখ্যাও অধিক নাই। সঞ্জন এই সময়ে যাদো রাও নামক এক জন হিন্দুরাজার অধীনে ছিল। ইনি স্বাধীন রাজা ছিলেন না; গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী পট্টনের অধীশ্বর রাজপুতরাজের অধীন ছিলেন, বোধ হয়। প্রবাসিগণের অধিনায়ক এবং পুরোহিত,—তাঁহাদিগের "দস্তুর" ও "মোবেদ"গণ—ইঁহার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাজা অপরিচিত বৈদেশিকগণকে সহসা আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। তিনি তাঁহাদিগের বিশেষ আচার ব্যবহারের

বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রধান "দস্তুর" তাহাদিগের যেরূপ উত্তর দেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল *;—

"হে প্রবলপ্রতাপ নরপতে! আমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস আপনার নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

"আমাদিগ হইতে ভীত হইবেন না। আমাদিগের এ স্থানে আগমনে আপনকার কোন অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই।

"আমরা সমগ্র ভারতের বন্ধু ভাবে অবস্থান করিব। আপনি জানিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করুন যে, আমরা "য়েজদানে"র পূজা করিয়া থাকি।

"আমাদিগের বিশ্বাসের জন্য আমরা বিধর্ম্মীদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি। আমাদিগের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি।

"দূর যাত্রাতে আমরা নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে পড়িয়াছি।

"গৃহ, ভূমি, ধন ধান্য যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্ত আমরা একবারে পরিত্যাগ করিয়াছি।

"হে ভাগ্যবান্ রাজন্! আমরা জেমশিদের অসহায় সন্তান; আমরা সূর্য্য ও চন্দ্রের পূজা করিয়া থাকি; আর তিনটীকে আমরা শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, যথা—"গো, জল এবং অগ্নি। আমরা অগ্নি ও জলের পূজা করিয়া থাকি। এবং গো, সূর্য্য এবং চন্দ্রেরও পূজা করি, ঈশ্বর পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমস্তই আমরা পূজা করিয়া থাকি; কেন না, তিনি এ সকলকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

"দ্বি-সপ্তুতি গুণান্বিত এই যে কোমরবন্ধ, ইহা আমরা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বন্ধন করি।

আরও যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিবে সে ৪০ দিন পর্য্যন্ত নিয়ম সংযত হইয়া থাকিবে এবং সে একাকী অবরোধের মধ্যে থাকিবে। যদি যথাসময়ের পূর্ব্বে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করে, অথবা যদি সে মৃত বৎস প্রসব করে, তাহা হইলে তাহার বাহিরে যাওয়া বা চলিয়া বেড়ান নিষিদ্ধ; কাহারও সহিত কথা কহাও তাহার নিষিদ্ধ, এইরূপে সে এক চত্বারিংশ দিন পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিবে।"

সঞ্জানাধিপ হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের সহিত ইহাদিগের আচার ব্যবহারের এইরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিশেষতঃ গো, অগ্নি ও সূর্য্যের প্রতি ভক্তি দেখিয়া কতক আশ্বস্ত হইলেন এবং স্বরাজ্য-মধ্যে তাহাদিগকে বাস করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে কয়েকটী নিয়ম বদ্ধ করাইয়া লইলেন। নিয়ম গুলি এই:—তাহাদিগের নিজ ভাষা পরিত্যাগ করিয়া তদ্দেশভাষা অবলম্বন করিতে হইবে; তাহাদিগকে নিজ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় পরিচ্ছদ অবলম্বন

* Parsis of Bombay, P. 11.

করিতে হইবে; রাত্রিকালে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। পারসিকগণকে অগত্যা এই কাঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্র—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

নির্ঝরিণী, ১ম খণ্ড, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত, ষ্ট্যানহোপ যন্ত্র, মূল্য ॥০ আনা নির্ঝরিণীর প্রতিপাদ্য বিষয় সুন্দর এবং প্রকৃত কবিত্বে পরিব্যাপ্ত। ইহার উদ্যান এবং আঁখির মিলন পাঠ করিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

ইহাতে প্রকৃত কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার ফুলবালার প্রশংসা কিছু দিন পূর্ব্বে করিয়াছি। তবে এই গীতিকাব্যের স্থলবিশেষে যতি-পতন ঘটিয়াছে, তাহা সংশোধন করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা এক নিখুঁত আদর্শ গীতি-কাব্য হইবে।

কুসুমাঞ্জলি, শ্রীমোজাম্মেল হক রচিত। বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিলে কেমন আনন্দ হয়, অন্যকে বুঝাইতে পারি না। যিনি আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তিনিই জানিতে পারেন, আমাদের বলিবার তাৎপর্য্য কি এবং আমরা সত্য বলিতেছি কি না। এই পদ্যসন্দর্ভ যদি এক জন মুসলমানের লেখনী প্রসূত না হইত, তাহা হইলেও প্রশংসার বিষয় হইত। বঙ্গবিধবার চিত্রটী সুন্দর; কে বলিতে পারে? অস্তোন্মুখ সূর্য্যের প্রতি নলিনী জীবনপ্রদীপ, মহরমাদির বর্ণন শ্রবণ-সুখকর। অবশিষ্টগুলিও নিতান্ত মন্দ নয়। গ্রন্থকর্ত্তা আর্য্যদর্শনের এক জন ভূতপূর্ব্ব গ্রাহক; তাঁহার বর্ত্তমান উন্নতিতে সন্তুষ্ট হইলাম।

কমলেকামিনী, বা ফুলেশ্বরী (নাট্য-রাসক) শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। রাধানাথ বাবু, বঙ্গভাষার উন্নতিকারক ভক্ত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের চণ্ডীকে আদর্শ ও অবলম্ব-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই নাট্যরাসক রচনা করিয়াছেন ইহাতে অনেক গুলি গীতিকার সন্নিবেশন করা হইয়াছে। ইহার কবিতা ও গীতিকায় আমাদিগের পরিতৃপ্তি জন্মিয়াছে। নির্দোষ জগতে কিছুই নাই। সেই হিসাবে এই পুস্তিকারও সামান্য অভাব আছে, উপযুক্তরূপ দোষ সংশোধন হইলে, গ্রন্থকার সৎকবি ও সুলেখক হইয়া উঠিবেন।

প্রশান্তকুসুমম্ (খণ্ডকাব্যম্) শ্রীগদাধর তর্করত্ন, গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

আজি কালি লোকে সংস্কৃত শ্লোকের কিছু কিছু আদর করিতেছে বলিয়া এরূপ দুই এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তকের শ্লোক গুলি মন্দ নহে; বর্ণাশুদ্ধি কিছু কম হইলে ভাল হইত।